প্রধান সম্পাদক—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় :: সহঃ স —শ্রীবীরেন্দ্রমোহন মজুমদার বি. এল

১৬শ বর্ষ VOL. X — ২১শে পৌষ, ১৩৫০ :: January 6, 1944 — ১ম সংখ্যা No. 1

নববর্ষের কথা

দীপালী ষোড়শবর্ষে পদার্পণ করিল। এই উপলক্ষে আপনাদের নিকট হইতে যে [illegible] সহযোগিতা ও সহানুভূতি লাভ করিয়াছি তাহা আজ আমরা স্মরণ করি।

আমাদের ত্রুটি বিচ্যুতির কথাও আজ মনে পড়িতেছে। বৎসরাধিক কাল শুধু সেবার আন্তরিকতা ভিন্ন অপর কোন সম্বল আমাদের ছিল না। বিপর্যস্ত জীবনের দীর্ঘশ্বাস কয়েকটা মাস এই ভাগ্যহীন প্রদেশের গ্রামে প্রান্তরে শ্বসিয়া ফিরিয়াছে, আজও তাহার স্পর্শ যেন আমরা অনুভব করিতেছি কেবল, আপনাদের সান্নিধ্য ও সহযোগিতার আশ্বাস এই নিরানন্দ দিনগুলিকে সহনীয় করিয়া তুলিয়াছে।

কোথা হইতে কি ঘটিয়া গেল তাহা ভাবিলে যেন আজ দিশাহারা হইতে হয়। হঠাৎ একদিন দেখিলাম মহাকালের বিষাণ গম্ভীর নির্ঘোষে বাজিয়া উঠিয়াছে, অন্তরের দীর্ঘ সঞ্চিত দাহে এই শস্যশ্যামলা জননীর নিথর কাল দেহ যেন ক্ষণে ক্ষণে শিহরিয়া উঠিল। অশরীরি কাহারা যেন বীভৎস রক্ততৃষায় রসনা মেলিয়া আমাদের ঘেরিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। ইহাদের আমরা ফিরাইতে পারিলাম না, লক্ষ লক্ষ নরবলি দিয়া ইহাদের উত্তপ্ত রসনাকে তৃপ্ত করিতে হইল। চক্ষু মেলিয়া যখন চাহিলাম, দেখিলাম দেশের চেহারা হইয়াছে বাত্যাসংক্ষুব্ধ রজনীর প্রভাতের মত। জীবনের কত টুকরা বিচ্ছিন্ন অংশ যে ইতস্ততঃ ছড়াইয়া রহিয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। যেন বিসর্জ্জন আসিয়া প্রতিষ্ঠাকে লইয়া গিয়াছে।

আজ শিল্পকলা ও সাহিত্যের উৎকর্ষের কথা যেন অবাস্তব স্বপ্ন বলিয়া মনে হইতেছে। একটা শ্রীহীন গতানুগতিকতা আমাদের অস্তিত্বকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। এই ধ্বংসলীলার মাঝখানে দাঁড়াইয়া গঠনের ও সুন্দরের পরিকল্পনাও যেন আজ সুদূর স্বপ্ন বলিয়া মনে হয়। বাংলার সমস্ত সাময়িকের অঙ্গে লাগিয়াছে এই শ্রীহীনতার, এই রূঢ় জীবনযাত্রার ছাপ।

আমাদের ত্রুটি বিচ্যুতির কথা বলিতে বসিয়া এই ঐতিহাসিক বিপর্যয়ের কথাই বারে বারে মনে পড়িতেছে। ইহার পটভূমিকায়ই আপনারা আমাদের বিচার করিবেন। এই রূঢ় অভিজ্ঞতা যেন আমাদের দিবসের চিন্তা ও নিশীথ তন্দ্রাকেও আচ্ছন্ন করিয়াছে। অভিশাপ দীর্ঘ বাহু মেলিয়া আমাদের গ্রাস করিয়াছে। ইহার কবল হইতে এ যুগের নরনারী দীর্ঘ দিন মুক্তি পাইবে না। এই ঐতিহাসিক দুর্গতির কাহিনী বলিতে বসিয়া আমাদের বক্তব্য থামিতে চাহে না। মনে হয় কত কথাই বলিবার ছিল, যাহার কিছুই হয়তো বলা হইল না।

বৎসরাধিক কাল এই স্তরেই আমরা গাহিয়া চলিয়াছি। জাতীয়তার যাহারা চারণ তাহাদের এই গান গাহিয়া পথ অতিবাহন করিতে হইবে। ইহা ছাড়া অন্যপথ সংবাদপত্রসেবীর এযুগে থাকিতে পারে না। জাতীয় জীবনে বিস্মৃতি বড় মারাত্মক বিলাস, বাঙালী আমরা সমস্ত রূঢ়তাকে এড়াইতে পারিলেই যেন বাঁচিয়া যাই। এই বিস্মৃতির

জীবন-সঙ্গীত

(বড় গল্প)

—শ্রীশচীন্দ্রনাথ মিত্র

ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম সকাল আটটা পঁয়তাল্লিশ। কলকাতা থেকে একশো সাতাত্তর মাইল দূরে, সাঁওতাল পরগণার একটা নগণ্য ষ্টেশনে, মোগলসরাই প্যাসেঞ্জারটা বিকট গর্জ্জন করতে করতে এসে মিনিট খানেকের জন্য থামল। রাধেশের ঘুম ভেঙ্গে গেল।

সে একটা নীলাম্বরী শাড়ী দিয়ে আপাদ মস্তক ঢেকে শুয়েছিল; ট্রেনের গর্জ্জনে ঘুম ভেঙ্গে [illegible] মনে মনে ই, আই, আর কোম্পানীর মুণ্ডপাত করে, শাড়ীর তলা থেকে মুখটি বার করে বাইরের দিকে একবার চেয়েই আবার সে তাড়াতাড়ি শাড়ীর তলায় মুখ ঢাকল। শরতের স্নিগ্ধ রৌদ্রে চতুর্দ্দিক তখন হেসে উঠেছিল।

ট্রেনের ফোঁস্-ফোঁসানি ক্ষীণ হতে ক্রমে ক্ষীণতর হয়ে এল। সে নিশ্চিন্ত হয়ে পাশ ফিরে শুলো। বেলা সাড়ে দশটার আগে আর কোন ট্রেন নেই, এখন ঘণ্টা দুয়েকের মতো সে নিশ্চিন্ত। একটা ঢোক গিলে তার জের টেনে তিন চারবার খাবি খেয়ে গলাটা ভিজিয়ে নিয়ে, পাশ বালিশটাকে দৃঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ করে সে আচ্ছন্নের মতো পড়ে রইল।

এইভাবে কতক্ষণ সে শুয়েছিল জানে না, হঠাৎ জানালার তলা থেকে কে যেন করুণ-স্বরে ডেকে উঠল: রাধদীশ বাবু, এ রাধদীশবাবু—

রাধেশের তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাবটা আবার ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। ভীষণ বিরক্ত হয়ে, মুখের ওপর থেকে শাড়ীটা একটু ফাঁক করে শ্লেষ্মাজড়িত বিকৃতকণ্ঠে সে বলল: কোন হায় রে! আবি ভাগ···

বাইরে থেকে আবার আওয়াজ এল: আরে বাবু উঠ্ঠাল্ [illegible]···

আর কোন উত্তর দেবার প্রয়োজন নেই মনে করে রাধেশ ভাল করে কান-মাথা ঢেকে পাশ ফিরে শুলো।

রমা স্নান করতে গিয়েছিল। স্নান সেরে ঘরে ঢুকে দেখল রাধেশ নির্ব্বিকার ভাবে চোখ বুঁজে শুয়ে রয়েছে এবং জানালার বাইরে থেকে ষ্টেশনের কুলী সর্দ্দার তেজু একটানা আওয়াজে ডেকে চলেছে: রাধদীশ বাবু—এ রাধদীশবাবু—

সে জানালার আড়ালে সরে গিয়ে কপাটের ফাঁক দিয়ে দেখল, তেজুর সঙ্গে ভাটিয়াদের মতো পোষাকপরা একটি রোগা ভদ্রলোক উৎকণ্ঠিত ভাবে জানালার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

কিছুক্ষণ ডাকাডাকির পর তেজু সেই ভদ্রলোকটিকে, বাঙলা ও হিন্দির মিশ্রিত ভাষায় বলল: মনে হচ্ছে বাবু এখন উঠবেন না—

চেষ্টাকৃত হিন্দিভাষার সাহায্যে ভদ্রলোকটি উৎকণ্ঠিত স্বরে বললেন: কেন?

গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে তেজু বলল: কাল রাত্রে লছমী বিবির বাড়ীতে খুব গান বাজনা হয়েছিল, বাবুও গান গেয়েছিলেন।

ভদ্রলোক কিছু বুঝতে না পেরে বিস্মিত দৃষ্টিতে তেজুর দিকে চেয়ে রইলেন। তেজু আবার বলল: বাবু গান করেন খুব ভাল, কিন্তু ঐ এক দোষ, মদ বা ভাঙ না খেলে গাইতে পারেন না। কাল [illegible] টেনেছেন, তাই আজ আর [illegible]

একটা ঢোক গিলে ভদ্রলোক বললেন: কী সর্ব্বনাশ! লোকটা মাতাল!

তেজু ব্যস্ত হয়ে [illegible] কথা বলবেন না। বাবু আমাদের মদ খান বটে কিন্তু কেউ কখন ওঁকে মাতাল হতে দেখেনি। আপনার মতো বহুত লোকই তো এ বাড়ীতে এসেছেন, কিন্তু অসুবিধে তাদের কারুরই হয়নি। আপনি থাকবেন দোতলায়, বাবু একতলায় বসে মদই খান আর ভাঙই খান, আপনি তো আর দেখতে আসছেন না। তাছাড়া বাবু আমাদের বড় দয়াল···বড় ভদ্দর···

—তা না হয় হলো, কিন্তু এ ভাবে আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকব? তার চেয়ে বরং··· ভদ্রলোক ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন।

তেজু ব্যস্ত হয়ে বলল: আমি ওনাকে খবর দিচ্ছি—

তেজুকে প্রস্থানোদ্যত দেখেই রমা জানালার আড়াল থেকে সরে এসে রাধেশকে ঠেলতে লাগল।

আলাপনী

অভিশাপ যেন আমাদের জীবনে না ঘটে, আমরা আমাদের বেদনা ও দুর্গতির কথা সাহিত্যে ও শিল্পের দোহাই দিয়া আজ আপনাদিগকে ভুলিতে দিতে পারি না।

আজও দীপ কল্যরজনীর প্রহর গণিয়া আমরা চলিতেছি। দুঃসময় যেন অন্তহীন বলিয়া মনে হইতেছে। এই কালরাত্রির বুকে আলোকের মালা দুলাইয়া বিভ্রম সৃষ্টির চেষ্টা আত্মহত্যারই পথ। আমরা জানি ক্ষণ জোনাকির আলো নিমেষমাত্রেই গভীরতর অন্ধকারের সৃষ্টি করিবে।

'দীপালী'কে সৌন্দর্য্যে সেবায় আলোকোজ্জ্বল করিয়া তুলিতে আমাদের আশা ও পরিকল্পনার অন্ত নাই। হয়তো শীঘ্র সেইদিন আসিতে পারে সেদিন সেবার পরম কৃতার্থতায় আমরা নিজেদের ভাগ্যবান বলিয়া মনে করিব। আশাবাদী আমরা, পরম দুর্দ্দিনেও সার্থকমধুর ভাবী দিনগুলির কথা স্মরণ করি। সেই অনতিদূর দিনের মুখ চাহিয়া আজ আমরা আপনাদের সাহায্য ও সহানুভূতির মূল্য অধিক পরিমাণে অনুভব করিতেছি। দ্বিতীয় মহাসমরের এই নববর্ষ গভীরতর তমসায় আচ্ছন্ন বলিয়া ইহা যেন অরুণোদয়ের পূর্ব্বগামী প্রকৃতির রহস্য-মধুর রূপ বলিয়া মনে হইতেছে। নববর্ষ উপলক্ষে আমাদের এই সামান্য নিবেদন জ্ঞাপন করিয়া আজ আপনাদের শুভেচ্ছা কামনা করিতেছি।

ঠেলা খেয়ে বিরক্ত হয়ে, শাড়ীর তলা থেকে মুখ বার করে রাধেশ বলল : যাঃ, কী ইয়ার্কী হচ্ছে সকাল বেলায়···সে আবার পাশ ফিরে শোবার উপক্রম করল।

রমা এবার বিরক্ত হলো। বলল : কী ছেলেমানুষী হচ্ছে? শীগ্‌গীর ওঠো, বাইরে চেঞ্জার ভদ্রলোক এসেছেন যে!

রাধেশ চোখ বুঁজেই বলল : ভাগিয়ে দাও না—

—কী পাগলামী হচ্ছে? শীগগীর ওঠ বলছি, এই বলে সে রাধেশের গায়ের ওপর থেকে শাড়িটি টেনে নিয়ে সরিয়ে রাখল। সঙ্গে সঙ্গে রাধেশ ধড়মড় করে উঠে বসল। ভ্রুকুটী করে বলল : কী—কী হয়েছে কী?

বাইরে চেঞ্জার ভদ্রলোকটি এসে ডাকা-ডাকি করছেন, শুনতে পাচ্ছ না?

এই সময়ে খিড়কীর দরজা থেকে তেজু হাঁক দিল : বাবা—

তেজুর আওয়াজ পেয়েই রাধেশের আচ্ছন্ন ভাবটা একেবারে কেটে গেল। আলনা থেকে বগল ছেঁড়া একটা গেঞ্জী টেনে নিয়ে সে ব্যস্ত হয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল।

তেজুর সঙ্গে, গেঞ্জী গায়ে দিতে দিতে বাইরে এসে রাধেশ দেখল, ভদ্রলোকটি হাতের লাঠির ওপর ভর দিয়ে, অত্যন্ত বিরক্ত মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। কাছে এসে মুখ কাঁচু-মাচু করে সে জিজ্ঞাসা করল : আপনিই কি কবি রুদ্রকান্ত রায়?

—হ্যাঁ।

—ইস্—ছিঃ ছিঃ, আপনি যে আমায় কী ভাবছেন! এতক্ষণ আপনাকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রেখে, ছিঃ ছিঃ···আমি···

রাধেশের বিনয়ের আধিক্য দেখে রুদ্রকান্ত হেসে ফেললেন। বললেন, আপনি ব্যস্ত হবেন না, আমি কিছু মনে করেনি। এখন দয়া করে আমার ঘরটা যদি দেখিয়ে দেন তো একটু শুয়ে বাঁচি, সারা রাত জেগে এসেছি!

রাধেশ ব্যস্ত হয়ে বলল : ওঃ নিশ্চয় নিশ্চয়···

রুদ্রকান্ত তখন তেজুর দিকে চেয়ে বললেন : তুমি বাবা তাহলে ষ্টেশন থেকে আমার চাকরকে বাকী মালপত্র সব নিয়ে আসতে বল! আর এই নাও তোমার বকশীস···

একটি টাকা বার করে তিনি তেজুকে দিলেন। আশাতীত বকশীস পেয়ে সসম্ভ্রমে সেলাম করে, তেজু ষ্টেশনের দিকে ছুটল। রাধেশ তখন রুদ্রকান্তর ব্যাগটি নিয়ে অগ্রসর হলো।

—ওকি, ওকি, আপনি কেন? আর ও লোকটাও তো আচ্ছা—ভীষণ ব্যস্ত হয়ে রুদ্রকান্ত বললেন।

রাধেশ সহাস্যমুখে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললে : ব্যস্ত হচ্ছেন কেন,—চলুন।

—কিন্তু—

—কোন কিন্তু নয়। আগে ঘরে গিয়ে বসবেন চলুন, তারপর...

এ ছাড়া আর কোন উপায়ও ছিল না। কুলীটি প্রস্থান করেছিল, নিজের শরীরও অত্যন্ত দুর্ব্বল, এরূপ ক্ষেত্রে রাধেশ ছাড়া অতবড় ভারী ব্যাগটা বয়ে নিয়ে যায়ই বা কে! রুদ্রকান্ত অত্যন্ত কুণ্ঠিতভাবে রাধেশের সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগলেন।

—আপনার ঘরগুলো সব পরিষ্কার করানই আছে। তবু যতক্ষণ না ষ্টেশন থেকে আপনার লগেজগুলো এসে পড়ে, ততক্ষণ আপনি আমার ঘরে বসে একটু বিশ্রাম করে নিন। একটু চা খেয়ে শরীরটাকে চাঙ্গা করে নিন। সত্যি, আমি যে কী ভীষণ ইয়ে···

—আঃ, আপনি কেন মিছে কুণ্ঠিত হচ্ছেন? সত্যিই আমি কিছু মনে করিনি···

রাধেশ এবার অনেকখানি নিশ্চিন্ত হয়ে বলল : বেশ তবে চলুন, একটু চা খাওয়া যাক।

—চা ? চা তো আমি···আচ্ছা আজ না হয় একটু খাওয়া যাক, শরীরটাও বড় ম্যাজ-ম্যাজ করছে।

খুশী হয়ে রাধেশ বলল : ওঃ আপনি বুঝি চা খান না ! বেশ করেছেন মশাই, বড় পাজী নেশা, যেন কাঁঠালের আঠা, একবার ধরলে আর ছাড়ে না।

রুদ্রকান্তকে ঘরে বসিয়ে রাধেশ ছুটে এল রান্নাঘরে। সেখানে রমা তখন উনুন ধরাচ্ছিল, বলল : ওগো, শীগগীর দু' কাপ চা—

—দাঁড়াও, আগে উনুন ধরুক্।

—ওরে বাবা, সে তো তাহলে এক ঘণ্টার ধাক্কা। ইয়ে, তুমি বরং ষ্টোভে করে···

ভ্রূকুঞ্চিত করে রমা বলল : ষ্টোভ কোথায় ? সে তো বেচে খেয়েছ।

কথাটা রাধেশের মনে ছিল না। কয়েক-দিন পূর্ব্বে অর্থাভাবশতঃ এগার টাকার ষ্টোভটা তাকে মাত্র তিন টাকায় বেচে ফেলতে হয়েছিল।

—ইয়ে, তাহলে এক কাজ করো, তেজু আসছে ওর লগেজ নিয়ে—তাকে দিয়ে ষ্টেশনের ভেণ্ডারের কাছ থেকে চার পয়সার তৈরি চা আনিয়ে নিও—সে চলে গেল। পরক্ষণেই আবার ফিরে এসে বলল : আর দেখ, অমনি পয়সা আষ্টেকের মিষ্টিও আনিয়ে নিও—

রমা ফিস্ ফিস্ ক'রে বলল : বলে তো যাচ্ছ, কিন্তু ঘরে পয়সা যে বাড়ন্ত।

সচকিতভাবে এদিকে ওদিকে চেয়ে রাধেশ বলল : কেন ? কাল তো একটা টাকা ছিল—বলেই হঠাৎ সে থেমে গেল।

স্থির দৃষ্টিতে কয়েক সেকেণ্ড তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে, গম্ভীরভাবে রমা বলল : কোথায় গেল সে টাকা—জান না ?

চোখ মুখ লাল করে রাধেশ বলল : আচ্ছা,—আচ্ছা, তাহলে তেজুকে দিয়ে ও গুলো তুমি সব ধারেই আনিয়ে নিও। —এই বলে প্রস্থানোদ্যত হয়েই আবার সে ঘুরে দাঁড়াল। বলল : আর দেখ, চা'টা তুমি নিজেই হাতে করে নিয়ে এসো—

ভ্রূকুঞ্চিত করে রমা বলল : কেন—

—ইয়ে, মানে ভদ্রলোকের একটু খাতির টাতির করতে চাই,—যাতে ইনি কিছু বেশীদিন এখানে থাকেন। দেখলে না টাকাকড়ির ব্যাপারে ভদ্রলোক কি রকম উদার ! advance চেয়ে পাঠালাম —ভদ্রলোক advance-এর সঙ্গে এ মাসের ভাড়াটাও পাঠিয়ে দিলেন। কে এ রকম দেয় বলতো ?

সে চলে গেল। কিছুক্ষণ পরেই তেজু ও রুদ্রকান্তর প্রৌঢ় ভৃত্য রামহরি, কয়েকজন কুলীর মাথায় লাগেজ চড়িয়ে বাড়ী ঢুকল। তাদের দেখে রুদ্রকান্ত বললেন : এক কাজ করলে হয় না ? এদের দিয়েই লাগেজ খুলিয়ে জিনিসপত্র গুছিয়ে ফেলা যাক না কেন ! ঘরে তক্তপোষ আছে তো ?

—"সব ঠিক আছে—চলুন্।"

রাধেশ সকলকে নিয়ে দোতালায় উঠল।

(ক্রমশঃ)

ছুটির ঘণ্টা

পরিচালক—শ্রীবিজনকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

চিঠির থলি

আমার আদুরে ভাই বোনেরা—

দীপালীর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের এই প্রিয় আসর, তারই হাত ধরে আরো এক বছর বেড়ে উঠলো।······ যে-সব ভাই বোন এই আসরে ছিলে এবং যারা আছো তাদের নতুন কিছু বলার প্রয়োজন দেখি না।" আজ আমার বলার কথা হচ্ছে সেই সব ভাই বোনেদের কাছে যারা এই আসরের সঙ্গে নতুন বছর থেকে জড়িয়ে পড়লো—তোমরা মনে রেখো: "ছুটির ঘণ্টা" তোমাদের, আর তোমরা "ছুটির ঘণ্টা"র।......

চিঠির উত্তর : এবারে চিঠির উত্তর পেলে না। আসছে বারে নিশ্চয়ই তা' পাবে।

প্রতিযোগিতার ফলাফল : গত ২৫ নং প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পেলো—

১মঃ উমারাণী ভেরা (১০৬৩)
২য়ঃ সুখাংকুমার দাস (৩৪৯)
৩য়ঃ আফসারী বেগম (৬৭৬)

নতুন প্রতিযোগিতা : এবারে দিতে পারলাম না। পরের বারে তা' জানতে পারবেই।

এর শেষ কোথায় : তোমাদের "বীরুকে" দেখলাম এবারে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে, তাই আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—"ব্যাপার কি বীরু, চুপ করে দাঁড়িয়ে কেন ?"

—বিজনদা আমার কি করা উচিত বলুন তো এখন ? যাঁরা আমায় গোড়ে তুলছেন, তাঁরা বার্ষিক পরীক্ষায় নতুন ক্লাসে ওঠার আনন্দে মেতে রোইলেন, আর আমি তাঁদের বিনানুমতিতে এক পা'ও নড়তে পারি না। আমার অবস্থাটা তো তাঁরা একবার ভেবেও দেখলেন না !

—তাই নাকি। কেউ তা' ভেবে দেখেনি—এতো বড় অন্যায় কথা !

—দেখবেন না কেন ? যাঁরা আমায় সবচেয়ে বেশী ভালবাসেন তাঁরা ভেবে দেখে আমায় তাঁদের মতামত জানিয়েছেন। কিন্তু জানেন তো তাঁরা আমায় স্নেহ এত বেশী করেন যে, আমাকে দিয়ে যা সম্ভব নয়, যা কেবল কল্পনাই করা যায়, বাস্তবে তা পরিণত করা কোন দিনই সম্ভব হবে না—তাঁরা সেই সব করতে আমায় বলেছেন। তা আমি কি করি বলুন তো ?

—তাই তো ভাই, এ বড় সমস্যায় তুমি পড়েছো তো দেখছি! তা তোমায় আমি কিছু সাহায্য করতে পারি কি ?

—আপনি আর কি সাহায্য করবেন বলুন, তবে যদি আমার অভিভাবকদের সঙ্গে আপনার দেখা হয় তো জানাবেন আমার অবস্থাটা। আমি কি এমনি করেই দাঁড়িয়ে থেকে জীবনের মূল্যবান সময়গুলো নষ্ট করবো ?······

"বীরু'র অবস্থা তোমাদের জানালাম। তোমরা তাড়াতাড়ি জানিয়ো ও এখন কি করবে !

চাঁদা পাঠিয়ো : যারা নতুন বছরের সভ্যের জন্যে চাঁদা এখনো পাঠাও নি তারা আর দেরী না করে তাড়াতাড়ি তা পাঠিও। নতুন বছরের সভ্য-চাঁদা না পাঠালে আসরের কোন কিছুতেই যোগ দান করতে পারবে না সে কথাটা যেন মনে থাকে! গত ২৮শে ডিসেম্বর পর্যন্ত যাদের চাঁদা পেয়েছি তাদের সবার কার্ডই ডাকযোগে পাঠান হয়েছে। নিশ্চয়ই তারা এতো দিনে তা' পেয়েছো।

তোমাদের লেখা : গল্প প্রবন্ধ, যত ছোট হয় ততই ভালো সব দিক দিয়ে। মনোনীত হলে তা খুব শীঘ্রই ছাপা যাবে। দেখলে তো গতবার কেমন কতো লেখা একসঙ্গে বার হয়েছে! এমনি ছোট্ট যেন লেখাগুলো হয়। "জানতেই হবে" ইত্যাদি ঐ সব ধরণের সংগ্রহ করার সময় সাধারণ জিনিষ পাঠাবার চেষ্টা করে বৃথা নিজেদের সময় নষ্ট করো না। সংগ্রহ করবার নূতন কিছু পাঠিও, তা' না হলে ওসব পাঠিও না।

আজ আসি······স্নেহ রইলো।

তোমাদের : বিজনদা।

টাটকা
চা-বাগান
থেকে
চায়ের কাপে
টসের চা

বি.বি. ৩৩৫৪৬
চিত্রা

তোমাদের বিভাগ

"হিতে বিপরীত"

কুমারী উমারাণী ক্ষেত্রী (:০৬৭)

—'গিন্নী, ও গিন্নী, শুনেছ কি ভীষণ ্যাপার? নাও, নাও চট্‌পট্‌ সব বাধাছাঁদা ্রু করে দাও। অমন হাঁ করে দেখলে ক হবে আমার মুখের পানে? রাত ারোটায় গাড়ী। আর এই সন্ধ্যে ছ'টা বজে গেল, হাতে আর মাত্র ঘণ্টা পাঁচ ছয় ময় আছে। আরে মোলো? নাও, ওঠো ছাই, াধো না?……' সেদিন সন্ধ্যের পর হঠাৎ ফিস থেকে এসেই হন্তদন্ত হ'য়ে রামবাবু ার স্ত্রীকে এই কথাগুলো বলে ফেল্লেন। গন্নী, ওরফে রামবাবুর স্ত্রী তাঁর স্বামীর রকম-কম দেখে তো তাঁর দুধের হাতা হাতেই রয়ে গেল, খানিকক্ষণ হতভম্ব হ'য়ে তাঁর ্খের পানে তাকিয়ে থাকবার পর শেষে তনি বল্লেন—'কি ব্যাপার বলো তো? তামার মাথা খারাপ হ'য়ে গেল না কি গা? বারোটার সময় গাড়ী, বাঁধাছাঁদা—এসব াবার কি কথা? যাবো আবার কোথায় াই শীতের রাতে?'

—'আবার সেই তর্ক জুড়লে তো? ঃ, যতো সব ইয়ে। আরে আচ্ছা মুশকিলে ড়া গেছে ছাই—গুরুজনের কথার ওপর থা? মানে ইয়ে, তোমার জাপানী যে লো, মানে এসে পড়লো—সে সব খোঁজ বর কি রাখো কিছু? জানতো খালি হাতা াড়তে? বলি রেডিওতে কাল জাপানীরা ক ঘোষণা করে দিয়েছে তা জানো?

—"জানিনা বাপু তোমাদের ওসব যতো ্ন্ধের ঢঙের কথা।"

—"তাইতো বলছি, কাল ওরা বলেছে যে আজ রাত্রি একটার পর, মানে আর ঘণ্টা ছ'সাতের মধ্যে এসে ওরা তোমার কোল-কাতার ওপর দমাদম করে বোমা ফেলবে! পিলেগুলো সব চম্‌কে চম্‌কে উঠবে তার সংগে!"

—"বোমা ফেল্‌বে—তা আগে থেকে বুঝি কেউ আবার তা' বলে ফেলে?"

—"থামো, থামো, বুদ্ধির ঢেঁকি তো তুমি একটি। বলি যুদ্ধনীতি মানে পলিটিক্‌সের তুমি জানো কি শুনি? এসব দস্তুরমত রেডিওতে শোনা খবর। এ সব কথা কি কখনো মিথ্যে হয়? এই দেখো, কথায় কথায় মিনিটের কাঁটাটা কতো এগিয়ে গেল। নাও, নাও, ঝট্‌পট্‌ বিছানা-পত্তর বাঁধো, আমি চল্লুম ট্যাক্সী ডাকতে। এই ন্যাড়া, এই বুঁচি, ওঠ্‌ ওঠ্‌ সব শীগগির, ছুঁচো, পাজী ইঁদুরের দল সব, সন্ধ্যে হতে না হতেই শুয়েছিস্‌?"

—"করছো কি বলো তো? ওদের তুললে কি করতে? তারপর যাবে কোথায়? কোলকাতায় না হয় বোম পড়বে, তাতে তোমার হুলুস্থুল বাধাবার ঘটা কেন শুনি?"

—"ওঃ! শুনবে কোথায় যাবো? কাশী, কাশী, কাশী—যার নাম বেনারস্‌, আর শুনবে? প্রাণটা বাঁচলে তবে সব। শেষে বোমের তলায় প্রাণটা জেনে শুনে দোব নাকি? আত্মহত্যাও যা এও তো তাই। আমি চল্লুম গাড়ী ডাকতে। বাঁধো সব, বাঁধো না একধার থেকে—চুপ করে বসে রইলে যে? ঝাঁটা, বদনা, গাড়ু থেকে সুরু করে কিছু বাদ দিও না। বিদেশ বিভুঁয়ে যাচ্ছি, কার কাছে চাইতে যাবো?"

এ হেন একটা ভয়ঙ্কর কাণ্ড। জাপানী রেডিওতে নাকি বলেছে যে রাত্তির একটার সময় কোলকাতায় আজ বম্বিং হবে, তাই বাক্যবাগীশ রামবাবু সপরিবারে বোমের হাত হতে নিষ্কৃতি পাবার জন্য চল্লেন রাত বারো-টার গাড়ীতে কাশী। মোটঘাট যা' হোল, তা' ছোটনাগপুরের একটা পাহাড় বল্লেই হয়। সে তো গেল অস্থাবর সম্পত্তি, জংগমের মধ্যে রামবাবু নিজে, তাঁর স্ত্রী আর ন্যেড়া, বুঁচি তাঁদেরই ছেলে মেয়ে!

* * *

কোন রকমে এসে তাঁরা হাওড়ার প্ল্যাটফর্মে তো ঢুকলেন। সকলেই চলন্ত পাহাড় স্বরূপ মোটটি এবং তার মালিককে বিস্ময়ের দৃষ্টিতে দেখতে লাগলো ব্ল্যাক আউটের স্বল্প আলোকের মধ্য দিয়ে। শীতের রাতে আরামে যাবার জন্যে রামবাবু সেকেণ্ড ক্লাসেরই টিকিট কাটিয়েছিলেন। কিন্তু প্ল্যাটফর্মে এসেও এক মহাবিপদে পড়লেন।……রাত তখন মাত্র আটটা বেজে মিনিট কুড়ি হয়েছে। গাড়ী তো সেই রাত বারোটায়! কিন্তু রামবাবু যতক্ষণ না ট্রেনের কামরায় উঠে বসছেন ততক্ষণ তো তাঁর স্বস্তি নেই। একজনের পরামর্শে তিনি জানতে পেরেছেন যে উনি যে গাড়ীতে যাবেন তা সাইডিং এ পড়ে আছে। কিন্তু সেখানে গিয়ে উঠতে গেলে তো রেলের লোক তাঁকে এখুনি চেপে ধরবে। এখন উপায়? ওদিকে মুটিয়ারা বাবুকে হঠাৎ থেমে গিয়ে দাঁড়িয়ে চিন্তা করতে দেখে সেই বিরাট গন্ধমাদন মোটটিকে তাদের মাথা থেকে নামিয়ে ধরাশায়ী করে ফেলেছে—'বোলিয়ে বাবু কোন্‌ টিরেন মে তুলিয়েগা—জাস্তি দেরী হোনে সে…এৎনা ভারী মোট ভি তো উঠানে বহুৎ তক্‌লিফ্‌ হোগা—হঁ!"

—"দাঁড়া বাবা, একটু দাঁড়া তোরা। হুঁ—বুদ্ধি এসেছে মাথায়, ওগো শুনছো? তোমরা এখানে দাঁড়াও তো খানিকক্ষণ। এক্ষুনি এলুম বলে আমি—রামবাবু ছুটলেন
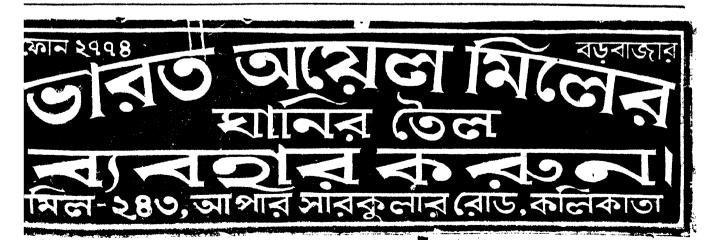
প্লাট্‌ফর্মের গেটের কাছে। প্রায় মিনিট পাঁচেক ধরে কথা হোল চেকারবাবুর সংগে রামবাবুর। চেকারবাবু কেবলই ঘাড় নাড়েন, আর রামবাবু নিজের স্বল্লায়তন শরীরটাকে কেবলই এধারে ওধারে সরিয়ে নড়িয়ে এক অদ্ভুত ভংগীতে সৌজন্য প্রকাশের চেষ্টা করেন। কিছুক্ষণ এইভাবে ভাবের আদান প্রদান হবার পর রামবাবু হতাশ হয়ে ফিরে এলেন তাঁরই তৈরী ছোটনাগপুরের পাহাড়টার কাছে।…শেষে তাঁর মালবাহী মুটিয়াদের কাছে জানালেন তাঁর দুঃখটা। তারা তো তাই শুনে গম্ভীর চালে বল্লে—ঐ তো বলিয়ে বাবু যে আপ্ রাত বারা বাজে কা গাড়ীমে কাশী যায়গা! চলিয়ে, হাম্ লোক ও গাড়ী জানতা হায়, আপকো সাইডিংসে উঠায় দেতা হায়। লেকেন বিশ রূপাইয়া বকশিস্ চাহিয়ে।" রামবাবু মহা খুসী হয়েই তা' দিতে রাজি হলেন। যেভাবে বা যে উপায়েই হোক, মুটের সাহায্যে রামবাবু সপরিবারে (সেই বিরাট মোটটিও অবশ্য তারই পরিবারভুক্ত) ব্লাক আউটের অন্ধকারেই লাইন পার হয়ে সাইডিং-এ অবস্থিত একখানি সেকেণ্ড ক্লাশ বগীতে উঠে বসলেন। "রাত বারোটায় ঠিক কাশীই যাবে তো এই গাড়ীটা?" —রামবাবু শেষ বারের মতো কুলিটার কাছ হতে এ সম্বন্ধে ভাল করে জেনে নেন্। "জরুর বাবুসাব"—কুলিটা বেশ জোরের সংগেই উত্তর দেয়।

মুটেদের ভাড়া চুকিয়ে রামবাবু এবার লাগলেন কামরার সব জানালা দরজাগুলো একদম বন্ধ করে দেবার কাজে। "কি করছো বলো তো? দম বন্ধ হয়ে মরে যাবো যে।"—রামবাবুর গিন্নী ঝঙ্কার দিয়ে ওঠেন।—"থামো, থামো তুমি, ভারী আমার ইয়ে এলেন!! মাঘ মাসের নতুন ইয়ে গায়ে লাগলে আর রক্ষে আছে? ব্যস্ শ্রেফ নিমুনিয়া…" জানলা দরজা সব বন্ধ করা হ'লে রামবাবু বিছানা পত্তর পেড়ে রাত্রির নিদ্রার বেশ একটা ব্যবস্থা করলেন। তারপর গিন্নী এবং ছেলেদের ঠিকমত শোবার নির্দেশ দিয়ে নিজে শুয়ে পড়লেন।

এদিকে কিন্তু একটা দারুণ মজা হ'য়ে গেছে। রামবাবু মুটের নির্দিষ্ট যে কামরাটায় উঠে বসলেন, সেটা রাত বারোটায় যে কাশীর গাড়ী ছাড়ে তার সংগে যোগ হবে না। সে বগীখানা পরদিন সকালের দিকে একখানা বর্দ্ধমান লোক্যাল গাড়ীর সংগে যাবে। রাত্রে ব্ল্যাক আউটের অন্ধকারে মুটেরা ঠিক আন্দাজ বুঝতে পারেনি। এদিকে ব্যস্তবাগীশ রামবাবুর তার পর দিন সকালে কি দশা হোল তা তো এরপর সহজেই সবাই বুঝতে পারো। * * *

"ওঠো গিন্নী, ওঠো ওঠো, দেখ গাড়ীটা বোধ হয় এখন মোগল সরাই-ফরাইয়েতে দাঁড়িয়েছে—ছেলেদের মুখহাত ধোওয়ার ব্যবস্থা করো, চট্ করে আমি ততক্ষণ দরজা খুলে প্ল্যাট্‌ফর্মে চায়ের আর জলখাবারের সন্ধান করছি—"—রামবাবু লেপের মধ্য থেকে বের হ'য়ে হন্তদন্ত হয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। কিন্তু দরজা খুলে চোখ দুটো বেশ ভালো করে রগড়ে যা দেখলেন তাতে রামবাবুর কেঁদে ফেলবার উপক্রম হোল। "যাঃ, চলে!! এযে সেই হাওড়ার সাইডিংয়েই পড়ে আছি!! কি মুশ্‌কিল, ও গিন্নী, কলিকালে যে সবই অদ্ভুত!! হ্যাঁ!! মুটে ব্যাটাচ্ছেলে তো আচ্ছা ঠকিয়েছে তা'হলে, কি মুশকিল!!"

—"তাইতো বটে!! এখন হোল তো? বোম্ পড়বে, বোম্ পড়বে করে যেন অস্থির হ'য়ে উঠলে—বাজে গুজবে বিশ্বাস করে তাড়াহুড়োতে কতকগুলো টাকার শ্রাদ্ধ

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ গৌরাঙ্গৌ জয়তাম্

সিঁথি বৈষ্ণব-সম্মিলনী

২৭, আটাপাড়া লেন, পোঃ কাশীপুর

সিঁথি বৈষ্ণব সম্মিলনীর সম্বর্দ্ধনা সভায়
প্রথিতযশা সাহিত্যিক ও সুকবি

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

মহাশয়কে প্রদত্ত

উপাধি-পত্র।

"মন্দিরা", "খঞ্জনী", "সপ্তস্বরা", "পত্রচিত্র," "পঙ্কপাত্র," "চিত্র ও চিত্ত," "ছবিত্রী," "মীরাবাঈ", "কৃষ্ণ-সুদামা", "বহ্নিবলয়", "সাহিত্য কথা", "মণি-মীমু", "মায়ামৃগ", "পঙ্কজিনী" প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক "দীপালীর" প্রাণস্বরূপ সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও বর্ত্তমান যুগের লব্ধপ্রতিষ্ঠ অন্যতম সুকবি শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে তাঁহার একনিষ্ঠ বাণী সেবার ও সাহিত্য-সাধনার পুরস্কার স্বরূপ সিঁথি বৈষ্ণব সম্মিলনী কর্ত্তৃক **"কাব্য-রত্নাকর"** উপাধি প্রদত্ত হইল। ইতি—সন ১৩৫০ সাল, তাং ৩রা পৌষ।

শ্রীরসিকমোহন দেবশর্ম্মা, (বিদ্যাভূষণ)
(সভাপতি)

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী, কবিরত্ন
শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন
ভক্তিভারতী ভাগীরথী
(সহঃ সভাপতিদ্বয়)

শ্রীকৃষ্ণকিশোর ভাগবতভূষণ
(সম্পাদক)

হোল খালি, আর বোম্ পড়লো না হাতী পড়লো—তোমার যতো সব ব্যস্তপনা, নাও এবার ঘরে ফিরে চলো আবার এইসব লটবহর নিয়ে !!"

—তুমি থামো। বোঝা গেছে ব্যাটাদের ওসব ধাপ্পাবাজী। আর কখনও রেডিওর এই সব প্রোপাগণ্ডা বিশ্বাস করছি না। যত সব [illegible]—কিন্তু আমাদের কি হবে ? তাহ'লে সত্যি করে কি এইসব মোটঘাট নিয়ে আবার ঘরে ফিরে যাবো ? উঃ, কি ফ্যাসাদ রে বাবা !! তাহ'লে দুটো কুলিটুলি দেখি, না কি বলো ? উঁ ?" *

* ২৫নং প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত রচনা।

সুকবি শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়কে নমস্কার

—শ্রীবিষ্ণু সরস্বতী

হেরি বসন্তে অগণিতরূপে অন্তবিহীন
রসের মেলা
তার আগমনে জাগে বনে বনে পল্লবদলে
রঙের খেলা।

বঙ্গ-বাণীর নবীন বিতানে হে কবি ফুটালে
কুসুম রাশি
গৌরব সাথে সৌরভ তার সারা বাংলায়
বেড়ায় ভাসি।

প্রেমের সিন্ধু মথি' ভক্তেরা যে সুধা লভিয়া
করিল দান
সে অমিয়রসে সিঞ্চিত কবি কল-গুঞ্জিত
তোমার গান।

গিরিধর গীতি-মুখরিতা মীরা শুনিয়া তোমার
বীণার ধ্বনি
এল বাংলায় হিয়ায় হিয়ায় বসাইল তার
হৃদয় মণি।

কৃষ্ণকরুণা তোমার শিয়রে পড়িছে ঝরিয়া
নিয়ত তাই
সুদামার সাথে দ্বারকার পথে তোমারে চলিতে
দেখিতে পাই।

যে দীপ জ্বেলেছ ছড়ায়ে পড়িছে
চারিদিকে আজ আলোক তার
লহ, বৈষ্ণব, মম সবিনয় শ্রদ্ধাপূরিত নমস্কার।

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ গৌরাঙ্গৌ জয়তাম্

প্রথিত-যশা সাহিত্যিক

সুকবি শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়
মহাশয়কে প্রদত্ত

অভিনন্দন

হে কবি,

বৈষ্ণবের যে কৃপালাভে সর্ব্বানুভূতি ঘটে ও যার ফলে অন্তরে জেগে ওঠে একান্ত মমত্ববোধ, যার সরল সুছন্দে স্পন্দিত অন্তরাত্মা ঝঙ্কৃত হয়ে ওঠে জীবনের ব্যথার সৌন্দর্য্যে অশ্রুময়ী বাণীরূপে, চির অম্লান গন্ধভরা পবিত্র ফুলের মত, সেই কৃপা-লাভে পরমভক্ত ভাগ্যবান যে আপনি তা আপনার সুদীর্ঘ নীরব বাণী-সাধনায় ধীরে ধীরে ব্যক্তিলাভ করেছে রসিক সুজন সমাজে, প্রস্ফুটিত ফুলের সৌরভের মত, তাই গুণমুগ্ধ সমবেত আমরা আপনাকে আজ সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করি !

হে বাণী সেবক,

আমাদের আয়োজনের আড়ম্বর নেই, তার প্রয়োজনও বোধ করিনি এই জন্য যে আপনাকে নিতান্ত আপনজন বলে চিনে ফেলেছি আপনার মুখে শুনে "মীরাবাই"এর সুরে শ্রবণমঙ্গল শ্রীগোবিন্দের গান : ভরসা পেয়েছি আপনাকে আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনে—শিশুসুলভ সরল কণ্ঠে কৃষ্ণ-সুদামার গান শুনে আর সতী সাবিত্রীর মহিমা কীর্ত্তন শুনে তাই গুণমুগ্ধ আমরা আপনাকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করি !

হে প্রথিত-যশা সাহিত্যিক,

সাহিত্য রসিক মহারাজ জগদিন্দ্রনাথের একান্ত সাধের "মানসীর" সেবা থেকে আরম্ভ করে কি উপন্যাসে, কি গল্পে, কি নাটকে, কি প্রবন্ধে কি কবিতায় নানা উপচারে একনিষ্ঠভাবে এই দীর্ঘকাল আপনি বঙ্গ-ভারতীর সেবায় আত্মনিয়োগ করে যে নিষ্ঠার ও শ্রদ্ধার পরিচয় দিয়েছেন তজ্জন্য আপনাকে গুণমুগ্ধ আমরা অভিবাদন করি !

গুণমুগ্ধ
সিঁথি বৈষ্ণব সম্মিলনীর সভ্যবৃন্দ

সম্বর্দ্ধনা সভা
৩রা পৌষ, ১৩৫০ সাল
সিঁথি বৈষ্ণব সম্মিলনী
২৭, আটাপাড়া লেন

কবির নিবেদন

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্‌বিদ্যাভূষণ মহাশয়, পরমভাগবত বৈষ্ণববন্ধুগণ ও সমবেত সাহিত্যিক সতীর্থগণ—

সর্ব্বপ্রথমেই আপনাদিগকে আমি আমার গভীর কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রণাম ও অভিবাদন নিবেদন করি। আপনাদের সুদুর্ল্লভ আশীর্ব্বাদলাভ মাদৃশ অকৃতি জনের আশার অতীত। আপনারা জ্ঞানী ভক্ত ও সর্ব্ববিধ বিদ্যায় পারগামী, আপনাদের নিকট আমার নগণ্য সাহিত্যসেবা আজ যে উৎসাহ লাভ করিল, আশীর্ব্বাদ করুন, তাহা সূর্য্যালোকের মত যেন আমার পথপ্রদর্শকই হয়, তাহার ঔজ্জ্বল্যে ও তাপে আমার চক্ষু ধাঁধিয়া গিয়া, কখনও যেন আমার দিকভ্রান্তি না ঘটায়। আমার রচনাবলী ভবাদৃশ মহাজনগণের কিঞ্চিৎ পরিমাণেও যে চিত্তরঞ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছে, তজ্জন্য নিজেকে পরম ভাগ্যবান মনে করিতেছি।

আমি সেবক, সেবাই আমার ধর্ম্ম। আমার সেবা যে আপনাদের গ্রহনীয় হইয়াছে এবং সমাদরলাভ করিয়াছে, ইহাতে আমার সেবা যেমন সার্থক হইয়াছে, আমিও তেমনি কৃতার্থ হইয়াছি। কাজেই, আমার কৃতজ্ঞতার হেতু, আচাযাদের অনায়াসেই অনুধাবন করিতে পারিতেছেন :—

যোঽজ্ঞানমত্তং ভুবনং বিধুয়-
-প্রাচার্য চৈতন্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি।

শ্রীমদ্ভাগবত, ১১ স্কন্ধ, ২৯অ, ৬ শ্লোক

ভবাদৃশ ভাগবতগণ তীর্থস্বরূপ। আপনাদের সামীপ্যলাভে আমি ধন্য হইলাম :

ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থীভূতাঃ স্বয়ং প্রভো।
তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা॥

—শ্রীমদ্ভা, ১ম স্ক। ১৩ অ। ৮ শ্লো।

আপনাদের সম্মুখে আমার মুখব্যাদন করা সাজে না :

"তোমার আগে ধাষ্টা এই মুখব্যাদান—"

চৈ, চ, অন্ত্য। ১ম। ১৭৪

কিন্তু অপার বাৎসল্যে ও স্নেহদৌর্ব্বল্যে আপনারা আমার প্রগল্‌ভতা মার্জ্জনা করিবেন, শ্র. নি :

—"তাহা তুমি সূর্য্যোপম ভাস।
মুঞি কোন্ ক্ষুদ্র—যেন খদ্যোতপ্রকাশ।"

চৈ, চ অন্ত্য। ১ম। ১৭৩

আপনারা

"নিজাঙ্কুরে পুলকিত পুষ্পে হাস্য বিকশিত"

তাই আপনাদের

"মধুমিষে বহে অশ্রুধার।"

আর সেইজন্যই আমার মত নগণ্য বংশকেও বেণুর মর্য্যাদা দিতেও আপনারা কুণ্ঠিত নহেন :

বেণুরে মানি নিজ জাতি আর্য্যের যেন পুত্রনাতি
বৈষ্ণব হৈলে আনন্দবিকার।"

—চৈ, চ, অন্ত্য। ১৬শ পরি। ১৪৮,

আচার্য্যদেব ও বন্ধুগণ, আপনাদের প্রীতিসাধন ও তজ্জনিত এই স্নেহাশীর্ব্বাদ লাভই আমার সাহিত্যসেবকের জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার। এ পুরস্কারের মূল্য হয় না, ইহা অমূল্য :

স্রজং ন কাচিদ্বিজহৌ জলাবিলাং
বসন্তি হি প্রেম্ণি গুণা ন বস্তুনি॥

—কিরাতার্জ্জুনীয়,
৮ম সর্গ। ২০ শ্লোক

আপনাদিগকে তাই পুনরায় প্রণাম ও অভিবাদন করি। ইতি সন ১৩৫০ সাল, ৩রা পৌষ

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়
কলিকাতা; ১৯শে ডিসেম্বর, ১৯৪৩

কবি-পূজা

—শ্রীমনুজচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী

কবির আদর এ যুগে অচল
কবিতারে কেহ পুছে না হায়—
কবিরা এখন মাসিকপত্রে
জন্মিয়া পুনঃ মরিয়া যায়।
সকল শ্রমেরই দাম দিতে হয়—
কাহারো মজুরী থাকে না বাকি
কবির মজুরী দেয় না গ্রহীতা
কবিরাই শুধু পেয়েছে ফাঁকি…
শুষ্ক-রুক্ষ মানুষ সমাজে
তোমারে যাহারা আদর করে
দেছে সম্মান—সমান পত্র
তাহাদেরই সেই অর্ঘ্য ধরে'—
আমি কবি সেই কবির আরতি
মজুরীবিহীন রচিয়া মালা
লও কবি তুমি তব কনিষ্ঠ
দত্ত, তুচ্ছ পূজার ডালা।

সমালোচনা

"ভূতের পাল্লায়"—ডাক্তার সন্তোষ কুমার দাশ, এম-বি প্রণীত। প্রকাশক শ্রীসুজিৎকুমার দাশ, দাম একটাকা চার আনা।

আমাদের এই বাংলা দেশে সত্যসত্যই একটা ভুতুড়ে কাণ্ড চলেচে। চিকিৎসকের থলিতে তার আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার কবচ পাওয়া যাবে না, কিন্তু ম্যালেরিয়া কলেরা প্রভৃতি যে সকল ভূত অজ্ঞানান্ধকারের মধ্যে বাসা বাঁধে এবং সেই অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে ঘুরে বেড়ায় ও হাজার হাজার লোকের প্রাণ হরণ করে তাদের ওঝা ডাক্তার। সে সব ভূত তাড়ানো এবং তাদের ছাড়ানোর মন্তর ডাক্তারের জানা আছে। ডাক্তার সন্তোষ দাশ মহাশয় একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক। সাধারণ দেশবাসীর প্রকৃতি এবং দৃষ্টিভঙ্গী সম্যক উপলব্ধি করে ভূত-তাড়ানো বিদ্যেটা অতি সহজ এবং সরলভাবে গল্পচ্ছলে শেখানোর জন্যে তিনি এই "ভূতের পাল্লায়" প্রণয়ন করেছেন। বাংলা দেশের কল্যাণের জন্যে এইরকম সুখপাঠ্য বই একটা বিশেষ অভাব পূর্ণ করতে অনেকখানি কাজে লাগবে। আমরা এর বহুল প্রচার কামনা করি।

নারীলোক

পরিচালিকা—শ্রীমতী হিরন্ময়ী দেবী

ব্রণ

—শ্রীশ্যাম বসাক

অনেক সময়েই দেখা যায় যে দু'চার দিনের যত্নে ব্রণ না সারলে হতাশ হয়ে আরোগ্যের আশা ত্যাগ করা হয়। ব্রণ আরোগ্যের ব্যাপারটা অধিকাংশ ক্ষেত্রে যত সহজ বলে মনে করা যায় আসলে কিন্তু ঠিক তা নয়, ব্রণ নানা রকমের আছে। এর মধ্যে কতকগুলো নিয়মিত যত্নের দ্বারা ধীরে ধীরে আরোগ্যের পথে এগিয়ে যায়। আবার কতকগুলো আছে যা' উপযুক্ত যত্ন নেওয়া সত্বেও সহজে সারতে চায় না। ব্রণ সারাতে হলে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ধৈর্য্য এবং সময়ের প্রয়োজন হয়, নচেৎ সুফল লাভের আশা খুবই কম। ব্রণ সারাবার জন্য অনেক রকম টোট্‌কা চিকিৎসার প্রচলন আমাদের দেশে আছে। সে-সবের কিছু না কিছু সকলেরই জানা থাকায় তা'র উল্লেখ আর করলাম না। আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানও এ সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোক পাত করেছে সত্য, কিন্তু প্রত্যেকটি প্রক্রিয়াই সহজসাধ্য নয়। এই সমস্ত উপায়ের মধ্যে সাধারণ ভাবে ব্রণ আরোগ্যের সহজ নিয়ম সম্বন্ধেই কিছু আলোচনা করব।

ব্রণ হয় সাধারণতঃ শরীর-যন্ত্রের ক্রিয়া-বৈষম্যের ফলে। ভিতরের রোগের পরিচয় বাইরে নানাভাবে প্রকাশ পায়। ব্রণ হচ্ছে সে-সবের মধ্যে অন্যতম। কিশোর এবং তরুণ বয়সে গায়ের চামড়া এমনই একটা কোমল অবস্থায় থাকে যে শরীরের ভিতরের কোন-না-কোন গোলমাল অতি সহজেই ব্রণ সৃষ্টির সহায়ক হয়। তেল-নিঃসরণ গ্রন্থি ও রোমকূপ কেন্দ্র করে ত্বকের প্রদাহজনক অবস্থা থেকেই হয় ব্রণের উৎপত্তি।

অত্যধিক মসৃণ এবং খস্‌খসে ত্বকই হচ্ছে ব্রণ উৎপত্তি এবং বৃদ্ধির পক্ষে বিশেষ অনুকূল: চামড়ার উপরের স্তর খুব পাতলা হলে কিম্বা ঐ পাতলা স্তরের উপর ব্রণ হলে সন্নিকটস্থ স্থান গোলাপী বা গাঢ় লাল রংয়ের হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঐ সকল ব্রণ হলদে রংয়ের পুঁজে ভরে ওঠে। উপরিভাগ ক্রমশঃ শক্ত হয়। ময়লা এবং ঘামে ঐ রংয়ের রূপান্তর ঘটে। ব্রণের মুখ কালো রংয়ের হয়ে যায়। কাছের চামড়ার ওপর চাপ পড়ে এবং চর্ম্মকোষের কাজেরও ব্যাঘাত জন্মে।

স্বাস্থ্যের উন্নতি বা অবনতি ব্রণ আরোগ্য বা বৃদ্ধির সহায়ক হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে এই রোগের প্রধান কারণ হচ্ছে কোষ্ঠবদ্ধতা বা শরীরের অন্য কোন অংশে স্থিত রোগের প্রভাব—যেমন খারাপ দাঁত, গলনালীর প্রদাহ প্রভৃতি। সাধারণ ব্রণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে একটু যত্ন নিলেই আরোগ্য হয়। প্রথমেই নিয়ন্ত্রিত করতে হবে দৈনন্দিন খাদ্য-তালিকার। মাংস, মিষ্টি, অত্যধিক শ্বেতসারযুক্ত খাদ্য না খাওয়াই উচিত। জল কিছু বেশী পান করা দরকার। শাক সব্‌জী বিশেষতঃ বাঁধাকপি, মূলো, গাজর, পেঁয়াজ এবং সব রকম ফল বিশেষ ভাবে কিস্‌মিস্‌ এবং খেজুর প্রভৃতির মধ্য থেকে প্রত্যহ অন্ততঃ একটা দ্রব্য কিছু পরিমাণ খাওয়া উচিত। নুন ও লঙ্কা খাওয়ার মাত্রাটা যতদূর সম্ভব কমানোই ভাল। আর এই সঙ্গে হাল্কা রকমের ব্যায়াম করলে ফল খুব তাড়াতাড়ি পাওয়া যায়।

ব্রণযুক্ত স্থান সকালে এবং রাত্রে বাদামের খোলা কিম্বা গন্ধবিহীন ভাল সাবান দিয়ে ধোওয়া উচিত। অত্যধিক ক্ষার বা

বৌদি বলে মানতে পারি না

—আমাকে বৌদি বলে ডাকবে, রবীন্, মিতা বলে। হেসে নেয় খানিকটা রবীন। তারপরই সারা ঘরটায় পায়চারি কোরতে থাকে সে। : কি বোললে? বৌদি বলবো? মিতা? তুমি তোমার মনকে হয়তো ভোলাতে পারো, কিন্তু আমার মনকে ভোলাতে যেও না। তোমাকে সেদিন কি বলেছিলাম মনে আছে?

—শোন তবে বলি :—

—আমি চলে যাচ্ছি জেনেভার আর্ট একজিবিশানে। আসতে দেরীও হবে হয়তো একমাস। যাবার সময় যে কামনা নিয়ে যাচ্ছি এসে যেন তা পূর্ণ করতে পারি। শূন্যতা নিয়ে চল্লাম—পূর্ণতা নিয়ে তাকে বরণ কোরো। তোমার চোখের কোণে সেদিন দেখেছিলাম জল। সেদিন অজ্ঞাতকুলশীল এই রবীনকে তুমি বলেছিলে : তোমাকেই চেয়েছি, তোমার অর্থ কৌলিন্যকে চাইনি। এত শীগ্‌গির তা কেমন কোরে তুমি ভুলে গেলে আমি সেইটে ভেবেই আশ্চর্য্য হচ্ছি—মিতা!

—চুপ্ কর রবীন! আমাকে এখন নাম ধোরে ডাকবার কোন অধিকার নেই তোমার। আমি তোমার গুরুজন, বৌদি। সমাজ আছে আমাদের পিছনে—লোকাচার আছে আমাদের সামনে।

হো হো হো—আবার হাসি। লোকাচার সমাজ, শাসন, এ সব ভয় কোরতে গেলে নির্জন বনবাসই ভাল মিতা। আমার সৃষ্টিতে লোকাচার নেই, সমাজ নেই, শাসন নেই। সেখানে শুধু আছে প্রেম, প্রীতি

রবীনের ভূমিকায় ছবি বিশ্বাস

—ভালবাসা। যদি ভালবাসা দিয়ে ভালবাসাই না পেলাম—সেখানে লৌকিকতার প্রয়োজন নেই। আমি যাব না। তোমাদের সংসারে আমার ঠাঁই নেই। এই নির্জনতা, মূক বধিরতা নিয়েই আমি থাকবো—শিল্পীর মনে শিল্পেরই হতে থাক আলাপন। সেদিন সে এমনি ধারা আঘাত দিল তার বৌদিকে। কিন্তু একদিন এলো যেদিন তার বৌদির সেবাই তাকে ফিরিয়ে আনলো তাকে মরণের দুয়ার থেকে।

এমনি ধারা দ্বিধা দ্বন্দ্বের মাঝখানে গড়ে উঠেছে, ইন্দ্রপুরীর "দেবর"। আজও গৌরবের আসন প্রতিষ্ঠা করে চলেছে ছবিখানি "চিত্রায়"। দিনের পর দিন লোকের ভীড় বেড়ে চলেছে ছবিখানা দেখবার জন্যে। আপনাদের ছবিখানি দেখতে বলি।

তেলযুক্ত সাবান ব্যবহার না করাই ভাল। ক্ষার আবওপ্রদাহের সৃষ্টি করে। আলকাতরা সংযুক্ত সাবানও ব্যবহার করা যেতে পারে। পরে আর একবার টিংচার বেনজোইন সংযুক্ত গরম জল দিয়ে ধুঁয়ে ফেলা দরকার। কিম্বা প্রত্যহ রাত্রে সাবান দিয়ে মুখ ধোওয়ার পর গমের ভুষির একটা ছোট পুঁটুলি তৈরী করে নিয়ে জলে ভিজিয়ে নেওয়ার পর গরম করে ব্রণযুক্ত স্থানে স্বেদ প্রয়োগ করতে হবে। পরে হাইড্রোজেন পেরোকসাইড দিয়ে মুখ ধুয়ে ভ্যানিসিং ক্রীম বা অ-দ-কলো লাগানো যেতে পারে। ব্রণের পুঁজ বার করার প্রয়োজন হলে সাবান দিয়ে ধোওয়ার পরই সে কাজ সেরে নেওয়া ভাল, বলা বাহুল্য একাজ খুব সাবধানে করা উচিত যেন নখের আঘাত না লাগে। সবচেয়ে ভাল হয় যদি ছোট চিমটে দিয়ে পুঁজ বার করা যায়। ব্যবহারের পূর্ব্বে চিমটেটীকে অবশ্যই শোধন করে নিতে হবে। আগুণে পুড়িয়ে নেওয়াই হচ্ছে দোষমুক্ত করার সবচেয়ে সহজ উপায়। ধৈর্য্যের সঙ্গে যত্ন নেওয়া সত্বেও ব্রণ না সারতে চাইলে

পালটা-পালটি

ধরুন একটা ছেলে আর দুটো মেয়ে। ছেলেটার বাবার খুব পয়সা আছে। মেয়ে দুটোর বাবাও খুব বিদ্বান। এমন দুটো সংসারের মধ্যে মিলন ঘটাতে হলে কি করতে হবে?

প্রশ্নকর্ত্তাকে, শ্রোতার দল জিজ্ঞাসা করে: আপনার মতটা বলুন।

প্রশ্নকর্তা উত্তর দেয়: আমি হ'লে কি করতুম জানেন? শুনুন তবে। এই দুটো সংসারকে মানে মেয়ে দুটোকে আর ছেলেটাকে নিয়ে যেতুম একটা পাহাড়ে জায়গায় হাওয়া বদলাতে। সেখানে বড় মেয়েটা—যাকে গড়ে তুলতাম খুব নিরীহ কোরে—তাকে জড়িয়ে দিতাম প্রেম করতে সেই ছেলেটার সংগে। কেমন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ—খুব ভাল। তারপর!

—তারপর আর একটা মেয়েকে যে খুব দুরন্ত, ভালবাসে আর একজনকে, তাকেও একদিন টেনে এনে ধরতাম সেই ছেলেটার কাছে। এইখানে একটা ভুল হোয়ে গেছে। মেয়ে দুটোকে যমজ বোন কোরলে নিশ্চয়ই তারা দেখতে প্রায় একরকম হ'ত। কেমন কিনা?

—আজ্ঞে হাঁ, তাতো হবেই।

—ছেলেটা কিন্তু ভালোবেসেছিলো আগেরটিকে অর্থাৎ ধীর, শান্তটিকে; মেয়েটিও তাকে ভালবেসেছিল মনে মনে। এমন সময় ছোট বোনটিকে দেখে—এক রকম দেখতে কিনা—ছেলেটি অনেক ভালবাসার কথা বললো। তখন মেয়েটি কি করলো বলুন তো?

—আমরা কেমন করে জানবো বলুন।

—মেয়েটি মজা দেখবার জন্যে তার সেই প্রেমকে প্রশ্রয় দিলো। শেষে একদিন তার ভুল ভেঙ্গে গেলেও ধরুন বিয়ে কোরলে ছোটটীকে?

সুখী হল কি তারা?

হতে পারে কি?

আপনারা হয়তো বলবেন অনেক সময় তা হ'য়। আমি কিন্তু তা হোতে দেবনা। একদিন ঝগড়া করে ছেলেটা বার কোরে দিলো তাকে ঘর থেকে। তারপর কি হ'ল আপনাদের মুখ থেকে জানতে চাই।

—বারে! কেমন কোরে আমরা বোলবো? আপনিই শেষটা বলুন!

—আচ্ছা ওর শেষটা আপনারা একদিন দেখে আসবেন "আঙ্গুঠী" ছবিতে। হ্যাঁ এর শেষটা সেখানে দেখানো হয়েছে। ছবিটা এখন সহরের তিন জায়গায় দেখানো হচ্ছে।

নমস্কার! আসি।

খেলার মাঠে

—শ্রীউমেশ-মল্লিক

যুদ্ধের পর শান্তি স্থাপন হলে ভারতবর্ষ আন্তর্জাতিক ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় ইংলণ্ড এবং অষ্ট্রেলিয়াকে প্রতিযোগিতাক্ষেত্রে আহ্বান করতে পারে কিনা সে সম্বন্ধে কোন এক সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে দলীপ সিংজী ও লেঃ কঃ সি, কে, নাইডু যে সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করেছেন তা প্রণিধানযোগ্য। উভয়েই প্রতিযোগিতা আহ্বানের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছেন। দলীপ সিংজীর মতে বোলারের এবং ফিল্ডসম্যানের অভাবই প্রতিযোগিতা আহ্বানের পরিপন্থী। লেঃ কঃ নাইডুর মতবাদ বাস্তবিকই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা উচিত। ভারতের শ্রেষ্ঠ ২ জন খেলোয়াড়ের অভিমত ও পরামর্শ যদি গ্রহণ করে এ বিষয়ে সচেষ্ট হওয়া যায় তাহ'লে ভারতীয় ক্রিকেটের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী।

গত ৩১শে ডিসেম্বর, ১লা ও ২রা জানুয়ারী লাহোরে যুদ্ধ তহবিলের সাহায্য উপলক্ষে এক বিশেষ খেলার ব্যবস্থা হয়েছিল। এদিনে অমর নাথ, হাজারী, সি, এস, নাইডু, মুস্তাক আলি, নিসার, জাহাঙ্গীর খাঁ, মানকড় রঙ্গনেকার প্রভৃতিকে যোগ দিতে দেখা যায়।

দিল্লী গোয়ালীয়র দলকে ৪১৯ রাণে রঞ্জী খেলায় পরাজিত করেছে। ইদ্রিসের ১০৩ রাণ সংগ্রহ করা উল্লেখযোগ্য।

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় দক্ষিণ বিভাগের খেলায় মাদ্রাজ দল মহীশূর দলকে ২২৮ রাণে পরাজিত করেছে।

* * *

এ বৎসরের ইষ্ট ইণ্ডিয়া টেনিস প্রতিযোগিতায় সর্ব্বসমেত ৫২ জন প্রতিযোগী যোগদান করেছে। ভারতের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়গণ ছাড়া হলসার্ফেস, চয়, লেড সিঙ্গার প্রভৃতি খেলোয়াড়গণ যোগদান করায় খেলাগুলি আকর্ষনীয় হবে সন্দেহ নেই, মেন্স ডাবল্‌স্ খেলায় ১৮টি খেলা অনুষ্ঠিত হবে। এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে হলসার্ফেস গত বৎসরে এই সম্মানজনক প্রতিদ্বন্দ্বীতায় ফাইনালে দিলীপ বোসকে পরাজিত করে প্রভূত খ্যাতি অর্জ্জন করেন। সাউথ ক্লাবের প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়।

এলাহাবাদে আগত ২৬শে জানুয়ারী নিখিল ভারত লন্ টেনিস প্রতিযোগিতা আরম্ভ হবে।

বিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়াই হচ্ছে বাঞ্ছনীয় ব্যাপার। তাড়াতাড়ি ফল না হলে ধৈর্য্য হারাবার কোন কারণ নাই। বহুদিনের সঞ্চিত অবহেলায় যে রোগের সৃষ্টি হয়েছে মাত্র কয়েকদিনের যত্নে তা নিরাময় হতে পারে না।

নানাকথা

পরলোকে অজয় ভট্টাচার্য্য

সুপ্রসিদ্ধ কবি, সাহিত্যিক, গীতিকার এবং চিত্র-পরিচালক অজয় ভট্টাচার্য্য মহাশয় গত ২৪শে ডিসেম্বর রক্তের চাপ বৃদ্ধি পাওয়ায় অকস্মাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ৩৯ বৎসর হইয়াছিল।

১৯২৯ সালে বাঙ্গলায় প্রথম শ্রেণীর ২য় স্থান অধিকার করিয়া এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ

হন। অতঃপর তিনি কিছুকাল কুমিল্লায় ঈশ্বর পাঠশালায় শিক্ষকতা করেন। সেই সময় তাঁহার রচিত হাফিজের বাংলা কাব্যগ্রন্থ রুবাইত-ই-হাফিজ প্রথম প্রকাশিত হয়। এই সময় তিনি সঙ্গীত রচনা আরম্ভ করেন। প্রসিদ্ধ 'ও পিয়ারী, লাইলী আমার' গানটি তাঁহার প্রথম সঙ্গীত। ইহার পর 'যেথা নাই প্রেম' (উপন্যাস), 'রোড ব্যাক' নামক গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ, 'সুরপরী' (গজল গানের বই), 'আজি আমারই কথা' (সঙ্গীত পুস্তিকা) 'রাতের রূপকথা' (কবিতার বই), 'বিজন বিরহ কথা' (সঙ্গীত পুস্তিকা), 'শুকশারী' (সর্ব্বশেষ সঙ্গীত পুস্তক), 'ঈগল ও অন্যান্য' (কবিতার বই),' সৈনিক ও অন্যান্য কবিতা' (শেষ কবিতার বই) নাম উল্লেখযোগ্য।

১৯৩২ সালে তিনি কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে এক বৎসরের জন্য অধ্যাপকের কার্য্য করেন। ১৯৩৫ সালে তিনি বালীগঞ্জে তীর্থপতি ইনষ্টিটিউশানে শিক্ষকতা করিতে থাকেন। এই সময় হইতে তিনি বাংলা চিত্র শিল্প জগতে বিভিন্ন চিত্রের সঙ্গীত রচয়িতা ও গল্পলেখক হিসাবে খ্যাতিলাভ করেন এবং ১৯৪১ সালে শিক্ষকের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া চিত্রজগতে যোগদান করেন। তিনি 'অশোক' ও 'ছদ্মবেশী' (মুক্তি প্রতীক্ষায়) পরিচালনা করেন। সম্প্রতি মতিমহল থিয়েটার্সের হইয়া তাঁহার 'শ্রীদুর্গা' তুলিবার কথা ছিল। 'মায়ের প্রাণ' 'কবি কালিদাস' ও 'নিমাই সন্ন্যাস' চিত্রগুলি তাঁহারই কাহিনী অবলম্বনে গৃহীত। তাঁহার মৃত্যুতে বাংলার একজন জনপ্রিয় ও শক্তিমান কবির তিরোধান ঘটিল।

আমরা তাঁহার আত্মার কল্যাণ কামনা করি।

জিরো ক্লাব

গত ২৫শে ডিসেম্বর অপরাহ্ণ ৩া০ ঘটিকার সময় ৯৩৬ হরিঘোষ ষ্ট্রীটে জিরো ক্লাবের বাৎসরিক প্রীতি-সম্মিলন ও ব্রিজ-টুর্ণামেন্টের পুরস্কার বিতরণোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। উত্তর কলিকাতার এ্যাসিষ্টান্ট পুলিশ কমিশনার রায় সাহেব পুলিন কুমার চট্টোপাধ্যায় পৌরহিত্য করেন। 'দীপালী'র প্রধান সম্পাদক সুকবি শ্রীবসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় একটি সুন্দর নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দ্বারা সভাপতি মহাশয়কে অভ্যর্থনা করেন। সন্তোষ দাঁ ও জটাধর পাইনের গান, প্রো: সোমের কমিক, অপর একজনের সেতার (সঙ্গত: প্রবোধ ভট্টাচার্য্য) অনুষ্ঠানটিকে সাফল্যমণ্ডিত করে। শেষে অভ্যাগতগণকে প্রচুর জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়।

নিমন্ত্রিতদের প্রতি কর্তৃপক্ষের অখণ্ড মনোযোগ বিশেষ প্রশংসনীয়।

পরলোকে কবি মানকুমারী বসু

গত ২৫শে ডিসেম্বর, শনিবার, রাত্রি ১২টার সময় কবি শ্রীমতী মানকুমারী বসু ৭৯ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন।

১২৭১ সালে ১৩ই মাঘ যশোহর জেলার

সাগরদাঁড়ি গ্রামের প্রসিদ্ধ দত্ত বংশে ইনি জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি মাইকেল মধুসূদন দত্তের ভ্রাতুষ্পুত্রী ছিলেন। পিতৃব্যের কাব্যই বাল্যকাল হইতে মানকুমারীর আদর্শ ছিল। শৈশবকাল হইতেই তিনি গদ্য ও পদ্য রচনায় প্রবৃত্ত হন। আট বৎসর বয়সে যশোহর বিদ্যানন্দকাটির বিধুশঙ্করের সহিত মানকুমারীর বিবাহ হয়। সতের বৎসর বয়সে মানকুমারীর একমাত্র কন্যা প্রিয়বালা জন্মগ্রহণ করেন এবং উনিশ বৎসর বয়সেরও পূর্ব্বে তাঁহার স্বামী বিয়োগ হয়।

এই সময় গ্রন্থকর্ত্রীর নাম ও পরিচয় না দিয়া "প্রিয় প্রসঙ্গ" নামক গদ্য কবিতায় তাঁহার প্রথম পুস্তক প্রকাশিত হয়। তৎপরে তাঁহার "কাব্য-কুসুমাঞ্জলি", "কনকাঞ্জলি" ও "বীরকুমার বধ" কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তারপর "শুভসাধনা", "বিভূতি", "পুরাতন ছবি" ও "সোনার সাথী" গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হয়।

প্রকাশ যে, মৃত্যুকালে তিনি প্রায় এক সপ্তাহ কাল সংজ্ঞাশূন্য অবস্থায় ছিলেন। মানকুমারীর আত্মার শান্তি হউক ইহাই আমাদের কামনা।

নাটমণ্ডপ

—অভিমন্যু

দেখিতে দেখিতে ১৯৪৩ সাল চলিয়া গেল। উৎকট খাদ্য-সমস্যা ও ফিল্ম-সমস্যা সত্ত্বেও বাংলার চিত্রপ্রতিষ্ঠানগুলি নিম্নলিখিত ছবিগুলির প্রযোজনা করিয়াছেন। চিত্র-প্রিয়দের নিকট সেগুলি কি রকম আদৃত হইয়াছে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

প্রিয়বান্ধবী, কাশীনাথ, দিকশূল, মীনাক্ষী, (হিন্দী) (নিউ থিয়েটার্স), অভিসার ও দাবী (নিউ টকীজ), নীলাঙ্গুরীয় ও শহর থেকে দূরে (ইষ্টার্ণ টকীজ), সহধর্ম্মিণী ও দম্পতি (রূপশ্রী লিঃ), দ্বন্দ্ব (আর্ট ফিল্মস), জননী (কে, বি, পিকচার্স), জবাব ও যোগাযোগ (এম, পি, প্রোডাকশান), সমাধান (এস, ডি, প্রোডাকশান), জজ সাহেবের নাতনী (রজনী পিকচার্স), স্বামীর ঘর (ইউরেকা পিকচার্স), পাপের পথে (প্রাইমা ফিল্মস-ফিল্ম কর্পোরেশন), আলেয়া (নিউ সেঞ্চুরী প্রোডাকশান), দেবর ও মমতা (হিন্দী) (ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিও), খামোশী ও মনচলি—হিন্দী (তলোয়ার প্রোডাকশান) রাণী—হিন্দী (বড়ুয়া লিঃ) এবং ভক্ত কবীর—হিন্দী (ইউনিটি প্রোডাকশান)। মোট ২৫ খানি। যুদ্ধজনিত সঙ্কটজনক পরিস্থিতি হেতু অন্যান্য বৎসরের তুলনায় বাংলায় চিত্রনির্ম্মাণ যে কিছু কম হইয়াছে বলিয়া মনে হয় কী?

* * *

উপরোক্ত মুক্তিপ্রাপ্ত ছবিগুলি ছাড়া নিম্নলিখিত ছবিগুলি এখন মুক্তি-প্রতীক্ষায়—

আর্জ্জু (হিন্দী)	আই-বি পিকচার্স
ছদ্মবেশী (বাংলা)	ডি-লুক্স
ইরাদা (হিন্দী)	ইন্দ্রপুরী
* কাশীনাথ (হিন্দী)	নিউ থিয়েটার্স
মাটির ঘর (বাংলা)	ভারতলক্ষ্মী
পোষ্যপুত্র (ঐ)	ভ্যারাইটি
* শ্রীরামানুজ (হিন্দী)	শ্রী ফিল্মস্
* ওয়াপস্ (ঐ)	নিউ থিয়েটার্স

তারকা-চিহ্নিত ছবিগুলি বাংলার বাহিরে ইতিমধ্যে মুক্তিলাভ করিয়াছে।

* *

নিম্নলিখিত ছবিগুলি এখন বিভিন্ন ষ্টুডিওতে নির্ম্মিত হইতেছে:

ভেদাভেদ	—নিউ সেঞ্চুরী
বেদুইন	—নিউ টকীজ
দুই পুরুষ	—নিউ থিয়েটার্স
উদয়ের পথে	— ঐ
বিপর্যয়	—কালী ফিল্মস
বিদেশিনী	—এম, পি, প্রোডাকসান
চাঁদের কলঙ্ক	—বড়ুয়া লিঃ
সুবে-শ্যাম	— ঐ
মেঘদূত	—ইন্দ্রপুরী (হিন্দী ও বাংলা)
কলঙ্কিনী	— ঐ
সন্ধি	—চিত্ররূপা (হিন্দী ও বাংলা)
শেষ-রক্ষা	—চিত্রভারতী
ফগু	—পান্না পাঠক

* * *

নিম্নলিখিত ছবিগুলি এখন বিভিন্ন চিত্রগৃহে চলিতেছে—

শহর থেকে দূরে	—রূপবাণী	—৩য় সপ্তাহ
দেবর	—চিত্রা	—১০ম সপ্তাহ
দম্পতি	—শ্রী	—৩২শ সপ্তাহ
ঝুলা	—চিত্রলেখা	—৫ম সপ্তাহ
দর্পণ	—প্যারামাউণ্ট	—৩য় সপ্তাহ
পৃথ্বীবল্লভ	—মিনার্ভা ও ছায়া	—১০ম সপ্তাহ
পুঁজি	—সেণ্ট্রাল	—ষষ্ঠ সপ্তাহ
রামরাজ্য	—গণেশ	—২১শ সপ্তাহ
আঙ্গুঠি	…	—৪র্থ সপ্তাহ

কিশোর শিল্প প্রদর্শনী

গত ৯ই পৌষ সকাল সাড়ে নয় ঘটিকায় "কিশোর বাংলা"র উদ্যোগে ১৫ কলেজ স্কোয়ারের ত্রিতলায় কিশোর শিল্প প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন খ্যাতনামা শিশু সাহিত্যিক শ্রীযুত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার। এই প্রদর্শনীতে বাংলার বিভিন্ন স্থানের পাঁচ বছর হইতে কুড়ি বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের আঁকা বহু ছবি সংগৃহীত হইয়াছিল। এই উদ্বোধন সভায় বহু ছেলেমেয়ে এবং খ্যাতনামা কথা-শিল্পী ও চিত্র-শিল্পী উপস্থিত ছিলেন।

দীপালীর স্বত্বাধিকারী শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত, ১২৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, দীপালী প্রেসে মুদ্রিত ও দীপালী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

প্রধান সম্পাদক—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় :: সহঃ সম্পাদক—শ্রীধীরেন্দ্রমোহন মজুমদার বি. এল

১৬শ বর্ষ VOL. XV. } ২৮শে পৌষ, ১৩৫০ :: January 13, 1944 { ২য় সংখ্যা No. 2

আলোচনী

বাংলার পরিবর্ত্তী লাটরূপে মিঃ কেসীর নিয়োগ ভারতীয় ও বিলাতী সংবাদপত্রগুলিতে বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। স্বাভাবিক অবস্থায় রাজকীয় নিয়োগের অর্থ লইয়া মাথা ঘামাইবার অবসর জনসাধারণের হয় না। এবং এযাবৎ বুনা শ্বেতাঙ্গ সিভিলিয়ান কর্ম্মচারীমণ্ডল হইতেই তিনটী প্রেসিডেন্সী প্রদেশের লাট নির্ব্বাচন করা হইত। এবার তাহার ব্যতিক্রম হইয়াছে। মিঃ কেসী অষ্ট্রেলীয়, তাঁহার রাজনৈতিক কর্ম্মপ্রচেষ্টার যে সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট সংবাদপত্র হইতে পাই, তাহা হইতে দেখা যায়, ১৯৩১ সাল হইতে ইনি অষ্ট্রেলীয় রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে ধীরে ধীরে প্রাধান্যলাভ করিতে আরম্ভ করেন। ১৯৪২ সালে মিঃ অলিভার লিটল্‌টনএর স্থানে মিনিষ্টার অফ ষ্টেট পদে মধ্যপ্রাচ্যে তাহার নিয়োগ ঘোষিত হয়। এই ব্যাপারে মিঃ চার্চ্চিল ও অষ্ট্রেলীয় প্রধান মন্ত্রীর সহিত যে সামান্য মনকষাকষির সৃষ্টি হয় তাহা আজ অতীতের ব্যাপার। শেষ পর্য্যন্ত মিঃ চার্চ্চিলের ব্যক্তিত্ব হয়তো মিঃ কেসীর মধ্যপ্রাচ্যে নিয়োগের সমস্ত বাধা অপসারিত করিতে সাহায্য করিয়াছিল। ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য। রাষ্ট্রনৈতিক হিসাবে অষ্ট্রেলীয়া মিঃ কেসীর মত বিচক্ষণ একজন কর্ম্মচারীকে বর্ত্তমান গুরুত্বপূর্ণ সময়ে হারাইতে পারে না। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত মধ্যপ্রাচ্য হইতে প্রায় ১৮ মাস পরে তাঁহাকে বাংলার গবর্ণর পদ গ্রহণ করিতে হইল। মধ্যপ্রাচ্যে তাঁহার নিয়োগে মিঃ চার্চ্চিল ও মিঃ কার্টিনের মধ্যে যে মতভেদ উপস্থিত হয় সে সময় মিঃ চার্চ্চিল অষ্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রীকে জানাইয়াছিলেন যে মিঃ কেসীর কর্ম্মক্ষেত্র পরিবর্ত্তনের ইচ্ছা এই নিয়োগের প্রধানতম কারণ। কিন্তু মাত্র ১৮ মাস পরে আবার তাঁহাকে কর্ম্মক্ষেত্র পরিবর্ত্তন করিতে হইবে ইহা সে দিন কে ভাবিয়াছিল! মধ্যপ্রাচ্যে তাঁহার অভিজ্ঞতার সুফল বাংলা পাইবে এ আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে! সরবরাহ ও অর্থনীতির সম্বন্ধে তাহার অভিজ্ঞতা বাংলার কাজে লাগিবে একথাও বলা হইয়াছে।

• • • • •

সমরপরিষদের সভ্য স্থানীয় একজন রাজকর্ম্মচারীকে বাংলার লাট নিযুক্ত করিয়া এই দুর্ভাগা দেশকে কৃতার্থ করা হইয়াছে এই প্রকার সুরই এই নিয়োগ বার্ত্তার মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে। কিন্তু বাঙালী ইহার মধ্যে আত্মপ্রসাদের কিছু খুঁজিয়া পাইবে না। এই নিয়োগের মধ্যে কূটনৈতিক ও সামরিক প্রয়োজন অলক্ষ্যে কতখানি কাজ করিয়াছে তাহা আজ সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে না পারিলেও, ইহা সুস্পষ্ট যে বৃটেনের আসন্ন সামরিক নীতির বিরাট পরিবর্ত্তনের সূত্র ধরিয়া এই নিয়োগ করা হইয়াছে।

• • • • •

কলিকাতার 'ষ্টেটশম্যান' পত্রিকা নূতন গবর্ণর নিয়োগ সম্বন্ধে যে সতর্ক মন্তব্য করিয়াছেন তাহা হইতেও বুঝা যায়, এই কলিকাতার ইউরোপীয় দলের অন্ততঃ একটি বড় অংশ এই নিয়োগে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। বাহিরের লোক

আসিয়া ভারতের বিশিষ্ট পদগুলি পূরণ করিবার নীতির নিন্দা পত্রিকাটি করিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত অষ্ট্রেলীয় রাজনীতির মুখপাত্র যাঁহারা তাঁহারা নীরবই রহিয়াছেন। কেবলমাত্র মিঃ ই, জে, ওয়ার্ড, (Minister of External Territories) বলিয়াছেন, ভারতীয় নেতৃবর্গ মিঃ কেসীর নিয়োগের যে সমালোচনা করিয়াছেন তাহা তিনি বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন। মিঃ ওয়ার্ড আরও বলেন, মিঃ কেসীর অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতা যত বড়ই হউক না কেন, বহু সুশিক্ষিত যোগ্য ভারতীয়ের সহিত তাহার তুলনা হইতেই পারে না।

নানা কারণে অষ্ট্রেলীয়ান গবর্ণমেন্টের একজন বিশিষ্ট সচিবের উপরোক্ত মন্তব্য এই নিয়োগ নীতির উপর গভীর কটাক্ষপাত করিবে।

* * *

কেন্দ্রীয় সরকারের খাদ্যনীতি লইয়া একটা বাদানুবাদের সৃষ্টি হইল দেখিতেছি। বর্ত্তমান লীগ মন্ত্রীমণ্ডলীর যুগল সেক্রেটারী মিঃ নরেন্দ্র নারায়ণ চক্রবর্ত্তী ও মিঃ আবদুল করিম এ সম্পর্কে যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহাতে ব্যাপারটা অধিকতর স্পষ্ট হয় নাই। সিন্ধু ও বাংলা হইতে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের খাদ্যনীতির উপর কটাক্ষপাত করা হইয়াছে। সরকারী খাদ্যনীতির মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা প্রবেশ করিয়াছে ইহাই সিন্ধু ও বাঙ্গলার মন্ত্রী দলের অভিযোগ। মনে রাখিতে হইবে উভয় প্রদেশই জিন্না সাহেবের ফারমান শাসিত। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের খাদ্য সচিব স্যার শ্রীবাস্তব বাংলা পরিদর্শন করিয়া বাংলা মন্ত্রিমণ্ডলীর খাদ্য পরিকল্পনার সমর্থন করিতে পারেন নাই। বাংলা সরকারের আমন ধান ক্রয়ের পরিকল্পনায় বহু গলদ আছে এবং রেশন পরিকল্পনাও সুষ্ঠু ভাবে হইতেছে না এইরূপ ধারণা তিনি লইয়া গিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। ইহার ফল যাহা হইবার তাহা হইয়াছে। স্যার শ্রীবাস্তব হিন্দু মহাসভার সমর্থক কিনা আমাদের জানা নাই। বাঙ্গলার এই স্বয়ং সিদ্ধ মন্ত্রীমণ্ডলীর সমালোচনা করিলেই মহাসভার নীতির সহিত গোপন যোগাযোগের অভিযোগ ইহারা তুলিয়া থাকেন। মহাসভার অস্তিত্ব ইহাদের চোখে আজ বিভীষিকার সৃষ্টি করিয়াছে ইহা সুস্পষ্ট। কোন জননেতা সুস্পষ্টভাবে কাহার ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশ করিলেই তাহার কণ্ঠ ধরিয়া হিন্দু মহাসভাকে গালি দেওয়া লীগ দলের কর্ম্ম পদ্ধতির একটি বিশিষ্ট অঙ্গ হইতে পারে। কিন্তু যে খাদ্যনীতি বড়লাটের তত্ত্বাবধানে গড়িয়া উঠিতেছে সেখানে রাতারাতি মহাসভার নীতি ও চক্রান্ত যে কার্য্যকরী হইয়া উঠিল ইহা ভাবিতে প্রবৃত্তি হয় না। এই ব্যাপার লইয়া যে চীৎকার উঠিয়াছে আমাদের মনে হয় তাহা প্রধানতঃ একটা রাজনীতিক ধূম্রজাল সৃষ্টির প্রচেষ্টা ছাড়া কিছু নয়।

* * *

লীগ মন্ত্রীমণ্ডলীর যুগল সেক্রেটারীর অন্যতম দেখিতেছি শ্রীযুত নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তী এম, এল, এ। লীগ দলে ইহার নাম দেখিয়া বিস্ময় মানিতেছি। ইনি বহু দল ভাঙিয়া বর্ত্তমানে ইহাদের সহিত আসিয়া জুটিয়াছেন। ইহার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিলাম বলিলে ঠিক বলা হয় না। আমাদের যতদূর মনে হয় ইনি পূর্ব্বে হিন্দু মহাসভার একজন বেতনভূক কর্ম্মচারী ছিলেন। তাহার পর বহুদলের সুদিনে তাহাদের আশেপাশেও ইহাকে ঘোরাফেরা করিতে দেখিয়াছি। ফরোয়ার্ড ব্লকের দীপ যখন নিভিল তাহার সহিত ইনিও একদিন উধাও হইলেন। ইহার পরবর্ত্তী কয়েক বৎসরের খবর যবনিকার অন্তরালে রহিলেও এই করিৎকর্ম্মা ব্যক্তিটি নিজের কাজ গুছাইয়া কোন সময় লীগ দলের খাতায় নাম লিখিয়াছিলেন তাহা লোকে জানিতেও পারিল না। বর্ত্তমান মন্ত্রীমণ্ডলীর সহিত বর্ত্তমানে ইহার যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ সন্দেহ নাই। বিবৃতিতে যে উহা প্রকাশ পাইয়াছে তাহা লক্ষ্য করিবার বস্তু। নাজিমুদ্দিন সাহেবের লোক চিনিবার বিচক্ষণতা আছে জানিতাম, বর্ত্তমান দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে। তবে দুর্ভাগ্যের বিষয় এই, এই শ্রেণীর নেতৃদলের মুখ চাহিয়াই বাঙালীকে আশা ভরসায় বুক বাঁধিতে হইতেছে।

প্রভেদ

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

উত্তরাধিকারে ধনীর পুত্র কি সে পায়?
কাঠের বোঝা; ইটের পাহাড়; মোটর গাড়ী; সোনা;
দেহখানি মাংসপিণ্ড গড়া ননী-ছানায়;
তুচ্ছ সবায়; সজ্জাপ্রীতি; খেয়াল-বাবুয়ানা;
রৌদ্র-শীতে অসহ্যবোধ; অপটুতা কাজে—
প্রাণের বায়ু থেকে প্রাণহীন—দেখে মরি লাজে।
উত্তরাধিকারে ধনীর পুত্র কি সে পায়?
নিত্যক্ষণই দারুণ চিন্তা তিলেক স্বস্তি নাই!
পয়সা-কড়ি ব্যাঙ্কে—সে ব্যাঙ্ক কখন্ বাতি জ্বালায়!
কারখানাতে আগুন লেগে কখন সে হয় ছাই
শেয়ার—সে তো বারিবিম্ব কখন হবে চূর।
চূর্ণ হলে সবি যাবে—নিমেষে ফতুর!
উত্তরাধিকারে ধনীর পুত্র কি সে পায়?
লোলুপ চিত্ত—বিলাস ভোজে রসনা তার রসে
পরের হস্তে ন্যস্ত নিজের দুঃখ সুখের দায়—
দিন কাটেতো রাত কাটেনা আলাস্য-রভসে।
চিন্তা নাহি কর্ম্ম নাহি—একই জীবন ধারা—
তাসের আসর, খোসামুদে জুড়াবের পারা!
গরীব বাপের পুত্র কি পায় উত্তরাধিকারে?
সবল পেশী, সুস্থশরীর চিন্তাবিহীন মন;
কর্ম্মে নিষ্ঠা; হারায় না পথ তিমির অন্ধকারে
অল্পে তুষ্ট নয়কো রুষ্ট,—দাহের নাই বেদন!
গ্রীষ্ম আসুক, বর্ষা আসুক—দুরন্ত সে শীতে
ফাগুনেরি মতন চিত্ত পূর্ণ গন্ধে-গীতে।
গরীব বাপের পুত্র কি পায় উত্তরাধিকারে?
বিনয়-নম্র চরিত্র; দৃষ্টি সমান সবার পানে!
নিত্য নব জ্ঞানের লাগি সাধন শুদ্ধাচারে;
বিধিদত্ত সকল তত্ত্ব সাড়া জাগায় প্রাণে!
নিজের পরে নির্ভরতা—নৈরাশ্যে নয় কাতর
কাজে কর্ম্মে জীবন্ত হয়—হয় না রুক্ষ পাথর।

জীবন-সঙ্গীত

(বড় গল্প)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রীশচীন্দ্রনাথ মিত্র

স্বামী

কুলীদের সাহায্যে আধ ঘণ্টার মধ্যে ঘর সাজিয়ে ফেলে, ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে একটা তোরঙ্গের ওপর বসে পড়ে, একটা ঝাড়ন নেড়ে বাতাস খেতে খেতে রাধেশ বলল: এইবার আসুন, একটু গল্প সল্প করা যাক্।

রুদ্রকান্তও রামহরিকে তাড়াতাড়ি মধ্যাহ্ন ভোজনের ব্যবস্থা করতে বলে, তক্তপোষের ওপর গুছিয়ে বসে বললেন: ঠিক বলেছেন। আসুন,—এবার নিশ্চিন্ত হয়ে একটু গল্প গুজব করা যাক্।

উভয়েই যৌবনের প্রান্ত সীমায় উপনীত, উভয়েই সমবয়সী। গাম্ভীর্য্যের কৃত্রিম আবরণে নিজেকে দুর্লভ করে তোলবার স্পৃহা উভয়েরই অল্প; তাই কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের পরিচয় স্বাভাবিক ভদ্রতার গণ্ডী ত্যাগ করে ঘনিষ্ঠতার বেড়াজালে বদ্ধ হবার উপক্রম করল। কথায় কথায় রুদ্রকান্ত জিজ্ঞাসা করলেন: আপনার ছেলে দুটি কই?

—"তারা তো এখানে থাকে না। রাঁচি ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়ে পড়ে।"

—"রাঁচিতে? কিন্তু এখানেও তো একটা ভাল স্কুল রয়েছে শুনলাম।"

—"সে দুঃখের কথা আর বলেন কেন! ওঁর ধারণা গান-বাজনা শুনলে ছেলেদের ক্ষতি হবে। তাই তাদেরকে একেবারে রাঁচিতে চালান দিয়েছেন। এত কষ্ট হয় মশাই—বাচ্চা বাচ্চা ছেলে, ওরা কি বাপ মাকে ছেড়ে অতদূরে থাকতে পারে! কিন্তু কী কঠিন প্রাণ মশাই ওর,—ওদিকে চোখের জলও ফেলেন, এদিকে আবার চোখ রাঙিয়ে তাদেরকে চোখের আড়াল করতেও ছাড়েন না! আমার এত কষ্ট হয়। মাঝে মাঝে মনে হয় দিই গোঁড়ার ডিমের গান-বাজনা ছেড়ে, আমার জন্যেই তো তাদের এত কষ্ট। আবার ভয় হয়, গান-বাজনা ছাড়লে খাব কী? আচ্ছা মশাই আপনারা তো পণ্ডিত লোক, আমার একটা সমস্যার মীমাংসা করে দিতে পারেন? দেখুন উনি নিজে এক সময়ে খুব গান বাজনার চর্চ্চা করেছেন; আজও যে আমি এ নিয়ে চর্চ্চা করছি—সেও ওঁরই প্ররোচনায়। অথচ যেমনি ছেলে হলো অমনি তাদেরকে এসব থেকে দূরে সরিয়ে রাখল! এর কারণ কী বলতে পারেন।

রাধেশের কথা শুনতে শুনতে রুদ্রকান্ত অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়েছিলেন। তাঁকে নীরব দেখে, একটি নিঃশ্বাস ফেলে রাধেশ আবার বলল: যাই বলুন মশাই, ছেলে-পুলে না থাকলে, বাড়ী-ঘর কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগে।

ইতিমধ্যে একটা রঙচটা টিনের ট্রে-র ওপর করে দু' পেয়ালা চা ও কিছু খাবার নিয়ে রমা ঘরে ঢুকেছিল। সে এ বাড়ীর নতুন ভাড়াটেকে যদিও পূর্ব্বে একবার জানালার আড়াল থেকে দেখেছিল, কিন্তু তখন তাঁর গায়ে ছিল ভাটিয়াদের জমকালো পোষাক। এখন খাশ বাঙালীদের মতো ধুতী গেঞ্জী পরে তাঁকে বিছানার উপর বসে থাকতে দেখে, সে তাঁর স্বরূপ চিনতে পারল।

রাধেশ দরজার দিকে পিছন ফিরে বসে গল্প করছিল, তাই প্রথমে সে রমাকে দেখতে পায়নি। হঠাৎ রুদ্রকান্তকে দরজার দিকে চেয়ে ভীষণ ভাবে চমকে উঠতে দেখে সে পিছনে তাকিয়ে দেখল—রমা কোন রকমে দু'হাতে ট্রে-টি ধরে, দরজার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। চোখে মুখে তার রক্তের চিহ্ন মাত্র নেই; ট্রে শুদ্ধ হাত দুটি তার থর থর ক'রে কাঁপছে।

রাধেশ তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে রমার হাত থেকে ট্রেটি নিয়ে তক্তপোষের ওপর রাখল, পরে নাটকীয় ভঙ্গিতে হাত নেড়ে বলল: মিষ্টার রায়, ইনি আমার স্ত্রী, রমা দেবী···আর এঁর নাম তো তুমি,—শুধু তুমি কেন, বাঙলাদেশের,—শুধু বাঙলাদেশই বা কেন, ভারতের সকলেই শুনেছে। ইনি স্বনামধন্য কবি রুদ্রকান্ত,—যদিও এঁর আসল নাম নিরঞ্জন রায়! সাঁওতাল পরগণার জল হাওয়ায় শরীর নিশ্চয়ই ভাল হবে—এই জন্যেই এঁর এখানে আগমন।

রুদ্রকান্ত গম্ভীরভাবে রমাকে একটি নমস্কার করলেন। রমাও কোন রকমে প্রতিনমস্কার ক'রে টলতে টলতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

তার গমন পথের দিকে চেয়ে, ফিক্ করে একটু হেসে রাধেশ বলল: দেখেছেন, কী রকম নার্ভাস লোক! নাঃ বাঙালীর মেয়েরা কলেজেই পড়ুক আর ফুটবলই খেলুক, অপরিচিত ভদ্রলোকদের কাছে এখনো তারা তাদের সেই বৃদ্ধা ঠাকুমাদের মতোই সেকেলে। অথচ শুনলে আপনি বিশ্বাস করবেন কি না জানিনা, ও এক সময় কলকাতায় "অগ্রগামী" সঙ্ঘের সভানেত্রী ছিল, "স্কটিসে" আই-এ পর্য্যন্ত পড়েছিল। এম্পায়ার বোর্ডে হাজার হাজার লোকের সুমুখে নেচে গেয়ে, সমাজের মধ্যে ও নাম কিনেছিল।

রুদ্রকান্ত বিরস মুখে কী যেন ভাবছিলেন। রাধেশকে থামতে দেখে বললেন: তাই নাকি? আশ্চর্য্য···

আরও উৎসাহিত হয়ে রাধেশ বলে চলল: আশ্চর্য্য তো বটেই। কলকাতার একজন বিখ্যাত ব্যারিষ্টারের একমাত্র বোন ও। ওর বিয়ে হওয়া উচিত ছিল কোন একজন নামকরা ব্যারিষ্টার বা আই-সি-এসের সঙ্গে; কিন্তু···বড় বড় জজ ম্যাজিষ্ট্রেটকে তুচ্ছ করে ভালবেসে বসল কিনা নগণ্য পনের টাকা মাইনের একটা গানের মাষ্টারকে—অদ্ভুত নয়?

রমার আবির্ভাবে রুদ্রকান্তর মুখের ওপর যে অস্বস্তিকর গাম্ভীর্য্যের ছায়াটি ফুটে উঠেছিল, রাধেশের বিরামবিহীন বক্তৃতার আতিশয্যে ক্রমে ক্রমে সে ভাবটা মিলিয়ে গিয়ে, আবার সেখানে তাঁর স্বভাব সুলভ সহাস্যময় রূপটি ফুটে উঠছিল। সস্মিতমুখে তিনি রাধেশের দিকে চাইলেন। যে সব লোকেরা মদ্যপায়ী, মনোস্তত্ত্ববিদ্‌গণের মতানুসারে, তাহাদের মধ্যে বেশীর ভাগ লোকই যে অত্যন্ত সরলমনা হয়, এ কথা তিনি ভাল করেই জানতেন। কিন্তু তাঁর মত সদ্য পরিচিতের নিকট তাকে এরূপ অন্তরঙ্গের ন্যায় মনের কপাট উন্মুক্ত করে দিতে দেখে তিনি মুগ্ধ না হয়ে পারলেন না। বললেন—তারপর?

—"তারপর?"—রাধেশ এবার উত্তেজিত হয়ে উঠলো। বললে: তারপর ও শুধু তাকে, মানে সেই গানের মাষ্টারকে ভালবেসেই বিদায় দিল না। তাকে ও—ইয়ে, মানে বিবাহ করল। সমস্ত আত্মীয় স্বজনের সর্ব্বপ্রকার অনুরোধ উপরোধ উপেক্ষা করে ও তাকে বিবাহ করল। সবার পরিত্যক্ত হয়ে ও ওর একমাত্র অবলম্বনরূপে বরণ করে

চতুর্থ সপ্তাহ

ধুলিধূম্রবিমলিন শহর থেকে বহুদূরে একটি ছোট্ট গ্রামের মানুষের মাঝখানে আমাদের হাসি-কান্না, ভালবাসা, আমাদের সংকীর্ণতা ও স্বার্থান্বেষণের যে জীবন সহজ সাধারণ পথে ভালোয়-মন্দে, অশান্তি ও আশায় মিশে আমাদের হৃদয়ের গভীর পরিচয় দিয়েছে, তারই করুণ মধুর চিত্র কাহিনী

সিন্ধুর মরুভূমির পটভূমিকায়

হিন্দুমুসলমানের জাতীয় ভেদাভেদকে পিছনে ফেলে রেখে সত্যের মহিমায় উজ্জ্বলতর হ'য়ে উঠে যে জীবন তা'রই ছন্দ-মধুর বাণী-চিত্র

ন্যাশন্যাল আর্টিস্টের অবদান

মজাহর খাঁ, কৌশল্যা, হরি শিবদাসানী, এ, হোসেন প্রভৃতি অভিনীত

-উমর মারভী-

বা

-মেরী দুনিয়া-

ম্যাজেষ্টিক টকীজে

আসন্ন মুক্তি-প্রতীক্ষায়

পরিবেশক : **গুডলাক পিকচার্স** ৫৫, এজরা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চিঠির থলি .

আমার আদুরে ভাই বোনেরা—

এবারে চিঠির উত্তর দেবার কথা ছিল। চিঠির উত্তর ও আমার লেখা শেষ হয়ে গিয়েছে, কিন্তু তা দিতে পারলাম না তোমাদের উপন্যাসটার জন্যে! আসছে বারে নতুন প্রতিযোগিতা আর চিঠির উত্তর নিশ্চয়ই তোমরা পাবে।···চাঁদা যারা এখনও পাঠাও'নি তারা তা পাঠিও।······স্নেহ নিও

তোমাদের : বিজনদা

নিল তাকে। তার নিদারুণ দারিদ্র্য, অত্যদ্ভুত চরিত্র, অকারণ অত্যাচার, সব তুচ্ছ করে আজও ও তাকে পূর্ব্বের মতোই ঠিক ভালবাসে।

—"আপনি ভাগ্যবান রাধেশবাবু—"

রাধেশ অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে পড়ল। সে এতক্ষণ তৃতীয় পুরুষের দোহাই পেড়ে, নিজের জীবনের একটি গৌরবান্বিত অংশ রুদ্রকান্তকে শোনাচ্ছিল। হঠাৎ তার মনে পড়ল, সে গোড়াতেই গলদ করে ফেলেছে। নিজের দুর্ব্বলতার কথা স্মরণ করে তার মুখ চোখ ঠিক যেন মেয়েদের মতোই আরক্ত হয়ে উঠল। কিন্তু এ দুর্ব্বলতা তার মজ্জাগত।

অত্যন্ত লজ্জিতভাবে সে বলল : ছিঃ ছিঃ কী সব বলে যাচ্ছি আমি! আপনি কী যে ভাবছেন আমাকে···ছিঃ ছিঃ···আপনার হয়তো সময় নষ্ট হচ্ছে···

রুদ্রকান্ত স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন : আবার আপনি কুণ্ঠিত হচ্ছেন। আপনার কথা আমার খুব ভাল লাগছে। ইতিমধ্যেই আমার মাথায় একটা উপন্যাসের প্লট এসে গেছে···

ঠিক এই সময়ে দরজার শিকলটি ঝন্ ঝন্ শব্দে বেজে উঠল। চমকে উঠে রাধেশ দরজার দিকে তাকাল।

তাকে বিস্মতভাবে দরজার দিকে চাইতে দেখে মৃদু হেসে রুদ্রকান্ত বললেন : আপনাকে বোধ হয় উনি ডাকছেন।

—"তাই নাকি"—লজ্জিতভাবে হেসে রাধেশ তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

এই দেশেরই মেয়ে

—শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

রাজা গঙ্গাধর রাওয়ের মৃত্যু হোল।

রাজার ছেলেমেয়ে ছিল না। সেই অজুহাতে ইংরাজরা ঝান্সীরাজ্য দখল করে নিল।

ঝান্সীর রাণী প্রতিবাদ জানালেন—মেরা ঝান্সী দেংগা নেহি!

ইংরাজরা সে প্রতিবাদে কান দিল না।

রাণী লক্ষ্মীবাঈ উমেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়কে বিলাতে পাঠালেন কোর্ট অফ্ ডিরেকটারদের কাছে আপীল জানাবার জন্য!

কোন ফল হোল না।

রুদ্ধ আক্রোশ পুঞ্জীভূত হতে লাগলো রাণীর মনে!

এই সময় সিপাহী-বিদ্রোহের লেলিহান শিখা জ্বলে উঠলো বাংলা থেকে বুন্দেলখণ্ড পর্য্যন্ত। লক্ষ্মীবাঈ ও তলোয়ার হাতে এগিয়ে এলেন সেই বিদ্রোহীদলের সঙ্গে—ইংরাজ কবল থেকে ঝান্সীকে মুক্ত করার বাসনায়।

যুদ্ধ সুরু হোল।

একদিন দুদিন নয়, মাসের পর মাস লক্ষ্মীবাই ও তার বোন বিরাট ইংরেজ বাহিনীকে রুখে দাঁড়ালেন ঝান্সীর দরজায়। ইংরাজ সেনাপতি হিউরোজ বিশেষ সুবিধা করে উঠতে পারলেন না। সারা ভারতের দৃষ্টি এসে পড়লো দু' বোনের উপর। সামান্য সামন্তরাজ্যের এক বিধবা রাণী শক্তিমান ইংরাজ বাহিনীকে ঠেকিয়ে দিল, কিসের শক্তিতে বিস্মিত হিন্দুস্থান ভাবতে লাগলো সেই কথা।

যুদ্ধ লড়া হ'লে শেষ পর্য্যন্ত কি হোত বলা যায় না, কিন্তু তার আগেই ঘটলো বিপর্য্যয়।

রাণী ও তাঁর বোন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরছেন এমন সময় পিছন দিক থেকে গুলি ছুঁড়ে ইংরাজ সৈনিকেরা তাদের দুজনকে নিহত করলো!
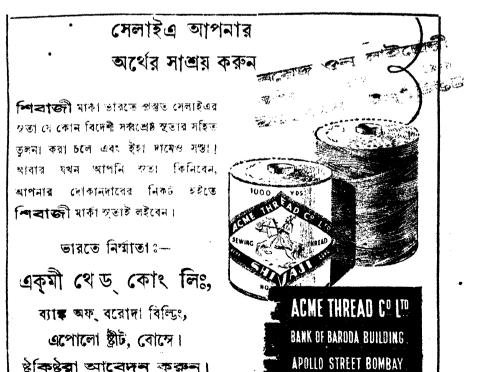
এর শেষ কোথায়......

(আসরের ভাই-বোনেদের লেখা ধারাবাহিক বারোয়ারী উপন্যাস)

[যে সব ভাই বোনেরা এ বছরে নতুন আসরে এলে তাদের পড়ার সুবিধের জন্যে আগের ঘটনাগুলো ছোট্ট করে জানালাম]

—বিজনদা

"বীরু সোনার গাঁয়ের ছেলে। বীরেশ্বর চক্রবর্ত্তী তার পুরো নাম। বিধবা দুঃখী মায়ের একমাত্র ছেলে সে। কিন্তু সে প্রতিভাবান, তেজস্বী। স্কুলের সেক্রেটারী তাকে ভালবাসেন...তাঁরই অনুগ্রহে সে স্কুলে পড়ে বিনা বেতনে।...সুখ-দুঃখের ভেতরে কাটছিল তা'র জীবন, কিন্তু তার জীবনে যে বন্ধন ছিল তাও ছিন্ন হ'লো—মা মারা গেলেন। স্কুলের প্রতিভাবান এবং শ্রেষ্ঠ ছাত্র বীরু ঠিক করলো প্রবেশিকা পরীক্ষা দেবে না—ভাগ্যের সঙ্গে বোঝা পড়া করবার জন্যে একা বেরুবে সে এই বৃহৎ পৃথিবীতে। গ্রামে সাড়া পড়ে গেল—একি করলে বীরু!...স্কুলের সেক্রেটারী এসে বোঝালেন, কিন্তু বীরু অনড়। এলো সেক্রেটারীর মেয়ে রাণু...বয়সে সে বীরুর চেয়ে ছোট...সে কত বোঝালে বীরুকে। বীরু পরীক্ষা দিলে, প্রবেশিকা পরীক্ষায় সে প্রথম হ'লো। সোনার গাঁয়ে উত্তেজনার স্রোত বহে গেল।...কোলকাতার বে-সরকারী কলেজের অধ্যক্ষ বীরুকে আদর করে নিয়ে এলেন তাঁর বাড়ীতে থাকবে আর কলেজে পড়বার জন্যে। বীরু কোলকাতায় থাকে গাঁয়ের খোঁজ-খবর রাখে, তার সেবা সমিতিকে নির্দ্দেশ দেয় কাজ করার।...আই, এ পরীক্ষার দিন পথের ভিখারীর প্রাণ বাঁচাতে গিয়ে সে হ'লো আহত। তার পরীক্ষা দেওয়া হলো না। বে-সরকারী কলেজের অধ্যক্ষ তাকে এজন্যে খুব তিরস্কার করলেন। বীরু তার ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলো: গরীব মানুষের জীবনের দাম কি কিছু নেই? বড়লোকদের ওপর তার ঘৃণা এলো। একা পথহারার মতো পথ চল্‌তে চল্‌তে হঠাৎ তার বন্ধু সমীরের সঙ্গে দেখা। বড়লোকের ছেলে সমীর। সে সব শুনে জোর করে তাকে নিয়ে এলো তাদের বাড়ীতে—সমীরের মা কল্যানী দেবী আর তার বোনের আদর যত্নে বীরুর চোখে জল এলো—সব ধনী লোকই তা'হলে মন্দ নয়! ...হঠাৎ সংবাদপত্রে বীরু দেখলো যে, তাদের গাঁয়ে মহামারী আরম্ভ হয়েছে। পাগলের মত ছুটে চলে গেল সে তার গাঁয়ে। গাঁয়ের দুঃখ আর অভাবের সঙ্গে পৃথিবীর বাস্তবতার সাথে তার নতুন করে পরিচয় হ'লো। আঘাত পেয়ে তার সারা মন কঠিন হ'য়ে উঠলো: এবার সে ডাক্তার হবে। হবে মানুষের বেদনার বন্ধু। অসহায়ভাবে মানুষকে মরতে সে দেবে না।...তাই সে কোলকাতায় ফিরে এসে ডাক্তারী পড়তে আরম্ভ করে দেয়।...আবার একদিন রাণুর টেলিগ্রাম বহন করে নিয়ে এলো নিষ্ঠুর দু'টী কথা: বাবা নেই। সমীর আর কল্যাণী দেবী বীরুকে অনুরোধ করলেন: রাণুকে নিয়ে এস এখানে আমাদের কাছে।...বীরু আবার ফিরে এলো তাদের গাঁয়ে। রাণুর কাছ থেকে সে শুনলো স্কুল আর সম্পত্তির সব ভার তার বাবা বীরুর ওপরেই দিয়ে গেছেন, রাণুর ভারও। রাণুকে তাই বীরু নিয়ে এলো কোলকাতায়"।...এরপর পড়ে যাও...

* * *

[১১]

শ্রীঅরুণ চক্রবর্ত্তী (২০৯)

বিরাট প্রকাণ্ড সহর। এর আগে রাণু কখনও কোলকাতায় আসে'নি। ষ্টেশনের বাইরে পা দিয়ে সে দিশেহারা হয়ে গেল... এত লোক! সবাই ব্যস্ত হয়ে চলেছে কোথায়? কেউ ট্রামে, কেউ বাসে, কেউ রিক্সায়, কেউ সাইকেলে, কেউ পায়ে হেঁটে কারো। একদণ্ড দাঁড়াবার সময় নেই। কোথায় যায় এরা...? কেন যায়?—বীরুর গা ঘেঁসে সে জড়ো সড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল প্রবাহমান জনসমুদ্রের দিকে।

বীরুদা'—রাণু ডাকলো ভীত চকিত গলায়।

বীরুর মন নানা ভয় ভাবনায় দোলা দিচ্ছিল। রাণুকে নিয়ে সে কী করবে? কোথায় রাখবে?—কল্যাণী দেবীর বাড়ীতে রাণুর জায়গা হবে কিন্তু সে তো সাময়িক কিন্তু তারপর?...রিক্সার জন্যে অপেক্ষা করতে করতে বীরু এ-সব কথা ভাবছিল। রাণুর ডাক তার কাণে যায়'নি। রাণু বীরুর হাতটা নাড়া দিয়ে ডাক দিলো—বীরুদা'!

বীরু চমকে তাকাল রাণুর দিকে—কি রে?

—কি ভাবছ?

বীরু হেসে সে কথার জবাবটা উড়িয়ে দিয়ে বল্লে—কেমন লাগ্‌ছে তোর কোলকাতা শহরটা?

—অদ্ভুত! আচ্ছা, এত লোক সব হন্ হন্ করে চলেছে কোথায় বীরুদা?

—খাবারের খোঁজে!

—তার মানে? বিস্মিত ভাবে জিজ্ঞাসা করে রাণু।

—মানে চলেছে কলকারখানায়, অফিসে, কেরাণীগিরি করতে।

—এরা সব?

—হ্যাঁ, এরা সব। আরো আছে, আরো আস্‌বে কাছে-পিটের গ্রাম থেকে রেলে করে—এমনি ভাবে চল্‌বে সাড়ে দশটা এগারোটা অবধি। তারপর সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায় এদের দেখ্‌বি এই পথ ধরেই ফিরছে। চলার সময় এদের যে গতি তুই দেখ্‌ছিস্—ফেরার সময় এরা সব ফুরিয়ে যায়। কোন রকমে টেনে টেনে ক্লান্ত হয়ে এরা বাড়ী ফেরে। এই এদের জীবন—একই পথ ধরে ওরা দু'বেলা চলে। বাড়ী অফিস, অফিস আর বাড়ী—ফাইল বড় বাবু আর বড় সাহেব—এই-ই এদের একান্ত পরিচিত। এদের ছেলে মেয়ে আছে, বউ আছে বুড়ো মা আছে, সংসার আছে। ছেলেরা লেখাপড়া শেখে বাপের মতো কেরাণী হবার জন্যে—মেয়েরা লেখাপড়া হয়তো শেখে না বাবাকে শ্বশুর বাড়ী থেকে চিঠি লিখে কুশল খবর দেবার আর নেবার জন্যে।—এই ই বাঙ্গালী জীবন। কেউ কারো দিকে চায় না, বিপদে সাহায্য করবার জন্যে এগিয়ে আসে না। ছোট মন, ছোট স্বার্থ নিয়ে এরা এমন মেতে আছে যে ছোট স্বার্থ রক্ষার অন্তরালে তাদের জাতীয় জীবনের কি যে ক্ষতি হচ্ছে—সে এরা জানে না।

—এদের কি এক করা যায় না

—না,

—কেন?

—কারো সঙ্গে কারো যোগ বা মিল নেই যে।

—রাণুর ইচ্ছে করে এদেশের জীবন বদলে দিতে তাই সে বলে বীরুদা—আমার ইচ্ছে করে এদের এদের এক করে দিই, সহস্র মন এক সুরে এক ভাবে গেঁথে দি'। এক সমাজে এক দেশে থেকে মানুষ কেন এত অনাত্মীয় এত উদাসিন হ'য়ে থাকবে? উত্তেজনাময় আবেগে রাণুর কণ্ঠ কাঁপতে লাগ্‌লো!

ঝান্সী রক্ষা করার কেউ আর রইল না!

ইংরাজ সেনা ঝান্সীতে প্রবেশ করে হত্যার তরঙ্গ তুললো।

ঝান্সী গেল, কিন্তু লক্ষ্মীবাঈয়ের শেষ নিঃশ্বাস জেগে রইল ভারতের আকাশে বাতাসে, সেই চিন্তাধারার উত্তরাধিকারের গৌরব আজও হিন্দুস্থানের রক্তের সঙ্গে অনুরণিত।

বীরু হেসে তার মাথাটা একটু নেড়ে দিয়ে, বল্লে: যে পাখী সব উড়তে শিখেছে—অনন্ত আকাশে উড়ে বেড়ানোর পিপাসা কেন? দেশের সমস্ত মানুষকে যদি ভাবে ভাবিত করতে পারো তার চেয়ে আনন্দের কি, আছে কিন্তু—

কিন্তু কি বীরুদা—অসম্ভব তা?

স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে বীরু বল্লে:—না অসম্ভব নয়! কিন্তু একজনকে দিয়ে তা সম্ভব নয়! তোমার আমার মতো আরো অনেক মানুষ দরকার, অনেক মন দরকার, অনেক আন্তরিকতা দরকার! কিন্তু তা আমাদের কই? আমাদের সজ্ঞে শক্তি নেই। বল নেই, সেবা করার উৎসাহ নেই—

—কিন্তু এত অল্পে আমরা ভেঙ্গে পড়বো কেন বীরুদা? তোমার উৎসাহ আমার মনে জাগিয়েছে সেবার নেশা, তোমার দেখেই সোনার গাঁয়ের ছেলেরা জেগেছে, এদের জন্যেই 'তো তুমি ডাক্তার হতে চলেছো, হতে চলেছো মানুষের বেদনার বন্ধু!

বীরু চুপ করে তার কথা শুনে বল্লে, এই জন্যেই তোকে আমার এত ভাল লাগে রাণু। বাংলার সহস্র সহস্র কিশোর ভাইয়ের যদি এমনি একটা বোন থাকতো—কথা বল্‌তে বলতে বীরু হাত নেড়ে একটা রিক্সাকে ডাকলো। দুজনে উঠলো। হারিয়ে যাওয়া কথার সুরটাকে ধরে বীরু বল্লো: রাণু এই লোকটার দিকে তাকিয়ে দেখ, শুকনো মুখ, ভাবনা ব্যাকুল চোখ, চার পাঁচ আনা পয়সার জন্যে সোজা তিন মাইল দৌড়ায়। এখন গায়ে জোর আছে তাই রিক্সা টানে, যখন গায়ে জোর থাকবে না, বুড়ো হয়ে যাবে তখন কি করবে এই লোকটা? কি খাবে? কে খাওয়াবে তার ছেলে মেয়ে বউকে? এরা শিক্ষা পায় না, ভাল খেতে পরতে পারে না, এমনি অসহায় ভাবে মরতে বসেছে এদেশের চাষী শ্রমিক, কামার কুমোর, তাঁতী জোলা। রাণু মনে পড়ে তোর হরি মুচীর ছেলেটা কি চমৎকার গান গায়, মুন্দে কোমরের ছেলে কি সুন্দর পট আঁকে, নারায়ণ বাগ্দীর মেয়েটার কি পড়ার ঝোঁক—এদের প্রতিভা মারা যাবে এদের বাপ-ঠাকুর্দা যে ভাবে জীবন যাপন করে এসেছে ওরাও সেইভাবে জীবন যাপন করবে—ভারতবর্ষের চিরন্তন রূপ এরা। দেশের উন্নতি করতে গেলে আগে এদের উন্নতি করা দরকার তা না হলে গোড়া কেটে আগায় জল দিয়ে লাভ নেই।

—এদের জন্যে তুমি কি করবে বীরুদা?

—স্কুল-বাড়ীতে সন্ধ্যে বেলা এদের নিয়ে স্কুল বসাবো। নানান দেশের খবর শোনাবো। স্বাস্থ্যরক্ষার সাধারণ নিয়মগুলো জানাবো। বাঁচবার পথটা ওদের দেখিয়ে দেবো। সেবাসমিতিকে এমনি ধরণের নির্দ্দেশ আমি দিয়ে এসেছি। ডাক্তারি পাশ করে এসেই এর সব ভার আমি নিজে নিবো। আমি শুধু এইটুকু সবাইকে জানাতে চাই আমি কেবল একটা সংসারের, একটা পরিবারের একটা গাঁয়ের নই, আমি এ যুগের এ দেশের। দেশ এবং যুগের দাবী যেখানে বড়ো এবং বৃহৎ সেখানে ছোট্ট সংসারের মধ্যে আমি কি বন্দী হয়ে থাকতে পারি? বীরু চুপ করলো।

রাণু চুপ করে বীরুর কথা শুনছিল—কিন্তু একটা কথা মনে পড়ে তার দু' চোখ জলে ভরে এলো। বীরুদার দেশসেবার কাজে তার জায়গা নেই, বীরুর পাশে দাঁড়িয়ে সেকি সেবা করে যেতে পারেনা? দেশের জন্যে খাটতে পারে না? গাঁয়ের মেয়েদের মধ্যে সাড়া জাগাতে সে কি পারবে না? বীরুদার সামনে সমস্ত কথার ভেতর, পরিকল্পনার ভেতর তার জায়গা নেই? একবারও তো বীরুদার তার কথা উল্লেখ করলো না। বীরুদা' যখন গাঁয়ে ছিল না তখন গাঁয়ের হাড়ি মুচী ডোমেদের মেয়েদের রোগের সময় সে কি সেবা ও শুশ্রূষা করেনি, তবে?—রাণুকে চুপ করে থাকতে দেখে বীরু তাকাল রাণুর দিকে। লক্ষ্য করলো ওর মুখের থমথমে ভাব আর জল জল চোখ।

—রাণু—বীরু স্নেহভরে ওকে ডাক

দিলো। ক্লান্ত চোখে রাণু তাকাল বীরুর দিকে, ধীর গলায় সে উত্তর দিলে : কি ?

: কিছু যে বল্লি না ?

: কি বল্‌বো ?

: চোখে তোর জল কেন ?

: তোমার দেশসেবার বৃহৎ আয়োজনের ভেতর আমার কোন জায়গা নেই দেখে। মেয়েদের কি দেশসেবার অধিকার নেই ? তবে ? যখন তুমি ছিলে কোলকাতায় তখন তোমারই নির্দ্দেশ মতো সকলের ব্যঙ্গ বিদ্রূপ সহ্য করে আমি কি সেবা করিনি—যারা অসুস্থ ছিল, যাদের দেখবার বা সেবা করবার কেউ ছিল না ! তবে ?—

বীরু কি উত্তর দেবে ঠিক করতে পারলো না। রাণুর সব কথাই সত্যি, কোন্ কথাটায় সে প্রতিবাদ করবে ?

দু'জনে অনেকক্ষণ চুপ করে রইলো। রাণু খানিক পরে জিজ্ঞেস করলো : কল্যাণী দেবীর বাড়ীতে আমি কতদিন থাকবো ?

: সেটা সেখানে গিয়ে ঠিক করা যাবে।

: আমার একটা অনুরোধ রাখবে বীরুদা ?—রাণুর শান্ত সহজ কণ্ঠস্বর শুনে বিস্মিত হ'য়ে তাকাল ওর দিকে। মনের বিস্ময় ভাবটাকে গোপন করে সহজ সুরে জিজ্ঞেস করলো—কি অনুরোধ রাণু ?

—তোমার সঙ্গে তোমার পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আমার কাজ করবার অধিকার দাও। আমায় তোমার সব কাজের সহকর্ম্মী করে নাও, আমার যদি যোগ্যতা না থাকে—সে যোগ্যতা আমি অর্জ্জন করে নেবো বীরুদা—

—বোন, তোর যোগ্যতা নেই একথা কে তোকে বলেছে ?

—তুমি যে তোমার কাজের ভেতর একবারও আমার নাম করলে না, একবারও বল্লে না রাণু তোকে এই ভারটা নিতে হবে। তবে কি ভাবছ উত্তর দাও না।

—আমার সহস্র কাজে আমার সহকর্ম্মী হবার দরকার নেই তোর।

—কেন ? যোগ্যতা নেই ?

—যোগ্যতা আছে কিন্তু প্রয়োজন নেই।

—কেন নেই ?—বীরু উত্তর দিল না সে কেন'র।

—কেন ? কেন নেই ? তবে আমায় ফিরিয়ে নিয়ে যাও সোণার গাঁয়ে—আমি ফিরে যাবো গাঁয়ে—এই রিক্সা ফিরো।

বুড়ো রিক্সাওয়ালা আদেশ পেয়ে থামবার উদ্যোগ করতেই বীরু বললো : এই ডাইনা, ডাইনা রোক্কো।

রাণু তাকিয়ে দেখলো প্রকাণ্ড একটা বাড়ীর দরজায় আনন্দ উৎসুক মুখে দাঁড়িয়ে মায়ের মতো একজন মহিলা। সহজ ভাবে অত্যন্ত আদর করে তিনি ডাকলেন : এস মা ! এস বীরু ! বীরু নেমে পড়ল। রাণু নামবে কিনা তাই ভাবতে লাগল··· (তারপর)

নারীলোক

পরিচালিকা—শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী

রান্নাঘর

টোম্যাটো ওমলেট

তিনটে কি চারটে পাকা টোম্যাটো (সেদ্ধ করে নিলে ভালো হয়) টুকরো টুকরো কোরে নিন্। আর একটা বড়ো পেঁয়াজ (যতো সরু করা সম্ভব করা সরু কোরে) কুচিয়ে নিন্ ! ঘিয়ে লালচে কোরে ভেজে নিন্ পেঁয়াজ আর টোম্যাটো। এইবার একটা ডিম গুলে প্যানে (ওম্‌লেট তৈরী করার মতো) ছড়িয়ে দিন, তার ওপর ভাজা পেঁয়াজ আর টোম্যাটো গুলো দিয়ে পাট কোরে নিন্। এটা হোলো স্যামাল্, মাল মসলা বাড়িয়ে আরো তৈরি কোরতে পারেন—

—অলকনন্দা ও বাণী মুখোপাধ্যায়

২। হিদারাম ব্যানার্জি লেন, কোল্‌কাতা।

সমালোচনা

ঐশ্বর্য্য কাদম্বিনী—শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ বিরচিত। শ্রীহরিদাস দাস কর্ত্তৃক সম্পাদিত। প্রকাশক—শ্রীকুঞ্জকিশোর দাস। ২৭, আটাপাড়া সিঁথি, কলিকাতা।

এই গ্রন্থের রচয়িতা গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনাচার্য্য শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ মহোদয়। সম্পাদক মহাশয় জানাইয়াছেন, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী রচিত "ঐশ্বর্য্য কাদম্বিনী" নামক গ্রন্থের অন্বেষণকালে বর্ত্তমান গ্রন্থের পুঁথি তাঁহার হস্তগত হয়। দীর্ঘদিন যাবৎ অনুসন্ধান করিয়াও চক্রবর্ত্তী কৃত গ্রন্থের পুঁথি আজও হস্তগত হয় নাই। আলোচ্য পুস্তকের সাতটি অধ্যায়ে (১) ত্রিপাদ বিভূতির বর্ণনা (২) পাদ বিভূতিগত পুরুষাদির বর্ণনা (৩) শ্রীবসুদেব নন্দ প্রভৃতির বংশাদি বর্ণনা (৪) শ্রীনন্দ রাজধানীর বর্ণনা (৫) ভগবানের জন্মোৎসব বর্ণনা (৬) ভগবানের বাল্যাদি ক্রমলীলা বর্ণনা (৭) এবং দ্বারকা হইতে পুনরায় ব্রজে আগমন বর্ণনা করা হইয়াছে। গ্রন্থখানি গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভক্তবৃন্দের চিত্তবিনোদন করিবে বলিয়া আমরা মনে করি।

শ্রীশ্রীমথুরা মাহাত্ম্যম্—শ্রীপাদ রূপগোস্বামী সঙ্কলিত। শ্রীহরিদাস দাস কর্ত্তৃক সম্পাদিত। প্রকাশক—শ্রীকুঞ্জকিশোর দাস, ২৭, আটাপাড়া সিঁথি, কলিকাতা।

মহাপ্রভুর লীলাসহচর শ্রীমৎ রূপগোস্বামী এই পুস্তক সঙ্কলন করেন। এবং সর্ব্বত্র শাস্ত্র প্রমাণাদির দ্বারা মথুরা মহিমার সমর্থন করা হইয়াছে। শ্রীধামে বাস করিলে, গমন করিলে বা তাহার সংস্পর্শে আসিলেই চরম কৃতার্থতা বা ভক্তিলাভ হয়, ইহা প্রতিপাদন করাই গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য। আমরা পুস্তকটি বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করিয়াছি।

নাটমণ্ডপ

—অভিমন্যু

ছদ্মবেশী—
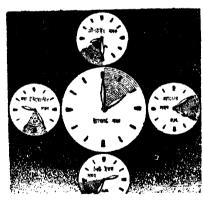
ডিলুক্স পিকচাসের ছদ্মবেশী আগামী ১৫ই জানুয়ারী শনিবার উত্তরা, পূর্ণ ও পূরবী সিনেমায় মুক্তিলাভ করিবে। ছবিখানির পরিচালক স্বর্গত অজয় ভট্টাচার্য্য ও ইহাতে অভিনয় করিয়াছেন—জহর, পদ্মা, ছবি, সন্ধ্যারাণী, ইন্দু, শৈলেন, মিহির, পূর্ণিমা রঞ্জিত, নৃপতি প্রভৃতি। ছবিখানির আখ্যান ভাগ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র নাথ গাঙ্গুলীর ছদ্মবেশী উপন্যাস হইতে গৃহীত। শচীন দেববর্ম্মন ছবিখানির সঙ্গীত পরিচালনা করিয়াছেন।

বিদেশিনী—

প্রেমেন্দ্র মিত্রের পরিচালনায় এম, পি, প্রোডাকসন্সের "বিদেশিনী"র একটী ষ্টুডিওর দৃশ্যের চিত্র গ্রহণ দ্রুত অগ্রসর হইতেছে।

দুই পুরুষ—

তারা শঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ের মঞ্চ সফল "দুই পুরুষ" নাটকের বাণীচিত্র নিউ থিয়েটার্সের অধীনে সুবোধ মিত্রের পরিচালনায় দ্রুত সমাপ্তির পথে অগ্রসর হইতেছে।

সহরের সিনেমায়—

প্রকাশ পিকচার্সের রামরাজ্য গণেশ টকীজে, মিনার্ভার পৃথ্বিবল্লভ মিনার্ভায়, পাঞ্চোলীর পুঁজি সেন্ট্রাল সিনেমায়, ইন্দ্রপুরীর দেবর চিত্রায় এবং জয়শ্রীর দম্পতি শ্রী সিনেমায় সগৌরবে প্রদর্শিত হইতেছে।

ভ্রম-সংশোধন

গত সংখ্যায় "ফল্গু" চিত্রের প্রযোজক হিসাবে ভুলক্রমে শ্রীযুক্ত পান্নালাল পাঠকের নাম মুদ্রিত হইয়াছিল। শাশ্বতিক সঙ্ঘের পক্ষে মিঃ জে, এন, চ্যাটার্জ্জি উক্ত ছবিখানির প্রযোজনা করিতেছেন ও ছবিখানি বর্ত্তমানে শ্রীভারতলক্ষ্মী ষ্টুডিওতে গৃহীত হইতেছে।

শহর থেকে দূরে

প্রযোজক ইষ্টার্ণ টকীজ' পরিচালক শৈলজানন্দ, সঙ্গীত পরিচালক সুবল দাসগুপ্ত, শব্দযন্ত্রী জে, ডি, ইরাণী, চিত্রশিল্পী অজয় কর। ভূমিকায় জহর, ফণী রায়, মলিনা, নরেশ, প্রভা, ধীরাজ, রেণুকা প্রভৃতি।

পল্লীগ্রামের পরদুঃখকাতর বেকার ভবঘুরে এক যুবক, সরলমনা সামান্য বেতনভোগী কম্পাউণ্ডার ও তাহার কুমারী কন্যা, স্বার্থান্বেষী ভণ্ড প্রেসিডেণ্ট, এবং সহরাগত সরলবিশ্বাসী এক ডাক্তারের জীবন কাহিনী লইয়া এই চিত্র গঠিত। সাহিত্যিক শৈলজানন্দ এমনি সরল এবং সাবলীল গতিতে এই কাহিনীর সমাপ্তি ঘটাইয়াছেন যে দর্শকচিত্ত প্রেক্ষাগৃহে বসিয়া সমালোচনার সময় পান না এবং বুঝিতেও কোথাও কোনও অসুবিধা নাই। তাঁহার এই অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য আমরা তাঁহাকে অভিনন্দন জানাই।

অভিনয়ে ফণী রায় (কম্পাউণ্ডার) যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন তাহা সত্যই প্রশংসার্হ। প্রভা (রতনের মা), রেণুকা (কম্পাউণ্ডারের কন্যা), মলিনা (মায়া, রতনের স্ত্রী) এবং নরেশ মিত্রের (প্রেসিডেণ্ট) অভিনয় হইয়াছে ভালই। জহরের (রতন) অভিনয় উচ্চাঙ্গের হইলেও অনেক স্থলে তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী অভিনয়ের পুনরাবৃত্তিই দৃষ্ট হয়। ধীরাজের (ডাক্তার) অভিনয়ও গতানুগতিক। কানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোট ভূমিকাটি ভালই। শব্দানুলেখন ও চিত্রগ্রহণ ভালই। সঙ্গীত শ্রুতিমধুর। নৃত্যের দৃশ্যগুলি একটু কম হইলেই ভাল হইত মনে হয়।

নানাকথা

ইউনাইটেড আর্ট প্লেয়ার্স

আগামী শুক্রবার ১৪ই জানুয়ারী ষ্টার রঙ্গমঞ্চে ইউনাইটেড আর্ট প্লেয়ার্স কর্তৃক ৮ যোগেশ চৌধুরীর "পরিণীতা" নাটিকা অভিনয় এবং তৎসহ একটি নৃত্য গীতের বিচিত্রানুষ্ঠান হইবে। বিক্রয়লব্ধ অর্থ ক্লাবপরিচালিত সাহায্য কেন্দ্রে দেওয়া হইবে।

তাসের দেশ

শান্তিদেব ঘোষের পরিচালনায় ১৪ই ১৫ই ও ১৬ই জানুয়ারী এলিট রঙ্গ মঞ্চে শ্রীমতী পার্বতী দেবীর প্রযোজনায় রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত নাটিকা "তাসের দেশ" ও 'বর্ষবরণ' নামে একটি নৃত্য নাট্য মঞ্চস্থ হইবে। এই অভিনয়ে নৃত্য পরিকল্পনা করিয়াছেন কেলু নায়ার এবং যন্ত্র সঙ্গীত পরিচালনা করিবেন শ্রীদক্ষিণা মোহন ঠাকুর।

রবি বাসর

গত ২৪শে পৌষ ডক্টর পঞ্চানন নিয়োগীর বাড়ীতে ৪৪ এ নিউ শ্যামবাজার ষ্ট্রীটে "রবিবাসরের" এক সভায় "বাংলা ভাষার সংস্কার" সম্বন্ধে আলোচনা হয়।

সাহিত্য বাসর

গত ৭ই জানুয়ারী ৪৯ বালীগঞ্জ প্লেসে "সাহিত্য বাসরের" একটি সঙ্গীত অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।

খুরুট বাণীসঙ্ঘ

খুরুট বাণীসঙ্ঘ গত ২ই জানুয়ারী দুঃস্থ পরিবারের মধ্যে শতাধিক কম্বল ও গরম গেঞ্জী বিতরণ করেন।

মধুমালঞ্চ সঙ্ঘ

নবগঠিত 'মধু-মালঞ্চ' সঙ্ঘ এই মাসেই —"স্বপ্ন দীপালী" নামক একটি গীতি নাট্য অভিনয় করিবেন।

ভারতীয় শিল্প প্রদর্শনী

গত ৭ই জানুয়ারী ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জির সভাপতিত্বে কমলালয় ষ্টোর্সে ভারতীয় শিল্প প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়।

পারিজাত সমাজ

বাঁটরা পারিজাত সমাজের একটা সাধারণ অধিবেশনে সুকবি বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সিঁথী বৈষ্ণব সম্মিলনী কর্তৃক "কাব্যরত্নাকর" উপাধি প্রাপ্তির জন্য আনন্দ প্রকাশ করেন।

অভিনন্দন

শ্রীমতী দেবিকারাণী (বম্বে টকীজ), ক্যাপিটাল থিয়েটার (বাগমারপিতি), ও শ্রীরামচন্দ্র পাটী ছুটির কর্তা নং ১০৯ প্রভৃতির নিকট হইতে নববর্ষের সাদর অভিবাদন পাইয়াছি। আমরা তাঁহাদের অভিনন্দনের প্রতি অভিনন্দন জানাই।

নবীন সরকার সম্প্রদায় কর্তৃক গত ১লা জানুয়ারী বাগবাজার রীডিং লাইব্রেরী হলে একটী জলসা আসর এবং শ্রীরঙ্গম রঙ্গমঞ্চে গত ১০ই জানুয়ারী দুঃস্থ নরনারীদের সাহায্য কল্পে আলমগীর নাটক অভিনয় ও একটি বিচিত্র অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। অভিনয় ও নৃত্যগীতাদি সকলের মনোরঞ্জন করে।

দীপালীর স্বত্বাধিকারী শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত, ১২৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, দীপালী প্রেসে মুদ্রিত
দীপালী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

প্রধান সম্পাদক—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় :: সহঃ সম্পাদক—শ্রীধীরেন্দ্রমোহন মজুমদার বি. এল.

১৬শ বর্ষ VOL. XVI. } ৬ই মাঘ ১৩৫০ :: January 20, 1944 { ৩য় সংখ্যা No. 3

আলোচনী

কত মহাপুরুষের পদচিহ্ন রহিয়াছে এই বাংলার মাটিতে তাহা স্মরণ করিয়া আমরা গৌরব অনুভব করি। আজও ইঁহাদের স্মৃতির চন্দনসৌরভ ক্ষণে ক্ষণে ভিন্ন পৃথিবীর কথা আমাদের কাছে আনে। ক্ষণকালের জন্য আমরা পরিপার্শ্বিকের গণ্ডীর বাহিরে পাখা মেলিয়া দূর দিগন্তের স্বপ্ন দেখি। কর্ম্মঘিন্ন জীবনের এইটুকুই হয়তো সান্ত্বনা। গত ১৭ই জানুয়ারী স্বামী বিবেকানন্দের ৮২তম জন্মোৎসব অনুষ্ঠান উপলক্ষে এই কথাই একান্তভাবে মনে হইতেছে। পুরুষসিংহ বিবেকানন্দের উদাত্তকণ্ঠে আমরা সেদিন জীবনের যে উদ্গান শুনিয়াছিলাম তাহা বাঙ্গালীর এই জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে বিশেষ অর্থপূর্ণ বলিয়া মনে হইবে। তাঁহার সমস্ত সাধনার মূলে সংগঠনের যে স্বপ্ন ছিল তাহা আজও জীবনে রূপান্তরিত হয় নাই। তথাপি এই নিঃস্বতার মধ্যেও আজ আমরা তাঁহাকে শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করি।

কলিকাতার 'ষ্টেটশ্ম্যান্' পত্রিকা কর্ত্তৃক প্রকাশিত Maladministration in Bengal বা বাংলার কুশাসন শীর্ষক একটি সচিত্র পুস্তিকা আমরা পাইয়াছি। পুস্তিকাটি সর্ব্বসাধারণের জন্য না হইলেও ইহা প্রকাশ করিয়া কর্তৃপক্ষ বাংলার সংবাদপত্রসেবী মাত্রেরই ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন। গত বৎসরাধিককাল বাংলার খাদ্য সঙ্কট তথা সরকারী নীতির তীক্ষ্ণ সমালোচনা করিয়া পত্রিকাটি এই দুর্গত প্রদেশের ভাষাহীন অসহায়তার কথা সুস্পষ্ট ও দৃঢ় ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। এই সম্পর্কে 'ষ্টেটশম্যান' পত্রিকায় গত বৎসরের মার্চ্চ হইতে অক্টোবর পর্য্যন্ত যে সকল সম্পাদকীয় নিবন্ধ, চিত্র ও চিঠিপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাই পুস্তিকায় সঙ্কলিত হইয়াছে। যে সর্ব্বব্যাপী দুর্নীতি সরকারী দুর্ব্বলতা ও অপরাধ প্রবণতা ১৯৪৩ সালের মন্বন্তরের প্রত্যক্ষ কারণ বলিয়া অনেকে মনে করেন তাহার সুস্পষ্ট আলোচনা ইহাতে আছে। এই সকল আলোচনা প্রতিদিনের ঘটনার সহিত মিলাইয়া পাঠ করিবার যে মূল্য আছে তাহা ছাড়াও পৃথকভাবে একত্রে প্রকাশিত এই নিবন্ধগুলির একটি ঐতিহাসিক মূল্য স্বীকৃত হইবে।

* * * * *

আগামী ৩১শে জানুয়ারী বা তাহার পরবর্ত্তী কোন সময় হইতে কলিকাতার খাদ্য রেশনিং প্রবর্ত্তিত হইতেছে। বর্ত্তমানে যুদ্ধের পঞ্চম বৎসর চলিতেছে ইহা মনে করিলে সরকারের এই অতি বিলম্বিত আয়োজনের মধ্যে একটা ট্রাজেডির সুর খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে। এ দীর্ঘসূত্রতা ও অপচয় এ দেশেই স্বাভাবিক। যাহা ১৯৪১ বা ১৯৪২ এর প্রথমেই হওয়া উচিত ছিল তাহা বিরাট নরমেধ যজ্ঞের অন্তে প্রবর্ত্তিত হইতেছে। রেশনিংএর পরবর্ত্তী অধ্যায়ে বাঙালীর ভাগ্যে কি আছে তাহা অনেকেই ভাবিতেছেন। অতীত যদি ভবিষ্যৎ দিগদর্শনের সহায়তা করে তাহা হইলে ভরসা করিবার অবলম্বন

কিছুই আমরা খুঁজিয়া পাইব না সত্য। তথাপি আশা করিয়াই বাঁচিতে হইবে, আমাদের চলিতে হইবে পথের শেষ আলোক-বর্ত্তিকার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া।

সম্প্রতি মিঃ আমেরী ইয়র্কে যে বক্তৃতা দিয়াছেন তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। নূতন ফসল বাজারে আসিবার ফলে বর্ত্তমান অবস্থায় যেটুকু উন্নতি হইয়াছে তাহার সূত্র ধরিয়া বিলাতি মহলে আবার পুরাতন সুর ধ্বনিয়া উঠিয়াছে। ভারত সচিবের উক্তির অধিকাংশ বর্ত্তমান অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য-হীন। এই ধরণের বক্তৃতার ফলে ইংলণ্ডের জনসাধারণের মনে এ ধারণা হইতে পারে যে বাংলা তথা ভারতবর্ষে আবার স্বাচ্ছন্দ্যের হাওয়া বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। ভারত সরকারের দোষস্খলনের চেষ্টায় আমেরি সাহেব যে বিশেষ সাফল্যলাভ করিয়াছেন তাহার প্রমাণ বিলাতের "ডেলী টেলিগ্রাফ" পত্রিকার মন্তব্য। পত্রিকাটি বলিয়াছেন, যাহারা এই দুর্ভিক্ষের জন্য ভারত সরকারের উপর দোষারোপ করেন তাহাদের অভিযোগের সম্পূর্ণ জবাব ভারত সচিবের বক্তৃতায় পাওয়া যাইবে। কিন্তু জবাব সত্যই কি পাওয়া গিয়াছে? আমেরী সাহেবের বক্তৃতায় দায়িত্ব এড়াইবার সতর্ক চেষ্টা পরিস্ফুট। তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন দর্শকের দৃষ্টিতে ধুলি নিক্ষেপ করিবার মত সূক্ষ্মতা হয়তো তাহার বক্তৃতায় পাওয়া যাইবে। কিন্তু এত বড় দেশের জীবন-মরণ লইয়া যাঁহারা বৎসরকাল ছিনিমিনি খেলিয়াছেন শুধু বক্তৃতার জোরে তাহা-দিগকে খাঁটি নিষ্কলঙ্ক বলিয়া প্রমাণ করা সম্ভব হইবে না। প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্যের দোহাই দিয়া ভারত সরকারের নিষ্ক্রিয়তার সমর্থন বহু বিবৃতিতে করা হইয়াছে। তাহা সম্পূর্ণ সত্য নয়। যে উদাসীনতা ও দৃষ্টিহীনতার ফলে ১৯৪৩এর মন্বন্তর সম্ভব হইয়াছিল তাহার সম্পূর্ণ ইতিহাস জনসাধারণের গোচরে আসিলে মানুষ স্তম্ভিত হইয়া যাইবে। বৃটিশ শাসনের এই অগ্রসর যুগেও এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হইতে পারে তাহা আজও অজ্ঞ জনসাধারণের নিকট হেঁয়ালীই রহিয়া গিয়াছে।

অগ্নে নয় সুপথা রায়ে

শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার

অগ্নি, তুমি নাও হে আমার
লক্ষ নমস্কার।

ঘুচাও এ দুই নয়ন হ'তে
মোহের অন্ধকার।

কুটিলতার পাকে পাকে
তীব্র দহন জ্বালো

পথ দেখিয়ে যাক নিয়ে যাক
দীপ্ত শিখার আলো

যে পথ গেছে মৃত্যু গহন
অন্ধকারের পার।

অগ্নি, তুমি নাও হে আমার
লক্ষ নমস্কার॥

আমার সকল কাজের তুমি
সাক্ষী চিরন্তন,

তাই তো তোমার পাবনশিখা
করব আমন্ত্রণ॥

মোর জীবনে ডাকব তোমায়
এমনি বারংবার।

অগ্নি, তুমি নাও হে আমার
লক্ষ নমস্কার॥

জীবন-সঙ্গীত

(বড় গল্প)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রীশচীন্দ্রনাথ মিত্র

অন্তরা

সিঁড়ির ধারে অত্যন্ত বিরক্ত মুখে রমা দাঁড়িয়ে ছিল। রাধেশকে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে দেখে, সে মুখে কিছু না বলে, তাকে ইসারা ক'রে নীচে নেমে যেতে বলল। রাধেশ বিনাবাক্য ব্যয়ে নীচে নেমে গেল, পিছন পিছন রমাও গেল।

রান্নাঘরে এসে ক্রুদ্ধস্বরে রমা বলল : তুমি কী চাও? তোমার জন্যে কি আমি গলায় দড়ি দোব!

রাধেশ ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল। রমার নিকট থেকে বাক্যবান সহ্য করা তার দৈনন্দিন অভ্যাস; কিন্তু আজ যেন সে লক্ষ্য করল,—রমা শুধু ক্রুদ্ধ হয়েই ওঠেনি, সে অত্যন্ত বিচলিত হ'য়েও পড়েছে। কিছু বুঝতে না পেরে সে আমতা আমতা করে বলল : আমি তো কই……

ডাল সাঁতলাবার জন্যে রমা তাকের উপর থেকে একটা লোহার কাঁটা পেড়ে নিয়েছিল। সেইটে আন্দোলিত ক'রে চাপা গর্জ্জনে বলল : কিছু জাননা? কে ওই লোকটা যে, তাকে আমাদের ভেতরকার সব কথা বলতে হবে? কিসের আত্মীয়তা ওর সঙ্গে? ইস্ আমাদের কথা নিয়ে উপন্যাস লিখতে চান্! তা যদি কখনও করবার চেষ্টা করে,—তাহলে বলে দিও ওকে, আমি…আমি…

রমা কথাটা শেষ করতে পারল না। হঠাৎ ছুটে গিয়ে ডালে কাঁটা দিতে আরম্ভ করল। রাধেশ আরও ভড়্কে গেল।

হঠাৎ রমা অত্যন্ত করুণস্বরে বলল : তুমি কি একটা দিনের জন্যেও আমাকে শান্তি দেবে না গো! তোমাকে পেয়েছি আজ বার বছর, কিন্তু আমার জীবনে এমন বারটা দিনও এলনা যে, নিশ্চিন্ত হ'য়ে তোমার ওপর নির্ভর করি! কাঁহাতক্ তোমায় সামলে বেড়াই বল তো?—একটুও কি বুদ্ধি-শুদ্ধি হোতে নেই! আমি ম'লে তোমার কী অবস্থা হ'বে একবার ভাবতো!

রাধেশ এবার চঞ্চল হ'য়ে উঠল। রমা তখন গম্ভীরভাবে বলল : বাড়ীতে বসে আড্ডা না মেরে, একবার রাজবাড়ীতে যাওনা। বড় কুমারের সঙ্গে সঙ্গে একটু ঘোরো না,—যদি দু' দশ টাকা advance দেয়… …

রাধেশ তৎক্ষণাৎ সুবোধ বালকের মতো প্রস্থানোদ্যত হলো। রমা আবার তাকে ডেকে বলল : দেখ লোকটার সঙ্গে বেশী কথাবার্ত্তা বলো না,—কেমন? আমার কেমন সন্দেহ হ'চ্ছে লোকটা ভাল নয়! তুমি বরং এক কাজ কর,—ওকে এখান থেকে চলে যেতে বল—

রাধেশ তো অবাক! রমার মতো মেয়েও এমন ছেলে মানুষের মতো কথা বলতে পারে! বলল : কী বলছ তুমি? advance দিয়েছেন, এক মাসের বাড়ী ভাড়া পর্য্যন্ত অগ্রিম দিয়েছেন—

রমা বাধা দিয়ে বলল : আচ্ছা আচ্ছা, সে সব পরে হ'বেখন! কিন্তু খবরদার, তুমি যেন ওর সঙ্গে আর কোন রকম মেলামেশা করতে যেওনা।

রাধেশ বেরিয়ে গেল।

সদর দরজা বন্ধ ক'রে রমা আবার রান্নাঘরে ফিরে এল। উনুনের ওপর কড়ার মধ্যে ডালটা তখন টগ্‌বগ্ করে ফুটছিল। অর্থহীন দৃষ্টিতে সেইদিকে একবার চেয়ে দেখে সে মেঝের ওপর বসে পড়ল।

কতক্ষণ সে সেইভাবে বসেছিল জানেনা, হঠাৎ একটা বিশ্রী পোড়া গন্ধে ঘরের বাতাস ভারাক্রান্ত হ'য়ে উঠল। দু'হাতে মেঝের ওপর ভর দিয়ে কোন রকমে উঠে দাঁড়িয়ে, ধীরে ধীরে সে উনুনের দিকে এগিয়ে গেল। ডাল্‌টা তখন পুড়ছিল; তাড়াতাড়ি

কড়াটা উনুনের ওপর থেকে নামিয়ে ফেলে, তার ওপর এক বাটি জল ঢেলে দিয়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অন্য মনস্কের মতো রমা দোতালার সিঁড়ির দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। আস্তে আস্তে ঠেলে দেখল, দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ। তখন অত্যন্ত অবসন্নের মতো সেই সেইখানেই, সেই ধুলোর ওপরের বসে পড়ে চোখ বুজল।

ধীরে ধীরে অতীতের কত কথাই তার মনে পড়তে লাগল। মনোশ্চক্ষে ভেসে উঠল তার বিগত জীবনের কত সুখ দুঃখের স্মৃতি! বিস্মৃতের দুস্তর সাগরের শেষ সীমায় উপনীত হবার আশায় সে যেন দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্যা হ'য়ে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করতে লাগল। কিছুদূর অগ্রসর হয়তো সে হ'তে পেরেছিল; হয়তো সে দেখতে পেয়েছিল পারাবারে পর পারস্থ অস্পষ্ট তটরেখা। কিন্তু হঠাৎ সে যেন ভয় পেল। ভীষণ তরঙ্গ সঙ্কুল সেই বিশাল সমুদ্র সে সাঁতরে পার হ'তে পারবে তো? চিন্তার সঙ্গে সঙ্গেই সে যেন অবসন্ন হ'য়ে পড়ল; সে ডুবতে আরম্ভ করল। ধ্বংস যখন তার অনিবার্য্য, তখন শেষবারের মতো সে একবার ভেসে উঠল। বাতাস, বাতাস, আরও বাতাস চাই তার। মুখ ব্যাদন ক'রে সে তার ফুসফুস্ দুটো পূর্ণ ক'রে নেবার চেষ্টা করল; সঙ্গে সঙ্গে জগৎটাকে নিমেষের তরে উপভোগ করে নেবার আশায় সে যেন প্রাণপণ শক্তিতে একবার চেয়ে দেখল। আসন্ন মৃত্যু-যাত্রী সে; অনুভূতি তার ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণতর হয়ে আসছে; তবুও সে অনুভব করল, তার দু'পাশে দু'জন পুরুষ উদগ্রীব হ'য়ে তার দিকে চেয়ে রয়েছে।

তাদের দেখে আর্ত্তকণ্ঠে সে বলে উঠল: বাঁচাও আমাকে—

একজন উত্তর দিল: পথ দেখাতে পারি, চেষ্টা ক'রে বাঁচ—

জীবনীশক্তি যার লুপ্তপ্রায় পথের সন্ধানে, তার কিসের প্রয়োজন! ব্যাকুল হয়ে সে বলল: পথের সন্ধানে কী হবে! আমি বাঁচতে চাই! ওগো, বাচাও আমাকে!

তখন অপর পুরুষ বলল: আমি বাঁচাতে পারি! আমাকে অবলম্বন করো!

আশার আলোক দেখতে পেয়ে নূতন করে বাঁচবার আশায় সে তৎক্ষণাৎ সেই পুরুষকে অবলম্বন ক'রে ভেসে চলল। পিছনে যারা পড়ে রইল তাদের দিকে ভুলেও একবার সে চেয়ে দেখল না। তবুও পিছন থেকে কে যেন তাকে ডেকে বলল: কোথায় চলেছ,—এ যাত্রার শেষ কোথায়?

দূর থেকে ভেসে আসা অস্ফুট শঙ্খধ্বনীর মতো সে আহ্বান তার মনের কোণে কোন দাগই কাটিতে পারল না। জীবনকে নতুন করে রাঙিয়ে তোলবার উদ্দীপনায়, সৃষ্টি করবার সূক্ষ্ম অনুভূতিকে উপলব্ধি করবার উন্মাদনায়, অনাগতের জৈবিক দেহধারী ভাগ্যবিধাতার নিকট নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দেবার প্রেরণায়, সে তখন দুর্নিবার গতিতে ভেসে চলেছিল তার সদ্য পাওয়া প্রিয়তমের সাথে! সকলের চলার পথ যখন তার পথ নয়, তখন পথের সন্ধানে তার আর কিসের প্রয়োজন!

ভেসে চলার আনন্দে সে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছিল। সর্ব্বকালের সকল বন্ধনকে উপেক্ষা করার প্রেরণায় সে হয়ে উঠেছিল উন্মাদিনী। নিজের নারীত্বকে সব দিক্ দিয়ে স্বার্থক ক'রে তোলবার ব্যাকুলতায় নিজের কাছেই সে যেন হ'য়ে উঠেছিল রহস্যময়ী। অকস্মাৎ কক্ষ্যচ্যুত নক্ষত্রের মতো সে যেন ঠিক্‌রে পড়ল অতল জলে। চক্ষুরুন্মীলন ক'রে সে দেখলে যে দরজাটাতে সে হেলান দিয়ে বসেছিল। সেই দরজাটি উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছে তার শরীরের একাংশ চৌকাঠের এপারে ও অপর অংশ চৌকাঠের ওপারে অবস্থান করছে এবং রুদ্রকান্ত উদগ্রীব হ'য়ে তার মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

তার পূর্ণ সম্বিৎ ফিরে এল। ত্রস্ত ব্যস্ত হ'য়ে উঠে দাঁড়িয়ে, সে প্রথমে কাপড়-চোপড় ঠিক ক'রে নিয়ে পরে মাথা নীচু করে দাঁড়াল।

রুদ্রকান্ত রমার অতি নিকটে এসে দাড়ালেন। কিন্তু সে মুহূর্ত্তের জন্য! অস্ফুট স্বরে কী যেন একটা কথা বলেই, তৎক্ষণাৎ আবার দ্রুতপদে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেলেন।

তাঁর গমন পথের দিকে চেয়ে চেয়ে হঠাৎ রমার চোখদুটি অশ্রুসজল হ'য়ে উঠল! কী ভেবে সে যেন কেঁপে উঠল। পরক্ষণেই দারুণ উৎকণ্ঠায় তার চোখে মুখে ফুটে উঠল একটা ভয়ার্ত্ত করুণ দৃষ্টি। বিহ্বল দৃষ্টিতে ওপরের দিকে চেয়ে, সে ইতস্ততঃ করতে লাগল। পরে হটাৎ সে যেন ঘুম ভেঙ্গে জেগে উঠল, বিস্ফারিত নেত্রে চতুর্দ্দিকে একবার চেয়ে দেখে,—আর কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করে, দৃঢ়পদে সিঁড়ি বেয়ে সে উপরে উঠতে আরম্ভ করল।

ঠিক এই সময়ে সদর দরজায় কে যেন সজোরে কড়া নাড়ল। রমার গতিরুদ্ধ হলো। নিদারুণ আশান্তির তীব্র বিষে কিছুক্ষণ পূর্ব্বে তার সুন্দর মুখ-মণ্ডল যে অস্বস্তিকর রেখাবাহুল্যে অসুন্দর হ'য়ে উঠেছিল, নিমেষে তা যেন নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেল। আঁচল দিয়ে মুখখানা একবার ভাল ক'রে মুছে নিয়ে, ধীরে ধীরে নেমে এসে সে দরজা খুলে দিল। স্বাধেশ বাড়ী ঢুকল।

অপরূপ!

অজন্তা-গুহার প্রাচীরে প্রাচীরে রেখা ও রঙের ছন্দে শিল্পী যে অপরূপ ছবি এঁকে রেখে গেছে, তার সৌন্দর্যে কোথাও এতটুকু খুঁত নেই। আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও পরিপূর্ণ এক সৌন্দর্য আমরা উপভোগ করি সুস্বাদু, সুগন্ধি চায়ের পরিবেশনের মধ্যে। সার্থক শিল্পের মতোই চা সমস্ত সত্তাকে জাগিয়ে তোলে, আর আমাদের মন খুশিতে ভরে দেয়। তেমনি আপনিও পরিবারের প্রিয়জনদের নিয়ে প্রতিদিন আনন্দময় চায়ের পাত্রকে ঘিরে আপনার অবকাশ মুহূর্তগুলিকে সার্থক করে তুলুন। দেখবেন অনবদ্য শিল্প-উপভোগের মতোই চা গভীর তৃপ্তিতে হৃদয় ভরে দেবে।

★

চা প্রস্তুত-প্রণালী: টাটকা জল ফোটান। পরিষ্কার পাত্র গরম জলে ধুয়ে ফেলুন। প্রত্যেকের জন্য এক এক চামচ ভালো চা আর এক চামচ বেশি দিন। জল ফোটামাত্র চায়ের ওপর ঢালুন। পাঁচ মিনিট ভিজতে দিন; তারপর পেয়ালায় ঢেলে দুধ ও চিনি মেশান।

ভারতীয় চা

একমাত্র পারিবারিক পানীয়

ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্সপ্যানশান বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত

IK 200A

সাহিত্য-বাসরের "চিরকুমার সভা" ও তাহার পরিণাম

মাননীয় শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সমীপেষু—

বসন্তদা, জানতে চেয়েছেন, "সৌজন্যে" বিভ্রাট কেন ঘটল? অপ্রিয় সত্য বলবার সাহস আমার আছে, অতএব যেমনটি আমার জানা আছে, অকপটে নিবেদন করছি। দিনকতক আগে একদিন "সাহিত্য বাসরের" একটি গণ্যমান্য সভ্য আমাকে এসে বলেন যে তাঁরা দু'একটি বই ধরে, ছেড়ে রবীন্দ্রনাথের "চিরকুমার সভা" অভিনয় করবেন স্থির করেছেন এবং আমাকে তাতে 'অক্ষয়' করতে হবে। আমি রাজী হলাম। জানতে চাইলাম না—'সাহিত্য বাসর' কি, এবং অন্যান্য কারা যোগদান করেছেন। স্পষ্টই বললাম—অভিনয় করা সত্যিকার উচ্চ শিক্ষিত ভদ্রলোক এবং ভদ্র মহিলারই কাজ।

মোট কথা ২১শে ডিসেম্বর, ১৯৪৩ 'শ্রীরঙ্গম' রঙ্গমঞ্চে অভিনয় হোল। সাহিত্যিকদের রেডিও অভিনয়ের দুর্নাম ঘুচে গেল, সকলেই আশাতীত আনন্দ পেলেন। তবে এ বিষয়ে মতভেদ রয়ে গেল যে, এই অভিনয়টি 'সাহিত্য-বাসরের' প্রতিষ্ঠা বাড়াল, কি 'সাহিত্য-বাসরের' নাম থাকার জন্যে এ অভিনয় লোকের ভাল লাগল। যাক, সাফল্যে উৎসাহ বাড়াল এবং অনেক সুযোগের যথেষ্ট সুবিধা না নেওয়ায় প্রবীণ ডাক্তার বটকৃষ্ট রায় মহাশয় আমাকে বলেন যে কিছু অদল বদল করে এই অভিনয়টি একটি হসপিট্যালের সাহায্যার্থে আবার করতে হবে। আমি অবশ্য রাজী হলাম। তোড়জোড় আরম্ভ হোল। অভিনয়ের দিক দিয়ে উন্নতি করবার চেষ্টায় অনেক তথাকথিত সাহিত্যিক বাদ পড়লেন এবং সেই জায়গায় নামকরা সু-অভিনেতা ডাক্তারদের ও শিল্পীদের মনোনীত করা হল। কথা উঠল যে 'সাহিত্য-বাসর' যেহেতু এই প্রচেষ্টায় অগ্রণী হয়েছিলেন, তাঁদের 'সৌজন্য' স্বীকার করে অভিনয় করা ভদ্রতা হবে। অতএব আমাদের বটুদা গিয়ে 'সাহিত্য-বাসরের' সভাপতির মৌখিক অনুমতি নিয়ে এলেন। হ্যাণ্ডবিল বেরুল, টিকিট ছাপল, টিকিট বিক্রী হতে লাগল, মহড়া চলল। ১১ই জানুয়ারী অভিনয় স্থির। হঠাৎ ৪ঠা তারিখে 'সতর্কিকরণ' কাগজে কাগজে বেরুল—"কয়েকটি লোক 'সাহিত্য-বাসরের' নাম ভাঙ্গিয়ে (ভাঁড়িয়ে)···ইত্যাদি। ইহার সহিত সাহিত্য-বাসরের কোন সম্বন্ধ নাই।" সংগে সংগে জানা গেল যে সাহিত্য-বাসরের তরফ থেকে জনৈক ভদ্রলোক সব মেয়েদের এ অভিনয়ের অংশ গ্রহণ করে সহযোগিতা করতে নিষেধ করলেন। মনে হোল অকুল পাথারে ভাসল আমাদের প্রচেষ্টার আদর্শ। তখন ৮০০৲ টাকারও বেশী টিকিট বিক্রয় হয়ে গিয়েছে, মহিলাদের সেকথা বোঝান হল—তাঁরা প্রায়শই নিজেদের অক্ষমতা বুঝিয়ে সরে দাঁড়ালেন। ধন্য বলতে হবে আমার অগ্রজপ্রতিম প্রভাত মুখোপাধ্যায়কে ও শ্রদ্ধেয়া মিসেস কে সি দে ও মিসেস ইলা মিত্র মহোদয়াদের যে তাঁরা বুক বেঁধে উঠে পড়ে লেগে লোক জোগাড় করলেন এবং আমাদের অভিনয় নির্দ্ধারিত দিনে সব দিক দিয়েই আরো অনেক ভাল ভাবে সম্পন্ন হল।

কতকগুলি প্রশ্ন স্বভাবতঃই মানুষের মনে জাগতে পারে। 'সৌজন্য' 'সংযোগ' অথবা 'সম্বন্ধ' এগুলোর অর্থের কি কোনই পার্থক্য নাই এবং এই প্রতিবাদ করবার জন্যেই কি অর্থের সাম্য ঘটাতে হয়েছে? আমাদের প্রচেষ্টা পণ্ড করবার জন্যে মেয়েদের অসহযোগিতাই কি প্রধান অস্ত্ররূপে নির্ব্বাচিত হবার একান্তই প্রয়োজন ছিল? সত্যিই কি সাহিত্য বাসরের ভাঙ্গাবার বা ভাঁড়াবার মত নাম আছে, যেটা কোন কলিকাতাবাসীর মতে ডাক্তার বটকৃষ্ণ রায়, ডাঃ ইন্দু রায়, ডাঃ বিনোদ বিহারী সেন, ডাঃ জীবন কৃষ্ণ মজুমদার, ডাঃ হীরেন চ্যাটার্জ্জি, শ্রীযুক্ত প্রভাত মুখার্জ্জি প্রভৃতি সুপ্রতিষ্ঠিত ভদ্রলোকদের স্বপ্নেও কাজে আসতে পারে? এদের ভদ্রলোক বলে স্বীকার করতে কি সাহিত্য বাসরের 'ভদ্রতায়' বাধল? সত্যিই কি এই 'সৌজন্যে'র প্রতিদানে সাহিত্য বাসরের অসৌজন্য ছাড়া আর কিছু দেবার ছিল না? এবং যে মহিলারা এদের প্ররোচনায় অথবা চাপে শেষ মুহূর্ত্তে সরে দাঁড়ালেন তারা কি এটা প্রমান করলেন না যে, তাঁরা শুধু অবলাই নন, তাঁরা কোন বড় কাজের বিশ্বাস লাভ করার অযোগ্য?

স্নেহধন্য
দ্বিজেন সান্যাল
২বি, হায়াত খাঁ লেন কলিকাতা।

[সাহিত্য বাসরের উত্তর]

দীপালী সম্পাদক শ্রদ্ধেয় বসন্তদা এই চিঠিখানি আমাকে দেখতে দিয়ে ও আমাকে

লিপটনের চা খেতে খেতে অসাবধানে কথা বলবেন না

এর উত্তর দেবার সুযোগ দিয়ে আমার প্রতি তাঁর যে স্নেহ প্রদর্শন করেছেন ও তাঁর স্বাভাবিক সৌজন্য দেখিয়েছেন সে জন্য আমি তাঁকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধাভিবাদন জানাচ্ছি। 'সাহিত্য বাসর' কর্ত্তৃক প্রথম অভিনয়ের পর যখন শ্রদ্ধেয় ডাক্তার বটুবাবু দ্বিতীয় অভিনয়ের কথা আমাকে বলিতে আসেন তখন আমি তাঁহাকে বলি—"আমি আপনাকে বহুদিন হইতে জানি ও শ্রদ্ধা করি; আমার বিশ্বাস আছে আপনার হাতে সাহিত্যবাসরের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইবে না—কাজেই আপনি যাহা করিবেন তাহাতে আমার আপত্তি হইবে না।" কিন্তু তাহার পর আমি যখন কলিকাতা হইতে কয়দিনের জন্য অনুপস্থিত ছিলাম, সে সময়ে সংবাদপত্রে আমার নামে যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়, তাহার ভাষা আমার ভাষা নয়, তাহা যাহারা আমাকে জানেন তাঁহারা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন। দীপালী সম্পাদক মহাশয়ও তাহা স্বীকার করিয়াছেন। আমার অজ্ঞাতসারে যাহা হইয়াছে তাহার জন্য আমি দায়ী না হইলেও দুঃখিত এবং সেজন্য যাহারা ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন, তাঁহাদের নিকট আমি ক্ষমা ভিক্ষা করি। তবে এই ঘটনার জন্য আমার প্রীতিভাজন বন্ধু শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র নাথ সান্যাল মহাশয়ই যে দায়ী, সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কারণ তিনি গুণী ব্যক্তি বটে, কিন্তু অভিনয়ের মহলার সময় ও তাহার পরে তিনি তাঁহার ব্যক্তিগত ব্যবহার দ্বারা (হয়ত অনিচ্ছাকৃত) সকলকে বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ করিয়াছেন। সেই জন্য পাপ যাহারই হউক না কেন আমাদিগকেই প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইল।

শ্রীফণীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়
সভাপতি, সাহিত্য বাসর।

নারীলোক

পরিচালিকা—শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী

রান্নাঘর

দুধের পরিবর্ত্তে

বিশুদ্ধ দুধ আজকাল পাওয়াই যায় না। যদিও বা পাওয়া যায় তবে সাধারণ গৃহস্থ ঘরে তাহার উপযুক্ত দক্ষিণা দিবার সামর্থ থাকে না। বালকদের দুধই প্রধান পুষ্টিকর খাদ্য। তাই দুধের দুর্ম্মূল্যতায় গৃহস্থ ঘরের বালক বালিকা আর প্রাণ ভরিয়া দুধ খাইতে পায় না,—দুধের তুলনা কোন খাদ্যের সহিতই করা চলে না, তবু যে-ক্ষেত্রে দিন দিনই দুধ ঘি, অন্তর্দ্ধানের পথে চলিয়াছে, সে ক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত ঘরে অন্য চেষ্টাও দেখা উচিৎ।

মুসুরীডাল ভাল সিদ্ধ করিয়া অনেক জল দিয়া সামান্য ঘি-তে রাঁধুনি, লঙ্কা, তেজপাতা ও পেঁয়াজ কুচি দিয়া সাঁতলাইয়া লইয়া তাহাই সকালে বিকালে ছেলেমেয়েদের এক কাপ করিয়া খাইতে দিলে, দুধের মতই দেহ পুষ্টিকর হয়। একটি করিয়া গোল আলু সিদ্ধ, একটি পাকা টোমাটো, ও ডালের জুস প্রতি ঘরেই প্রত্যেক শিশুদের দেওয়া চলিতে পারে। কেন না ইহা ছেলেমেয়েদের মুখরুচিকর খাদ্য, মূল্য ও বিশেষ কিছু নয়, এবং মেয়েদের কষ্ট ও খাটুনি হইবার ও কিছু ইহাতে নাই।

শ্রীকাত্যায়নী দেবী
মুক্তারামবাবু ষ্ট্রীট

চিঠির থলি

আমার আদুরে ভাই-বোনেরা—

অনেকদিন পরে চিঠির উত্তর দিতে বসেছি। এবারে যে কতো বাধা এসেছিল এর উত্তর দেওয়ার তা' তো তোমরা জানই। হ্যাঁ ভালো কথা, এবারে চাঁদা পাওয়া মাত্রই ডাকযোগে নতুন বছরের সভ্য কার্ড পাঠান হচ্ছে। অতএব চাঁদা পাঠিয়ে এক সপ্তাহের মধ্যেও যারা কার্ড পাবে না তারা বুঝবে যে নিশ্চয়ই কোথাও গণ্ডগোল হয়েছে। প্রত্যেককে কার্ড পাঠান হয়েছে বলে পৃথক পৃথক ভাবে চিঠি দেওয়াও সম্ভব হয় না। ভেবেছিলাম যাদের চাঁদা পেয়ে কার্ড পাঠিয়েছি তাদের নাম ও সভ্য সংখ্যা প্রতি সপ্তাহে ছাপাবো, কিন্তু কাগজের এই দুর্মূল্যের বাজারে তা সম্ভব হয়ে উঠছে না।……

নতুন প্রতিযোগিতা : নতুন প্রতিযোগিতা এবারে না দেবার জন্যে অনেক ভাই-বোন অনুরোধ জানিয়েছে, কারণ সরস্বতী পূজোর হাঙ্গামা নিয়ে সবাই ব্যস্ত। অতএব পূজোর পরই প্রতিযোগিতা আহ্বান করা যাবে, কি বলো?…এই সময়ের মধ্যে তোমরা না হয় নতুন ধরনের কোন রকমের প্রতিযোগিতার বিষয় আমায় জানিও আমি তা আহ্বান করবার চেষ্টা করবো। কেমন, তাই পাঠিও সকলে!…এবারে তোমাদের চিঠির থলি খোলা থাক। দেখি কা'র কি উত্তর দেবার আছে…

শ্রীঅরুণকুমার পাল (নাটোর : ৯৭৮) আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে ফিরে গিয়েছ না দেখা পেয়ে, ওতে দুঃখ করবার কি আছে? প্রতি সপ্তাহেই তো তোমাদের সকলের সঙ্গে দেখা করছি এই আসর মারফৎ। তোমার বন্ধু মারা গেছে শুনে সত্যিই মনে আঘাত পাবার কথা। প্রকৃত বন্ধু আজকাল মেলে খুব কম। যাই হোক আবার এক এমনি প্রকৃত বন্ধু যোগাড় করে নাও আমাদের এই ভায়েদের মধ্যে থেকে।

শ্রীঅরুণকুমার চক্রবর্ত্তী (কলিকাতা ৯৩৩) : তোমার লেখা উপন্যাসএর যে অংশটা ছাপা হয়েছে তাতে সভ্য সংখ্যাটা ভুল ছাপা হওয়ার জন্যে সত্যিই দুঃখিত।

শ্রীঅসীমা দত্ত (লক্ষ্ণৌ : ১৩৫০) : কেন চিনবো না? আমাকে যেমন তুমি চেনো দাদা বলে, ঠিক আমিও তোমায় চিনি আমার বহু বোনেরই একজন বলে।

শ্রীঅর্চ্চনা পাল (আলমবাজার : ৩৪৩): মাতৃভাষার যে অপমান করে তাকে উপযুক্ত শাস্তি দিয়েছ শুনে খুব খুশী হলাম। আমার ভাই-বোনের কাছে থেকে আমি এমনি আশাকরি সব সময়।

শ্রীঅচিন্ত্য কুমার মিত্র (কলিকাতা : ৯৫২). তোমার যে কটা লেখা পাঠিয়েছ তার মধ্যে গল্প হলেও সত্যি, মনোনীত হয়েছে।

শ্রীঅরুণকুমার মিত্র (পুরুলিয়া : ১০০১) : তোমার কবিতাগুলো খুশী করতে পারেনি ভাই।

শ্রীঅবনীকুমার গঙ্গোপাধ্যায় (আলমবাজার : ৯৪৩) : তোমার কাছে থেকে এগুলোর থেকে আরো ভালো লেখা পাবার আশা রাখি ভাই।

শ্রীঅশেষকুমার চট্টোপাধ্যায় (হাওড়া : ৮৮৬) : আচার্য্য স্যার জগদীশচন্দ্র বসু সর্ব্বপ্রথম ১৮৯৫ খৃঃ কোলকাতা টাউন হলে বিনা তারে বিদ্যুৎ প্রেরণ বিষয়ক কতকগুলি পরীক্ষা দেখান। কিন্তু বেতার বার্ত্তা আবিষ্কারের সম্মান যিনি পেয়ে থাকেন তাঁর নাম মাকুইস্ গুগ্ লিয়েলমো মার্কনি।

আফসারী বেগম (শ্রীহট্ট : ৬৭৬) : তোমার চিঠির উত্তর ডাকে পেয়েছ তো? ঐ সঙ্গে তোমার নতুন বছরের সভ্য কার্ড পাঠিয়েছি।

এ ওয়াহেদ খান চৌধুরী (রাজসাহী : ৬৯০) : তোমার চিঠি পেয়েছি। হ্যাঁ তোমার সভ্য কার্ড পাঠান হয়েছে যথা সময়ে।

কমলা ও মৃদুলারাণী ভদ্র (৭৪৪, ৭৪৫) : নিশ্চয়ই তোমরা দু' বোনে এ বছরও এ আসরের সভ্যা রোইলে।

শ্রীগঙ্গারাম ঘোষ (মুঙ্গের : ১০৭৮) : তোমার সংগ্রহ করে পাঠান "জেনে রেখো" মনোনীত হ'লো।

শ্রীগিরীন্দ্রনাথ রায় (নৈহাটী : ৭৩৪) আমার কাছে সহরের আর গাঁয়ের ভাই-বোন সকলেই সমান। তুমি বোধ হয় জানো না যে আমিও তোমারই মত একজন গ্রাম-

বাসী। ভারতবর্ষের ইতিহাসের পাতা ওল্টালে ও'ক'টা প্রশ্নের উত্তর পাবে। আকবরের সভায় যে ন'জন গুণী পণ্ডিত ছিলেন তাঁদের নাম হ'চ্ছে : টোডারমল্ল, তানসেন, আবুল ফজল, ফৈজী, মানসিংহ, বীরবল, আবদুল কাদের বদায়ুনী, হাকিম হুসেন, মোল্লা দোপেয়াজা।

কুমারী গীতা চট্টোপাধ্যায় (নৈহাটী : ৩৪৪) : চাঁদা যখন পাঠিয়েছ তখন নিশ্চয়ই তুমি সভ্য থাকবে এ আসরের—কেন বার হ'বে। উপন্যাস ছাড়াও তো তোমাদের লেখা ছাপা হচ্ছে।

শ্রীজিতেন্দ্র নাথ পাল (নাটোর : ১০৫৮) : তোমার হাতের লেখা এতো খারাপ যে চিঠিখানা বহু কষ্টে দু'লাইনের বেশী পড়তে পারলাম না। হাতের লেখা ভালো করো।

শ্রীজলধি রতন বন্দ্যোপাধ্যায় (কাশী : ১৬২) : তোমার সঙ্গেও আমি সেই প্রার্থনা করি দেশবাসীদের জন্যে। হাতের লেখা তোমারও খুব ভালো দেখলাম না।

টর্পেডো (কলিকাতা : ৩৪৮) : ছদ্মনাম ব্যবহার করা যে উঠে গেছে আসরে সে খবর কি তুমি রাখো না? তোমাদের শুভ কামনা আমি সর্ব্বদাই করি। কার্ড পাঠান হয়েছে।

দীপালী চন্দ (রংপুর : ২১১) : তোমার ও ইলিনার চাঁদা পেয়েছি, কার্ডও পাঠিয়েছি। তুমি যখনই চিঠি লেখ তখনই তোমার সভ্য সংখ্যা দাও না। ভবিষ্যতেও ভুল যেন আর না হয়।

শ্রীদামোদর চক্রবর্ত্তী (আলমবাজার : ১১০৩) : তোমার আর ননী গোপালের (১১০৪) চাঁদা পেয়েছি। "বয়সের সার্টিফিকেট্" হচ্ছে তোমার অভিভাবকের বা স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের লেখা তোমার সঠিক বয়স বর্ত্তমানে যে কত সেটা জানাতে হয়।

শ্রীদেবনারায়ণ কর্ম্মকার (কলিকাতা : ৭৩৬) : আমরা যখন ক্লান্তি বোধ করি বা ঘুম পায় তখনই আমাদের রক্তে অক্সিজেনের অভাব ঘটে। নাক দিয়ে নিশ্বাস নেওয়ার সঙ্গে যে টুকু অক্সিজেন শরীরের মধ্যে যায় তার থেকে বেশী দরকার হয় ভেতরে। তাই সেই অভাবটা মেটে মুখের মধ্যে দিয়ে ভেতরে গিয়ে। সেইজন্যই আমরা "হাই" তুলি।

শ্রীদুলাল কান্তি বন্দ্যোপাধ্যায় (কলিকাতা : ৯৪৮) : তোমার কবিতাটী আমায় খুসী করতে পারলো না। ওঁর ঠিকানা আমার জানা নেই। তুমি লেখার জন্যে পুরস্কার পেয়েছ শুনে খুসী হলাম।

শ্রীনারায়ণ চন্দ্র ঘোষ (মুঙ্গের : ১০৩৮) : তোমার লেখা দুটী পেলাম। ও বিষয়ে পরিচালক বা সম্পাদকের মতামত সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে।···ঝরণা কলম আবিষ্কার করে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার ওয়াটারম্যান সাহেব।

শ্রীনির্ম্মলকুমার রায় (কলিকাতা : ১০৯২) : তোমার লেখা দুটি খুসী করতে পারল না ভাই। ও কুপনটী প্রতিযোগিতায় যোগদান করবার জন্যে।

শ্রীনির্ম্মলকুমার ঘোষ (বনহুগলী : ৯৭৯) : ম্যালেরিয়ায় তুমি ভুগে তার উদ্দেশ্যে আবার ব্যঙ্গ করে কবিতা লিখেছ দেখলাম। ওর থেকে ভালো কবিতা লিখো।

শ্রীপাঁচুগোপাল কুণ্ড় (নৈহাটী : ৯৪৫) : বাকী ফটোগুলো তো বহুদিন আগে তোমায় ডাকযোগে ফেরৎ পাঠিয়েছি।

শ্রীপ্রীতি বন্দ্যোপাধ্যায় (বম্বে : ৮৪১) : তোমার মত একই অনুরোধ যে সবাই করেছিল তা তো দেখেছই। তোমার ও বাড়ীর ছোট বড় সবাইকে ওখানা খুসী করছে শুনে সুখী হলাম।

শ্রীবিভা রায় (বর্দ্ধমান : ২০০) : পাঠান লেখা পেলাম। এবারে কোনটাই কিন্তু খুসী করতে পারলো না। ও সব সংগ্রহ করা ছেড়ে দিয়ে নিজে লেখবার চেষ্টা করো।

শ্রীবিনয় ভৌমিক (কলিকাতা : ৮২৮) : আরো ভালো লেখা লেখবার চেষ্টা করো।

শ্রীরামচন্দ্র মহাপাত্র (উড়িষ্যা : ১১০১) : তোমার সভ্য কার্ড ফিরে এলো কেন? ঠিকানা তুমি যা দিয়েছিলে তাই লেখা হয়েছে।

শ্রীমদনমোহন গোস্বামী (বালী : ৯৪৪) তোমাদের বহুবার বলেছি যে নিজেরা লেখার অভ্যাস করো। ও সংগ্রহ করে লেখা পাঠানোতে নিজের লেখার কোন উপকার নেই।

শ্রীরবীন সরকার (মালদহ : ১৮০৭) : কার্ড আর চিঠির উত্তর নিশ্চয়ই ডাক যোগে পেয়েছ। ওটা প্রায় সকলেই জানে তাই "জেনে রাখা দরকার" মনোনীত হলে না।

শ্রীরেখা সেন (শ্রীহট্ট : ৮৫৪) : লেখনী বন্ধু তুমি আমাদের আসরের যে তিনজন বোনের সঙ্গে পাতাতে চাও তাদের নাম ও সভ্য সংখ্যা জানিয়ে ডাক টিকিট পাঠিও আমার কাছে, তাহ'লে তাদের ঠিকানা পাবে। তারপর তুমি তাদের সঙ্গে চিঠি-পত্র আদান প্রদান করো।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (কলিঃ : ৮৭৮) : "অল্পবিদ্যে ভয়ঙ্করী" বলে একটা কথার প্রচলন আমাদের মধ্যে আছে তা' তো জানো? তোমার ঐ 'জানবে কি' ছাপলে আমাদের ভাই বোনেদের চীনাভাষা সম্বন্ধে তাই হবে আর কি।

শ্রীরামচন্দ্র পাটী (উড়িষ্যা ১০১৩): বাংলা হাতের লেখা তোমার মাতৃভাষা না হলেও বেশ সুন্দর দেখে সত্যিই খুসী হলাম, কিন্তু চিঠির ভাষা অর্থাৎ তোমার মনের কথা আমি বুঝতে পারি না চিঠি পড়ে।

শ্রীরবি চক্রবর্ত্তী (রংপুর : ৮৮৪): তোমার চিঠির উত্তর ও সভ্য কার্ড আমি ডাক যোগে পাঠিয়েছি। বেশ তাই এসো। কবিতাটী মনোনীত হ'লো।

শ্রীশচীনন্দন আঢ্য (কলিঃ : ৯৬৮): এবারের নতুন সভ্য কার্ড পেয়ে তোমার মত অনেক ভাই বোনই খুসী হয়েছে দেখলাম। নিশ্চয়ই লিখতে পারো। ভাই-বোনদের রাগিয়ে আনন্দ পাই, তার কারণ তাদের অভিমানপূর্ণ চিঠি পাই। কিন্তু লেখা ভালো না হ'লে ছাপা উচিত নয় তাই ছাপি না। ভবিষ্যতে ভাল লেখা যাতে লিখে পাঠাতে পারো সেই চেষ্টা করো। "জানা উচিৎ" মনোনীত হলো।

শ্রীশেফালিকা দাস (ঢাকুরিয়া: ১০৬২): ও সম্বন্ধে আগে আলোচনা করেছি। পুরাতন দীপালী উল্‌টে দেখো।

শ্রীশৈলেন্দ্র কুমার দে (গৌহাটী : ৪৭৮): তোমার ও তারাকিঙ্করের (৮৪৮) নতুন বছরের সভ্য কার্ড ও চিঠির উত্তর নিশ্চয়ই পেয়েছ। "এর শেষ কোথায়" বোধ হয় ষোল পরিচ্ছেদে শেষ করবো। বই হয়ে ওখানা বার হলে একটাকার বেশী যাতে দাম না হয় সেদিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখবো।

শ্রীসুহাস দাস (ঢাকুরিয়া : ৯৪৯): "প্রদীপ"কে দেখবার আসায় রইলাম।

সেখ সিরাজউদ্দীন (মুর্শিদাবাদ : ৪১১): বেশ তাই এসো। আশাকরি বোমার ভয়ে আর তোমার ওখানে আমায় যাবার জন্যে বলবে না। "ভিখারিণীও গোলাপ" খুশী করতে পারলো না।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন দেব (কুমিল্লা : ৭৮৬): তোমার লেখা রচনার ঠেলায় আমি সত্যিই হাঁপিয়ে উঠি। এতো বেশী লেখা পাঠাও কেন? তোমার একটা গল্প হলেও সত্যি মনোনীত হলো।...

...আজকের মত তোমাদের স্নেহ জানিয়ে এইখানে বিদায় নিই। কেমন?

তোমাদের : বিজনদা'

এই দেশেরই মেয়ে

—শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

শিবরাম সার্বভৌম ছিলেন ফরিদপুরের নামকরা পণ্ডিত।

পণ্ডিতমশাইয়ের একমাত্র মেয়ে প্রিয়ংবদা। অতবড় পণ্ডিতের মেয়ে কিন্তু পিতা তার শিক্ষার কোন ব্যবস্থা করলেন না। পণ্ডিত মশাই ভাবতেন মেয়েদের লেখাপড়া শেখার কি শাস্ত্র পড়ার কোন প্রয়োজন নেই।

মেয়েটি টোলের এক কোনে চুপ করে বসে থাকতো, আর শুনতো সংস্কৃত পাঠ। শ্লোকের সবটুকু তার কানে এসে বাজতো, যা শুনতো তাই সন্ধ্যার পরে আবৃত্তি করতো নিজের মনে।

পণ্ডিতমশাই মেয়ের স্মৃতিশক্তি দেখে মুগ্ধ হলেন, ঠিক করলেন মেয়েও পড়বে তার ছাত্রদের সঙ্গে।

দেখতে দেখতে প্রিয়ংবদা কাব্য, অলঙ্কার ব্যাকরণ, ন্যায় ও মীমাংসা শেষ করে ফেললো। আর তারই সঙ্গে প্রকাশ পেল অপূর্ব কণ্ঠ—সংগীত সামর্থ।

নিজে সংস্কৃত শ্লোক রচনা করে তিনি গাইতেন, প্রতিদিন পূজার সময় তিনি একটি করে স্তব রচনা করতেন। তাছাড়া মার্কণ্ডেয় পুরাণে যে মদালসা উপাখ্যান আছে, তার তিনি দার্শনিক ব্যাখ্যা লেখেন, মহাভারতের শান্তি পর্বের মোক্ষ ধর্মের একখানি টীকাও তিনি লেখেন।

এমন বিদুষী মেয়ের বিয়ে দেওয়া বড় সহজ কথা নয়। পণ্ডিতমশাইয়ের কোন পাত্রই মনে ধরে না। শেষে সার্বভৌম মশাই পাত্রের সন্ধানে কাশীতে গেলেন, সেখানে রঘুনাথ মিশ্র নামে এক কনৌজী ব্রাহ্মণের সঙ্গে প্রিয়ংবদার বিয়ে হোল।

বিবাহের সময় সার্বভৌম মশাই মেয়ে জামাইকে একখানি গাঁ যৌতুক দিলেন।

জামাই বললেন—জমিদারী করার ইচ্ছা থাকলে বাবার জমিদারীই দেখতে পারতাম, কিন্তু তা আমি চাই না, শাস্ত্র অধ্যয়নেই জীবন কাটানো আমার আদর্শ। গ্রামের দরকার নেই, সামান্য খেত-খামার হলেই চলবে যাতে জীবনটা স্বচ্ছন্দে কেটে যায়।

নদীর ধারে ছোট কুটির বেঁধে স্বামী স্ত্রী শাস্ত্র-পাঠে জীবন কাটিয়ে দিলেন রান্না ও সংসারের কাজ শেষ করে স্ত্রী এসে বসতেন স্বামীর কাছে, হস্তাক্ষর ছিল ভালো, বড় বড় সংস্কৃত বই নকল করতে হতো বাংলায়। কিন্তু কোনদিন আলস্য দেখা দেয়নি। সংসারের প্রতিটি কাজ নিখুঁত ভাবে করার জন্য দাসদাসী রাখার আগ্রহ প্রকাশ পায়নি কোনদিনই, এই ছিল ভারতের শিক্ষার আদর্শ।

সমালোচনা

নতুন বই

তোমাদেরই মত ছেলে ঃ—শ্রীবিজন কুমার গঙ্গোপাধ্যায় প্রকাশক সরস্বতী সাহিত্য মন্দির, সোনারপুর (২৪ পরগণা)। দাম আট আনা।

শ্রীমান বিজনের নতুন বই তোমাদেরই মত ছেলে পড়লাম। পড়তে পড়তে অবাক হ'য়ে কেবল এই কথাই ভাবছিলাম যে এই বড় বড় মানুষের জীবনী লিখতে গিয়ে কেবলমাত্র কতকগুলো বড় বড় কথা আউড়েই আমরা ক্ষান্ত হ'য়ে যাই, অথচ একবারও একথা ভাবিনে যে এসব মনীষীদের বাল্যকাল আমাদেরই বাল্যকালের মত ভুলভ্রান্তি ও দুষ্টুমীতে ভরা ছিল। আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি শ্রীমান বিজন কোত্থেকে এইগুলি করলো। যেখান থেকেই করুক,—এমনভাবে সে গল্পগুলি বলে গেছে যে মনে হয় আমাদের কাছে বসে সে মুখে-মুখে বানিয়ে বানিয়ে এই কাহিনী শোনাচ্ছে। ঠিক এই ধরণের বই বাংলা সাহিত্যে আর আছে কিনা জানি না। এই ছোট্ট বইখানা আরম্ভ করে আমি আর ছাড়তে পারিনি, এমনকি ষ্টুডিওতে গেছি ট্রামে বসে পড়তে পড়তে।

ভারী ভাল হ'য়েছে বইখানি। আমার মনে হয় বাংলাদেশের প্রত্যেকটি ছেলের এটি পড়া উচিত; যদিও আমি বেশ জানি আমি একথা বলবার আগেই তারা এখানি কিনেছে এবং পড়েছে। যাইহোক সব শেষে আর একটি কথা বলবো,—ছেলেদের পড়া হ'য়ে যাওয়ার পর যদি তাদের বাপেরা-মায়েরা অথবা আমার মত বড় ভায়েরা এই বইখানা পড়ে দেখেন তবে তাঁরাও আনন্দ পাবেন—কেননা দুই পুরুষের আনন্দ যোগাবার মত ক্ষমতা এর আছে।

—শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য্য

স্বর্গের সন্ধানে

শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ, বি, এল

"স্বর্গ" বলিয়া কি কোন স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে, না ইহা কল্পনাবিলাস মাত্র? এই পুরাতন প্রশ্ন নৈশাকাশে জিজ্ঞাসা-চিহ্নের মতোই সনাতন; দুঃখের আঁধারে উজ্জ্বল সুখের জ্যোৎস্নায় লুপ্তপ্রায়। এ প্রশ্নের সমাধান নাই—নাই বলিয়াই যুক্তির জাল হইতে মুক্তি পাইয়া স্বর্গের উদ্দেশে কত বিচিত্র কাব্যকাহিনী রচিত হইয়াছে। যাহাকে জানি, যাহাকে দেখিতে পাই তাহার সবটুকুই তো বর্ণনা করা যায়; যাহা ইন্দ্রিয়ের অগোচর অথচ আশায় অপরূপ, সান্ত্বনায় মধুর, চিন্তায় সুখকর—যাহা দুঃখে শান্তি, দৈন্যে প্রাচুর্য্য, বেদনায় সহানুভূতি, তাহাকে অস্বীকার করিয়া কল্পনার আনন্দে বঞ্চিত হইব কেন?

মহাপ্রস্থানের পথে স্বর্গের যে যৎসামান্য নির্দ্দেশ আছে—তাহাতে রহস্য দুর্জ্ঞেয়ই থাকিয়া যায়; পিতৃ-সত্য রক্ষার জন্য সশরীরে যমপুরে গিয়া বালক নচিকেতা নেপথ্যে পিতৃগণের গান শুনিল—

হেথা স্নান করি মোরা অমৃত-সাগর-জলে—
মর্ত্ত্য-নদীর মুক্তির মোহনায়,
হেথা পান করি সুধা তারকা-তরুর তলে,
কৃষ্ণা-তিথির জ্যোৎস্নার সীমানায়।

* * *

হেথা ঋতু, হোল পল, নৃত্য-চপল নহে,
স্থির-আঁখি'পরে দুলিছে না আলোছায়া
হেথা দিবা-নিশা দোঁহে মধুরে মিলিয়া রহে
বিথারি' বদনে গোধূলির ম্লান মায়া!
এবে দিক্-দিগন্ত উদয়-বিলয় হয়েছে অন্তরে!
এবে সুখ দুঃখহীন মরণানন্দে চেতনা সন্তরে!

(মোহিতলাল)

বৈতরণীর পরে কী আছে? কে সেখানে যাইবার অধিকারী? শ্রাদ্ধক্রিয়া, প্রেতকার্য্যাদি না করিলে মৃতের আত্মার উদ্ধার লাভ করে না ইহা হিন্দুর সংস্কার এই সবই "স্বর্গ-কামনা"। Virgilও বলিয়াছেন—

For never man may travel o'er
That dark and dreamful blood, before
His bones are in the urn."

বৈতরণীর পরে আছে নরক ও স্বর্গ; মেঘনাদবধ কাব্যে উভয়েরই যথাযোগ্য সুষ্ঠ বর্ণনা আছে; স্বর্গের একাংশে—

"পূর্ব্বদ্বারে সুখে
করে বাস পতিসহ পতি-পরায়ণা
সাধ্বীকুল; স্বর্গে, মর্ত্তে অতুল এ পুরী
সে ভাগে; সুরম্য হর্ম্ম্য সুকানন মাঝে
সুসরসী সুকমলে পরিপূর্ণ সদা,
বসন্ত সমীর চির বহিছে সুস্বনে
গাহিছে সুপিকপুঞ্জ সদা পঞ্চস্বরে।
আপনি বাজিছে বীণা, আপনি বাজিছে
মুরজ, মন্দিরা, বাঁশী-মধু সপ্তস্বরা!
দধি, দুগ্ধ, ঘৃত উৎসে উথলিছে সদা
চৌদিকে, অমৃতফল ফলিছে কাননে;
প্রদানেন পরমান্ন আপনি অন্নদা।

স্বর্গের উত্তরাংশে—

"এই দ্বারে বীর সম্মুখ সংগ্রামে
পড়ি, চিরসুখ ভুঞ্জে মহারথী যত,
স্বর্ণসৌধ সুকাননরাজি
কনকপ্রসূণপূর্ণ সুদীর্ঘ সরসী
নবকিশলয় ধাম * *
* * এ পুণ্যভূমে বিধাতার হাসি
চন্দ্র সূর্য্য তারারূপে দীপে, অহরহ
উজ্জ্বলে!"

[Virgil এও অনুরূপ কল্পনা আছে]

Rupert Brookএর একটি চমৎকার কল্পনা আছে।

"Mamua, there waits a land
Hard for us to understand
Out of time, beyond the sun......
There the Eternals are, and there
The Good, the Lovely and the True
And the Types, whose earthly copies were
The foolish broken things we know"

তবু আশা মিটিল না—কিছুই জানা গেল না—তাই কবি সর্ব্ব নিয়ন্তাকে বলিলেন—

"ওই বধির যবনিকা তুলিয়া দেখাও মোরে
প্রভু তব আলোক-লোক;
ওপারে সবই ভালো, কেবলই সুখ আলো
এ পারে দুঃখজ্বালা আঁধার শোক।"

ও পারে কি শুধুই আলো? কিসের আলো? সে আলো কি অনির্ব্বাণ?

উপনিষদের কবি বলিলেন—

"ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্র তারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোহয়মগ্নিঃ॥
তমেব ভান্তু মনুভাতি সর্ব্বং।
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥"

(ক্রমশঃ)
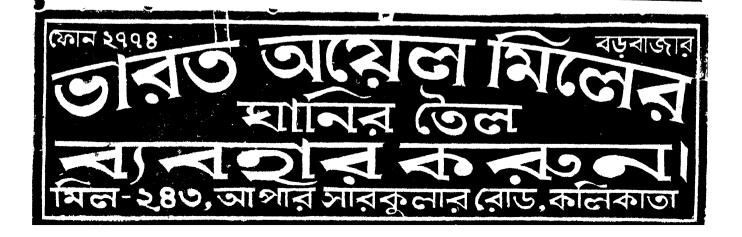
খেলার মাঠে

—শ্রীউমেশ মল্লিক

ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের অনুরোধে ক্রিকেট ক্লাব অব ইণ্ডিয়ার উদ্যোগে আগামী ১১, ১২, ১৩ ও ১৪ই বোম্বাইতে রেড ক্রশের সাহায্য কল্লে এক আকর্ষণীয় ক্রিকেট খেলার ব্যবস্থা হয়েছে। এই প্রতিযোগিতায় পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় ও ইংলণ্ডের টেষ্টের অধিনায়ক ডি, আর, জার্ডিন বাছাই সৈন্যদলের পক্ষে অধিনায়কত্ব করবেন এবং প্রতিপক্ষ ভারতীয় একাদশ দলে মার্চ্চেণ্টকে অধিনায়কত্ব করবার ভার অর্পণ করা হয়েছে। কারণ ভারতীয় ক্রিকেট ক্রীড়ামোদীরা সি, কে, নাইডর উপর আর আস্থাবান নন। তাঁর যোগ্যতা কিন্তু সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্বীকার্য্য।

রঞ্জী প্রতিযোগিতার পশ্চিমাংশের ফাইনালে পশ্চিম ভারত রাজ্যদল বোম্বাই দলকে প্রথম ইনিংসের ফলাফলে ১০৮ রাণে পরাজিত করে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে।

বোম্বাই দল ১ম ইঃ ২৫৫ রাণ সংগ্রহ করে, বিজয়ী রাজ্য দল ৩৬৩ রাণ তোলেন। তন্মধ্যে মোদীর ১২৮ রাণ এবং মার্চ্চেণ্টের ৫৫ রাণ বোম্বাই দলের বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পশ্চিম ভারত রাজ্যদলের উমার খাঁর ১৩৬ রাণ এবং পৃথ্বিরাজের ১৭৪ রাণ বিজয়ী দলের জয়লাভে বিশেষ কার্য্যকরী হয়।

রঞ্জী প্রতিযোগিতার দক্ষিণ বিভাগের ফাইনালে মাদ্রাজ দল হায়দ্রাবাদ দলের বিরুদ্ধে আগামী ২৮শে ২৯শে এবং ৩০শে জানুয়ারী তারিখে খেলবেন। বিজয়ী দল উক্ত প্রতিযোগিতায় সেমি ফাইনালে বাঙ্গলা দলের বিপক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করবে।

বাঙ্গলা দলের খেলোয়াড় নির্ব্বাচনের জন্য এবং প্রসিদ্ধ খেলোয়াড়দের অনুশীলনীর জন্য আগামী ২২শে ও ২৩শে জানুয়ারী কলিকাতায় একটি বিশেষ "নির্ব্বাচনী" খেলার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বলা বাহুল্য এবারও কুচবিহারের মহারাজাকে বাঙ্গলা দলের অধিনায়ক নির্ব্বাচিত করা হয়েছে। প্রসিদ্ধ খেলোয়াড় কে, বসু বাঙ্গালী দলকে সমর্থন করে খেলায় যোগদান করবেন না বলে বিবৃতি প্রকাশ করেছিলেন। এ বৎসরের প্রাদেশিক প্রতিযোগিতায় অভিজ্ঞ খেলোয়াড় কে, বসুকে উপেক্ষা করে মহারাজা অব্ কুচবিহারকে বাঙ্গলার অধিনায়ক নির্ব্বাচন করা হয়ে আসছে। অভিজ্ঞতা এবং খেলায় অন্যান্য কথা বিচার করে দেখতে গেলে কে, বসুকে উপেক্ষা প্রদর্শন করার তাৎপর্য্য বুঝা যায় না। কুচবিহারের মহারাজা মাত্র কয়েক বৎসর প্রাদেশিক প্রতিযোগিতায় যোগদানের সৌভাগ্য লাভ করেছেন, সেই অনুপাতে কে, বসু আজ বহু বৎসর উক্ত যোগ্যতা অর্জ্জন করেছেন। তাছাড়া তিনি সর্ব্বভারতীয় দলে স্থান পেয়েছেন। বিলাতে যাত্রা করেছিলেন ভারতীয় দলের পক্ষে এবং উন্নত খেলা দেখান বিলাতে। রাজপুতানার পক্ষে বিলাতে বহুবার শতাধিক রাণ করেও যোগ্যতাকে বিসর্জ্জন দিয়ে যদি অধিনায়ক নির্ব্বাচনে পক্ষপাতিত্ব করা যায় তা' হলে আমাদের বলবার কিছু নেই।

সান্ত্বনার প্রতীক

"হিয়ার টু ইজ্ ভ্যালার" (Here, too, is Valour) বিখ্যাত লেখিকা এলিনর মরডণ্ট-এর একখানি সাম্প্রতিক গ্রন্থ। বিমান আক্রমণের সময় লণ্ডনের অধিবাসীরা যে অদ্ভুত স্থৈর্য ও সাহস দেখিয়েছে, এ বইয়ের গ্রন্থকর্ত্রী তারই একটি চিত্র এঁকেছেন। বিমান আক্রমণের সময় চা লোককে যে ভাবে সান্ত্বনা ও আনন্দ দিয়েছে প্রসঙ্গত গ্রন্থকর্ত্রী তারও উল্লেখ করেছেন। যুদ্ধকালীন অবস্থায় লণ্ডনে চা আজ কতোখানি কাজ করছে নিচের উদ্ধৃতিতে তারই একটি সুন্দর বর্ণনা আছে:

"স্যালভেশন আর্মির একজন স্বেচ্ছা-সেবিকা তাড়াতাড়ি তৈরি করা একটি চায়ের গাড়ি চালিয়ে থাকেন। তিনি আমাকে বলেছেন যে তিনি একদিন দেখতে পান, পাইয়োনিয়ার কর্মীদের একটি মস্তবড়ো দল একটা বোমায় গর্ত ভরাট করার জন্য ভীষণ খাটছে। সেই দলের মধ্যে গর্তের কিনারায় ছিলো অসংখ্য ছোটো ছোটো ছেলে। তারাও ছোট্টো কোদাল শাবল বালতি আর ঝাঁটা নিয়ে কাজে লেগেছিলো। ইংলণ্ডের জন্য সাধ্যমতো তারাও খাটছিলো।

"বালতি ভর্তি গরম চা নিয়ে চায়ের গাড়ি সেখানে পৌছুবার সঙ্গে সঙ্গেই সার্জেণ্ট এর হুকুম হোলো 'সবাই সার বেঁধে দাঁড়াও। অমনি দেখা গেল সবাই শাবল কোদাল রেখে সার বেঁধে দাঁড়িয়েছে। তাদেরই পিছনে অদম্য উৎসাহী ছোকরার দলও সৈন্যদের চেয়েও সুশৃঙ্খলভাবে তাদের শাবল আর ঝাটা কাঁধে নিয়ে দাঁড়িয়ে গেলো। তাদেরও যথানিয়মেই চা দেওয়া হোলো।

"আর একদিন রাত্রে সত্যিই সংঘাতিক রকমের বোমা পড়লো। সারা রাতই আমরা প্রতীক্ষা করে বসে রইলাম কখন আমাদের ডাক পড়ে। টেলিফোনটা সেদিন কোনোরকমে খারাপ হয়ে গিয়েছিলো। কাজেই সাতটার আগে চা আর স্যাণ্ডউইচের জন্য ডাক এসে পৌছালো না।

"তখনো অন্ধকার কাটেনি। তাড়াতাড়ি জল গরম করে নিয়ে স্যাণ্ডউইচের রুটির স্তুপ তৈরি করে আধমাইল খানেক দূরের এক রাস্তার দিকে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। সেখানে গিয়ে দেখি কতো যে বাড়ী আর দোকান গুঁড়ো হয়ে গেছে তার ইয়ত্তা নেই। আর সেই ধ্বংসস্তুপে চাপা পড়ে লোকও মরেছে অসংখ্য। দেখেই আমাদের মনে হোলো আমরা বড় দেরি করে এসেছি। তা ছাড়া পুলিশের লোক আগুন নেভাবার দল আর ধ্বংস-অপসারণের দলের লোকেরা সবাই আমাদের অনুযোগ দিলে, আমরা ভাবছিলাম 'আপনারা আর বুঝি এলেন না। কিন্তু দেখলাম যদিও আমাদের দেরী হয়ে গেছে, তবুও আমাদের করবার কাজ তখনো অনেক। তখনও পুরোদমে কাজ চলছিলো, তখনও চলছিলো নলের মুখে জল ছিটানো; এই কর্মীদের মধ্যে শত শত পেয়ালা চা আমরা বিতরণ করলাম॥"

নাটমণ্ডপ

—অভিমন্যু

শহর থেকে দূরে—

ইষ্টার্ণ টকীজের "শহর থেকে দূরে" প্রত্যহই পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে চলিতেছে। ছবিখানি সগৌরবে পঞ্চম সপ্তাহে পড়িল।

বিপর্য্যয়—

শৈলজানন্দের রচিত ও পরিচালিত কালীফিল্মসএর 'বিপর্য্যয়ের' স্যুটিং এই মাসের শেষ সপ্তাহে আরম্ভ হইবে।

প্রতিকার—

নিউ সেঞ্চুরী প্রোডাকসন্সের বিজ্ঞাপিত "ভেদাভেদ" ছবিখানির নাম হইল "প্রতিকার"। ছবিখানির পরিচালক ছবি বিশ্বাস। এবং গল্পাংশ লিখিয়াছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। বর্ত্তমানে পূর্ণোদ্যমে ছবির স্যুটিং চলিতেছে।

ছদ্মবেশী—

উত্তরা, পূরবী ও পূর্ণ চিত্রগৃহে সদ্যমুক্ত চিত্র ছদ্মবেশী সগৌরবে চলিতেছে।

নিউ থিয়েটার্স—

বিমল রায়ের পরিচালনায় "উদয়ের পথে" ও সুবোধ মিত্রের পরিচালনায় 'দুই পুরুষ' পূর্ণোদ্যমে চলিতেছে।

রঙ্গ সিনেমায়—

প্রকাশের 'রামরাজ্য' গণেশ টকীজে, মিনার্ভার "পৃথিবল্লভ" মিনার্ভায়; পাঞ্চোলীর 'পুঁজি' সেণ্ট্রাল সিনেমায়, ইন্দ্রপুরীর 'দেবর' চিত্রায় রূপশ্রীর 'দম্পতি' শ্রী সিনেমায় চলিতেছে।

তাসের দেশ

এলিট সিনেমায় প্রদর্শিত রবীন্দ্রনাথের "তাসের দেশ" এবং ক্ষিতীশ রায়ের "বধু-বরণ" দেখিলাম। 'বধুবরণে'র আবহ-সঙ্গীতগুলি মোটেই সুখশ্রাব্য নয়। কেলু নায়ারের ও সরস্বতী শাস্ত্রীর নৃত্য ভালই। 'তাসের দেশের' অভিনয় সাধারণ শ্রেণীর। সংযুক্তা সেনের হরতনী ভাল লাগিল। সূর্য্য রায়ের সজ্জা-পরিকল্পনা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর এবং অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সত্যই তাসের দেশের মানুষ বলিয়া মনে হইতেছিল।

নানাকথা

গিরিশ সঙ্ঘ—

গত ২রা মাঘ ৭1১ এ মোহন লাল ষ্ট্রীটে উক্ত সঙ্ঘের দ্বাবিংশ বার্ষিক অধিবেশন শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যভূষনের সভাপতিত্বে সম্পন্ন হয়। সভায় বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

হেমলতাদেবী সম্বর্দ্ধনা—

গত ২৯শে পৌষ শুক্রবার মহাবোধী সোসাইটী হলে বিচারপতি শ্রীযুক্ত চারু চন্দ্র বিশ্বাসের সভাপতিত্বে সাহিত্য ও সমাজ সেবিকা শ্রীমতী হেমলতাদেবীর সপ্ততিতম বার্ষিক জন্মতিথি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন এবং মহামহোপাধ্যায় দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ মঙ্গলাচরণ করেন। বহু প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক ও সভাপতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেন এবং নানাবিধ সঙ্গীত প্রভৃতির পর সভা ভঙ্গ হয়।

শরৎ স্মৃতিসভা—

গত ৪ঠা মাঘ কবিশেখর কালিদাস রায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে ৬নং ক্রাউচ হলে শরৎ স্মৃতি বার্ষিকী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

গত ২রা মাঘ ব্যাটরা পরিজ্ঞাত সমাজের উদ্যোগে শরৎ স্মৃতিসভা অনুষ্ঠিত হয়।

শিশিরকুমারের ত্রয়স্ত্রিংশ মৃত্যুবার্ষিকী—

বিগত সোমবার ১০ই জানুয়ারী সিঁথি বৈষ্ণব সম্মিলনীর উদ্যোগে, ২৫ বাগবাজার ষ্ট্রীটে শতংজীব বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমৎ রসিক মোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সভাপতিত্বে মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষের ত্রয়স্ত্রিংশ মৃত্যু বার্ষিকী অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। দীপালীর প্রধান সম্পাদক সুকবি বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় কবিরত্নাকর একটি সারগর্ভ বক্তৃতা দেন। শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীকিশোরীমোহন গুপ্ত এম, এ, কাব্যতীর্থ ও ডাঃ শ্রীসরসীলাল সরকার মহাত্মা শিশির কুমারের বহুমুখী গুণাবলীর বিস্তৃত আলোচনা করেন। সভাপতি মহাশয় সহকর্ম্মী মহাত্মা শিশির কুমারের সেবা ধর্ম্মের আলোচনা করেন।

অল বেঙ্গল কালচারাল্ এসোসিয়েশন্—

গত ১০ই জানুয়ারী সোমবার নলডাঙ্গার কুমার পন্নগভূষণ দেব রায় মহাশয়ের ৪১ পরাশর রোডস্থ ভবনে শ্রীযুক্ত পঙ্কজকুমার মল্লিকের সভাপতিত্বে বালীগঞ্জের পূর্ণিমা সম্মিলনীর উদ্যোগে অল বেঙ্গল কালচারাল এসোসিয়েসনের প্রথম অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভায় নাটোরের মহারাজকুমার ইন্দ্রজিৎ রায়, কুমার পিনাক ভূষণ দেব রায়, মিঃ পি ঘোষাল, শ্রীযুক্ত অজিত কুমার হালদার, সরোজ বন্দোপাধ্যায়, ইন্দু মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত পঙ্কজ মল্লিক, বিমলভূষণ, সমর গুপ্ত, শৈলেশ ভড়, প্রভাত মুখোপাধ্যায় ও কুমারী রাজী মহাদেবের গান, কুমারী রত্না মহাদেবের সেতার ও হাস্যরসিক রমণী ঘোষালের কৌতুক কথা সমবেত ভদ্রমণ্ডলীকে তৃপ্তি দান করে।

শরৎ-স্মৃতি-তর্পণ রবিবাসরে ষষ্ঠবার্ষিক অনুষ্ঠান

গত ২রা মাঘ রবিবার অপরাহ্নে কলিকাতায় মহানির্ব্বাণ রোডে শ্রীযুক্ত মৃণাল কান্তি ঘোষের সভাপতিত্বে রবি-বাসর কর্ত্তৃক স্বগত শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ষষ্ঠ মৃত্যু-বার্ষিকী অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মিত্র কর্ত্তৃক উদ্বোধন সঙ্গীতের পর সভায় উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী নিজ নিজ ভাষণে তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেন।

শুভ বিবাহ—

মৈমনসিংহের মহারাজ বাহাদুর শশী কান্ত আচার্য্য মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান স্নেহাংশুর সহিত ঔপন্যাসিক সৌরীন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী সুপ্রিয়ার শুভ বিবাহ গত ৩রা মাঘ সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। আমরা নব দম্পতির দীর্ঘায়ু কামনা করি।

জে, বি, পি, এস,

জে, বি,পি, এস-এর উদ্যোগে কথাশিল্পী প্রবোধ সরকারের নূতন পৌরাণিক নাটক 'দময়ন্তী' শীঘ্রই মঞ্চস্থ হইবে। ভূমিকায়:— ধীরাজ ভট্টাচার্য্য, সুশীল রায়, ছায়া দেবী, শ্যাম লাহা, মৃণাল ঘোষ প্রভৃতি দেখা দিবেন। পরিচালনা করিবেন—অনাথ মুখোপাধ্যায়।

প্রাপ্তি স্বীকার—

নিম্ন লিখিত প্রতিষ্ঠানগুলির নিকট হইতে আমরা এই বৎসর দেয়ালপঞ্জী পাইয়াছি। বেঙ্গল সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক, ইণ্ডিয়ান টি মার্কেট এক্সপ্যানসান বোর্ড, বিলিমোরিয়া লালজী, পাবলিসিটি সোসাইটি অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড, মডার্ণ ষ্টেশনার্স এণ্ড প্রিণ্টার্স।

দীপালীর স্বত্বাধিকারী শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত, ১২৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, দীপালী প্রেসে মুদ্রিত দীপালী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

প্রধান সম্পাদক—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় :: সহ: সম্পাদক—শ্রীশ্রীরেন্দ্রমোহন মজুমদার বি. এল.

১৬শ বর্ষ VOL. XVI. } ১৩ই মাঘ ১৩৫০ :: January 27, 1944 { ৪র্থ সংখ্যা No. 4

আলোচনী

মাদ্রাজের ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর লর্ড আরস্কিন বিলাতের ইষ্ট ইণ্ডিয়া এ্যাসোসিয়েসনের সভায় যে বক্তৃতা দিয়াছেন তাহা ভারতের আধুনিক রাষ্ট্রনৈতিক পটভূমিকায় আলোকপাত করিবে। লর্ড আরস্কিন ভারতীয় সমস্যা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ। নূতন শাসনতন্ত্রে গবর্ণর ও মন্ত্রিপরিষদের ক্ষমতার ভাগ বাঁটোয়ারা লইয়া ১৯৩৮ সালে কংগ্রেস ও কর্ত্তৃপক্ষের মধ্যে মতদ্বৈধ দেখা গিয়াছিল। সেই সময় লর্ড আরস্কিনের প্রচেষ্টা এই রাষ্ট্রনৈতিক বিতর্কের সমাধানে অনেকখানি সাহায্য করে। উল্লিখিত ইষ্ট ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েসনের সভায় ইনি বলিয়াছেন ভবিষ্যতের দীর্ঘকাল ধরিয়া প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলির উপর একটি ক্ষমতাবান কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের প্রয়োজন হইবে। কোন কারণে ভারতীয় গবর্ণমেণ্টের কোন একটি অংশ অচল হইয়া গেলে এই কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টকে সম্পূর্ণ ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া ইহাকে সচল রাখিতে হইবে।

• * * •

শাসকের অভিজ্ঞতা হইতে তিনি বলিয়াছেন, গবর্ণর এবং মন্ত্রীপরিষদের মধ্যে এমন কোন চুক্তি হয় নাই যদ্দারা গবর্ণর হিসাবে বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগের বাধা হইতে পারে। প্রয়োজন হইলে গবর্ণর তাঁহার ক্ষমতার তূণ হইতে বাছা বাছা অস্ত্র প্রয়োগ করিতে পারেন, কোন প্রকার স্বাক্ষরিত চুক্তি বা ভদ্রলোকের কথা (Gentleman's agreement) এক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করিতে পারে না। ইহাই লর্ড আরস্কিনের বক্তৃতার মর্ম্ম। তিনি আরও বলিয়াছেন, একটি বিশেষ ক্ষেত্রে (অবশ্য ক্ষেত্রটি কি তিনি তাহা জানান নাই) এইরূপ ক্ষমতার প্রয়োগ করিয়া তিনি সুফল পাইয়াছিলেন।

* * * *

লর্ড আরস্কিন প্রাচীন ইতিহাসের আবরণ উন্মোচন করিয়া তাঁহার বক্তৃতাকে পরিস্ফুট করিতে চাহিয়াছেন। ভারতের বর্ত্তমান অচল অবস্থার সহিত পঞ্চম শতাব্দীর রোমক সাম্রাজ্যের তুলনা তিনি করিয়াছেন। যতদিন রোমের কেন্দ্রীয় শক্তি অপ্রতিহত ছিল ততদিন সারা রোমক সাম্রাজ্যে একটা নির্ব্বিবাদ অখণ্ডতা দেখা গিয়াছিল। রোমের বিরাট রাষ্ট্রীয় শক্তি তাহার বিরাট সাম্রাজ্যের উপর প্রহরীর মত সজাগ দৃষ্টি মেলিয়া রাখিত। রোমের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই সারা ইউরোপ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। লর্ড আরস্কিন ভারতীয় রাজনৈতিক নেতৃবর্গকে ইতিহাসের এই শিক্ষা গ্রহণ করিতে বলিয়াছেন।

• * * *

প্রফেসার কুপল্যাণ্ড-এর মতবাদ সম্বন্ধে তিনি বলেন, "শুধু ভারতীয় নেতৃবর্গকেই এই অচল সমস্যার সমাধান করিতে হইবে, দায়িত্ব শুধু তাঁহাদেরই, যাঁহারা এই মত পোষণ করেন আমি তাঁহাদের দলভুক্ত নই। বর্ত্তমান সমস্যার সমস্ত দায়িত্ব হইতে নিজেদের দূরে রাখিতে

আমরা পারি না। ভারতীয় সুশাসনের দায়িত্ব পার্লামেণ্টের, বর্ত্তমান অবস্থার জটিলতা দেখিয়া যদি সে দায়িত্ব পালনে আমরা বিমুখ হই তাহা হইলে চরম বিশ্বাসভঙ্গের কাজ হইবে।"

* * *

ভারতের ক্ষেত্রে বিশ্বাসভঙ্গের দৃষ্টান্ত নূতন নয়। শান্তি স্থাপিত হইলে লর্ড আরস্কিন কথিত বহু সদুপদেশের মর্য্যাদা কি ভাবে রক্ষিত হইবে তাহা আমরা পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা হইতে ধরিয়া লইতে পারি। বৃটিশ রাষ্ট্রনীতিক নেতৃবর্গের ঘোষণার মূল্য আমরা সে দিনও দেখিয়াছি স্যার ষ্টাফোর্ডের ব্যর্থতায়। দিল্লীতে আসিয়া বহু নেতৃবর্গের নিকট তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, এক রহস্যময় কারণে পরিশেষে তাহা তিনি অস্বীকার করিতে বাধ্য হন। বড়লাটের executive councilকে সত্যকারের জাতীয় cabinet এ পরিণত করিবার পরিকল্পনা প্রথমে তাঁহার ছিল। এই কথাই তিনি ব্যক্তিগতভাবে বহু ভারতীয় রাজনীতিকের নিকট ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার এই আশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া কংগ্রেস-ক্রীপস্ আলোচনা বহুদূর অগ্রসরও হইয়াছিল। শেষ পর্য্যন্ত কাহার অঙ্গুলি নির্দ্দেশে সমস্ত আলাপ আলোচনা ও আয়োজন এক মুহূর্ত্তে মিথ্যা হইয়া গেল তাহা আজও বহু রাষ্ট্রনীতিক দর্শকের নিকট দুর্ব্বোধ্য রহিয়া গিয়াছে।

* * *

সে দিন সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় এ সন্দেহ ব্যক্ত হইয়াছিল যে, স্যার ষ্টাফোর্ডের ভারতে আগমন ও নিষ্ক্রমণের রহস্য হইতেছে সারা সভ্য পৃথিবীকে ভারতের অনগ্রসর অবস্থার কথা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া। ভারতের অনৈক্য, কংগ্রেসের অনমনীয় মনোভাব ও তাহার হিন্দুপ্রাধান্য প্রভৃতি বহু অজুহাতে স্যার ষ্টাফোর্ডের ব্যর্থতা সে দিন ঘোষিত হইয়াছিল। কিন্তু কেহ কেহ মনে করিয়াছিলেন সমস্ত ব্যাপারটাই নাটকীয়। এই ঘটনাকে সাম্রাজ্যবাদী প্রচারকার্য্যের বিষয়বস্তু করিয়া তোলার ব্যবস্থা পূর্ব্ব হইতেই ছিল। সেই প্রচারকার্য্য আজও চলিতেছে। সেইজন্য মনে হইতেছে লর্ড আরস্কিন প্রভৃতি রাষ্ট্রনীতিকের সদিচ্ছার যে মূল্যই থাকুক না কেন, ভারত সম্পর্কে বৃটেনের ব্যবহারিক কূটনীতিক সম্পর্কের আজও পরিবর্ত্তন হয় নাই।

* * *

এ সপ্তাহের উল্লেখযোগ্য সংবাদ বিলাতের "নিউস ক্রনিকল"এ প্রকাশিত উক্ত পত্রিকার নয়া দিল্লীর সংবাদদাতার রিপোর্ট। ১৯৪৪ সালে পুনরায় ভারতে ভীষণতর দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব হইতে পারে সংবাদদাতা এই আশঙ্কা ব্যক্ত করিয়াছেন। বর্ত্তমান বাংলা সরকারের অযোগ্যতা ও উপযুক্ত ব্যবস্থা প্রয়োগে অক্ষমতা এই অবস্থার সৃষ্টি করিবে এই কথা বলা হইয়াছে। রিপোর্টে বাংলা সরকারের বিরুদ্ধে যে সকল গুরুতর অভিযোগ করা হইয়াছে, তাহার প্রত্যুত্তরে সরকারী মহল হইতে বিবৃতিও প্রকাশিত হইয়াছে। জনসাধারণকে যুক্তি দিয়া বুঝাইবার মত বস্তু এ বিবৃতিতে নাই। অস্বীকারের অহমিকা শুধু সর্ব্বত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। আজও অবস্থার এমন কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই যাহা দ্বারা জনসাধারণ সহজেই আস্থা ফিরিয়া পাইতে পারে। বাংলার জীবনযাত্রা পূর্ব্বের মতই খঞ্জগতিতে চলিয়াছে। এ চলার মূল্য কতটুকু তাহাও আমরা জানি না। বাংলার অন্তরের ক্ষত অত্যন্ত গভীরে পৌছিয়াছে বলিয়াই আজ তাহার প্রগলভ মুখরতা স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। আপাতগোচর এই প্রশান্তি যদি গবর্ণমেণ্টের কোথাও শৈথিল্য ও নিশ্চিন্ততার সৃষ্টি করে তাহা হইলে বর্ত্তমান বৎসরে আমাদিগকে গভীরতর পঙ্কে নামিতে হইবে। সমালোচনাকে যাহারা প্রচারকার্য্য বলিয়া মনে করিতেছেন তাঁহাদিগের নিকট হইতে এই বিপদ আসিতে পারে বলিয়া আজ অনেকে আশঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছেন।

জীবন-সঙ্গীত

(বড় গল্প)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রীশচীন্দ্রনাথ মিত্র

সঞ্চারী
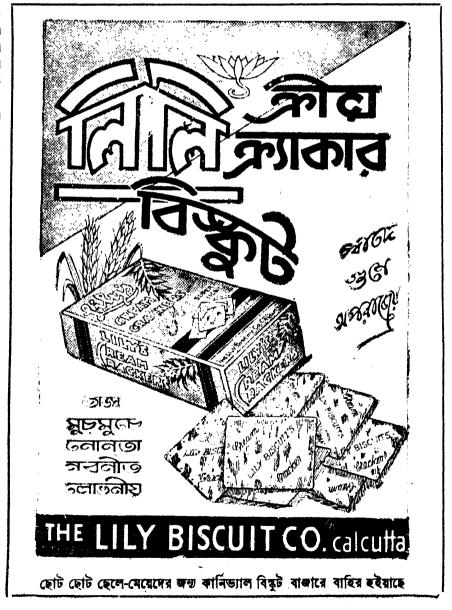
ভাড়াটে আসার গোলমালে রমার খেতে বসতে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল। রাধেশের খাওয়া হয়ে যাবার পর, তার পাতে নিজেই ভাত বেড়ে নিয়ে সে খেতে বসল। এমন সময়ে কচু পাতায় মুড়ে কয়েক টুকরো কাঁচা মাছ হাতে করে পাশের বাড়ীর উকীল গিন্নী এসে রান্নাঘরের দাওয়ায় উঠলেন। ইনি নিঃসন্তান। সুদীর্ঘ তের বছরের পরিচয়ের ঘনিষ্টতাসূত্রে রাধেশ ও রমাকে ইনি ঠিক নিজের গর্ভের ছেলে মেয়ের মতোই স্নেহ করতেন। তাই এত বেলায় রমাকে খেতে বসতে দেখে, বিরক্ত হয়ে বললেন: তোর হলো কী বল্‌তো রমা, এত বেলায় খেতে বসেছিস? সে হতভাগাটার এতক্ষণে বুঝি বাড়ীর কথা মনে পড়ল?

রমার উত্তর দেবার পূর্ব্বেই শোবার ঘর থেকে একছুটে উঠোনটুকু পার হয়ে রাধেশ এসে রান্নাঘরে ঢুকল। সে ও-ঘর থেকেই উকীল গিন্নীর ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছিল, বলল: সত্যি বলছি মাসীমা, আমার জন্যে নয়। আজ সকালে সেই চেঞ্জার ভদ্রলোকটি এলেন কিনা—

—ওঃ ওরা সব আজ এল বুঝি। নে তাড়াতাড়ি খেয়ে নে রমা! তুই উঠলে ওদের মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করতে যাব।

রাধেশ হেসে বলল: সে গুড়ে বালী! ভদ্রলোক একা এসেছেন। কিন্তু তোমার মেয়ের কাণ্ড শুনেছ তো? আজ সকালে—

—আঃ—ঘোমটার ভেতর থেকে ভ্রূভঙ্গী করে ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে রমা রাধেশের দিকে তাকাল। পরে চাপা স্বরে বলল: তুমি শোওগে যাওনা! এখানে কী করতে এসেছ?

একটা ঢোক গিলে, অপ্রস্তুত হয়ে রাধেশ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মাসীমা তখন রমার দিকে চেয়ে বললেন: এ কেমন ধারা চেঞ্জার রে? বাউণ্ডুলে নাকি?

তাচ্ছিল্যভরে ওষ্ঠ কুঞ্চিত করে রমা আহারে মনোনিবেশ করল, কোন উত্তর দিল না।

মাসীমা আবার কী বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময়ে মাথায় তেল ঘষতে ঘষতে রুদ্রকান্তের ভৃত্য রামহরি সেখানে এসে উপস্থিত হল।

রমা সপ্রশ্নদৃষ্টিতে তার দিকে তাকাতেই সে বলল: মা ঠান্ 'তোঙ্গার' দড়ি বালতীটা একবার নোব? "আঙ্গার" তো কুঁয়ার কথা মনেই ছ্যাল না, তাই আনাও হয়নি—

রমা বলল: বেশ তো, নাও না।

মাসীমা এতক্ষণ বিস্মিত দৃষ্টিতে রামহরিকে নিরীক্ষণ করছিলেন, বললেন: তুমি বুঝি বাছা ওই চেঞ্জার বাবুর চাকর?

—আজ্ঞে হেঁ মা ঠান।

—তা তোমাদের মেয়েরা কেউ এল না যে? তারা কবে আসবে?

বিরস মুখে মাথা নেড়ে রামহরি বলল: আর মা ঠান! বাবুর কি তিন কুলে কেউ আছেন, যে আসবেন!

মাসীমা বিস্মিত হয়ে বললেন: ওমা, সেকি গো? তোমাদের সংসারে মেয়েছেলে কেউ নেই? তোমার বাবুর বউও নেই?

—আর বৌ! তিনি থাকলে কি আর বাবুর এই অবস্থা হয়! তেনার জন্যেই তো বাবুর আজ এই অবস্থা!

এই বলে বিরস মুখে রামহরি দাওয়ার একধারে উঠে বসল। বেচারা পল্লীগ্রামের লোক, স্বভাবতই একটু বেশী গল্পপ্রিয়। মাসীমাকে কৌতূহলান্বিতা দেখে সে চেপে বসল।

—তোমার বাবুর স্ত্রী বুঝি মারা গেছেন? আহা…

—কে জানে মা! বোধ হয় মরেই গেছে—এই পর্য্যন্ত বলেই সে কেমন যেন সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল এবং তাড়াতাড়ি দাওয়া থেকে নেমে পড়ে, দড়ি বালতী না নিয়েই প্রস্থানোদ্যত হল। কিন্তু তার কথার ভাবে মাসীমা কী যেন একটা রহস্যের আভাষ পেলেন, ব্যস্ত হয়ে তাকে ডেকে বললেন: আহা, যাচ্ছ কোথায়, শোনই না—

ডাক শুনে রামহরি বিব্রতভাবে উঠোনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ল। মাসীমা আবার তাকে ডাকলেন। তখন ঈষৎ ইতস্ততঃ করে রামহরি আবার দাওয়ার ওপর উঠে বসল।

—কী ব্যাপার বলতো বাছা? বৌটি মারা গেছে বলছ, অথচ…

রামহরি কী বলতে যাচ্ছিল কিন্তু বাধা পড়ল। রমা অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বলল: আমাদের ওসব কথায় দরকার কী মাসিমা! না রামহরি, তুমি যাও।

—তুই থাম—এক দমকে মাসীমা রমাকে ঠাণ্ডা করে দিলেন। পরে রামহরিকে বললেন: হ্যাঁ কী হয়েছিল বলতো বাছা?

রামহরি তখন খাশ পল্লীগ্রামের মেয়েদের মতো চোখদুটি বড় বড় করে, সচকিত ভাবে এদিক ওদিক চাইতে চাইতে একটু চাপা গলায় বলল: সে মা অনেক কথা। "আঙ্গার" বাবু মস্ত জমিদার ঘরের "ছাবাল"; বিয়েও করেছ্যাল উনি অমনি এক জমিদারের মেয়েকে। আহা তেনার নাম ছিল "লক্ষি", রূপও "ছ্যাল" নাকি "মা লক্ষির" মতো।
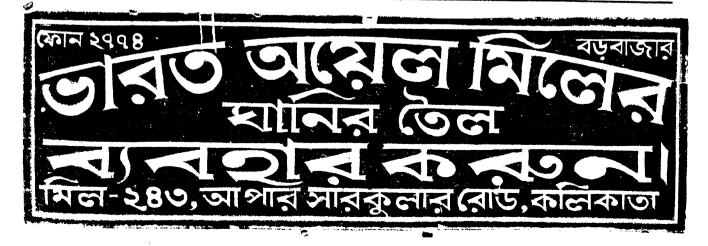
কিন্তু শাউড়ী মাগী তারে সহ্য করতে পারলেক নি, দু বেলা তার চোখের জল ফ্যালাতে লাগল। বউটা বোধ হয় বাঁজা ছ্যাল, বিয়ের দু' বছরের মধ্যে ছেলে হলুনি বলে, মাগীর সে কী হেনেস্তা! শেষে একদিন তাকে একটা পিঁড়ে ছুঁড়ে মারলে, বউটার মাথা ফেটে গেল।

—আহা হা, তা তোমার বাবু কিছু বলতো না?

—বাবু যে বড্ড "মাতিভক্ত" ছ্যাল গো। তাছাড়া বাবু তো তখন কলকাতায় থেকে 'নেকা-পড়া' করতো, ফী শনিবার বাড়ী আসতো। তেনার···

বাধা দিয়ে মাসীমা বললেন: তারপর?

—তারপর? তারপর একদিন বউটার বাপ এসে মেয়েকে নিজের "ঠেঁয়ে" নিয়ে গেল, বলে গেল আর পাঠাবেক নি—'

—তারপর?

—তারপর বছর খানেক পরে খবর এল, বাপ মার সঙ্গে ছিক্ষেত্তর দর্শন করতে গিয়ে মেয়েটা সাগরে ডুবে মরেছে।

—আহা-হা, তবে যে তুমি বললে, মরেছে কি না কে জানে?

মাথা নেড়ে ফিস্ ফিস্ করে রামহরি বললে: সেই কথাই তো বলছিনু গো। "আঙ্গার" বাবুর কাছে তো ওই খবর এল কিন্তু গাঁয়ের লোক অন্য কথা বলে যে!

—কী বলে?

—সে মা অনেক কথা! বৌটার ভাই নাকি তাকে কলকাতায় নে' গেছল লেখাপড়া, গান-বাজনা শেখাবার তরে। বছর খানেক পরে খবর এল, বউটা নাকি "অমেশ" ম্যাষ্টরের সঙ্গে পাইলে গেছে।

দারুণ ঘৃণায় চোখ মুখ বিকৃত করে মাসীমা বললেন: ওমা, কী ঘেন্নার কথা, শেষে কিনা একটা মাষ্টারের সঙ্গে বেরিয়ে গেল! ওলো রমা, শুনছিস্? মা গো মা।

—আঙ্গার বাবু কিন্তু ও সব কথা বিশ্বাস করেনা, বড্ড ভালবাসতো কিনা। আহা, সেই থেকে বাবুর আমার অবস্থার সীমে পরিসীমে নেই! শরীর ভাঙ্গতে আরম্ভ করল, শেষে রোগে ধরল। গিন্নী-মা বাবুর আবার বে' দেবার জন্যে কত চেষ্টা চরিত্তির করলে, কিন্তু বাবু কিছুতেই "আজি" হলো নি। অমন পিরতিমের মতো বৌকে কি সহজে কেউ ভুলতে পারে মা!

—তুমি তাকে দেখেছিলে রামহরি? এতক্ষণ পরে রমা কথা কইল।

—না মা, আমি তখন কোথায়? গাঁয়ের লোকের ঠেঁয়ে সব শুনছু কি না! তারা বলে বৌ মরে যাবার পর গিন্নীমা যতদিন বেঁচে ছ্যাল বাবু তেনার সঙ্গে 'বাক্যিলাপ' করেনি! তা শোকটা কি বাবুর কম লেগেছে মা? সেই মাগীর জন্যেই তো বাবুর আজ বংশ লোপ হতে বসেছে।

—বেশ গল্প হলো তো! এবার খাওয়া দাওয়া করগে যাও—এই বলে রমা ভাত ফেলে উঠে দাঁড়াল।

রমা যে অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছে সে কথা বুঝতে মাসীমার একটুও বিলম্ব হলো না। কিন্তু তিনি কিছু বলবার পূর্ব্বেই রামহরি দাওয়া থেকে নেমে দাঁড়িয়ে কপালে করাঘাত করে বলল: আর খাওয়া দাওয়া! বাবুই যখন খাবেন নি, তখন আর—

—তোমার বাবুর এখনও খাওয়া হয়নি?

—সেই কথাই তো বলছিনু গো! সারা সকাল ধরে "আন্না-বান্না" করনু, ডাকতে গিয়ে দেখিনা, বাবু বালিসে মুখ গুঁজে শুয়ে "অয়েছেন", খাবেন নি:—

—'কেন?' রমা বিহ্বলকণ্ঠে প্রশ্ন করল।

—বোধ হয় জ্বর এসেছেন।

রমা বিমূঢ়ভাবে রামহরির দিকে চেয়ে রইল, আর কোন প্রশ্ন করতে সাহস করল না। কিন্তু মাসীমা উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলেন। জিজ্ঞাসা করলেন: সে কি গো বাছা, তোমার বাবুর অসুখ আছে নাকি? কই, সে কথা শুনিনি তো! কী অসুখ?

হতাশভাবে হাত নেড়ে রামহরি বলল: কি জানি মা, কী অসুখ। রোজ বিকেলে চোখ জ্বালা করে জ্বর আসেন, আবার সকালে ছেড়েও যান্।

—ওলো রমা করিছিস্ কী? বিস্ফারিত চক্ষে রমার দিকে চেয়ে মাসীমা বললেন: কাকে বাড়ী ভাড়া দিইছিস্? ও রোগ যে আমি চিনি। হ্যাঁ গো বাছা,—বাবু তোমার কাশে টাশে?

—খু-উ-ব।'

—রক্ত-টক্ত ওঠে?

—কই-না তো।

—আজ ওঠেনি কাল উঠবে। ওলো রমা সর্ব্বনাশ হয়েছে! বিদেয় কর, বিদেয় কর, ওমা আমার কী হবে!

মাসীমার ভাব-ভঙ্গি দেখে রামহরি অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিল। বিশেষতঃ তাঁর কণ্ঠের 'বিদেয় কর' কথাটি তার কানে অত্যন্ত কটু শোনাল। বিস্মিত হয়ে বলল: "কাকে বিদায় করবে গো মা-ঠান্, 'আঙ্গার' বাবুকে?

মাসীমা সে কথার উত্তর না দিয়ে রমার উদ্দেশ্যে তর্জ্জন গর্জ্জন করতে লাগলেন: করিছিস্ কী হতভাগী, ছেলেপুলের বাড়ীতে এ কাকে জায়গা দিইছিস্?

তাঁর চীৎকার ক্রমে চরমে উঠল। রাধেশ ব্যস্ত হয়ে ও ঘর থেকে ছুটে এল, রমাও তাঁকে কী বোঝাবার চেষ্টা করতে লাগল। এমন সময়ে দোতলার ঘর থেকে গম্ভীরস্বরে কে যেন ডাকল: রামহরি—

মাসীমার কাণ্ড দেখে রামহরি এতক্ষণ বিমূঢ়ভাবে তাঁর দিকে চেয়েছিল। হঠাৎ প্রভুর ডাক শুনে সে সভয়ে সেখান থেকে প্রস্থান করল।
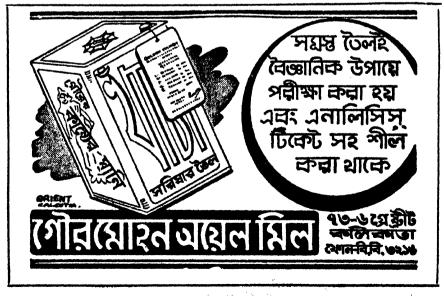
(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

সেযুগ ও এযুগের কথা...

কয়েক বৎসর আগেও আমাদের জন্য কাপড় আসত ইংলণ্ড থেকে। তার আগে কি আমরা তবে কাপড় পরতাম না? তা নয়, আমাদের প্রয়োজনীয় সব কাপড় তৈরী হ'ত এই ভারতেই—তাঁতে। সে শিল্প ছিল এতই বিরাট যে আমরা প্রচুর কাপড় বিদেশেও রপ্তানী ক'রতে পারতাম। কিন্তু যখন থেকে ইংলণ্ডে কলে কাপড় তৈরী হ'তে লা'গল তখন থেকেই এই শিল্পের দুর্দিন উপস্থিত হ'ল। একদিকে রাজশক্তির স্নেহপুষ্ট কাপড়ের কল, অন্যদিকে সেই রাজশক্তিরই আমাদের শিল্প-বানিজ্যের ধ্বংসকামনা; এই দুই চাপে প'ড়ে আমাদের অসহায় তাঁতশিল্প বিলুপ্ত হ'ল। ফলে লক্ষ লক্ষ তাঁতী বৃত্তিহীন হ'য়ে কৃষিকেই জীবিকা ব'লে অবলম্বন ক'রল; আর তাদের পরিশ্রমের ফল ভোগ করতে লা'গল তাঁরাই যারা দায়ী তাদের দুর্দশার জন্য। তবে সৌভাগ্যের কথা যে এই দুঃখের দিনের শিক্ষা আমরা ভুলি নাই, আমরা বুঝেছি যে যন্ত্রশক্তির সামনে আত্মরক্ষা করতে চাই যন্ত্রশক্তি। তাই স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম সুফল হ'ল যন্ত্রচালিত বস্ত্রশিল্প, ভারতবাসীর অর্থে ও শ্রমে যার প্রতিষ্ঠা, ভারতবাসীর স্বদেশপ্রেমে যার প্রচলন। আজ লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী এই শিল্পের কল্যাণে সুখী, উন্নত জীবন যাপন ক'রছে—আর আমাদের বস্ত্র সমস্যা চিরকালের জন্য মিটে গেছে। আজ আমরা অপেক্ষা ক'রছি সেই শুভদিনের, যুদ্ধান্তে যেদিন আমাদের উৎপাদিত বস্ত্র আমাদের প্রতিবেশী আরব, পারস্য, মালয়, চীন পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি রাষ্ট্রে পাঠাতে পা'রব। জাতীয় শিল্প বানিজ্যের এই উন্নতিতে বাংলাদেশের অংশও কিছু কম নয়। তার উন্নততম যন্ত্রসজ্জায় সজ্জিত এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট কাপড় ও সূতা তৈরীর বৃহত্তম কলটি হচ্ছে—

প্রতিষ্ঠাতা ও ম্যানেজিং ডাইরেক্টর— শ্রী সূর্য্য কুমার বসু।

খেলার মাঠে

—শ্রীউমেশ মল্লিক

আগত ২৯শে, ৩০শে এবং ৩১শে জানুয়ারী মেয়রের সাহায্য-ভাণ্ডারের উপলক্ষে কলিকাতায় মোহনবাগান মাঠে ভারতীয় বিশিষ্ট খেলোয়াড়দের নিয়ে একটি প্রদর্শনী খেলার ব্যবস্থা হয়েছে। লেঃ কঃ সি, কে, নাইডু এ অনুষ্ঠানে এক দলের অধিনায়কত্ব করবেন। এঁদের বিপক্ষ দলে মহারাজা অব্ কুচবিহারকে নেতৃত্ব করতে দেখা যাবে। উদ্দেশ্যটিকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলবার জন্য উদ্যোগীরা যে সমস্ত ভারতের বিশিষ্ট খেলোয়াড়দের অনুরোধ করেছেন এবং যারা যোগদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে ভি এস হাজারী, মুস্তাক আলী, সি, এস, নাইডু, জগদল, অধিকারী, কিষণ চাঁদ, রামপ্রকাশ প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মোহনবাগানের পরিবর্ত্তে ইডেন গার্ডেনে খেলার ব্যবস্থা করলে অর্থাগমের দিক দিয়ে বোধহয় সুবিধা হবে।

•

রেডক্রশের সাহায্যের জন্য বোম্বাই সহরে বৈদেশিক পেশাদার ফুটবল খেলোয়াড় বনাম বোম্বাই একাদশের ফুটবল খেলার ব্যবস্থা পশ্চিম ভারতীয় ফুটবল এসোসিয়েশনের তত্বাবধানে আগত ২৬শে কুপারেজ মাঠে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। অর্থাগমের দিক দিয়ে উদ্যোক্তারা যে বিশেষ লাভবান হবেন তা আমরা নিঃসংশয়ে বলতে পারি। কারণ বিলাতী বহু বিশিষ্ট পেশাদার খেলোয়াড় রাজকীয় বিমানবাহিনীতে যোগদান করে বর্ত্তমানে ভারতে উপস্থিত হয়েছেন। বোম্বাই একাদশ দলের খেলোয়াড় সুনির্ব্বাচিত হলে খেলাটি খুবই আকর্ষণীয় হবে বলে মনে হয়।

•

একাদশ নিঃ ভাঃ অলিম্পিক প্রতিযোগিতা এবৎসর পাতিয়ালায় আগত ১০ই, ১১ই এবং ১২ই ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত হবে। বাঙ্গালা দেশের পক্ষ সমর্থন করে বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিযোগী নির্ব্বাচন আগামী ২৬শে, ২৭শে, ২৮শে এবং ২৯শে জানুয়ারী ক্যালকাটা ফুটবল গ্রাউণ্ডে আরম্ভ হবে। কুস্তিতে এ বৎসরের প্রতিদ্বন্দ্বীর সংখ্যা ৫০-এরও অধিক। তন্মধ্যে তিনজন ভারতবিজয়ী মল্লযোদ্ধাকে দেখা যাবে।

*

পশ্চিম ভারত লনটেনিস টুর্ণামেণ্ট এবৎসর স্থগিত রাখা হল। আর একটি প্রতিযোগিতামূলক টুর্ণামেণ্ট এ বৎসরে খেলান হল না।

*

বেসরকারী নিখিল ভারত মুষ্টিযুদ্ধে শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিদ্বন্দ্বীতা লাহোরে ২৯শে জানুয়ারী অনুষ্ঠিত হবে। এই গুরুত্বপূর্ণ সৌখীন মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতাটি ইতিপূর্ব্বে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য বার্ট ইনষ্টিটিউট সকলেরই ধন্যবাদার্হ। বাঙ্গালী কয়েকটি মুষ্টিযোদ্ধা সম্প্রতি যোগদানেচ্ছু হয়ে লাহোর যাত্রা করেছেন। আশা করি বাঙ্গালীদল বাংলার মুখ উজ্জ্বল করে প্রত্যাগমন করবেন। মুষ্টিযুদ্ধে বাঙ্গালীর কৃতিত্ব বড় একটা প্রদর্শিত হয় না।

*

প্রাদেশিক ভার উত্তোলন প্রতিযোগিতায় এবৎসর কয়েকটি নূতন রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে। সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বার্ড-এর উত্তোলন। কর্পোরাল বার্ড তিন প্রকার পদ্ধতিতেই ১৯৪২ সালের নিঃ ভাঃ অলিম্পিকের রেকর্ড

এই দেশেরই মেয়ে

—শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

১৫৬৮ সাল।

সম্রাট আকবরের মোগল বাহিনী চিতোর আক্রমণ করেছে, রাণা জয়মল্ল নিহত হয়েছেন, রাজপুতবাহিনীর নেতৃত্ব নিয়েছেন ষোল বছরের ছেলে পুত্ত।

ষোল বছরের ছেলের সামনে মোগল সেনা ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে, তাদের জয়ী করতে হলে পুত্তকে কৌশলে আঘাত করতে হবে। সম্রাট আকবর অর্দ্ধেক সেনা নিয়ে পিছন দিক থেকে পুত্তকে আক্রমণ করার জন্য অগ্রসর হলেন।

রাণী কর্মদেবী আর চুপ করে থাকতে পারলেন না, বর্ম এঁটে ঘোড়ার পিঠে বেরিয়ে পড়লেন, সঙ্গে চললেন মেয়ে কর্ণবতী আর পুত্রবধূ কমলাবতী।

সঙ্কীর্ণ গিরিসঙ্কট দিয়ে আকবরের বাহিনী অগ্রসর হচ্ছিল, সহসা তাদের গতিরোধ হোল, গুলিতে গুলিতে মোগল সেনা ত্রস্ত হয়ে উঠলো।

তিনটী মহিলা বিরাট মোগল বাহিনীর গতিরোধ করলো।

আকবর বিস্মিত হলেন। ঘোষণা করলেন—এই তিনটি মহিলাকে জীবিত অবস্থায় ধরতে হবে, যে ধরবে তাকে দেওয়া হবে প্রচুর পুরস্কার।

কিন্তু ধরবে কে, তাদের কাছে অগ্রসর হয় সাহস কার!

ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে লড়াই চললো—উন্মত্ত, ক্ষিপ্ত, মৃত্যুপাগল মোগল সেনার সামনে তিনজন রাজপুত মহিলা।

কর্ণবতী লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে।

কমলা দেবী গুলি খেয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গেলেন।

কর্মদেবী অচঞ্চল।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে, এমন সময়ে একদিকের যুদ্ধ জয় করে পুত্ত ফিরলো। রক্তাপ্লুত ছেলের পানে তাকিয়ে মা বললেন, শোকের অবসর নেই, যারা গেল তারা যাক, আমিও চললাম। মাতৃভূমির শত্রুকে আগে শেষ কর—

কর্মদেবী আহত হয়েছিলেন, এবার তিনি ঘোড়া থেকে পড়ে গেলেন। ছেলেকে শেষ আদেশ জানাবার জন্যই বুঝি তিনি এতক্ষণ বেঁচে ছিলেন।

পুত্ত একবার তাকালেন মায়ের পানে, বোনের পানে, স্ত্রীর পানে। রাজপুতের ছেলে সে, সারাদিনের শ্রান্তি মন থেকে দূর হয়ে গেল।

কর্মদেবী বললেন—রাজপুতের ছেলে তুমি, মাতৃভূমিকে শত্রুমুক্ত না করে ফিরবে না, স্বাধীনতা হারানোর চেয়ে মৃত্যুও শ্রেয়···

মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে পুত্ত আবার শত্রুর মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়লো।—সেই তাঁর শেষ যুদ্ধ!···মা মেয়ে বউ ছেলে সবাই একই সঙ্গে চিতায় উঠলো।

এমনিই ছিল রাজপুত নারীর শিক্ষা, মায়ের এই শিক্ষাই রাজপুত জাতিকে ভারতের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় করে গেছে।

চিঠির থলি

আমার আদুরে ভাই বোনেরা—

তোমাদের লেখা উপন্যাস "এর শেষ কোথায়"-এর দ্বাদশ পরিচ্ছেদ এবারে গেল। পরের অংশটা তাড়াতাড়ি লিখে পাঠিও কিন্তু। কারণ যাঁরা আসরের সভ্য নন, এমন বহু পাঠক পাঠিকার কাছ থেকে চিঠি পাই প্রায়ই, যদি একবার যথাসময়ে ওর একটা অংশ না বার হয় ভালো লেখা পেতে তোমাদের কাছ থেকে দেরী হলে তবে তারা বলেন : মশাই, বীরুর জীবনে এর পরে কি ঘটলো তাই জানবার জন্যে কোন রকমে ধৈর্য্য ধরে আমরা সাতদিন বসে থাকি। কিন্তু তারপর যখন দেখি আপনি চিঠিতে জানিয়েছেন যে এবারে ভালো লেখা না পাওয়ার জন্যে 'এর শেষ কোথায়' গেল না তখন 'দীপালী' খানাকে ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে করে।···অতএব বুঝতেই পারছো তো তোমাদের বীরুকে নিয়ে আমি কি মুস্কিলেই পড়েছি! তাড়াতাড়ি লেখা পাঠিও।···নতুন প্রতিযোগিতা আসছে-বারে নিশ্চয়ই যাবে।···আজ আসি। স্নেহ নিও তোমরা।

তোমাদের : বিজনদা'

অতিক্রম করেছেন। তিনি ইম্পিরিয়্যাল ক্লাবের সভ্য। আসানসোলের জনৈক উত্তোলকও বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তাঁর নিজস্ব সংরক্ষিত ভারতীয় রেকর্ড ভঙ্গ করে। অমূল্যরতন চক্রবর্ত্তী নামীয় বিষ্ণুবাবুর ছাত্রই প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে কেবলমাত্র নিজের পূর্ব্ব উত্তোলনের রেকর্ড থেকে অনেক কম ভার উত্তোলন করেন।

এর শেষ কোথায়......

(আসরের ভাই-বোনেদের লেখা ধারাবাহিক বারোয়ারী উপন্যাস)

(১২)
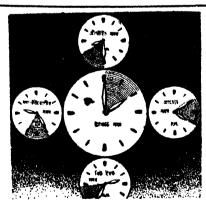
শ্রীশেফালিকা দাস (১০৬২)

...রাণু নামতে ইতস্ততঃ করছে দেখে কল্যাণীদেবী তার কাছে এগিয়ে এসে সস্নেহ হাসিমুখে নিজের হাতে তার হাতখানা ধরে নামাতে নামাতে তিনি স্নিগ্ধকণ্ঠে বললেন: মায়ের কাছে লজ্জা কিসের মা? নেমে এসো।...রাণু নিঃশব্দে নেমে এলো রিক্সা থেকে। বীরুর দেখাদেখি কল্যাণীদেবীর পায়ে প্রণাম করে যখন মাথা তুলে দাঁড়ালো, তখন তার চোখের পাতাদুটি জলে ভিজে গেছে। "মা"...এক অক্ষরের ছোট একটি কথা,—কিন্তু কত আন্তরিকতার মধু যে সঞ্চিত আছে এই ছোট্ট কথাটির মাঝে তা' কে জানে!...খুব ছোটবেলায় রাণুর মা মারা গেছেন, তাঁর কথা রাণুর এখন একটুও মনে পড়ে না,—কিন্তু আজ এই অপরিচিতা মহিলাটির স্পর্শ আর কণ্ঠস্বরের মধ্যে এমন একটা অদ্ভুত মমতার আহ্বান তার জন্য ঝরে পড়লো যে, অকস্মাৎ সেই অনেকদিন আগেকার হারাণো মায়ের কথা মনে পড়ে রাণুর চোখ দুটো জলে ভরে এলো নিজে থেকেই।...তিনি কি এমনিই ছিলেন?...এত সুন্দর!...এমন প্রশান্ত কণ্ঠস্বর!...ঠিক এমনিই মহিমাদীপ্ত চেহারা ছিল কি তাঁর?...কে জানে!!......

ভাবনায় উদাস রাণুর মনটা কোলকাতা সহরের সহস্র কোলাহলের মধ্যে থেকে কয়েক মুহূর্ত্তের জন্যে ছুটে চলে গিয়েছিল অনেক অ—নেক দূরের সেই সোণার গাঁয়ের আঁকা-বাঁকা মেঠো পথের বাঁকে,...স্কুলের ধারের সেই পিয়ারাতলায়,...বৈঁচি আর বাবলার ঝোঁপে...সেই নিজেদের পরিচিত আবাল্যের শান্ত গৃহকোণ,...বাতাবীলেবুর গাছের ফাঁকে "বেনেবউ" পাখীর ছোট্ট বাসাটা,...অবশেষে পিতার মৃত্যু-শয্যার করুণ ব্যথাতুর ছবিটা ধীরে ধীরে তার চিন্তার যবনিকায় ভেসে উঠ্‌লো। তিনি মারা যাবার আগে রাণুর পাণ্ডুর মুখটা বুকের উপর চেপে ধরে বলেছিলেন: তোকে আমি নিঃসম্বল রেখে গেলাম না রাণু—রইলো তোর বীরুদা, আমি জানি তোর ভার সে হাসিমুখে মাথা পেতে নেবে। রাণু সেদিন কেঁদে বলেছিল: বাবা, ক্ষমা করো আমায়—বীরুদার ভারবোঝা হয়ে শান্তির সিংহাসনে বসে থাকার চেয়ে আমি পথের ঝড়-ঝাপ্টার মধ্যেই বড় হতে চাই।...বীরুদার ভার আর আমি বাড়াতে চাইনা বাবা, আমি চাই তার ভার লাঘব করতে। বাবা সেদিন ওর উত্তরে হেসে বলেছিলেন: তাই হবে মা, আজ তোকে আমি কোন নির্দ্দেশ দিয়ে যেতে চাইনা,—তোর সবল সুস্থ মন তোকে যে পথের নির্দ্দেশ দেবে তাই হবে তোর সত্যিকারের পথ। আজ যাবার আগে তোর জন্যে রেখে গেলাম আমার স্কুল, আমার আদর্শ...আর আমার সব কিছুর জন্যে রইলি তুই আর তোর বীরুদা। সে কথা রাণুর আজও স্পষ্ট মনে আছে, চিরদিন থাকবেও...কিন্তু এই যে বীরুদার হাত ধরে সে গ্রামের আশ্রয় ত্যাগ করে সহরের জনসমুদ্রের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছে,...এখানে বীরুদাকে ছাড়া তার পথ কোথায়?...

পথের চিন্তাটা মনে আসার সঙ্গে সঙ্গে রাণু চমকে বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে ফিরে এলো। শুনলো কল্যাণীদেবী বীরুকে উদ্দেশ্য করে বলছেন: চিরকালের প্রথা এই, শুনে আসছি ছেলেরাই চিরকাল মায়ের কাছে আবদার জানিয়ে আসে,—আজ যদি মা হয়ে আমিই তোর কাছে আব্‌দার জানাই বীরু তাহলে সে আব্‌দার তুই কি রাখবি নি?

বীরু ছোট ছেলের মত আনন্দে হেসে উঠে বললে: মায়ের আব্দার যদি খুব বেশী ভারি গোছের কিছু একটা না হয়, তাহলে ছেলে তা রাখতে চেষ্টা করবে বৈকি মা! কিন্তু কি এমন গুরুতর আব্দার বলতে পারো,—যার জন্যে চিরকালের প্রথাটাকে আজ মা বর্জ্জন করে স্বয়ং আব্দার জানাতে এলে আমার দরবারে?···কল্যাণী দেবীও হেসে রাণুকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে নিজের হাতে তার অশ্রুকলঙ্কিত মুখখানা উঁচু করে তুলে ধরে বললেন: সে গুরুতর আব্দার এই যে, আমার এই মেয়েটিকে তোর কাছ থেকে আমি ভিক্ষে চাইছি বীরু,—দিবি আমায়?

বীরু বিস্ময়ের সুরে বাধা দিয়ে বোললো: ভিক্ষে কেন মা? বল দাবী, রাণু তোমার ছেলের বোন, অতএব তোমার মেয়েকে তুমি তো দাবী করবেই।

: না, দাবী করবো না বীরু, এ আমার ভিক্ষা। দাবী দিয়ে পেয়েছিলাম তোকে,—তুই আমার দাবীর সন্তান,···কিন্তু একে পেলাম দাবীর প্রয়োজন মিটে যাবার পর, তাই এ হবে আমার ভিক্ষার অঞ্জলি।··· এই অঞ্জলি দিয়ে দেবী মূর্ত্তিকে গড়ে তোলবার চেষ্টা করবো,—দেখবো মাটির ছাঁচে স্বর্গের দেবী আর মর্ত্ত্যের মানবীর মধ্যে তফাৎ কতটুকু! তাই তোর কাছে আমার ভিক্ষা বীরু—

: কিন্তু ও যে নেহাৎই মেয়ে মা,··· পল্লীগ্রামের মেয়ে মাটির একটা তাল,—ওকে নিয়ে তোমার স্বপ্ন কি সফল হবে?

: স্বপ্ন নয় বলেই তো সফল হবে আমার সাধনা। আমি যে দেবীকে রূপ দোবো সে দেবী তোদের ঐ পাথরের প্রতিমা নয়, সে মানুষের সুখ দুঃখের দেবী, দুঃখীর ব্যথা বেদনার অংশভাগিনী—আর্ত্তের জীবনদায়িনী কল্যাণী নারী।···সে দেবীকে রূপায়িত করতে হোলে পাথুরে মাটির প্রয়োজন নেই বীরু, পল্লীগ্রামের মেয়ে মাটিই তার পক্ষে যথেষ্ট।

বীরু কাছে এসে আর একবার কল্যাণী দেবীর পায়ের ধূলো নিয়ে বললে: তুমি এত ভালো মা বলেই তো তোমার ছেলেরা ভিক্ষে দিতে ভয় পায় না মা—কিন্তু ঐ পোড়ারমুখীকে জিগ্‌গেস করোতো, কোন লজ্জায় ও' এসে আমার আদরে ভাগ বসায়! কল্যাণীদেবী হাসিমুখে ভ্রূভঙ্গী করে বললেন: হিংসুটে ছেলে কোথাকার! বৃহৎ পৃথিবীর সেবা করতে চাস্ অথচ ক্ষুদ্র স্বার্থ নিয়ে এখনও অহঙ্কার করিস?

কিছুমাত্র অপ্রাতিভ না হয়ে বীরু কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে বললে: এইটাই তো স্বাভাবিক মা,—যারা পায় অনেক কিছু, তারাই তো বৃহৎ পৃথিবীর সেবায় অনেকটা খরচ করতে পারে। যে রিক্ত—তার জমা আর খরচের খাতা দুটোই শূন্য, সুতরাং তার দেওয়া আর নেওয়া নিয়ে কোন প্রশ্নই উঠে না। কিন্তু আমরা যা দেবো তার মূলে রয়েছে তোমাদের অকৃত্রিম দান। সে দানের পাত্র পূর্ণ থাকতে আমি দান করতে ভয় পাব না নিশ্চয়! কিন্তু সেই দানের পাত্রটাই যদি তুমি আমার সামনে অপরের হাতে উপুড় করে ঢেলে দাও,···তাহলে হিংসে না করে কি করি বলতে পারো মা?···

মা হাসি লুকোবার জন্যে মুখ ফিরালেন। রাণুর অশ্রুভেজা চোখদুটি আনন্দে ঝিক্‌মিক্ করছিল মাতা-পুত্রের এই কৃত্রিম কলহের অভিনয়ে। সে এতক্ষণ পরে কথা বোললে: আপনার ছেলে কিন্তু ভারী অভদ্র মা, পথে দাঁড়িয়ে মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করতে ওর পৌরুষে বাধে না। কিন্তু আমি বলি যে রিক্সাওয়ালা বেচারী তো গরীব মানুষ, ও যে এখনও দাঁড়িয়ে আছে ভাড়ার অপেক্ষায় সেটা খেয়াল নেই?

বীরু হেসে বললো: এইতো! এতক্ষণে মেঘ কাটল! রিক্সাওয়ালাকে ধন্যবাদ যে তার ভাড়াটা চুকিয়ে দিতে ভুলে গিয়েছিলাম। কল্যাণী দেবী তাঁর কাপড়ের আঁচলটা খুলে পয়সা বার করে রিক্সাওয়ালার ভাড়া চুকিয়ে দিলেন।···বীরু আবার পুরাণো কথার জের টেনে বললে: তোর রাগ দেখে ভয় পাই না বোন, কারণ জানি যে, ঝড়-জল কেটে গেলেই রোদ উঠ্‌বে আবার। কিন্তু ভয় পাই ঐ চুপচাপ মেঘময় অবস্থানকে দেখে,—কারণ তখন বুঝি না যে ঝড় উঠবে, আর তার পরিমাণ কতখানি!···কিন্তু একটা প্রশ্ন আছে বোন্—আমি মায়ের অভদ্র ছেলে, এ অপবাদ না হয় মেনেই নিলাম, কিন্তু তুই ত' ভদ্র মেয়ে, মাকে "আপনি" বলে সম্বোধনটা কোন্ জাতীয় ভদ্রনীতি জানতে পারিকি? কথার শেষে সে হাসতে লাগলো।

রাণু লজ্জায় মুখ ফিরিয়ে নিলো।

মা হেসে ধমক দিয়ে বললেন: তুই থাম বাপু! আয় মা রাণু, আমরা ভেতরে যাই,—ও দুষ্টু ছেলের সঙ্গে ঝগড়া করতে হলে আজকে সারাদিন আমাদের পথেই দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।···মায়া মমতা হৃদয়ের কোমল বৃত্তি বলে ওর কিছু নেই, এমনি ডাকাত ওটা। সস্নেহ হেসে রাণুর হাতটা ধরে তিনি ভেতরে চলে গেলেন।

তাঁর যাওয়ার পথের পানে তাকিয়ে বীরু দু'হাত তুলে বারবার তার ললাট স্পর্শ করলো। এই মহীয়সী নারী যে স্বেচ্ছায় তার হাত থেকে রাণুর ভার গ্রহণ করে তাকে জীবনের পথে বন্ধনহীন করে সম্পূর্ণ মুক্তি দিয়ে গেলেন,—একথা বুঝলো সে মর্ম্মে মর্ম্মে। কিন্তু মহানুভবতার এই যে অসামান্য ঋণ, এ'ঋণ সে শোধ করবে কেমন করে? কি দিয়ে?···

(তারপর?)

নাটমণ্ডপ

—অভিমন্যু

গত ১৮ই জানুয়ারী কালী ফিল্ম ষ্টুডিওতে এম, পি, প্রোডাকসানের প্রেমেন্দ্র মিত্র পরিচালিত "বিদেশিনী"র চিত্রগ্রহণ দর্শনে ত্রিপুরার মাননীয়া মহারাণী আগমন করিয়াছিলেন। ঐ দিন একটি বিমান আক্রমণকালে এ, আর, পি, আশ্রয়স্থলের চিত্রগ্রহণ হইতেছিল এবং উক্ত দৃশ্যে কানন দেবী, ধীরাজ ভট্টাচার্য্য ও কিষণ রায় (বালক অভিনেতা) কে দেখা যায়। ব্যবস্থাপক বিমল ঘোষ ও পরিচালক মহাশয় অভ্যাগত রাজ অতিথিদের বিশেষভাবে আপ্যায়িত করেন।

* * *

নিউ সেঞ্চুরী প্রোডাকশানের "প্রতিকার" পরিচালনা ছাড়াও নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করিতেছেন ছবি বিশ্বাস। অন্যান্য ভূমিকায় পরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলেন চৌধুরী প্রভৃতি অভিনয় করিতেছেন।

* * *

"গরমিল", "সহধর্ম্মিনী" ও "দম্পতি" প্রভৃতির খ্যাতনামা পরিচালক নীরেন লাহিড়ীও কলিকাতা ত্যাগ করিয়া বোম্বাই যাত্রা করিয়াছেন। সেখানকার ভারত প্রোডাকশানের হইয়া তিনি একখানি ছবি তুলিতে চুক্তিবদ্ধ হইয়াছেন। সম্ভবতঃ "গরমিলে"র হিন্দী সংস্করণটিই হইবে তাঁহার প্রথম হিন্দী ছবি। বোম্বায়ে অন্যান্য বাঙালী পরিচালকদের মধ্যে সুধীর সেন, সুশীল মজুমদার, নীতিন বসু, জ্ঞান মুখোপাধ্যায়, ফণী মজুমদারের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

* * *

আগামী ২৯শে জানুয়ারী চিত্রা ও জ্যোতি সিনেমায় বম্বে টকীজের "হামারি বাত" মুক্তিলাভ করিবে। ইহাতে দেবিকারাণী, জয়রাজ, শাহ নওয়াজ, ডেভিড, মমতাজ আলি, সুরাইয়া প্রভৃতি অভিনয় করিয়াছেন।

প্যারামাউন্ট সিনেমায় রতনবাই অভিনীত "রেডিও সিঙ্গার" দ্বিতীয় সপ্তাহে পড়িল। এই ছবিখানির পরিবেশক লক্ষ্মী পিকচার্স।

এই সপ্তাহে প্রকাশ পিকচার্সের "রামরাজ্য"এর রজত-জয়ন্তী সপ্তাহ অনুষ্ঠিত হইবে। ছবিখানি এখন গণেশ টকী হাউসে চলিতেছে।

* * *

কলিকাতায় আর একটি চিত্র পরিবেশন প্রতিষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন হইয়া গিয়াছে গত বৃহস্পতিবার। এই প্রতিষ্ঠানটির নাম রেডিয়্যান্ট পিকচার্স। ইহাদের পরিবেশিত "ভক্ত বিদুর" শীঘ্রই কলিকাতায় মুক্তিলাভ করিবে। আমরা এই প্রতিষ্ঠানটির সাফল্য কামনা করি।

* * *

চিত্রবাণী লিমিটেড পরিবেশিত ঈষ্টার্ণ পিকচার্সের "বাদল" শীঘ্রই প্যারামাউন্ট সিনেমায় মুক্তিলাভ করিবে। এই ছবিখানিতে জহর রাজা, রাধারাণী, উর্ম্মিলা প্রভৃতি অভিনয় করিয়াছেন। ইহাদের পরিবেশিত "শাহানশাহ আকবর"ও কলিকাতায় মুক্তি প্রতিক্ষায়।

* * *

চিত্ররূপার দোভাষী ছবি "সন্ধি"র চিত্রগ্রহণ রীতিমত চলিতেছে। অপূর্ব্ব মিত্র পরিচালনা করিতেছেন। বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করিতেছেন অহীন্দ্র চৌধুরী, বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, মৃণাল ঘোষ, ফণী রায়, দেববালা প্রভৃতি।

* * *

আমরা শুনিয়া মর্ম্মাহত হইলাম যে সুপ্রসিদ্ধ মঞ্চশিল্পী পরেশ বসু (পটলবাবু) গত ১৮ই জানুয়ারী মাত্র ৫৩ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। বহুদিন হইতে তিনি ক্যানসার রোগে ভুগিতেছিলেন। বহুদিন যাবৎ তিনি মিনার্ভা থিয়েটারের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তারপর মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি ষ্টার থিয়েটারের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। মৃত শিল্পীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য ১৯শে জানুয়ারী ষ্টার কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের অভিনয় বন্ধ রাখিয়াছিলেন।

* * *

শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্স-এর নবতম কথাচিত্র 'গৃহলক্ষ্মী'র চিত্রগ্রহণ কার্য্য পুনরারম্ভ হইয়া পূর্ণোদ্যমে অগ্রসর হইতেছে। ছবিখানির পরিচালনা করিতেছেন 'জীবন-সঙ্গিনী'র প্রয়োগশিল্পী শ্রীগুণময় বন্দ্যোপাধ্যায়। ছবিখানির বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করিতেছেন: শ্রীমতী চন্দ্রাবতী, শ্রীমতী পদ্মাদেবী, দেববালা, শ্রীমতী পূর্ণিমা, অহীন্দ্র চৌধুরী, জহর গাঙ্গুলী, রতীন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি।

নানাকথা

পরলোকে সঙ্গীতাচার্য্য সুরেন্দ্র লাল দাস

(চট্টগ্রামস্থ সংবাদদাতার পত্র)

গত ২৮শে ডিসেম্বর, মঙ্গলবার, চট্টগ্রামের সঙ্গীত নায়ক সুরেন্দ্রলাল দাস, সঙ্গীতাচার্য্য, মাত্র ৫৩ বৎসর বয়সে নিদারুণ ম্যালেরিয়া রোগে কয়েকদিন ভুগিয়া স্বীয় পল্লীভবন কাটুলী গ্রামে পরলোক গমন করিয়াছেন। চট্টগ্রামে গত কয়েক বৎসর হইতে ব্যাপকভাবে যে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত চর্চ্চা চলিতেছে ;প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে সুরেন্দ্রলাল 'আর্য্য সঙ্গীত বিদ্যাপীঠ' স্থাপন করিয়া তাহার সূচনা করেন।

বৃদ্ধ পিতৃদেব শ্রীযুক্ত প্রাণহরি দাস হইতে সুরেন্দ্র লাল সঙ্গীত কলায় অনুশীলনী লাভ করেন, এবং স্বকীয় সাধনায় পরবর্ত্তীকালে তাঁহার এই অসাধারণ বুৎপত্তি লাভ ঘটিয়াছিল। ভারতীয় সঙ্গীতে বহুবিধ অভিনব স্বরগ্রাম সংযোজনা করিয়া তিনি সঙ্গীতগুরু আলাউদ্দীন, গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, ওঙ্কার নাথ, গিরিজাশঙ্কর প্রমুখ ভারত বিখ্যাত গুণীমহলে প্রভূত সম্মানের অধিকারী হইয়াছিলেন। ১৯৩১ সনে সুরেন্দ্রলাল কলিকাতায় বেতার প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেন এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত 'যন্ত্রীসঙ্ঘ' গত কয়েক বৎসর সহস্র সহস্র সঙ্গীত রসপিপাসুকে তাঁহার গুণমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। ইহার পূর্ব্বে তিনি কিছুকাল লাহোরে এক সবাকচিত্রে সঙ্গীত পরিচালনা করিয়া সাফল্য অর্জ্জন করেন। তাঁহারই নেতৃত্বে ১৯২৮ সনে নিখিল ভারত কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনে 'চট্টগ্রাম আর্য্য সঙ্গীত সমিতি' উদ্বোধন সঙ্গীতে ঐকতান বাদন করিয়া সকলের মনোরঞ্জন করিয়াছিল।

সুরেন্দ্রলাল মনেপ্রাণে দেশপ্রেমিক ছিলেন। ১৯২০ সনে বি, ও, সির চাকুরী ত্যাগ করিয়া অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন। তদানীন্তন বিরাট জনসভাগুলি তাঁহা'র কম্বুকণ্ঠের 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীতে অপূর্ব্ব উন্মাদনা লাভ করিত। মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্ব্ব হইতে তিনি স্বীয় গ্রামে কৃষির উন্নতি প্রচেষ্টায় ও তৎসঙ্গে দুর্ভিক্ষপীড়িত নরনারীর সেবাকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

শোক-সংবাদ

গত ৩রা নভেম্বর, বুধবার, ১২৪বি আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট নিবাসী হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ৫৯ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি অতিশয় অমায়িক প্রকৃতির লোক ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি বিধবা স্ত্রী এবং বিবাহিতা কন্যা ব্যতীত অমরেন্দ্রনাথ, সুবলচন্দ্র, অজিতকুমার এবং মুরারীমোহন নামক চারিটি পুত্র রাখিয়া গিয়াছেন

বাউল

—শ্রীমতী স্নেহলতা দেবী

নিশিদিন চাঁদের সুধা
মাগে অধীর চকোর নয়ন
ফুলের চুমার লাগিরে হায়
কাঁদে আমার পিপাসী মন।
পাই যদি মোর ঘর ছাড়ারে
যাই চলে দূর নদীর পারে,
পাতার ঘরে বাঁধব বাসা
চাইনে মাণিক চাইনে রতন।
আজকে আমার বাউল মনে
সুর দিয়েছে দোলা
আপন হয়েও যে রয় দূরে
তারে কি যায় ভোলা ?
আঁধার আলোর লীলার ছলে
যে আসে আর যায় গো চলে
যে রূপে মোর জুড়ায় আঁখি

নারীলোক

পরিচালিকা—শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী

সখী-সংবাদ

(প্রবন্ধ)

সিনেমায় বসিয়া আছি মহিলাদের উপর তলার আসনে, একটু আগেই আসিয়াছি। দেখিলাম আরও দু' চারিটি মেয়েও আমার মত আগেই আসিয়া বসিয়া আছে আমার ঠিক সম্মুখে। বাহিরের আলো হইতে আসার পর ভিতরে কিছুই ঠাহর হয় না, তবে কিছুক্ষণ অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে দেখিয়া দেখিয়া বুঝিলাম মেয়েটি অত্যন্ত পুরাতনিকা, বা সেকেলে। একটু বাদেই অত্যন্ত আধুনিকা একটি মেয়ে আসিয়া তাহার পাশে বসিল, এবং একটু ঘোর কাটিলে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিল, "দুর্গা ঠাকরুণ দেখছি যে! তা ভাল, ভাগ্য আমার আজ ভালই, তোমার দেখাত' সহজে পাওয়া যায় না।" পুরাতনিকা অর্থাৎ দুর্গানামধারিণী মেয়েটিও একটু সলাজ হাসিয়া উত্তর দিল, "বাঃ বেশত দেখা হয়ে গেল। এষা তুই যে মেয়েদের দিকে এলি বড়, ব্যাপার কি? ভালই হ'ল ভাই, একা ভাল লাগছে না—বেশ এখন গল্প করা যাবে।" আধুনিকা অর্থাৎ এষা বলিল "গল্প নয় ঝগড়া, বলি তোর মতলবটা কি তাই শুনি, ভেবেছিস কি?" কৃত্রিম ভীতি প্রকাশ করিয়া দুর্গা বলিল "কি রে, কি আবার মতলব, কিছু ত বুঝতে পাচ্ছি না।" ঝঙ্কার দিয়া এষা বলিল, "না তা বুঝতে পারবে কেন, ঠাকুরমা সেজেছ—ঠাকুরমা বুড়ি। বয়স এখনও পঁয়ত্রিশ পার হয় নি, অথচ বুড়োর বেহদ্দ বুড়ো সেজেছিস, আমার মা এখনও তোর চাইতে ভাল কাপড় গহনা পরেন, আর তুই যেন নামাবলী গায়ে হরি-সংকীর্ত্তন শুনতে এসেছিস।"

মৃদু হাসিয়া দুর্গা উত্তর করিল "তাতে চটিস কেন ভাই, বেশী সাজসজ্জা আমি পছন্দ করি না। বাইরে বেরুতে সাদাসিদে পরিষ্কার পোষাকই আমার ভাল লাগে চটকদার পোষাকে শুধু লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা ছাড়া আর কিছু লাভ হয় না।" এষা বলিল "দেখ পাকামো রাখ, গয়না কাপড় আবার মেয়েমানুষে ভালবাসে না! নতুন কথা শোনাস নে, কিপ্‌টে কোথাকার। যেমন বর তেমনি তুই, বর টাকার গাদা রোজকার কর্চ্ছে আর তুই রেঁধে মরছিস। আমরা ও রকম বড় লোক হলে পায়ের ওপর পা তুলে বসে থাকতাম। তুই বোধ হয় বলবি, আমি রাঁধতে ভালবাসি?" পুরাতনীটির মুখ রাগে কিংবা অপমানে জানি না লাল হইয়া উঠিয়াছিল, একটু উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, "হ্যাঁ সত্যিই তাই, রাঁধতে আমি খুব ভালবাসি। তোরও ছেলেমেয়ে হয়েছে, রাঁধতে ভালবাসা তোরও উচিত। আমার স্বামী ছেলে মেয়েকে নিজের হাতে রেঁধে খাওয়াব, যত্ন করব এমন মনোবৃত্তি প্রত্যেক মেয়েরই থাকা উচিত। সন্তানের মা হলে বিলাসিতা ত্যাগ করা সর্ব্বতঃ ভাবেই উচিত।" শ্রীকাত্যায়নী দেবী

[আগামীবারে সমাপ্য]

দীপালীর স্বত্বাধিকারী শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত, ১২৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, দীপালী প্রেসে মুদ্রিত দীপালী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

প্রধান সম্পাদক—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় :: সহঃ সম্পাদক—শ্রীধীরেন্দ্রমোহন মজুমদার বি. এল.

১৬শ বর্ষ VOL. XVI. } ২০শে মাঘ ১৩৫০ :: February 3, 1944 { ৫ম সংখ্যা No. 5

আলোচনী

বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতায় অত্যন্ত শীত পড়িয়াছে। এত শীতে পলিটিক্সের আসর জমে না। শীত ও গ্রীষ্ম সময়টা যাহাই হউক না কেন এ সহরের শিক্ষিত সমাজেও আলোচনার বস্তু নগণ্য। খবরের কাগজ ধরিয়া কিছুদূর আলোচনা ও তর্ক চলে তাহার পর আবার আলোচনা ঝিমাইয়া মামুলী কথাবার্ত্তার গতানুগতিক পথে পা বাড়ায়। বয়স যাহাদের গিয়াছে, সিনেমার কথা শুনিয়া তাহাদের রক্ত গরম হইবার সম্ভাবনা কম। বয়স অবশ্য বৎসর গুণিয়া হিসাব করা চলে না। বাহিরের যৌবন যাইতে না যাইতেই একদিন মনের একান্তে সেই চিরকালের পলিত কেশ বৃদ্ধ আসিয়া বাসা বাঁধে। সিন্ধবাদের গল্পের মত ঘাড় হইতে এই প্রবীণতার ভূতকে নামান শক্ত। এ দুর্ভাগ্য যাঁহার হইয়াছে জগৎকে চোখ মেলিয়া দেখিবার তাঁহার সুযোগ ঘটে না। আশে পাশে পরিচিতের মধ্যে কত দৃষ্টান্তই তো রহিয়াছে। আর এক শ্রেণীর ভাগ্যবান আছেন যাহাদের জীবনে যৌবন ও বার্দ্ধক্যের সীমারেখা একাকার হইয়া গিয়াছে। যৌবনের ভরা নদী কূল ছাপাইয়া বার্দ্ধক্যের রুক্ষ বেলাভূমিকেও সরস করিয়া তোলে এ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, তবে কম।

* * * *

নানা কারণে মন আমাদের বৃদ্ধ হইয়া গিয়াছে। এই দেউলিয়া মনের কাছে বেশী কিছু আশা করাই আজ অন্যায়। অথচ শিক্ষার অভিমানে আমাদের চাওয়ার অন্ত নাই। দীর্ঘ দিনের সংস্কার নূতন জীবনকে ভাল করিয়া পাইবার পক্ষে আজ অহরহ বাধা দিতেছে। আমরা বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রায় মধ্যপথে আসিয়া পৌছিয়াছি। শতাধিক বৎসরের যে জীবনটা আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ ছিল আজ তাহা অতীতে সরিয়া যাইতেছে। তাহার বিলীয়মান গৌরবরশ্মি এ জাতিকে যতটুকু গরীয়ান করিয়া তুলিয়াছে তাহা লইয়া যদি সন্তুষ্ট না থাকিতে পারি তবে সংঘর্ষ বাধিবেই। অতীত বা বর্ত্তমান যাহাকেই যতটুকু চাহি না কেন আমাদের শক্তির মাপেই চাহিতে হইবে। আজ দীর্ঘদিন পরে ধীরে ধীরে আমরা জীবনের দিকে চোখ মেলিয়া তাকাইতেছি। ইহা তো সবে আরম্ভ। যুদ্ধান্তে এই সমস্যা জাতি-গঠনের বৃহত্তর সমস্যারূপে দেখা দিবে। তাহার আসন্ন ইঙ্গিত সমাজের স্তরে স্তরে ফুটিয়া উঠিতেছে।

* * * *

আবহাওয়া মানুষকে কতখানি ভাবপ্রবণ করিয়া তোলে তাহা আজ বুঝিতেছি। অদ্ভুত কল্পনা মনের মধ্যে খেলিয়া যায়, যাহার কোন অর্থ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। গুরু গুরু মেঘ গর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে মনে হইতেছে সারা সহরটা যদি বিরাট ভূকম্পনে কাঁপিয়া ধূলিসাৎ হইয়া যায়, তাহা হইলে কত হাসি কান্নার ছোট ছোট জগৎ এক মুহূর্ত্তে মিথ্যা হইয়া যাইবে। তাহার পর বৎসরের পর বৎসরের পলি পড়িয়া সহরের উপর চলুক

সুরবিন্যাসের কারুকার্য্য। ধ্বংসাবশেষ নগরীর উপর বৃহৎ বনস্পতির অরণ্য সৃষ্টি হউক। দীর্ঘদিন পরে এই অরণ্যানীর যখন মৃত্যু হইবে তখন অনুসন্ধিৎসু মানুষের দৃষ্টি মাটির কবরের নীচে কত আশ্চর্য্য জিনিষ আবিষ্কার করিবে। অস্থিখণ্ড ইষ্টক লইয়া চলিবে গবেষণা। হয়তো যেখানে বসিয়া এই উদ্ভট কল্পনার জাল বুনিতেছি শত শত বৎসর পরে সেখানে প্রথম সূর্য্যের আলোক পাত হইবে, কে বলিতে পারে। মহেঞ্জোদরো খননের ইতিহাস যখন বাহির হইতেছিল তখন একটি চমৎকার ঘটনার কথা কোন লেখক লিখিয়াছিলেন। লেখকের নাম আজ মনে পড়িতেছে না। ব্যাপারটা কিছুই নয়। যখন সহরটির অধিকাংশ খনন হইয়া গিয়াছে তখন হঠাৎ একটি ধাতুনির্ম্মিত বাঁশী লেখকের হাতে পড়ে। তাহাতে ফুঁ দিতেই চমৎকার মিষ্ট আওয়াজ বাহির হইয়া যেন দিগন্তে মিশিয়া গেল। দীর্ঘ বৎসরের অপর প্রান্তে একদিন জীবনের যে কলস্রোত বহিয়াছিল বাঁশীটি যেন তাহারই প্রতীক। সহস্র বৎসরের মৌনব্রত ভঙ্গ করিয়া অতীত যেন এ যুগের সহিত কথা কহিয়া বাঁচিল। ঘটনাটির আবেদন অদ্ভুত সুন্দর বলিয়া আজও মনে আছে।

* * *

রবিবার ৩০শে জানুয়ারীর কথা। ঘুম হইতে উঠিয়াই মনে হইল আজ শ্রীপঞ্চমী। গত কয়দিন ধরিয়া পথে ঘাটে নূতন প্রতিমা গড়াইয়া ছেলেদের দল চলিয়াছে দেখিয়াছি, মুখে চোখে ইহাদের খুসি ও উৎসাহ ধরিতেছে না। প্রতি পল্লীতে লাল শালুতে বাণী অর্চ্চনার বিজ্ঞাপন দেখিয়াছি—এ বৎসর একটু যেন বেশীই নজরে পড়িতেছে। ছোট ছোট মেয়েরা সকাল সকাল স্নান সারিয়া বাসন্তীরঙা কাপড় পরিয়া ছুটাছুটি করিতেছে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, সপ্তাহান্তিক বর্ষা নামিয়াছে, বৃষ্টি ধরিবার নাম নাই। ইহারই মধ্যে পূজার্চ্চনার শঙ্খ-ঘণ্টাধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছে।

* * *

অঝোরে বর্ষা নামিয়াছে। বাসন্তী পঞ্চমীর চরণচিহ্ন এই বর্ষার প্রবল ধারাপাতে ধুইয়া মুছিয়া চলিয়া গিয়াছে। কল্পনা করিতে পারিতেছি যে ছেলেমেয়েদের মুখও ম্লান হইয়া উঠিল। বিশ বৎসর পূর্ব্বে এত পূজা ও অর্চ্চনার ভীড় ছিল না। স্কুলে কলেজে ছাড়া বহু গৃহে সরস্বতী পূজা হইত। উৎসাহ এমনই ছিল। আজ বাড়িয়াছে বলিয়া মনে হয় না। হয়তো যাহা বেশী বলিয়া মনে হইতেছে তাহা আসলে পূজার বিজ্ঞাপনের ভঙ্গী। এই বিজ্ঞাপনের রেওয়াজ ধীরে ধীরে আমাদের জীবনকে পাইয়া বসিতেছে। কত রকম-বেরকমের চিঠি পত্র দেখা যায় পূজার নিমন্ত্রণে। নিজেদের প্রচেষ্টাকে বাহিরে না জানাইয়া তৃপ্তি পাওয়া যায় না। ইহা ভাল কি মন্দ তাহা বলিবার উদ্দেশ্য আমার নাই। তবে সর্ব্বক্ষেত্রেই প্রচারকার্য্যের ভাবটা জীবনে প্রাধান্য পাইতেছে ইহাই বক্তব্য।

জীবন-সঙ্গীত

(বড় গল্প)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রীশচীন্দ্রনাথ মিত্র

ভোগ

রাত্রি দুটোর পর নিদ্রিত পল্লীকে সচকিত করে দিল্লী একস্‌প্রেসটা চলে গেল। রমা মশারী তুলে আস্তে আস্তে শয্যা থেকে বেরিয়ে এল। ঘরের এককোণে একটা হ্যারিকেন লণ্ঠন টিম্‌ টিম্‌ করে জ্বলছিল। তার অস্পষ্ট আলোকে সে সভয়ে একবার চতুর্দ্দিকে চেয়ে দেখল, পরে দরজার দিকে অগ্রসর হলো। দরজার খিলে হাত দিয়ে সে হঠাৎ একবার শয্যার দিকে তাকাল। মশারির ভেতর থেকে তখন রাধেশের গভীর শ্বাস প্রশ্বাসের একটানা আওয়াজ ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছিল না।

ধীরে ধীরে খিল খুলে সে কুয়া তলায় এসে দাঁড়াল। বাইরে তখন শরতের স্নিগ্ধ বায়ু মোলায়েম ভাবে দক্ষিণ থেকে উত্তরে বয়ে চলেছিল; অদূরস্থ বাউরী পাড়া থেকে মত্তপ বাউরীদের উন্মত্ত কণ্ঠের ঝুমুর গানের কয়েকটা কলি অস্পষ্ট ভাবে ভেসে আসছিল: একা কেন্নে যাব যমুনায় গ',—একা কেন্নে যাব যমুনায়……

রমা সভয়ে একবার চারিদিকে চেয়ে দেখল, পরে আঁচলটাকে ভাল করে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে সেইখানে উবুড় হয়ে বসে পড়ে বালতি থেকে গণ্ডূস করে জল নিয়ে সজোরে নিজের ব্রহ্মতালুর ওপর চাপড়াতে লাগল। কিছুক্ষণ ওইরূপ করার পর হঠাৎ তার সর্ব্ব শরীর যেন ভীষণ ভাবে কেঁপে উঠল ও দারুণ শীতে তার কম্পিত ওষ্ঠাধরের মধ্য থেকে একটা অস্ফুট হি হি শব্দ নির্গত হতে লাগল। কোন দিকে আর না চেয়ে এক লাফে সে ঘরে এসে ঢুকল; পরে সশব্দে অর্গল বন্ধ করে দ্রুতপদে সে মশারির মধ্যে আশ্রয় নিল।

উষ্ণ শয্যার মধ্যে আশ্রয় নিলেও তার কম্প থামল না। শাড়ীর আঁচল দিয়ে চুলের জল মুছতে মুছতে সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ঘরের চতুর্দ্দিকে লক্ষ্য করল। দেখল রাধেশের শিয়রের জানালাটি ছাড়া ঘরের আর সব ক'টি জানালাই খোলা রয়েছে। তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে সে জানালা বন্ধ করতে উদ্যত হলো। হঠাৎ আবার ভাবল যে বন্ধ ঘরের মধ্যে রাধেশের হয়তো কষ্ট হবে। তখন সে জানালা বন্ধ না করে কাঁপতে কাঁপতে ঘরের এক কোনায় —দড়ি কাঠ থেকে ঝোলানো বাঁশের আলনা থেকে একটা লেপ পেড়ে নিয়ে, আবার মশারির মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করল।

আপাদমস্তক লেপে ঢাকা দিয়ে সে শুয়ে পড়ল কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল, তার কম্প যেন উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। হঠাৎ সে অনুভব করলে তার ভীষণ পিপাসা পেয়েছে। আবার মশারি তুলে বেরিয়ে এল; ঘরের এক কোণে জলচৌকির ওপর রক্ষিত পিতলের ঘড়া থেকে জল গড়িয়ে নিয়ে আকণ্ঠ পান করে, আবার সে শয্যার মধ্যে প্রবেশ করল।

আপাদমস্তক লেপ ঢাকা দিল, হাঁটু মুড়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে পড়ল সে। কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই শুনতে পেল, কোথায় যেন দপ্‌দপ্‌ করে ঢেঁকির পাড় পড়ার মতো একটা শব্দ হচ্ছে। সে বুঝতে পারল না কোথা থেকে এ শব্দ আসছে। পরক্ষণেই উপলব্ধি করল এ শব্দ তারই বুকের মধ্য থেকে আসছে। দারুণ উৎকণ্ঠায় আবার তার কণ্ঠ শুকিয়ে গেল; প্রবল শীতে তার শরীরের প্রতি লোমকূপটি খাড়া হয়ে উঠল; কী একটা অমঙ্গলের আশঙ্কায় সে সভয়ে রাধেশকে জড়িয়ে ধরে চক্ষু মুদ্রিত করল।

এই ভাবে কতক্ষণ সে পড়েছিল জানে না। হঠাৎ তার মাথার ওপর,—দোতলায় কিসের যেন একটা আওয়াজ হলো! চমকে উঠে আরও গভীর ভাবে রাধেশকে জড়িয়ে ধরে সে বিস্ফারিত চক্ষে ওপর দিকে তাকাল, আওয়াজ ক্রমেই বেড়ে চলল; শেষে তা চরমে পরিণত হলো। মনে হোল ভাষাহীন কোন পশু যেন তার বন্দীত্বকে অস্বীকার করবার জন্য দুর্দ্ধর্ষ হয়ে উঠেছে। উন্মাদ হয়ে উঠেছে সে তার মূকত্বের দুর্ব্বলতাকে প্রচণ্ড শারীরিক শক্তির পর্য্যায় পর্য্যবসিত করে, চার পাশের মিথ্যা আবেষ্টনীগুলিকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে; অশান্তির তীব্র বিষে জর্জ্জরিত তার যে আত্মা এতদিন সুপ্ত ছিল কাল্পনিক

সমাপ্তির মোহময় সুপ্তিতে, সে নিদ্রা আজ যেন তার টুটে গিয়েছে। রোমাঞ্চিত কলেবরে রাধেশকে দৃঢ়তর আলিঙ্গনে বদ্ধ করে, বহুকাল পরে রমা তার ইষ্টদেবকে স্মরণ করল। আজ সে প্রথম উপলব্ধি করল, সত্য যা তা চিরকালই সত্য। প্রত্যক্ষকে রহস্যময় করে তোলবার জন্য কোনরূপ যবনিকার আবরণ,—সেখানে অনিত্য।

কিন্তু কী কুৎসিত! নিজের কল্পনায় রমা নিজেই শিউরে উঠল।

দোতলার কোলাহল ক্রমেই বেড়ে চলেছিল; রমা আর শুয়ে থাকতে পারল না। নিদ্রিত রাধেশের স্বভাব-কুঞ্চিত দীর্ঘ কেশ গুলি নিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে, তার উষ্ণ ললাটের ওপর নিজের কপোলটি রক্ষা করে সে চক্ষু মুদ্রিত করল। আহা, বেচারা রাধেশ! আজও সে রমার কাছে প্রতিজ্ঞা করে বাড়ী থেকে বেরিয়েছিল; কিন্তু রাজ-বাড়ী থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে স্থানীয় বাউরী পাড়ার গাঁতিদার মহাদেব মাহাতোর সবিনয় অনুরোধ উপেক্ষা করতে না পেরে, আজও সে দু'কলসী "মহুয়া পচাই" টেনে আসতে বাধ্য হয়েছিল। নাহলে রমার এতবড় দুঃখে সে কি সান্ত্বনা না দিয়ে থাকতে পারত! রাধেশ জাগলে রমার ভয় কী! সে একবার তাকে নাড়া দিল। কোন কথা না বলে রাধেশ পাশ ফিরে শুলো।

রাধেশকে আরও কিছুক্ষণ আদর করে রমা ধীরে ধীরে মশারি তুলে বাইরে এল। সাবধানে দরজার খিল খুলে ঘর থেকে বেরুল সে। বাইরে বেরিয়ে এবার আর তার শরীর কাঁপল না,—মন তো নয়ই। দৃঢ়হস্তে বাইরে থেকে দরজার শিকল বন্ধ করে দিয়ে ক্ষিপ্র পদে এগিয়ে গেল সে দোতলার সিঁড়ির দরজার দিকে। দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে এগিয়ে চলেছিল সে, নাহলে এত রাত্রে সিঁড়ির দরজা খোলা রয়েছে কেন—এ প্রশ্নে সে উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠত। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গিয়ে, দম ফেলল সে রুদ্রকান্তের ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে।

কবি রুদ্রকান্ত তখন অতি কষ্টে রাম-হরির মাথায় একটা প্রকাণ্ড 'গ্ল্যাডষ্টোন' ব্যাগ তুলে দিচ্ছিলেন, এমন সময় রমা ঘরে ঢুকল। কিন্তু তাকে দেখে তিনি বিস্মিত তো হলেনই না, বরং এমনভাবে তার দিকে চাইলেন, যেন এতক্ষণ তিনি তারই জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

রমাকে দেখে প্রৌঢ় রামহরি হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল। বলল: মাঠান্, বাবুর মাথা খারাপ হয়ে গেছে—

তাকে একটা প্রচণ্ড ধমক দিয়ে রুদ্রকান্ত দরজা দেখিয়ে দিলেন; সভয়ে দ্রুতপদে রামহরি ব্যাগ নিয়ে নীচে নেমে গেল।

রুদ্রকান্ত তখন রমার উদ্দেশে নম্রস্বরে বললেন: বাড়ী আমি তিনমাসের কড়ারে ভাড়া নিয়েছিলাম। দু' মাসের ভাড়া আগে আমি দিয়েছি, বাকি একমাসের ভাড়ার দরুণ টাকাটা এই খামের মধ্যে রইল। এই বলে একখানি খাম্ তিনি পকেট থেকে বার করে তক্তপোষের ওপর রাখলেন।

রমা কোন কথা বলল না। ঘরে ঢুকে সেই যে সে মুখ নীচু করে দাঁড়িয়েছিল, আর মুখ তুলল না!

রুদ্রকান্ত আবার বললেন: কাল সকালের ট্রেণে রামহরি আমার জিনিষপত্র সব নিয়ে যাবে। আমি এই ভোরে "জসিডি লোকালেই" চলে যাচ্ছি।

এবারেও রমা কোন কথা বলল না।

—"আচ্ছা—"

রমার পাশ দিয়ে রুদ্রকান্ত দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। সিঁড়ির চাতালে দাঁড়িয়ে তিনি যেন মুহূর্ত্তের জন্য চঞ্চল হয়ে রমার দিকে তাকালেন; পরক্ষণেই দ্রুতপদে নীচে নেমে গেলেন।

বিস্ফারিত নেত্রে ভূমির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে অবনতমুখী রমা, যেন মূর্তিমতী মৃত্যুর মতোই সেখানে দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ টপ্ টপ্ করে কয়েক ফোঁটা অশ্রুজল মেঝের ওপর ঝরে পড়ল, সে যেন ঘুম ভেঙ্গে জেগে উঠল। ব্যাকুলভাবে চারিদিকে একবার চেয়ে দেখেই উন্মত্তের মতো সে নীচে নেমে গেল।

নীচে এসে সে দেখল, সদর দরজার খিল খুলে তিনি চলে গেছেন বটে কিন্তু বাইরে থেকে বেশ ভাল করে ভেজিয়ে দিয়ে গিয়েছেন। দরজা খুলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে পথের দিকে তাকাল, গাঢ় অন্ধকারে কিছুই দেখা গেলনা। শুধু কাঁকর বিছানো রাস্তার ওপর দিয়ে শ্রান্ত পদক্ষেপের একটা একটানা ঘস্ ঘস্ শব্দ অত্যন্ত ক্ষীণভাবে তার শ্রুতি-গোচর হতে লাগল। সেই ক্রমবিলীয়মান শব্দ শুনে তার মনে হলো, কে যেন তার কানে কানে বলছে ভয় নেই, আর ভয় নেই। রাধেশকে হারাবার আর ভয় নেই—নিজেকে বিলুপ্ত করবার আর প্রয়োজন নেই।

কুয়াতলা থেকে ঘরে ঢোকবার সময়ে এবার আর তার ভয় করল না! দরজার শিকল খোলবার সময়ে শব্দ হবার ভয়ে আর সে সাবধান হলো না! ঘরে ঢুকে শয্যায় আশ্রয় নেবার সময়ে, দরজার খিলটা পর্য্যন্ত বন্ধ করবার আর সে কোন প্রয়োজন বোধ করল না। কম্পিতবক্ষে, অথচ প্রচণ্ড বিক্রমে রাধেশের বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, চুম্বনে চুম্বনে তার সারা মুখখানি ভরিয়ে দিল। ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলে সে ডাকতে লাগল: ওগো জাগো, ওগো জাগো—

স্খলিতকণ্ঠে কী একটা মন্তব্য করে রাধেশ ফিরে শুলো। তখন হঠাৎ তাকে ছেড়ে দিয়ে, বালিসে মুখ গুঁজে রমা আকুল হয়ে কেঁদে উঠল। অন্তরের রুদ্ধ আবেগে তার সমস্ত শরীর শিউরে শিউরে উঠতে লাগল। কিন্তু সে কান্না কেউ শুনতে এল না, কেউ দেখতে পেল না।

শেষ

নারীলোক

পরিচালিকা—শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী

সখী-সংবাদ

(প্রবন্ধ)

বিদ্রূপের কণ্ঠে আধুনিকা মেয়েটি উত্তর দিল "হাঁড়ি না ঠেললে সেবা করা হয় না, আর ছেলে হলেই যোগিনী সাজতে হয়, যোগ অভ্যাস করতে হয় একথা আজ নতুন শুনছি, তোকে পাগল ছাড়া আর কিছু বল্‌তে পারি না, পাগলই বা কেন আসলে তুই ভারি কেপ্পন—একটা পয়সা খরচ করতে বুক তোর চড়্‌ চড়্‌ করে।"

দুর্গা নামধারিণী মেয়েটি উত্তেজিত রাঙ্গা মুখ শান্ত হইয়াই উঠিয়াছিল, শান্ত হাসিয়া বলিল, "তুই পাগল বা কৃপণ যা খুসী বলতে পারিস্ তাতে রাগ বা দুঃখ আমার কিছু নেই, কৈফিয়ৎ দিতেও আমি পছন্দ করি না, তবে তর্কের খাতিরে এইটুকুই বলছি যে ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে উঠেছে। অনুকরণ প্রবৃত্তি ওদের প্রবল, তাই ওদেরকে মানুষ কর্ত্তে গেলে, নিজেকে কিছু ত্যাগ স্বীকার কর্ত্তেই হবে। তুই হয়ত বুঝবি না—কেন না তোদের মত মেয়েদের মধ্যে ভোগ-প্রবৃত্তি অত্যন্ত প্রবল, তবে সত্যিকার জ্ঞানী যাঁরা তাঁরা নিশ্চয়ই আমার কথা বুঝবেন।"

এবা ঝঙ্কার দিয়া উত্তর করিল "দেখ সংসারে শুধু একলা তোরই ছেলে হয় নি, সবারি ছেলে মেয়ে হয়েছে এবং হচ্ছে। আমারও ছেলেরা বড় হয়েছে, তাদের কত পড়ার জন্য বুঝুই, কত বড় লোকের আদর্শ দেখাই, বিদ্বান হলে লোকে কত সম্মান করবে—তাই বলে কি সন্ন্যাস নেব নাকি?"

প্রশান্ত স্বরে দুর্গা বলিল "হ্যাঁ ছেলে হলে প্রায় সন্ন্যাসই নিতে হয়। যোগ, তপ, জপ যা কিছু বল—সব সাধনার চাইতে বড় সাধনা সন্তানকে মানুষ করে তোলা, তুমি পরের আদর্শ দেখিয়ে নিজেরা জোড়ের পায়রা হয়ে বাইরে বাইরে বেড়াও, আর আমরা নিজেরাই সাধনা কচ্ছি তাদের আদর্শ হবার। আমি যদি বিলাসিতায় মগ্ন থাকি তাহলে কোন মুখ নিয়ে সন্তানকে শিক্ষা দোব "তোরা বিলাসী হসনে।" যদি আমি নিয়ত আলস্যপরায়ণা হই, দুর্মুখ নির্ম্মম হই তবে তা হতে সন্তানকে বিরত রাখব কেমন করে? সাধনাই বল আর তপস্যাই বল, তাই আমি করছি শুধু সন্তানকে মানুষের মত মানুষ করে তোলার চেষ্টায়। জানি না ঈশ্বর সফলতা দান করবেন কি না, তবে শুধু "হে ঈশ্বর ছেলেদের ভাল কর" বলে কর্ত্তব্য শেষ ত' করছি না। ভোরে ঘুম ভেঙ্গে একসঙ্গে আমরা ঈশ্বরকে নমস্কার করি, তারপর একসঙ্গে এক্সারসাইজ করি, ফুলগাছে জল দিই, দাঁতন করি। তারপর খাবার খেয়ে ওরা পড়তে বসে, উনি কাজে যান, আমি রান্না করি। কি খেলে কি উপকার, কেমন রান্না ওরা ভালবাসে, কেমন করে কুটনো কুটলে ভিটামিন বাদ যায় না—সে সব মাইনে করা উড়ে বামুনে বুঝবে কেমন করে? মায়ের প্রাণের স্নেহ-দরদ দিয়ে খাদ্য তৈরী হলে তাতে বেশী সন্তানের দেহ পুষ্টি হয় এই সহজ কথাটা কেন যে তোদের মাথায় ঢোকে না তা বুঝি না। ছেলেরা সর্ব্বদাই দেখবার সুযোগ পায়—নিজের কাজ নিজে কর্ত্তে হয়, আমি গুরুজনদের সেবা করি, শ্রদ্ধা করি ওরা দেখবে এবং শিখবে বলে, চাকর-বাকরদের সঙ্গে মিষ্টি ব্যবহার করি ওরাও মিষ্টি ব্যবহার করায় অভ্যস্ত হবে বলে। এমন কি ঠাকুরকে প্রণামও করি এই উদ্দেশ্য নিয়ে যে আমার ছেলেমেয়েরা ঈশ্বর-বিশ্বাসী হবে—নাস্তিক হবে না। স্কুলে পাঠিয়ে দুপুরে আমি মহামানব মহাপুরুষদের জীবনী পড়ি সন্ধ্যায় ওদের কাছে গল্প বলবার জন্যে। খবরের কাগজ পড়ি খেতে বসে ওদের সঙ্গে সমালোচনা করার জন্যে, তোদের কোন পার্টিতে যোগ দিই না। তাতে ছেলেমেয়ে সঙ্গে করে যাবার মত হয় না, পার্টিতে কেবল

অসার আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা থাকে। ছেলেদের দেখানর মত বই হলে তবে সিনেমা থিয়েটারে যাই। তুই বড্ড ঘা দিলি, তাই তোকে এত কথা বলে ফেলেছি। কৃপণ বলছিস, কিন্তু প্রত্যেক ছেলের জন্মতিথিতে একশ' টাকা তারা নিজ হাতে গরীবের জামা-কাপড়ের জন্য দান করে, যেখানে যখন দুর্ভিক্ষ হয়, ওরা মোটা টাকা চাঁদা পাঠায়। ছেলেরা এখন থেকেই অন্তর দিয়ে ভাবতে শিখেছে ভোগের চাইতে বেশী আনন্দ ত্যাগে। দেশের দরিদ্র আত্মীয় স্বজন রোগে মৃত্যুতে বিয়ে পৈতেতে আমার হাত দিয়ে যথেষ্ট সাহায্য পায় আর আমার সে খরচের হিসেব লেখে আমার বড় ছেলে। কাকে কত পরিমাণ দেওয়া হয় বা দেওয়া উচিত তা সে শিখেছে। অর্থের অপ্রতুল আমার নেই, কৃপণও আমি নই, তবে তোমরা যেটা অর্থের চরম সদ্ব্যবহার ভাব আমি তা ভাবি না। আমি আশা করি, আকাঙ্খা করি, শয়নে স্বপনে চিন্তা করি যে আমার সন্তান হবে ঈশ্বর চন্দ্রের মত বিলাসশূন্য দয়াময়, আশুতোষের মত তেজস্বী বিদ্বান, চিত্তরঞ্জনের মত দান পরায়ণ, শ্রীমধুসূদনের মত প্রতিভাশীল, বঙ্কিমচন্দ্রের মত সাহিত্যিক আর বিবেকানন্দের মত ভারতবাসীর উপর প্রীতি—ভারতের উপর প্রীতি।

জানি না আশা সফল হবে কি না, কিন্তু সাধনার ত্রুটী আমি রাখছি না। যদি আমি একগাল পান দোক্তা খেয়ে বলি "ওরে পান তোরা খাস না"—তবে আমার সে আদেশ কার্য্যকরী হয় না। কিন্তু আদেশও দেবার প্রয়োজন হয় না যদি আমরাও সে জিনিষ একেবারে না খাই। উনি সিগারেট পর্য্যন্ত খান না আমিও পান পর্য্যন্ত খাই না, যাদের সংসারে এসেছি তাদের দ্বারা দেশের ও দশের গৌরব বৃদ্ধি করার জন্যে সাধনার প্রয়োজন আছে একথা সকলেই স্বীকার করবেন। তাই বলি শুধু এক৷ আমার নয় সন্তানের মা মাত্রেই সংযমী হয়ে সন্তানকে মানুষ করে তোলার সাধনা যদি আজ করেন তবে দেশের যথার্থ উপকার হয়। মনে প্রাণে নিজেকে অনলস সত্যবাদী ত্যাগী এবং পরিশ্রমী করে তুলে তবে সন্তানের কাছে আশা কর্ত্তে হয় প্রকৃত মনুষ্যত্ব। তুই সকাল থেকে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত একদিন আমার বাড়ী গিয়ে দেখিস কি আনন্দস্রোত বয়ে যায় সেখানে। আমার সঙ্গে ওঁর সঙ্গে ছেলেদের সম্বন্ধ ঠিক বন্ধুর মত। আমরা এক সঙ্গে খাই রোজ রাত্রে আর রবিবারের দিনে, ছেলেদের সঙ্গে আমি অঙ্ক কষি প্রতিযোগিতায়, ওরা যখন পড়ে তখন আমিই পড়াই, ক্যারম খেলি, ছুটোছুটি খেলি সকল সময়ে আমরা হাসি কলরবে কাটাই। কাজ করি তাও খেলার মত আনন্দে। তোরাই কেবল দেখিস আমি যোগিনী সন্ন্যাসিনী—কিন্তু আনন্দে হৃদয় আমার কানায় কানায় ভরে আছে। মনে হয় তোদের মন বাইরে বিক্ষিপ্ত, তাই ঘরের এ আনন্দ—ত্যাগের আনন্দ—তোরা ঠিক বুঝতে পারিস না, কিন্তু বাইরের মোহ কাটিয়ে তোদের মত মেয়েরা যদি আমার পথ নেয় তাহলে দেখবি সব সংসারই আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠবে—বৃথা আমার উপর রাগ না করে ভেবে দেখিস; নে—ওদিকে দেখ, বইটা যে আরম্ভ হয়ে গেল।"

আমিও চমকিয়া দেখিলাম—ওমা—তাই ত, বই কখন আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, দুই সখীর মিলন-আলাপে আমিও তন্ময় হইয়া পড়িয়াছিলাম। সিনেমা সেদিন দেখিলাম বটে কিন্তু মাথায় কিছু ঢুকিল না। আধুনিকা ও পুরাতনীর ঝগড়া আমার মাথার সবখানিই অধিকার করিয়া রহিল।

শ্রীমতী কাত্যায়নী দেবী
মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

খেলার মাঠে

—শ্রীউমেশ মল্লিক

একাদশ নিঃ ভাঃ অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় বাঙ্গলা দেশের প্রতিযোগী নির্ব্বাচন সমাপ্ত হয়েছে। প্রতিদ্বন্দ্বিতাক্ষেত্রে স্বীয় বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়ে কজন বাঙ্গালী নির্ব্বাচিত হয়েছেন তা লক্ষ্য করা উচিত। আনন্দ মুখার্জ্জী, এ কে দত্ত এবং বি বসু সারা বাঙ্গলা দেশের মধ্যে এই তিন জনের নামই মাত্র পাওয়া যায়। কাবাডী, ভলি-বল এবং কুস্তি প্রভৃতির কথা অবশ্য ব্যতিরেকে। সুখের বিষয় এ, কে, দত্ত ৫০০০ মিটার ভ্রমণে ভারতীয় রেকর্ড ভঙ্গ করেছেন। বাঙ্গালীর এ অধঃপতনের কারণ অনুসন্ধানে দেখা যায় দারিদ্র্য এবং প্রকৃতিগত দোষ। এ ছাড়া উৎসাহ দেবার লোকের অভাবও অনেকাংশে দায়ী। অভাব অনটনের মধ্য দিয়ে অন্যান্য সম্প্রদায় যখন উন্নতি লাভ করতে পারে তখন খেলার মাঠে বাঙ্গালীর পশ্চাৎপদ হওয়াটা প্রকৃতিগত দোষ ছাড়া আর কি। এ বৎসরের প্রতিযোগী নির্ব্বাচনে কয়েকটি নূতন রেকর্ডের সৃষ্টি হয়েছে। ৪০০ মিঃ দৌড়ে জি, ই, হাউট, ১০০ মিঃ লো হার্ডলসে সি এইচ কং এবং হপ ষ্টেপ এণ্ড জাম্পে গডক্রের কৃতিত্বপূর্ণ রেকর্ড স্থাপন এবৎসরের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা। নির্ব্বাচিত প্রতিযোগীদের মধ্যে পার্শীভ্যাল ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ানসিপ লাভ করেন। মহিলাদের এবং দলগত চ্যাম্পিয়ানসিপের জন্য ক্যালকাটা ওয়েষ্ট ক্লাবের যোগ্যতা সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্বীকার করতে হবে।

*

বার্ট ইনষ্টিটুট পরিচালিত লাহোরে নিঃ ভাঃ সৌখীন মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতায় একজন বাঙ্গালীও সাফল্য লাভ করতে পারেনি। কেবলমাত্র বি, দাস ফ্লাই-ওয়েটে ফাইনালে উন্নীত হবার যোগ্যতা অর্জ্জন করে। কলকাতার অপরাপর প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে এরাটুন, যশোয়া এবং বি লাল বিভিন্ন ওয়েটে ভারতীয় বে-সরকারী চ্যাম্পিয়ানসিপ অর্জ্জন করেছে।

আগত ৭ই ফেব্রুয়ারী প্রাদেশিক সৌখীন মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতা আরম্ভ হবে। শুনা যায় এরাটুন প্রভৃতি ভারত-বিজয়ী কয়েকজন মুষ্টিযোদ্ধা প্রাদেশিক প্রতিযোগিতায় যোগ দিচ্ছেন। উদীয়মানদের উৎসাহ দেবার জন্য এদের বিরোধিতা না করাই ভাল।

*

আপ্পা রাও, সোমানা এবং গড়গড়ি ভ্রাতৃদ্বয় ভবানীপুরে ফুটবল খেলায় অতঃপর যোগদান করবে বলে সংবাদে প্রকাশ। সোমানা ও আপ্পারাও-র দলত্যাগ হেতু ইষ্ট বেঙ্গলের বিশেষ ক্ষতি হবে বলে মনে হয়।

*

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্পোর্টসে মাদ্রাজ দল ৮২ পয়েণ্ট সংগ্রহ করে গত তিন বৎসরের শ্রেষ্ঠ প্রতিদ্বন্দ্বী পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়কে পরাজিত করেছে। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় দল ৭৭ পঃ, আলীগড় ৪২ পঃ এবং সিলোন বিশ্ববিদ্যালয় ৩০ পঃ সংগ্রহ করে যথাক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ স্থান অধিকার করে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এ প্রতিদ্বন্দ্বীতায় যোগদান করেনি।

*

বোম্বাই সহরে আগামী ১১, ১২, ১৩, ১৪ই সামরিক বাছাই সৈন্যদল বনাম ভারতীয় একাদশের যে ক্রিকেট খেলার দিন ধার্য্য করা হয়েছে তাতে ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ খেলোয়াড় হার্ডষ্টাফকে কর্ম্মে রত বাছাই সামরিক দলে যোগদান করতে দেখা যাবে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য মাত্র একদিন খেলার পর মেয়রের সাহায্য ভাণ্ডারের খেলাটি কলিকাতায় স্থগিত রাখতে হল।

রঞ্জী ট্রফী প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইনালের খেলাটি আগামী ১৮, ১৯, ২০ এবং ২১শে ফেব্রুয়ারী কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হবে। বাঙ্গলা দল মাদ্রাজ দলের সঙ্গে বিরোধিতা করবে। মাদ্রাজ দল হায়দ্রাবাদ দলকে দক্ষিণ বিভাগের খেলায় সহজেই পরাজিত করে।

মাদ্রাজ দল ১ম ইনিংসে ৩৪৯, ২য় ইনিংসে ১১৫ রাণ সংগ্রহ করে।

হায়দ্রাবাদ দল ১ম ইনিংসে ১৮৭ রাণ করে।

অনন্তনারায়ণের ১০১ রাণ এবং রামসিংহের ৮৯ রাণ কৃতিত্বের পরিচায়ক। রঞ্জী প্রতিযোগিতার উত্তর বিভাগের খেলায় দক্ষিণ পাঞ্জাব দিল্লীকে এক ইনিংস এবং ২০১ রাণে পরাজিত করেছে। অমরনাথ পাঞ্জাবের পক্ষে ১৪৮ রাণ এবং ১৮ রাণে ৪ উইকেট সংগ্রহ করা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

চিঠির থলি

আমার আদুরে ভাই বোনেরা—

এবারে তোমাদের চিঠির উত্তর দেবার কথা, নয়? আগে প্রতিযোগিতার বিষয়টা জানিয়ে দিই, তারপর চিঠির উত্তর দেওয়া যাবে'খন।

নতুন প্রতিযোগিতা : এবারে প্রতিযোগিতার বিষয় হচ্ছে যে—ধরো তুমি এখন দ্বিতীয় বা প্রথম শ্রেণীর স্কুলের ছাত্র। হঠাৎ তোমার নামে "লটারীতে" দশ হাজার টাকা উঠেছে। যথাসময়ে তা তোমার হাতে এসে পৌছাল, এখন তুমি সে টাকা নিয়ে কিসে খরচ করবে, এবং কেন তাতে খরচ করবে তা' "দীপালী"র এক পাতার মত লিখে আমার কাছে পাঠাবে আগামী ২২শে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে। তবে একটা কথা মনে থাকে যেন যে, যে বিষয় খরচ করবে সেটা একটা বিষয়ের বেশী নিয়ে কেউ লিখতে পারবে না। যথা : কেউ বল্লে—আমি টাকা পেয়ে কেবল খেয়ে দেয়েই দিন কাটাবো। অতএব কেন খাবে, তাতে তোমার লাভ কি, কি খাবে ইত্যাদি সব জানাতে হবে। ওর সঙ্গে আবার "খেয়ে দেয়ে" "বেড়িয়ে" অমনি দুটো বিষয় নিয়ে লিখলে চলবে না কিন্তু।...

...এবারে চিঠির থলি খোলা যাক্... কি বলো?

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার মিত্র (৯৫২ : কলিকাতা) : ভাই তোমার "নিঃস্ব" কবিতাটি আমায় খুশী করতে পারলো না।

শ্রীইন্দ্রশেখর রায় (১০৮৪ : কলিকাতা) : তোমার প্রতিযোগিতার বিষয়টা বেশ ভালই লাগলো আমার কাছে। আসছে বারে ওটা আহ্বান করবার চেষ্টা করবো। তুমি পুরস্কারের জন্যে টাকা পাঠিও তাড়াতাড়ি, তাহলে তুমিই ওর আহ্বায়ক হবে।

শ্রীজ্যোতির্ম্ময় গঙ্গোপাধ্যায় (১০৪৩ : কলিকাতা) : তোমার লেখাটা মনোনীত হয়েছে, যথাসময়ে তা ছেপে বার হবে।

শ্রীপরেশনাথ রায় চৌধুরী (১১০২ : বিরাটি) : তোমার "গল্প হলেও সত্যি" মনোনীত হলো না। নতুন লেখা পাঠিও।

শ্রীধনঞ্জয় কুণ্ডর (১০৩৬ : হাওড়া) : নিজের অন্যায় নিজে বুঝতে পারলে তাকে মানুষ মাত্রই ক্ষমা করতে বাধ্য। তা' যারা না করে তারা মানুষ নয়! তোমার লেখাটা আমায় খুশী করতে পারলো না। এবারে যেন শুনি প্রথম হয়েছ পরীক্ষায়।

শ্রীনির্ম্মল কুমার রায় (১০৯২ : কলিকাতা); তোমার লেখার মধ্যে হাস্য কৌতুকটি মনোনীত হয়েছে। ও কুপনটার সম্বন্ধে তো গতবারে তোমায় জানিয়েছি।

শ্রীরবীন দাস (১০২০ : কলিকাতা) : তোমার লেখা ছাপান শোকোচ্ছ্বাসখানি পড়লাম। খুশীই হলাম ওটা পড়ে, কিন্তু পাখীর মৃত্যুতে অতো ভেঙ্গে পড়লে তো চলবে না! সংসারে ওর থেকে বড় আঘাত সহ্য করবার জন্যে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকতে হয় মানুষকে এবং তা' সহ্য করেও যারা ভেঙ্গে পড়ে না তারাই মানুষ। তুমিও সেই সত্যিকারের মানুষ হবার চেষ্টা করো।

শ্রীসন্তোষ রাখাল রায় (৯৩১ : পাবনা) : দু'আনা পাঠিয়েছ কেন? চার আনা পাঠাতে হয় প্রতি বছরের চাঁদা স্বরূপ। বাকি দু'আনা পাঠালে নতুন বছরের জন্যে সভ্য করে নিয়ে নতুন সভ্য কার্ড পাঠাবো। তাড়াতাড়ি পাঠিও বাকী চাঁদাটা।

শ্রীনারায়ণদাস পাল (১০৩৮ : মুঙ্গের) : তোমার চিঠির উত্তর ডাকযোগে পাঠিয়েছি, তা' পেয়েছ তো?

...আজ তোমাদের সকলকেই স্নেহ জানিয়ে এখানেই বিদায় নিই, কেমন?...হ্যাঁ ভালো কথা, এবারের প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার স্বরূপ বই দেওয়া হবে।

তোমাদের : বিজনদা

তোমাদের বিভাগ

বুদ্ধির দৌড়

—নৃপেন সেনগুপ্ত (সভ্য নং ৩৮৯)

বনস্থলীর বিশাল সমতলে বিরাট এক সভা বসে গেছে। পশুরাজ সিংহমশায়ের আদেশে সারা বন উজাড় করে পশুরা এসে সে সভায় যোগদান করেছে। ছোট বড় কেউই বাদ পড়েনি। পশুরাজ সভাপতির আসন গ্রহণ করেছেন; পাশেই বসেছে বাঘ, হাতী, গণ্ডার ইত্যাদি বনের সেরা জন্তুরা। তাদের ঘিরে বসেছে শৃগাল, হরিণ, শূয়োর, জিরাফ, বানর, ভালুক, ইয়্যাক, জেব্রা আরো কতো কি! সভা যখন পশুতে ভর্ত্তি হয়ে গেছে, সিংহ মশায় তখন উঠে দাঁড়ালেন। সকলকে সম্বোধন করে বললেন: আপনাদের মনে নিশ্চয়ই একটা প্রশ্ন জেগেছে হঠাৎ কেন এ-সভার আহ্বান! তা আমি এক্ষুণি বলছি···আমরা দেখতে পাচ্ছি পশুদের ওপর মানুষের অত্যাচার দিনদিনই বেড়ে চলেছে। বন জঙ্গলই আমাদের একমাত্র আশ্রয়; মানুষ অনেক বন-জঙ্গল আবাদ করে চাষ ভূমিতে পরিণত করেছে—তা' ছাড়া গাছ-গাছড়া কেটে ঝোপ-জঙ্গল সাফ করে আমাদের যে কতো ক্ষতি করছে তার আর অবধি নেই। মনের সাধ মেটাতে, সামান্য আমোদ-প্রমোদের বশবর্ত্তী হয়ে তারা শিকারে এসে আমাদিগকে ধ্বংস করছে; অথচ আমরা কখনো তাদের সঙ্গে শত্রুতা করতে যাইনি। এ-ভাবে যদি পশু ধ্বংস চলতে থাকে তবে অচিরেই যে আমাদের অস্তিত্ব লোপ পাবে তাতে সন্দেহ নেই। তাই এখনি আমাদের দাঁড়াতে হবে এর বিরুদ্ধে (সকলে পশুরাজের কথায় সায় দিলে)।

এখন কথা হলো কি করে আমরা মানুষের সাথে বিরোধিতা করতে পারি। আমাদিগকে অর্থাৎ বাঘ, সিংহ, হাতী, গণ্ডার প্রভৃতি জন্তুকে মানুষ ভয় করে। কিন্তু হরিণ, জিরাফ, শেয়াল ইত্যাদিকে তারা গ্রাহ্যই করে না। তা ছাড়া হরিণ শূয়োর প্রভৃতির মাংস অনেক মানুষে খায়। তাহাদিগকে শিকার করতে এসে অনেক সময় আমাদিগকেই মেরে বসে। এমনি প্রাণহীন মানবজাতিটা! এ-সব তৃণভোজী প্রাণী কিছুতেই মানুষের বিরোধিতা করতে পারবে না;—কিন্তু হাতী, গণ্ডার এরা তৃণভোজী হলেও মানুষকে মারতে পারে—মানুষের সাথে যুঝবার সামর্থ্য তাদের আছে। তাই আমরা ভেবে দেখেছি মানুষের অত্যাচার হতে পরিত্রাণ পেতে হলে প্রথমতঃ এ-সব তৃণভোজী দুর্ব্বল জন্তুদিগকে বন থেকে তাড়াতে হবে এবং তাদের স্থানে বসাতে হবে আমাদের মতো শক্তিশালী হিংস্র পশুকে! এই ব্যবস্থা করা হলে আমরা প্রধানতঃ দু'বিষয়ে উপকৃত হবো—প্রথমতঃ বন যখন তৃণভোজী প্রাণীশূন্য হয়ে পড়বে তখন আর মানুষ তাদের শিকার করতে বনে আসবে না; কারণ আমাদের মতো মাংসভোজী কোন প্রাণীকে তারা খায় না। তাহলে আমরাও অনেকটা নিরাপদ হতে পারবো! আর বীর-কীর্ত্তি অর্জ্জন করবার জন্যে আমাদের যারা বধ করতে আসবে সংখ্যাধিক্যবশতঃ আমরা তখন দল বেঁধে তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে চেষ্টা করবো। শুধু এ-ব্যবস্থা অবলম্বনেই আমরা মানুষের অত্যাচার হতে কতকটা পরিত্রাণ লাভ করতে পারি। সুতরাং আমার আদেশ —এক হপ্তার ভেতর হাতী, গণ্ডার প্রভৃতি ছাড়া আর সব তৃণভোজী দুর্ব্বল প্রাণীদিগকে বন ছেড়ে চলে যেতে হবে। যারা আদেশ অমান্য করবে তাদের শাস্তি—প্রাণদণ্ড!

পশুরাজের এ কঠোর আদেশ শুনে তৃণভোজী দুর্ব্বল প্রাণীদের বুক দুরু দুরু করে উঠলো। মাথায় তাদের যেন আকাশ ভেঙে পড়লো। কোথায় যাবে তারা! পশুরাজ এই নির্দয় আদেশ প্রচার করবার আগে কি একটিবার ভেবে দেখেননি তাদের পরিণামের কথা! বন ছাড়লে মানুষ কি আর তাদিকে জীবন্ত রাখবে! উপায় নেই—প্রতিবাদ করবার সাহস কারো হলো না—মহারাজের আদেশ!···

এমনি দুর্ভাবনায় যখন তৃণভোজী প্রাণীরা নিমগ্ন তখন এক বুড়ো হরিণ উঠে বললে- মহারাজ, আপনার আদেশ শিরোধার্য্য। আমরা বাসস্থান ছেড়ে চলে যাবো এর চেয়ে দুঃখের বিষয় আর কী আছে। বন ছাড়া মানে আমাদের ধ্বংস—সুতরাং বাঁচবার ক্ষীণ আশাটুকুও এখন আমাদের আর নেই। কিন্তু আপনাদের জন্যে দুঃখ হচ্ছে আরো বেশী। কারণ তৃণভোজীদের সুললিত মাংস খেয়েই তো আপনারা বেঁচে আছেন, আমরা যদি বন ছেড়ে চলে যাই তাহলে আপনারা তো উপোস করে মরবেন। মানুষের সাথে লড়াই করবেন আর কখন?

এ-কথা শুনে সিংহমশায় ঘাড় নেড়ে বললেন: তাওতো বটে। যে সকল মাংসভোজীরা মানুষের সাথে লড়াই করবার জন্যে কোমর বাঁধছিলো, তারা মাথা চুলকিয়ে অস্ফুটস্বরে বলে উঠলো: তাইতো!!

নানাকথা

বাংলায় সরস্বতী পূজা

বর্ত্তমান দারুণ সঙ্কটময় পরিস্থিতিতেও কলিকাতা ও বাংলার সর্ব্বত্র বাগ্‌দেবীর অর্চ্চনা বেশ সুষ্ঠুভাবেই সুসম্পন্ন হইয়াছে। নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানগুলি হইতে আমরা আমন্ত্রণ-লিপি পাইয়াছিলাম: জুপিটার স্পোর্টিং ক্লাব, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট; পঞ্চাননতলা স্পোর্টিং ক্লাব, বৌবাজার; ভ্রাতৃ সম্মিলনী, বেলিয়াঘাটা; কালচারাল এসোসিয়েশন, চন্দ্রনাথ চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট; দত্তপাড়া ষ্টুডেন্টস ইউনিয়ন, ফকির চক্রবর্ত্তী লেন; ছাত্রসংঘ ডবলু, সি, ব্যানার্জ্জী ষ্ট্রীট; কেশব বিদ্যালয়ের হিন্দু ছাত্রবৃন্দ, রামকৃষ্ণ বাগচি লেন; অভিনয় সঙ্ঘ, বাবুরাম শীল লেন; বাণী অর্চ্চনা সমিতি (রাজেন্দ্র বয়েজ এ্যাথলেটিক ক্লাব ও বেঙ্গল চ্যাম্পিয়ন ক্লাব কর্ত্তৃক পরিচালিত) রাজেন্দ্র লাল ষ্ট্রীট; সংস্কৃতি পরিষদ, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট; মিলন-বীথি, মানিকতলা বাজার বিল্ডিং; তরুণ সংসদ, বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীট; কিশোর সঙ্ঘ ও ছাত্র মিলন সমিতি; রাউেন এণ্ড কোং, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট; কাশী ঘোষ স্পোর্টিং ক্লাব, কাশী ঘোষ লেন; মায়া-বীথি সঙ্গীত সংঘ, মসজিদ বাড়ী ষ্ট্রীট; হরিতকী বাগান এসোসিয়েশন 'বি'; এ, আর, পি, ওয়ার্ডেন পোষ্ট নং ২, লোয়ার সারকুলার রোড; ওরিয়েণ্ট ক্লাব, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট; নর্থ ক্যালকাটা সরস্বতী পূজা, মদন মিত্র লেন; উল্টাডাঙ্গা জলি ক্লাব, উল্টাডাঙ্গা মেন রোড; নিউ বেঙ্গল ক্লাব, গোপীকৃষ্ণ পাল লেন; এ আর পি ক্লাব, ১নং পোষ্ট, ভবনাথ সেন ষ্ট্রীট; কিশোর দল, হাডিঞ্জ রোড; কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নার্সিং ষ্টাফ; আর্ট সেন্টার অফ দি ওরিয়েণ্ট, রসা রোড; সুহৃদ সঙ্ঘ, বৌডন ষ্ট্রীট; সন্ধানী লাইব্রেরী, পঞ্চানন ঘোষ লেন, চন্দ্রনাথ ইনষ্টিটিউশন, কলিকাতা। শ্রীসুধন্যকুমার সাহা ও গোপাল লাল খাঁ, রাজসাহী; খুরুট বাণী সঙ্ঘ, খুরুট; উদয়ন, হাওড়া; সত্যেন্দ্র মণি মেলা, হাওড়া; পারিজাত সমাজ ও রবীন্দ্রকলা সদন, হাওড়া; মারুতি ব্যায়াম বিদ্যালয়, বালী; বালক সমিতি, গৌহাটি; ছাত্র সমিতি, বর্দ্ধমান; নর্থ ব্যাটরা বয়েজ স্কাউটবৃন্দ, ব্যাটরা; গৌহাটি যুব নাট্য সমাজ, গৌহাটি; শেখঘাটের ছাত্রবৃন্দ; অন্নপূর্ণা ব্যায়াম সমিতি, হাওড়া; দাড়িয়াপাড়ার ছাত্রবৃন্দ, শ্রীহট্ট; বি, এন, আর পূজা কমিটি, বাঁকুড়া; বন্ধু মিলন ক্লাব, হাওড়া; প্রগতি পরিষদ, নবদ্বীপ; বয়েজ এ্যাসোসিয়েসন ক্লাব, জব্বলপুর, পাটনা; মুরারিচাঁদ বিদ্যা নিকেতনের হিন্দু ছাত্রবৃন্দ; রিপণ কলেজিয়েট স্কুল, হাওড়া; কালচারাল সোসাইটি, তেজপুর প্রভৃতি।

প্রায় সকল স্থানেই সরস্বতী পূজার দিন সন্ধ্যায় প্রীতি সম্মিলনীর আয়োজন ছিল এবং এই উপলক্ষ্যে সঙ্গীত, নৃত্য, জলসার বন্দোবস্ত ছিল। আমন্ত্রণকারীদের আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

বেঙ্গল জিলা ভলিবল প্রতিযোগিতা

বেঙ্গল ভলি বল এসোসিয়েশনের পরিচালনায় উক্ত প্রতিযোগিতার ২য় বার্ষিক অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন রায় বাহাদুর রাঘবেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে গত শনিবার প্রাতে বালী স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। মোট দশটি জিলা দল খেলায় যোগদান করে। শনি ও রবিবার উভয় দিনই প্রাতে ও বৈকালে খেলা হয়। বাংলার বিভিন্ন জিলা হইতে বিশিষ্ট ক্রীড়ামোদীগণ ও খেলোয়াড়গণ উপস্থিত ছিলেন। ফাইন্যাল খেলায় কলিকাতা হোয়াইটস্ হাওড়া 'বি' কে পরাজিত করে। কলিকাতার পক্ষে অধিনায়ক ও প্রবীণ খেলোয়াড় পি মজুমদার ও এন বন্দ্যোপাধ্যায় অতীব উচ্চাঙ্গের খেলা দেখান। খেলার শেষে মিঃ এন, ডি, আগরওয়ালা সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং পুরস্কার বিতরণ করেন।

কারুকলা সঙ্ঘ

কারুকলা সঙ্ঘের উদ্যোগে গত ২৭ শে জানুয়ারী বৃহস্পতিবার বেলা ৪ ঘটিকার সময় কমার্শিয়েল মিউজিয়ামে (কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট) "দুর্গতদের" সাহায্যের জন্য একটি চিত্রপ্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

উক্ত প্রদর্শনীতে একমাত্র দুর্গতদের বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করিয়া নানাপ্রকার চিত্র প্রদর্শিত হয়।

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করেন।

শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় সম্বর্দ্ধিত

বিগত ২৩শে জানুয়ারী, বালীগঞ্জ ১১ ডোভার লেনে, বিচারপতি বি, বি, ঘোষের ভবনে, লব্ধপ্রতিষ্ঠ সঙ্গীত-বিশারদ, কবি ও সাহিত্যিক শ্রীযুত দিলীপ কুমার রায়ের ৪৭তম জন্মোৎসব তাঁহার গুণমুগ্ধ বান্ধব-বান্ধবীগণের উদ্যোগে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। এতদুপলক্ষে প্রথমে একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতার পর কবি শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী সিঁথি বৈষ্ণব সম্মিলনীর পক্ষ হইতে একটি অভিনন্দন পত্র পাঠ করিয়া দিলীপকুমার রায় মহাশয়ের হস্তে প্রদান করেন। পরে দিলীপবাবুকে উক্ত সম্মিলনী কর্ত্তৃক "সঙ্গীতরত্নাকর" উপাধি প্রদত্ত হয়। পণ্ডিচেরী হইতে শ্রীঅরবিন্দের ও শ্রী"মা"র আশীর্ব্বাণী সভায় জ্ঞাপিত হয়। লালগোলার কুমার শ্রীযুত ধীরেন্দ্র নারায়ণ রায়, শ্রীযুত সুদাম চট্টোপাধ্যায়, কুমার শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী প্রমুখ সুধীবৃন্দ দিলীপবাবুকে অভিনন্দিত করেন। যথাযোগ্য প্রত্যাভিভাষণের পর উক্ত উৎসবের জন্য লিখিত একটি দীর্ঘ কবিতা দিলীপবাবু পাঠ করেন এবং তাঁহার স্বাভাবিক সুকণ্ঠে ভজন ও কীর্ত্তন গাহিয়া সমবেত সকলকে আনন্দ দান করেন। শতংজীব বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমৎ রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহোদয় তাঁহার আশীর্ব্বাণী প্রেরণ করিয়াছিলেন।

সিঁথি বৈষ্ণব সম্মিলনী

২৭শে জানুয়ারী ২৫ বাগবাজার ষ্ট্রীটে অপরাহ্ণ ৫॥ ঘটিকায় সম্মিলনীর উদ্যোগে মহামহোপাধ্যায় ফণীভূষণ তর্কবাগীশের দ্বিতীয় মৃত্যু-বার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয়। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমৎ রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহোদয় পৌরহিত্য করেন।

নাটমণ্ডপ

—অভিমন্যু

"ছদ্মবেশী"—

ডিলুক্স পিকচার্সের ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন ৺অজয় ভট্টাচার্য্য। অভিনয় করিয়াছেন জহর গাঙ্গুলী, ছবি বিশ্বাস, ইন্দু মুখো, শৈলেন চৌধুরী, পদ্মা দেবী, শান্তি গুপ্তা, মীরা দত্ত, সন্ধ্যারাণী প্রভৃতি। বর্ত্তমানে উত্তরা, পূরবী, পূর্ণ ও আলেয়াতে দেখানো হইতেছে।

ছদ্মবেশে কয়েকটি চরিত্রের কৌতুকপূর্ণ অভিযানই হইল "ছদ্মবেশী"র গল্পাংশের ভিত্তি। পূর্ণাঙ্গ কমেডি ছবি বাংলা দেশে খুব বেশী দেখা যায় নাই, কিন্তু আজকাল যে প্রযোজকগণ এদিকে মনোযোগ দিতেছেন ইহা আনন্দের বিষয়। "ছদ্মবেশী" ছবিখানি আমাদের ভাল লাগিয়াছে, তাহার কারণ হাস্যরসের খোরাক আছে ইহাতে প্রচুর, শুধু কম্যুনিষ্টদের অধ্যায়টি দেখানোর কোনো সার্থকতাই আমরা খুঁজিয়া পাইলাম না। যাহা হউক, সামান্য ত্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও "ছদ্মবেশী"র নির্ম্মাতাদের আমরা অভিনন্দন জানাই।

কিন্তু এই আনন্দের মাঝে যে বেদনার সুর ধ্বনিত হইতেছে তাহা পরিচালক, চিত্রনাট্যকার, সংলাপ রচয়িতা ও গীতিকার অজয় ভট্টাচার্য্যের অকাল মৃত্যু। পরিচালনা ব্যাপারে ইহাই তাঁহার দ্বিতীয় প্রচেষ্টা এবং প্রথম খানির অপেক্ষা এখানি যে বহুগুণে উন্নত তাহা বলাই বাহুল্য। চিত্র পরিচালনায় তাঁহার সাফল্যটুকু যে তিনি দেখিয়া যাইতে পারিলেন না ইহাই দুঃখের বিষয়।

অভিনয়ের মধ্যে ছবি বিশ্বাস আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা বেশী আনন্দ দিয়াছেন যদিও তাঁহার অভিনীত চরিত্রটি মূল গল্পকে বিশেষ সাহায্য করে না। তার পরেই পদ্মাদেবী ও ইন্দু মুখোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। জহর গাঙ্গুলী তাঁহার স্বভাবসুলভ নৈপুণ্যে আনন্দ পরিবেশন করিয়াছেন। তাহা ছাড়া মিহির ভট্টাচার্য্য, শৈলেন চৌধুরী, সন্ধ্যারাণী, শান্তি গুপ্তা সুঅভিনয় করিয়াছেন।

শচীন দেব বর্ম্মণের আবহ-সঙ্গীত "ছদ্মবেশী"র অন্যতম সম্পদ। অন্যান্য টেকনিক্যাল দিক সম্বন্ধে বলিবার কিছু নাই।

"ভক্ত রায়দাস"

মিনার্ভা মুভীটোনের আগতপ্রায় ছবি "ভক্ত রায়দাস" শীঘ্রই কলিকাতায় মুক্তিলাভ করিবে। বারাণসীর প্রসিদ্ধ ঋষি রায়দাস ছিলেন জাতিতে মুচি। বহুগুণালঙ্কৃত তাঁহার হৃদয়ের বৃত্তিগুলি এবং তাঁহার প্রচারিত বাণী জগতের বিস্ময়ের কারণ হইয়াছিল। এই ভক্তিমূলক ছবিখানির কাহিনী রচনা করিয়াছেন ডাঃ সাফদার এবং পরিচালনা করিয়াছেন কে, খাইবার। অভিনয় করিয়াছেন পরেশ ব্যানার্জ্জী, ললিতা পাওয়ার, অনন্ত মারাঠে, শীলা, গোলাম হোসেন প্রভৃতি।

সহরের সিনেমায়

বম্বে টকীজের "হামারি বাত" চিত্র ও জ্যোতি সিনেমায় দ্বিতীয় সপ্তাহে পড়িল। নৃত্যে গীতে, অভিনয়ে ও কাহিনীর বৈচিত্র্যে ছবিখানি বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে।

গণেশ টকীজে "রামরাজ্য" ২৬শ সপ্তাহে পড়িল।

আগামী কল্য সেণ্ট্রাল সিনেমায় জয়ন্ত দেশাই প্রযোজিত "ভক্তরাজ" মুক্তিলাভ করিবে। পাগনীস, বাসন্তী, কৌশল্যা, মুবারক প্রভৃতি অভিনয় করিয়াছেন। অন্যান্য ছবির মধ্যে মিনার্ভায় "পৃথ্বীবল্লভ" এখনও বিশেষ সাফল্য সহকারে চলিতেছে। প্যারামাউণ্ট সিনেমায় ইষ্টার্ণ পিকচার্সের "বাদল" আগামী শনিবার মুক্তিলাভ করিবে। ইহাতে জহর রাজা, উর্ম্মিলা, রাধারাণী প্রভৃতি অভিনয় করিয়াছেন। চিত্রলেখায় মতিমহলের "আহুতি" দ্বিতীয় সপ্তাহে চলিতেছে।

দীপালীর স্বত্বাধিকারী শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত, ১২৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, দীপালী প্রেসে মুদ্রিত দীপালী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

প্রধান সম্পাদক—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় :: সহঃ সম্পাদক—শ্রীধীরেন্দ্রমোহন মজুমদার বি. এল.

১৬শ বর্ষ VOL. XVI. } ১১ই ফাল্গুন ১৩৫০ :: February 24, 1944 { ৮ম সংখ্যা No. 8

আলোচনী

রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্বের পরিবর্ত্তন নূতন নীতির সূচনা করে এই রকম একটা ধারণা এ দেশের কাহারও কাহারও থাকিতে পারে। ভারতের বড়লাটপদে লর্ড ওয়াভেলের নিয়োগ ঘোষিত হইবার পর এ দেশের বিভিন্ন মহলে বহু আশার কথা শোনা গিয়াছিল। লর্ড ওয়াভেলের প্রথম রাষ্ট্রনীতিক বক্তৃতা সে কলরব ও উৎকণ্ঠা শান্ত করিবে। বর্ত্তমান যুদ্ধের সমস্ত সম্ভাবনাকে পুরোভাগে রাখিয়া সাম্রাজ্যবাদী নীতি অগ্রসর হইতেছে। ভারত সেই যুদ্ধের অন্যতম পটভূমিকা রচনা করিয়াছে মাত্র। যুদ্ধের সাফল্যের জন্য এই মহাদেশপ্রমাণ ভূভাগের সামর্থ্য পুরাপুরি নিয়োগ করিবার অর্থ কি, তাহা বৃটেনের রাষ্ট্রনীতিক মহারথদের নিকট সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। এতখানি স্পষ্টতা প্রথমে ছিল না। ভারতীয় ঘটনার আবর্ত্তন, তাহার অন্তর্নিহিত দুর্ব্বলতা, এই শতাব্দীর চরম মুহূর্ত্তেও যে সুযোগ ও সুবিধার ক্ষেত্র রচনা করিয়াছে তাহা যুদ্ধের প্রারম্ভেও ইহাদের নিকট আশাতীত ছিল।

* * *

ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে আজ দেশের রাষ্ট্রনীতিক ক্ষেত্রে বহু দল ও উপদলের অস্তিত্ব আমরা অনুভব করিতেছি। ভারতীয় রাজনীতির অচঞ্চল আবিল স্রোতমুখে ইহারা সুবিধাবাদের পাল তুলিয়া অগ্রসর হইতেছেন। কর্তৃপক্ষ সহাস্যে ইহাদের পিঠ চাপড়াইয়া উৎসাহিত করিতেছেন। উৎসাহের আতিশয্যে ইহারা নিজেদের রং-মাখা বিচিত্র চেহারাটা দেখিয়াও দেখিতেছেন না। বাহিরের দর্শকের নিকট এই শ্রেণীর লোকের হাস্যকর প্রচেষ্টার অর্থ অত্যন্ত সোজা ও স্পষ্ট। ইহাদিগকে সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বক্ষেত্রেই পাওয়া যায়। ভারতের ক্ষেত্রে তাহাদিগকে একত্র করিতে কর্তৃপক্ষকে বেগ পাইতে হয় নাই। দেশের অবস্থা হইয়াছে অদ্ভুত। কংগ্রেসের আদর্শনিষ্ঠা, ত্যাগ ও উৎসর্গের আদর্শ যতদিন জনগণের সমক্ষে প্রত্যক্ষ ছিল ততদিন ইহাদের অস্তিত্ব ছিল অবজ্ঞাত ও তুচ্ছ। আজ শুষ্ক অরণ্যানীর মত হইয়াছে দেশের অবস্থা। প্রাণের চিহ্ন বলিতে কোথাও নাই। মাঝে মাঝে স্বার্থের বেসুরা আওয়াজ ভাসিয়া আসিতেছে। অথচ আমরা টিকিয়া আছি একথা অস্বীকার করা চলিবে না।

* * *

লর্ড ওয়াভেল বক্তৃতা দিয়াছেন। আমরা স্তব্ধ হইয়া কেবল ভাষ্যকারের কেরামতি দেখিতেছি। আমাদের বড়লাট সাহেব যাহা বলিবার তাহাতো বলিয়াছেন। উপনেতাদের কলরব তথাপি থামিতে চাহে না। যুদ্ধক্ষেত্রের শৃঙ্খলা ও ক্ষিপ্রকারিতার আভাষ তাঁহার রচিত বক্তৃতার প্রতি ছত্রে উঁকি মারিতেছে। তিনি সোজা স্পষ্টভাষায় বলিয়াছেন, কংগ্রেসকে ছাড়া চলিবে না। কংগ্রেস নতজানু হইয়া ৮ই আগষ্ট এর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করুক ইহা তিনি চান না। কারণ বড়লাট মহোদয় মনে করেন, এই ধরণের পন্থা সমস্যা

দূর করে না। কিন্তু তথাপি নীতি পরিবর্ত্তনের সুস্পষ্ট আশ্বাস তাঁহার চাই। ইহার জন্য কারারুদ্ধ নেতাদের পরস্পরের সহিত মতামত আলোচনারও না কি মূল্য কিছু নাই। অর্থাৎ লর্ড লিনলিথগোর ভারত ত্যাগের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত অবস্থা যেখানে পৌছিয়াছিল তাহা হইতে অবস্থার বিন্দুমাত্র উন্নতি হয় নাই।

• • •

তথাপি বড়লাটের বক্তৃতায় জাতির স্বাস্থ্য ও কল্যাণের বহু কথা আলোচিত হইয়াছে। রচনার ফাঁকে ফাঁকে স্বপ্নালু ভাববিলাসও আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। তাঁহার বক্তৃতা হইতে মনে হইবে, জাতির কল্যাণ একটা বাহিরের বস্তু। বৃটেন ও মার্কিন হইতে তাহা আমদানী করিয়া ভারতের স্কন্ধে চাপাইতে পারিলেই যেন সব সমস্যা মিটিয়া যাইবে। বৃটেনের সদিচ্ছার প্রতিধ্বনি তাঁহার বক্তৃতাকে অধিকতর লোভনীয় করিবে কি? বিভিন্ন মতামত এ পর্য্যন্ত যাহা প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে একটা ব্যর্থতার সুর উঠিয়াছে। পুনরায় একটা গতানুগতিকতার ইঙ্গিত পাইয়া জনসাধারণ শঙ্কিত হইয়া উঠিতেছে।

• • •

বর্ত্তমানে শাসননীতি পরিবর্ত্তনের কোন পরিকল্পনা বৃটেনের নাই। যুদ্ধে আশু জয়লাভই একমাত্র লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যপথে কংগ্রেসের বিরুদ্ধতা যে ছায়া মেলিয়া অগ্রসর হইয়াছিল তাহার অস্তিত্ব আজ নাই। যুদ্ধের অগ্রসর অধ্যায়ে পুনরায় কংগ্রেস ও বৃটেনের শক্তি পরীক্ষার অনুপযোগিতা আজ শাসকবর্গ বুঝিয়াছেন। সরকারী সমস্ত প্রচেষ্টা সেই নীতিকে বহন করিয়া চলিতেছে।

অনন্য

(গল্প)

—শ্রীসরোজ ঘোষ

দিব্যেন্দু আর গৌরীর পাশাপাশি বাড়ি। আপাততঃ ঘনিষ্ঠতা হয়ে দু'জনের বন্ধুত্ব হয়েছে—তবে অদূর ভবিষ্যতে 'ক্রমবিকাশে'র ফলে অন্য রকম সম্পর্কের আশা আছে।

সেদিন রবিবার না হয় কিসের যেন ছুটি, জানালার ধারে একটা চেয়ারে অন্যমনস্ক হয়ে বসে আছে দিব্যেন্দু. ঘরে ঢুকলো গৌরী, মুখে একটা বাঁকা হাসির রেখা টেনে বল্লে—"অমন করে বসে কি ভাবছেন?"

দিব্যেন্দু চোখ ফিরিয়ে জবাব দিলে, "ভাবছি একটা চমৎকার গল্পের প্লট্—শুনবে?"

গৌরী কোন জবাব দিলে না, পাশেই একটা চেয়ার টেনে বস্‌লো,...দিব্যেন্দু আরম্ভ করলো—।

"মনে কর এক মধ্যবিত্ত পরিবারে দুই ভাই আর এক বোন। বড় ভাই ইনসিওরেন্স কোম্পানীর ম্যানেজার, মেজ কিছু করেন না—সাহেব। আর বোন লতিকা।

লতিকা খুব ছোট থাকতে এদের মা মারা যান, তার কিছুদিন পরে বাপও। বাপ মারা যাবার পর তার কিছু সঞ্চিত অর্থ ছেলেদের হাতে পড়ে। মেজ ছেলে যা পেলো তাই নিয়ে বিলেত চলে গেল আর ফেরেনি। বড় ধীরেন বাবু লতিকার চেয়ে অনেক বড়। তিনিই লতিকাকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করতে লাগলেন। ধীরেন বাবুর অবস্থা ক্রমশঃ খুবই ভাল হওয়ায় তিনি একটু আধুনিক হয়ে ওঠেন। কিন্তু এই পরিবারের মধ্যে আধুনিকতায় ফার্ষ্ট ক্লাস ফার্ষ্ট হলো লতিকা।

বি, এ পাশ করে দাদার ইনসিওরেন্স কোম্পানির অরগানাইজার হলো। একখানা টু' সিটার গাড়ী নিজেই চালায়, মস্ত মস্ত লোকের সঙ্গে অনায়াসে আলাপ জমিয়ে তোলে, তারপরই করে ফেলে ইনসিওর।

চেহারাটা লতিকার খুবই ভাল, তবে সে কোন পুরুষের ভোগ্য বা উপভোগ্য হ'তে একেবারেই পছন্দ করতো না। লতিকার বন্ধু সুবর্ণার দাদা অশেষ—তুলনা দিয়ে বলতে গেলে কন্দর্পের মত তার চেহারা—বিশ হাজার টাকার লাইফ ইনসিওর তো করেই ছিল, তা ছাড়া এক বছরের মধ্যে পাঁচ পাঁচবার লতিকাকে, কি বলে, প্রস্তাব করেছে। বসন্তের এক দিবা দ্বিপ্রহরে বোটানিক্যাল গার্ডেনে অশেষ প্রথম প্রস্তাব করেছিল; মাঝ রাতে অন্ধকারে লেকের পাড়ে বসে বলে দেখলে...তারপর একদিন জ্যোৎস্না রাতে তাজ আর যমুনার সামনে দাঁড়িয়ে...শেষবার। এই নিদারুণ ব্যর্থতায় বেচারী অশেষ নিজের ওপর ঘৃণায় সেদিন কেঁদে ফেলেছিল।

আট বছর পরে একদিন! লতিকা অফিসে বেরুচ্ছে, বিভাস মানে ধীরেন বাবুর বড় ছেলে—বছর ষোল বয়েস হয়েছে তার—এসে বল্লে "পিসীমা, বাইরের ঘরে তোমাকে একজন ডাকছে।"

জুতো পরতে পরতে লতিকা বললে, "ডাক্‌ছে, কি নাম বললে?"

বিভাস বললে "জিজ্ঞেস করিনি, মেয়ে ছেলে কিনা?"

লতিকা একটু হেসে বললে—"ও—আচ্ছা যাচ্ছি—!"

প্রায় পরক্ষণেই দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকেই লতিকা—অবাক—"আরে—!!"

সুবর্ণা উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "অবাক হবার কিছু নেই ভাই—আমি সংসারী, ছেলে সামলাতেই দিন যায়, কিন্তু তুই তো একবার যাসও না।" বড় গোছের খামে একখানা নিমন্ত্রণ পত্র হাতে দিয়ে বললে, "কাল আমার ছেলের ভাত, আসবি কিন্তু। আর দেরী করবো না, অনেক যায়গায় এখনও যেতে হবে, ওদিকে ছেলে ফেলে এসেছি! বিয়ের পর থেকে বন্ধুদের কারো সঙ্গে বিশেষ দেখাশোনা হয়না—সকলকে তাই নেমন্তন্ন করবো ভেবেছি—আচ্ছা ভাই চল্লুম, নিশ্চয়ই আসবি কিন্তু"—লতিকাকে কোন কথাই সুবর্ণা বলতে দিলে না। মহাব্যস্ত হয়ে চলে গেল।

লতিকা তার ছোট্ট গাড়ী চালিয়ে অফিসে চল্‌লো, কিন্তু অফিসের পাশ দিয়ে সে চলে গেল, থাম্‌লে না। মনে যে ভাবনার স্রোত এসেছে তাকে আজ সে ইচ্ছে করেই প্রশ্রয় দিলে। অনেক দিন পরে আবার বন্ধুদের সঙ্গে কাল দেখা হবে...সুবর্ণার বাড়িতে...অশেষের সঙ্গেও দেখা হবে। আশমানী রংয়ের সাড়ীটাই সবচেয়ে ভাল, সাদা জরির কাজ আলোতে কি সুন্দর দেখায়! লতিকার মনে ভীষণ চঞ্চলতা জাগলো। ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড ধরে অনেকদূর গিয়ে হঠাৎ গাড়ী ঘুরিয়ে নিলে, ফেরার পথে মার্কেটে ঢুকে যা ভাল লাগলো কিন্‌লে... বাড়ি ফিরে সে রাতে আর ভাল ঘুম হলো না। কত কী সম্ভাবনার—ঠিক স্বপ্ন দেখলে না,—তন্দ্রাতুর চিন্তা করলে।

অবশেষে সেই উৎকণ্ঠিত মূহুর্ত্ত যেন একটু তাড়াতাড়িই এগিয়ে এল। লতিকার গাড়ী এসে থামলো। বন্ধুরা অনেকে ছুটে এসে লতিকাকে বাড়ির ভেতর টেনে নিয়ে গেল। হাসি, তামাসা একটু অহেতুক উত্তেজনাময় আবহাওয়া—তা অবশ্য উৎসব মাত্রই এমন হয়! কিন্তু যত সময় কাট্‌তে লাগলো লতিকার ততই বিশ্রী বোধ হতে লাগলো। এই উৎসবের সুরের মাঝখানে নিজেকে তার মনে হতে লাগলো বেসুরো। বন্ধুদের সকলেরই বিয়ে হয়েছে, তাদের অনেকেরই স্বামীরা সঙ্গে আছেন। সকলেরই মুখে হয় স্বামী, না হয় শ্বশুর, নয় দেওর এদেরই সব কথা। কার স্বামী কি পছন্দ করেন, কার শ্বশুর কাশীবাসী হতে চান, কার দেওর ফিল্ম কোম্পানিতে কাজ করে মাইনে পায়না—এ সবে লতিকার কি?···কিন্তু কাকেই বা সে বারণ করে, সকলেরই তো ওই এক কথা! কেউ কেউ লতিকাকে বললে, "তুই বেশ আছিস্ ল'তি, কোন ঝঞ্ঝাট নেই।" লতিকা কিছু বললে না, শুধু মনে মনে এর জবাব দিলে, "এমন 'বেশ' তো তোমরাও ইচ্ছে করলে থাকতে পার্‌তে।"

একটু পরেই অশেষ ঘরে ঢুকলো, গায়ে গেঞ্জী, মুখে পাইপ। বয়সের সঙ্গে চেহারা যেন আরও ভাল হয়েছে। অনেকের সঙ্গেই আলাপ কর্‌লে সে, লতিকার পাশে তিনতি বসে ছিল তার সঙ্গেও···সুবর্ণা লতিকাকে দেখিয়ে বললে "দাদা,—লতি!"

অশেষ বেশ একটু আশ্চর্য্য হ'য়ে কাছে এসে বললে, "আমি একেবারেই চিন্‌তে পারিনি···তোমার চেহারা এমন হয়ে গেছে!!" একটু সাধারণ আলাপ হ'লো।

সুবর্ণা লতিকাকে পাশের ঘরে নিয়ে গেল··শ্যামবর্ণা, তবে সুশ্রী, সিঁথির সিঁদুর বেশ মানিয়েছে মুখখানিতে। সুবর্ণা পরিচয় করিয়ে দিলে: "বৌদি"। লতিকা খানিকক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে তার দিকে চেয়ে রইল। তারপর কোন আপত্তি সে শুনলে না,—নিজের গলার হারগাছি তার গলায় পরিয়ে দিলে। অনেক রাত হল উৎসব শেষ হতে। সকলেরই সাথী আছে, লতিকাই শুধু একা। সে অবশ্য একলা যেতে একটুও ভয় পায় না···দু'একবার আপত্তিও সে করলে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সুবর্ণার অনুরোধে অশেষ তাকে পৌছে দিতে রাজী হলো।

অশেষ গাড়ী চালাচ্ছে, লতিকা তার পাশে বসে। অশেষ বল্লে—"সেই বাড়ীতেই আছ তো?'

লতিকা জবাব দিলে "হ্যাঁ"

মানুষের আশা বড় নির্লজ্জ, কিছুতেই শেষ হতে চায় না। প্রতি মুহূর্ত্তেই লতিকা আশা করছে অশেষের কাছ থেকে পুরোনো দিনের ছাঁচে ঢালা দু'একটা কথা—যার জবাবে হ্যাঁ হবে না', বা 'না'ও হবে না, শুধু কথাই বেড়ে যাবে এমনি ধরণের কত কথাই লতিকা মনে মনে সাজিয়ে রাখছিল, কিন্তু প্রতিপক্ষ একেবারেই নির্ব্বিকার।

অশেষ কথা বল্লে গাড়ী থামিয়ে, "তোমার গাড়ীখানা আজ আমায় নিয়ে যেতে হচ্ছে, কাল সকালেই ড্রাইভারকে দিয়ে পাঠিয়ে দোবো কেমন?"

লতিকা কিছুই বলতে পারলে না! শুধু মাথা নেড়ে সম্মতি জানালে।···অশেষ গাড়ী চালিয়ে চলে গেল, যতদূর দেখা যায় লতিকা সেই দিকে চেয়ে রইল···অচঞ্চল নির্ণিমেষ—তার চোখের সামনে পৃথিবীর এ কী ছবি! একটানা অন্ধকারের মধ্যে মোটরের এতটুকু আলো অনেক দূরে গিয়ে মিলিয়ে গেল।

অনেক চেষ্টা করেও সে রাত্রে লতিকার ঘুম হলো না। রাত তখন দুটো, লতিকা বিছানা ছেড়ে উঠে আলো জ্বেলে ড্রেসিং টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। মুখের প্রতিটি রেখা ভালো করে দেখলে। নিশ্চয় তার চেহারা খুব খারাপ হয়েছে···তাকে চিনতে পারা যায় না! সত্যিই তো, এরি

মধ্যে সে যেন বুড়ি হয়ে গেছে। ক্রীম পাউডার রুজ ভালো করে মুখে লাগিয়ে ভ্রূ এঁকে অনেকক্ষণ ধরে সাজলে...তারপর আটবছর আগেকার একখানা ছবি বের করে মিলিয়ে দেখলে কথাটা মিথ্যে নয়, অশেষের কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়!!

পুরোনো দিনের সমস্ত কথা তার মনে পড়তে লাগলো। শুধু অশেষ নয় আরো অনেকেই তাকে আকাঙ্খা করতো। বাড়ির আশপাশের ছেলেরা কত চেষ্টা করেছে,... যাতায়াতের পথে কত লোক পিছু নিয়েছে। কিন্তু এখন তো আর তেমন হয় না, যদি বা কেউ কখনও উৎসুক দৃষ্টি হানে আবার তখনই নির্ব্বিকার ভাবে ফিরিয়ে নেয়...আট বছর আগেকার সেই অশেষ, আজ এতটা রাস্তা পাশাপাশি বসেও একটা কথা বলবার উৎসাহ পর্য্যন্ত পেল না...সত্যিই সে বুড়ি হয়েছে। প্রকৃতির নির্ম্মম নিয়ম, ঠিক সময়ে নিজের পাওনা আদায় করে না নিলে এমনিই ফাঁকে পড়তে হয়। লতিকার মন ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। ক'দিন আর অফিসেও সে গেল না।

সেদিন দুপুরে ঘুমিয়ে পড়লো, বিকেলে ঘুম থেকে উঠে বাইরের ঘরে বসে চা খাচ্ছে—সামনের উঠোন থেকে কে যেন চীৎকার করে ডাকছে "বিভাস, বিভাস—"

লতিকা ঘর থেকে বল্লে—"কে?"

ছেলেটি দোরগোড়ায় এগিয়ে এসে গলা নামিয়ে জিজ্ঞেস করলে, "বিভাস আছে?"

একলা বসে থাকতে লতিকার ভাল লাগছিলো না, তাই বল্লে—"তুমি একটু বসো, বিভাস এলো বলে—"

ছেলেটীর নাম শুভেন্দু, বিভাসের সঙ্গে পড়ে। অনেকক্ষণ লতিকা তার সঙ্গে কথা বললে...কিন্তু বিভাস এলো না দেখে সে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়ালো—"আচ্ছা চলো তোমার সঙ্গে লেক অবধি যাই...ওখান থেকে তুমি বাড়ী যাবে আর আমিও ফিরবো"...

গল্পের এই পর্য্যন্ত বলা হলে দিব্যেন্দু হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো।

গৌরী বল্লে—"কি হলো গল্প শেষ?"

দিব্যেন্দু বল্লে—"না, বাকীটা তোমায় আসল জিনিস থেকে পড়ে শোনাব"—খবরের কাগজে মোড়া একখানা ছেঁড়া খাতা এনে শেষ পাতাটা বের করে বল্লে—"লতিকার হাতে লেখা ডাইরী"। সে পড়ে যেতে লাগলো, "দাদা, আমার জীবনের সমস্ত ইতিহাস এই ডাইরীতে লিখিয়া রাখিয়াছি, আজ ইহার শেষ পৃষ্ঠায় বিশেষ করিয়া আপনাকে উদ্দেশ্য করিয়া লিখিতেছি।

ক্ষমা চাহিতে আমি পারি না, কারণ এ অপরাধের ক্ষমা নাই। যখন আমার সত্যিকার যৌবন ছিল তখন আমি বহুবার নিজেকে বঞ্চিত করিয়াছি! কিন্তু যেদিন দেখিলাম যে বিগতযৌবনা নারীর কোন মর্য্যাদা নাই, কোন পুরুষ তাহার সহিত দুটো কথা বলিবার উৎসাহ পর্য্যন্ত পায় না সেদিন ক্ষোভ ও দুঃখের আর অবধি রহিল না। নিজের ভুলে আমি নিজেরই সর্ব্বনাশ বুঝিতে পারিলাম।

একদিন আমি নিজেকে কাহারো ভোগ্য বা উপভোগ্য বলিয়া ভাবিতে ঘৃণা করিতাম, কিন্তু আজ...? মানুষের মনে কামনা পূর্ণ মাত্রায় রহিয়াছে,তাহার স্বাভাবিক পরিণতিও আছে। কিন্তু আমার বর্ত্তমান বয়সে তাহার সম্ভাবনা কোথায়? অথচ সমস্ত চিত্তবৃত্তি আচ্ছন্ন করিয়া কামনার বহ্ন্যুৎসব চলিয়াছে। মনের এই নিদারুণ অবস্থায় শুভেন্দুর সাথেই আজ আমি ভাসিয়া চলিলাম, কোথায় জানি না। অতীত ও ভবিষ্যত আজ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। আছে, শুধু বর্ত্তমান আমি আর শুভেন্দু।

ইতি—

আপনার হতভাগিনী লতিকা।

দিব্যেন্দু ছেঁড়া পাতাটা আবার কাগজে মুড়ে ফেললে, একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে গৌরী উঠে দাঁড়িয়ে বললে "বাড়ী যাই, অনেকক্ষণ হলো এসেছি—"

নিঃশব্দে দিব্যেন্দু গৌরীর সঙ্গে সিঁড়ি পর্য্যন্ত এলো। গৌরী নামছে......দিব্যেন্দু বললে—"শোন—" গৌরী ফিরে দাঁড়ালো—

ধরা গলায় দিব্যেন্দু বল্‌তে লাগলো, "গল্পটার শেষ তোমাকে বলা হয়নি গৌরী, স্কুলে যখন পড়তুম আমারই নাম ছিল শুভেন্দু ...লতিকার কাছ থেকে আমি পালিয়ে এসেছিলুম।"

নির্ব্বাক বিস্ময়ে গৌরী চেয়ে রইল, দিব্যেন্দু মাথা নীচু করলো।

এই দেশেরই মেয়ে

—শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

পুরাণো দিল্লীর ধ্বংস-শেষের মাঝে আজও দেখা যায় পৃথ্বিরাজের কেল্লা, প্রাসাদের জীর্ণ থামগুলি পড়ি-পড়ি করে আজও পড়েনি।

ওর সঙ্গে জড়িয়ে আছে হিন্দুস্থানের এক শাশ্বত কাহিনী।

দৃশদ্বতীর . তীরে শত্রুসমাবেশ হয়েছে, দিল্লীর পৃথ্বিরাজ ও রাজস্থানের সমরসিংহ তাদের গতিরোধ করে দাঁড়ালেন নারায়ণপুর গ্রামে তিরৌরীর ক্ষেত্রে। প্রথম বারের যুদ্ধে সাহাবুদ্দিন শৃগালের মত পলায়ন করেছিল, এবার সে ছলের আশ্রয় নিল—লড়াই আমি করবো না, শুধু আমার উপরওয়ালার আদেশ পেলেই ফিরে যাই!

সত্যভাষী হিন্দুরা সেই কথাই বিশ্বাস করলো, আর তারই ফলে অতর্কিতে নদী পার হয়ে শত্রুরা তাদের আঘাত করলো, পৃথ্বিরাজ ও সমরসিংহ প্রাণ দিয়েও সে আঘাতকে প্রতিরোধ করতে পারলো না। হিন্দুর স্বাধীনতার সূর্য্য দৃশদ্বতীর তীরে অস্ত গেল শত শত বছরের জন্য।

ভগ্নদূত দিল্লীর প্রাসাদে খবর পৌঁছে দিল—শত্রু আসছে!

রাণী সংযুক্তা অধীর হলেন না, শত্রুর কাছে নতজানু হওয়ার চেয়ে মৃত্যুও ভালো। এতদিন স্বামীর মঙ্গল কামনায় তিনি উপবাস করেছিলেন, এবার স্বামীর অনুগমন করার জন্য প্রস্তুত হলেন।

চিতা সাজানো হোল।

রক্তবস্ত্র পরে রাণী অগ্নি প্রদক্ষিণ করে চিতার মধ্যে প্রবেশ করলেন।

প্রাসাদের আরো বহু রমণী সংযুক্তার পদানুসরণ করলেন।

দিল্লীর রাজপ্রাসাদ শ্মশান হয়ে গেল।

সাহাবুদ্দিনের বাহিনীকে আরেক প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হোল দিল্লীদুর্গের সামনে। হিন্দুর মৃতদেহগুলির উপর দিয়ে সাহাবুদ্দিন যখন দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করলো সেখানে তখন শূন্য গৃহগুলির মাঝে বাতাসের হাহাকার জেগেছে, শ্মশানের নীরবতা ব্যথাতুর করে রেখেছে চারিপাশ।

এইটিই বোধ হয় ভারতভূমির ইতিহাসে প্রথম জহরব্রত।

সংযুক্তা আজ আর নেই সত্য, কিন্তু তাঁর চিতাভস্ম কণা কণা করে ছড়িয়ে রেখে গেছে ভারত মহিলার অন্তরের আকাশে।

বিজনদা'র চিঠি

আমার আদুরে ভাই বোনেরা—

তোমাদের প্রতিযোগিতার ফলাফল আসছে বারে জানাবো। …"এর শেষ কোথায়" এবারে বার হ'লো। এর পরের অংশ তাড়াতাড়ি তোমরা লিখে পাঠিও। মনে আছে তো যে ষোলটা পরিচ্ছেদে উপন্যাসটা শেষ করতে হবে। …স্নেহ রইলো তোমাদের জন্যে। আজ আসি, কেমন?

তোমাদের : বিজনদা

এর শেষ কোথায়……

(আসরের ভাই-বোনেদের লেখা ধারাবাহিক বারোয়ারী উপন্যাস)

(১৩)

—শ্রীঅলক চক্রবর্ত্তী (৯৩৪)

মানুষের জীবনে কত অসম্ভব ঘটনা ঘটে। স্বপ্নেও যা ভাবা যায় না তাই সত্য হয়ে ওঠে। বীরু আর রাণুর মতো ছেলে মেয়ে—জীবনে বাঁধন যাদের আলগা, শিক্ষা জ্ঞান অভিজ্ঞতা যাদের স্বল্প, জীবনের প্রবল স্রোতে খড়ের কুটোর মতো যাদের ভেসে যাওয়ার কথা—ভাগ্য-দেবতার পরম কৌতুকের পাত্র হয়ে আজ তারা আশ্রয় পেলো কল্যাণী দেবীর বাড়ীতে। স্নেহে যত্নে আদরে ভালবাসায় আজ তারা দু'জনে মানুষ হ'য়ে উঠছে কল্যাণী দেবীর অপরিসীম আগ্রহে—যাঁর সঙ্গে রক্তের কোন সম্পর্ক এদের নেই, আত্মীয়তার কোন যোগসূত্র নেই, তবু জীবনে এরা জড়িয়ে গেল কল্যাণী দেবীর জীবনের সঙ্গে। অদ্ভুত অবিশ্বাস্য মনে হয় রাণুর এসব কথা। গ্রামের শীতল ছায়ায় ছায়ায় শিক্ষাহীন রুচিহীন আদর্শ-বিহীন জীবন অতিবাহিত হয়ে যাবে সাধারণ সুখ দুঃখের অনুভূতি নিয়ে। আরো পাঁচটা গ্রামের ছেলের মতো তারা বড়ো হবে, অন্ধ সংস্কারে বিড়ম্বিত করে একটা বাঁশ নিয়ে বা এক ছটাক জমি নিয়ে মামলা
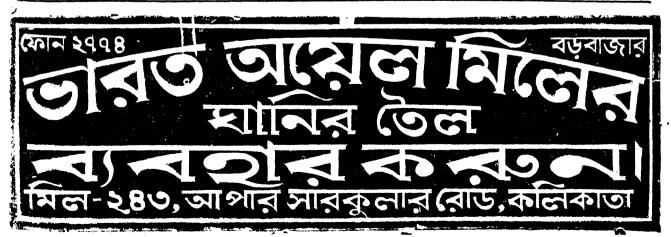
বাজি করবে বীরু, আর পুকুর পাড়ে বাসনের গাদা নিয়ে বসে রাণু পরের ঘরের কুৎসা-কাহিনী সালংকারে সংগিনীদের কাছে গল্প করবে।

এমনি নির্দিষ্ট ছক্-কাটা জীবন তো ওদের জন্যে অপেক্ষা করছিল। কিন্তু কোথা দিয়ে কি হয়ে গেলো! জীবনের বিচিত্র অনুভূতি ও সংঘাতের মধ্যে দিয়ে সে যে বড়ো হ'তে পেরেছে একথা মনে করে রাণুর মন কৃতজ্ঞতায় ও অপূর্ব আনন্দে ভরে উঠলো, করজোড়ে প্রণাম জানাল ভাগ্য-দেবতার উদ্দেশ্যে। হঠাৎ একটা কোমল স্পর্শ পেয়ে রাণু চমকে তাকাল পিছন দিকে, আনন্দে চোখমুখ তার রোদ-রাঙা দিনের মত হেসে উঠলো: মা মণি! তুমি!

: ভয় পেয়েছিলি?

: না ভয় পাইনি, চমকে উঠেছিলুম।

: একা এই ভর সন্ধ্যেবেলায় বারান্দায় দাঁড়িয়ে দু'হাত তুলে কাকে প্রণাম জানাচ্ছিস রে পাগলী মেয়ে?

: প্রণাম জানাচ্ছিলুম আমার ভাগ্য দেবতাকে যে আমার জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে দিলো তোমাকে—তুমি আমার মা, মা মণি, তোমার জন্যে আজ আমি শিক্ষা পেয়েছি, জ্ঞান পেয়েছি!

কল্যাণী দেবী সকৌতুকে কানে আঙুল দিলেন, মিষ্টি হেসে বল্লেন: নিজের প্রশংসা নিজের কানে শোনা মহাপাপ! তোকে কাছে পেয়ে আমি তো নিজেকে সার্থক করে তুলেছি। মনে মনে ভাবতুম আমার যদি আর একটা মেয়ে থাকতো—তাকে আমার মনের মতো করে গড়ে তুলতুম।

—কেন রেবাদি, সেও তো তোমার মেয়ে মা, রাণু হাসতে হাসতে বললো।

: হ্যাঁ রেবাও তো আমার মেয়ে, কিন্তু সে গড়ে উঠেছে তার শিক্ষা দীক্ষা ও বিজাতীয় আবহাওয়ায়। আমি তাকে গড়তে চেয়েছিলুম নতুন করে, কিন্তু দেখলুম আগুনে পোড়-খাওয়া মূর্ত্তিকে নতুন করে গড়া যায় না, তাকে ভাঙ্গা যায়। কাজেই চাইছিলুম নতুন একটা মেয়েকে যে নিজের দুঃখ সুখ নিয়ে বাঁচতে চায়, যে নিজেকে নিয়ে সুখী থাকতে পারে না—সে চায় আপনাকে এবং আপনার পরিবেশকে সুন্দর করতে—এমনি প্রার্থনা যখন করছিলুম তখন তোকে পেলুম।

: বনের পশুকেও জয় করতে পারো মা তুমি। প্রথম যেদিন এলুম তোমার বাড়ী, রিক্সা থেকে নামতে সাহস হচ্ছিল না—ভাবছিলুম ফিরে যাবো আমার নিজের গাঁয়ে।

: এখন নিজের গাঁয়ে ফিরে যেতে ইচ্ছে করে না?

: করে বৈকি, কিন্তু তুমি রয়েছ যে, তোমাকে ছাড়তে সাধ যায় না। কিন্তু তবু আমাকে ফিরে যেতে হবে।

কল্যাণী দেবী চমকে উঠলেন সে কথা শুনে। মুখখানা রক্তশূন্য হয়ে এলো। নিজেকে সামলে নিয়ে ধীর শান্ত স্বরে বল্লেন: এর মধ্যেই যাওয়ার কথা কেন মা?

রাণু মুখ তুলে তাকাল তাঁর দিকে। তারপর ধীর শান্ত গলায় বল্লো: নিজেকে নিয়ে অনেক ভেবেছি মা, তোমার ঘরে রইলুম অনেক দিন। নার্সিং আর ধাত্রী-বিদ্যাটা মোটামুটি শিখে নিয়েছি। এবার ফিরে যাই নিজের গ্রামে, যেটুকু পারি গ্রামের সেবা করি, বীরুদা যে কাজ সেখানে সুরু করে এসেছে সে কাজে যোগ দিই। জীবনে আমার তো আর কোন বন্ধন নেই মা!

রাণুর কণ্ঠস্বর যেন ভেজা-ভেজা। কেন কে জানে! কল্যাণী দেবী তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়ে তারপর দু'হাত দিয়ে তিনি তাকে কাছে টেনে নিয়ে বল্লেন: অভিমানে একথা বলছিস না তো?

: না মা, অভিমান করবো কেন?

: তুই আমায় বাঁচালি মা, আমি জানি আমাদের দেশে মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার সংগে স্বাস্থ্যরক্ষার প্রচারটা আরো ব্যাপক হওয়া দরকার। এও আমি তোকে বলে যাচ্ছি রাণু: যতদিন না এদেশে মেয়েরা সর্বক্ষেত্রে

নিজেরা অগ্রসর হচ্ছে, ততদিন এ জাতির মুক্তি নেই।

: সে কথা তোমার কাছ থেকে আগেই জেনেছি মা। তোমার কাছে এসে আমি নতুন জীবন পেয়েছি। আমার মা আমাকে জন্ম দিয়েছিলেন আর তুমি আমাকে দিলে জীবন, তাইতো শুধু মা বলে তোমায় ডাকতে ইচ্ছে যায় না, ডাকি তোমায়: মা মণি বলে, না হলে মন যে কিছুতেই ভরে না! কল্যাণী দেবী আদর করে তার মাথাটা একটু নেড়ে দিলেন, তারপর চাপা গলায় বল্লেন: একটা কথা রাখবি মা! রাণু অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল: কি মা?

: আমি আশা করছিলুম শিক্ষা শেষ হলেই তুই দেশে ফিরে যেতে চাইবি—আজকে তোর মুখে দেশে ফিরে যাবার কথা শুনে আশ্বস্ত হলুম, দেখলুম কলকাতা তোর মন ভোলাতে পারে নি, তোর আদর্শ তুই ভুলিস নি। এ জীবনে অনেক মেয়ে দেখলুম, অনেক বড়ো কথা শুনলুম, কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই দেখি সব শূন্যে মিলিয়ে যায়। প্রার্থনা করি তোর আদর্শ তুই সার্থক করে তোল।

রাণু হাঁটু গেড়ে পায়ের তলায় বসলো, কল্যাণী দেবীর পা স্পর্শ করে বল্লো: আশীর্বাদ করো মা।

দু'হাত দিয়ে তাকে তুলে কাছে নিয়ে কল্যাণী দেবী বল্লেন: নিত্যই তো তোকে আশীর্বাদ করছি মা। কিন্তু শুধু আশীর্বাদে কি কাজ হয়? আমি কি বলি জানিস্?

: কি?

: গ্রামে গিয়ে কতটুকু কাজ তুই করতে পারবি?

: কেন পারবো না?

: উপকরণ কই মা, আয়োজন কোথায়?

রাণু চুপ করে রইল, সে কথার কোন উত্তর দিলো না। কি উত্তর দেবে সে ঠিক করতে পারছিল না। সত্যি তাদের গ্রাম নিতান্ত ছোট নয়, লোকসংখ্যা হাজারের ওপর। সে একা এদের কতটুকু করতে পারবে, তার চেষ্টা মরুভূমিতে বারি-বিন্দুবৎ: নানা ভয় ভাবনায় তার ছোট্ট মন দুলে উঠলো। উত্তর তার যোগাল না কিছু।

কল্যাণী দেবী বল্লেন: আমি কিন্তু আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছি। আমার যা টাকা আছে সব টাকা আমি তোকে দিয়ে যাবো।

: টাকা? টাকা নিয়ে আমি কি করবো মা?

: টাকা নিয়ে কি করবি? কল্যাণী দেবী হাসলেন। কী প্রশান্তি ও নির্ভয়তা সে হাসিতে। টাকা নিয়ে তুই তোর আদর্শকে রূপ দিবি, মেয়েদের অবৈতনিক স্কুল আর সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠা করবো তোদের গ্রামে। তোর ওপর ভার থাকবে সেবাশ্রমের। এই সেবাশ্রমে শুধু সকল শ্রেণীর মেয়েরা চিকিৎসা ব্যাপারে পাবে সেবা। আমি দেখতে চাই সেবা সম্পর্কে তোর যে আদর্শ আছে মনে মনে, বাইরের জগতে তুই তাকে কেমন করে রূপ দিস্। জীবনে অনেক টাকা নষ্ট করেছি, অপব্যয় করেছি, বিলাসিতায় ব্যয় করেছি। আজকে বয়েস বেড়েছে, তাই পুরাণো দিনের ভুলগুলো নতুন করে চোখে পড়লে লজ্জা পাই। অতীত দিনের সে লজ্জাকে আমি মুছে দিতে চাই মা, তুই আমায় সাহায্য কর।

কল্যাণী দেবী রাণুর হাত দুটো ধরলেন। অতীত দিনের কথা ভেবে দুঃখে আবেগে উত্তেজনায় কাঁপতে লাগলেন। রাণু কী বলবে ঠিক করতে পাচ্ছিল না এমনি সময় বীরু এসে দাঁড়াল তাদের কাছে। কল্যাণী দেবী মুখ তুলে তাকালেন: সুপুরুষ বীরু—তিন বছরে সে অনেক বড় হ'য়ে গেছে।

—কি হ'য়েছে মা মণি—বীরু হাসি মুখে জিজ্ঞাসা করলো।

কল্যাণী দেবী ভাবছিলেন কি বল্‌বেন বীরুকে।

রাণু হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো: বীরুদা এসে গেছে। সব প্রশ্ন জিজ্ঞাসার সদুত্তর বীরুদাই দিতে পারে একথা মনে মনে ভেবে রাণু আশ্বস্ত হলো।

(তারপর?)

খেলার মাঠে

—শ্রীউমেশ মল্লিক

কলিকাতায় প্রথম বিভাগীয় হকি লীগ খেলা যথারীতি অনুষ্ঠিত হচ্ছে। গত সপ্তাহের ফলাফল :—

শুক্রবার ১৮ই ফেব্রুয়ারী :—
বি এণ্ড এ আর—২ পাঞ্জাব—০
লিলুয়া—১ আর্মেনিয়ান্স—০

শনিবার ১৯শে ফেব্রুয়ারী :—
ইষ্ট বেঙ্গল—২ রেঞ্জার্স—০
কাষ্টমস্—২ আর্মেনিয়ান্স—১
ডালহৌসী—০ মেসারার্স—০

সোমবার ২১শে ফেব্রুয়ারী :—
মোহনবাগান—১ আর্মেনিয়ান্স—১
পুলিশ—৪ বি এণ্ড এ আর—০
লিলুয়া—১ পাঞ্জাব স্পোর্টস—১

আন্তঃ প্রাদেশিক হকি প্রতিযোগিতার প্রতিনিধি নির্ব্বাচনে একজন বাঙ্গালীও নির্ব্বাচিত হয়নি। এ বৎসরের যুদ্ধ-সংক্রান্ত কোন বিশেষ কাজে নিযুক্ত থাকায় আর, কারের যোগদানে অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে। দলের অধিনায়কত্ব করবেন বি, এন, আরের ট্যাপসেল। নিম্নলিখিত খেলোয়াড়রা বাংলার পক্ষে খেলবেন : স্কট, ট্যাপসেল, মিড্, লাড্ডী, গ্যালিবার্দ্দি, কাপুর, সুইনি, চারঞ্জীৎ রায়, জানসেন, ও নিস।

* * *

বেঙ্গলী বক্সিং এসোসিয়েশনের উদ্যোগে যে প্রাদেশিক মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিদ্বন্দ্বীতার ব্যবস্থা হয়েছে আমরা তা সমর্থন করি। প্রাদেশিক প্রতিযোগিতা বা সর্ব্ব ভারতীয় প্রতিযোগিতায় বাঙ্গালীরা কোন সাফল্যেরই পরিচয় দিতে পারে নি। তাদের মধ্যে এরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করলে ব্যাপকভাবে প্রচারের সুবিধা অনেকটা হবে বলে মনে হয়।

* * *

মহিলাদের সর্ব্ব বঙ্গীয় স্পোর্টসের দিন আগামী ৫ই মার্চ্চ ধার্য্য করা হয়েছে। ২০শের পরিবর্ত্তে ২৮শে ফেব্রুয়ারী যোগদানের শেষ দিন বলে সংবাদ প্রচারিত হয়েছে। ইতিমধ্যে বহু যায়গা থেকে এ সম্বন্ধে আগ্রহ প্রকাশ করে যোগদানের কথা শুনা যায়। মিস্ রাজকুমারী সিংহের সঙ্গে ৮নং সরকার বাই লেনে অনুসন্ধিৎসুরা পত্রালাপ করুন।

* * *

ইষ্ট জোনের সেমি-ফাইনালে চারদিন-ব্যাপী খেলাটি গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী থেকে বাঙ্গালা দেশ মাদ্রাজের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করেছে। বাঙ্গালাদেশ ১ম ইঃ ২৩৫ রাণ করে এবং প্রতিপক্ষ দল মাত্র ১০২ রাণে আউট হয়। প্রথমে বাঙ্গলাদেশ বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি। জব্বর ও কমল ভট্টাচার্য্য ১ম ইঃ ৮০ ও ৬৭ রাণ সংগ্রহ করেন। ২য় ইঃ বাঙ্গলা দেশ ২৬৬ রাণ করে।

তার মধ্যে নির্ম্মল চ্যাটার্জ্জীর ১১২ রাণ এবং অশি চ্যাটার্জ্জীর ৫৩ রাণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মাদ্রাজ দল ২য় ইনিংসে ২৫৬ রাণ করে ১৩৩ রাণে পরাজয় বরণ করে। এদলে প্রথম ইনিংসে গোপালন্ (অধিনায়ক) একটিও রাণ করতে পারেন নাই কিন্তু দ্বিতীয় ইনিংসে তাহার ৮৬ রাণ ও রিচার্ডসনের ৬২ বিশেষ প্রশংসনীয়। এ দলের বোলিং-এ রাম সিং বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন—দু' ইনিংসে তিনি ১৩টি উইকেট পান। বেঙ্গলের বোলিং-এ কমল ভট্টাচার্য্য, এস ব্যানার্জ্জী ও বিমল মিত্র বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন।

স্বর্গের সন্ধানে

—শ্রীজ্যোতিঃ প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়
এম, এ, বি, এল,

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বাইবেলে স্বর্গের কল্পনা রহস্যময়। আশার প্রতীক ও ক্ষমার নিকেতনস্বরূপ।

গীতায় স্বর্গ সম্বন্ধে বর্ণনাও সুস্পষ্ট নহে। দশম অধ্যায় ৩৪ শ্লোক—

"মৃত্যুঃ সর্ব্বহরশ্চাহমুদ্ভবশ্চ ভবিষ্যতাম্।"

সংহর্ত্তাদের মধ্যে আমি সর্ব্বসংহারক মৃত্যু, ভবিষ্যতে যাঁহারা কল্যাণ লাভ করিবে আমি তাহাদের অভ্যুদয় বা উৎকর্ষের হেতু।

নবম অধ্যায় ২০ শ্লোক—

"তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোকে—
মশ্নন্তি দিব্যান দিবি দেবভোগ্যান্"

তাঁহারা (ত্রিবেদজ্ঞ যাজ্ঞিকগণ) পুণ্য ফলস্বরূপ পবিত্র স্বর্গলোকপ্রাপ্ত হইয়া বিবিধ দেবভোগসমূহ ভোগ করিয়া থাকেন।

নবম অধ্যায় ২১ শ্লোক—

"তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্তলোকং বিশন্তি
এবং ত্রয়ী ধর্ম্মমনু প্রপন্না
গতাগতং কামকামা লভন্তে"

সেই স্বর্গকামী লোকসকল তাহাদের প্রার্থিত বিপুল স্বর্গসুখ ভোগ করিয়া পুণ্যফল ক্ষীণ হইলে পুনরায় মর্ত্তলোকে প্রবেশ করেন। এইরূপে বেদত্রয়বিহিত ধর্ম্মের অনুগত ভোগকামী ব্যক্তিগণ এই সংসারে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করেন।

এই দুইটি (২০ ও ২১ নং) শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে মানব পার্থিব দেহত্যাগের পর কিছুকাল স্বর্গাদিলোকে বাসের পর কর্ম্মের ফল ভোগান্তে পুনরায় পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু

দ্বিতীয় অধ্যায় ২২ শ্লোক—

"বাংসাসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা
—ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহি।"

অর্থাৎ মানুষ যেমন পুরাতন জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করে, আত্মাও তদ্রূপ পুরাতন জীর্ণ দেহ সকল ত্যাগ করিয়া নূতন দেহসমূহ প্রাপ্ত হয়।

প্রশ্ন এই যে মানুষ একবস্ত্র পরিত্যাগের অব্যবহিত পরেই নূতন দ্বিতীয় বস্ত্র পরিধান করে। পুরাতন বস্ত্র ত্যাগের পর মুহূর্ত্তেই নূতন বস্ত্র পরিহিত হয়। সাধারণ যুক্তিতে নববস্ত্র পরিধানের সহিত নূতন জন্মের তুলনা বজায় রাখিলে উপরোক্ত দুইটি শ্লোকের (২০ ও ২১নং) তাৎপর্য্য পৃথক স্বর্গলোকের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিচারসহ হয় কি ? কিন্তু বস্ত্র পরিবর্ত্তনের উপমা শুধু দেহান্তরের রূপক হিসাবে ধরিয়া ও সময়ের ব্যবধান-প্রশ্ন না তুলিয়া যুক্তির দ্বন্দ্ব মিটান যায়। এই প্রবন্ধে জন্মান্তরবাদ বা কর্ম্মফল প্রাপ্তি আলোচনার বস্তু নহে; স্বর্গ বলিয়া কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে কি না, এই সনাতন ও মধুর প্রশ্ন লইয়া একটু সময়ক্ষেপ মাত্র। (Aldous Huxley একটি উপভোগ্য পুস্তকে (Jesting Pilate) লিখিয়াছেন :

"The Other World—the world of metaphysics & religion—can never possibly be as interesting as this world and for an abvious reason. The Other World is an invention of the human fancy and Shares the limitations of its creator. This world, on the other hand the world of the materialists, is the fantastic and incredible invention of—well not in any case of Mrs Annie Besant."

রবীন্দ্রনাথ তাই স্বর্গকে এই মাটির ধরণীতে সৃষ্টি করিয়াছেন :—

স্বর্গ কোথায়

জানিস কি তা ভাই ! তার ঠিকানা নাই !
তার আরম্ভ নাই, নাইরে তাহার শেষ
ওরে, নাইরে তাহার দেশ,
ওরে, নাইরে তাহার দিশা,
ওরে নাইরে দিবস, নাইরে তাহার নিশা !
ফিরেছি সেই স্বর্গে শূন্যে শূন্যে
ফাঁকির ফাঁকা মানুষ !
কত যে যুগ যুগান্তরের পুণ্যে
জন্মেছি আজ মাটির পরে ধুলা মাটির মানুষ !
স্বর্গ আজি কৃতার্থ তাই আমার দেহে,
আমার প্রেমে, আমার স্নেহে
আমার ব্যাকুল বুকে,
আমার লজ্জা আমার সজ্জা আমার দুঃখে-সুখে !
স্বর্গ আমার জন্ম নিল মাটি-মায়ের কোলে !
বাতাসে সেই খবর ছোটে আনন্দ-কল্লোলে !"

এই স্বর্গকে অন্য দৃষ্টিভঙ্গিতে অতি সহজে দেখা যায়—"Heaven lies about us in our infancy."

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কশ্চিৎ

(কঠোপনিষৎ ১৮)

—শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার আই, সি, এস

তুললে যখন খড়্গ তুমি
আমার শিরে হানতে
মিথ্যা তোমার ভয় দেখানো
সে কথা কি জানতে।

দেখে তোমার চোখ রাঙানি
বজ্র কঠোর খড়্গপাণি
হাস্য আমার উঠল ফুটে
আপনি অধর প্রান্তে।
তুললে যখন খড়্গ তুমি
আমার শিরে হানতে॥

মারতে কারে কে পারে রে
মারার নাহি অর্থ
মৃত্যু ভয়ে ক্ষুণ্ণ হওয়াও
তেমনি রে নিরর্থ।
রক্তে রাঙা যে ধন পেলে
ছাড়তে হবে মৃত্যু এলে
মারলে যারে সে বেঁচে রয়
দেহের মরণান্তে।
তুললে যখন খড়্গ তুমি
আমার শিরে হানতে॥
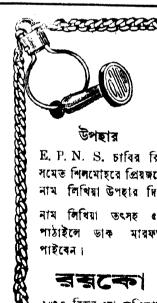
শ্রীরঙ্গমে—"তাইতো"!

—স্থু—

শ্রীরঙ্গম রঙ্গমঞ্চে 'তাই তো' রঙ্গনাটিকার অভিনয় দেখলাম। আজ তার যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দিতে গিয়ে, কলম ফেলে গোড়াতেই হাত গুটিয়ে বসে ভাবচি—তাইতো! কী লিখবো এমন নাটকের!

মুদ্রিত পরিচয়-পত্রে লেখা আছে, "তাইতো" একখানি 'মধ্য-সাপ্তাহিক' 'হাস্য-রসাত্মক নাটক'। এটি বৈধায়িক বাঙলার নতুন definition কিনা জানি না তবে বিশ্বনাথ আশ্রিত নতুন দলের গোপাল ভাঁড় দিগের প্রচার কার্যের বাহন হিসেবে যে সার্থক, সে কথা স্বীকার করতে আমরা বাধ্য।

ভাবচি এখন, তাইতো, বিধায়ক বাবুর প্রাক্তন-বয়সের আস্য-রসের মধ্য-সাপ্তাহিক হাস্যরসের নমুনার যথার্থ পরিচয় কী ভাবে লিখি? বরং নাটকের নাম 'তাইতো' না হয়ে 'চপেটাঘাত' হলেই লেখার কাজটি আরও সহজ হোত। কারণ নাটকের শুরু চপেটাঘাত থেকেই আর তার পরিণতি—আঘাতের প্রতিঘাতে। বিধায়ক বাবু বোধ করি ভালই জানেন যে এদেশের আধুনিক আলোক-প্রাপ্তা তরুণীরা যখন কোন তরুণকে চপেটাঘাত করেন তখন থেকেই তার মধ্যে রস-সঞ্চার হতে থাকে। যাঁরা গাল বাড়িয়ে আঘাত নেন তারাই ধন্য। কারণ আঘাত না পেলে তার প্রতিঘাত হবে কী করে?

মারামারির মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করা আরও মারাত্মক হয়ে উঠবে। কারণ মার খেয়ে মারা ও মারবার জন্য প্রস্তুত হওয়া—দুটো এক জিনিষ নয়। এক শ্রেণীর মারাত্মক আদি রস ঠিক মধ্য-সাপ্তাহিক প্রবৃত্তির উপযোগী নয়। ওটা শনিবার রাতের শেষ প্রহর পর্যন্ত চলে। কারণ রোববারটা বিশ্রাম নিয়ে আবার সোমবার থেকে চাঙ্গা হওয়া যায়। তবু বোল্‌ব, বোম্ ভোলা বিশ্বনাথের ছোট কল্‌কেয়, সুযোগ বুঝে বিধায়ক বাবু যদি বা একটুখানি মধ্য সাপ্তাহিক ছিলিমই ভরে থাকেন, তাতে তাঁর 'বিপ্রদাসের' নাট্যরূপদাতা হিসেবে হালে লব্ধ গৌরব বিন্দুমাত্র ম্লান হ'বে না।

নাটকে অবতীর্ণ শিল্পীবৃন্দের অভিনয় সম্বন্ধেও বলবার কিছুই নেই। শ্রীমান্ রঞ্জিত ভায়ার ভাঁড়ামিটুকু পরিপাক করতে না পারলেও, মলিনা, রেবা, মিহির, জীবেন, শৈলেন, বিশ্বনাথ, কানু প্রমুখ শিল্পীদের অভিনয়ে খুঁৎ ধরবার মত কিছু পাইনি! এঁদের ব্যক্তিত্বের অন্তরালে নাটকীয় চরিত্রগুলি চাপা না পড়লেও, রসগ্রহণে কোন বাধা জমেনি। বর্তমান ব্যক্তি-স্বাতন্ত্রের যুগে এটুকুও কম কথা নয়।

বাঙ্গলা সরকারের বাজেট

কয়েকটী ব্যয় বরাদ্দের অঙ্ক

১৯৪৪-৪৫ সালের দরুণ বাঙ্গালা সরকারের বাজেটে কয়েকটি বিশেষ বিশেষ ব্যয়ের বরাদ্দের পরিমাণ নিম্নে দেওয়া হইল :—

লাট সাহেবের বেতন—১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা, ঐ ভাতা—২৫ হাজার টাকা, ঐ খাস কর্ম্মচারীদের বেতন ৮১৲ হাজার ৩ শত ।০ টাকা, ঐ দপ্তর খরচ—১ লক্ষ ১৪ হাজার ১৬০ টাকা। কর্ম্মচারীদের ভাতা প্রভৃতি—৪২৩০০৲, ঐ ব্যাঙ্কের খরচ—৫০,০০০৲, দেহরক্ষী দল—১০৩৯০০৲, ঐ অফিসের সাজ-সরঞ্জাম ৫৪০০০৲, লাট সাহেবের রাহা খরচ—স্থলপথে—১, ২৮, ৯৩০৲ এতন্মধ্যে রেলওয়ের একটি সেলুনের বাবদ ১২,০০০৲, জলপথে ৪২,০০০৲ মোট—১,৭০,৯০০৲। মন্ত্রীদের বেতন—৬,৯৬,০০০৲, পার্লামেন্টারী সেক্রেটারীদের বেতন—১,১৪০০০৲, রাহা খরচ—১,২০,০০০৲, বাড়ী ভাড়া প্রভৃতি ৩,৯০০৲, ভাতা—১২,০০০৲, প্রচার বিভাগের ব্যয় ৪,০৭,৮০০৲, সিভিকগার্ড—৪, ৩০,০০০৲, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—৫, ২৫,০০০, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ৬,৬৭,৩৪৬৲, ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্ট—৪৫০০৲, বঙ্গীয় ব্রতচারী সঙ্ঘ—৯, ০০০৲, মুস্লিম ইন্‌ষ্টিটিউট—১৬২০৲ ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউট—২,৪০০৲ বিশ্বভারতী ৩৫,০০০৲, দুর্ভিক্ষ নিবারণ ২.৬১০২,০০০,। এতন্মধ্যে কর্ম্মচারীদের বেতনাদি ১, ১১,০০,০০০৲। খয়রাতি সাহায্য—১ কোটি ২ হাজার টাকা। রাজবন্দীর জন্য খরচ—২৬৩,০০০৲, অনাথালয়ে দান—২২, ০০০৲। ভিক্ষাবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ—৩ লক্ষ টাকা। কলিকাতা কর্পোরেশনকে সাহায্য—১লক্ষ টাকা। মজুত নিবারণী সঙ্ঘ ৩৩,৯০০। প্রেস সেন্সর—৫২,০০০,। প্রচার কার্য্যের দরুণ—১,৪১,০০০৲ ন্যাশনাল ওয়ার ফ্রণ্ট ৫, ১৬ ৫০০৲ ভ্রাম্যমান নাট্যদল—২১,০০০৲ সঙ্গীত প্রচার—৬৪,৮০০৲।

নানাকথা

পরলোকে শ্রীযুক্তা কস্তুরবাই গান্ধী

বোম্বাই, ২২শে ফেব্রুয়ারী—বোম্বাই সরকার নিম্নোক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়াছেন :—

"বোম্বাই সরকার দুঃখের সহিত জানাইতেছেন যে শ্রীযুক্তা কস্তুর বাঈ গান্ধী অদ্য সন্ধ্যা ৭-৩৫ মিনিটের সময় পুণায় আগা খাঁর প্রাসাদে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।"

মহাত্মা গান্ধী, গান্ধীজীর জ্যেষ্ঠ পুত্র হীরালাল ও কনিষ্ঠ পুত্র দেবদাস, হীরালালের কন্যা (এই পৌত্রীটিই শ্রীযুক্তা কস্তুর বাঈর সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় পাত্রী) ও গান্ধী পরিবারের আর একটি মহিলা মৃত্যুশয্যা পার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন। অন্য কয়েকজনও তথায় ছিলেন।

বুধবার সকালে তাঁহার অন্তিম-কৃত্য অনুষ্ঠিত হয়।

শোক-সংবাদ

গত সোমবার সন্ধ্যায় জমিদার শ্রীশরৎ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার কলিকাতাস্থ ভবনে লোকান্তর গমন করিয়াছেন। ইনি 'স্পোর্টস এণ্ড স্ক্রীন' নামক সাপ্তাহিকের ম্যানেজিং এডিটার এবং অংশীদার এবং ইষ্টার্ণ ফিল্ম একসচেঞ্জ লিমিটেডের ডিরেকটার হেমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ খুল্লতাত ছিলেন। তিনি এক পুত্র ও দুই কন্যা ছাড়া বহু ভ্রাতুষ্পুত্র, পৌত্র এবং আত্মীয় স্বজন রাখিয়া গিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ৭৩ বৎসর হইয়াছিল।

আমরা এই শোকসন্তপ্ত পরিবারকে আন্তরিক সমবেদনা জানাই।

• • •

তমলুকের সম্ভ্রান্ত অধিকারী বংশীয় জমিদার শ্রীকাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় অধিকারীর পত্নী সুরবালা দেবী মাত্র একান্ন বৎসর বয়সে সম্প্রতি স্বগৃহে লোকান্তরিত হইয়াছেন। ইনি অতিশয় ধর্ম্মপ্রাণা, দানশীলা ও জনপ্রিয়া ছিলেন এবং নারীহিতকর যাবতীয় স্থানীয় অনুষ্ঠানে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতেন।

যাদুকর পি, সি, সরকার

সুপ্রসিদ্ধ যাদুকর শ্রীযুক্ত পি, সি, সরকার বিগত ১২ই, ১৩ই ও ১৪ই ফেব্রুয়ারী তারিখে জব্বলপুরে তাঁহার বহু প্রশংসিত যাদুবিদ্যা প্রদর্শন করিয়াছেন।

নাটমণ্ডপ

হেমচন্দ্র পরিচালিত নিউ থিয়েটার্সের ন্দী ছবি "My Sister"-এর চিত্রগ্রহণ লিতেছে। গত সংখ্যায় প্রকাশিত উক্ত বির সম্প্রতি সম্পাদিত মহরৎ সংবাদটি এন ']র প্রচার সচিবের বিজ্ঞপ্তি হইতে জানা গল যে, ঠিক নহে। "My Sister"-এর াজ পূর্ব্ব হইতেই চলিতেছিল, তবে মাঝে কছুদিন বন্ধ ছিল। এখন আবার নিয়মিত ্টিং আরম্ভ হইয়াছে। বিনয় চট্টোপাধ্যায় ্হার কাহিনী রচনা করিয়াছেন। শ্রেষ্ঠাংশে াইগল ছাড়া চন্দ্রাবতী, অমর মল্লিক এবং চিত্রজগতে নবাগতা আখতার জিহানকে দেখা যাইবে। নবতর পরিকল্পনায় ও সূক্ষ্ম রসানুভূতিতে "My Sister" ভারতীয় চিত্র জগতে নূতন আলোকপাত করিবে বলিয়া প্রকাশ।

* * *

"দুই পুরুষে"র আদালতের দৃশ্যটি সম্প্রতি তোলা শেষ হইয়াছে। এক গরীব চাষীর হইয়া উদ্দাম পরাক্রমশালী জমিদারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া এডভোকেট রূপে ছবি বিশ্বাসের অনবদ্য অভিনয় এই নাটকীয় দৃশ্যটিকে প্রাণবন্ত করিয়া তুলিয়াছে।

* * *

বিমল রায়ের পরিচালনায় "উদয়ের পথে"র কাজ চলিতেছে। সম্প্রতি লাইব্রেরী ঘরের দৃশ্যটি গৃহীত হইয়াছে। এইখানে নাটকীয় পরিস্থিতির মধ্য দিয়া নায়ক ও নায়িকার প্রথম দর্শন হয়। নায়ক একজন গরীব সাহিত্যিক, নায়িকা একজন মিলের মালিকের কন্যা। নায়িকার ভূমিকায় বিনতা বসু, নায়কের ভূমিকায় রাধামোহন ভট্টাচার্য্য এবং নায়িকার ভাই-এর ভূমিকায় দেবী মুখোপাধ্যায় অভিনয় করিতেছেন। প্রসিদ্ধ-সুরশিল্পী রাইচাঁদ বড়াল সঙ্গীত পরিচালনা করিতেছেন।

* * *

হেমচন্দ্র পরিচালিত নিউ থিয়েটার্সের 'ওয়াপস্' ছবিখানি শীঘ্রই কলিকাতায় মুক্তিলাভ করিবে। ছবিখানি বোম্বায়ে বিপুল জনসমাদর লাভ করিয়াছে। ইহাতে ভারতী, অসিতবরণ, লতিকা, ধীরাজ, ইন্দু, নবাব, প্রভৃতি অভিনয় করিয়াছেন।

* * *

শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্সের ষ্টুডিওতে নিউ সেঞ্চুরী প্রোডাকশনের "প্রতিকার"-এর চিত্রগ্রহণ পূর্ণোদ্যমে চলিতেছে। নায়িকার অংশে শ্রীমতী রেণুকা রায়কে দেখা যাইবে। নায়কের অংশে বোম্বায়ের পরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিত্রাবতরণের কথা ছিল কিন্তু স্থানীয় চিত্রনির্মাতাদের সহিত চুক্তিবদ্ধ থাকায় এখন নায়কের অংশ অভিনয় করিবেন জীবেন বসু। ইহা ছাড়া কুমারী বরুণা রায় নাম্নী একজন নবাগতা সুকণ্ঠীকে নায়িকার ভগিনীর অংশে দেখা যাইবে। অন্যান্য ভূমিকায় ছবি বিশ্বাস, শৈলেন চৌধুরী শ্যাম লাহা, রবি রায়, কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, বন্দনা দেবী, রেবা বসু প্রভৃতিকে দেখা যাইবে। পরিচালনা করিতেছেন ছবি বিশ্বাস।

* * *

'শ্রী' সিনেমায় বর্ত্তমানে রবীন মৈত্র'র 'অল-ষ্টার ট্র্যাজেডী', সুধীরবন্ধু'র 'গোঁজামিল' এবং পরশুরামের "বিরিঞ্চি বাবা" দেখানো হইতেছে। তিনখানি ছবিই হাস্যরসাত্মক এবং এ ধরণের প্রোগ্রাম বোধ হয় বাংলা দেশে এই প্রথম এবং জন-সম্বর্দ্ধনা দেখিয়া আমরা এই ধরণের কৌতুক চিত্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিশেষ আশান্বিত হইয়াছি। এ্যালায়েড ফিল্মস, রূপকথা ও শ্রীণ পিকচার্সের কর্ত্তৃপক্ষকে বিশেষ করিয়া এ্যালায়েড ফিল্মের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত কল্যাণ গুপ্তকে শুধু যে তাঁহার সাফল্যের জন্যই অভিনন্দন জানাইতেছি তাহা নয় উপরন্তু তাঁহার দূরদর্শিতা ভবিষ্যতের বহু চিত্রনির্ম্মাতাকে নবতর প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করিবে বলিয়াই আমাদের মনে হয়।

* * *

"বড়দিদি" ও "অভিনেত্রী"র পরিচালক ও স্বনামধন্য নট শ্রীঅমর মল্লিক মহাশয় নিউ থিয়েটার্সের হইয়া অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের "বিরাজ বৌ"-এর চিত্ররূপ দিবেন। ছবিখানি কেবল মাত্র বাংলা সংস্করণেই গৃহীত হইবে।

* * *

আজকাল যে কোন চিত্রগৃহে যে কোন ছবি দেখিতে যান না কেন, মূল ছবির পূর্ব্বে যে কতকগুলি খণ্ডচিত্র দেখান হয় সেগুলি প্রচারমূলক হইলেও কয়েকটি ছবিতে বেশ শিক্ষামূলক বস্তুর সমাবেশ দেখা যায়। যেমন "Our Heritage", "Land of Five Rivers" "Handicraft" প্রভৃতি। ইহাদের নির্ম্মাতা হইলেন Information Films of India. ইহাদের প্রচার সচিব মিঃ হাসুম সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন এবং গত সোমবার বেলা এগারটার সময় এক চা-পার্টিতে তিনি তাঁহার এখানে আগমনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেন। তিনি স্থানীয় সাংবাদিকদের সহযোগিতা কামনা করেন এবং Information Films of India এর ভবিষ্যত ছবিগুলিকে যে আরও শিক্ষাপ্রদ এবং জনপ্রিয় করিবার চেষ্টা করা হইতেছে এ আশ্বাসও দেন।

* * *

আমরা শুনিয়া মর্ম্মাহত হইলাম যে ভারতীয় চিত্রশিল্পের জনক দাদা সাহেব ফালকে গত বুধবার ৭৪ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন।

১৮৭০ সালে নাসিকে শ্রীযুক্ত ফালকে জন্মগ্রহণ করেন। বোম্বাইয়ের জে, জে, স্কুল অফ্ আর্টসে এবং বরোদার কলাভবনে ইনি চিত্র বিদ্যা শিক্ষা করেন। ১৯০৯ সালে ইনি প্রথম বিলাতে যান এবং সেখানে ব্লক নির্ম্মাণ শিক্ষা করেন। সেখান হইতে ফিরিয়া বোম্বাইয়ের লক্ষ্মী আর্ট প্রিন্টিং প্রেসে লিথোগ্রাফাররূপে যোগদান করেন। দুই বৎসর পরে তিনি চিত্রনির্ম্মাণ শিক্ষার্থে পুনরায় বিলাতে যান এবং ১৯১২ সালে বিলাত হইতে ফিরিয়া প্রথম ভারতীয় চিত্র "হরিশ্চন্দ্র" নির্ম্মাণ করেন। ১৯১৩-১৯১৭ সালে ফালকে ফিল্মসের অধীনে তিনি বহু ছবি তোলেন। তারপর তিনি হিন্দুস্থান সিনেমা ফিল্ম কোং প্রতিষ্ঠা করেন কিন্তু সেটি বন্ধ হইয়া যাইবার পর তিনি আর কোনও কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করেন নাই। তাঁর শেষ ছবি হইল "গঙ্গাবতরণ" (কোল্হাপুর সিনেটোন)। আমরা তাঁহার আত্মার অক্ষয় শান্তি কামনা করি।

* * *

শহরের সিনেমায়

চিত্রা ও জ্যোতি	হামারী বাত
নিউ সিনেমা	লড়াই-কে-বাদ
রূপবাণী	শহর থেকে দূরে
প্যারামাউণ্ট	ভালাই
প্রভাত	সালমা
মিনার্ভা	পৃথিবল্লভ

বাড়্তি কাজের বন্ধু

কলকারখানার মজুরদের ক্লান্তি কি করে' দূর করা যায় এবং তাদের কর্মক্ষমতা কিসে বাড়ে এ দুটো সমস্যাই খুব ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত, এবং এ দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানের পরিচালকেরা এ-সব বিষয় নিয়ে অনেকদিন থেকেই মাথা ঘামাচ্ছেন। আজ যুদ্ধের দরুণ যখন প্রত্যেক শিল্প প্রতিষ্ঠানেরই উৎপাদন ক্ষমতার উপর অত্যন্ত বেশি চাপ পড়েছে, তখন কারখানার শ্রমিকরা কি করে অক্ষুণ্ণ একাগ্রতায় যুদ্ধের বাড়তি কাজের সঙ্গে চলতে পারে এ-সমস্যা আরো বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে।

শিল্প-শ্রমিকদের মনোবিজ্ঞান নিয়ে যারা চর্চা করেন, তাঁরা অনেক দিন আগেই এ-কথা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেছেন যে মজুরদের ক্লান্তি এবং আনুসঙ্গিক অন্যান্য ক্রটি—যেমন কর্মক্ষমতার হ্রাস, অমনোযোগ এবং দুর্ঘটনার সম্ভাবনা ইত্যাদি দূর করবার একটা খুব ভালো উপায় হচ্ছে মজুররা যখনই ক্লান্ত বা ক্ষুধার্ত বোধ করে তখুনি তাদের এক পেয়ালা চা এবং সম্ভব হলে কিছু খাবার দেওয়া। দেখা গেছে চা খাওয়া মাত্রই ক্লান্তি দূর হয়ে যায় এবং মজুরদের মনে ফুর্তি আসে। ফলে সে তার স্বাভাবিক কর্মক্ষমতা ফিরে পায়।

ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্স্প্যানশান বোর্ড এ-বিষয় নিয়ে বিশেষ ভাবে চিন্তা করে এমন একটি প্রণালী প্রবর্তন করেছেন যাতে করে শিল্প-শ্রমিকরা কারখানার মালিকদের কোন খরচ না বাড়িয়ে এবং অসুবিধা না করেও কাজের ফাঁকে ভালো এক পেয়ালা চা আর কিছু খাবার পেতে পারে। এই প্রণালী অনুসারে ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্স্প্যান্শান্ বোর্ড মিলের মধ্যে একটি সমবায় ক্যাণ্টিন্ (কো-অপারেটিভ ক্যাণ্টিন্) প্রতিষ্ঠা করেন। এ ক্যাণ্টিনে শ্রমিকরা কাজের ফাঁকে যে কোন সময় সস্তা দামে ভালো খাবার আর চা পায়। মিলের মালিকদের কাছ থেকে ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্স্প্যান্শান্ বোর্ড তাঁদের এ কাজে আজকাল প্রচুর সাহায্য ও সহযোগিতা লাভ করছেন।

এই সব সমবায় প্রতিষ্ঠান আজকাল মিল-মজুরদের কাছে একটা আশীর্বাদের মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে—বিশেষত আজকের দিনে, যখন একদিকে পড়েছে বাড়তি কাজের চাপ আর অন্যদিকে খাবার জিনিষের দাম বেড়ে গেছে অসম্ভব। এই ক্যাণ্টিনগুলো সমবায় প্রথায় পরিচালিত হয় বলে এর মধ্যে বাইরের কোনো ঠিকাদার থাকবার দরকার হয় না। ঠিকাদারেরা যে খারাপ জিনিষ দিয়ে আর বেশি দাম নিয়ে কী করে চূড়ান্ত লাভ আদায় করে নেয় সে তো সকলেই জানেন। কিন্তু এ-সব কো-অপারেটিভ ক্যাণ্টিন্ হচ্ছে শ্রমিকদের নিজেদের প্রতিষ্ঠান; এখানে তারা দামের অনুপাতে ভালো জিনিষ পায়। তাছাড়া দেখা গেছে যে বাজার দরের থেকে অনেক কম দামে চা বিক্রি করেও ক্যাণ্টিনে কিছু লাভ হয়। এই লাভটা থেকে পুরোনো অব্যবহার্য্য সরঞ্জামের বদলে নতুন সরঞ্জাম কেনা এবং ক্যাণ্টিনের সুখ-সুবিধার নানা রকম উন্নতি করা চলতে পারে।

কাজেই এটা খুবই স্বাভাবিক যে কারখানায় কারখানায় কো-অপারেটিভ ক্যাণ্টীন্ প্রতিষ্ঠার জন্য ইণ্ডিয়ান্ টী মার্কেট এক্স্প্যান্শান বোর্ডের এ উদ্যম দেশের শিল্প-প্রতিষ্ঠানের মালিকদের কাছ থেকে যথেষ্ট সাহায্য ও সহযোগিতা লাভ করছে। গত মার্চ মাসের মধ্যে বোর্ডের উদ্যমে ভারতের বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলে ১৭৮টি কো-অপারেটিভ ক্যাণ্টিন্ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ-দেশের শিল্পপতিরাও বোর্ডের এ কাজের উপযুক্ত মর্যাদা দিয়েছেন। কেন না এরা আজ সকলেই স্বীকার করে নিয়েছেন যে সামান্য মজুরদের চা ও জলখাবারের ব্যবস্থা করলে ভালো কাজ, সুখী শ্রমিক এবং বেশি উৎপাদন লাভ করা সম্ভব হয়।

গণেশ টকী	রাম-রাজ্য
রূপালী	কাশীনাথ

* * *

আগামী ৭ঠা মার্চ মিনার্ভা সিনেমায় তলোয়ার প্রোডাকশনের "শুক্রিয়া" মুক্তিলাভ করিবে। ইহাতে রমলা, সুন্দর সিং, রূপেয়ানী, রূপলেখা, অমর প্রভৃতি অভিনয় করিয়াছেন এবং পরিচালনা করিয়াছেন এচ, এস, রাওয়েল।

* * *

প্যারামাউণ্ট সিনেমায় সিলভার ফিল্মসের "ভালাই" দেখিলাম। পরের উপকার করিতে গিয়া কি ভাবে এক গ্রাম্য যুবক নিজের বিপদ টানিয়া আনিল এবং কিরূপ সংঘাতবহুল ঘটনাবলীর মধ্য দিয়া "ভালাই" পরিণতির দিকে অগ্রসর হইল তাহার মনোরম আলেখ্য। গল্প গ্রন্থনে স্থানে স্থানে অসঙ্গতি দৃষ্ট হইলেও পৃথ্বিরাজের চমৎকার অভিনয়, সিতারার নৃত্য ও গীত এবং গোপের হাস্যরস পরিবেশনে ছবিখানি দর্শক সাধারণের নিকট খুবই উপভোগ্য হইয়াছে।

দীপালীর স্বত্বাধিকারী শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত, ১২৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, দীপালী প্রেসে মুদ্রিত ও দীপালী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

প্রধান সম্পাদক—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় :: সহঃ সম্পাদক—শ্রীধীরেন্দ্রমোহন মজুমদার বি. এল.

১৬শ বর্ষ VOL. XVI. } ১৮ই ফাল্গুন ১৩৫০ ঃ ঃ March 2, 1944 { ৯ম সংখ্যা No. 9

চার্চ্চিলীয় সুসমাচার

গত ২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখের কমন্স বক্তৃতায় মিঃ চার্চ্চিল উচ্ছ্বসিত ভাবাবেশে কয়েকটি স্বগতোক্তি করিয়াছেন। ভাষায় স্বভাবসিদ্ধ চার্চ্চিলিয়ানার (Churchillian) আমেজ ছিল। কমন্স নাট্যশালার আলোকোজ্জ্বল প্রেক্ষাগৃহে সেদিন তিল ধারণেরও স্থান ছিল না। দেশপ্রেমিক ইংরেজ জাতির আগ্রহ ও উৎকণ্ঠা ঘনঘন সহর্ষ করতালিধ্বনির সহিত ক্ষরিয়া পড়িতেছিল। মিঃ চার্চ্চিল বলিতেছিলেন—

"The central principle of a nation's life is broken and all healthy normal control vanishes. There are few societies that can withstand conditions of subjugation. Indomitable patriots take different parts; quislings and collaborationists of all kinds abound. etc.

অর্থার্থ :—* * * * * জাতীয় জীবনের মূলমন্ত্র বিনষ্ট হইয়াছে। জাতির স্বাস্থ্যসূচক স্বাভাবিক সংযমের চিহ্নমাত্র নাই। খুব কম জাতিই পরাধীনতার এই অবস্থার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারে। দুর্দ্দম দেশপ্রেমিকও উল্টা পথ গ্রহণ করে। বিশ্বাসঘাতক ও সহযোগপন্থীদের সর্ব্বত্র দেখা যায়। ইত্যাদি।

ভারত সম্বন্ধে উপরোক্ত মন্তব্য করা হইয়াছে এইরূপ ভুল আপনি করিবেন না—ইহা ধরিয়া লইতে পারি। মন্তব্যের উপলক্ষ ছিল নাৎসি পীড়িত যুগোশ্লাভিয়া ও গ্রীসের কথা। বক্তৃতার যেটুকু রিপোর্ট এদেশে আসিয়াছে তাহা হইতে মনে হয় এই আপাতঃ স্পষ্ট উপলক্ষ হইতে মিঃ চার্চ্চিলের দৃষ্টি বহু উর্দ্ধে চলিয়া গিয়াছিল। রূঢ় বস্তুতন্ত্র সম্মুখ হইতে সরিয়া গিয়া ক্ষণকালের জন্য একটা সার্ব্বজনীন সত্যের মূর্ত্তি তাঁহার নিকট স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছিল। ক্ষণমাত্র হইলেও ইহাকে আপনি Trance বা যাহা হয় কিছু আখ্যা দিতে পারেন। তথাপি ইহা কতখানি সত্য ইহা বুঝিতে পারি। ঝুনা রাষ্ট্রনৈতিককেও সময়ে সময়ে রূঢ় সত্যের সহিত বোঝাপড়া করিতে হয়। পরাধীনতার অভিশাপ সম্বন্ধে মিঃ চার্চ্চিলের উপরোক্ত উক্তির মধ্যে সার্ব্বজনীনতার আমেজ ছিল ইহা ধরা পড়িবে।

মিঃ চার্চ্চিল গ্রীস ও যুগোশ্লাভিয়ার দুঃখে ভাবপ্রবণ হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাঁহার উক্তির ইহাই ছিল পটভূমিকা। তথাপি মনে হয় এই কূটনৈতিক বিবৃতির রচনা কালে, স্বাভাবিক: ভাবে এই পীড়িত ভারতের কথা তাঁহার মনে হইয়াছিল। বস্তুতঃ বাহিরের চলমান কয়েকটা ঘটনার কথা বাদ দিলে এদেশের দুর্গত অবস্থার প্রতিরূপ উল্লিখিত দেশ দুটিতে প্রতিফলিত দেখা যাইবে। সাম্রাজ্যবাদী নীতির মুখ চাহিয়া ভারতের কথা উল্লেখ করিতে প্রধান মন্ত্রী মহোদয়ের বাধিয়াছে ইহা আমরা কল্পনা করিতে পারি। মিঃ চার্চ্চিলের বক্তৃতায় ভারত সম্বন্ধে এই ধরণের উক্তি থাকিবে ইহা আমরা একেবারেই ভাবিতে পারি

দীপালীতে বিজ্ঞাপনের হার

পূর্ণ পৃষ্ঠা (প্রতি সংখ্যা)			৭০৲
অর্দ্ধ ঐ	ঐ	...	৩৬৲
[illegible] ঐ	ঐ	...	২৪৲
[illegible] ঐ	ঐ	...	১৮৲
১ম কভার	ঐ	...	১০০৲
২য় ও ৩য় কভার	ঐ	...	৮০৲
৪র্থ কভার	ঐ	...	৯০৲
কলম ইঞ্চি	ঐ	...	২৷৹

• • •

দীপালীর চাঁদার হার

বাৎসরিক সডাক	...	...	৬৲
ষাণ্মাসিক „	...	...	৩৷৹
ত্রৈমাসিক „	...	...	২৲
প্রতি সংখ্যা	..	...	৵০
পুরাতন সংখ্যা	...	...	৶০
ঐ ডাকে	...	...	৶১০

• • •

দীপালী কার্য্যালয়

১২৩/১ আপার সার্কুলার রোড
কলিকাতা
ফোন : বড়বাজার ৩২৫৩
টেলিগ্রাম : DIPALI

• • •

শাখা অফিস :

'শান্তিনিবাস'
বিঠলভাই প্যাটেল রোড, বোম্বাই ৪
টেলিফোন : ৪২৬৬৯

সাহিত্যিক

(গল্প)

শ্রীঅনুপম বন্দ্যোপাধ্যায়

বাড়ী থেকে পার্কটা খুব বেশী দূরে নয়। পিচের রাস্তার দুটো মোড় পেরুলেই লতায় ঢাকা পার্কের গেট চোখে পড়ে।

রোজ বিকেলে এই পার্কের ভেতর ঝোপে ঢাকা নিরিবিলি একটা বেঞ্চে সুকোমল এসে বসেন, একা। মাথার উপর প্রকাণ্ড গাছটা হাওয়ায় কাঁপে, পাকা পাতা মাটিতে ঝরে পড়ে। তিনি দেখেন। সামনের ঘাসের ওপর ছোট ছেলেমেয়ের দল ছুটোছুটি করে। তিনি দেখেন। ওদের কলহাস্যের সাড়া তিনি পান। বড় ভাল লাগে।

সাহিত্যিক সুকোমল চৌধুরীর জীবনে হয়ত এই পৃথিবীর আজ কোন দাম নেই। কিন্তু একদিন এই পৃথিবীকেই তিনি ভাল-বেসেছিলেন।.........

তাঁর জীবনে এখন ধূসর লগ্নের সুরু। তাঁর দেহ, তাঁর মন, সবকিছুই তাঁর বার্দ্ধক্যের পরিচয় দিচ্ছে। আজ তিনি সেদিনের মত উজ্জ্বল হতে পারেন না, সে দিনের মত দুর্ব্বার হতে পারেন না। তাঁর সে দিনের পৃথিবী আজ কোথায় যেন অবগুণ্ঠন টেনেছে।

নিরিবিলি ঐ কোনের বেঞ্চিতে সেদিন তাঁকে আবিষ্কার করল, তাঁরই মত একজন জীবন-সায়াহ্নের পথিক।

—আপনি!

সুকোমল বলে উঠলেন, আমায় চেনেন নাকি আপনি?

—বাঃ, আপনাকে চিনি না! কতবার ছবি দেখেছি, কত আপনার লেখা বই পড়েছি! কে জানত আজ এমনি করে আপনার সাথে দেখা হবে! আমার জীবনের আজ একটা স্মরণীয় দিন।

চঞ্চল হয়ে উঠলেন সুকোমল! এ প্রশংসা আজ তার ভাল লাগছে না। তাঁর আজকের এই জীবনে এ প্রশংসার কোন মূল্য নেই।

—এখানে চুপ করে বসে উপন্যাসের প্লট ভাবছিলেন বুঝি?

—না, লেখা আমি অনেকদিন ছেড়ে দিয়েছি।

—ছেড়ে দিয়েছেন?—ভদ্রলোক যেন কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারলেন না—জানেন, ছোট বেলায় আমিও লিখতাম। আপনার মত লেখবার কত চেষ্টা করতাম! কিন্তু পারলাম কই! কাল আপনি আসবেন কি এখানে? তা হ'লে আমার লেখাগুলো আনব।

লেখার সঙ্গে সুকোমলের সম্পর্ক অনেক দিন শেষ হয়ে গেছে। তবু নিরাশ করতে পারলেন না একে। মিথ্যে বললেন, নিশ্চয়ই, আসব বৈকি! নিয়ে আসবেন আপনার লেখা।

ভদ্রলোকের মুখ কি এক অপার আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। জীবনের শেষ বেলায় এ হাসি তার অমূল্য সঞ্চয়।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বেঞ্চের চার পাশে ছেলেমেয়ের দল ভীড় করল। কোথা থেকে যে তারা খবর পেলে, সেই কথাই ভেবে সুকোমল অবাক হলেন।

একজন সাহসী ছেলে এগিয়ে এসে বলল, আপনিই সেই বিখ্যাত সাহিত্যিক সুকোমল চৌধুরী। আপনার 'ছন্নছাড়ার যাত্রা' বইটা আমাদের পড়ান হয়।

সুকোমল ওর কথার উত্তরে একটু হাসলেন।

দু' একজন বয়স্ক ছেলে যারা তাঁর নাম শুনেছে, অবাক বিস্ময়ে সুকোমলকে দেখতে লাগল।

আর একজন তার 'অটোগ্রাফ' খাতাটা সুকোমলের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, আপনার অটোগ্রাফটা দিন না—

সুকোমল সহাস্যে সই করে দিলেন নামটা। ঐ ছেলেটার কাছে এই সামান্য সইয়ের যে কত দাম তা তিনি জানেন।

ছোট্ট একটা মেয়ে সুকোমলের গা ঘেঁসে তার ঝাঁকড়া চুলগুলো দুলিয়ে বলে উঠল, তুমি বুঝি গল্প বলতে পার?

—পারি বৈকি!—সুকোমল ওর দুষ্টুমিভরা চোখ দুটোর দিকে চেয়ে হাসলেন।

—কিসের গল্প? সেই রাজপুত্তুরের গল্প?

—না ভূতের গল্প।

—ইস, ভূতকে আমি ভয় করি নাকি?

অনেকক্ষণ বাদে এদের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে সুকোমল পার্ক ছেড়ে পথে নামলেন। আজ কিন্তু এদের মাঝে সত্যিই তাঁর বড়

ভাল লাগছিল। মনে হল এইসব ছুটুমিভরা মুখের সাথে তাঁর যেন কতকালের চেনা!

পার্কের গেটের কাছে আসতেই এক তরুণী তাঁর কাছে এগিয়ে এল। সে বলল, আপনার জন্যই আমি অপেক্ষা করছি।

সুকোমল একটু অবাক হয়ে বললেন, আমার জন্যে?

—হ্যাঁ, আপনাকে এত কাছে যখন পেয়েছি, তখন কিছুতেই ছাড়ব না। আপনাকে আমাদের বাড়ী যেতেই হবে।

—কোথায় তোমাদের বাড়ী?

—ঐ যে লালবাড়ীটা দেখছেন, ঐটে।

কিছুক্ষণ চুপ করে তিনি কি যেন ভাবলেন। তারপর বললেন, শোন, আজ হবে না। কাল যাব।

ওর ভয় হ'ল। বলল, না আজই চলুন। কাল আর আপনি আসবেন না।

সুকোমল হাসলেন। বললেন, আসব, ঠিক আসব। ভয় নেই। আর যদি না আসি, তুমি নিজেই ধরে নিয়ে এস আমায়। এই রইল আমার ঠিকানা।

ওর পিঠে একবার সস্নেহে হাত রেখে ধীরে ধীরে এগিয়ে চললেন সুকোমল। ঘরে ঢুকে আলো জ্বাললেন না সুকোমল। চেয়ার টেনে জানলার ধারে যেখানে আবছা চাঁদের আলো উঁকি মারছে, সেখানে বসলেন।......

ভাবতে লাগলেন রীণার কথা। এক মুহূর্তের জন্য যাকে ভোলা যায় না তাঁর সাহিত্যিক জীবনে সেই ছিল অনুপ্রেরণা। তার প্রতিটী লেখার মাঝে সে রীণা জীবন্ত হয়ে আছে।

সুকোমলের বুক ব্যথায় ভরে এল। চোখ দুটো সজল হয়ে এল।

রীণার নামে একদিন সুকোমল কবিতা লিখেছিল। বলা বাহুল্য প্রেমের কবিতা।

নিজের হাতে রীণাকে দেবার সাহস হয়নি। চুপি চুপি ওর পড়বার ঘরের টেবিলে লেখাটা রেখে এসেছিলেন সুকোমল।

পরের দিন লেখাটা সাথে এনে রীণা প্রশ্ন করল, একি?

—কি আবার!

—আহা কি ভালমানুষ, কিছুই জানেন না যেন! লুকিয়ে প্রেমের কবিতা লেখা হচ্ছে?

—তা হচ্ছে।

—বলি, লেখাটা তোমার, না অন্য কিছু থেকে টুকেছ!

—কেন, ভাল লাগেনি বুঝি?

রীণা হেসে উত্তর দিল, এ রাবিশ কবিতা কোন মেয়ের ভাল লাগবে শুনি?

এরপর একদিন চুপি চুপি সুকোমলের ড্রয়ার ঘেঁটে এক রাশ লেখা বার করল। এবং তৎক্ষণাৎ সেগুলো নিজের ড্রয়ারে স্থানান্তরিত হ'ল!

পরের দিন কলেজ থেকে নিজের ঘরে ঢুকতেই সুকোমল দরজার আড়াল থেকে বেরিয়ে রীণার হাত ধরল। বলল, এইযে চোর ধরেছি।

রীণা বলল, বা-রে, ছাড়! চোর কেন হতে যাব!

—তা তুমি নিজেই ভাল করে জান। না বলিয়া পরের দ্রব্য লইলে চুরি করা হয়।

—আমি বুঝি তোমার পর?

সুকোমল বলল, আচ্ছা না হয় আপনই হলে! লক্ষ্মী মেয়ের মত লেখাগুলো দাওতো—

—কেন দোব? উঃ, কি দুষ্টু তুমি! এতদিন আমায় লুকিয়ে এত কাণ্ড হচ্ছিল! চাইতে লজ্জা করে না!

সেদিন রাতে রীণা তাকে টেনে আনল নিজের পড়ার ঘরে। টেবিলের একপাশে সুকোমলকে জোর ক'রে বসিয়ে বললে, লেখ—
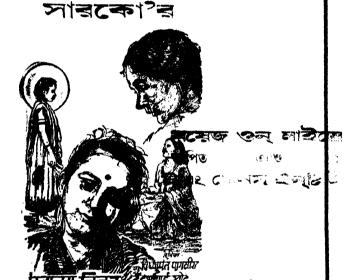
সুকোমল বলে উঠল, আরে এই, কি কচ্ছ? পাগল হলে নাকি?

রীণা গম্ভীর হবার ভাণ করে বলল, লেখ বলছি—

—কি লিখব?—অসহায় সুকোমল প্রশ্ন করল।

—যা ইচ্ছে।

—গল্প লিখব?

—লেখ।

—প্রেমের?

—হুঁ।

—নায়িকা কে হবে?

রীণা বলল, কল্পনার নায়িকা লেখবার দরকার নেই। জলজ্যান্ত এই বাস্তবের নায়িকা তোমার সামনে বসে রয়েছে।

অনেক গল্প লিখে ফেলল সুকোমল দিনের পর দিন। রীণা করত তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা। রীণার হাসিভরা মুখ দেখে সুকোমল লিখে চলত নব উৎসাহ আর প্রেরণায়। তার প্রথম সাহিত্যিক জীবনে রীণাই ছিল একমাত্র পাঠিকা, একমাত্র দরদী বন্ধু।

একদিন ওর লেখা রীণা পাঠিয়েছিল পত্রিকায় ছাপতে। অমনোনীত হয়ে তা ফিরে এল।

সুকোমল বলল, লেখা থাক রীণা, ও সব হবে না আমায় দিয়ে।

রীণা বলে উঠল, হবে না মানে? হতেই হবে! কি বোঝে ওরা লেখার! ছাই জানে! আমি বলছি, একদিন তুমি বড় সাহিত্যিক হবে। সারা দেশের লোক তোমার বই পড়বে।

পরের মাসে সুকোমলের সাহিত্যিক জীবনের স্মরণীয় দিন। ওর প্রথম বই ছেপে এল।

রীণা ছুটতে ছুটতে এসে বলল, এই দেখ তোমার বই।

ভয়ানক আশ্চর্য্য হয়ে উঠল সুকোমল। সত্যি না স্বপ্ন!

—কি করে ছাপা হল! এ বই কে ছাপল! ছাপাবার টাকা কে দিল?

রীণা হাসি চেপে বলল, কি জানি?

—বুঝেছি, এ তোমার কাজ! কেন এতগুলো টাকা খরচ করলে মিথ্যে?

—আমার টাকা যা ইচ্ছে করব।

—কিন্তু কেন?

—খুশী আমার।

কিছুদিন পরে আবার একটা নতুন উপন্যাস সুরু করল সুকোমল। এতদিন লেখায় তার ছিল অনুপ্রেরণা, এখন হল নেশা। এ মদের জন্য মাতালের নেশা নয়; আর্টকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে এ আর্টিষ্টের নেশা।

সুকোমল বলল, শোন রীণা আর একটা উপন্যাস লিখছি।

—সত্যি! লেখ, খুব ভাল একটা লেখ। কবে শেষ হবে বইটা?

সুকোমল হাসল। হেসে বলল, দাঁড়াও, এত তাড়াতাড়ি কি! আগে সুরু হ'ক, তারপর ত শেষ!

—ঠিক, রীণা বলল, খুব ভেবে লেখ।··· হ্যাঁ, আর একটা সুখবর দেবার আছে।

—বল।

—তোমার সেই 'ক্রন্দসী' নাটকটা এবার আমাদের কলেজ ইউনিয়নে প্লে করা হবে, ঠিক হয়েছে।

—এ দুর্বুদ্ধি ওদের কে দিল? তুমি নিশ্চয়ই।

হেসে রীণা জবাব দিল, হুঁ।

নতুন বইটা ছাপাবার জন্যে পাণ্ডুলিপিটা লুকিয়ে রাখল রীণা। জানতে পেরে সুকোমল বলল, ওটা দাও, এবার আর দুষ্টুমি হবে না।

—হবে, একশবার হবে।···আর যদি না দিই?

—তবে মার খাবে।

—ইস্, মার দেখি!

—বেশ তবে একটা কথা রাখ। নিরুপায় হয়ে সুকোমল বলল, বইয়ের উপহারের পাতায় তোমার নাম থাকবে।

—না সে হয় না।

—কেন?

—বন্ধুবান্ধবেরা সবাই ভাববে—

—কি ভাববে ?

—না কিছু নয়।—কি যেন বলতে গিয়ে চুপ করে গেল। ওর দিকে চেয়ে হাসল সুকোমল।

কিছুক্ষণ চুপ করে রীণা বলল, কিন্তু কেন ?

সুকোমল উত্তর দিল, কিইবা এমন দিলাম রীণা। কিছুত' নয়।

তারপর তিন বছর চলে গেছে।

সুকোমল এখন মস্ত বড় সাহিত্যিক। অনেক বই লিখেছে সে এর মধ্যে। নাম, যশ, সম্মান সব কিছুই সুকোমল পেতে চলেছে, যা কিছু রীণা একদিন তার জন্যে চেয়েছিল।

টেবিলের পাশে বসে এখনও লেখে সুকোমল। রীণা মুগ্ধদৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে কাছে বসে থাকে। রীণা পাশে না থাকলে সুকোমল কিছুতেই লিখতে পারে না।

রীণা বলে, তোমার কিন্তু ভারি খারাপ অভ্যেস হয়ে গেছে—

সুকোমল জবাব দেয়, দোষটা কিন্তু আমার নয়, তোমার।

—তা বৈকি! তুমি ছোট ছেলে নাকি ?

—হয়ত তাই।

কলেজ শেষ করে তিন বছর ঘরে বসেছিল রীণা, তারপর একদিন ডাক পড়ল [illegible] বাবার।

রীণার বিয়ের ঠিক হয়ে গেল এক ব্যারিষ্টারের সাথে।

সুকোমলকে রীণা বলল, আমার বিয়েতে তোমায় একটা খুব ভাল কবিতা লিখে দিতে

সুকোমল বলে উঠল, এ আমি পারব না, রীণা, পারব না। এ অনুরোধ আমায় কর না।

—কেন পারবে না ?

সুকোমল কোন উত্তর দিল না। চুপ করে রইল।

রীণা বলল, আমি জানি তুমি আমায় ভালবাস। কিন্তু এই প্রেমের চেয়ে তোমার এই সাধনা অনেক বড়। আজ তুমি শুধু আমার নও, তুমি সকলের।

সুকোমল বলল, কিন্তু তুমি চলে গেলে আমি আর লিখতে পারব না রীণা! আমার পাশে তুমি আর থাকবে না!

রীণা আস্তে আস্তে বলল, ছেলেমানুষি করো না, আমায় এমনি করে কেন কাঁদাবে! দূরে গেলেও আমি যে চিরদিন তোমারই কাছে আছি!

রীণার চোখদুটো জলে ভরে এসেছিল।

বিয়ে হয়ে গেল রীণার। চলে গেল সে শ্বশুরবাড়ী।

শূন্য ঘরে একা বসে থাকে সুকোমল। লিখতে ভাল লাগে না, মন বসে না, সম্পাদক আর প্রকাশকের তাড়ায় জোর করে মন দিতে হয়।

রীণার চিঠি আসে। প্রায়ই আসে! মস্ত বড় চিঠি। কত কথাই লেখে। কত আজে বাজে কথা। সব চিঠির শেষে থাকে 'তোমার পায়ে পড়ি, আমার কথা ভেবে লেখা ছেড়ো না।'

বার বার ওর চিঠিগুলো সুকোমল পড়ত। বড় ভাল লাগে।

বছরখানেক পরে একদিন রীণাদের শ্বশুরবাড়ী থেকে খবর এল, রীণার অবস্থা গুরুতর। সুকোমলকে দেখতে চায়।

তখুনি ছুটে গেল সুকোমল। পাগলের মতই ছুটে গেল।

মেয়ে হয়েছে রীণার। চমৎকার তুল-তুলে একটা মেয়ে। রীণা আজ মা হয়েছে।

পাশের বিছানায় শুয়ে আছে রীণা। তার যাবার সময় হয়েছে।

সুকোমলকে দেখে রীণার মুখে হাসি ফুটে উঠল। সে আস্তে আস্তে বলল, এই যে তুমি এসেছ। তোমার জন্যই এতক্ষণ অপেক্ষা করছিলাম। তোমার সেই বইটা পড়ছিলাম। শেষ আর হল না। আমি যাচ্ছি, তবে তোমার ভয় নেই। তোমার কাছে চিরদিনই রইলাম। লেখা যেন বন্ধ কর না। লিখে যেও।

সুকোমল ওর রুক্ষ চুলে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, ভয় কি, তুমি বেঁচে উঠবে। কিছুই তোমার হয় নি। আমি তোমায় এমনি করে যেতে দোব না রীণা!

রীণা হাসল। শীর্ণ সে হাসি, ম্লান। সেই শেষ হাসি।

এমনি করে তার চলে যাওয়া একান্ত আকস্মিক। আজও তা বুঝতে পারেন না সুকোমল। আজও তার হিসেব পান না।

রীণা মারা যাওয়ার পর একটা কবিতা লিখেছিল সুকোমল। তার জীবনের শেষ লেখা। তারপর লেখা ছেড়ে দিল। সকলের অনুরোধই হল নিস্ফল। রীণা নেই, তাই লেখনীও স্তব্ধ হয়ে গেছে।

তারপর সুকোমল লেখা দিলেন ঐ পার্কের কোণে প্রায় আঠার বছর বাদে। সেদিনের
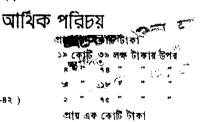
জীবনের সাথে আজ তার কোন মিল নেই, সেদিনের দেহে আজ ছায়া পড়েছে ধুসরতার।

মাঝখানে এই দীর্ঘ আঠার বছরের কোন হিসেব নেই সুকোমলের জীবনে।

পরদিন সন্ধ্যেবেলায় রোজকার মত পার্কের দিকে তার পা এগুল না। ওদের শ্রদ্ধা, ওদের প্রশংসা তার ভাল লাগে না। মনে হয় এ সব যেন পরিহাস। তার এ অসহায় রূপ দেখে ওরা যেন আঘাত দিতে চায়।

সুকোমলের হঠাৎ মনে পড়ল সেই মেয়েটার কথা। কাল পথে যার সাথে দেখা হয়েছিল। ওকে তিনি কথা দিয়েছেন। যেতে হবে বৈকি! সে আজ কত আগ্রহে তার আসা-পথের পানে চেয়ে আছে।

পথে নামলেন সুকোমল।

মেয়েটা গেটের কাছে দাঁড়িয়েছিল, তাঁরই অপেক্ষায়। সুকোমলকে দেখে ওর মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

—আপনার অপেক্ষাতেই দাঁড়িয়ে আছি, আসুন ভেতরে।

সুকোমল নীরবে তার অনুসরণ করলেন। ছোট একটা সাজান ঘরের মাঝে নিয়ে এসে ও বলল, এইটে আমার ঘর, বসুন।

মেয়েটা সুরু করল, আপনি হয়ত আমাকে চিনতে পারছেন না! কিন্তু আপনার সাথে আমাদের পরিচয় অনেকদিনের।

কিছু বুঝতে না পেরে সুকোমল অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন।

সে একটা ছবির এ্যালবাম বার করে তাঁর সামনে ধরল। মুহূর্তেই সেটা চিনতে পারলেন সুকোমল! এ যে বীণার! তার আর বীণার কত ফটো ওর মাঝে গাঁথা রয়েছে।

সুকোমল বলে উঠলেন, তুমি, তুমি······

—হ্যাঁ, ঐ আমার মার ফটো, ঐ সামনের আলমারিটা দেখছেন, ওটাও মার। আপনার লেখা সমস্ত বই ওতে সাজান রয়েছে। আপনার বইয়ের পাণ্ডুলিপি গুলোও মার ড্রয়ার থেকে আমি পেয়েছি।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে সুকোমল বললেন তুমি আমার বীণার মেয়ে। তুমি যে আমার কত আপন! আমার এই সাহিত্যিক জীবনে যা কিছু শ্রদ্ধা, যা কিছু সম্মান আমি পেয়েছি তার অন্তরালে ছিল তোমার মার নিঃস্বার্থ প্রেম। আমার জীবনের বৃহত্তর এই সম্মানের যথার্থ মূল্য আমার নয়, তার।

সুকোমল আবেগে চুপ করে রইলেন।

বাণী বলল, আপনি আর লেখেন না?

—না, অনেকদিন ছেড়ে দিয়েছি।

—কেন ছাড়লেন? লিখতেই হবে আপনাকে। মার ভালবাসার যদি সত্য মূল্য দিতে চান তবে আপনাকে লিখতে হবে। এমনি করে লেখা বন্ধ করতে পারবেন না।

বীণাও বলেছিল, লেখ। আজ এতদিন পরে এও জানাচ্ছে সেই অনুরোধ। বাণী জোর করে বলতে পারে, অধিকার ওর আছে। কিন্তু তিনি আজ কত অসহায়, কত দুর্ব্বল!

লেখা ছাড়ার আগে প্রকাশক, সম্পাদক বন্ধুবর্গ সকলের অনুরোধ তিনি ব্যর্থ করেছিলেন। কিন্তু এতদিন পরে বীণার মেয়ের অনুরোধ কেমন করে তিনি ঠেলবেন?

আঠার বছর পরে আবার কলম নিয়ে বসলেন সুকোমল। পাশে বসে বাণী। বীণার বাণী।

সুকোমলের কম্পিত হাতে কলম কাঁপতে লাগল। তিনি লিখতে পারছেন না! আশ্চর্য্য!

লেখবার ব্যর্থ চেষ্টা করলেন সুকোমল। কিছুতেই পারলেন না। অবশ হাতে এক ফোঁটা কালির দাগও পড়ল না।

আঠার বছর আগেই সে সাহিত্যিকের মৃত্যু হয়ে গেছে।

বিজনদা'র চিঠি

আমার আদুরে ভাই বোনেরা—

এবার তোমাদের গত প্রতিযোগিতার ফলাফল জানাবার কথা আছে। গত প্রতিযোগিতায় যথাক্রমে শ্রীমান্ নৃপেন্দ্র সেনগুপ্ত (৩৮৯), শ্রীমান্ অসীম চৌধুরী (১০৯৮), কুমারী ঝরণা দেবী (২৬৮), ১ম, ২য়, ও ৩য় স্থান অধিকার করেছে।

নতুন প্রতিযোগিতা—এই প্রতিযোগিতা আহ্বান করেছে আমাদের আসরের এক ভাই শ্রীমান্ ইন্দ্রশেখর রায় (১০৪৮)। প্রতিযোগিতার বিষয়: তোমরা তোমাদের একটা দিনের 'ডায়রী' অর্থাৎ ভোরে শয্যা ত্যাগ করা থেকে আরম্ভ করে রাতে শয্যায় আশ্রয় নেবার সময় পর্য্যন্ত সারা দিনটা কি করো তা লিখে পাঠিও আগামী ২৩শে মার্চ্চের মধ্যে। লেখা যেন দীপালীর এক পাতার বেশী না হয়। এই প্রতিযোগিতায় ১ম, ২য়, ৩য়, পুরস্কার স্বরূপ বই দেওয়া হবে।...

এবারে তোমাদের চিঠির উত্তর দেওয়া যাক:

শ্রীঅজিত কুমার ঘোষ (হাওড়া: ৫৩৬): তোমার চেয়ে পাঠান ভায়েদের ঠিকানা যথা সময়ে পাঠান হয়েছে, কিন্তু কেন যে পেলে না তা' বুঝলাম না। স্থান এতো অল্প যে, বহু নতুন বিষয় দেওয়ার ইচ্ছে থাকলেও তা দিয়ে উঠতে পারি না।

শ্রীঅঞ্জুশ্রী রায় (বরিশাল: ১১১৮): প্রতিযোগিতা তোমাদের জন্যেই আহ্বান করা হয়, অতএব সেখানে সভ্যা নতুন বা পুরাতনের কোন কথাই ওঠে না। সবার যোগদান করার জন্যে যে কুপনটা ছাপা হয় তা' রচনার সঙ্গে লাগিয়ে দিতে যেন পাঠাবার সময় মনে থাকে।

শ্রীকেদার নাথ রক্ষিত (কলিকাতা ৯০৪): ১৮০৭ খৃঃ রবার্ট ফুলটনের 'ক্লার্মণ্ট'ই সর্ব্বপ্রথম বাষ্পীয় পোত। ১৮১৯ খৃঃ "সাভানা" জাহাজ প্রথম অতলান্তিক মহাসাগর পার হয়। ভারতে প্রথম বাষ্পীয় পোত আসে ১৮২৫ খৃঃ। সে জাহাজটার নাম ছিল "এণ্টারপ্রাইজ", আর তার কাপ্তেন ছিলেন জনসন সাহেব।... ভুবো জাহাজ আজও আছে।...সরস্বতী পূজোয় আমন্ত্রণ তোমার মত অনেক ভাই-বোনই করেছিল, কিন্তু কাউকে খুশী করে আর কাউকে বঞ্চিত করা আমি পাপ বলে মনে করি। তাই কারুর বাড়ীতে না গিয়ে নিজের বাড়ীতে বসে বসেই তোমাদের জন্যে মায়ের কাছে প্রার্থনা জানাই।

শ্রীগিরীন্দ্রনাথ রায় (নৈহাটী: ৭৩৪): পত্র-মৈত্রীর জন্যে তোমার কাছ থেকে কোন টিকিট পাইনি। তাজমহল নির্ম্মাণের পরিকল্পনা করেন পারস্য কিম্বা তুরস্কদেশীয় শিল্পী ওস্তাদ ঈশা। তবে প্রধান মিস্ত্রীর নাম কোথাও ইতিহাসের পাতায় পাওয়া যায় না।

শ্রীজিতেন পাল (নাটোর: ১০৫৬): সভ্য নং দাওনি কেন? ভবিষ্যতে ওটা না দিলে কিন্তু আর উত্তর পাবে না। তোমার কবিতা খুশী করতে পারলো না। হাতের লেখা পত্রিকার জন্যে আমি তো এর আগে একটা লেখা লিখে তোমাদের সবার জন্যে এই আসরেতেই ছেপেছিলাম সেটা নিয়ো তোমরা। ওতে আমার কোন আপত্তি নেই।

শ্রীজ্যোতির্ম্ময় গঙ্গোপাধ্যায় (কলিকাতা: ১০৪৩): তুমি বড় বেশী চিঠি পাঠাও। শুধু শুধু বাজে পয়সা নষ্ট করো কেন ডাক খরচা করে? এ অভ্যাস ছাড়ো। তোমার লেখাটা এবারে খুশী করতে পারলো না।

ঝরণা দেবী (মুঙ্গের: ২৬৮): তোমার লেখাটা মনোনীত হলো। "অভ্র" বহু কাজে লাগে। যেমন ধরো দেবী প্রতিমার সাজের জন্যে অভ্র ব্যবহার করা হয়; আবার বৈদ্যুতিক পাখার ভিতরের যন্ত্রের জন্যে অভ্র খুব কাজে লাগে। ওমনি আরো অনেক জিনিষ আছে, অর্থাৎ কাজের লোক ওটাকে অনেক কাজে লাগায়।

শ্রীধনঞ্জয় কুমার (হাওড়া: ১০৩৬): তোমার লেখা কবিতা আমায় খুসী করতে পারলো না। কবিগুরুর জীবনী সম্বন্ধে যা জানতে চেয়েছ তা তাঁর জীবনী পড়লে তো জানতে পারবেই, তা ছাড়া আরো অনেক কিছু জানবে। অতএব তাঁর জীবনী পড়ে দেখো।

শ্রীনির্ম্মলকুমার রায় (কলিকাতা: ১০৯২): 'ছুটির ঘণ্টা'র সভ্যের সঙ্গে "দীপালী"র গ্রাহক হওয়ার কোন সম্বন্ধই থাকে না। সেটা তোমার ইচ্ছের উপর নির্ভর করে। তোমার একটা লেখা মনোনীত হলো।

শ্রীনিভৃতকুমার রায় (হাওড়া: ১০৯৭): তোমার "শ্যামের বাঁশী" গল্পটা ছাপার যোগ্য হ'লো না বলে মনোনীত করলাম না।

শ্রীশান্তিসমীরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (কলিকাতা: ১০৫৫): তোমার চিঠির উত্তর ডাকযোগে পাঠালাম।

শ্রীশোভনেন্দু ভট্টাচার্য্য (শ্রীরামপুর: ১১১০): তোমার লেখা পড়ে হাসবার মত তেমন কিছুই পেলাম না। পরিদর্শক মশাইরা অতো বোকা নয় আজকাল।

শ্রীপরেশনাথ রায় চৌধুরী (বিরাটী: ১১০২): তোমার লেখা "স্বপ্ন" খুসী করতে পারলো না।

শ্রীপশুপতি বন্দ্যোপাধ্যায় (শ্রীরামপুর: ১১০৯) তোমার লেখা "বুড়োর বুদ্ধি" দেখে ভাই বোনেরা যে খুসী হবে না তা আমি বেশ বুঝতে পারলাম। তাই তা অমনোনীত হলো।

ছুটির ঘণ্টা ২৭নং প্রতিযোগিতা কুপন।

নাম ....

বয়স: ....

ঠিকানা: ....

শ্রীবিনয় ভৌমিক (কলিকাতা: ৮২৮): তোমার লেখার সম্বন্ধে খুব শীঘ্রই ডাকযোগে খবর পাঠাব।

বিভা রায় (বর্দ্ধমান: ২০০): তোমাকে আজ সান্ত্বনা দেবার ভাষা আমার জানা নেই। কিন্তু তবুও বলবো বোন, বাবাকে হারিয়ে ভেঙ্গে পড়লে তো চলবে না। এ সংসারে আঘাতের পর আঘাত পেয়েও যে হাসিমুখে সবার মাঝে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকে সেই "প্রকৃত মানুষ"। আমার ভাই বোন হয়ে তোমাদের আমি প্রকৃত মানুষ রূপেই দেখতে চাই।

শ্রীমিলন কুমার ঘোষ (মুঙ্গের: ১১১৩): তোমার কার্ড পাঠানতে দেরী হওয়ার কারণ তোমার সম্পূর্ণ ঠিকানা পাওয়া যায় নি বলে। এবারে তা পাওয়া মাত্রই ডাকযোগে কার্ড পাঠান হয়েছে, তা নিশ্চয়ই পেয়েছ। "সঞ্চয়ন" আগে বার হয়ে গিয়েছে, অতএব ওটা অমনোনীত হলো। গল্পটার সম্বন্ধে পরে জানাবো।

শ্রীরণজিৎ মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা: ৭১৮): তোমার "একটা ম্যাজিক" মনোনীত হলো। "ছদ্মনাম" লেখ কেন ? ওর প্রচলন তো আসর থেকে উঠে গিয়েছে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (কলিকাতা: ৮৭৮): তোমার চিঠির উত্তর ডাকযোগে পাঠালাম।

শ্রী রাধাগোপাল ও হরিগোপাল বসাক (কলিকাতা: ৭১৭ ও ৭৩৭): তোমাদের সান্ত্বনা দেবার ভাষা আমার জানা নেই। আগে আমাদেরই আসরের বোনটী বিভা রায়কে যে কথা বলেছি আজ তোমাদের সম্বন্ধেও সেই কথা বলি। ও উত্তরটা পড়ে দেখো।

শ্রীসুহাস কুমার দাস (ঢাকুরিয়া: ৯৪৯): তোমাদের পত্রিকার জন্যে আসরের ভাই-বোনের কাছে লেখা চেয়েছ দেখলাম। তোমার মত ও অনুরোধ আরো অনেক ভাই বোন তাদের পত্রিকার জন্যে করেছিল, কিন্তু সেটা সম্ভব নয়। সব থেকে বড় সমস্যা হচ্ছে যে যারা লেখা পাঠায় বহুদূর থেকে তাদের লেখা তোমাদের পত্রিকায় প্রকাশ হলেও কোনদিন নিজেদের লেখা দেখার সৌভাগ্য তাদের হবে না। তা ছাড়া আজকাল প্রায় অনেকেই হাতে-লেখা পত্রিকা বার করে।......আজকের মত এইখানেই বিদায় নিই তোমাদের স্নেহ জানিয়ে, কেমন ?

তোমাদের: বিজনদা

এই দেশেরই মেয়ে

—শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

রাইসিন দুর্গের কথা।

হুমায়ুনের বাদশাহীর আমলে বাহাদুর শা দুর্গ আক্রমণ করলো।

দুর্গের ভার ছিল লক্ষণের উপর।

অজেয় দুর্গ। জয় করা সহজ নয়। যুদ্ধ করে বিশেষ সুবিধা হবে না দেখে বাহাদুর শা দূত পাঠালেন,—দুর্গাধিপ মহারাজ শিহ্লাদি ইতিপূর্ব্বেই বন্দী হয়েছেন, লক্ষণ যদি এখন মুসলমানদের হাতে দুর্গ ছেড়ে দেন তাহলে শিহ্লাদিকে ছেড়ে দেওয়া হবে, এবং উপযুক্ত সম্মান রক্ষা করা হবে।

শিহ্লাদি মহারাজ ছিলেন লক্ষণের বড় ভাই, বাহাদুর শাহের কথায় বিশ্বাস করে ভাইয়ের মুক্তি কামনায় লক্ষণ দুর্গ ছেড়ে দিলেন।

মুসলমান সেনা দুর্গমধ্যে প্রবেশ করলো, কিন্তু প্রতিশ্রুতির মূল্য তারা রাখলো না, সম্মানের বদলে দুর্গবাসীদের উপর তারা ঘনিয়ে তুললো সংহারের করালরূপ।

লক্ষ্মণ এতদূর আশা করেন নি।

শিহ্লাদি-পত্নী রাগে দুঃখে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন, বললেন—ছি ছি, এ কি করলে ? সামান্য ভাইয়ের প্রাণ রক্ষা করার জন্য সর্ব্বনাশ ডেকে আনলে! এর চেয়ে মৃত্যুও তো বরণীয় ছিল।

হিন্দু মেয়ের কাছে আত্মসম্মান বড় কথা। মুসলমানদের কাছ থেকে মর্যাদা রক্ষা করার জন্য রাণী দুর্গাবতী নিজের প্রাসাদে আগুন দিলেন। ঘরে ঘরে মেয়েরা আগুন জেলে পুড়ে মরলো।

পুরুষের দল তলোয়ার হাতে অগ্রসর হোল শত্রুর সংহার করতে।

দেখতে দেখতে সব শেষ হয়ে গেল।

মুসলমানেরা যখন দুর্গের শীর্ষে জয়-পতাকা উড়ালো, তখন দুর্গের পথে পথে মৃতদেহের স্তুপ, বহ্নিমান গৃহগুলির লেলিহান শিখা উঠছে আকাশের গায়। রাইসিন দুর্গ জয় হোল বটে, কিন্তু জীবিত একটি মানুষকেও জয় করা গেল না।

সেদিনকার হিন্দুমেয়েরা দুর্গাবতীর মত স্বামী ও রাজ ঐশ্বর্য্যের চেয়ে স্বাধীনতা বড় বলে মনে করতো, সেইজন্য বোধ হয় আজকের বিলাসিনীরা তাদের স্মরণ করতে চায় না।

তোমাদের বিভাগ

জেনে রাখা ভাল

নূর একবাল খানম্ চৌধুরী

(১) পৃথিবীতে সব চেয়ে বেশী দামের চেয়ারে বসেন রোমের পোপ। চেয়ার খানার দাম ১৮০৫০ পাউণ্ড।

(২) পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বপ্রথম ট্রাম চলে নিউ ইয়র্কে ১৮৫৮ খৃঃ।

সত্যি বলে মনে হয় না

(সংগৃহীত)

শ্রীসৌরীন্দ্র মোহন দেব (৭৮৬)

১। নিউ জারসী সহরে জোসেফ সোলডি নামে একটি বালক জন্মাবধি বোবা। একদিন তার সামনের ঘরে আগুন লাগলো, তার মা আগুন দেখতে পান নি। জোসেফ আগুন দেখে চীৎকার করে বললে, "মা মা, আগুন লেগেছে।" তার চীৎকার শুনে তার মা তাড়াতাড়ি নিজে ও আর সকলকে আগুনের হাত থেকে বাঁচান। কিন্তু জোসেফের মুখ দিয়ে ও ছাড়া ভবিষ্যতে কোনদিন আর কিছু বার হয় নি। উত্তেজনার বশে মাত্র ঐ একবার তার জীবনে মুখ দিয়ে কথা বার হয়েছিল।

২। আফ্রিকার "ডোহমী" নামক স্থানের অধিবাসিগণ স্থির করে যে, রাজার কাজ খুব কঠিন। তাকে সকল সময়েই কাজ করতে হয়। কিন্তু একজন লোকের পক্ষে ২৪ ঘণ্টা কাজ করা অসম্ভব। সুতরাং তারা এই সিদ্ধান্ত করল যে, দুইজন রাজা রাখতে হবে। একজন দিনের বেলায়, আর একজন রাত্রির বেলার জন্য।

নানাকথা

মায়াবীথি সঙ্গীত-সঙ্ঘ

মায়াবীথি সঙ্গীত-সঙ্ঘের ৺সরস্বতী পূজা উৎসবে ৬৬, মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীটস্থ ভবনে স্কুলের ছাত্রীবৃন্দ কর্ত্তৃক শৈলেন্দ্র নাথ সরকারের "কর্ম্মই ধর্ম্ম" অভিনীত হয়। অভিনয় বেশ ভালই হইয়াছিল। কাঠুরিয়ার ভূমিকায় পুষ্প কুণ্ডু, কাঠুরিয়া পত্নীর ভূমিকায় বিদ্যুৎকুণ্ডু ও শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকায় চিত্রা পাঞ্জা রৌপ্য পদক পান। তাহা ছাড়া সেতার বাদ্যে শোভা কুণ্ডু সকলকে প্রীত করেন। ঐক্যতান বাদনে অচলা ভড়, প্রীতি পাঞ্জা, স্মৃতি পাঞ্জা, দীপিকা দে, স্নেহলতা চক্রবর্ত্তী, কল্যাণী দেবী যোগদান করেন।

সঙ্গীতে শ্রীমতী নমিতা কুণ্ডু একটী রৌপ্য পদক পাইয়াছেন। নৃত্য পরিচালনা করেন কুমারী রেবা সোম। নাট্য ও শিল্প পরিচালনা করেন শ্রীমতী মায়া দে চৌধুরী।

সভাপতির আসন গ্রহণ করেন সুপ্রসিদ্ধ ডিটেকটিভ ঔপন্যাসিক শ্রীপাঁচকড়ি দে মহাশয়।

রবীন সরকার সম্প্রদায়

গত রবিবার ২৭শে ফেব্রুয়ারী ক্লোদিং ইন্সপেক্‌সন ডিপার্টমেণ্টের উদ্যোগে কর্ম্মীদের ওয়েলফেয়ার ফাণ্ডের জন্য একটি বিচিত্র আমোদ প্রমোদের আয়োজন হয় ই, বি, আর ম্যানসন ইন্‌ষ্টিটিউটে। মুষ্টিযোদ্ধা রবীন সরকার, তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শৈলেন সরকার ও হরবোলা রবীন ভট্টাচার্য্যের সহিত মুষ্টিযুদ্ধ ও যুযুৎসু প্রদর্শন করেন। শৈল নন্দী ও সত্য দেবের মুষ্টিযুদ্ধ উপভোগ্য হয়। কুমারী শোভা বিশ্বাসের বেনেটি লাঠি খেলা ও কুমারী সাধনা দাসের সহিত ছোরা খেলা, তারক ভড় ও সমীর দে'র রোলার ব্যালান্স আনন্দ দেয়। পরে যাদুবিদ্যা প্রদর্শনীর পর উৎসব সমাপ্ত হয়।

রবি-বাসর

গত ১৪ই ফাল্গুন রবিবার অপরাহ্ণে কালীঘাট ১১৪।১ নং হাজরা রোডে শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মিত্রের ভবনে রবি-বাসরের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সদস্যগণ ব্যতীত অন্যান্য বহু সুধী ব্যক্তিও সভায় উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত জ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

এই অধিবেশনে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ বসু "দেহ ও অন্ন" বিষয়ে একটি সারগর্ভ বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা করেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি দেহের সহিত খাদ্যের সম্বন্ধ, খাদ্যের উপাদান ও তাহাদের কার্য্য, ভাইটামিন বা খাদ্যপ্রাণ, বাঙ্গালীর খাদ্যের দোষগুণ এবং খাদ্য সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতা প্রভৃতি বিষয়ে অতি সরল ভাষায় আলোচনা করিয়াছিলেন। বক্তৃতার অন্তে ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র, কবিরাজ ইন্দুভূষণ সেন এবং সভাপতি মহাশয় যে আলোচনা করেন তাহা বিশেষ মনোজ্ঞ হইয়াছিল। সভার অন্তে সকলকে যথারীতি জলযোগে পরিতুষ্ট করা হয়।

বীণাপাণি-গল্প প্রতিযোগিতা

গত বৎসরের মত এবারও বীণাপাণি স্মৃতিভাণ্ডার হইতে দুইটি গল্প প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রতিযোগিতার বিষয় বাংলা ভাষায় স্বরচিত একটি গল্প। প্রথম প্রতিযোগিতা ১৭ বৎসরের অনধিক বয়স্ক ছেলেমেয়েদের জন্য। প্রথম পুরস্কার ১০ টাকা, দ্বিতীয় পুরস্কার ৫ টাকা। দ্বিতীয় প্রতিযোগিতা সর্ব্বসাধারণের জন্য। প্রথম পুরস্কার ২০ টাকা, দ্বিতীয় পুরস্কার ১৫ টাকা। গল্প পাঠাইবার শেষ তারিখ ৩১শে চৈত্র, ১৩৫০। বিশেষ বিবরণের জন্য তিন পয়সার ডাক টিকিটসহ পত্র লিখুন।

সম্পাদক, তীর্থ সাথী পরিষদ
৬-এ, ক্রাউচ লেন, কলিকাতা।

সারস্বত লাইব্রেরী মাকড়দহ

হাওড়া

গত রবিবার, ২৭শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪৪, অপরাহ্ণ ৩-৩০ ঘটিকায় দেশনায়ক শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে উক্ত গ্রন্থাগারের "রজত জয়ন্তী" উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে।

খেলার মাঠে

—শ্রীউমেশ মল্লিক

গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী বিভিন্ন মহিলা প্রতিষ্ঠান, মহিলা কলেজ ও বালিকা বিদ্যালয়ের উদ্যোগে যে প্রাদেশিক মহিলা স্পোর্টসের ব্যবস্থা হয়েছিল তাতে প্রতিযোগীর সংখ্যা ছিল ২২৪ জন। ১৬টি বালিকা বিদ্যালয়, ১০টি কলেজ এবং ২টি প্রতিষ্ঠান এই অনুষ্ঠানে যোগদান করায় তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বীতা লক্ষিত হয়।

বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য নির্দ্ধারিত অনুষ্ঠানগুলিতে কুমারী পদ্মা দত্ত এবং ম্যাকলীন উভয়েই সমান সংখ্যক পয়েন্ট সংগ্রহ করে "ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়নসিপ" লাভে বিশেষ প্রতিদ্বন্দ্বীতা করেন। লরেটো ডে স্কুলের বালিকা বিদ্যালয় বিভাগে শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হয়। কলেজ বিভাগে মিস্ নিকলসন নিজস্ব চ্যাম্পিয়ানসিপ লাভ করেন। আশু বোস কলেজের আবৃত্তি জানাও কয়েকটি বিষয়ে নিজ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। এই অনুষ্ঠানে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা লরেটো স্কুল, লরেটো কলেজ এবং লরেটো ক্লাবের সর্ব্ব বিষয়ের উৎকর্ষ।

•

আন্তঃ প্রাদেশিক হকি প্রতিযোগিতায় বাঙ্গলা দেশ মধ্য প্রদেশের কাছে পরাজিত হয়েছে। প্রথম কয়েক মিনিট ব্যতীত সমস্ত সময় মধ্য প্রদেশ নিজেদের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে এবং ক্রীড়া-চাতুর্য্যে দর্শকদের অভিভূত করে তোলে। সাধারণ্যে মনে হয় ক্রীড়া-ক্ষেত্রে একটি মাত্র দলই যেন এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেছে।

এই প্রতিদ্বন্দ্বীতায় ভূতপূর্ব্ব বিজয়ী দিল্লী দল মানভাদার দলকে ৩—১ গোলে পরাজিত করে সেমি-ফাইনাল খেলার যোগ্যতা লাভ করেছে।

বাঙ্গলা দেশকে মধ্য প্রদেশ যে ভাবে পরাভূত করে তাতে অনেকেরই এ দলের চ্যাম্পিয়ানশিপ পাবার সম্ভাবনা আশা করেছিলেন, কিন্তু গোয়ালিয়ার দল সে আশা সম্পূর্ণ ধূলিসাৎ করে দিয়েছেন মধ্য প্রদেশকে ৪—১ গোলে বিস্ময়পূর্ণ ভাবে পরাজিত করে। সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে জানলে যত বড় প্রতিপক্ষ হউক না কেন তাকে পরাজিত করা সহজসাধ্য হয়ে ওঠে। গোয়ালিয়ার দল এর জাজ্জ্বল্য প্রমাণ। খেলার মধ্যে কিন্তু গোয়ালিয়ারদলের খেলা মোটেই প্রাণস্পর্শী হয়ে ওঠে নি কোন সময়েই।

*

গত সপ্তাহের স্থানীয় খেলার ফলাফল :—

২৫শে ফেব্রুয়ারী শুক্রবার :—

ইঃ বিঃ২—ডালহৌসী—১

জেভেরিয়ান্স ৩—মেসারার্স—১

২৬শে শনিবার :—

গৌয়ার—২ মহঃ স্পোঃ—২

ডালহৌসী—২—আর্ম্মেনিয়ান—১

২৮শে ঐ সোমবার :—

লিলুয়া—১ ডালহৌসী—০

২৯শে ঐ মঙ্গলবার :—

বি জি প্রেস—১ পাঞ্জাব স্পোঃ—০

বি এণ্ড এ আর—০ আর্ম্মেনিয়ান—১

প্রথম বিভাগের লীগ টেবিলে কাহার কিরূপ স্থান :—

(সোমবার পর্য্যন্ত)

ইষ্টবেঙ্গল	৩	৩	০	০	৭	১	৬
মিঃ মেডিক্যাল্‌স	৪	২	২	০	৫	২	৬
কাষ্টমস	৩	২	১	০	৯	৪	৫
গৌয়ার	৪	২	১	১	৭	৫	৪
ডালহৌসী	৫	২	১	২	৩	৫	৫
পুলিশ	২	২	০	০	৭	০	৪
মহমেডান স্পোঃ	৩	১	২	০	৪	৩	৪
বি এণ্ড এ আর	৪	২	০	২	৯	১২	৪
মোহনবাগান	২	১	২	০	৪	১	৩

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের হকি টুর্ণামেণ্টের দক্ষিণ বিভাগের খেলায় ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ১—০ গোলে মাদ্রাজকে পরাজিত করে।

*

নিখিল ভারত ফুটবল প্রতিষ্ঠানের এক বিশেষ অনুষ্ঠানে এ বৎসর মহারাজা অফ সন্তোষের স্মৃতি রক্ষার্থে আন্তঃ প্রাদেশিক ফুটবল খেলাটি অনুষ্ঠিত হবে বলে প্রকাশ। এজন্য উক্ত সমিতিকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

উত্তর বিভাগ—এন্ ডব্লিউ এফ্ পি, এন ডব্লিউ এফ্ এ, দিল্লী এবং ইউ পি,

দক্ষিণ বিভাগ :—মাদ্রাজ, মহীশূর, হায়দ্রাবাদ।

পূর্ব্ব বিভাগ :—আই এফ্ এ, ঢাকা, বিহার।

পশ্চিম বিভাগ :—ডব্লিউ আই এফ্ এ, সিন্ধুদেশ, রাজপুতানা।

গত বৎসরের কর্ম্মকর্ত্তাগণ এ বৎসরের জন্য পুনরায় নির্ব্বাচিত হয়েছেন এ দিনের অধিবেশনে।

নাটমণ্ডপ

শৈলজানন্দের সম্বর্দ্ধনা
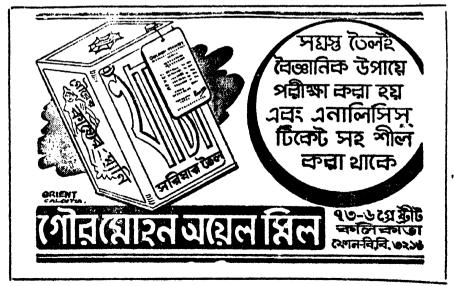
গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী ৩৬নং বেথুন রো'তে শ্রীযুক্ত পান্নালাল নান মহাশয়ের গৃহে প্রাইমা ফিল্ম ও ষ্টার কর্পোরেশনের কর্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় স্বনামধন্য সাহিত্যিক ও চিত্র পরিচালক শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়কে সম্বর্দ্ধিত করা হয়। শ্রীতুষার কান্তি ঘোষ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। আমাদের যতদূর মনে হয় এ ধরণের সম্বর্দ্ধনা বোধ হয় বাংলা দেশে এই প্রথম। পর পর তিনখানি ছবি (নন্দিনী, বন্দী এবং শহর থেকে দূরে) তে শৈলজানন্দের এইরূপ অভাবিত কৃতিত্ব সত্যই বিস্ময়কর। এই উপলক্ষে শ্রীগোপাল লাল সান্যাল, বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র, সুধীরেন্দ্র সান্যাল ও সভাপতি মহাশয় শৈলজানন্দের প্রতিভার বিষয় আলোচনা করেন ও অভিনন্দন জানান। শৈলজানন্দের এককালীন সহকর্মী বিনয় চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক লিখিত একখানি অভিনন্দন-পত্র সুধীরেন্দ্র সান্যাল কর্ত্তৃক সভায় পঠিত হয়। "শহর থেকে দূরে"র অপূর্ব্ব সাফল্যে ইহার প্রযোজককে অভিনন্দন জানাইলে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ সরকার একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতার দ্বারা সকলকে ধন্যবাদ জানান। সর্ব্বশেষে শৈলজানন্দের প্রতিভাষণটি খুব সুন্দর হইয়াছিল। তিনি বলেন যে তাঁহার ছবিগুলির সাফল্যের গৌরব তিনি একা গ্রহণ করিতে পারেন না, কারণ এই সাফল্যের জন্য তাঁহার প্রত্যেক সহকর্মীর (এমন কি electric boyএর পর্য্যন্ত) কৃতিত্ব বর্ত্তমান, সুতরাং প্রশংসা প্রত্যেকেরই প্রাপ্য।

তার পর জহর গাঙ্গুলী ও ফণী রায়কে একটি করিয়া স্বর্ণ-কেন্দ্র পদক দেওয়া হয় এবং কর্তৃপক্ষ শৈলজানন্দকে একটি চায়ের সেট উপহার দেন।

ইহার পর নবদ্বীপ হালদারের "ট্রেণ-জার্ণি" নামক একটি কৌতুকাভিনয় হয়। সর্ব্বশেষে অভ্যাগতগণকে প্রীতিভোজে আপ্যায়িত করা হয়।

চিত্রশিল্প-সংশ্লিষ্ট বহু ব্যক্তি এই সভায় উপস্থিত ছিলেন।

ষ্টুডিওর খবর

ইউরেকা পিকচার্সের "দোটানা"র শুটিং ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে চলিতেছে। জহর গাঙ্গুলী শৈলেন চৌধুরী, পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করিতেছেন। মণি বর্ম্মা ইহার পরিচালক এবং গল্প-লেখক। সঙ্গীত পরিচালনা করিবেন কালীপদ সেন।

প্রমথেশ বড়ুয়া পরিচালিত "চাঁদের কলঙ্ক" ও "সুবে-শ্যাম"-এর আর অল্পই বাকী। নিউ থিয়েটার্স ষ্টুডিওতে "দুই পুরুষ", "উদয়ের পথে" ও "My Sister" (হিন্দি)-র শুটিং চলিতেছে। কালী ফিল্মস ষ্টুডিওতে এম, পি, প্রোডাকশানের "বিদেশিনী" এবং ইষ্টার্ণ টকীজের "অভিনয় নয়" দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। উপরোক্ত ছবিগুলি ছাড়া ভারতলক্ষ্মীর "গৃহলক্ষ্মী" এবং নিউ সেঞ্চুরী প্রোডাকশানের "প্রতিকার" এর শুটিং বেশ জোর চলিতেছে। চিত্র ভারতীর "শেষ-রক্ষা" "শহর থেকে দূরে"র পর রূপবাণীতে মুক্তিলাভ করিবে।

* * *

"শহর থেকে দূরে" রূপবাণীতে ১১শ সপ্তাহে পড়িল, কিন্তু এখনও ভীড় কমে নাই। "যোগাযোগ"-এর হিন্দী সংস্করণ "হাসপাতাল" আগামী শনিবার চিত্রা ও নিউ সিনেমায় মুক্তিলাভ করিবে। আগামী শনিবার মিনার্ভা সিনেমায় তলোয়ার প্রোডাকশানের "শুক্রিয়া"র শুভ উদ্বোধন হইবে। ইহাতে রমলা, সুন্দর, গেয়ানী, রূপলেখা, মনোরমা, অমর প্রভৃতি অভিনয় করিয়াছেন। একটি অপ্রকাশ্য প্রদর্শনীতে ছবিখানি আমরা দেখিয়া প্রীতিলাভ করিয়াছি। বারান্তরে ইহার বিশদ সমালোচনা করিবার ইচ্ছা থাকিল। "শ্রী"তে "বিরিঞ্চি বাবা", "অল-ষ্টার ট্রাজেডী ও "গোঁজামিল" তৃতীয় সপ্তাহে পড়িল। তাহা ছাড়া গণেশ টকীতে "রাম-রাজ্য" (৩০শ সপ্তাহ), প্যারামাউণ্টে "ভালাই" (৪র্থ সপ্তাহ), চলিতেছে। চিত্রলেখায় এ সপ্তাহে 'খান-দান' দেখান হইবে।

দীপালীর স্বত্বাধিকারী শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত, ১২৩/১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, দীপালী প্রেসে মুদ্রিত ও দীপালী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

—দোল সংখ্যা—

প্রধান সম্পাদক—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় :: সহঃ সম্পাদক—শ্রীধীরেন্দ্রমোহন মজুমদার বি. এল.

১৬শ বর্ষ VOL. XVI. } ২৫শে ফাল্গুন ১৩৫০ :: March 9, 1944 { ১০ম সংখ্যা No. 10

আলোচনী

আজ হোলী। হিন্দু ভারতের বসন্ত-উৎসবের দিন। হিন্দুর সাহিত্যে, ধর্ম্মে ও তাহার কৃষ্টির সহিত এ উৎসবের যোগাযোগ। নবকিশলয় শাখায় যে রক্তরাগ আজ অপরূপ হইয়া উঠিয়াছে সূর্য্যাস্তে তাহারই প্রকাশ মনে যেন কিসের আবেশ বহিয়া আনে। এ ঋতুতে অন্তর ও প্রকৃতির অবাধ হোলিখেলা সুরু হইয়া যায়। দূর হইতে ফাগুয়ার কোলাহল ভাসিয়া আসিতেছে। বাহিরে দুঃখ ও কষ্টের ক্ষতমুখে যে লাল রুধির রেখা ফুটিয়া উঠিতেছিল তাহা যেন আবিরের লালে লাল হইয়া উঠিল। মনসিজের চরণ স্পর্শে আজ বাহির পড়িয়া রহিল বহুদূরে—মানুষের জয় এইখানে।

• • •

গত শনিবার ৪ঠা মার্চ্চ গভর্ণর বাহাদুরের পৌরোহিত্যে কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন (Convocation) উৎসব হইয়া গিয়াছে। প্রায় ২৩৬৮ ছাত্র ছাত্রীর মধ্যে মহিলার সংখ্যা ছিল ২৪২, ইহারা প্রত্যেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ডিগ্রি লাভ করিয়াছেন। পোষ্ট গ্রাজুয়েট বিভাগের ভূতপূর্ব্ব শিক্ষক ডাঃ নলিনী মোহন সান্যাল মহাশয় ৮০ বৎসর বয়সে পি-এইচ-ডি, ডিগ্রী লাভ করিলেন, ইহা উল্লেখযোগ্য। আর একজন ভদ্রলোক, দুঃখের বিষয় তাহার নাম সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় নাই, ৫০ বৎসর বয়সে ১৮বার ফেল করিয়া গ্রাজুয়েট হইয়াছেন। ইহা তাঁহার উনবিংশ প্রচেষ্টা, সুখের কথা এবার তিনি বিফল হন নাই।

• • •

ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন। একস্থানে তিনি বলিয়াছেন—সম্প্রদায় বা ধর্ম্ম লইয়া জাতি তৈয়ারী হয় না। ভারত শুধু একটা ভৌগোলিক ব্যাপার নয় বা লোক সংখ্যা লইয়াও তাহার অস্তিত্ব গড়িয়া ওঠে নাই। ভারতীয় জীবনের ভঙ্গীই হইল আসল কথা। এই বিশেষ ভঙ্গীর ধারাবাহিকতা ও ঐতিহ্য আছে। আমাদের চিন্তা ও জীবন যাপনের প্রণালী বহু মানুষের সংস্পর্শে বহু ধর্ম্ম ও সম্প্রদায়ের মিলিত জীবনের মধ্য দিয়া এদেশে গড়িয়া উঠিয়াছে। ভারতীয় জীবন অপরিহার্য্য Values সৃষ্টি করিয়াছে যাহাকে আমরা সুখ ও সুবিধার খাতিরেও ত্যাগ করিতে পারি না। কথাগুলিতে চিন্তা করিবার বস্তু আছে।

• • •

কলিকাতার "ষ্টেটশম্যান" পত্রিকায় ১৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখে যে সম্পাদকীয় বাহির হইয়াছে তাহা উল্লেখযোগ্য। ইহা হইতে আমাদের সংবাদ নিয়ন্ত্রণ-নীতির পরিচয় খানিকটা পাওয়া যাইবে। "ষ্টেটশম্যান" জাতীয়তাবাদী পত্রিকা নয়। ভাবপ্রবণ উচ্ছ্বাস প্রকাশ পত্রিকাটির প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। তাহা সত্বেও একটি বিশেষ ক্ষেত্রে সরকারী সেন্সারের

খণ্ড পত্রিকাটির উপর প্রয়োগ করিতে হইয়াছিল। "ষ্টেটশম্যান" এ হস্তক্ষেপ প্রসন্ন চিত্তে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। ঘটনার এতদিন পরে বিষয়টির উল্লেখ করা হইয়াছে দেখিয়া এইরূপ মনে হওয়া অসঙ্গত নয়। ১৯৪২-৪৩ সালের ডিসেম্বর এপ্রিল-এর মধ্যে আরাকান যুদ্ধ সম্বন্ধে দুইটী সম্পাদকীয় এই পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল। এপ্রিল-এর সম্পাদকীয় নিবন্ধ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, লেখাটি সত্য সংবাদের উপর ভিত্তি করিয়া সতর্কভাবে রচিত হইয়াছিল। তথাপি কর্তৃপক্ষ সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা অবলম্বন করেন এবং যাহাতে বৈদেশিক পত্রিকাগুলিতে সংবাদ পুনরুদ্ধৃত না হয় তাহার ব্যবস্থা করেন।

* * *

কলিকাতায় রাজপথে গ্যাসের আলোর ব্যবস্থা প্রায় ৮৭ বৎসরের। জানা গেল গ্যাসের আলোর পরিবর্ত্তে কলিকাতার পথে বিজলীর আলোক ব্যবস্থার কথা কর্পোরেশন চিন্তা করিতেছেন। গ্যাসের আলোর হার কমাইবার জন্য গ্যাস কোম্পানীকে একটি প্রস্তাব দেওয়া হইয়াছে। কোম্পানী যদি তাহা গ্রহণ না করেন তাহা হইলে কলিকাতার উনিশ হাজার বাতি বিজলী বাতিতে পরিবর্ত্তিত হইবে এবং ইহা হইতে বৎসরে প্রায় ৪ লক্ষ টাকা বাঁচিবে।

* * *

গত ৪ঠা মার্চ্চ, শনিবার, কলিকাতা হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার মিঃ এস, এন, ব্যানার্জ্জী লোকান্তরিত হইয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে বাঙ্গালী একজন বিশিষ্ট আইনজ্ঞকে হারাইয়াছে। বাংলার ক্রীড়াজগতেও তিনি জনপ্রিয় ছিলেন। রাষ্ট্রনীতিতে তিনি মহাসভার কার্য্যতালিকাকে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। বহু রাষ্ট্রনৈতিক মঞ্চে তাঁহার অসাধারণ বাগ্মিতা ও যুক্তিদ্বারা তিনি জনসাধারণকে মুগ্ধ করিয়াছেন। এই প্রদেশের বর্ত্তমান নেতৃত্বের কথা বিবেচনা করিলে তাঁহার মৃত্যু অত্যন্ত শোকাবহ বিবেচিত হইবে।

* * *

স্বর্গতা কস্তুরীবাঈ-এর স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় এক আবেদন প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার আবেদনক্রমে গত ৫ই মার্চ্চ ভারতের সর্ব্বত্র "কস্তুরীবাঈ দিবস" অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। বহু অনুষ্ঠানে দলে দলে মহিলারা যোগদান করিয়াছিলেন বলিয়া জানা গিয়াছে। গান্ধী গৃহিনীর নীরব ও নিরভিমান কর্ম্মসাধনা ভারতীয় নারীর নিকট দীর্ঘদিন উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে।

অমৃতের সন্তান

—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

ভেসে গেল উড়ে গেল বন্যায় বাত্যায়
যাহাদের গরু জরু ধন ধান সমুদায়,
গলাজলে দাঁড়াইয়া যারা সব হারাইয়া
শুনাইল বিশ্বেরে নিঃস্বের শেষ গান—
জয় হোক তাহাদের সেই সব হারাদের
তাহারাই সত্যই অমৃতের সন্তান।

পুরশ্রী পল্লীর লক্ষ্মীর বিরহেতে
বিলুপ্ত হল যবে গেহে ও খামারে ক্ষেতে,
গ্রাম ছাড়ি দলে দলে নগরে আসিল চলে
জঠর তাড়নে যারা ত্যজি মান-অপমান,
ভুলিয়া ভিটার মায়া ত্যজি সুত পতি জায়া
সেই সব-ভোলাদের গাই এই জয়গান।

এক মুঠি ভাত যারা নাহি পেল ঘুরি ঘুরি
খাবারের দোকানেও করিল না তবু চুরি,
হন্যে হইয়া যারা ভ্রমিল নগর সারা
পাইল না তবু কোথা অন্নের সন্ধান—
জয় হোক তাহাদের সেই হতভাগাদের
মরে যারা করে গেল মরণের অপমান।

জয় হোক তাহাদের যারা ঘর বাড়ী ছেড়ে
নগরের পথে পথে কুকুরের মত ফেরে,
যারা শুধু মাগে ভাত যেথা সেথা পাতে হাত
উচ্ছ ও জঞ্জাল ঘাঁটে যারা দিনমান,
পথমাঝে মরে থাকি মৃত্যুরে দেয় ফাঁকি
সেই সব অমরের গাই আজি জয়গান।

ভিটে মাটি ছেড়ে যারা নগরেতে খেতে এল
দেশ গেল ঘর গেল গরু জরু ধান গেল,
যা ছিল তা সব গেল তবু খেতে নাহি পেল
রাজপথে ভরে গেল কঙ্কালে চলমান—
উলঙ্গ অস্থি-র চলন্ত করোটির
জীবন্ত প্রেতেদের গাই এই জয়গান।

যেই সব অভাগিনী জঠরের তাড়নায়
মরণের হাত হতে বাঁচাইয়া আপনায়
মরিল যাহারা প্রাণে দেহ দিয়া শয়তানে—
মরণের চেয়ে বড় যে মানুষ-শয়তান—
যাদের নয়ন জলে মরণেরো হিয়া গলে
তাহাদের জয় হোক্—এ তাদের জয়গান।

জয় হোক সেই সব লাঞ্ছিত আত্মার
গেল যারা রেখে শুধু হিয়া-ভরা হাহাকার,
মানুষের মহাপাপে তাহাদের অভিশাপে
উঠিছে যে হলাহল তাহা হতে নাহি ত্রাণ!
পিছে ফেলি মৃত্যুরে গেল যারা সুরপুরে—
অমৃতের সন্তান—এ তাদের জয়গান।

৪ঠা মার্চ্চ ১৯৪৪।

বুঝলে কথা সোজা?

—শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী

আমার গান গাইতে যদি পেতে মোহন বাঁশী
তোমার গান গাইলে পরে বলব কটু-ভাষী।
আমার হয়ে লড়তে যদি দিতেম হাতে অসি
নিজের তরে লড়তে গেলে ঝুলবে গলে রসি।

তোমার কথা তোমাতে থাক্ প্রকাশ করা পাপ,
তোমার আশা, তোমার সাধ, তোমার অভিশাপ।
তোমার ধন, তোমার ধান আমার ঘরে দাও,
তোমার ক্ষুধা পেতেও পারে, আমার কাছে চাও।

চাওয়াটুকু সইতে পারি, দেওয়া মোর খুসী,
দাবী দাওয়া করলে পরে দিতেও পারি ঘুষী।
কাঁদতে পারো—চেঁচিয়ে নয়; করতে পারো গোসা
দয়ার বশে দিতেও পারি খুদ কুঁড়া ও খোসা।

নগদা দামে নিতেও পারো মাথায় বহে বোঝা,
দয়াল ব'লে করবে পূজা—বুঝলে কথা সোজা?

দোল

—শ্রীগিরিজাকুমার বসু

এই যে রঙের খেলা
সারাদিন সারা বেলা
এই যে খুসীর মেলা সজনি!
কেবলি তনুতে নয়
প্রাণে যেন জেগে রয়
তাহারি পরশ দিন রজনী।

সত্যযুগের সূচনা

(গল্প)

—শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

গদাইয়ের চাকরী হয়ে গেল।

ডিউটি দিনে নয়, রাতে।

সন্ধ্যা ছ'টা থেকে রাত দেড়টা পর্য্যন্ত বারোখানি ট্রেণ পাস করাতে হয়।

ষ্টেশনের ওপাশে খানিকটা এগিয়ে গেলেই গুমটি। লাইনের ধারে ছোট ঘরখানিতে সারারাত লণ্ঠনটী পাশে রেখে গদাই বসে থাকে। বসে বসে কখন-কখন ঝিমুনি আসে। কিন্তু তন্দ্রাটুকু ভালো করে উপভোগ করে নেবার আগেই রাত্রির স্তব্ধতা ভেদ করে ইঞ্জিনের শব্দ ভেসে আসে। রাত্রির থম্‌থমে অন্ধকারকে সচকিত করে সার্চলাইটের জলন্ত দৃষ্টি ঝল্‌মল্ করে ওঠে। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে আলোটা হাতে নিয়ে গদাই বাইরে গিয়ে দাঁড়ায়। নীল আলোটা জ্বলে ওঠে, চারিপাশ আলোয় ঝল্‌সে দিয়ে কালো ইঞ্জিনখানি পিছনের জনবহুল বগী-গুলিকে টেনে নিয়ে ছুটে চলে যায়। বাষ্পের দীর্ঘশ্বাস, চাকার ঘর্ষণ, রেলের খট্‌খট্ শব্দ গাড়ী চলে যাবার পরেও খানিকক্ষণ চারিদিকে জম্‌জম্ করতে থাকে। ট্রেণের শেষ আলোটা অন্ধকারে মিলিয়ে যাবার পর গদাই আবার ঘরে ঢুকে দেয়ালে হেলান দিয়ে ঝিমুতে সুরু করে।

রাত দেড়টার সময় শেষ গাড়ী চলে গেলেই গদাইয়ের ছুটী। লণ্ঠনটী হাতে নিয়ে লাইনের পাশে সরু পথটী দিয়ে ষ্টেশনে ফিরে আসে। ষ্টেশন মাষ্টারবাবু একখানি মাদুর দিয়েছেন, সেটি পেতে ইণ্টার ক্লাসের ওয়েটিং রুমে গদাই শুয়ে পড়ে, একঘুমে বাকি রাতটুকু কেটে যায়।

ষ্টেশনের কাছেই কুলিদের আস্তানা গুমটি থেকে আসার পথেই পড়ে। অত রাতেও কখন-কখন ওদিক থেকে সোরগোল ভেসে আসে। প্রচুর তাড়ি খাওয়ার আনন্দে মাঝে মাঝে দু' একটা রাত এমনি হাল্লা করে খোল মাদল বাজিয়ে আর চীৎকার করেই তারা কাটিয়ে দিতে ভালবাসে।

সেদিন রাত্রে সবেমাত্র মাদুরখানি বিছিয়েছে এমন সময় একজন এসে গদাইকে ডেকে নিয়ে গেল—বললে—চলো তো কর্ত্তা, তোমায় একটা পরামর্শ দিতে হবে—

—এখন—এই এতো রাতে ?

—হ্যাঁ হ্যাঁ এখুনি—

গদাইকে যেতে হোল। গিয়ে দেখে ওপাশের মাঠে ক'জন লোক একটি মেয়েকে ধরে এনেছে। মেয়েটির নামে চুরীর অভিযোগ আছে। সন্ধ্যার কিছু পরে লখুয়া আড়াই সের আটা রেখে একবার পায়খানা গেছে, সেই ফাঁকে মেয়েটা তার ঘরে ঢুকে আটার থলিটী চুরি করেছে। অতবড় থলিটি লুকাতে অসুবিধা হয়েছিল বলেই রক্ষা। ভিখনের চোখে পড়তেই কেমন যেন সন্দেহ হয়। অচেনা মুখ দেখে ভিখন তাকে ধরে ফেলে। সেই

থেকে মেয়েটাকে তারা আটকে রেখেছে। এখন এই মেয়েটার সম্পর্কে কি ব্যবস্থা করা যায় তাই ঠিক করে দেবার জন্য তারা গদাইকে ডেকেছে।

ধরা পড়ে মেয়েটার কিন্তু এতটুকু লজ্জা নেই, গদাইকে দেখে বললে—খেতে হবে তো বাবু, খাব না?

ভিখন গর্জে উঠলো—তা বলে চুরী করবি?

—কেন করবো না?

——বটে! দাঁড়া তোকে আমি থানায় দোব। আমার আড়াই সের আটা···

—আরে, তোর আড়াইসের আটার দামই বড় বেশী হোল, আর আমার জীবনের কি কোন দাম নেই?—বলে চটুল একটু হেসে কোমরের পাশে একখানি হাত দিয়ে বুকের কাপড়টি টান করে সে ঋজু হয়ে দাঁড়িয়ে বললে—দেখ দিকি, আমার কি কোন দাম নেই?

সব ক'টি মজুরের দৃষ্টি উগ্র হয়ে উঠলো।

আবদুল তাড়াতাড়ি আগিয়ে এসে বললে—শোন শোন্, তুই আমার সঙ্গে আয়, আমি তোকে পেট ভরে খাইয়ে দোব, কি খাবি বল?

লখুয়া লাফিয়ে উঠলো, বললে—তোর সঙ্গে যাবে কি রে? আমার আড়াইসের আটা নিলে তোর সঙ্গে যাবার জন্যে?

আবদুল বললে—আড়াইসের আটা তোকে আমি কিনে দোব'খন, যা—

মেয়েটা আরেকটু হেসে ঘাড়টা হেলিয়ে বললে—আমাকে শুধু খাওয়ালে চলবে না, আমার পয়সা চাই!

ভিখন বললে—আমি দোব তোকে পয়সা!

আবদুল বললে—আমি দোব—

লখিয়া বললে—আমি দোব—

তারা তিনজনেই মেয়েটির সঙ্গে এগিয়ে গেল।

গদাইকে কোন কথা বলতে হোল না, সুবিধাও সে পেলে না। মেয়েদের এমন নির্লজ্জতা গদাই এর আগে কখনও দেখে নি।

সেই থেকে সন্ধ্যার সময় মেয়েটাকে প্রায়ই গদাই দেখে তার গুমটির সামনে দিয়ে যায়, সঙ্গে থাকে কখনো ভিখন, কখন লখাই, কখনো বা আবদুল।

আবার এক একবার তাদেরই কারুর সঙ্গে মুখোমুখি হলে বলে—বেটী আমার সর্ব্বনাশ করলে, হাতে একটা পয়সা রাখার জো নেই। বেটীকে এবার এখান থেকে মেরে তাড়াবো একদিন।

কিন্তু সন্ধ্যেবেলা ওই মেয়েটাকে নিয়ে আবার মজলিস জমিয়ে তোলে।

সেদিন শেষ গাড়ি চলে যাবার আগে গদাই একটু ঝিমুচ্ছিল, সহসা কার একখানি হাত গায়ে পড়তেই চমকে উঠলো। দেখে ঘন অন্ধকারে শাদা একটি মূর্ত্তি তার পিছনে দাঁড়িয়ে আছে। গদাই একটু ভয় পেয়েছিল। তার হাবভাব দেখে মূর্ত্তিটা খিলখিল করে হেসে উঠলো, বললে—ভয় পাসনি, আমি ভূত নই।

এবার গদাই চিনলে।

মেয়েটা বললে—এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, দেখলুম তুই বসে আছিস, ভাবলুম দুটো কথা বলে যাই—

—এতো রাতে যাচ্ছিস কোথা?

এবার আর চুরী করতে নয় রে, এবার যাচ্ছি এসিষ্টেন মাষ্টারবাবুর ঘরে—

—এতো রাত্তিরে?

—হ্যাঁ, বাবুর সঙ্গে আমার দরকার আছে।

মেয়েটার কথা বলার ধরণটা গদাইয়ের কানে ভারী বিশ্রী লাগে, আর কথা বলতে তার ইচ্ছা করে না। বললে, আচ্ছা তুই যা—

যাবার কিন্তু কোন লক্ষণই দেখা গেল না। মেয়েটা ঝুপ করে তার পাশে বসে পড়লো। খানিকক্ষণ তারায় ভরা আকাশের পানে তাকিয়ে থেকে সহসা উদাস স্বরে প্রশ্ন করলো—আচ্ছা, মানুষ মরে কোথায় যায় বলতে পারিস?

গদাই বিস্ময়ে তার মুখের পানে তাকায়, এই প্রশ্নের জবাব সে কি করে দেবে!

মেয়েটা কিছুক্ষণ গদাইয়ের মুখের পানে চেয়ে রইল, তারপর বললে—এ কথার জবাব তুই দিতে পারবি না তা আমি জানি। কত জনকে জিজ্ঞেস করেছি কেউ বলতে পারেনি, তুই বলবি কেমন করে! আর একটা কথা আমি জিজ্ঞেস করি, বলতে পারবি?

—কী?

—বলতে পারিস আমরা খেতে পাইনে কেন?

—এতো খুব সহজ,—আমাদের পয়সা নেই বলে।

—কেন পয়সা নেই? আমরা তো সেই সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্য্যন্ত খাটি, তবু আমরা পয়সা পাই না কেন?

গদাই চুপ করে রইল।

মেয়েটা বললে—এ কথার জবাবও তো তুই দিতে পারবি নে। আচ্ছা, ভগবান আছে মানিস?

গদাই ঘাড় নেড়ে বললে—হ্যাঁ।

—আমি কিন্তু মানিনে, ভগবান যদি খেতে না দেয় তো সে ভগবানকে মানবো কেন বলত?

ইতিমধ্যে দূরে লৌহদানবের দীর্ঘশ্বাস

শোনা যায়। গদাই উঠে পড়ে। লণ্ঠনটি হাতে নিয়ে বেরিয়ে আসে।

মেয়েটাও আর দাঁড়ালো না, গদাইয়ের পিছু পিছু বাইরে এসে বললে—যাই, রাত অনেক হোল, এসিষ্টন মাষ্টারবাবু অনেক করে বলে দেছেন।

ট্রেণ পাস করিয়ে দিয়ে ফিরে এসে গদাই দেখলে লছমিয়া তখনও যায়নি, বললে—যাসনি যে এখনও?

—পরে যাব'খন। এখন তোর এই রোয়াকটায় খানিকক্ষণ শুয়ে থাকি। ওই যে তারাটা দেখছিস, আমার কেবলি মনে হচ্ছে ওইটা মতিয়ার চোখ। সেও ঠিক এমনি ড্যাব্ ড্যাব্ করে চেয়ে থাকতো। এখনো অভ্যাস যায় নি। স্বভাব যায় না মলে...

গদাই জিজ্ঞেস করলো—মতিয়া তোর কে?

—ও: তুই মতিয়াকে দেখিস্ নি না? আমার ছোট ভাই। খেতে না পেয়ে শুকিয়ে শুকিয়ে মরে গেল! কত ডাকলুম, সাড়াও দিলে না। শেষে বাবুরা একখানা মোটর গাড়ী নিয়ে এসে তুলে নিয়ে চলে গেল। বোধ হয় গঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়েছে, কি বলিস? ভিখিরীর মড়া কে আর পয়সা খরচ করে পোড়ায় বল? কাঠ কেনার পয়সা দেবে কে?...মতিয়া যা দুষ্টু ছেলে, আমাদের অমন আমগাছটার আগডালে উঠে যেত এক মিনিটে, সে কি আর গঙ্গায় চুপ করে থাকার ছেলে—সে ঠিক সাঁতরে চলে গেছে স্বর্গে। ওই যে গাছটার মাথায় পাশাপাশি দুটো তারা দেখছিস ওই দুটো তার চোখ, আমি ঠিক চিনেছি, আচ্ছা তুইই বল্ ও ঠিক মতিয়া কি না!

গদাই বোঝে, লছমিয়ার মাথার মধ্যে যে গোলমাল সে কিসের জন্ত। তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে সারি সারি ভিখারী, রাজপথের ফুটপাতে বসে বসে ধুঁকছে, দুটো অন্ন চাইবার মত কণ্ঠের সামর্থ্য তাদের নেই। প্রতি নিঃশ্বাসে বুকের পাঁজরগুলো উঠছে, নাবছে, শেষে একেবারে থেমে যাচ্ছে এক মুঠো অন্নের অভাবে।

সহসা গদাই জিজ্ঞেস করলো—কিছু খাবি?

লছমিয়া সে কথার কোন জবাব না দিয়ে বললে—এই যে সব গাড়ী চলে? কত ভাড়া লাগে তো—বাবুরা অত টাকা পায় কোত্থেকে বলত?

—রোজগার করে।

—আর আমরা খেতে পাই না কেন?

—রোজগার করতে পারি না, পয়সা নেই।

—ঠিক বলেছিস পয়সা নেই। বায়স্কোপের সামনে বসে ভিক্ষে চাইতুম, কত বাবু এলো গেলো, কত পয়সা খরচ করলে, কিন্তু আমাকে একটা ডবল পয়সা কেউ দিলে না, মতিয়া না খেয়ে মরে গেল। পয়সা নেই, আমাদের পয়সা নেই!

হঠাৎ লছমিয়া তড়বড় করে উঠে পড়লো, মাষ্টারবাবু বলেছে একটা টাকা দেবে, যাই—

গদাইয়ের দিকে আর ভ্রূক্ষেপ না করে চলে গেল ষ্টেশানের দিকে।

লণ্ঠনটার নীল কাচখানার পানে তাকিয়ে গদাই চুপ করে বসে রইল, এখনও আরো একখানা ট্রেণ পাশ করবে, তারপর তার ছুটী।

পরদিন সন্ধ্যার পরে লছমিয়ার সঙ্গে আবার দেখা।

দু'খানা এক টাকার নোট চোখের সামনে তুলে ধরে বললে—দেখছিস নগদ দু' টাকা। মাষ্টারবাবু কাল কত খাওয়ালে, আর এই দুটো টাকা দিলে, আবার বলেছে আজ যেতে। বলেছে একখানা ভাল কাপড় কিনে দেবে, কালো শাড়ী তার উপর সাদা জরীর গুল। ওর কাছে লখিয়া, ভিখন আর আবদুল দিতে পারে কখনও? তুই বল?

তারপর গদাইয়ের মুখের পানে ক' মিনিট চুপ করে তাকিয়ে থেকে কোন উত্তর না পেয়ে বললে—রোজ একটাকা করে দেবে বলেছে, কম কি বল্। টাকা ছিল না, বাড়ী বাড়ী একটু ফ্যান ভিক্ষে করে বেড়িয়েছি কেউ চাট্টি ভাতও দেয় নি, ফ্যান খেয়ে খেয়ে পা ফুলে গেছে। তখন যদি এমনি করে আমায় কেউ টাকা দিত তাহলে মতিয়াকে মিঠাই কিনে খাওয়াতুম। বেচারা না খেয়ে মরে গেল।

লছমিয়া লণ্ঠনের আলোয় নোট দুখানা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে, টাকা বাজাবার ধরণে কাগজে কাগজে ঠোকাঠুকি করে দেখে কোন শব্দ হয় কি না, তারপর কোন এক সময় হি-হি করে হেসে ওঠে।

গদাই বিরক্ত হয়ে বলে উঠলো, কি হচ্ছে কি! তুই কি পাগল হলি নাকি?

—শোন না, ভারী মিষ্টি লাগবে। নোটের কাগজ খস্ খস্ করছে। এই টাকায় কত খাবার কেনা যায় তা জানিস! তোর আমার চেয়ে এর দাম অনেক বেশী। কেমন রঙীন চকচকে দেখছিস না?

লছমিয়া আবার নোট দু'খানা নিয়ে খস্খস্ শব্দ করতে লাগলো। কখনও বা দু'আঙুলে টোকা মেরে ফটফট শব্দ করতে লাগলো।

গদাই তাকিয়ে থাকে: আলো পড়ে নতুন নোট দু'খানা নীলাভ হয়ে উঠেছে, ওর দু' পিঠেই টাকার গোলাকার ছাপ। ওই গোলাকার টাকগুলো নিয়েই এই জগতের যত গোলমাল। একপিঠে ওর রাজার মুখ আর এক পিঠে লতাপাতা গাছ। ওইটাই হোল আমাদের জীবনের দুটো দিক। যার টাকা আছে সে রাজার আদর পায়, যার নেই তাকে আশ্রয় নিতে হয় ওই লতায় পাতায় ঘেরা গাছতলায়। একদিন ওই টাকা ছিল না বলেই এই কলকাতার শহরে তার মায়ের সে:সংকার করতে পারেনি, হাস-পাতালের ডোমেদের হাতে বিক্রী করে দিয়েছিল বাইশ টাকায়। সেদিনকার কথা ভেবে গদাই চঞ্চল হয়ে ওঠে, অকারণে রুক্ষ হয়ে ওঠে লছমিয়ার উপর, বললে, তুই এখান থেকে যা এখন লছমিয়া—আমার ওসব আর ভালো লাগে না।

—কী! তুই আমায় তাড়িয়ে দিচ্ছিস, বেশ, আমি চল্লুম। টাকা থাকলে তোর মত অমন বন্ধু অনেক মিলবে দেখিস!

নোট দু'খানা আচলে বাঁধতে বাঁধতে লছমিয়া চলে গেল।

তারপর দিন কয়েক লছমিয়াকে গদাই আর দেখেনি। লছমিয়ার কথাটি তার মনের এক কোণে চাপা পড়ে গেছে। রেল লাইনটুকু পাশ কাটালেই তার চোখে পড়ে দুর্ভিক্ষের ঢেউ, মানুষের কঙ্কালগুলোকে কে যেন এক পুরু চামড়া ঢাকা দিয়ে প্রাণবন্ত করে পাঠিয়েছে পথে পথে অন্ন ভিক্ষা করতে, রাত্রের অন্ধকারে তাদের আর সে মূর্ত্তি চোখে পড়ে না, প্রেতাত্মার আর্তনাদের মত আকাশে বাতাসে ভেসে বেড়ায়—মা এক মুঠো ভাত দেবে, মাগো—

তারপর চালের দোকানে, আটার দোকানে মানুষের সারি মিশে গেছে পথের একদিক হতে আর এক দিগন্তে।

গদাই আজ নিজেকে ভাগ্যবান মনে করে, ভাগ্যে রেলের চাকরী সে:পেয়েছিল তাই চাল ডাল কয়লার কথা তাকে ভাবতে হয় না এতটুকুও, নাইলে……

গদাই আর ভাবতে ভয় পায়।

সেদিন রাত্রে শেষ ট্রেণ পাশ করিয়ে দিয়ে লণ্ঠন হাতে গদাই ফিরছে এমন সময় পথের পাশে একটা গাছের নীচে দেখে শাদা একটি ছায়া। গদাই প্রথমে মনে করেছিল প্রেতিনী। সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল, এমন

সময় প্রেতিনীটা খিল খিল করে হেসে উঠলো। এগিয়ে এসে বললে—খুব ভয় পেয়েছিস, না?

গদাই চিনলো। লছমিয়া।

কিছু বললে না, পাশ কাটালো।

লছমিয়া তার একখানা হাত ধরলো, বললে—তোর এতো ভয় কিসের শুনি, আমি খেয়ে ফেলবো নাকি? শোন্…

—হাত ছাড়, রাত অনেক হয়েছে…

—শোন্ আগে! রেলগাড়ীতে তো জায়গা হয় না, তাই গিয়েছিলুম হেঁটে। এখানে কনট্রোলের দোকানে সারাদিন রাত ঠায় দাঁড়িয়ে থেকেও তো আর চাল পেলুম না, কয়লাও নেই, তাই ভাবলুম দেশে গিয়ে দু'মুঠো ফুটিয়ে খাইগে। টাকা যখন আছে তখন ভাবনা কি! তিন দিন তিন রাত হেঁটে তো দেশে গেলুম, গিয়ে কি দেখলুম জানিস? গাঁ-শুদ্ধ লোক ধুঁকছে, পয়সা থাকলেও সেখানে চাল মেলে না, তিল জলে ফুটিয়ে সব খাচ্ছে। ছোট ছেলেমেয়ে সবাই প্রায় মরেছে, আর যারা মরেনি তারা দু'চার দিনেই মরবে। ভয় হোল, পালিয়ে এলাম। এখানে এসেও আর খাওয়া হয় নি, কনট্রোলের দোকানে কত আর দাঁড়ানো যায়, তুই বল? কেবলই কানের কাছে শুনছি, মতিয়া ডাকছে—তুই চলে আয়। আজ রাত্রেই যাব মতিয়ার কাছে, এমনি ভাবে আর বেঁচে কি হবে, তুই বল?

—মরবি তাহলে?

—ওদের মত অমন পথে পথে চাট্টি ভাত চেয়ে বেড়াতে আমি পারবো না, পাঁচদিন পেটে ভাত পড়েনি, কিন্তু চেয়েছি আমি কিছু কারুর কাছ থেকে! সারা সন্ধ্যেটা বসে বসে এতো ধুতরো ফুলের বিচি কেটেছি, এবার গিয়ে খাব। কাল সকালে তুই এসে দেখবি আমি এই গাছতলায় মরে পড়ে আছি। আমার কাছে বারোটা টাকা আছে, তুই রাখ—

—তোর টাকা আমি নিতে যাব কেন?

—নিবি নে? যা তবে। আমি যখন মরে যাব তখন আর টাকার কথা ভেবে কি হবে বল। যে পাবে তারি—মতিয়া থাকলে তাকে দিয়ে যেতাম সন্দেশ কিনে খেতো।

সেদিন গদাইয়ের শরীর গতিক ভালো ছিল না, তার উপর খাটুনি হয়েছে বেশী, ছ'খানা মিলিটারী স্পেশাল পাশ করাতে হয়েছে, লছমিয়ার পাগলামিকে উপভোগ করবার মত মন তখন নয়, বিরক্তির স্বরে বললে—তুই মরবি তো মরবি, তাতে আমার কি বল?

—তা ঠিক বলেছিস। রাস্তায় যে কত লোক না খেয়ে মরছে, তাতে এই সহরের বাবুদের কি ক্ষতি হয়েছে বল? তুই তো তাদেরই চাকর……

গদাই তখন চলতে সুরু করেছে।

•

পরদিন সকালে বিছানা ছেড়ে ওঠার আগেই আবদুল এসে হাজির; বললে—শুনেছ গদাইদা, লছমিয়া ছুঁড়ীটা গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছে—

গদাই বিছানায় উঠে বসলো, বললে—সত্যি?

—সত্যি নয় তো কি! চল না দেখিয়ে আনছি—

দেখতে যাবার উৎসাহ গদাইয়ের থাকে না, আবার শুয়ে পড়লো, তন্দ্রা আড়ষ্ট কণ্ঠে বললে—মরুক গে—

আবদুল বললে—খালি কি ওই একটা? ষ্টেশনে যাবার পথে আরো চারটে লোক পড়ে আছে। বইতে লিখেছে সত্যযুগ আসছে, মানুষ যে এভাবে না খেয়ে মরবে তাতো লেখেনি, ব্যাটারা গুণতেই শেখেনি, শুধু ধাপ্পা……

গদাই সে কথার কোন উত্তর দিলে না, শুয়ে শুয়ে চোখ বুজে ভাবে, সত্যযুগ হয়তো এমনি অবস্থার ভিতর দিয়েই সূচিত হয় যুগে যুগে, কে জানে?

কথার মাঝে একটা বিড়ি ধরিয়ে নিয়ে অন্যমনস্কভাবে আবদুল ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

নারীলোক

পরিচালিকা—শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী

রূপ ও প্রকৃতি

—শ্রীশ্যাম বসাক
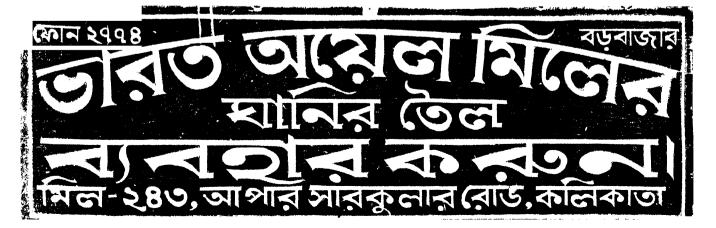
প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের একটা অবিচ্ছিন্ন যোগসূত্র বর্ত্তমান রয়েছে। দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার প্রত্যেক ব্যাপারেই আমরা বারে বারে সে পরিচয় পেয়ে থাকি। প্রকৃতির এই প্রভাব থেকে চেষ্টা করা সত্ত্বেও মুক্ত হবার কোন উপায় আমাদের নাই, দারুণ গ্রীষ্মে প্রকৃতি যখন শুষ্ক ও কঠোর হয়ে ওঠে মানুষের মেজাজও তখন প্রকৃতির মত কতকটা রুক্ষ ভাবাপন্ন হয়, বর্ষায় যখন সমস্ত আকাশ মেঘে ছেয়ে যায় বৃষ্টি পড়ে এবং চারিদিক জুড়ে বিরাজ করে একটা থমথমে ভাব—তখন আমাদের দেহে এবং মনের ওপর তার প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। শীতের রুক্ষ এবং শীর্ণ ভাব অথবা বসন্তের নবীন উন্মাদনা আমাদের জীবনে আপন আপন প্রভাব বিস্তার করে চলে। এ জগতে সুস্থ ও সুন্দর হয়ে বাঁচার মূলেও রয়েছে প্রকৃতি এবং তার প্রভাব।

কলরব-মুখরিত বিংশ শতাব্দীর জীবন যাত্রায় অন্যান্য প্রয়োজনের মত রূপচর্য্যার প্রয়োজনকেও অস্বীকার করা যায় না। এখন রূপচর্য্যা হয়েছে একটা শিক্ষনীয় বিষয় এবং তার প্রয়োজন ও আবেদনের নানা দিক আছে। সৌন্দর্য্য-সাধনায় অঙ্গরাগের মতই প্রকৃতির অনুসরণ ও পর্য্যবেক্ষণ করার বিশেষ আবশ্যকতা আছে। পরিবর্ত্তনশীল প্রকৃতির মাঝে আমরা রূপ ও রসের যে সমাবেশ ও বৈচিত্র্যের পরিচয় পাই সে সবের মধ্যে এমন অনেক ইঙ্গিত আছে যে গুলি নানাভাবে রূপচর্য্যার সহায়ক। সমস্ত প্রকৃতি জুড়ে রূপের যে সমারোহ চলে এবং বিভিন্ন বর্ণ-সমাবেশের যে মনোহারিত্ব পরিস্ফুট হয়ে ওঠে সচেতন মনের কাছে তার দাম খুব বেশী। বর্ণ সমন্বয়ের ব্যাপারে প্রকৃতি আমাদের অনেক ভুল সংশোধন করে সঠিক পথের অনুসন্ধান দেয়। অঙ্গরাগের ব্যাপারেও প্রকৃতির প্রভাবকে অস্বীকার করা যায় না। ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে ব্যবহার্য্য অঙ্গরাগের বিভিন্ন উপকরণগুলি প্রধানতঃ প্রস্তুত হয়ে থাকে সেই সেই ঋতুতে স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যের একাধিক অন্তরায় অন্ততঃ কতক পরিমাণেও দূর করবার উদ্দেশ্য নিয়ে।

বিরাট প্রকৃতির মাঝে একই রূপ বারে বারে রূপান্তরিত হয়ে চলেছে নানা ভাবে। সচেতন মন ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থেকে এই পরিবর্ত্তনের ব্যাপার সহজে এড়িয়ে যায় না। ভাবুক মনের কাছে এইটাই হয়ে দাঁড়ায় একটা রহস্যময় ব্যাপার। সমস্ত মন জুড়ে রচিত হয় চিন্তার জাল। আর এই চিন্তা বাইরে অভিব্যক্ত হয় নানা ভাবে রূপ-কলা-কুশল রূপচর্য্যার মধ্য দিয়ে। রূপ-সাধনায় এইরূপ শিল্পী-মনেরই একান্ত আবশ্যক। প্রকৃতির অনুসরণ অর্থে নিজের রূপের বৈশিষ্ট্যকে বিসর্জ্জন দেওয়া নয়, স্বাতন্ত্র্যকে রক্ষা করা।

এই বিরাট প্রকৃতির এক একটি ক্ষুদ্র অংশ আমরা প্রত্যেকেই। সেইজন্যই রূপ-সাধনায় প্রকৃতির কাছ থেকে পাঠ নেওয়ার প্রয়োজন আমাদের আছে। রূপচর্য্যায় সাফল্য লাভের জন্য যদি আমরা প্রকৃতিকে অনুসরণ করি তবে সেটা হবে সত্যেরই অনুসরণ। রূপকে কি ভাবে সময়োপযোগী, সহজ ও সুন্দর করা যেতে পারে সে শিক্ষা প্রকৃতির কাছ থেকে নানা ভাবে পাওয়া যায়। প্রকৃতির এই সহজ সত্য আদৌ যদি মনের কাছে ধরা না পড়ে তবে বুঝতে হবে মন দেউলে হয়ে গেছে।

হলিউডের সুপ্রসিদ্ধা চিত্রনটী
—জিঞ্জার রজার্স—

দোল সংখ্যা
১৩৫০

ীনা—শালিমার পিকচার্সের "শ্রীকৃষ্ণ ভগবান" চিত্রে ইঁহাকে শীঘ্র দেখা যাইবে।

স্ববর্ণলতা—"তসবীর" "ইনকার" প্রভৃতি ছবিতে ইঁহার অভিনয়ে নিশ্চয়ই আপনি প্রীত হইয়াছিলেন কিন্তু মজহর আর্টের নির্ম্মীয়মান ছবি "বড়িবাত"এ ইঁহার অসামান্য কলানৈপুণ্যের পরিচয় পাইবেন।

নাসিম—চিত্রজগতের সুবিখ্যাতা চিত্রনটী ফিল্মিস্তানের "চল চল রে নওজোয়ান" ইঁহার নূতন ছবি।

রমলা—মিনার্ভা সিনেমায় এখন ইঁহার নবতম ছবি "প্রক্রিয়া" দেখানো হইতেছে।

নলিনী জয়বন্ত—পরিচালক বীরেন্দ্র দেশাই-এর সহিত শীঘ্রই ইনি পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হইবেন।

াহেনুর—ইনি চিত্রজগতে নবাগতা। নব-প্রতিষ্ঠিত ইণ্টারন্যাশনাল থিয়েটারের "জুদাই" চিত্রে নায়িকারূপে অভিনয় করিতেছেন।

●

দীপালী

আপনার কয়েকজন প্রিয় অভিনেত্রী বর্ত্তমানে কোন ছবিতে অভিনয় করিতেছেন তাঁহারই পরিচয় নিয়ে প্রদত্ত হইল।

●

নির্ম্মলা—কার্দার প্রোডাকশনের "শারদা" চিত্রে ইঁহাকে প্রথম দেখা যায়। শীঘ্রই ইঁহাকে কার্দারের "কাঞ্চন" চিত্রে একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় দেখা যাইবে।

●

সুনন্দা দেবী—ইঁহার প্রথম আবির্ভাব হয় "কাশীনাথে", কিন্তু প্রথম চিত্রাবতরণের সঙ্গেই তিনি চিত্রপ্রিয়দের চিত্তজয় করেন। বর্ত্তমানে "দুই পুরুষ"-এ অভিনয় করিতেছেন।
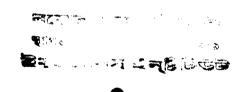
চন্দ্রাবতী—ইনি বর্ত্তমানে নিউ থিয়েটার্সে'র "দুই পুরুষ" ও ভারতলক্ষ্মীর "গৃহলক্ষ্মী"তে অভিনয় করিতেছেন।

●

চিত্র-বর্ত্তিকা

রেণুকা রায়—বর্ত্তমানে ইনি শৈলজানন্দ রচিত ও পরিচালিত "বিপর্য্যয়" চিত্রে নায়িকার ভূমিকাভিনয় করিতেছেন।

ললিতা পাওয়ার ও অনন্ত মারাঠে মিনার্ভা মুভীটোন প্রযোজিত ও কে, সাইক্লার পরিচালিত "ভক্ত রায়দাসে" বিশিষ্ট দুইটি ভূমিকায় রূপদান করিয়াছেন। ছবিখানি কলিকাতায় মুক্তি প্রতীক্ষায়।

১৬শ বর্ষ

১০ম সংখ্যা

বাংলা সাহিত্য ও আমাদের জাতীয় জীবন

—শ্রীনলিনীরঞ্জন সরকার

একবার অবধান করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে, সাহিত্য আমাদের জীবন ও সমাজকে কিরূপ গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছে। যদিও আজিকার ভারতীয় রাজনীতিতে বাঙ্গালী 'পিছ দোহারের' গায়কমাত্র তথাপি একথা মনে করিয়া গর্ব্ব অনুভব করিতে পারি যে, ভারতীয় জাতীয়তা-বাদের প্রথম উন্মেষ হয় বাঙ্গালা দেশে। স্বাজাতিক ভারতের জাতীয় সঙ্গীতটী পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর রচনা। দেশাত্মবোধের এই প্রেরণা বাঙ্গালী তাহার সাহিত্যের মধ্য দিয়াই লাভ করিয়াছে; বিগত-বৈভব স্বদেশের প্রতি মমত্ববোধ, প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা এবং রাষ্ট্রশাসনে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রয়াস বাঙ্গালী তাহার সাহিত্যের মধ্যেই সর্ব্বপ্রথম অনুভব করিয়াছে। এই দিক দিয়া বাঙ্গালার কবি ও সাহিত্যিক ভারতের জাতীয়তাবাদের জনকের আসন নিশ্চয়ই দাবী করিতে পারেন। "স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়"—বলিয়া বাঙ্গালী কবি যে আত্মজিজ্ঞাসার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, মুক্তিকামী ভারত আজো তাহারি অনুশীলন করিতেছে। বঙ্কিমের সাহিত্য বাঙ্গালীকে কিরূপ গভীরভাবে দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে তাহা কাহারও অবিদিত নহে। স্বদেশী যুগে পুলিশ বৃথাই 'আনন্দমঠে'র অনুসন্ধান করিয়া বেড়ায় নাই। নিজের জীবন ইতিহাসের দিক দিয়া বলিতে পারি, রাজনীতির যজ্ঞ-ভবনে সেই সময় আমার প্রথম প্রবেশ,—নেতার অংশে নহে সামান্য কর্ম্মীর ভূমিকায়। যৌবনের সেই গভীর উদ্দীপনাময় অতীতের কথা স্মরণ করিলে নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি, বাঙ্গলার স্বদেশী আন্দোলনের দিনে জাতীয়তাবাদের প্রথম প্রকাশ বাঙ্গালার কাব্য ও সাহিত্য এবং গান হইতে। আমরাও তাহা হইতে যে প্রেরণা লাভ করিয়াছিলাম, তাহা অন্য আর কোন উৎস হইতেই সম্ভব ছিল না। আজি-কার সভায় এমন অনেকেই উপস্থিত আছেন যাঁহারা সেদিনের জাতীয় আন্দোলন প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, অনেকে হয়ত তাহাতে সাক্ষাৎভাবে অংশও গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। কিন্তু বয়সের কোঠায় যাহারা আমাদের বহু পরবর্ত্তীস্থানীয় তাহাদের কাছে সেদিনকার ইতিহাস আর একটু বিস্তৃতভাবে বলিতে চাই। কবিকে যাহারা কল্পনাবিলাসী আকাশচারী বলিয়াই গণ্য করিয়া থাকেন, তাহারা জানিয়া বিস্মিত হইবেন যে স্বদেশী যুগে একা রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও সাহিত্য জাতীয় আন্দোলনকে কী গভীরভাবে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। শুধু স্বদেশী যুগে নহে, একটু অবধান করিলেই দেখা যাইবে কবির বাণী ও রচনা আমাদের পরবর্ত্তীকালের রাজ-নৈতিক চিন্তাধারারও বহুলাংশে পূর্ব্ব নির্দ্দেশ। বস্তুতঃ আমাদের বিগত চল্লিশ বৎসরের রাজনৈতিক কর্ম্ম বা অনুভূতি কবির চিন্তা ধারাকে কোন ক্ষেত্রেই অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে নাই,—যদিও বহুক্ষেত্রে অনুসরণ করিয়াছে মাত্র। মহাত্মাজী কবিকে যে গুরুদেব বলিয়া মানিতেন তাহা অর্থহীন নহে। সমাজের যাহারা দুর্গত, দেশের সেই অগণিত নরনারীর সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধনের দ্বারা দেশসেবার যে বৃহত্তর আদর্শ তিনি জাতির সম্মুখে স্থাপন করিয়াছিলেন, পরবর্ত্তীকালে মহাত্মাজী প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ তাহাকে জাতীয় কংগ্রেসের কর্ম্মতালিকায় গ্রহণ করিয়া লইয়াছেন। তাঁহারই কণ্ঠে সর্ব্বপ্রথমে অমোঘ সত্য ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল—

বিধাতার রুদ্ররোষে
দুর্ভিক্ষের দ্বারে ব'সে
ভাগ করে খেতে হ'বে
সকলের সাথে অন্নপান।
অপমানে হোতে হ'বে
তাহাদের সবার সমান।

স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা আবেদন নিবেদনের ডালি সাজাইয়া সম্ভব নহে, কেবল মাত্র আত্মশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া আপন কর্ম্মসাধনা দ্বারাই সম্ভব—একথা তিনিই সর্ব্বপ্রথম শুনাইয়াছিলেন এবং রাজনৈতিক ভারত আজও সেই আত্মশক্তি উদ্বোধনের দুরূহ ব্রতকেই সফল করিবার চেষ্টা করিতেছে মাত্র। তিনিই প্রথমে প্রচার করিলেন যে, বিদ্বেষ ও ক্ষোভের সাময়িক উত্তেজনা সৃষ্টি সহজ বটে, কিন্তু কর্ম্মের জন্য চাই অবিচলিত নিষ্ঠা ও মুক্ত প্রয়াস। কল্যাণ সাধনের পথ প্রীতির পথ,—রাগের দ্বারা নয়, অনুরাগের দ্বারাই তাহা সফল হইয়া থাকে।

প্রকৃত পক্ষে স্বদেশী যুগে রবীন্দ্রনাথ দিয়াছেন মন্ত্র, বিপিনচন্দ্র করিয়াছেন তাহার প্রচার, আর অরবিন্দ লইয়াছিলেন সেই মন্ত্রের সাধনা। রাষ্ট্রশক্তি যেদিন বাঙ্গালা দেশকে দ্বিধা-খণ্ডিত করিয়া বাঙ্গালীকে ভৌগলিক সীমারেখা দ্বারা বিচ্ছিন্ন করিতে প্রয়াসী হইয়াছিল, বাঙ্গালীর কবি সেদিন
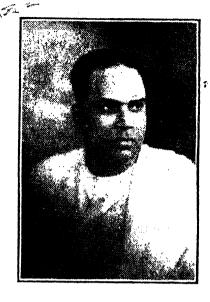
রাখীবন্ধনের দ্বারা সেই অন্যায়ের প্রতিরোধ করিতে চাহিয়াছিলেন—

বাঙ্গালীর আশা বাঙ্গালীর পণ
বাঙ্গালীর ভাষা বাঙ্গালীর মন
বাঙ্গালীর ঘরে যত ভাইবোন
এক হউক, এক হউক,
এক হউক, হে ভগবান।

নব বৎসরে তিনিই পণ করিয়াছিলেন "নব স্বদেশের দীক্ষা"। তিনিই বজ্রনির্ঘোষে ঘোষণা করিয়াছিলেন 'রাজা তুমি নহ হে মহাতাপস, তুমি হে প্রাণের প্রিয়, ভিক্ষা ভূষণ ছাড়িয়া পরিব তোমারই উত্তরীয়।' শুধু রবীন্দ্রনাথই নহেন, বাঙ্গালার কবি, নাট্যকার, লেখক ও গীতিকার সকলের মিলিত রচনার মধ্য দিয়াই বাঙ্গালার স্বদেশী আন্দোলন শক্তি সংগ্রহ করিয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলাল একদিকে যেমন "বঙ্গ আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার আমার দেশ" বলিয়া দেশমাতৃকাকে আহ্বান করিয়াছেন, তাঁহার রাণাপ্রতাপ, দুর্গাদাস, সাজাহান, মেবার পতন প্রভৃতি বহুজনপ্রিয় নাট্য-রচনাগুলির মধ্য দিয়া তেমনি উদ্দীপনার সঞ্চার করিয়াছেন। ব্রহ্মবান্ধবের 'যুগান্তর' ও 'সন্ধ্যা'র তেজোদৃপ্ত রচনা কত যুবকের ধমনীর রক্তপ্রবাহকে চঞ্চল করিয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। ফুলার সার্কুলারে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি যেদিন বেত্রাঘাতের দ্বারা দণ্ডনীয় হইয়াছিল, সেদিন কাব্য-বিশারদের গান "বেত মেরে কি মা ভুলাবে আমরা কি মার সেই ছেলে। জগৎ মাঝে তোমার কাজে যায় যাবে জীবন চলে, বন্দেমাতরম্ বলে।"—গাহিয়া বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা অন্যায় আদেশের প্রতিবাদ জানাইয়াছে। এমনি করিয়া বাঙ্গালীর কাব্য ও সাহিত্য বাঙ্গালীর রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রেরণা জোগাইয়াছে; শুধু রাজনীতির ক্ষেত্রেই নহে, সমাজ সংস্কার, পল্লী উন্নয়ন প্রভৃতি সংগঠনমূলক কর্ম্মের ক্ষেত্রেও বাঙ্গালীর সাহিত্য, বিশেষ করিয়া রবীন্দ্রনাথের রচনা বাঙ্গালীর চিন্তাধারাকে প্রভাবান্বিত করিয়াছে। আধুনিক ভারতবর্ষ বাঙ্গালাদেশকে যদি জাতীয়তাবাদের দীক্ষাগুরু বলিয়া মানে, তবে সে গৌরবে বাঙ্গালী সাহিত্যিকগণের অধিকার অকিঞ্চিৎকর নহে।

বৃহত্তর কর্ম্মের ক্ষেত্র ছাড়িয়া দিলেও দেখা যাইবে, বাঙ্গালীর দৈনন্দিন জীবনে সাহিত্য খুব সামান্য প্রভাব বিস্তার করে নাই। নবজাত শিশুর নামকরণ হইতে সুরু করিয়া মাথার তেল, গায়ের সাবান পর্য্যন্ত প্রায় সকল বিষয়েই বাঙ্গালীর সংসার এই সাহিত্য প্রভাবের পরিচয় বহন করিয়া থাকে। বাঙ্গালীর জুতার দোকানের নাম শ্রীচরণেষু, খাবারের দোকানের সাইন-বোর্ড মিষ্টিমুখ, দাঁতের মাজনের নাম রদফেন, বাঙ্গালীর থিয়েটারের নির্দেশ শ্রীরঙ্গম্। সাহিত্যের মধ্য দিয়া বাঙ্গালীর মনকে স্পর্শ করা যেমন সহজ তেমন আর কিছুতেই নহে। আধুনিক কালে যাঁহারা বাংলা সাহিত্য রচনায় ব্রতী আছেন, এই তথ্যটিকে যেন তাঁহারা স্মরণ রাখেন। কারণ, সমগ্র বাঙ্গালীজাতিকে উদ্বুদ্ধ ও কৃতিত্বে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রেরণা দান করা তাঁহাদের দায়িত্ব—সে দায়িত্ব তাঁহারা পূর্ব্বাচার্য্যগণের নিকট হইতে উত্তরাধিকাররূপে পাইয়াছেন। সেই অবশ্য পালনীয় গুরুভার দায়িত্বের প্রতি সবিনয়ে তাঁহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চাই। তাহারই জন্য সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতির মঞ্চে এই অসাহিত্যিকের অনধিকার প্রবেশ।*

* প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের (দিল্লী) একবিংশতিতম অধিবেশনের মূল সভাপতির অভিভাষণ।

সিনেমা-ফটোগ্রাফী

—শ্রীনীরোদ রায়

সিনেমা-ফটোগ্রাফীতে এমন কতকগুলি বিষয় আছে যাহা সচরাচর দর্শকের চোখে ধরা পড়ে না। যেমন,—lighting composition এবং angle। অবশ্য দর্শক এই সব দিকে মনোযোগ দিতে পারে না। কারণ তাহাকে ছবির গল্প এবং অভিনয় লইয়া ব্যস্ত থাকিতে হয়। তাহার পক্ষে পরিষ্কার ছবি হইলেই মোটামুটিভাবে গল্পটা বুঝতে পারা সহজ এবং ফটোগ্রাফী চমৎকার বলিয়া মত প্রকাশ করিবে। Lighting-এর দোষে রাত্রির দৃশ্য যদি' দিনের দৃশ্যের মত দেখায়, তবুও দোষ কাটিয়া যায় ছবির টেম্পোর দরুণ। Composition যাহাই হউক না কেন অভিনেতা আর অভিনেত্রীকে স্পষ্ট দেখিতে পাইলেই সন্তুষ্ট। সেইরূপ angle যাহাই হউক না কেন কেহই এ বিষয়ে কিছুই মতামত প্রকাশ করিতে পারে না। কিন্তু একথা খুবই সত্য যে এই সমস্ত ত্রুটী না রাখিয়া যদি নিখুঁতভাবে ছবি প্রস্তুত হয় তাহা হইলে দর্শকের মনে আরও পরিতৃপ্তি আসে এবং ছবির সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়া সফলতা লাভ করে।

সিনেমা-ফটোগ্রাফীর আর্ট ও টেকনিক অতি উচ্চস্তরের এবং ইহার প্রত্যেকটি বিষয়েই খুব ভাল ভাবে লক্ষ্য রাখিতে হয়। কারণ একটীর দোষে অপরটী নষ্ট হইয়া যাইতে পারে, ফলে সমস্ত ছবিখানাই হয়ত দর্শকের নিকট দৃষ্টিকটু লাগিতে পারে। ছবির Composition করিবার সময় যে রকম balance ইত্যাদির কথা বিবেচনা করিতে হয়, সেরকম angle ঠিক করিবার সময় ভাবিতে হইবে যে উপযুক্ত ভাবে ক্যামেরা বসানো হইয়াছে কি না। ফটোগ্রাফীর কৌশলে ছবির strength বহুগুণে বৃদ্ধি হয় এবং ক্যামেরাম্যানের বুদ্ধির কৌশলে সাধারণ ব্যাপার পর্দ্দার উপর অসাধারণ হইয়া উঠে। স্থান কাল না ভাবিয়া আপন খেয়ালমত চিত্র গ্রহণের ফলে অনেকস্থলে অর্থহীন হইয়া পড়ে।

বাঙ্গলা ছবিতে সর্ব্বপ্রথম নূতন angle লইয়া ছবি তুলিয়াছিলেন বিখ্যাত ক্যামেরাম্যান নীতিন বসু তাঁহার পরিচালিত 'ভাগ্যচক্র' চিত্রে। উপযুক্ত angle হইতে ছবিখানি গৃহীত হইয়াছিল বলিয়া সকলেরই দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল এবং তাঁহার এই নিখুঁত ফটোগ্রাফীর জন্য ছবিখানার সফলতা অনেকখানি বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তাঁহার প্রত্যেকটা angle-shot অর্থপূর্ণ ছিল।

তারপর আমরা অনেক ছবিতে দেখিয়াছি ক্যামেরাম্যান angle-shot দেখাইতে যাইয়া এক অস্বাভাবিকভাবে ক্যামেরা বসাইয়া ছবি তুলিয়াছেন—যাহা পর্দ্দার উপর বিষদৃশ লাগে। উদাহরণ স্বরূপ:—জনবহুল সহরের রাস্তার দৃশ্যে অস্বাভাবিকভাবে ক্যামেরা-angle দেখানো হইয়াছে—যাহাতে মনে হয় পথের লোকজন বাঁকা ভাবে হাটিতেছে। আর বৃহৎ অট্টালিকাসমূহ যেন পড়িয়া গিয়া চুরমার হইয়া যাইবে। তারপর আরও অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে দুইজন লোক দাঁড়াইয়া কথা-বার্ত্তা বলিতেছে—সেক্ষেত্রে angle-shot এমন ভাবে গৃহীত হইয়াছে যাহাতে মনে হয় একজনের উপর অপরজন হেলিয়া পড়িতেছে। এই প্রকার ত্রুটীর জন্য দর্শক সেই মুহূর্ত্তে অভিনয়ের দিকে নজর দিতে পারেন না—তাঁহার মনে এক প্রকার অস্বাভাবিক অস্বস্তি আসে।

এই প্রকার ত্রুটীর জন্য ক্যামেরাম্যানকে সম্পূর্ণভাবে দোষী বলা যাইতে পারে। কারণ তাঁহার shot সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান না
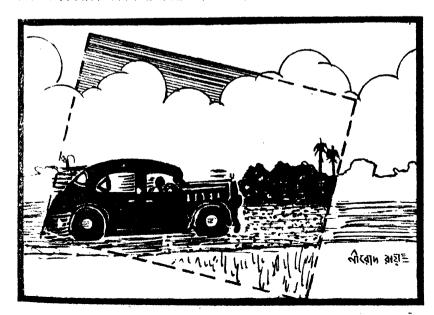
থাকা সত্ত্বেও এই প্রকার কার্য্য করিয়াছেন। নিজের প্রতিভার অভাব বলিয়া অপরকে অন্ধের মত নকল করিতে যাইয়া স্থান-কাল ভুলিয়া কতকগুলি অর্থহীন ছবি গ্রহণ করিয়া অহেতুক অর্থ ও ছবির সৌন্দর্য্য নষ্ট করেন।

দৃশ্য অনুযায়ী উপযুক্ত ভাবে angle গ্রহণ করিলে ছবির সৌন্দর্য্য অনেকাংশে বৃদ্ধি পায় একথা দর্শকের মতামত হইতেই বুঝিতে পারা যায়। দর্শক ঠিক angle সম্বন্ধে কিছু মতামত প্রকাশ করিতে না পারিলেও একথা বলিতে পারিবেন যে ছবিখানা খুব জোরের সহিত পর্দ্দায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক :—একটা মোটরগাড়ীতে নায়ক বা নায়িকা "বিশেষ জরুরী" ব্যাপারে ছুটিয়া চলিয়াছেন। সহরের পথ অতিক্রম করিয়া গ্রামের পথে ছুটিয়াছেন। এই স্থলে angle shot খুব প্রয়োজনীয়। প্রকাশিত অঙ্কিত চিত্রটী দেখিয়া তাহা অনুমান করা যায়। সোজা পথ ধরিয়া মোটরগাড়ী চলিয়া গেলে বিশেষ কিছু 'চাঞ্চল্য' 'জরুরী' 'বেগ' ইত্যাদি বুঝাইবে না। এ ক্ষেত্রে angle shot গ্রহণ করিলে সোজাপথ পর্দ্দায় উঁচু দেখাইবে যাহাতে মোটরের গতিবেগ আরও বেশী মনে হইবে।—পথের পাশে গাছগুলি হেলিয়া থাকিবে, তাহার সম্মুখের রাস্তা দিয়া মোটরটী ধুলা উড়াইয়া তীরবেগে চলিয়া যাইবে। ছবির strength আরও বৃদ্ধি করিয়া দৃশ্যটী দর্শকের সম্মুখে ধরা দিবে।

যেস্থলে এই প্রকার উত্তেজক দৃশ্য থাকে সেস্থলে angle খুব নীচু হওয়া বাঞ্ছনীয়—তাহাতে বিষয়টী আরও সুন্দর ভাবে ফুটিয়া উঠে।

ছবির composition আর একটী বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয়,—যাহার ব্যতিক্রম ঘটিলে ছবির গতিতে শিথিলতা আসে। Angle shot গ্রহণকালে composition উপযুক্ত ভাবে না হইলে angle-এর effect তত বেশী হয় না। অঙ্কিত চিত্রটীতে composition-ও দেখানো হইয়াছে। সোজাভাবে এবং সম্পূর্ণ চিত্রটির দৃশ্য গ্রহণ করিলে ছবির সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিত না এবং মোটরের গতিও বিশেষ বুঝাইত না। এককোণা হইতে এবং চিহ্নিত অংশ গ্রহণ করিলে সবদিকেই ভালভাবে প্রকাশ পাইবে এবং পর্দ্দায় দেখা যাইবে যে মোটরটী সহসা বিদ্যুৎগতিতে ধুলা উড়াইয়া চলিয়া গেল।

ঘোড়দৌড়ের দৃশ্যটীতেও সেইরূপ angle ও composition দেখানো হইয়াছে। সেই angle হইতে চিহ্নিত অংশ পর্য্যন্ত গ্রহণ করিয়া ছবি তুলিলে দেখা যাইবে দূর হইতে ঘোড়াগুলি আসিয়া পর্দ্দার উপর দিয়া যেন ছুটিয়া চলিয়া গেল—প্রতিযোগিতার উত্তেজক দৃশ্য দর্শকের মনেও উত্তেজনা জাগাইবে।

কালিদাস ও ভবভূতি

—শ্রীনারায়ণ ভঞ্জ

কালিদাস ও ভবভূতি—ভারতের এই দুই মহাকবির কাব্য-সমালোচনা বহুকাল ধরিয়াই হইয়া আসিতেছে। এ যুগের মনীষিযুগল—বঙ্কিমচন্দ্র এবং দ্বিজেন্দ্রলাল ইঁহাদের কবিত্বের যে তুলনামূলক সমালোচনা করিয়াছেন, অনেকেই তাহা পাঠ করিয়াছেন; কিন্তু প্রাচীনগণ এই বিষয় লইয়া কিরূপ আখ্যায়িকা রচনা করিতেন, তাহার একটি নিদর্শন আজি পাঠকবর্গের নিকট উপস্থিত করিব। সে কালের সেই মামুলী কাঠামো—মানুষের কার্য্য-ব্যাপারে দেবতার অধিনায়কত্ব। কালিদাস ঐতিহাসিক যুগের মানব; কিন্তু তাঁহার জীবন-বৃত্তান্তে দৈবলীলা ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত, দেবতারই মহিমা প্রকটিত। সুতরাং বিংশ শতাব্দীর পাঠক পাঠিকাদিগকে মুহূর্ত্তের জন্য প্রাচীন যুগে ফিরিয়া যাইতে হইবে।

কথিত আছে—কালিদাস নাকি মূর্খ ছিলেন। এমনই ঘোরতর মূর্খ যে, বৃক্ষে আরোহণ করিয়া যে শাখায় বসিয়া থাকিতেন, তাহারই মূলদেশ ছেদন করিতেন; কিন্তু দৈবানুকম্পায়—দেবী সরস্বতীর বরে পরিণামে তিনিই বিশ্ববরেণ্য কবি হইয়াছিলেন। তাঁহার সেই বরলাভের কাহিনী যেমন বিচিত্র, তেমনই বিস্ময়কর। সেই সর্ব্বজনবিদিত কাহিনী পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নাই। আমরা প্রস্তাবিত প্রসঙ্গেরই অবতারণা করিব। কাহিনীটি :এইরূপ :—
একদা দেবী সরস্বতী কালিদাস ও ভবভূতি উভয় কবির মধ্যে কে শ্রেষ্ঠতম, তাহার পরীক্ষা গ্রহণ মানসে ছদ্মবেশে ধরাতলে অবতীর্ণা হইলেন। হৃতসর্ব্বস্বা, দীনা, মলিনা পথিপার্শ্বে রোদনপরায়ণা, তাঁহাকে দেখিতে অল্পক্ষণ মধ্যেই বিস্তর :লোক-সমাগম হইল। কৌতূহলী হইয়া অনেকেই অনেক প্রশ্ন করিলেন। মহিলার দুঃখ বিমোচনে উৎসাহী ব্যক্তির সংখ্যাও অল্প ছিল না; কিন্তু মহিলার দাবী অতি অদ্ভুত: তিনি কাহারও নিকট অর্থ সাহায্য বা অপর কোনও উপকারের প্রত্যাশী নহেন। তাঁহার সর্ব্বস্ব চোরে অপহরণ করিয়াছে, তাহার প্রতিকার-প্রার্থিনীও তিনি নহেন। বরং দুর্ব্বৃত্তেরা সর্ব্ব আভরণ হরণ করিয়াও, তাঁহার নাসামৌক্তিক অর্থাৎ নোলকটি কেন লয় নাই, তাহাই তাঁহার দুশ্চিন্তার বিষয় হইয়াছে। তাঁহার ইচ্ছা—এই শোচনীয় ঘটনা লইয়া তিনি একটি শ্লোক রচনা করেন, কিন্তু তাহার শেষার্দ্ধ রচিত হইলেও প্রথমার্দ্ধ কিছুতেই হইয়া উঠিতেছে না, ইহাই তাঁহার দুঃখ। কেহ যেন দয়া করিয়া তাঁহার সেই শ্লোকার্দ্ধের পাদপূরণ করিয়া দেন—ইহাই তাঁহার প্রার্থনা।

প্রাচীনকালে দৈহিক সামর্থ্য এবং শিক্ষা-কৌশল সম্বন্ধে নানারূপ কঠোর পরীক্ষা গ্রহণের প্রথা ছিল,—হরধনুভঙ্গ, লক্ষ্যভেদ প্রভৃতি তাহার দৃষ্টান্তস্থল; মানসিক শক্তি বা প্রতিভা-পরীক্ষার জন্য তেমনই যে নানাবিধ সমস্যা-সমাধান এবং পাদপূরণের ব্যবস্থা ছিল, তাহারও অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। বিবাহ-বাসরে ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক নিহত ব্রাহ্মণ-তনয়ের পুনরুজ্জীবনের জন্য স্বয়ং সম্রাটের ঢোল ঘাড়ে করিয়া—"লক্ষব্যমর্থং লভতে নরাণাং" শ্লোকের পাদপূরণার্থ দেশে দেশে পরিভ্রমণ এবং রাজকুমারের "স-সে-মি-রা"—প্রলপনের কাহিনী সর্ব্বজনবিদিত। রাজ-সভায় রাজকার্য্য কিরূপে সম্পন্ন হইত, তাহার বিবরণ না থাকুক, সমস্যা পূরণের কাহিনীতে প্রাগৈতিহাসিক যুগ বিলক্ষণ সমৃদ্ধ। খুব অধিক দিনের কথা নহে—ষাট-সত্তর বৎসর পূর্ব্বেও এতদ্দেশে বিবাহ-সভায় বর-বরযাত্রীগণকে যে প্রায়ই সমস্যা-সমরের সম্মুখীন হইতে হইত, তাহার অনেক করুণ-কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায়। আদান-প্রদান এবং পান-ভোজনের দ্বন্দ্ব-কোলাহলে নহে,—কেবল সমস্যা-পূরণের কলহে যে কত বিবাহ পণ্ড হইয়া যাইত, অভুক্ত বরযাত্রীগণ শিশুপাল বরকে লইয়া রাতারাতি বাড়ী ফিরিয়া পলাইত, তাহার ইয়ত্তা নাই। ইদানীং বরের বাজার "তেজী" হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঐ সমর-প্রথারও অবসান ঘটিয়াছে। বর বা বরযাত্রীগণের এখন আর সে বিভীষিকা নাই, বরং কন্যাপক্ষীয়েরাই এখন তাঁহাদের নিকট সন্ত্রস্ত—তটস্থ। আর—

"যুধিষ্ঠিরস্য জাতা কন্যা নকুলেন বিবাহিতা।
পূজিতা সহদেবেন সা কন্যা বরদা ভব॥"

এবং—

"কেশবং পতিতং দৃষ্ট্বা দ্রোণঃ হর্ষমুপাগতাঃ।
রুদন্তি পাণ্ডবাঃ সর্ব্বে হা কেশব হা কেশব॥"

ইত্যাদি মহাস্ত্র সকলও, ইংরাজী আমলে অস্ত্র আইনে নিষিদ্ধ চোর-কুঠারীগত অসি-খড়্গাদির ন্যায় আত্মগোপন করিয়াছে।

যাহা হউক, সেই 'কালিদাসের কালে' সেই বিপুল জনতার মধ্যে কবিযশঃপ্রার্থী আদৌ ছিল না, এমত সম্ভাবনা অল্প। সুতরাং কেহ কেহ সে প্রতিযোগিতায় অগ্রসর হইয়াছিলেন নিশ্চয়ই, কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। ক্রমে দিবাবসান হইল, সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। তখনও সমস্যার কোন সমাধানই হইল না। উত্তরোত্তর জনতা বৃদ্ধি হওয়ায় একটা মহা কোলাহল পড়িয়া গেল। এমত সময়ে কালিদাস ও ভবভূতি একসঙ্গে তথায় আসিয়া উপনীত হইলেন। এইখানে বলিয়া রাখা ভাল যে, কবিযুগলের আবির্ভাব-কাল সম্বন্ধে কেহ ঐতিহাসিক প্রশ্ন উত্থাপন করিলে আমরা নিতান্ত নাচার হইব।

কালিদাস ও ভবভূতি মহিলার সকল বৃত্তান্ত অবগত হইলেন। তৎসঙ্গে শুনিলেন তাঁহার অভীপ্সিত কবিতার শেষাংশ—

"চৌরেণাপহৃতং সর্ব্বং বিনা
নাসাগ্রঃমৌক্তিকম্।"

কি জন্য চোর তাঁহার সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়াও এই নোলকটিই রাখিয়া গেল, তাহার সঙ্গত কারণ প্রদর্শন দ্বারা পূর্ব্বপদ রচনা করিতে হইবে।

শ্রুতমাত্র কালিদাস অবলীলাক্রমে শ্লোকের পাদপূরণ করিয়া মহিলাকে কহিলেন :—

"অধররাগরঞ্জনাঞ্জনাৎ গুঞ্জাফলভ্রমাৎ।
চৌরেণাপহৃতং সর্ব্বং বিনা নাসাগ্রমৌক্তিকম্॥"

অর্থাৎ—অধরের রক্তরাগ ও [নয়নের] অঞ্জনে রঞ্জিত [রক্তমধ্যস্থ কৃষ্ণবিন্দুযুক্ত] মুক্তাটি গুঞ্জফলরূপে প্রতীত হওয়ায় চোর কর্ত্তৃক সমস্ত [অলঙ্কার] অপহৃত হইয়াও ভ্রমপ্রযুক্ত নাসাগ্রমুক্তাটি [উপেক্ষায়] পরিত্যক্ত হইয়াছে।

আর ভবভূতিও প্রায় সেই সঙ্গেই বলিলেন—

"নিদ্রাবিস্রস্ত বেণী ধ্বনি-মণি-ফণীভ্রমাৎ।
চৌরেণাপহৃতং সর্ব্বং বিনা নাসাগ্রঃমৌক্তিকম্॥"

অর্থাৎ গাঢ়নিদ্রায় কবরীমুক্তবেণী (সহজেই সর্পভ্রমের কারণ স্বরূপ) নাসিকাধ্বনি এবং মণি হইতে নিশ্চিত সর্পরূপে প্রতীত হওয়ায়, চোর সমস্ত [আভরণ] অপহরণ করিয়াও ভ্রমবশতঃ ঐ নাসাগ্রমুক্তাটি ফেলিয়া পলাইয়াছে।

দুই মহাকবির দুই প্রকারের অপরূপ সমাধান শুনিয়া সেই জনসমুদ্র হর্ষোদ্বেল হইয়া উঠিল। কেহ কহিল—"ধন্য কালিদাস"; কেহ কহিল—"ধন্য ভবভূতি"।

অকস্মাৎ দেখা গেল মহিলা অন্তর্ধান করিয়াছেন; তৎপরিবর্ত্তে শূণ্যমার্গে দেবী সরস্বতী আবির্ভূতা। তিনি স্মিতহাস্যে প্রশংসমান চক্ষে কবিযুগলকে নিরীক্ষণ করিয়া বরদহস্ত উত্তোলন করিয়া যেন সর্ব্ব-মানবের সেই চিরন্তন প্রশ্নের মীমাংসাচ্ছলেই বলিতেছেন :—

"কালিদাসঃ কবিশ্রেষ্ঠঃ ভবভূতির্মহাকবিঃ।"

খর্ব্বাকৃতি দেহ

(ব্যায়াম)

—শ্রীউমেশ মল্লিক

সেণ্ট কলাম্বাস কলেজের কোল ঘেঁসে যে পথটি রাঁচি রোডের দিকে এঁকে বেঁকে চলে গেছে সেখানকার সুসজ্জিত বাংলোটি ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের। কংগ্রেসের অসহোযোগ আন্দোলনে নয়, হিন্দু মুসলমানের সাম্প্রদায়িকতাপূর্ণ দাঙ্গায় নয়, খর্ব্বাকৃতি কন্যাত্রয়ের বিবাহের জন্য হাকিম সাহেবের চিন্তার আর অবধি নেই। রেবা, শুভ্রা, মায়া হাকিম সাহেবের এই তিনটী কন্যা। বলা বাহুল্য তিনটি কন্যাই অত্যন্ত খর্ব্বাকৃতি। বহু চেষ্টায় পাত্রের সন্ধান পাওয়া যায়, কিন্তু প্রত্যেকের মুখেই এক কথা—"মেয়েটি বড্ড বেঁটে"। শেষকালে স্থানীয় কোর্টের উকিল শৈবালবাবুও যখন ঐ একই কথার পুনরুল্লেখ করলেন তখন জেলার দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা হাকিম সাহেব রীতিমত বিচলিত হয়ে পড়লেন।

ঘরে প্রবেশ করলেন হাকিম-গৃহিনী শ্রীমতী সুলেখা বোস। সদাহাস্যময়ী। হাতে রবীন্দ্রনাথের 'গীত বিতান'। স্বামীর মুখে শৈবাল বাবুর কথা শুনে তাঁর মুখ বিমর্ষ হয়ে উঠলো। উভয়ের মধ্যেই কোন প্রকার কথাবার্ত্তা নেই। ঘরে বিরাজ করছে প্রশান্ত নিস্তব্ধতা। কেবল ভেসে আসছে বাতাসের তরঙ্গে কাঁপতে কাঁপতে কন্যা ত্রয়ের অস্বাভাবিক হাসির রোল। প্রথমে সুলেখা দেবীই কথা বল্লেন, "এর কি কোন প্রতিকার নেই? ভগবানের সৃষ্ট জীব সকলেই, কিন্তু কেন এত আকৃতিগত তারতম্য? এর কারণই বা কি আর এর প্রতিকারই কি?"

নির্ব্বাপিত হাভানা চুরুটে অগ্নি সংযোগ করে হাকিম সাহেব এক সুদীর্ঘ টান দিলেন। একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বল্লেন, "এ সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা নেই। তবে সে দিন একটা প্রবন্ধ পড়ছিলাম খর্ব্বাকৃতি-দেহ হওয়ার কারণ বহুবিধ। তার মধ্যে এইগুলিই প্রধান: (ক) পিতা মাতার গঠন আকৃতি। এই যে "রেবারা বেঁটে" সেটা তোমার আমার জন্যই "নু"। আমাদের উভয়ের আকৃতিই এক রকম। আমাদের মধ্যে যদি তুমি বা আমি দীর্ঘাকৃতি হতাম তা হলে দেখতে রেবাদের মধ্যে সবাই এ রকমের হত না। কেউ হত খর্ব্ব আবার কেউ বা দীর্ঘাকৃতি। সুতরাং রেবাদের জন্যে আমরাই অনেকটা দায়ী। হাকিম সাহেব একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন। তারপর আবার বলতে থাকেন। (খ) প্রাকৃতিক আবহাওয়াকেও অনেকাংশে দীর্ঘাকৃতি বা খর্ব্বাকৃতির জন্য দায়ী করা যেতে পারে। এই দেখ আমাদের বুদ্ধিরাম নেপালী দরোয়ান আর গফুর খাঁ খানসামা। দেখ এরা দু'জনেই ভারতবাসী। একজন থাকে ফ্রন্টিয়ারে আর একজন হিমালয়ের নীচে। একজন ৬ ফুটের উপর "লম্বা", আর একজন সেই অনুপাতে কত বেঁটে। (গ) এ ছাড়া আমাদের দেহের কতকগুলো gland-এর সিক্রিশনের বৈকল্যও এর কারণ। যেমন "পিটুটারী" গ্ল্যাণ্ড। এই বিশেষ গ্ল্যাণ্ডের কার্য্যাবলী এতই জটিল এবং দীর্ঘতালাভের সহায়তা করবার ক্ষমতা এতই জটিলতর যে সে বিষয়ে অনেক কথা বলতে হয়। (ঘ) কতকগুলি খাদ্য এমন আছে যা খেলে নাকি দীর্ঘতালাভ করা যায়। অবশ্য পাশ্চাত্য ব্যায়াম-বিশেষজ্ঞদের এই মত। তারা যে সমস্ত খাদ্যদ্রব্যের তালিকা দিয়েছেন তা আমাদের লোকেদের systemএ কতখানি কার্য্যকরী তা বলতে পারা যায় না। সুতরাং সে বিষয় উত্থাপন না করাই ভাল।

(ঙ) রোগ ভোগ, শৈশবে ভুল ও ভ্রান্তি-পূর্ণ ব্যায়ামও অনেকের খর্ব্বাকৃতি হওয়ার কারণ বলা যেতে পারে।

আমাদের দেহে মেরুদণ্ডে ৩৩টি হাড় আছে, মাথার কাছ থেকে বুক পর্য্যন্ত ৭টি, পরে বুকে ১২টি, পরে ৫টি এবং মেরুদণ্ডের সর্ব্বশেষে ৫ এবং ৪টি, সুতরাং এই ৩৩টি হাড় ছোট বেলায় থাকে, পরিণত বয়সে এগুলি ২৬টিতে দাঁড়ায়। কারণ কতকগুলি হাড় শেষে একত্রীভূত হয়ে যায়। তবে সাধারণতঃ মেরুদণ্ডের শেষ সীমায় অবস্থিত হাড়গুলিই একত্রীভূত হয়! হাড়গুলির মধ্যে "কার্টিলেজেস" থাকে। সেগুলি "নরম"। রোগ ভোগজনিত বা ভ্রান্তিপূর্ণ ব্যায়ামের জন্য cartileges গুলি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, ফলে কাজ করবার ক্ষমতা হ্রাস পায়। এই কার্টিলেজগুলি ২টি হাড়ের মধ্যে একটা করে থাকে। শৈশব অবস্থায় কার্টিলেজের ক্ষয়জনিত মানুষের উচ্চতা কমে যায়। তবে কার্টিলেজগুলো যদি ক্ষয় প্রাপ্ত না হয়ে থাকে তবে ব্যায়ামের দ্বারা উচ্চতা লাভ হয়ে থাকে। এই সম্বন্ধে অনেক বলবার আছে। তবে মোটামুটি এই হল কারণ।

প্রতিকারের দিক দিয়ে অনেকে অনেক রকম বলেন। বাজারে কতকগুলি ঔষধ পাওয়া যায়। সেগুলিতে বিশেষ কাজ হয় বলে মনে হয় না। তবে সেই প্রবন্ধটীতে যৌগিক ব্যায়ামের কথা আছে। তাতে যে সকলেরই ফল হবে বলে আমার বিশ্বাস হয় না। প্রবন্ধ-লেখক ব্যায়ামবীর, স্বয়ং গঠনাকৃতি না দেখে কোন কিছু বলতে চান না। সেই তো বিপদ। সাধারণ ভাবে তিনি "হলাসন" "বৃক্ষাসন" "ভুজঙ্গাসন" প্রভৃতি আসন-পদ্ধতি অনুসরণ করতে বলেছেন। রেক্টাস এবডোমিনিস বলে যে "মাসল"টি উদরে আছে সেটির "সঙ্কোচন" ও "প্রসারণের" ফলে বিশেষ কাজ হয়। অবশ্য এটাও যৌগিক প্রক্রিয়ার অন্যতম নির্দ্দেশ।

অনেকে Roman Rings (সার্কাসে যে খেলা দেখান হয়) ব্যায়ামের অনুশীলন করলে দীর্ঘাকৃতি হওয়া যায় বলে থাকেন। ওটা সম্পূর্ণ বাজে। কারণ দেখা যায় যারা সার্কাসে ঐ প্রকার খেলা দেখান তারা প্রায়ই খর্ব্বাকৃতি। যদি তাই হত তা হ'লে সার্কাসের খেলোয়াড়গণ খর্ব্বাকৃতি হতেন না।"

এই বলে হাকিম সাহেব আবার নির্ব্বাপিত চুরুটে অগ্নিসংযোগ করলেন। বিদায়কালীন সূর্য্যের রক্তিম আভায় তখন পশ্চিম দিগন্ত লোহিত রাগে রঞ্জিত হয়ে উঠেছে।

বিজনদা'র চিঠি

আমার আদুরে ভাই-বোনেরা—

এবারে তোমাদের বিশেষ দোল-সংখ্যার জন্যে আমাকে একটা গল্প তোমাদের উপহার দেবার আদেশ হয়েছে তোমাদেরই কাছ থেকে। সে আদেশ পালন করা আমার কর্তব্য, তাই বহু কষ্ট স্বীকার করেই তা পালন করতে চেষ্টা করেছি। তবে তোমাদের খুসী করতে পেরেছি কিনা তা' আমি জানি না, সেটা তোমরাই জানো।

এর শেষ কোথায়: ভালো লেখা পাইনি এখনও। তাড়াতাড়ি পাঠিও, যাতে আসছে সংখ্যায় যেতে পারে। এখনও তিনটে পরিচ্ছেদ বাকী আছে।......

আজ স্নেহ জানিয়ে বিদায় নিই এখানে। কেমন?

তোমাদের: **বিজনদা**

দোলের দিনে

— শ্রীবিজনকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

: এই বীরু, গায়ে রং দিস্‌নি আজ! সত্যি বলছি আমার জ্বর হয়েছে। বিশ্বাস হলো না কথাটা? দেখ্‌না আমার গায়ে হাত দিয়ে, উঃ! জ্বরে আমার গা পুড়ে যাচ্ছে বলে মনে হবে।...হ্যাঁ, রে, সত্যিই মা আর ডাক্তারবাবু বারণ করেছেন রং খেলতে আজ।...রোগশয্যায় শুয়ে শুয়ে বিশু ওমনি প্রলাপ বোকে চলে ভীষণ জ্বরের ঘোরে, আর তার মাথার ওপর জল-পটী দিতে দিতে তার বিধবা মায়ের চোখের পাতার কুল ছাপিয়ে অশ্রুধারা নেমে আসে। তিনি মনে ভাবতে থাকেন নিজের ভাগ্যের কথা...মাত্র দু'বছরের একটী শিশু রেখে তাঁর স্বামী পরলোক গমন করলেন। সংসারে তাঁর আপনার বলতে রইলো ঐ একরত্তি শিশু। দিনের পর দিন কত আশা নিয়ে কত কষ্ট করে ওকে এই তেরো বছর ধরে লেখা পড়া শিখিয়ে মানুষ করে তুলেছেন।' ঐ বিশু বড় হলে তাঁর এত কষ্ট করা হবে সার্থক।...কিন্তু ভগবান বিরূপ। আজ ভগবানের ওপরও বোধ হয় উনি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলবেন। আর তা ছাড়া উপায়ই বা কি? গত একমাস কাল ধরে বিশু রোগশয্যা নিয়েছে। কিছুতেই সে রোগ-মুক্ত হতে পারছে না। প্রত্যেক বছরে এই দোলের দিনে ও কি হৈ-চৈ করেই না বেড়ায়! পাড়ার যত ছেলে মেয়ে আছে সব আজকের দিনে এই বাড়ীতে এসে রং আর আবীর নিয়ে কি মাতামাতিই না করতো! কিন্তু আজ?......আর তিনি ভাবতে পারেন না।

: মা কি ঘরে আছেন?

—হাঁ, আয় বাবা। বলে বিশুর মা মায়া দেবী তাকে আহ্বান করলেন। তাঁর আহ্বানে যে ছেলেটা ঘরে ঢুকে প্রশ্ন করলো—বিশু এখন কেমন আছে মা? সে হোল বিশুর সব চেয়ে প্রিয়তম বন্ধু শেখর। পিতৃমাতৃহীন ছেলেটা মামার কাছে থেকে মানুষ হচ্ছে। এই বিশু আর শেখরের মধ্যে বন্ধুত্বটা এত বেশী যে মাঝে মাঝে ভুল করতে হয় ওরা একই মায়ের পেটের সহোদর ভাই বলে। মায়াদেবীর কাছে শেখর আর বিশুর মধ্যে স্নেহের পার্থক্য নেই কোথাও। তাঁকে কেউ শেখরের সঙ্গে তাঁর কি পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে তিনি হেসে বলেন: "ওমা, তা জানো না বুঝি? ও যে আমার বাবা হয়!" মায়া দেবীর কথা শুনে সে সবিনয়ে প্রশ্ন করে: সে কি কথা?

তিনি তেমনি হাসিমুখে উত্তর দেন: স্নেহের আইনে মায়ের কাছে ছেলে তো বাবা বলেই পরিচিত হয়। সবাই তাঁর কথা শুনে হেসে ওঠে। শেখরের প্রতি তাঁর স্নেহের আধিক্যটা সকলে বুঝে আর দ্বিতীয় প্রশ্ন করে না ওর সম্বন্ধে। শেখরের আর পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক মনে করি।...

শেখর মায়াদেবীর পাশে এসে বসে নিজের হাতে বিশুর মাথাটা স্পর্শ করে দেখে বল্লে: ডাক্তারবাবু তো বল্লেন যে আজ জ্বর বোধ হয় ছাড়তে পারে, কিন্তু তার তো কোন লক্ষণই দেখছি না। রোজকার মত আজও তো তেমনি গায়ের উত্তাপ রয়েছে।

: কি জানি বাবা! সবই ভগবানের উপর আমি ছেড়ে দিয়েছি।···ডাক্তারের আশা ভরসা আমি আর করি না।···বলে মায়াদেবী ভগবানের উদ্দেশ্যে একবার প্রণাম করে তারপর একটু থেমে বল্লেন—এই তো একটু আগে তোকে বিশু খুঁজছিল। জ্বরের ঘোরে ও কত ভুল বকতে আরম্ভ করেছিল। কাল সেই যে ওকে দোলের সম্বন্ধে বলে ছিলুম সেই কথাটা দেখছি ঠিক ওর মনে আছে।···কিন্তু বাবা শেখর, তুই বাড়ী যা এখন। তোর জন্যে সবাই অপেক্ষা করছে নিশ্চয়ই দোল খেলার জন্যে।

: কেউ অপেক্ষা করবে না মা; সবাইকে আমি বলে দিয়েছি যে এ উৎসবে এবারে আমি যোগ দিতে পারবো না, তারা যেন আমায় ক্ষমা করে। মায়াদেবী শেখরের বন্ধু-প্রীতি দেখে অবাক হয়ে গেলেন। তার নিজের চোখ অশ্রুতে ঝাপ্‌সা হয়ে উঠলো। কোনমতে নিজেকে সামলে নিয়ে শেখরকে নিজের বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে স্নেহ-চুম্বন এঁকে দিলেন তার গালে। শেখর কিন্তু বিস্মিত হয়ে উঠলো এমনি স্নেহ দেখে। এতো স্নেহ তো সংসারে কারুর কাছ থাকে আগে সে কোনদিন পায় নি। কি জানি হঠাৎ সে কি ভেবে লজ্জায় লাল হয়ে উঠে বল্লে: কি যে কর মা, যদি কেউ ঘরে এসে পড়ে তো কি বলবে বলো দেখি?

মায়া দেবী শেখরের কথা শুনে আবার একটী স্নেহ-চুম্বন তার গালে এঁকে দিয়ে হেসে বল্লেন: লোকে বলবে যে কলিকালে দেখছি সব উল্টো, বুড়ো মেয়ে তার বাবাকে কোলে বসিয়ে আদর করছে। এই তো? : না, সে আমার বড় লজ্জা করে···শেখরের কথা শেষ হলো না, এমন সময় বাইরে থেকে ডাক এলো: কোথায় রে শেখর?

শেখর তাড়াতাড়ি মায়া দেবীর কোল থেকে নেমে পড়ে নিজেকে সামলে নিয়ে জবাব দিলে: এই যে ডাক্তারবাবু, আসুন, এই ঘরেতেই আছি।···বীরেশ্বর এই গ্রামেরই ছেলে, তাই পাড়ার বয়স্থা মহিলাদের আর তাকে দেখে ঘোমটায় মুখ ঢেকে কথা বলতে হয় না। বীরেশ্বরেরও সুবিধে আছে—গ্রাম সম্পর্কে সকলেরই সঙ্গে একটা না একটা সম্বন্ধ আছেই। তাই বীরেশ্বর সোজাসুজি বল্লে: বৌদি, বিশুর সম্বন্ধে পাশের গ্রামের ভবেশ ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করলাম। তিনি বল্লেন, ভয়ের কোন কারণ নেই ওর সম্বন্ধে। তবে ওর দেহে রক্তশূন্যতার ভাব দেখা দিয়েছে, তাই ওর দেহে কারুর দেহ থেকে রক্ত দেওয়ার প্রয়োজন মনে করি।··· বীরেশ্বরের কথা আর শেষ করতে না দিয়ে শেখর বলে উঠলো: আপনি এখুনি তা দেবার ব্যবস্থা করুন। ভায়ের জন্যে রক্ত আমিই দেবো আমার দেহ থেকে।

শেখরের কথা শুনে মায়াদেবীর বিস্ময়ে বাক্ রোধ হয়ে গেল। তিনি শেখরকে নিজের বুকের মধ্যে টেনে এনে জড়িয়ে ধরলেন সস্নেহে, ঠোঁটের পাতা দুটোই তাঁর নড়তে দেখা গেল কিন্তু মুখ দিয়ে কোন শব্দ বার হ'লো না। তাঁর চোখের দু'ধার বেয়ে নেমে এলো আনন্দাশ্রু। কিছুক্ষণ কারুর মুখ থেকেই কোন কথা বেরুল না। শেষে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করলেন মায়াদেবী শেখরকে এই বলে যে, সে কেমন করে হয় বাবা, আমি তোদের মা বেঁচে থাকতে তোর গায়ের থেকে রক্ত দিতে আমি কিছুতেই দেবো না।

: বুঝেছি, কেন তুমি তা আমায় দিতে দেবে না।

: কি বুঝেছিস্?

: বুঝেছি, যে তুমি আমার সত্যিকারের মা নও, তাই তুমি দিতে চাও না আমার রক্ত ওর দেহেতে।

: শেখর, কি বলছিস্ তুই? দুঃখে অপমানে ওর মুখটা মায়াদেবী নিজের হাতে চেপে ধরলেন।

: যা সত্যি তাই বলছি, এতে আঘাত বা লজ্জা পাবার তোমার কি আছে?

: বেশ তুই-ই রক্ত দে। তুই যে আমায় এমনি ভুল বুঝবি তা আমি কোন দিন ভাবিনি। নিশ্চয়ই, তোর ভাই হয় বিশু, তোর অধিকারই ওর ওপর সব্ চেয়ে বেশী কথা ক'টা বলে মায়াদেবী যেন হাঁফিয়ে উঠে মাথা নীচু করলেন।

মাগো, আমায় ক্ষমা করো। আমি তোমায় আঘাত ইচ্ছে করে দিইনি কেবল তোমার দেওয়া অনুমতিটা আদায় করবার জন্যেই আমি ঐ কথা বলতে বাধ্য হয়েছিলুম! তা না হ'লে তুমি যে কিছুতেই মত দেবে না তা আমি জানতুম। তোমার অনুমতি নেবার অনেক আগেই আমি আমার রক্ত ডাক্তারবাবুকে দিয়ে এসেছিলুম পরীক্ষার জন্যে। আমায় ক্ষমা করো মা! বলে শেখর মায়াদেবীর পা দুটো জড়িয়ে ধরে ক্ষমা ভিক্ষা করতে লাগলো।

মায়াদেবী আবার শেখরকে সস্নেহে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে এক স্নেহচুম্বন তার গালে বসিয়ে দিয়ে বল্লেন: আজ দোলের দিন, সবাই গায়ে রং দিয়ে আনন্দ করে আর তুই নিজের দেহ থেকে রক্ত দিয়ে আনন্দ করবি? সে কেমন করে হয়?

—সত্যিকারের আনন্দ তো আজ আমারই। ভায়ের গায়ে এমন রং দিয়ে আজ আনন্দ করবো তা কোনদিন ধুলেও উঠে যাবে না! তার দেহে থাকবে যুগ যুগ ধরে এই সত্যিকারের রং। মায়াদেবী শেখরের মুখখানাকে নিজের বুকের মধ্যে চেপে ধরে আর কথা বলতে দিলেন না! তাঁর দু' চোখের বাঁধ ভেঙ্গে তখন জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো।
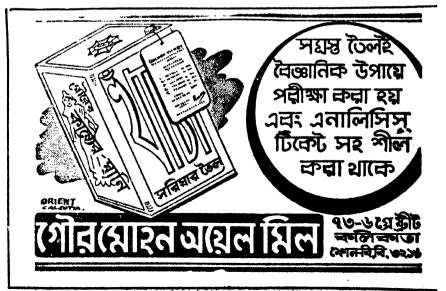
তোমাদের বিভাগ

"আমার গ্রাম"

—শ্রীনৃপেন সেনগুপ্ত (৩৮৯)

উঃ! একসংগে দশ হাজার টাকা পাইয়ে দিয়ে মাথাটা আমার ঘুরিয়ে দিলে বিজন দা! হ্যাঁ, টাকাতো পেলাম—এখন খরচ করবো কি করে! উহুঁ—এ-টাকা কিছুতেই আমি গ্রাম ছাড়া আর কিছুতেই খরচ করতে পারি না; আমায় এতে তুমি স্বার্থপর, আর যা খুশী বলো না কেন, টাকাটা আমি আমার গ্রামে রাখবোই।

আমার গ্রামের লোক অশিক্ষিত—জ্ঞানের সূক্ষ্ম আলোটুকুও তাদের ভেতর প্রবেশ করবার পথ পায়নি, যার ফলে শিক্ষিত-সমাজের কাছ থেকে তারা অনেক দূরে সরে আছে। তারা যাতে শিক্ষা পায়—অজ্ঞতার আঁধার-গুহা থেকে জ্ঞানের উজ্জল প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করতে পারে তার ব্যবস্থাই আমি করব এ-টাকা দিয়ে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস একবার যদি তাদের ভেতর শিক্ষার ছোঁয়াচ লাগিয়ে দিতে পারি তবে আপনা থেকেই তাদের চোখ খুলে যাবে। তখন তারা বুঝতে পারবে কেন তারা এসেছে এ পৃথিবীতে—বুঝতে পারবে তাদের জীবনের মূল্য—বুঝতে পারবে তাদের মংগলামংগল—ভালো-মন্দ। জগতের শিক্ষিত সমাজের পাশে বসার আসন তখন তারা নিজে বেছে নিতে পারবে।......

তারা মুখ্যু—স্বাস্থ্য-রক্ষার নিয়ম কানুন জানে না; তাই রোগ-শোক তাদের ভেতর বাসা বেঁধেই আছে—সংক্রামক ব্যাধি দাবানলের মতো হু হু করে তাদের ভেতর ছড়িয়ে পড়ে জীবনের মাঝখানে মরণের যবনিকা টেনে দেয়। শিক্ষা তাদের নেই, তাই তারা দেশ, জাতি ইত্যাদির অর্থ বুঝতে পারে না। অজ্ঞতা তাদের শুধু সহ্যের ক্ষমতাই দিয়েছে, প্রতিবাদ বা দাবী জানাবার সাহস দেয় নি—তাই দুঃখ কষ্টকে তারা "ভাগ্যের লেখা" বলে মেনে নেয়।

একমাত্র শিক্ষাই পারবে তাদের চোখের সম্মুখ থেকে অজ্ঞতার কালো পর্দাটিকে সরিয়ে নিয়ে দৃষ্টির সম্পূর্ণ পথ আলোকিত করে দিতে।...তাই লটারীতে পাওয়া এই দশ হাজার টাকা আমি ব্যয় করবো আমার গ্রামের অধিবাসীদের শিক্ষার জন্যে শিক্ষা কেন্দ্র খুলতে। শুধু মাত্র একটি অজ্ঞ গ্রামবাসীও যদি আমার এই অর্থের বিনিময়ে জ্ঞানের আলোক পায়, তাহলেই মনে করবো আমার টাকা খরচ করা সার্থক হলো। *

* ২৬ নং প্রতিযোগিতায় ১ম পুরস্কার প্রাপ্ত রচনা।

একটু খানি হাসো

—কুমারী ঝরণা দেবী (২৬৮)

১ম ব্যক্তি—তুমি যেদিন জন্মাও সেদিন কোন তারিখ ছিল?

২য় ব্যক্তি—আমি যে ঘরে ভূমিষ্ট হয়েছিলাম সে ঘরে ক্যালেণ্ডার ছিল না।

* * *

ক্রেতা—ভালো টাটকা মাংস ও রুটি আছে? দাও দেখি।

বিক্রেতা—আছে, আপনার বরাত ভালো, টাটকা যা কিছু সব এখন তৈরী হচ্ছে।

ক্রেতা—তবে এত জন কি খেয়ে গেল, তারা কি বাসি খেয়ে গেল?

বিক্রেতা—নিশ্চয়ই, এখন এগুলো তৈরী আমাদের জন্যে, আমরা জেনে শুনে আর বাসি খাই কি করে বলুন?

জানো কি?

(সংগৃহীত)

—শ্রীরেণুকা দাস: (৫৪৯)
শ্রীনিবাসদিয়া (পাবনা)

১। কোন্ ইংরেজ মহিলা মহাত্মা গান্ধীর জীবনী পাঠ করে তাঁর শিষ্যা হয়েছিলেন?—"কুমারী ম্যাডোলীন শ্লেড্"।

২। কোন্ ভারতীয় মহিলা টেনিস খেলায় বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন?—"কুমারী লীলা রাও"।

৩। কোন অন্ধ মূক ও বধির মহিলা জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন?—"হেলেন কেলার"।

৪। কোন্ রমণীর প্রবর্তিত অভিনব শিশুশিক্ষা-পদ্ধতি জগতের সর্বত্র সমাদৃত?—"ডাঃ মারিয়া মন্তেসরীর"।

৫। কোন্ মহিলা হিমালয় বিজয় অভিযানে যোগ দেন?—"মিসেস বুলক" (১৯০৩ খৃঃ)

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব ও দোল পূর্ণিমা

—ডাঃ শ্রীরসিকমোহন বিদ্যাভূষণ

শতাব্দীব বৈষ্ণবাচার্য্য
ডাঃ শ্রীমদ্ রসিক ভূষণ বিদ্যাভূষণ

শ্রীকৃষ্ণের দোল-লীলা এবং তাঁহারই কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে আবির্ভাব একই দিবসে সংঘটিত হয়। ঐরূপ হওয়ার কোন সূক্ষ্ম হেতু আছে কি না এ সম্বন্ধে কেহ কেহ জানিতে ইচ্ছা করেন। ভগবৎকার্য্য সম্বন্ধে হেতুপ্রদর্শন করা মানবীয় জ্ঞানের পক্ষে সময়ে সময়ে ধৃষ্টতা বলিয়া মনে হয়। শ্রীভগবান অনন্ত জ্ঞানের আধার। মানুষের জ্ঞান বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় একটি পরমাণু যত ক্ষুদ্র তাহা অপেক্ষাও ক্ষুদ্র বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই অবস্থায় ভগবৎ কার্য্যের কারণ নির্দ্দেশে প্রবৃত্ত হওয়া অর্ব্বাচীনের উপহাসজনক কার্য্য ভিন্ন আর কিছু নহে। তবে তাঁহার কোন কোন কার্য্য এত স্পষ্ট এবং আমাদের হিতকর যে তাহা না বলাই অন্যায়, অসঙ্গত এবং অকৃতজ্ঞতার পরিচায়ক। যদি একথা বলা যায় যে তিনি সর্ব্বমঙ্গলময় তাহা হইলে ইহা সকলেরই স্বীকার্য্য যে তাঁহার সকল কার্য্যই মঙ্গলময়। আমরা আমাদের ক্ষুদ্র দৃষ্টিতে তাঁহার কৈফিয়ৎ অমঙ্গলজনক বলিয়া মনে করিলেও উহা অবশ্যই মঙ্গলজনক।

তাঁহার লীলার হেতু সম্বন্ধে শ্রীভগবৎ গীতায় তিনি যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই সুবিদিত। কিন্তু উহাতে এ প্রশ্নের সদুত্তর মিলে না। এ বিষয়ের আলোচনা করিতে হইলে এই লীলা-ব্যাপার বিশ্লেষণ করিয়া তদ্‌বিচারে প্রবৃত্ত হইতে হয়। বিচার বিশ্লেষণসাপেক্ষ। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি এইরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া অর্ব্বাচীনের উপহাসজনক কার্য্য ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু কৌতূহলের বিচার নাই। এ সম্বন্ধে যদি কোন একটা অভিমত প্রকাশ করিলে, সঙ্গতভাবেই হউক আর অসঙ্গত ভাবেই হউক, কাহারও কৌতূহল নিবৃত্তি হয়, তাহা হইলেই উত্তরদাতার কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে।

দোলন কার্য্যে আমরা সাধারণতঃ মানবীয় জ্ঞানে বিভিন্ন আরাম বোধের ভাব দেখিতে পাই। ভারতবর্ষের পশ্চিম অঞ্চলে গুজরাট প্রভৃতি স্থানে ধনী এবং দরিদ্রের গৃহেও দোলনের দোলনা-সরঞ্জাম দেখিতে পাই। সকলেই নিজ নিজ গৃহে ইহার ব্যবস্থা রাখেন, উদ্দেশ্য কিঞ্চিৎ আরাম লাভ। আমি ইহাকে কিঞ্চিৎ মনে করিলেও, যাঁহারা ইহাতে আরাম অনুভব করেন তাঁহারা ইহা "কিঞ্চিৎ" মনে করেন না। তাঁহাদের অনেকের পক্ষেই ইহাতে মাদকতা ভাব দেখিতে পাওয়া যায়—যেন এই আরাম না করিলেই নয়—ইহাতে ইহারা একটু "ফুর্ত্তি পাইয়া থাকেন। ইহা দেখিয়া মনে হয়। এই দোলন ব্যাপারটি অত্যন্ত আনন্দজনক। যাঁহারা দার্জ্জিলিং গিয়াছেন তাঁহারা সেখানকার সর্ব্বসাধারণের উপভোগ্য দোলনাখেলার উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা দেখিয়া থাকিবেন। ভুটিয়া রমণীগণ ইহাতে নিরতিশয় আমোদ ও আনন্দ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সে এক বিশাল ব্যাপার।
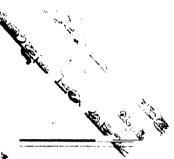
এই দোলন-খেলা অত্যন্ত প্রাচীন। পাশ্চাত্য পরিব্রাজকগণের গ্রন্থে অসভ্য নরনারীগণের মধ্যে এই দোলন ক্রীড়ার বহুল প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। সুদূর অতীতকাল হইতেই এই দোলন-ক্রীড়ার প্রথা যে ভারতবর্ষে চলিয়া আসিতেছে তাহা অতি নিশ্চয়! বেদান্ত সূত্রে লিখিত আছে "লোকবত্তুলীলা কৈবল্যং", শ্রীভগবানের লীলাখেলা অনেকাংশেই নরলোকের কার্য্যাদির ন্যায়। নরলোকে যখন এই ক্রীড়াটি জনসাধারণের মধ্যেও অতীব মনোমদ প্রীতিপ্রদ এবং আনন্দজনক, শ্রীকৃষ্ণলীলাতেও আমরা ইহাতে এই আমোদ-আনন্দের কথা মনে করিয়া বলিতে পারি যে, এই লীলাটি নিরতিশয় আনন্দ ও আমোদ ও আহ্লাদদায়িনী। ইহার মূলে, মানবীয় জীবপ্রকৃতির অন্তঃস্থলের গতি। দেহধারণার্থেও এই ক্রিয়ার প্রয়োজন আছে। অজ্ঞান শিশু আপনাআপনি দোলে, ইহা দেহ প্রকৃতিরই প্রেরণা। ইহার মূলে আছে জাগতিক ব্যাপার-সাধনে গতিতত্ত্বের Motion। ইহা এক মহাবৈজ্ঞানিক ক্রিয়ার ব্যাপার। এস্থানে উহার ইঙ্গিতমাত্র উল্লেখ করা হইল।

এই লীলা মহানন্দময়ী। কিন্তু এই দিনে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামে মহাসন্ন্যাস লীলা প্রদর্শনমূলক আবির্ভাবের দিন করিয়া লইলেন কেন? এ যে এক মহা বৈপরীত্যময় ব্যাপার! কোথায় ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলনকোমল মলয়সমীরময় শ্রীবৃন্দাবনের বসন্ত কুঞ্জে মহা-প্রেমরসময়ী গোপীগণের সহিত দোল লীলায় মহোল্লাস, আর কোথায় বা এই সর্ব্বত্যাগের অতিকঠোর মহাবৈরাগ্যময়ী সন্ন্যাসলীলার প্রদর্শক নিদারুণ ব্যাপার!—একই দিনে অমৃত ও সিদ্ধযোগ উপস্থিত হইলে উহা বিষদোষজনক দিবস বলিয়া খ্যাত হয়। এই মহা আনন্দের দিনে প্রেমানন্দরসময় উৎকট কঠোর সন্ন্যাসীর আবির্ভাব কেন?

বারান্তরে এই কেন প্রশ্নের উত্তর আমরা আমাদের ক্ষুদ্রতম জ্ঞানের আলোক-বিন্দুতে দর্শন করিতে প্রয়াস পাইব।

চিত্রবাণী লিমিটেডের পরিবেশণায় মুক্তি-প্রতীক্ষায় !

৮৯-বি ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

'গ্রাম : প্রযোজক

কমলরায় পিকচার্সের

ঐতিহাসিক চিত্র......সর্ব্বজনপূজ্য

শাহানশা আকবর

শ্রেষ্ঠাংশে :

কুমার, বনমালা, হাসনা বানু, আজুরী,
কে, এন, সিংহ, প্রভৃতি।

সঙ্গীত পরিচালক :

ঝাণ্ডে খাঁ

কাহিনী :

দেওয়ান শরার্

নৃত্যে, গীতে ও ভাবোচ্ছাসে অপূর্ব্ব
ইষ্টার্ণ পিকচার্সের
নবতম অর্ঘ্য

বাদল

শ্রেষ্ঠাংশে { জহুর রাজা,
রাধারাণী,
ঊর্ম্মিলা প্রভৃতি।

নেপচুন পিকচার্সের
রোমাঞ্চকর চিত্র-কথা

জিগোমার

শ্রেষ্ঠাংশে { নবীনচন্দ্র
লীলা পাওয়ার

থাক্ আজ দোল্ খেলা

—শ্রীনিকুঞ্জ পত্রী

জীবনের মহোৎসবে মৃত্যু-রাঙা আবীরের
চলে আজ মহা জয়োল্লাস—
রবিরা সৃষ্টির বুকে দুরন্ত কৃষ্টির নৃত্য
জাগাইছে বিক্ষুব্ধ সন্ত্রাস।

নাই বন্ধু, কোন শান্তি নাই—
দিনান্তের শ্রান্ত-প্রাণে আনন্দের মত্ত-সুধা
বহি আনে ব্যর্থ বেদনাই।

রঙের মাতন-মুগ্ধ বিশ্বাসীর প্রাণ-ভাণ্ডে
সংকোচের হাতছানি জাগে,
এমন ফাগুন দিনে আগুন লাগিবে মনে
কেউ কি ভেবেছে এর আগে?

নাই সে যমুনা জল, নাই প্রেম ঢল ঢল
আঁখি জল রাধার নয়নে,
একাকী কদমতলে ক্ষণে আসা কত ছলে,
ক্ষণে আসা সখি সনে কুসুম চয়নে।

তমালের ডালে ডালে লতার ঝুলন রচি
দোল খাওয়া কিশোর প্রাণের,
আবীরে আঁচল ভরি', রঙে ভরি' পিচ্‌কারী
আর নাই রঙ খেলা ব্রজরাখালের।

এখন মরুর ধূলা লাল হোল খুন্ মেখে—
লাল খুন্ কাঁচা শিশুদের,
থাক্ আজ দোল্ খেলা, প্রাণ নিয়ে হেলাফেলা
চলিয়াছে, চলিবেও ঢের।

জেনে রাখা ভাল

—শ্রীশান্তি সমীরণ ব্যানার্জ্জী (১০৫৫)

পৃথিবীর সব চেয়ে যা বড়:

বড় ছবি—টিণ্টারেট্টোর প্যারাডাইস; (২৩×৭২ ফিট)

বড় মন্দির—দক্ষিণ ভারতে শ্রীরঙ্গমের রঘুনাথ স্বামীর মন্দির।

বড় মান-মন্দির—মাউণ্ট উইলসন অব্‌সারভেটরী (আমেরিকা)

উঁচুতে রেল ষ্টেশন—ওরায়া (পেরু) ১৩১০০ ফিট

খেলার মাঠে

আন্তঃপ্রাদেশিক হকি চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করলেন বোম্বাই প্রদেশ গোয়ালিয়রকে ৩—০ গোলে পরাজিত করে। একদিন ১—১ গোলে ড্র হয়, দ্বিতীয় দিন জয় পরাজয় নির্দ্ধারিত হয়।

*

পোর্ট কমিশনার্স অনায়াসে মেসারার্সকে ৪—০ গোলে পরাজিত করেছে। গ্রীয়ার মিলিটারী মেডিক্যালসের কাছে ২—০ গোলে পরাজয় স্বীকার করেছে। ঐ দিন মহামেডান স্পোর্টিং কোনক্রমে লিলুয়াকে ১—০ গোলে পরাজিত করে ২টি পয়েণ্ট সংগ্রহ করে।

*

রঞ্জী ট্রফির উত্তর বিভাগীয় ফাইনাল খেলায় নদার্ণ ইণ্ডিয়া ক্রিকেট এসোসিয়েশন সাদার্ণ পাঞ্জাবকে প্রথম ইনিংসের ফলাফলের উপর মাত্র ৩ রাণে হারিয়ে সেমি-ফাইনালে উঠেছে। ১ম ইনিংসে এন, আই, সি, এ করে ৩২৯ রাণ এবং সাদার্ণ পাঞ্জাব করে ৩২৬। দ্বিতীয় ইনিংসে এন, আই, সি, এ ১২৭ রাণ করলে সাদার্ণ পাঞ্জাবও ১০৪ রাণ করে ৮ উইকেটে। কিন্তু ৩ দিন সমাপ্ত হয়ে যাওয়ার দরুণ ১ম ইনিংসের ফলাফলই এন, আই, সি, একে জয়ী করে। ইহারা এবার ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া ষ্টেট ক্রিকেট এসোসিয়েশনের সঙ্গে খেলবেন। এ খেলাটি রাজকোটে আগামী ১৭ই মার্চ্চ সুরু হবে।

টিমসমূহের স্থান

প্রথম ডিভিসন হকি লীগ (শনিবার পর্য্যন্ত)

	খেলা	জ	ড্র	পরা	স্ব	বি	প
লিলুয়া	৬	৩	২	১	৬	৪	৮
পুলিশ	৪	৩	১	০	১১	২	৭
ইষ্টবেঙ্গল	৪	৩	১	০	৮	১	৭
মহঃ স্পোর্টিং	৪	২	২	০	৫	৩	৬
ডালহৌসী	৮	৩	১	৪	১০	১৪	৭
মিলিঃ মেডিঃ	৫	২	২	১	৬	৫	৬
মোহন বাগান	১	২	১	০	১১	৩	৩
কাষ্টমস্	৫	২	১	২	১০	৮	৫
বি-জি-প্রেস	৪	২	১	১	৪	১	৫
গ্রীয়ার	৪	২	১	১	৭	৫	৫
বি ও এ রেল	৮	২	০	৩	৯	১৩	৪
জেভেরিয়ান্স	২	১	১	১	৪	৫	৪
আরমেনিয়ানস	২	০	১	১	৪	১০	১
পোর্ট কমিঃ	১	১	০	০	১	০	২
পাঞ্জাব স্পোর্টস	৬	০	২	৪	১	৭	২
মেসারারস	৭	০	১	৩	২	৮	১
রেঞ্জারস	২	০	০	২	০	৪	০

সমালোচনা

সচিত্র যৌন বিজ্ঞান—(মত ও পথ) আবুল হাসানাৎ প্রণীত। প্রকাশক দি ষ্ট্যাণ্ডার্ড লাইব্রেরী, জে বি, ঢাকা। নূতন সংস্করণ—দাম সাড়ে পাঁচ টাকা।

আমরা এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি, এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। পুস্তকটির নূতন সংস্করণ বাহির করিতে হইয়াছে, ইহা গ্রন্থকারের খ্যাতির পরিচয়। বিশেষ করিয়া বাঙ্গালা দেশে বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ। ইহা আশার কথা সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান সংস্করণে পুস্তকটির আকার প্রায় দেড় গুণ বাড়িয়াছে। প্রত্যেকটি অধ্যায় নূতন করিয়া পরিবর্দ্ধিত ও পরিমার্জ্জিত হইয়াছে। যৌন-সমস্যার সমাজতত্ত্বমূলক অধ্যায়গুলি অধিকতর সুন্দররূপে পাঠকের সমক্ষে ধরা হইয়াছে। ফলে পুস্তকের গুরুত্ব ও মূল্য বাড়িয়াছে বলিয়া মনে করি। আমরা এই অধ্যায়গুলি বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছি। বলিতে বাধা নাই, সমস্যা সম্বন্ধে গ্রন্থকারের মতবাদ কোথাও গোঁড়ামী বা অতি আধুনিকতাকে স্পর্শ করে নাই। সর্ব্বত্রই একটা balanced ও বিচারসহ দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করা হইয়াছে।

এই বৈজ্ঞানিক পুস্তকের ভাষা হইয়াছে চমৎকার, পরিভাষাগুলির রচনাও সুষ্ঠু ও সহজ। জনসাধারণ পুস্তকটি পাঠ করিয়া লেখককে অভিনন্দিত করিবেন। বর্ত্তমানে গবর্ণমেণ্ট যৌন সমস্যার গুরুত্বের দিকে দৃষ্টি দিয়াছেন—এই গ্রন্থের সমধিক প্রচার হইলে সে দিকে বিশেষ সাহায্য হইবে বলিয়া মনে করি।

কুচবিহার কাপ ফাইনালে অমৃতবাজার পত্রিকা ক্লাব ৮ উইকেটে বেঙ্গল ক্রিকেট ক্লাবকে পরাজিত করেছে। ১ম ইনিংসে বেঙ্গল ক্রিকেট ক্লাব মাত্র ৮০ ও ২য় ইনিংসে ১৩১ রাণ করে আর পত্রিকা ১ম ইনিংসে ১৫৫ ২য় ইনিংসে ২ উইকেটে ৬০ রাণ করে। বিজয়ী দলের মণ্টু সেন (৩২ রাণে ৬) ও কে, ভট্টাচার্য্যের (৩৭ রাণে ৪) বোলিং প্রতিপক্ষ দলের বিপর্য্যয়ের সৃষ্টি করে।

নাটমণ্ডপ

শৈলজানন্দ-সম্বর্দ্ধনায় শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ঘোষের অভিভাষণ

শৈলজানন্দ-সম্বর্দ্ধনায় প্রাইমা ফিল্মস ও রূপবাণীর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ঘোষ যে অভিভাষণ পাঠ করেন, তাহাতে তিনি বলেন, চিত্রজগতে আমরা শৈলজানন্দের সাক্ষাৎ পাইয়াছি মাত্র অল্প কয়েক বৎসর, কিন্তু তার পূর্ব্ব হইতেই শৈলজানন্দের সাহিত্য-প্রতিভা গভীরভাবে আপনাদের মুগ্ধ ও আকৃষ্ট করিয়া রাখিয়াছিল। শৈলজানন্দকে প্রথম যখন 'নন্দিনী' কথা-চিত্রের রচয়িতা ও পরিচালক রূপে জনসাধারণ পাইয়াছিল তখনই তাহাকে উচ্ছ্বসিত সমাদরে গ্রহণ করিতে এতটুকু সঙ্কোচবোধ করে নাই। শৈলজানন্দের রচনায় ও পরিচালনায় দ্বিতীয় বাংলা ছবি 'বন্দী' অসামান্য সাফল্যে তাঁহাকে অভিনন্দিত করে। এই কথাচিত্রটি বঙ্গীয় চিত্রসাংবাদিক প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক ১৯৪১ সালের শ্রেষ্ঠ কাহিনী ও পরিচালনার সম্মান অর্জন করে। তাঁর তৃতীয় ছবি 'শহর থেকে দূরে', শহরে ও শহর থেকে দূরে অভূতপূর্ব্ব চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিয়াছে।

শৈলজানন্দের প্রাণবন্ত রচনা ছায়াছবির মধ্যে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়া তার শিরায় উপশিরায় তার গতিতে ও ভঙ্গিমায় প্রাণ সঞ্চার করিয়াছে। শৈলজানন্দের সাবলীল ভাষা, স্বচ্ছন্দ মধুর সংলাপ ও ছবির দ্রুত গতি-শীলতা (tempo) ছবিটিকে এমন চিত্তগ্রাহী করিয়া তুলিয়াছে যে ছবি দেখিতে দেখিতে অন্য কোন দিকে দৃষ্টি ফেরান যায় না।

প্রযোজকের দৃষ্টি উন্নত না হইলে ও পরিচালকের প্রতি তাঁর আন্তরিক বিশ্বাস শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা না থাকিলে ছায়াচিত্র-শিল্পী উৎকর্ষ লাভ করিতে সক্ষম হয় না। এই প্রসঙ্গে আমরা বলিতে পারি ইষ্টার্ণ টকিজের প্রতিষ্ঠাতা ও 'শহর থেকে দূরে' চিত্রের প্রযোজক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্ররঞ্জন সরকার একজন আদর্শ চিত্র-প্রযোজক।

বিশ্বপতির চরণে আজ এই প্রার্থনাই করি যে এই দুই আদর্শ প্রযোজক ও পরিচালক সুরেন্দ্ররঞ্জন ও শৈলজানন্দের সহযোগিতায় বাংলার সিনেমা-শিল্প যেন দিনের পর দিন সমৃদ্ধ হইয়া ওঠে।

পরিশেষে তিনি বলেন, যে ছবি গত

নয় সপ্তাহে সহরের মাত্র একটি চিত্রগৃহে একলক্ষ একত্রিশ হাজার সতের টাকা দশ আনা বিক্রয় লাভে তার স্রষ্টাকে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ মাসের পর মাস বাঙলার অযুত সহস্র নরনারী কর্ত্তৃক অভিনন্দিত করিতেছে, তার তুলনায় এই অভিভাষণ অকিঞ্চিৎকর।

ইউনিটি ফিল্ম এক্সচেঞ্জ লিঃ

উপরোক্ত নামে লাইটহাউস বিল্ডিংএ আর একটি চিত্র-পরিবেশনা প্রতিষ্ঠান জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ইহার কর্ণধার হইলেন ব্রিটিশ ডিষ্ট্রিবিউটার্স (ইণ্ডিয়া) লিঃ এর অন্যতম ডিরেক্টার ক্রোড়পতি মিঃ এচ, এন, সাহগল, পরাশর ব্রাদার্সের মিঃ লাহোরী-রাম পরাশর এবং ইউনিটি প্রোডাকশানের মিঃ আর, শর্ম্মা। প্রচুর মূলধন লইয়া ইঁহারা কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং শীঘ্রই দিল্লী, লাহোর এবং করাচীতে ইঁহাদের শাখা অফিস খোলা হইবে। বর্ত্তমানে তাঁহাদের পরিবেশনাধীনে আছে ইউনিটি প্রোডাকশানের "ভাই-চারা", বড়ুয়ার "সুবে-শ্যাম" ও "চাঁদের কলঙ্ক", ইন্দ্রপুরীর "ইরাদা" এবং দেবকী বসুর আগামী ছবি "Call Of The Motherland" এবং ইউনিটির আগামী ছবি "কুরুক্ষেত্র"। আমরা এই নবজাত চিত্র পরিবেশকদের সর্ব্বাঙ্গীন শুভ কামনা করি।

সহরের সিনেমায়

গণেশ টকীজে—"রাম-রাজ্য" (৩১শ সপ্তাহ)
মিনার্ভা —"শুক্রিয়া" (২য় সপ্তাহ)
প্যারামাউণ্ট—"ভালাই" (৫ম সপ্তাহ)
চিত্রলেখা—"মানময়ী গার্লস স্কুল"

রবীন্দ্রনাথের "বাল্মীকি প্রতিভা"

বিশ্বভারতী কর্ত্তৃপক্ষ শীঘ্রই কলিকাতায় রবীন্দ্রনাথের "বাল্মীকি-প্রতিভা" নামক গীতিনাট্যটি অভিনয়ের ব্যবস্থা করিবেন। শান্তি নিকেতনের শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী এবং ছাত্র ছাত্রীরা এই অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করিবেন। রবীন্দ্রনাথের তরুণ বয়সে রচিত এই গীতিনাট্যটি সর্ব্বপ্রথম ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে অভিনীত হইয়াছিল এবং সেই অভিনয়ে কবি স্বয়ং বাল্মীকির ভূমিকায় মঞ্চাবতরণ করিয়াছিলেন। তারপর এই গীতি-নাট্যটি আরও কয়েকবার অভিনীত হইয়াছে। সাজসজ্জার অভিনবত্ব এবং নৃত্য পরিকল্পনার মৌলিকত্ব এবারকার অভিনয়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইবে। সম্প্রতি, বোম্বাইতে রবীন্দ্রনাথ সপ্তাহ উপলক্ষ্যে এই গীতিনাট্যটি সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ হইয়াছিল।

নানাকথা

ব্যাঁটরা পারিজাত সমাজ, হাওড়া

১৯৪৪ ও ৪৫ সালের জন্য নিম্নলিখিত কর্ম্মীবৃন্দ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন :—

সাধারণ সভাপতি—অবসর-প্রাপ্ত জিলা জজ শ্রীযুক্ত জ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাধারণ সহকারী সভাপতি ও সাহিত্য, পাঠাগার, প্রমোদ, সেবা ও স্বাস্থ্য সংসদ সমূহের সভাপতিগণ :—শ্রীযুক্ত এস, ওয়াজেদ আলি, বিজয়কুমার মুখোপাধ্যায়, ধূর্জ্জটী অধিকারী, জহরলাল চট্টোপাধ্যায়। সাধারণ সহকারী সভাপতি—দ্বিজবর চোংদার, ভগবানদাস চট্টোপাধ্যায় এবং নরেন্দ্র নাথ বসু (সম্পাদক, রবি-বাসর)। সংসদ সমূহের সহ-সভাপতিগণ—কবি গিরিজাকুমার বসু, শৈলকুমার মুখোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র পাল, মনীন্দ্রমোহন বসু, ডাঃ বিভূতিভূষণ দাস ও রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা ও অর্থরক্ষক—ব্যোমকেশ অধিকারী।

বালী শিশু সমিতি

আগামী ১১ই মার্চ্চ শনিবার, বৈকাল ৩॥ ঘটিকার সময় ২নং প্রাণকৃষ্ণ গঙ্গো রোডে শিশু সমিতির বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। মাননীয় শ্রীযুক্ত জে, এন্, তালুকদার আই, সি, এস্, বেসামরিক খাদ্যবিভাগের অতিরিক্ত পরিচালক মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন। সমিতির সভ্যগণ কর্ত্তৃক ক্রীড়া-কৌশল প্রদর্শিত হইবে।

১২ই মার্চ্চ রবিবার বৈকাল ৪॥ ঘটিকায় সময় সমিতির সাহায্যকল্পে বহিরাগত ভদ্রমহোদয়গণ কর্ত্তৃক ব্যায়াম কৌশল, মুষ্টিযুদ্ধ, হাস্যকৌতুক, নৃত্যকলা, সঙ্গীত ও সমিতির সভ্যগণ কর্ত্তৃক "চিত্রার্জ্জুন" নাটক অভিনীত হইবে।

দীপালীর স্বত্বাধিকারী শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত, ১২৩৷১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, দীপালী প্রেসে মুদ্রিত ও দীপালী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

প্রধান সম্পাদক—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় :: সহঃ সম্পাদক—শ্রীধীরেন্দ্রমোহন মজুমদার বি. এল.

১৬শ বর্ষ VOL. XVI. } ৩রা চৈত্র ১৩৫০ :: March 16, 1944 { ১১শ সংখ্যা No. 11

আলোচনী

বাংলা সরকার গত শুক্রবার (১০ই মার্চ্চ) ১৯৪৩ সালের বাংলার মৃত্যু-সংখ্যা প্রকাশ করিয়াছেন! অসম্পূর্ণ হইলেও ইহা হইতে মৃত্যুর ভয়াবহতা কতকটা আন্দাজ করা যাইবে, Statistics বা সংখ্যানুপাতের বালাই এদেশে কোন দিন ছিল না। বাংলা দেশে যে ভাবে জন্ম-মৃত্যুর হার গণনা করা রেওয়াজ আছে তাহা হইতে কোন প্রকার সিদ্ধান্ত করা বিপজ্জনক। দীর্ঘদিন একটা আন্দাজী মনগড়া সংখ্যানুপাতের উপর নির্ভর করিয়া আমাদের চলিয়াছে। মাত্র জানুয়ারী মাসে বাংলা গভর্ণমেণ্ট বর্ত্তমান সংখ্যা সংগ্রহের ত্রুটির কথা স্বীকার করেন এবং নূতন পদ্ধতিতে সঙ্কলনের সিদ্ধান্ত করেন। ১৯৪৩এর যে মৃত্যুসংখ্যা গবর্ণমেণ্ট বাহির করিয়াছেন তাহাতে যথেষ্ট ত্রুটি আছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

* * * * *

১৯৪৩ সাল বাংলার মন্বন্তরের বৎসর। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সহিত অনেকে ইহার তুলনা করেন। বাহিরের দিক দিয়া এ তুলনা খানিকটা হয়তো চলিতে পারে। অন্তরের দিক হইতে প্রভেদ অনেক। সে যুগে মানুষের ক্ষুধার যে তীব্রতা ছিল তাহাতে সমাজে সংসারে গরল উঠিত। আর এ যুগের বাঙ্গালী সে গরল পান করিয়া নীলকণ্ঠ হইয়াছে। ১৯৪৩ সালের অনশন মৃত্যু বাঙালীর লজ্জা না গৌরবের ইতিহাস? হয়তো গৌরবের। এতখানি দাহ বা জ্বালা যাহারা অন্তরে বহিয়া চলিয়া গিয়াছে সভ্যতার গৌরব তাহাদের ষোল আনা প্রাপ্য বই কি!

* * * * *

মৃতের কবর খুঁড়িয়া লাভ নাই। তথাপি সভ্য জগতকে বুঝাইবার গরজ আছে। ১৯৪৩ সালে "সর্ব্ব বিষয়ে" (Death from all causes) মৃত্যুহার গত পাঁচ বৎসরের (average) বা সাধারণ হার হইতে শতকরা ৫৮ বৃদ্ধি হইয়াছে। মোট বৃদ্ধির সংখ্যা ৬,৮৮,৮৪৬,। ম্যালেরিয়া কলেরা ও বসন্ত রোগে মৃত্যুর বৃদ্ধি সংখ্যা ৪৬০,৭৭৬। এইগুলি হইল বৃদ্ধি সংখ্যা। সাধারণ (average) মৃত্যু সংখ্যা ইহার সহিত যোগ করিলে ১৯৪৩ সালের মোট মৃত্যু-সংখ্যা দাঁড়ায় ১৮,৭৩,৭৪৯ অর্থাৎ সরকারী হিসাবমতে এই বৎসরে প্রায় ১৯ লাখ লোক মরিয়াছে। বাংলা সরকার চক্ষুলজ্জাবশতঃ (death from all causes) বা সর্ব্ব বিষয়ে মৃত্যুর সংখ্যা বলিয়াই সারিয়াছেন। তাঁহারা নীরব রহিলেও হিসাবমত ২,২৮,০৭০ জন লোকের মৃত্যু কি কারণে ঘটিয়াছে তাহা আমরা অনুমান করিতে পারি। সে কারণ প্রকাশ্য প্রেস নোটে বলা চলে না। ইহা হইল বাংলা গবর্ণমেণ্ট-এর সঙ্কলিত মৃত্যু-সংখ্যা। বহু বেসরকারী সূত্র হইতে যে সকল সংখ্যা বাহির হইয়াছে তাহা আরও ভয়াবহ। কলেরা, ম্যালেরিয়া ও বসন্ত রোগ এড়াইয়াও যাহারা ধীরে ধীরে

পৃষ্টহীন হইয়া মরিয়াছে তাহাদের কাহিনী রহিয়াছে সংখ্যাবিজ্ঞানীর দৃষ্টির বাহিরে। সেই সহস্র সহস্র মানুষের মৃত্যুর ইতিহাস পশ্চাৎ পটে রাখিয়া সংখ্যা সঙ্কলনের চেষ্টা দুশ্চেষ্টা মাত্র।

* * *

সম্প্রতি আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা কালে জনাব জিন্না সাহেব যুদ্ধ জয়ের নূতন পথ বাৎলাইয়াছেন। ভারতে পাকিস্থান হইলেই নাকি যুদ্ধ জয় সোজা হইয়া যাইবে। অবশ্য এ সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য তিনি খুলিয়া জানান নাই। জানাইবার অসুবিধা থাকিতে পারে। কিন্তু তাহাতে কিছু আসে যায় না। জনতার নেতৃত্ব করিতে অসাধারণ যুক্তিতর্কের আবশ্যক নাই। সুরের ব্যতিক্রম না ঘটিলেই হইল। জিন্না সাহেবের আর যে দোষই থাকুক পাকিস্থান সম্বন্ধে তাঁহার নিষ্ঠা অসাধারণ ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। লর্ড ওয়াভেল ভারতের অখণ্ডতার পক্ষে সম্প্রতি যাহা বলিয়াছেন, তাহা ভারতকে চিরদিন সাম্রাজ্যবাদী শাসনের কবলে রাখিবার অজুহাত মাত্র জিন্না সাহেব হঠাৎ ইহা আবিষ্কার করিয়াছেন। কংগ্রেসের সহিত সরকারের আপোষের যে চেষ্টা হইতেছে তাহাতে দেশের সর্ব্বনাশ হইবে এইরূপ সতর্কবাণীও বড়লাট সাহেবের উদ্দেশ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। সাম্প্রদায়িক ভেদনীতি লইয়া যাঁহারা দীর্ঘদিন পরীক্ষা চালাইয়া খুনা হইয়াছেন তাঁহাদের নিকট এই শ্রেণীর বাক্‌বিস্ফোরণের কি মূল্য তাহা আমরা সহজেই কল্পনা করিয়া লইতে পারি।

* * *

কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি ডাঃ রাধাবিনোদ পাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরবর্ত্তী ভাইসচ্যান্সেলার নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। বর্ত্তমান ভাইস-চ্যান্সেলার ডাঃ বি, সি, রায়ের কার্য্যকাল শীঘ্রই পূর্ণ হইবে। এ সম্বন্ধে সরকারী বিজ্ঞপ্তি আশা করা যাইতেছে। ডাঃ পাল হাইকোর্টের খ্যাতনামা এ্যাডভোকেট হিসাবে সুপরিচিত। আইনের বিভিন্ন বিষয়ে তাঁহার মূল্যবান গবেষণা ভারতের বাহিরেও স্বীকৃত হইয়াছে। ডাঃ পাল International Academy of Comparative Law-এর যুক্ত সভাপতি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনি তিনবার Tagore Law Professor নিযুক্ত হইয়াছেন। গত ১৯৪২ সালে টেগোর আইন অধ্যাপক হিসাবে তিনি যে বক্তৃতা দেন তাহার বিষয়বস্তু ছিল "The Constitutional Development of British India"। ডাঃ পালকে আমরা অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

উপন্যাসের প্রারম্ভ

(বড় গল্প)

এক

—শ্রীশচীন্দ্রনাথ মিত্র

গুগ্‌লিডাঙ্গার পদ্মলোচন ঘোষ যখন তাঁর অতিরিক্ত তাম্বূল চর্ব্বনের ফলে মিশ-কালো রঙের কুৎসিতদর্শন দাঁতগুলি বার করে সবিনয় হাস্যে দোকানদারদের মনোরঞ্জন করতে করতে, রজক-ভবন-সম্পর্ক-বিহীন আটহাতী খাটো লালপেড়ে বঙ্গলক্ষ্মীর ধূতী ও শতছিন্ন পিরাণটী পরে হার্ড-ওয়ারের বাজারে দালালী করে বেড়াতেন তখন কে জানতো সে তাঁর ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্স তখন এক লক্ষ টাকারও অনেক উর্দ্ধে অবস্থান করছে? শুধু তাই নয়;—শনিবারের বাজারে দ্রুতপদে ট্রেণ ধরবার উদ্দেশ্যে উদ্বেগ-আকুল প্ল্যাটফরমের ওপর কলার খোসায় পা বেধে আছাড় খাওয়া নিবন্ধন, ভগ্ন-উরু পদ্মলোচনকে নিয়ে তাঁর সহকর্ম্মী কলকাতার কয়েকজন যুবক যখন তাঁকে তাঁর গ্রামের বাড়ীতে পৌঁছে দিতে গেল, তখন তারা সবিস্ময়ে শুনলো যে, এতাবৎকাল যাকে তারা অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে আসছে. নিরক্ষর দরিদ্র ভেবে, নিজেদের আত্ম-সম্মান সম্যক-রূপে বজায় রাখতে গিয়ে, যার সঙ্গে তারা জীবনে কখনও হেসে কথা কয়নি, খাট মলিন ধূতী পিরাণ পরা, তুশো বৎসর পূর্ব্বেকার ক্যাসানের কঙ্কির বাঁটে নিৰ্ম্মিত শতছিদ্রযুক্ত অপরূপ ছত্রধারী এই পদ্মলোচন ঘোষ শুধু যে সেই গ্রামটারই জমিদার তা নয়, আশে পাশে আরও অনেকগুলি গ্রাম ও তাঁর বিরাট জমিদারীর এলাকাভুক্ত। মনে মনে ভবিষ্যতে নিজেদের ভুলগুলি সংশোধন করে চলবার প্রতিজ্ঞা করে চেষ্টাকৃত ভদ্রতার হাসি হেসে, সবিনয়ে বিদায় গ্রহণ করে তারা যখন স্বস্থানে প্রস্থান করতে উদ্যত হোল, তখন অতি অকস্মাৎ হৃদ-যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে গিয়ে তাদের ভবিষ্যৎ স্বপ্নের বুকে নিদারুণ বজ্র হেনে অকালে পদ্মলোচন পরলোকে গমন করলেন।

পদ্মলোচনের একমাত্র পুত্র সদ্য-পিতৃহারা রাজীবলোচনের কথা স্মরণ করে পদ্মলোচনের যুবক বন্ধুবর্গ এইখানেই নিরস্ত হতে পারলে না; তাদের সমবেত চেষ্টায় কাগজে কাগজে হৈ চৈ পড়ে গেল। জনসাধারণের নিকট পদ্মলোচন ঘোষ, বিশেষরূপে তদ্বিরের ফলে বিখ্যাত দালালের পরিবর্ত্তে একজন স্বনামধন্য ব্যবসায়ী বলে স্মরণীয় হয়ে রইলেন।

পদ্মলোচনের একমাত্র বংশধর রাজীব-লোচন গ্রামের হাইস্কুল থেকে বার তিনেক টেষ্ট পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হয়ে এতদিন দিনমানে কোন গৃহস্থ বাড়ীর খিড়কীর ঘাটে বসে হুইল হাতে করে মাছ ধরবার অজুহাতে পাড়ার কিশোরী তরুণীদের সঙ্গে আলাপ জমাবার চেষ্টা করে এবং রাত্রিকালে নানাবিধ সাপ্তাহিক, মাসিক পত্রিকার মারফৎ সাহিত্য চর্চ্চা করবার চেষ্টা করতে করতে কাল কাটাচ্ছিল, এখন পিতার বিপুল বিষয়ের মালিক হয়ে বসল। কিন্তু শুদ্ধমাত্র জমিদারী নেড়ে-চেড়ে, অশিক্ষিত চাষাদের সাহচর্য্য করে, ডোবাখানাবহুল ম্যালেরিয়া পীড়িত, মিউনিসিপ্যালিটী-বিহীন অজ পাড়াগাঁয়ে পড়ে থাকাটা রাজীবলোচনের

মত একজন প্রগতিপন্থী যুবকের পক্ষে সম্ভবপর নয়! বিশেষতঃ পিতার সহকর্মী সেই যুবকগণ—যারা পদ্মলোচনের শেষ সময়ে সত্যিকারের বন্ধুর কাজ করেছিলো বলে দাবী করে থাকে—তারাও কথাটাতে সায় না দিয়ে পারল না। ভ্রূকুঞ্চিত করে চিন্তিতস্বরে তারা বলল: আপনার মতো একজন অসাধারণ বুদ্ধিমান যুবকের পক্ষে নিজেকে এইভাবে একটা অজ পাড়াগাঁয়ে বন্দী করে রাখাটা নিছক পাগলামী ছাড়া আর কিছুই নয়! কর্ম্ম-কোলাহলমুখর কলকাতা অবাক বিস্ময়ে চেয়ে আছে আপনার অদ্ভুত প্রতিভার দিকে; পল্লীগ্রামে পড়ে থেকে সেই অসাধারণ প্রতিভাকে এ ভাবে টুঁটী টিপে মেরে ফেলবার আপনার কোন অধিকার নেই! বিখ্যাত ব্যবসায়ী পদ্মলোচন ঘোষের ছেলে আপনি,—পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ না করে, এ ভাবে পাড়াগাঁয়ে পড়ে থেকে নিজেকে নষ্ট করে ফেলবেন না স্যার! কলকাতায় গিয়ে ব্যবসা করুন, আমরা আপনার পিছনে আছি।

কথাটা রাজীবলোচনের মনে লাগল। নায়েব গোমস্তার ওপর সংসার ও জমিদারীর ভার অর্পণ করে, ব্যবসা করবার উদ্দেশ্যে সে কলকাতায় গিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করবার ব্যবস্থা করে ফেলল। কিন্তু কলকাতায় গিয়ে তাড়াতাড়ি ব্যবসাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবার সুযোগ তার ভাগ্যে ঘটে উঠল না। প্রথমেই সে একদল ভ্রাম্যমান সামাজিক-জীবের করকবলিত হয়ে পড়ল। এই সকল শুভাকাঙ্ক্ষীর অমানুষিক চেষ্টার ফলে কিছুদিনের মধ্যেই সে এমন একটা সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ল যারা ব্র্যাণ্ডি ছাড়া ডিনার খায় না; সুইজারল্যাণ্ড ছাড়া চেঞ্জে যায় না এবং বিলেত-ফেরৎ ছাড়া সাধারণতঃ বন্ধুত্ব পাতায় না।

এদের সাহচর্য্যের ফলে রাজীব লোচনেরও যথেষ্ট উন্নতি হতে লাগল। সর্ট ষ্ট্রীটে একটী প্রকাণ্ড ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে সে বাস করতে আরম্ভ করল; আর্ট-সিলিগুয়ের একখানি প্রকাণ্ড 'বুইক' গাড়ী কিনে, অপরাহ্ন বেলায় সে অভিজাত সমাজের টি-পার্টীতে যোগদান করে বেড়াতে আরম্ভ করল। ফ্রান্সের বন্যায়, রাসিয়ার দুর্ভিক্ষে, তুর্কীস্থানের ভূমিকম্পে হাজার হাজার টাকা দান করে, সমাজের মধ্যে শীঘ্রই সে একজন নামকরা লোক বলে পরিচিত হয়ে পড়ল। ক্রমে সম্ভ্রান্ত ইংরাজ রাজ-কর্ম্মচারীদের বাড়ীতে ঘন ঘন তার ডাক পড়তে আরম্ভ ... অভিজাত স্বদেশ নেতাদের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব স্থাপিত হোল এবং সমাজের নামকরা তরুণীবৃন্দের জনক-জননীদের নিকট শীঘ্রই সে অত্যন্ত স্নেহের পাত্র বলে পরিগণিত হয়ে পড়ল।

প্রেমে সে অনেকের সঙ্গেই পড়ল এবং একদা অনেকের হৃদয়ে ব্যথা দিয়ে ল্যান্স-ডাউন রোড নিবাসী বিপুল বিত্তশালী জমিদার মিঃ নিখিল গুপ্তের একমাত্র কন্যা লিলি গুপ্তার নিকট বিবাহের প্রস্তাব করে বসল। স্থির থাকল বিবাহের পরই সস্ত্রীক রাজীব গস্ বিলাত ভ্রমণে যাত্রা করবে। সমাজের মধ্যে একটা সাড়া পড়ে গেল। নিজেদের অপরূপ-রূপ-লাবণ্যময়ী শিক্ষিতা কন্যাদের দিকে করুণ দৃষ্টিতে চাইতে চাইতে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতামাতার দল রাজীব লোচনের এই অবিমৃষ্যকারিতার জন্য দুঃখ প্রকাশ করতে লাগলেন।

এদিকে সমাজের মধ্যে নিজের প্রতিষ্ঠা সুদৃঢ় করতে গিয়ে তার ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স বলতে আর কিছুই রইল না। এইবার সে একটু চিন্তিত হয়ে পড়ল; এবং ব্যবসাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবার এখনই উপযুক্ত সময়, এই ভেবে ভূতপূর্ব্ব ব্যবসায়ী বন্ধুদের সন্ধানে একদিন দুপুর বেলায় সে দর্ম্মাহাটায় গিয়ে উপস্থিত হল। বহু অনুসন্ধানের পর বাঁশতলা গলিতে একটা অপরিস্কার চায়ের দোকানের মধ্যে তাদের কয়েকজনকে দেখতে পেয়ে, সে তাদেরকে নিজের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করল। তারা লাফিয়ে উঠে সঙ্গে সঙ্গে কাগজ কলম নিয়ে খশড়া করতে বসে গেল; ক্লাইভ ষ্ট্রীটের ওপর প্রকাণ্ড ফ্ল্যাট ভাড়া করা হোল; মূল্যবান আসবাব পত্র কেনা হোল; নরউইজিয়ান কাগজে Letter heading প্রভৃতি অবশ্য প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্রাদি ছাপান হোল; রয়েল রেমিংটনের বাড়ী থেকে টাইপ রাইটার এলো; খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনের মারফৎ ফিরিঙ্গী লেডি টাইপিষ্ট এলো; দারোয়ান এলো, বেহারা এলো, মাথার ওপর বৈদ্যুতিক পাখা ঘুরল, হাতের কাছে টেলিফোন বসল, দরজা জানালায় খশ খশ পর্য্যন্ত ঝুলল। বিলাতের নাম করা Shipper দের কাছে বিমান ডাকে জরুরী পত্র গেল, কঁন্টিনেন্টাল কারখানাওয়ালাদের স্থানীয় প্রতিনিধিদের নিকট থেকে Quotation আনবার জন্য লোক ছুটলো; সর্ব্বোপরি তাড়াতাড়ি কারবার 'ফ্যালাও' করে ফেলবার জন্য রাজীবলোচন তার দালাল বন্ধুবর্গকে মাহিনার বন্দোবস্তে নিজের কারবারের মধ্যেই আটকে ফেলল। তাঁরাও রাস্তায় রাস্তায় অকারণ ঘুরে বেড়ানোর পরিবর্ত্তে নিশ্চিত বেতনের আশায় রাজীবলোচনের কেরাণী পদে নিযুক্ত হয়ে, দালালের পরিবর্ত্তে কেরাণীতে পরিণত হলেন।

বিলাতী আমদানী ব্যবসায়ে সদ্য সদ্য কেউ রোজগার করতে পারে না। ভবিষ্যতে লাল হবার আশায় রাজীবলোচনের দালাল বন্ধুবর্গ বাজার থেকে দিস্তে দিস্তে Proforma Indent আনতে লাগল। এই সকল বন্দোবস্তের জন্য রাজীবলোচনের পৈত্রিক জমিদারী একবার বন্ধক পড়ল; চমৎকার ভাবে দিন কেটে যেতে লাগল।

এমন সময়ে নিজের একটা অকিঞ্চিৎকর ভুলের জন্য, সামান্য একটু উচ্ছৃঙ্খলতা প্রকাশ করার জন্য তার সব গোলমাল হয়ে গেল। কিন্তু তার পূর্ব্বে ব্যাপারটা একটু খুলে বলা প্রয়োজন।

(ক্রমশঃ)

সুকবি মানকুমারী স্মরণে

(শ্রদ্ধাঞ্জলি)

—শ্রীমতী কনকলতা ঘোষ

বহু দিবসের পরিচিত ধরা ত্যজি
কোন সুরলোকে চলিয়া গিয়াছ আজি?
পেয়েছ কি সেথা নূতন উন্মাদনা
প্রিয় বিরহের মিলেছে কি সান্ত্বনা?
ধরাবাসে থেকে পেলে যে দুঃখ শোক
সে সব বেদনা ভুলাল কি দেবলোক?
হিন্দু গৃহের হে বালবিধবা নারী
ব্যর্থ জীবন সার্থকতায় ভরি—
রচনা করেছ যে সব কবিতাবলী
ভারতী দেউলে দেছ যে অশ্রুডালি,
সে সব তোমারে স্মরণ করায় নিতি
"প্রিয় প্রসঙ্গ" "কনকাঞ্জলী" গীতি,
"বীর কুমারের নিধন" কাহিনী
সকরুণ ছবি এঁকেছে লেখনী,
কাব্য কুসুম দেছ অঞ্জলি ভরি
শান্ত সুষমা গেছ বিকীরণ করি।
বঙ্গবাণীর অঙ্গন দ্বারে পূর্ব্বগামিনী কবি
শ্রদ্ধাপূর্ণ জানাই নমস্কার,
বিদায় বেলায় প্রার্থনা এই মোর
লভ আনন্দ শান্তি পুরস্কার।

লিপটনের চা খেতে খেতে অসাবধানে কথা বলবেন না

বিজনদা'র চিঠি

আমার আদুরে ভাই বোনেরা

তোমাদের লেখা উপন্যাস এবারে গেল। এর পরের অংশটা সকলে তাড়াতাড়ি লিখে পাঠিও। মনে থাকে যেন যে ষোলটী পরিচ্ছেদে উপন্যাসটী শেষ হবে, অতএব মাঝে তোমাদের লেখা বার হতে বাকী আছে আর একটী পরিচ্ছেদ। শেষ পরিচ্ছেদটী লিখবেন তোমাদের অনুরোধে কোন একজন খ্যাতনামা সাহিত্যিক।

প্রতিযোগিতাঃ প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্যে অনেক ভাই বোন প্রতিযোগিতায় যোগদান করতে পারবে না বলে, ওর সময় আরও বাড়াতে বলেছ, তাই ওর লেখা পাঠাবার শেষ তারিখ করে দিলাম ৩১শে মার্চ্চ···হ্যাঁ, ভালো কথা মনে পড়ে গেল, এর আগেও বহুবার বলেছি যে প্রতিযোগিতার কুপন তোমাদের রচনার সঙ্গে লাগিয়ে দাও। কিন্তু এখনও অনেকে তা পৃথক ভাবে খোলা অবস্থায় পাঠাও দেখছি। তার ফলে কুপন হারিয়ে যায়, আর আমিও লেখার সঙ্গে কুপন থাকে না বলে সে রচনা "প্রতিযোগিতার রচনা" বলে গ্রাহ্য করি না।··· আজ আবার সাবধান করে দিলাম। ভবিষ্যতে আর যেন ও কথা তোমাদের বলতে না হয়।···আজ আসি। স্নেহ নিও তোমরা।

তোমাদের : **বিজনদা**

তোমাদের বিভাগ

"সত্যির চেয়ে মিথ্যে ভাল"

—শ্রীকিরণ চাঁদ বর্ম্মন (৫৩)

গল্পের নামটা দেখে চমকে যাবার কোন কারণ নেই। সত্যি কথা যে বলা ভালো একথা কে অস্বীকার করবে? কিন্তু অনেক সময় ক্ষেত্রবিশেষে সত্যি কথা বললে ক্ষতি হয়, সেক্ষেত্রে মিথ্যে বলার প্রয়োজন সত্যি বলার চেয়ে অনেক বেশী—তাতে পাপ নেই। একটা গল্পই শোন না: এক রাজা। ন্যায়পরায়ণ বলে রাজার খুব নাম ডাক আছে। একদিন এক অপরাধীর বিচার করতে বসে, সব বিচারপত্র শেষ করে তিনি বুঝতে পারলেন লোকটা ভীষণ বদমাইস এবং দুষ্ট প্রকৃতির। রাজা তো চটেই আগুন। তখুনি হুকুম দিলেন কোতোয়ালকে, তরোয়াল এনে সেখানে তাঁর সামনে লোকটার মাথাটা কেটে ফেলবার জন্যে। লোকটা সত্যিই ভারী পাজী ছিল—যখন সে দেখলে যে বাঁচবার আর তার কোন আশাই নেই তখন মরিয়া হয়ে রাজাকে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি দিতে লাগলো। রাজা কিন্তু তার সেই গ্রাম্য ভাষার দুর্বোধ্য কথাগুলো মোটেই বুঝতে পারলেন না—তখন তিনি একজন সভাসদকে জিজ্ঞাসা করলেন যে লোকটা বিড় বিড় করে তাঁকে কি বলছে? সভাসদ লোকটা ছিলেন ভাল। প্রকৃত সত্য গোপন করে তিনি রাজাকে বললেন: লোকটি বলছে যে অপরাধীকে ক্ষমা করলে রাজামশায়ের ভাল হবে, ঈশ্বর তাঁর উপর সন্তুষ্ট হবেন, আর পরলোকে ঈশ্বর তাঁর অপরাধ ক্ষমা করবেন। রাজা সন্তুষ্ট হয়ে অপরাধীটিকে মুক্ত করে দেবার আদেশ দিলেন।

আর একটি বদ্‌মায়েস সভাসদ ছিল। কাছেই দাঁড়িয়ে সে সব শুনছিল এতক্ষণ। প্রথম সভাসদটিকে সে মোটেই ভাল চোখে দেখত না। তাঁকে জব্দ করবার ফন্দী খুঁজে বেড়াত খালি। একটা সুযোগ পেয়ে সে তখুনি প্রতিবাদের সুরে রাজাকে জানালে: রাজা মশাই, সব মিথ্যে কথা—সব মিথ্যে কথা। লোকটা আপনাকে মিছে কথা বুঝিয়ে দিল। অপরাধী লোকটা আপনাকে তো ওসব কথা বলেনি! অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি দিচ্ছিলো সে আপনাকে। আপনি ওর কথায় বিশ্বাস করবেন না।

রাজা কিন্তু ভীষণ রেগে গেলেন তার কথা শুনে—দ্বিতীয় সভাসদটিকে কঠোর স্বরে বললেন: থামো হে বাপু, থামো সত্যবাদী—তোমার এ সত্য কথার চেয়ে ওর মিথ্যে কথা ঢের ভাল। তুমি সত্যি কথা বলে দুটো লোকের প্রাণ নিতে চাও আর ও একটা মিথ্যে কথা বলে একটা লোকের প্রাণ রক্ষা করতে

এর শেষ কোথায়......

(আসরের ভাই-বোনেদের লেখা ধারাবাহিক বারোয়ারী উপন্যাস)

(১৪)

শ্রীসুহাস কুমার দাস (৯৪৯)

...নদীর চরের ভাঙ্গা গড়ার মতই এই সংসার, এই সমাজ। কখনও ভাঙ্গে, কখনও গড়ে, শুধু এই ভাঙ্গা গড়ারই খেলা চলেছে প্রতি নিয়ত। কিছু দিন আগে ঠিক এমনি ধারাই এক ভাঙ্গন লেগেছিল সোনার গাঁয়ের সব কিছুর মাঝে। দেখতে দেখতে ক'দিনের মধ্যে বীরুর মা—রাণুর বাবা' এরা সব একে একে গাঁয়ের মায়া কাটিয়ে চলে গেলেন কোন অনির্দ্দেশের পথে। তারপর এক এক করে সমস্ত গ্রামটাকে গ্রাস করে বসলো বিরাট মহামারী,—অভাব অভিযোগ। রোগে ভুগে অনাহারে অনিদ্রায় কতজন যে মারা গেল তার সীমা নেই। দেখতে দেখতে সমস্ত গাঁখানা হয়ে উঠলো যেন একটা মহা শ্মশান।

সেদিনের সে দৃশ্যটা বীরু আজও ভুলতে পারে নি। মনে মনে শুধু একটা প্রতিকারের প্রতিজ্ঞা করেই সে চলে এসেছিল গ্রাম ছেড়ে। ঐ অভাব অভিযোগের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে সে করতে চেয়েছিল ওরই প্রতিকার। আজ ভগবান তার দিকে মুখ তুলে চেয়েছেন। আজ সে শুধু একাই নয় কল্যাণীদেবী, রাণু, রেবা, সমীর সকলেই একযোগে ফিরে চলেছে সোণার গাঁয়ের পথে। আজ তার জীবনের সব চেয়ে আনন্দের দিন। মায়ের মত কল্যাণীদেবীকে, বোনের মত রাণুকে, রেবাকে আর ভাইয়ের মত সমীরকে সে আজ পেয়েছে তার একান্ত আপনার করে। এদের এই সম্মিলিত প্রচেষ্টার সঙ্গে মুখোমুখি যুদ্ধ করেও গাঁয়ের সেই নগ্ন অভাব অভিযোগ কি আজও ঠিক তেমনি ভাবেই টিকে থাকবে?...তার হারিয়ে যাওয়া মায়ের ঐকান্তিক আশীর্ব্বাদ... তার কি কোন দাম নেই, ভগবান?

...না না এ তার সম্পূর্ণ ভুল। এ কখনও হতে পারে না। চলন্ত গাড়ীখানার মধ্যে থেকে বাইরে দৃষ্টি ফেলতেই বীরুর স্পষ্ট মনে হোল ঐ তো তাদের গাঁয়ে যাবার মেঠো পথের ধারে তার মা যেন তারই জন্য অপেক্ষা করছেন। ঐ তো সেই মুখ...সেই হাসি মুখে সেই নির্ভয়তার চিহ্ন...একি কখনও ভুল হতে পারে? না কখনও না। বীরু প্রাণপণে চীৎকার করে উঠলো...মা,মা!

কিন্তু একি! এ সে কোথায়? ঘুম ভেঙ্গে বীরু দুহাতে চোখদুটো রগড়াতে রগড়াতে উঠে বসল বিছানার ওপর। অনেক বেলা হয়ে গেছে। জানালা দিয়ে রোদ এসে ছড়িয়ে পড়েছে ঘরময়। তবে এতক্ষণ সে যা দেখেছিল তার সবটুকুই কি স্বপ্ন? বীরু তন্ময় হয়ে এই সব কথাই ভাবছিল এমন সময় তার ঘরের দরজায় ঝোলান পর্দ্দাটা সরিয়ে ঘরে এসে ঢুকল রাণু। তারপর বীরুকে লক্ষ্য করে একটু বিদ্রূপের স্বরেই রাণু হাসতে হাসতে বলে উঠলো: বীরুদার কি আজকাল সকাল আটটায় ভোর হচ্ছে নাকি? বলি আজ সোনার গাঁয়ে যে যেতে হবে সে কথাও কি এই এক রাত্তিরের মধ্যেই ভুলে গেলে?

...টেবিলের উপর বসানো ঘড়িটার দিকে দেখে বীরু চমকে উঠে বলে: ও সত্যিই তো এত বেলা হয়ে গেছে? আচ্ছা তোরও কি মাথা খারাপ হলো নাকি রাণু? একটু আগে আমায় ডেকে দিতে হয় তো?

: বাঃ বেশ তো? পরের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে নিজেকে বাঁচাবার কৌশলটা বেশ শিখেছ, কেমন?

: না রে না,...আসলে ভোরের দিকে একটা খুব সুন্দর স্বপ্ন দেখছিলাম—আচ্ছা ভোরের স্বপ্ন নাকি সত্যি হয়? শুনেছি!

: হয় বৈ কি, কিন্তু কি এমন স্বপ্ন দেখলে?

: স্বপ্ন দেখলাম শুধু তুই আর আমি নয়, মা-মণি, রেবা, সমীর এরাও আমাদের সঙ্গে আমাদের গাঁয়ে চলেছে, বুঝলি?

হাসতে হাসতে রাণু বলে উঠলো—যদি বলি তোমার স্বপ্নই সত্যি হয়েছে!

বীরু আনন্দে লাফিয়ে ওঠে—কি আমার স্বপ্ন সত্যি হয়েছে? মা-মণি, রেবা, সমীর এরাও আমাদের সঙ্গে তাহলে যাবে রাণু?

: হ্যাঁ যাবে বৈকি—কেন যাবে না শুনি? হাসিমুখে কথাটা বলতে বলতে কল্যাণীদেবী এসে হাজির হলেন ঘরের মধ্যে। তাঁর কথায় বীরু ছোট ছেলের মত প্রশ্ন করলো—তাহলে তুমিও আমাদের সঙ্গে যাবে মা-মণি—আমাদের সেই অজ পাড়া গাঁ কি তোমার ভাল লাগবে মা-মণি?

কল্যাণীদেবী কি বলতে যাচ্ছিলেন, রাণু তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে উঠলো—বাঃ এই না হলে আর প্রশ্ন? বীরুদার মতে আজকাল মা আর ছেলে তফাৎ হয়ে পড়েছে, কেমন তাই না বীরুদা?

সত্যিই অতি আনন্দের মধ্যে কথা বলতে গিয়ে বীরুর প্রশ্নটা একটু খাপছাড়া হয়ে পড়েছিল। কল্যাণীদেবী এবার সেটাকে মানিয়ে নেবার জন্য বলে উঠলেন: তুই কি পাগল হয়েছিস রে বীরু? মার কাছে আবার ভাল মন্দ কি বলতো? তোদের যখন আমি মা তখন তোদের যেখানে জন্ম—যে গাঁয়ের প্রতি ধূলিকণার সঙ্গে তোদের ছেলেবেলাকার সব স্মৃতি জড়িয়ে আছে—সেই গাঁ কি আমার কাছে কখনও খারাপ লাগতে পারে রে? ভেবে দেখলাম শুধু টাকা দিয়ে সাহায্য করে তোদের কাছ থেকে সরে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমার কাছে রেবা, সমীর যা আর তুই, রাণুও তাই। সেই জন্য ঠিক করলাম আমার জীবনের শেষ ক'টা দিন তোদের বুকে পিঠে করে কাটিয়ে দেবো, বুঝলি বীরু?

এর পরে বীরুর আর কিছু বলার ছিল না। আনন্দে তার চোখের কোলগুলো জলে ভরে উঠলো। কল্যাণীদেবীকে সে মা বলেছে কিন্তু তিনি কি শুধুই মা...? বীরু তার হারিয়ে-যাওয়া মায়ের সব কিছুই ফিরে পেয়েছে—কল্যাণীদেবীর প্রতি কথা, প্রতি কাজ, প্রতিটি আচার ব্যবহারের আর স্নেহের মধ্যে দিয়ে। তার স্পষ্ট মনে আছে এমনি ধারা কথাই সে শুনতো তার মার কাছ থেকে। এক সময়ে সে তার মা হারানোর দুঃখেই হয়ে পড়েছিল কাতর, সে ভেবেছিল জগতে বুঝি তার আর কোথাও কেউ নেই, কিন্তু সে কথা ভাবলেও আজ তার নিজের মনেই ধিক্কার লাগে। বাংলার ঘরে ঘরে আজ যে শত শত মাতৃমূর্ত্তির সন্ধান সে পেয়েছে তাঁদের উদ্দেশ্যে সে জানাল প্রণাম। এরা শুধু মা নয়, আরও অনেক ওপরে এঁদের স্থান। (তারপর?)

চায়। রাজাকে সব সময় সৎপথে পরিচালিত করাই হচ্ছে তাঁর সংগীদের কাজ। তুমি তো ভীষণ দুষ্ট লোক, হিংসা আর ক্রূরতার জন্যে দুটো লোককে বধ করাতে চাও!!"

...যে গল্পটা এতক্ষণ বল্লাম, সেটার আখ্যানবস্তু আমার নিজস্ব নয়। বিখ্যাত ফার্সী কবি সাদীর নাম তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ। তাঁরই লেখা জগৎ-বিখ্যাত বই 'গুলিস্তাঁ'র গল্প এটা।

গল্প হলেও সত্যি

—শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

বছর ত্রিশ আগের কথা।

তখনও কলকাতার সহর এখনকার মত এতো জমজমাট হয়ে ওঠেনি।

শ্যামবাজার অঞ্চলে এক বাড়ীর রোয়াকে বসে একটি ছেলে মুড়ি ছোলা ভাজা বিক্রী করছে। ছেলেটির বয়স বেশী নয়, বছর চৌদ্দ হবে।

ইস্কুল ফেরৎ ছেলের দল কখন কখন তার চারিপাশে ভীড় করে, মুড়ি, ছোলা-ভাজা, চিনাবাদামের চাহিদা বেড়ে যায়, ছেলেটি তাড়াতাড়ি করেও সবাইকে কুলিয়ে উঠতে পারে না। কখন বা একেবারে বিক্রী নেই, ছেলেটি চুপ করে বসে থাকে; মুখখানি শুকিয়ে যায়।

ছেলেটী প্রতিদিন আসে, ওই এক জায়গায় বসে।

বাড়ীর কর্ত্তা নামকরা ডাক্তার। একদিন বিকাল বেলা কলে বেরুবার সময় ভীড় দেখে এগিয়ে আসেন, ছোকরাকে দেখে বলেন—আমার রোয়াকটা দোকান নয়, উঠে যা এখান থেকে,—

ছেলেটী ভয়ে ভয়ে ধামাটি মাথার উপর তুলে নেয়, বললে—আজ্ঞে যাচ্ছি...

ডাক্তার মোটারে গিয়ে ওঠেন, ছেলেটী ধামা মাথায় নিয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। পায়ে ব্যথা হয়ে যায়, কিন্তু বিক্রী তেমন হয় না।

কাজেই ছেলেটীকে পরদিন বিকালে আবার সেই পুরাণো রোয়াকে এসে বসতে হয়।

আবার ছেলের দল ঘিরে ধরেছে, ডাক্তারও ঠিক সেই সময় বেরিয়েছেন। আর যায় কোথা! মুড়িওলার সামনে এসে বললে—তোমাকে কাল বলেছি না আমার বাড়ী নোংরা করো না।

: আজ্ঞে নোংরা তো কিছু করিনি, যাবার সময় ঝাঁট দিয়ে যাব।

: ঝাঁট দিয়ে যাব! যত জঞ্জাল সব আমার বাড়ীতে, যাও—পদাঘাতে ডাক্তার মুড়ির ধামা সরিয়ে দিলে, চারিপাশে সব ছড়িয়ে পড়লো।

—খবরদার আর এখানে বসবি না,—বলে ডাক্তার বীরদাপে মোটরে গিয়ে বসলো।

ছেলেটীর চোখে তখন জল এসে গেছে।

প্রতিবেশী একজন সহানুভূতি জানিয়ে বললে—চুপ করে ওখানে দাঁড়িয়ে থেকে কি হবে, মুড়িগুলো সব কুড়িয়ে নে—

—দরকার নেই...

—আরে বড়লোকেরা চিরকালই অমন হয়, গরীব হলে সব সইতে হয়...

—আচ্ছা আমিও একদিন বড়লোক হব!

প্রতিবেশী সেদিন হয়তো ভাবতেও পারেনি যে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর পরে এই ছেলেটি সত্য সত্যই একজন নামকরা লোক হবে এবং এক জনসভার মাঝে ওই ডাক্তারের অহঙ্কারে আঘাত করবে?

ছেলেটি কে জান? কর্মবীর আলামোহন দাশ! অদম্য অধ্যবসায়ের ফলে তিনি আজ ব্যাংক, পাটকল, যন্ত্রপাতির কারখানা প্রভৃতি বহু প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার। হাওড়া অঞ্চলে এঁর বাসস্থানের চারিপাশ ঘিরে এক নতুন নগরীর পত্তন হয়েছে—দাশনগর। অতি সাধারণ মাহিষ্য ঘরে জন্মে, ছাত্রবৃত্তি পর্য্যন্ত পড়াশুনা সম্বল করে, একজন বাঙালী কি অসাধ্য সাধন করতে পারে এঁর জীবনই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এঁর আদর্শ সামনে রেখে বাঙালী-ছেলেরা কি আজকের দিনে ত্রিশটাকার চাকরীর উমেদারী ছাড়তে পারবে না?

খেলার মাঠে

শ্রীউমেশ মল্লিক, বি, এ,

বঙ্গীয় মহিলা স্পোর্টস এসোসিয়েশনের প্রথম বার্ষিক অনুষ্ঠানে বাঙ্গালী মেয়েদের অসাফল্যই বিশেষ পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। বিশেষ করে বালিকা বিদ্যালয় নির্দ্ধারিত বিষয়গুলিতে কোন বাঙ্গালী মেয়েই কোন বিষয়ে শীর্ষ স্থান অধিকার করতে পারেনি। কেবল মাত্র ১০০ মিঃ দৌড়ে এবং হাইজাম্পে কুমারী পদ্মা দত্ত ২য় স্থান ও ৮০০ মিঃ ভ্রমণে যূথিকা বড়াল ২য় স্থান লাভ করে। সর্ব্ব সাধারণ বিষয়ে ব্যালেন্স রেস ও ১৫০ মিঃ হ্যাণ্ডীক্যাপে যথাক্রমে প্রতিমা রায় ও গৌরী ঘোষ ১ম স্থান সংগ্রহ করেন এবং কুমারী কণিকা ঘোষ ব্যালেন্স রেসে ২য় স্থান লাভ করেন। উপরোক্ত বাঙ্গালী মেয়েরা ব্যতীত অন্য কোন বাঙ্গালী মেয়ে শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিতে পারেন নি। অন্যান্য স্পোর্টসের মত ওয়েষ্ট ক্লাব এক্ষেত্রেও বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছে। মিসেস এডা জনষ্টন সর্ব্বসাধারণের বিষয়ে ১৫ পয়েণ্ট সংগ্রহ করেন এবং মিস ডুলি চেক বিদ্যালয়সমূহের বিষয়গুলিতে ২০ পঃ সংগ্রহ করে বিভিন্ন বিভাগে ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়নসিপ লাভ করেন।

* * *

রেডক্রশের সাহায্য উপলক্ষে বরোদায় একটি তীব্র প্রতিদ্বন্দীতামূলক ক্রিকেট প্রতিযোগিতা গত তিনদিন ধরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ভারতের প্রায় সমস্ত বাছাই খেলোয়াড়রা যোগদান করায় অনুষ্ঠানটি আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। প্রোঃ দেওধরের দ্বাদশ বনাম লেঃ কঃ সি, কে, নাইডুর দলের মধ্যে প্রতিযোগিতা হচ্ছে। দেওধর দল ১ম ইঃ ৪৪৭ রাণ সংগ্রহ করে। এই রাণ সংগ্রহ করায় দলের হাজারীর ৭৪ ও পরাণজীর ৮২ রাণ বিশেষ মূল্যবান হয়। লেঃ কঃ নাইডুর দ্বাদশ দলের ৫২০ রাণ হয়। জি কিষণচাঁদ ১৭৪ রাণ তুলেও "নট আউট" থাকেন। সি এস নাইডুও ১০৪ রাণ করেন।

রেড ক্রশের সাহায্য-কল্পে বোম্বাই ব্রেবর্ণ ষ্টেডিয়ামে একটি নিঃ ভাঃ কুস্তি প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়েছে। ভারতের প্রসিদ্ধ মল্লবীরেরা যোগদান করায় অর্থ-প্রাপ্তির দিক দিয়ে উদযোগীরা লাভবান হবেন তা বলা বাহুল্য। গামা, ইমামবক্স প্রভৃতি প্রদর্শনী কুস্তি দেখান। তাছাড়া কিকর সিং (যার বক্ষের বেড় ৮০ ইঞ্চি এবং দৈহিক ওজন ৭ মণ ছিল) এর পুত্র অর্জ্জুন সিং, হামিদা, গুঙ্গা, যোসী প্রভৃতি বহু যোদ্ধারা যোগদান করেছেন। ইমাম বক্সের পুত্র বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেয়। এর নাম হুসেন বক্স।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কুস্তি প্রতিযোগিতা সিমলা ব্যায়াম সমিতিতে আরম্ভ হয়েছে।

* * *

পৃথিবীর ফেদারওয়েট চ্যাম্পিয়ানসিপ এ বৎসরে সাল বারটোলা ফিল টেরেনোভকে ১৫ রাউণ্ডের প্রতিযোগিতায় পয়েণ্টসে পরাভূত করে পেয়েছে।

পৃথিবীর লাইটওয়েট চ্যাম্পিয়ানসিপে জুয়ান জুরিটা এ্যগনটকে পরাজিত করেছে।

* * *

ভারতীয় টেনিসের উন্নতিকল্পে যে সমিতি সম্প্রতি গড়ে উঠেছে শীঘ্রই এঁদের পরিচালিত একটি বিশেষ টেনিস খেলার ব্যবস্থা হচ্ছে। এই খেলার উদ্ধৃত সমস্ত অর্থ রেডক্রশ এবং চীন রিলিফ কমিটিতে অর্পণ করা হবে। এই অনুষ্ঠানটিকে সাফল্য-মণ্ডিত করবার জন্য সুপ্রসিদ্ধ খেলোয়াড়দ্বয় বিশেষ চেষ্টা করছেন।

* * *

প্রথম বিভাগীয় হকি খেলায় গত সপ্তাহের ফলাফল :—

বৃহস্পতিবার ৯ই মার্চ্চ

মেসারার্স ২—লিলুয়া—০

শুক্রবার ১০ই মার্চ্চ

পোর্ট কমিশনার ২—ডালহৌসী—০
বি এণ্ড এ রেলওয়ে ২—গ্রীয়ার—২

শনিবার ১১ই মার্চ্চ

মহমেডান স্পোঃ ৩—মিঃ মেডিক্যাল—১
রেঞ্জার্স ২—লিলুয়া—১

সোমবার ১৩ই মার্চ্চ

কাষ্টমস ৪—রেভেরিয়ান্স—০
গ্রীয়ার স্পোঃ ২—পুলিশ—০
বি এণ্ড এ আর ৩—বি, জি প্রেস—২

মঙ্গলবার ১৪ই মার্চ্চ

ইঃ বিঃ (০) পোর্ট কমিশনার (০)
রেভেরিয়ান্স (১) পাঞ্জাব (০)

* * *

রঞ্জী ট্রফি প্রতিযোগিতার সেমি ফাইনালে উত্তর ভারত ক্রিকেট এসোসিয়েশন পশ্চিম ভারত রাজ্যদলের বিরুদ্ধে ১৭ই, ১৮ই, ১৯শে, ২০শে রাজকোটে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করবে। রামপ্রকাশ উত্তর ভারত ক্রিকেট এসোসিয়েশনের অধিনায়কত্ব করবেন। উত্তর ভারত ক্রিকেট এসোসিয়েশনের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণ :— রামপ্রকাশ, সইয়দ, আমীর ইলাহী, হাফেজ, গুল মহম্মদ, ফরবেশ, ফজল মহম্মদ, এনায়েত খাঁ, আসগার আলী, আহম্মদ খাঁ এবং বসীর। উত্তর ভারত ক্রিকেট এসোসিয়েশন ও পশ্চিম ভারত রাজ্যদলের বিজয়ী দল ফাইনালে বাঙ্গলা দেশের বিরুদ্ধে খেলবে।

নানাকথা

সান্ধ্য-সম্মিলন—

বিগত ১০ই মার্চ্চ সন্ধ্যা ৮ ঘটিকায় কলিকাতা ট্রেডিং কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর সাহিত্যবন্ধু শ্রীঅনিলকুমার দে মহাশয় তাঁহার অতিথি-বৃন্দকে 'রূপসি-টকি'তে "কিসমৎ" ছায়া-চিত্র দেখাইয়া সম্বর্দ্ধনা করেন। মিষ্টার এবং মিসেস্ এ, ডব্লিউ, মিয়োর, মিষ্টার রজার এলেরা, মিষ্টার এম, বমগার্টেন, মিষ্টার এ, বি, ক্যাটাম্যাক্, মিষ্টার এবং মিসেস্ ডব্লিউ, জি ম্যান, শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত হরেন্দ্র বসু, বি-এস-সি প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন।

রবি-বাসর

শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রচন্দ্র মজুমদারের আহ্বানে রবিবাসরের বর্ত্তমান বৎসরের ত্রিংশ অধিবেশন ৯নং মহারাজা ঠাকুর রোডে (ঢাকুরিয়া) অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র কুমার রায় 'নাটকের রূপ' বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব উৎসব

গত বুধবার ২৪শে ফাল্গুন অপরাহ্ণ ৫৷৷০ ঘটিকায় ২৫ বাগবাজার ষ্ট্রীটে সিঁথি বৈষ্ণব সম্মিলনীর উদ্যোগে শ্রীশ্রী মহাপ্রভুর আবির্ভাব উৎসবের উদ্বোধন হইয়া গিয়াছে। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমৎ রসিক মোহন বিদ্যাভূষণ মহোদয় এই সভায় পৌরহিত্য করেন। সভায় শ্রীশ্রী মহাপ্রভুর প্রেম-ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা হয় এবং বহু সুধী এই আলোচনায় যোগদান করেন।

বাণী মন্দির বালিকা বিদ্যালয়

গত রবিবার ১২ই মার্চ্চ উক্ত বিদ্যালয়ের বার্ষিক স্পোর্টস শিয়ালদহ বি এণ্ড এ, রেলওয়ে ম্যানসন ইনষ্টিট্যুট গ্রাউণ্ডে সুসম্পন্ন হইয়াছে। সভানেত্রীত্ব করেন মিসেস হামিদা মোমিন এম, এল, এ এবং পুরস্কার বিতরণ করেন তিনিই।

শুভ-বিবাহ

গত শনিবার ২৭শে ফাল্গুন হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্সের লাহোর শাখার ম্যানেজার শ্রীনীহারকুমার রায়ের কন্যা শ্রীমতী নমিতা রায়ের সহিত পাবনা নিবাসী স্বর্গীয় যোগেন্দ্রনাথ কর মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীঅমরেন্দ্র নাথ করের শুভ পরিণয় কলিকাতায় সুসম্পন্ন হইয়াছে। আমরা নব দম্পতির সর্ব্বাঙ্গীন শুভ কামনা করি।

নাটমণ্ডপ

আর একজন সহকারী পরিচালক পরিচালকের পদে উন্নীত হইলেন। ইঁহার নাম মণি ঘোষ। ইনি কুমার প্রমথেশ বড়ুয়ার সঙ্গে অনেক দিন সহকারী রূপে কার্য্য করিয়া অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন। অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশানে "সন্ধ্যা" নামক যে একখানি ছবির কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে তাহার পরিচালনা-ভার পাইয়াছেন মণিবাবু। কুমার বড়ুয়ার নির্দ্দেশে "সন্ধ্যা"র চিত্রনাট্য রচিত হইয়াছে। নতুনকে আমরা চিরদিনই স্বাগত জানাই, এক্ষেত্রেও তাহা হইতে বিরত হইব না। স্বাগতম্।

* * *

চিত্ররূপার নির্ম্মীয়মান দোভাষী ছবি "সন্ধি" দ্রুত সমাপ্তির পথে অগ্রসর হইতেছে। "সন্ধি"র ঘটনা-সংস্থান সহরে ও গ্রামে উভয় স্থানেই আছে এবং উভয় স্থানেরই বিচিত্র ও অভিনব চরিত্রের সমাবেশ ছবিখানিকে প্রচুরভাবে সমৃদ্ধিশালী করিবে। এবং এই চরিত্রগুলি যথাযথভাবে পরিচালনা করিতেছেন অপূর্ব্ব মিত্র। অহীন্দ্র চৌধুরী, বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, দেববালা, মৃণালকান্তি ঘোষ, বাংলা ও হিন্দী উভয় সংস্করণেই অভিনয় করিতেছেন। বাংলাতে সুমিত্রা দেবী নাম্নী জনৈকা নবাগতাকে দেখা যাইবে। ফণী রায়কেও বাংলা সংস্করণে দেখা যাইবে। অনিল বাগচী সঙ্গীত পরিচালনা করিতেছেন।

* * *

আশা করা যায় নিউ থিয়েটার্সের নির্ম্মীয়মান ছবি "উদয়ের পথে" এই মাসের মধ্যেই শেষ হইয়া যাইবে এবং এজন্য পরিচালক বিমল রায় বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। কয়েকদিন আগে কলিকাতার বাহিরে গিয়া তিনি কয়েকটি বহির্দৃশ্য গ্রহণ করিয়া আসিয়াছেন। ছবির নায়িকা বিনতা বসু নবাগতা হইলেও তিনি গানে ও অভিনয়ে যে রকম নৈপুণ্য দেখাইতেছেন তাহা সত্যই বিস্ময়কর। নায়কের ভূমিকায় রাধামোহন ভট্টাচার্য্যের অভিনয়েও যথেষ্ট অভিনবত্ব দেখা যাইবে বলিয়া প্রকাশ।

* * *

সুবোধ মিত্রের পরিচালনাধীনে "দুই পুরুষ" দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। কি ভাবে এক আভিজাত্যাভিমানী দাম্ভিক জমিদার তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীর ব্যক্তিত্বে ও মহত্ত্বে মুগ্ধ হইয়া পরাজয় স্বীকার করিল, তাহারই সংঘাত বহুল কাহিনী এই "দুই পুরুষ"। বদমেজাজী ও ধনগর্ব্বিত জমিদারের ভূমিকায় অহীন্দ্র চৌধুরী এবং তাঁহার পরাক্রমশালী প্রতিদ্বন্দ্বীর ভূমিকায় ছবি বিশ্বাস অভিনয় করিতেছেন।

হেমচন্দ্র তাঁহার হিন্দী ছবি "My Sister" লইয়া এখন ব্যস্ত।

* * *

সহরের সিনেমায়ঃ

চিত্রা ও নিউ সিনেমা—হাসপাতাল (৫ম সপ্তাহ)

শ্রী—শেষ-উত্তর

উত্তরা, পূরবী ও পূর্ণ—ছদ্মবেশী (৩৩শ সপ্তাহ)

গণেশ টকী—রাম-রাজ্য (৩২শ সপ্তাহ)

মিনার্ভা—শুক্রিয়া (৩য় সপ্তাহ)

চিত্রলেখা—মানময়ী গার্লস স্কুল (২য় সপ্তাহ)

সারকো'র বহু অর্থব্যয়ে নির্ম্মিত পৌরাণিক চিত্র "ভক্ত বিদুর" আগামী কল্য একযোগে আলেয়া, সিটি ও প্যারামাউন্ট সিনেমায় মুক্তিলাভ করিবে। ইহাতে স্বর্গীয় বিষ্ণুপন্ত পাগনীশ ও দুর্গাবাই খোটে অভিনয় করিয়াছেন।

দীপালীর স্বত্বাধিকারী শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত, ১২৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, দীপালী প্রেসে মুদ্রিত ও দীপালী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

প্রধান সম্পাদক—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় :: সহঃ সম্পাদক—শ্রীধীরেন্দ্রমোহন মজুমদার বি. এল.

১৬শ বর্ষ VOL. XVI. } ১০ই চৈত্র ১৩৫০ :: March 23, 1944 { ১২শ সংখ্যা No. 12

'দীপালী'র কথা

সম্প্রতি বাংলা সরকারের প্রধান প্রেস এ্যাডভাইসার মহোদয়ের দপ্তর হইতে আমরা যে নির্দ্দেশপত্র পাইয়াছি তাহার প্রতি দীপালীর গ্রাহক এজেন্ট ও বিজ্ঞাপনদাতাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। বিষয়টি জরুরী, এ সম্পর্কে সরকারী নির্দ্দেশ ও আমাদের সিদ্ধান্ত অবিলম্বে জ্ঞাপন করা প্রয়োজন, ইহা আমরা মনে করি। উপরোক্ত সরকারী নির্দ্দেশপত্রে জানান হইয়াছে যে, ১৯৪২ সালের সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ আদেশের (Newspaper Control Order 1942) ৩ (খ) বিধান অনুযায়ী "দীপালী"—"ডি" শ্রেণীর সংবাদপত্র পর্য্যায়ভুক্ত। উপরোক্ত আদেশের ৩নং আপীল অনুযায়ী এই শ্রেণীর সংবাদপত্রের বরাদ্দ পৃষ্ঠা সংখ্যা আমরা অতিক্রম করিয়াছি বলিয়া পত্রে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে দুই আনা মূল্যে আমরা "দীপালী"র ষোল পৃষ্ঠা ধার্য্য করিয়াছিলাম। উপরোক্ত পত্রে প্রকাশ, এতদ্বারা সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ আদেশের ৭নং বিধান অমান্য করা হইয়াছে। ইহা ভারতরক্ষা নিয়মাবলীর ৮১ (৪) বিধানানুযায়ী অপরাধজনক।

* * * * *

এ সম্পর্কে "দীপালী"র প্রতিনিধির সহিত বাংলা সরকারের প্রেস এ্যাডভাইসার মহোদয়ের যে মৌখিক আলাপ আলোচনা হইয়াছে তাহাতে বিষয়টি আরও পরিস্ফুট হইয়াছে। বর্ত্তমান পরিস্থিতি এই (১) দীপালীর বর্ত্তমান আকার ও দুই আনা মূল্য বজায় রাখিতে হইলে ইহার পৃষ্ঠা সংখ্যা কমাইয়া বার পৃষ্ঠায় দাঁড় করাইতে হইবে (২) দুই আনা মূল্যে বর্ত্তমান পৃষ্ঠা সংখ্যা বজায় রাখিতে হইলে "দীপালী"র আকার আরও ছোট করিতে হইবে (৩) বর্ত্তমান পৃষ্ঠা সংখ্যা ও আকার অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে অবিলম্বে মূল্য বাড়াইতে হইবে।

* * * * *

বর্ত্তমানে পত্রিকা প্রকাশ ও পরিচালনার অসুবিধা কতখানি তাহা এতদ্বারা পরিস্ফুট হইবে। ঠিক এক বৎসর পূর্ব্বে সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ আদেশ অনুযায়ী যখন আমরা এই পত্রিকার পৃষ্ঠা সংখ্যা কমাইয়া ১৬ পৃষ্ঠায় দাঁড় করাইবার সিদ্ধান্ত করি, সে সময় আমাদের একান্ত অসহায়তার কথা আমরা নিবেদন করিয়াছিলাম। আমরা জানাইয়াছিলাম যে, "দীপালী"র বিভাগীয় আলোচনার বৈচিত্র্য—যাহা দীর্ঘদিন সর্ব্বশ্রেণীর নরনারীর মনোরঞ্জন করিয়াছে—তাহা এই সরকারী আদেশের ফলে অনেকাংশে খর্ব্ব হইবে। অথচ কঠিন পরিস্থিতির কথা চিন্তা করিয়া ইহা আমাদের সহ্য করিতেই হইবে। এই পরিবর্ত্তন তৎকালে আকস্মিক হইলেও আজ আমরা আনন্দের সহিত স্বীকার করিতেছি যে, আমাদের সহৃদয় গ্রাহক এজেন্ট ও অনুগ্রাহকবর্গ সেই আবেদনে যথোপযুক্ত সাড়া দিয়াছিলেন। পত্রিকার ইতিহাসে আবার একটি নূতন অধ্যায়ের যোজনা হইতে চলিয়াছে। আমাদের

আশা আছে বর্ত্তমান অবস্থায় পরিবর্ত্তনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়া তাঁহারা আমাদের সহযোগিতা করিবেন। ১৯৪১ সালে যখন আমরা প্রথম দুই আনা মূল্য ধার্য্য করি তখন "দীপালী"র পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল চল্লিশ। বর্দ্ধিত আয়তনে "দীপালী" যাহাতে জনসেবার উপযুক্ত বাহন হইতে পারে তখন এইরূপ পরিকল্পনা আমাদের ছিল। ১৯৪২ ও ১৯৪৩ সাল আসিল। মুদ্রণোপযোগী কাগজের অভাবে ১৯৪২ সালে সর্ব্বপ্রথম নিয়ন্ত্রণ আদেশ জারী হইল। সংবাদপত্র ও পত্রিকার ইতিহাসে এই দুইটি বৎসর স্মরণীয়। নানা দিক দিয়া আসিয়াছে অভাবনীয় ক্লেশ ও উৎকণ্ঠা। কতখানি ত্যাগ স্বীকার করিয়া এদেশের পত্রিকা ও সংবাদপত্র সেবা আজ চলিতেছে তাহা কতটুকুই বা প্রকাশ করা চলে। একদিকে রহিয়াছে পত্রিকাশাসন ও নিয়ন্ত্রণের বিরাট আয়োজন, অপরদিকে রহিয়াছেন সংবাদ ও সাহিত্য রসপিপাসু নরনারী। মাঝখানে আমরা সাগরে শয্যা রচনা করিয়া দূর দিগন্তের দিকে চাহিয়া রহিয়াছি। এতখানি পরস্পর-বিরোধিতা কোন দেশে আছে কি না জানি না।

* * * *

বর্ত্তমান অবস্থা যাহা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে আমরা "দীপালী"র পৃষ্ঠা-সংখ্যা ষোল হইতে চব্বিশ পৃষ্ঠা বাড়াইয়া মূল্য দুই আনা স্থলে চার আনা ধার্য্য করিবার সিদ্ধান্তে আসিয়াছি। ইহা ছাড়া আর উপায়ান্তর নাই। চার আনা মূল্যে "দীপালী"র আট পৃষ্ঠা বাড়িবে। ইহাতে যে স্থান সঙ্কুলান হইবে "দীপালী"র পক্ষে তাহা যথেষ্ট না হইলেও রচনা ও অন্যান্য বিষয়ে কিছু বৈচিত্র্যসাধন করা যাইবে। এ বিষয়ে আমরা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিলাম। ইহা আজ ভুলিলে চলিবে না যে আমাদের পরিকল্পনা ও প্রত্যাশার অনেকখানি আজ বাহিরের উপর নির্ভর করিতেছে।

* * * *

অবিলম্বে আমাদের এই সিদ্ধান্ত যাহাতে কার্য্যে পরিণত হয় তাহার জন্য আমরা প্রস্তুত হইতেছি। এই সিদ্ধান্তের ফলে 'দীপালী'র ত্রৈমাসিক, ষাণ্মাষিক ও বার্ষিক চাঁদার হারও বর্দ্ধিত হইবে। এ সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় বিজ্ঞপ্তি পত্রিকার অন্যত্র প্রকাশিত হইল। আমরা আশা করি "দীপালী"র গ্রাহক ও বিজ্ঞাপনদাতাগণ এই পরিবর্ত্তিত ব্যবস্থা অনুমোদন করিবেন। তাঁহাদের সহযোগিতা আমাদের শক্তি বৃদ্ধি করিবে ইহা আমরা একান্তভাবে অনুভব করিতেছি।

উপন্যাসের প্রারম্ভ

(বড় গল্প)

দুই

—শ্রীশচীন্দ্রনাথ মিত্র

চায়ের টেবিলে বসে অর্দ্ধ-সিদ্ধ মুরগীর ডিমের ওপর মরিচের গুঁড়ো ছড়াতে ছড়াতে মিঃ গুপ্ত উচ্ছ্বসিত হয়ে কন্যার নিকট তাঁর নব-নিযুক্ত সেক্রেটারীর রূপ-গুণের বর্ণনা করে যাচ্ছিলেন:—"দিব্যি ছেলে, কী রূপ, প্রশস্ত ললাট, টানা টানা ভুরুর নীচে ডাগর ডাগর দুটি চোখ, খাঁড়ার মত নাক,—ছোট্ট একটুখানি গোঁফ, কী অদ্ভুত গায়ের রং,—যেন দুধে আলতায় গোলা! কি রকম লম্বা দেখেছিস? অন্ততঃ ছ' ফিট হবে,—কী বলিস? আর মাস্‌ল্‌—আমি challenge করে বলতে পারি, ও নিশ্চয়ই রোজ exercise করে! আহা-হা, বিধাতা যেন অযাচিতভাবে, অকৃপণ হাতে ওর যেখানে যেটুকু অভাব ছিল, তা পূর্ণ করে দিয়েছেন! তোকে আমি সত্যি বলছি মা,—আমার এতখানি বয়স হোল কিন্তু প্রকাশের মত অমন পুরুষোচিত রূপ আর কখনও দেখিনি! এদিকে আবার যেমন বিনয়ী তেমনি শিক্ষিত। চা খেতে ডাকলুম,—আজকালকার ছেলে,—বললে কিনা চা খাই না। বাঃ এইতো চাই......

লিলি এতক্ষণ বিরক্ত মুখে পিতার কথা শুনে যাচ্ছিল; কিন্তু আর সে সহ্য করতে পারল না; বলল: আচ্ছা বাবা,—একবার ঠকেও তোমার আকেল হোল না? মাসের মধ্যে কতবার করে সেক্রেটারী বদলাবে বলতো? জানা নেই শোনা নেই,—কতদূর পড়েছে তাও পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করলে না, শুধু রূপ নিয়ে কি ধুয়ে খাবে? এ রকম লোক নিয়ে তোমার ক'দিন কাজ চলবে? তবু রক্ষে যে advance দিয়ে বোসনি......

বাধা পড়ল। বেহারা এসে সংবাদ দিলে ঘোষ সাহেব এসেছেন। ভাবী জামাতাকে অভ্যর্থনা করবার জন্য মিঃ গুপ্ত ব্যস্ত হয়ে টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। কন্যা বাধা দিয়ে বলল: "আঃ বাবা, তুমি অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন?" পরে বেহারার উদ্দেশ্যে বলল: "এই—সাহেবকো ইধার সেলাম দেও।" বেহারা চলে গেল। কয়েক মিনিট পরে নিখুঁত সাহেবী পরিচ্ছদে রাজীবলোচন এসে ঘরে ঢুকল। মিঃ গুপ্ত অত্যন্ত কুণ্ঠিত হয়ে বললেন: "ইস্, তোমার অত্যন্ত দেরী দেখে ...ছিঃ ছিঃ ছিঃ...আমরা অত্যন্ত দুঃখিত। দেখ দেখি কাণ্ড, তোমাকে নেমন্তন্ন করে, তোমাকেই বাদ দিয়ে আমরা খেতে বসে গিয়েছি...ইস্..."

"আঃ বাবা..."

পিতাপুত্রী দুই জনেরই হাত-জোড়া—সেক্ হ্যাণ্ড করবারও উপায় নেই। রাজীবলোচন সোজা লিলির পাশে গিয়ে একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ে বলল: "মিঃ গুপ্ত, আপনিই বলেন, আমি নাকি আপনার ঘরের ছেলের মতো; কিন্তু তা সত্বেও যদি আপনি ওই রকম ভদ্রতা করতে আরম্ভ করেন, তা হলে তো আমার পক্ষে বড়ই বিপদের কথা হয়ে ওঠে।"

মিঃ গুপ্ত যেন লজ্জিত হয়ে পড়লেন।

খানসামা কয়েকখানি খাদ্যপূর্ণ প্লেট এনে রাজীবলোচনের সুমুখে টেবিলের ওপর রাখল। সে প্লেটগুলি টেনে নিয়ে খেতে আরম্ভ করল। লিলি এক স্লাইস রুটির ওপর মাখন লাগাতে লাগাতে রাজীবলোচনকে বলল: "জানো ঘোষ,—আজ সকাল বেলাতেই বাবা একজন ভাল সেক্রেটারী পেয়ে গেছে।"

এই বলে সে পিতার দিকে চেয়ে কটাক্ষ করল। কৃত্রিম বিস্ময়ে মুখ ব্যাদান করে রাজীবলোচন ইংরাজী করে বলল: "তাই নাকি? ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, এটি যেন কিছুদিন টেঁকে। নাম?"

"প্রকাশ চন্দ্র রায়।"

"কোয়ালিফিকেশন?"

"মাকাল ফল এবং চা খায় না।"

রাজীবলোচন ও লিলি দু'জনেই হেসে উঠল। মিঃ গুপ্ত কন্যার দিকে চেয়ে একটু ম্লানভাবে হেসে বললেন: "ছিঃ মা, কোন ভদ্রলোকের সম্বন্ধে না জেনে শুনে, কোনরকম অভদ্র ইঙ্গিত করতে নেই, অন্ততঃ তোমার মত লেখাপড়া জানা মেয়ের পক্ষে তা শোভা পায় না!"

রাজীবলোচনের দিকে চেয়ে বললেন: "পুরুষ মানুষ হোলেও তার পক্ষে সুন্দর চেহারা হওয়াটা নিশ্চয়ই একটা ডিস্-কোয়ালিফিকেশন নয়!" পরে উভয়কে লক্ষ্য করেই বললেন: "আর আচার্য্য রায়ের গোঁড়া ভক্ত বলে তোমরা যখন দাবী কর তখন চা খাওয়া সম্বন্ধে তোমাদের নতুন করে আর কি বলব!"

রাজীবলোচন মুখ নীচু করে চায়ের কাপে মুখ দিল। লিলি কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্য্য হয়ে পিতার দিকে চেয়ে রইল। আজ তার একুশ বছরের ওপর বয়স হোল

কিন্তু পিতাকে এ রকম দৃঢ় অথচ করুণ স্বরে কথা কইতে সে আর কখনও শোনে নি।

মিঃ গুপ্তর আত্মীয় স্বজনদের দৃঢ় বিশ্বাস যে স্ত্রী-বিয়োগের পর থেকেই তাঁর মস্তিষ্কের একটু গোলযোগ ঘটেছে। কথাটা হয়তো সত্য না হতেও পারে কিন্তু তাঁর কতকগুলি অদ্ভুত খেয়ালের সঙ্গে যাঁরা ব্যক্তিগত ভাবে পরিচিত তাঁদের মনে ওরূপ একটা ধারণা গড়ে ওঠা কিছুমাত্র বিচিত্র নয়।

মিঃ গুপ্তর অনেকগুলি খেয়ালের মধ্যে একটি হচ্ছে অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙলা এবং সংস্কৃতের মিশ্রিত ভাষায় আমাদের দেশের অধুনালুপ্ত আর্য্য-সভ্যতার স্বপক্ষে বিরাট বিরাট প্রবন্ধ সৃষ্টি করা। নিজের হাতে লেখবার ধৈর্য্য তাঁর নেই, তাই মহাকবি গিরিশচন্দ্রের অনুকরণে তিনি তাঁর বক্তব্য মুখে বলে যান এবং অপরে সেগুলি দ্রুতহস্তে লিখে নেয়; এবং এই জন্যই তাঁর সেক্রেটারীর প্রয়োজন হয়। কিন্তু বেশীর ভাগ সময়েই তাঁর বক্তব্যের সঙ্গে সেক্রেটারীর নোটগুলির কোন সামঞ্জস্য তিনি দেখতে পান না, এবং সেই কারণেই তাঁকে ঘন ঘন সেক্রেটারী বদল করতে হয়। কিন্তু এদিকে তাঁর যত উদ্ভট খেয়ালই থাক্ না কেন,—তাঁর মত অমন বিনয়ী মার্জ্জিত রুচিসম্পন্ন ভদ্রলোক আজকালকার দিনের ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যে খুব বেশী নজরে পড়ে না।

প্রকাশ তাঁর সেক্রেটারীরূপে নিযুক্ত হবার পর লিলি প্রমুখ বাড়ীর আর সকলেই মনে মনে স্থির জানত যে এ সংসারের স্বাভাবিক আইন অনুযায়ী প্রকাশের চাকরীর মেয়াদ বড় জোর পনের দিন মাত্র। কিন্তু দেখতে দেখতে দু'মাস কেটে গেল, প্রকাশকে মিঃ গুপ্ত বিতাড়িত তো করলেনই না, বরং তাকে অত্যধিক স্নেহ করতে আরম্ভ করলেন। কিছুদিন পরে এমন ঘটনাও ঘটলো যে প্রকাশের অনুরোধে তিনি তাঁর অত্যদ্ভুত মতবাদেরও কিছু কিছু অদল বদল করে ফেললেন। ব্যাপার দেখে লিলি ভয়ঙ্কর চিন্তিত হ'য়ে পড়ল।

বহুকাল পূর্ব্বের কথা—মিঃ গুপ্ত তখন সবে মাত্র প্রবন্ধ লিখতে সুরু করেছেন, সেই সময়ে শুভাকাঙ্খী কয়েক জনের প্ররোচনায় তিনি তাঁর কয়েকটি প্রবন্ধ সহরের বিভিন্ন সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকায় ছাপাবার জন্য পাঠিয়ে দেন। সাপ্তাহিক মাসিকের সম্পাদকমণ্ডলী গভীর শ্রদ্ধা সহকারে লেখাগুলি তৎক্ষণাৎ ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়ে সবিনয়ে জানান যে মিঃ গুপ্তর বহুমুখী প্রতিভা, অদ্ভুত মতবাদ এবং অপরূপ লিখন-ভঙ্গী হৃদয়ঙ্গম করবার মত শিক্ষা এদেশের লোকেরা এখনও পায় নি, সম্ভবতঃ দু'শো বছর পরে সেই শ্রেণীর শিক্ষিত লোক এদেশে জন্মালেও জন্মাতে পারে। তবে তিনি যদি চলতি ভাষায় মতবাদ সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রকার গোঁড়ামি পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিজের খরচে পুস্তকে ছাপাতে ইচ্ছা করেন তবে তাঁরা সাগ্রহে…ইত্যাদি…ইত্যাদি…

সেদিন থেকে তিনি পত্রিকায় লেখা পাঠানো বন্ধ করে দিলেন। পৈত্রিক আমলের বিরাট লাইব্রেরী ঘরটির মধ্যে স্ব-সেক্রেটারী নিজেকে বন্দী করে দিবারাত্রি পরিশ্রম করে তিনি বিরাট বিরাট প্রবন্ধ লিখে যেতে লাগলেন। নিজের একমাত্র সন্তান লিলিকে কয়েকবার তোষামোদ করে তিনি নিজের লেখা শোনাবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু যে মুহূর্ত্তে বুঝতে পারলেন কন্যাও তাঁর লেখাকে অবজ্ঞার চোখে দেখে সেইদিন থেকে তাকেও লেখা পড়ে শোনানো তিনি বন্ধ করে দিলেন। জবরদস্তীর দ্বারা তিনি কখনও কারুকে স্বমতে আনবার চেষ্টা করতেন না।

কেউই যখন তাঁর লেখার কোন মূল্য দিল না তখন তিনি নিজের লেখা নিজে পড়েই আনন্দলাভ করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু প্রকাশ আসবার পর থেকেই সব যেন আস্তে আস্তে বদলে যেতে আরম্ভ করল। মিঃ গুপ্ত তাঁর সাবেক লিখনভঙ্গী ত্যাগ করলেন; মতবাদের গোঁড়ামিও ত্যাগ করলেন এবং প্রকাশের প্রচেষ্টায় একদিন সহরের একখানি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মাসিকের পাতায় তাঁর লেখা স্থান পেল। যাদুকরের মত কোন্ সম্মোহন মন্ত্রের প্রভাবে প্রকাশ মিঃ গুপ্তের মধ্যে এতবড় একটা পরিবর্ত্তন এনে দিল লিলি তো তা ভেবেই পেল না।

লিলি যে প্রকাশের ওপর আদপেই

সন্তুষ্ট নয় এ কথা সকলেই জানত। হয়তো প্রকাশও জানতো। কিন্তু প্রকাশের প্রতি নিজের এই অকারণ বিতৃষ্ণার কথা ভেবে লিলি নিজেই মাঝে মাঝে আশ্চর্য্য হয়ে যেত। সে ভেবে পেত না, প্রকাশের অপরাধটা কোথায়! অথচ রূপবান হয়ে জন্মগ্রহণ করাটা কি নারীর কাছে পুরুষের একটা অমার্জ্জনীয় অপরাধ? কিংবা নারীর প্রতি অপরিসীম ঔদাসীন্য প্রকাশ করাটাই তার বিরক্তির কারণ? পিতার মৃদু অনুযোগের ফলে নির্জ্জনে বসে প্রকাশের প্রতি তার এই অকারণ বিরক্তির কারণ অনুসন্ধান করবার সে যথেষ্ট চেষ্টা করেছিল; তার পুরুষোচিত সৌন্দর্য্য, অপরিসীম অধ্যয়ন-স্পৃহা এবং পদমর্য্যাদানুযায়ী গাম্ভীর্য্য-পূর্ণ ভদ্র ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে হয়তো কতবার সে মনে মনে সঙ্কল্প করেছিল ভবিষ্যতে তার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করবার জন্য; কিন্তু রাজীবলোচনের অবিরাম সাহচর্য্যে এবং তীক্ষ্ণ সমালোচনার আতিশয্যে তার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত তো হোতই না, পরন্তু প্রকাশের তরফ থেকে তার সঙ্গে কোনোরূপ ঘনিষ্ঠতা করবার চেষ্টা না দেখে সে তার প্রতি আরও বিরূপ হয়ে উঠতে লাগলো।

কিন্তু একদিন তার মধ্যেও পরিবর্ত্তন এলো।

তিন

সে দিন অপরাহ্ন বেলায় দ্রুতপদে লাইব্রেরী ঘরে প্রবেশ করে অত্যন্ত বিরক্ত হ'য়ে লিলি পিতাকে বলল: "তোমায় কতবার বলেছি বাবা,—আবদুলের মত ড্রাইভার নিয়ে আমার চলবে না,—চলবে না, চলবে না,—কিন্তু তুমি আমার কোন কথা কানেই তুলতে চাও না।"

প্রকাশ এবং মিঃ গুপ্ত উভয়েই বিস্মিত হয়ে লিলির দিকে চাইলেন। লিলি পূর্ব্ববৎ বিরক্তির স্বরে বলল: "আর আধঘণ্টার মধ্যে টাউনহলে পৌছাতে না পারলে ঘোষ কি রকম offended হবে বল তো? অথচ সব জেনে শুনেও সকাল বেলায় তুমি আবদুলকে ছুটী দিয়ে বসলে? আমি এখন যাই কি করে?" মিঃ গুপ্ত কুণ্ঠিত স্বরে বললেন: "ইস্…"

আরও উত্তেজিত হয়ে উঠে লিলি বললে: "তোমার তো সম্বল ওই "ইস্"! আমি এখন যাই কি করে বল? রোজ রোজ ট্যাক্সী চড়লে ঘোষ কি ভাববে বল তো? এই তো সেদিন…"

তাকে বাধা দিয়ে মিঃ গুপ্ত প্রকাশকে বললেন: "প্রকাশ,—তুমিও তো "হিন্দু মহাসভার" মিটিং শুনতে যাবে বলছিলে, তা তুমিই লিলিকে নিয়ে গাড়ীতে যাও না কেন? তুমি তো ড্রাইভিং বেশ ভালই জান দেখলাম।"

ঈষৎ ইতঃস্তত করে কুণ্ঠার হাসি হেসে প্রকাশ বলল: "কিন্তু আমার যে লাইসেন্স নেই, যদি কিছু হয়…"

"ইস্ তাই তো…বে-আইনী…"

এমন সময়ে সরকার এসে জানালো, টেলিফোনে মিঃ গুপ্তকে কে ডাকছে। মিঃ গুপ্ত কথা শেষ না করেই দ্রুতপদে ড্রইংরুমের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করলেন।

প্রকাশ গাড়ী চালাতে জানে শুনে লিলির চোখ দুটী উজ্জল হয়ে উঠেছিল, কিন্তু পিতার মন্তব্য শুনে নিরাশ হয়ে পড়ল। মিঃ গুপ্ত প্রস্থান করবার পর লিলির ম্লান মুখের পানে চেয়ে প্রকাশ বলল: "ট্যাক্সী চড়া যদি

আপনার মনোনীত না হয়, তাহলে না হয় আমিই গাড়ী ড্রাইভ করবো'খন।"

লিলি বিস্মিত হোল, প্রকাশ আজ অবধি কখনও যেচে তার সঙ্গে কথা কয়নি! কিছুক্ষণ অবাক হয়ে তার মুখের পানে চেয়ে থেকে সে বলল: "সে কি? আমার জন্য আপনি risk করতে যাবেন কেন?"

তার কথায় ভাবে একটা যেন অভিমানের আভাষ ফুটে উঠল। মৃদু হেসে প্রকাশ বলল: "তা, আপনার জন্য না হয় একটু riskই করলাম; risk করাটাই তো জীবনের বৈচিত্র্য।"

প্রকাশের কথায় লিলি যেন তার মধ্যে একটা নতুনত্বের সন্ধান পেল। প্রকাশের আজ হোল কী? এ ধরণের কথাবার্ত্তা তার মত গম্ভীর প্রকৃতির যুবকের মুখ দিয়ে যে কোন দিন নির্গত হোতে পারে এ আশা লিলি কোন দিনও করেনি। কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে সে বলল: "হোক বৈচিত্র্য। কিন্তু আমার জন্যে আপনি risk করতে যাবেন কেন? সামান্য একটা মেয়ের জন্যে···"

সে হঠাৎ থেমে গেল। তার চোখ-মুখ আরক্ত হ'য়ে উঠতে দেখে প্রকাশ মৃদু হেসে বলল: "আপনি সামান্য কি অসামান্য সে মীমাংসা পরে করলেও চলবে। কিন্তু আমার মনিবের কন্যার সুখ-সুবিধার জন্য যদি আমাকে একটু riskই করতে হয়—তাতে তো আমার অগৌরবের কিছু নেই!"

প্রকাশের কথার সম্যক অর্থ সঠিক বুঝতে না পারলেও লিলির দৃষ্টি আবার কঠিন হ'য়ে উঠল। ঈষৎ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে সে বলল: "কোন দরকার নেই, ওটুকু কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করলেও চাকরী বজায় থাকবে'খন্।"

প্রকাশও গম্ভীর ভাব ধারণ করলো। দৃঢ়স্বরে সে বলল: "শুকনো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ছাড়াও যে আমাদের অন্য কিছু বলবার থাকতে পারে, সময় বিশেষে এ কথাটা বুঝতে না পারাটাই যে আপনাদের চরিত্রের সর্ব্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য, এ আমি জানি। কিন্তু আপনি ভুলে যাচ্ছেন মিস্ গুপ্তা—প্রয়োজনটা আপনার, আমার নয়।" এই বলে সে নিজের কাজে মনোনিবেশ করল। লিলি বিমূঢ় ভাবে তার দিকে চেয়ে রইল। লোকটা কি সৃষ্টিছাড়া? সুন্দরী তরুণীর সুমধুর সাহচর্য্যের কোন মূল্যই নেই এর কাছে? নারীর প্রতি নিদারুণ তাচ্ছিল্য প্রকাশ করাটাই কি এর জীবনের একমাত্র বৈশিষ্ট্য? নারীর নারীত্বকে পদদলিত করতে পারাটাই কি এর সকলের চেয়ে বড় গর্ব্ব? এমন আশ্চর্য্য লোক লিলি জীবনে কখনও দেখেনি। সে নিষ্পলক দৃষ্টিতে প্রকাশের দিকে চেয়ে রইল।

হঠাৎ প্রকাশ টেবিল ছেড়ে উঠে এসে একেবারে লিলির মুখোমুখী হয়ে দাঁড়ালো। তার পর মৃদুস্বরে বলল: "আমাকে ভুল বুঝবেন না মিস গুপ্তা···যান তৈরী হয়ে নিন্।"

লিলির দৃষ্টি ছিল প্রকাশের চোখের দিকে, কিন্তু প্রকাশ যখন হাস্যোজ্জ্বল মুখে তাকে প্রস্তুত হবার জন্য অনুরোধ করলো তখন তার সেই দৃষ্টির মধ্যে লিলি এমন একটা জিনিষ দেখতে পেল যা কোন নারী কোন দিনই তুচ্ছ করতে পারেনি। বোধ হয় যুগে যুগে মহাকবিরা এরই রস-মাধুর্য্য বর্ণনা করবার নিস্ফল চেষ্টা করে নীরবে শুধু অশ্রুজল ফেলে গিয়েছেন। নারীর চির-বাঞ্ছিত পুরুষের শাশ্বত দৃষ্টি! সেই রহস্যময় দৃষ্টিভঙ্গীর ভাষা বুঝতে কোন নারীর কখনও ভুল হয় নি। এরই একটা সূক্ষ্ম অনুভূতির পরশ পেয়ে নারী হয়ে ওঠে পুরুষের জীবনে রমণীয়।

লিলি হঠাৎ প্রস্থানোদ্যত হ'ল। প্রকাশ আবার ডাকল: "লিলি দেবী···"

লিলি থমকে দাঁড়াল, কিন্তু আর সে প্রকাশের দিকে চাইতে ভরসা করল না। লিলির তরফ থেকে কোনরূপ সাড়াশব্দ না পেয়ে প্রকাশ আরও এগিয়ে এসে মুখ নীচু করে লিলির মুখের পানে চাইবার চেষ্টা করল, প্রকাশের অভিপ্রায় লিলি বোধ হয় বুঝতে পেরেছিল, সে তাড়াতাড়ি মুখ ঘুরিয়ে দ্রুতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। নিমেষের জন্য প্রকাশ লিলির মুখ দেখতে পেয়েছিল, কিন্তু তার চোখে জল দেখে যতখানি বিস্মিত হওয়া উচিত ছিল তা সে হতে পারল না।

এমন সময় মিঃ গুপ্ত ব্যস্তভাবে ঘরে ঢুকে একটা কৌচের ওপর বসে পড়ে হাঁফাতে আরম্ভ করলেন। পিতাকে ব্যস্তভাবে ড্রইংরুম থেকে বেরিয়ে আসতে দেখে লিলিও তাঁর পিছন পিছন ঘরে প্রবেশ করল; এবং তাঁর চোখ মুখের অবস্থা দেখে অত্যন্ত শঙ্কিত হয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি তাঁর নিকট গিয়ে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে সে জিজ্ঞাসা করল: "কী হয়েছে বাবা? কে তোমায় ফোন করছিল?"

মিঃ গুপ্ত কন্যার প্রশ্নের কোন উত্তর দিলেন না; পূর্ব্বের মত জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলতে লাগলেন, তাঁর ভাব-ভঙ্গী দেখে লিলি নিঃসংশয়ে বুঝতে পারল যে তিনি টেলিফোনে ভীষণ কিছু একটা সংবাদ পেয়েছেন। সে ব্যাকুল ভাবে প্রকাশের
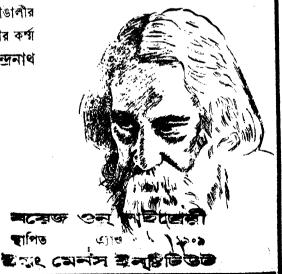
দিকে তাকাল। লিলির মনোভাব বুঝতে পেরে এইবার প্রকাশ আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করল: "কী হয়েছে কাকাবাবু?"

"বলছি…"

সজোরে একটা নিঃশ্বাস ত্যাগ করে মিঃ গুপ্ত বললেন: "আমার এ্যাটর্ণী এই মাত্র ফোন করে জানালেন যে রাজীব তার জমিদারী আবার আর একজনের কাছে বন্ধক দিয়েছে। এইবার নিয়ে দ্বিতীয়বার হ'ল।"

লিলি ভীষণ ভাবে চমকে উঠে বলল: "সে কি? ওর জমীদারী কি পূর্ব্বেও একবার বন্ধক পড়েছে নাকি? কই—আমি তো কিছু শুনিনি!"

লিলির কথার উত্তর না দিয়ে মিঃ গুপ্ত প্রকাশকে বললেন: "আমি কী করি বল তো বাবা? ওর জমিদারী যখন দ্বিতীয়বার বন্ধক পড়েছে, তখন আর যে ও খালাস করতে পারবে এমন ভরসা আমি করি নি; কিন্তু আমার যে তিরিশ হাজার টাকা ওর অফিসে খাটছে, সে টাকা আদায় করি কী করে বল দেখি? ওসব ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা আমি একবর্ণও বুঝতে পারি না, তাই সেদিন যখন ও বড় বড় আশার কথা শুনিয়ে আমাকে তিরিশ হাজার টাকার শেয়ার গছিয়ে দিয়ে গেল, তখন না বলতে পারিনি; কিন্তু আজ দেখছি আমি ভয়ঙ্কর ভুল করেছি। প্রকাশ—বাবা, টাকাটা উদ্ধার করি কী করে বল দেখি। ও যখন একবার রেস খেলতে শিখেছে, তখন ঘোড়ার মাঠ থেকে যে কিছু ফিরিয়ে আনতে পারবে এতো আমার মনে হয় না।"

রাজীবের রেস খেলার কথা শুনে লিলি একবার মুখ তুলে পিতার দিকে তাকাল, কিন্তু মুখে কিছু বলল না। প্রকাশও কোন উত্তর দিল না, গম্ভীর মুখে সম্মুখস্থ উন্মুক্ত জানালাটীর মধ্য দিয়ে রাস্তায় লোক চলাচল দেখতে লাগল। মিঃ গুপ্ত আবার বললেন: "প্রকাশ, একটা কিছু উপায় স্থির কর। এইভাবে এতগুলো টাকা নষ্ট হ'য়ে যাবে?"

এবার প্রকাশ চিন্তিত স্বরে বলল: "কিন্তু এইটাই তো স্বাভাবিক কাকাবাবু। ব্যবসা করাটা আমাদের দেশের লোকেরা যত সহজ বলে মনে করে, আসলে তো সেটা ঠিক অত সহজ নয়! কিছু না জেনে শুনে হঠাৎ ব্যবসা করতে নামলে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তো এই ফল ফলে। বিশেষতঃ মিষ্টার ঘোষকে খরচপত্র করার ব্যাপারে অত্যন্ত উদার বলেই মনে হয়। হিসেব নিকেশের কোন ধারই বোধ হয় উনি ধারেন না।"

প্রকাশের কথা শুনে ব্যাকুল হয়ে মিষ্টার গুপ্ত বললেন: "সেই জন্যেই তো আমার ভয় হয় প্রকাশ! ওদের বিয়ের পর আমার যথাসর্ব্বস্ব যখন ওর হাতে গিয়ে পড়বে, তখন কী হবে? অবর্ত্তমানে আমার বিষয় সম্পত্তিগুলোও সে বজায় রাখতে পারবে,—ওর কার্য্যকলাপ দেখে এ কথা তো আর আমার বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না।"

এমন সময়ে ঢং করে ঘড়ীতে চারটের ঘা পড়ল। লিলি চঞ্চল হয়ে ঘড়ীর দিকে তাকাল। কন্যার চঞ্চলতা লক্ষ্য করে মিষ্টার গুপ্ত বললেন: "আচ্ছা, ওসব কথা রাত্রিরে হবে'খন। তোমরা এখন মিটিং শুনতে যাও।" তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

(ক্রমশঃ)

বিজনদা'র চিঠি

আমার আদুরে ভাই-বোনেরা—

তোমরা এবারে নিশ্চয়ই খুশী হবে এবারের আসরে সবই তোমাদের লেখা দেখে।...এবারে আমাদেরই এক ভাইয়ের লেখা "একখানা চিঠি" তোমাদের উপহার দিলাম। চিঠিখানা সুন্দর ও মূল্যবান, তোমাদের প্রত্যেকের জীবনে ওটা পড়ে কাজে লাগাবার চেষ্টা করলে আমি খুব খুশী হ'বো।...প্রবেশিকা পরীক্ষা সবার শেষ হয়ে গেল তো?...এই ক'মাস ছুটি কেউ বাজে নষ্ট করো না। মনে থাকে সবার যেন যে, "সময় অমূল্য রতন...।" তোমরা স্নেহ নিও। আজ আসি, কেমন?

তোমাদের : বিজনদা'

গল্প হলেও সত্যি

—শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

মৃত্যুকাল।

তখনকার দিনে নামকরা নেতা, সাধারণ লোকে তাঁর সঙ্গে দুটো কথা বলে ধন্য হয়।

শুধু নেতাই নয়, বিলাত পর্য্যন্ত তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়েছে। সাহেবরা পর্য্যন্ত বলে যে অমন সুন্দর ইংরাজীতে বক্তৃতা করতে ইংরাজরাও পারে না, শুনতে শুনতে দেমসথেনিসের কথা মনে পড়ে।

দেমসথেনিস গ্রীসের ঐতিহাসিক বাগ্মী, লোকে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পড়েছে।

লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে—উনি ভারতের দেমসথেনিস।

গরীবের ছেলে, মামার বাড়ীতে মানুষ, পাঁচ টাকা ইস্কুলের মাইনে, তাও দয়া ক'রে কোন প্রতিবেশী দিয়ে দিতেন, শেষে কেলভিন্ কোম্পানীর কেরাণী পঁয়তাল্লিশ টাকা মাইনে।...

তখন কে ভেবেছিল, সেই কেরাণী একদিন একজন স্বনামধন্য মানুষ হবে, লাটের দরবারে পর্য্যন্ত তাঁর প্রতিপত্তি হবে অপ্রতিহত।

কিন্তু মহাকালের কাছে ব্যক্তিত্বের কোন মূল্য নেই, অমন কৃতকর্মা মানুষটি আজ মরণাপন্ন, আত্মীয় ও সুহৃদেরা উৎকণ্ঠিত মনে সমবেত হয়েছে শয্যাপাশে।

মুমূর্ষু অস্থির হয়ে পড়েছেন।

—কি কষ্ট হচ্ছে? কি চাই?

—আমি শান্তি পাচ্ছি না।

—কেন কেন, কি হোল?

—আমার ওই সিন্দুকটা খুলে ফেল দিকি, ওর ভিতরে কতকগুলো কাগজপত্র আছে, সেগুলো এখন একবার আমার দেখা দরকার!

বিষয়ী লোক, টাকা পয়সা, কি সম্পত্তি ঘটিত কোন ব্যাপারে সুস্থির হয়ে মরতে পারছেন না। তখনই সিন্দুক খুলে কাগজ পত্র বের করে দেখানো হোল: তিনি তার ভিতর থেকে একে একে খান কয়েক দলিল বেছে নিলেন।

প্রত্যেকটি এক একটি ঋণ-খৎ, টাকা ধার নিয়ে এক একজন খৎ লিখে দিয়েছে।

—সবশুদ্ধ কত টাকা হয় হিসাব করে দেখতো?

একে একে হিসাব করে দেখা গেল—চল্লিশ হাজার টাকা।

তোমাদের বিভাগ

একখানা চিঠি

—নৃপেন সেনগুপ্ত (৩৮৯)

স্নেহের ভাইটি শ্যামল :

সুদীর্ঘকাল গ্রাম্য-জীবন-যাপনের পর এই প্রথম পা বাড়ালে সহুরে জীবন-যাপনের পথে ; সহরের চাল-চলন, আবহাওয়ার সাথে আদৌ পরিচিত নও তুমি—তাই প্রতিপদে আশঙ্কা রোয়েছে পা পিছলে যাবার, আশঙ্কা রোয়েছে নিজেকে হারিয়ে ফেলবার। সে আশঙ্কা থেকে কিছুটা নিশ্চিন্ত করবার জন্যে তোমায় আজ দু'একটা কথা বোলবো—বেশ কোরে মনে রেখো কিন্তু কথাগুলো।···

আমরা নিজেই আমাদের ভাগ্য-বিধাতা—নিজের ভাগ্য আমরা নিজেই গোড়ে তুলি আমাদের কাজ-কর্ম, চলা-ফেরা ইত্যাদির ফলস্বরূপ কখনো দিনগুলো আমাদের চোখে রাঙা হোয়ে ওঠে, কখনো বা বিষাদের কালো ছায়ায় ম্লান হোয়ে যায়। এর জন্যে অন্য কাকেও দায়ী করা বা ভাগ্যের দোহাই দেওয়া আমাদের পক্ষে ভারি অন্যায়—কেন না, আমরা নিজেরাই তো আমাদের ভাগ্য গোড়ে নিয়েছি এবং সুখ-দুঃখকে জীবনের গণ্ডীর ভেতর টেনে এনেছি। সুতরাং আমাদের শান্তি-অশান্তির জন্যে একমাত্র দায়ী আমরা নিজেরাই।

বর্তমানের কর্ম থেকে প্রাণ পেয়েই ভবিষ্যতের দিনগুলো লাল বা কালো হোয়ে আমাদের ধরা দেয়—বর্তমানকে ভিত্তি কোরেই আমাদের ভবিষ্যত গোড়ে ওঠে ; বর্তমানকে যেভাবে আমরা ব্যবহার কোরবো, ভবিষ্যতও ঠিক সেই ভাবেই বর্তমানে এসে দাঁড়াবে—ঠিক তেম্নি ফল প্রসব কোরে আমাদের দিনগুলোর ওপর রাঙা তুলির রেখা এঁকে দেবে বা কালি ঢেলে দেবে।···তাই জীবনক্ষেত্রে দাঁড়াতে হোলে, নিজেকে মানুষ বলে দাবী কোরতে হোলে, জীবনের দিনগুলোকে মধুময় কোরে তুলতে হোলে বর্তমানের সদ্ব্যবহার আমাদের কোরতেই হবে।···

সহর জায়গাটা হোচ্ছে কৃত্রিমতার মূর্ত প্রতীক। জটিলতা বেড়াজালের মতো সহরকে ঘিরে রোয়েছে। সেখানে পাড়া-গাঁয়ের মৌলিকতা বা সারল্য নেই। সহর মানুষকে উন্নতির শিখর দেশে ঠেলে দিতে পারে, আবার টেনে আনতে পারে অবনতির অতল গহ্বরে। কারণ সব কিছুই সেখানে সুলভ - উন্নতির, অবনতির সকল দ্বারই সেখানে খোলা; যে যেটাতে পা বাড়ায় সেটাই তার জীবনে এসে ক্রিয়া কোরে যায়।

সহরের যেখানে-সেখানে অসংখ্য ফাঁদ

—নামগুলো সব পড়তো—

হ্যাণ্ডনোট যারা লিখে দিয়েছে একে একে তাদের নামগুলো পড়া হোল।

কর্ত্তা বললেন—ঠিক হয়েছে, ওগুলো সব এবার পুড়িয়ে ফেল দিকি—

—চল্লিশ হাজার টাকার হ্যাণ্ডনোট!

—তা হোক, ওরা সবাই আমার জানাশুনা, বিপদে পড়ে আমার কাছ থেকে টাকা ধার নিয়েছিল। আমার ছিল, আমি দিয়েছি! তারা এখনও শোধ দিতে পারে নি সেজন্য তাদেরকে এই মৃত্যুকালেও আমি ঋণী রেখে যেতে পারি না···

—কিন্তু এতোগুলো টাকা···

—টাকার চেয়ে বন্ধুত্ব বড়···

তাঁর চোখের সামনে তখনই সেই সব হ্যাণ্ডনোট পুড়িয়ে ফেলা হোল।

মুমূর্ষু এবার সুস্থির হয়ে চোখ বুজলো!

ইনি কে জান?—রামগোপাল ঘোষ।

গরীবের ছেলে, কত অধ্যবসায়ের মধ্যে তিনি ওই টাকা সঞ্চয় করেছিলেন, কিন্তু অর্থলোভ তাঁর চিত্ত জয় করতে পারেনি, এই মহানুভবতা ছিল বলেই তিনি অত বড় হতে পেরেছিলেন। এ সব মন আজকের দিনে মেলে না।

পাতা রোয়েছে। রং-বেরংয়ের পোষাক পরে মুখোস এঁটে সেগুলো এমন ভাবে সেজে-গুজে থাকে যে মানুষ—বিশেষ কোরে যারা সহরে জীবন-যাপন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ—প্রথমটায় বুঝতেই পারে না। যে সেই রঙীন মুখোসের আড়ালে কী জঘন্য ফাঁদ পাতা রোয়েছে, যার ভেতর একবার পা দিলে বেরিয়ে আসার পথ আর খুঁজে পাওয়া যায় না। যারা নতুন যায় সহরে তাদের অধিকাংশের চোখই সহরের এই কৃত্রিম রং চং দেখে সহজেই ঝলসে যায়—তখন সব কিছুই তারা ভুলে যায়—আগুপিছু না ভেবে ফাঁদের ভেতর পা দিয়ে বসে, ভাবে—এখানেই বুঝি জীবনের পরম সুখ, চরম সার্থকতা। কিন্তু ভুল তাদের ভেঙে যায় শীগ্‌গিরিই—মরু-মরীচিকার মিথ্যে ছলনা বুঝ্‌তে পারে। তখন কেবল সেই জঘন্য ফাঁদ থেকে বেরিয়ে আসতে ছট্‌ফট্‌ করে, অথচ পথ যেন খুঁজে পায় না। আর যদিও বা কেউ কেউ চলে আসতে পারে, বাইরে এসে দেখে পৃথিবী অনেক দূরে সরে গেছে—তার জীবনে জোয়ার ফুরিয়ে হয়তো বা ভাঁটার স্রোত বইছে। তখন তার থাকে শুধু দু'টো জিনিষ সম্বল—নৈরাশ্য আর অনুতাপ। এই পাথেয় নিয়েই সে মরণ পর্য্যন্ত পথটুকু এগিয়ে যায়।

যারা সহরের এই ভয়ানক ফাঁদগুলোকে এড়িয়ে চলতে পারে তারাই সত্যিকারের মানুষ হবার সুযোগ পায়। এই ফাঁদ থেকে দূরে থাকবার একমাত্র উপায় হল—সৎ-সংসর্গ, আত্ম-সংযম এবং জীবনের লক্ষ্যের প্রতি স্থির দৃষ্টি।...তোমাকে এ-কথা ভুললে চলবে না যে লক্ষ্য তোমার এখনো অনেক দূরে রয়েছে—এখন অন্য পথে পা বাড়ালে সেই লক্ষ্যে পৌঁছবার পথ ভুলে যাবে। তুমি এখন জীবন-সৌধের ভিত্তি গোড়ছো, এখন অন্য দিকে মন দিলে সেই ভিত্তি হাল্‌কা হ'য়ে যাবে; জীবন-সৌধ সেই হাল্‌কা ভিত্তিতে হয়তো স্থির থাকতে পারবে না—হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পোড়বে—সঙ্গে সঙ্গে কালো কালি গড়িয়ে পোড়বে তোমার জীবনের দিনগুলোর ওপর,—আলোর প্রবেশদ্বার হয়ে যাবে রুদ্ধ।...একথা ভুললে চোলবে না যে জীবনকে উপভোগ করবার সময় তোমার এখনো আসেনি। বর্ত্তমানের কাজ-কর্ম, শিক্ষা-দীক্ষা ইত্যাদি শুধু তোমার ভাবী জীবনের সুখ শান্তির মাল-মশলা জোগাচ্ছে—এখন শুধু চলছে তোমার জীবন-সৌধের ভেতর শান্তিতে দিন কাটাবার জন্যে ভিত্তিটাকে দৃঢ় কোরে গোড়ে নেবার চেষ্টা। ভিত্তি পাকা না কোরেই যদি তুমি সৌধে গিয়ে বাস কোরবার লোভ সামলাতে না পারো, তাহোলে তো শান্তিতে থাকতে পারবে না—ভুকম্পনের মৃদু শিহরণেই যে তোমার অপক্ক-ভিত্তি সৌধ ভেঙে পোড়ে চুরমার হ'য়ে যাবে।...

আজকাল ছেলে মেয়েদের অবনতির অন্যতম প্রধান কারণ এই যে তারা চায় জীবনকে তাড়াতাড়ি ভোগ করে ফেলতে। যৌবনে জীবনের যে অংশটাকে উপভোগ কোরলে সময়োপযোগী হবে এবং সত্যি-কারের আনন্দও পাওয়া যাবে, সেটাকে তারা চায় কৈশোরেই ভোগ কোরে ফেলতে। এরই ফলে জাতীয় মেরুদণ্ড ভেঙে পোড়েছে, জাতি ও সমাজ দিন দিন এগিয়ে যাচ্ছে অবনতির পথে।...তাই তোমায় বোলছি জীবনকে তাড়াতাড়ি ভোগ কোরবার জন্যে অস্থির হোয়ে পোড়ো না—অপেক্ষা করো ধৈর্য্য ধোরে, সময় আপনা থেকেই আসবে। সহরের পারিপার্শ্বিক অবস্থা স্বভাবতই তোমাদের মতো কিশোরদের মনে ভোগের তীব্র স্পৃহা জাগিয়ে দেবে—কিন্তু সংযমের আশ্রয়ে থেকে সেটাকে জোর পদাঘাতে দূরে ঠেলে

খেলার মাঠে

শ্রীউমেশ মল্লিক, বি, এ

আকর্ষণীয় রঞ্জী ট্রফি প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইনালে পশ্চিম ভারত রাজ্যদল উত্তরভারত ক্রিকেট এসোসিয়েশনকে সেমি-ফাইনালে পরাজিত করায় বর্ত্তমানে খেলাটি ফাইনালে সীমাবদ্ধ। পশ্চিম ভারত রাজ্যদল চার দিন ব্যাপী প্রতিদ্বন্দ্বীতায় প্রতিপক্ষ দলকে ৭ উইকেটে পরাজিত করায় ফাইনালে বাঙ্গালা দলের বিরুদ্ধে বিপক্ষতা করবার সৌভাগ্য অর্জ্জন করেছে। বিজিত দলের হাফিজ ১৪৩ রাণ করে ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দেয়। এ দলের জাফর আহম্মদও ৭৬ রাণ করে নট আউট থাকে। দ্বিতীয় ইনিংসেই এদের রাণের সমষ্টি বিশেষ উল্লেখযোগ্য হয়। প্রথম ইনিংসে মাত্র ১৪৫ রান এবং দ্বিতীয় ইং: ২৮৩ রাণ উঠে। বিজয়ী দল ১ম ইং: ২৫৪ রাণ করে এবং ২য় ইং: এ জয়লাভের জন্য ১৭৪ রাণ অবশিষ্ট থাকায় ৩ উইকেটে ১৭৫ সংগ্রহ করে। পশ্চিম ভারত রাজ্যদল এইভাবে ৭ উইকেটে জয়লাভ করেছে। আগামী ৩১শে মার্চ্চ বাঙ্গালা দলের বিরুদ্ধে পশ্চিম ভারত রাজ্যদল ফাইনালে বিরোধিতা করবে।

আগামী রঞ্জী ট্রফি প্রতিযোগিতার ফাইনালে বাঙ্গালা দলের টিম নির্ব্বাচনে নির্ব্বাচনী প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়েছে। বাঙ্গালা দল এ বৎসরে যে ভাবে অন্যান্য প্রতিযোগিতায় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে আশা করি রঞ্জী ট্রফির ফাইনালে তার ব্যতিক্রম হবে না।

*　*　*

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় হকি প্রতিযোগিতার ফাইনালে ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় নিজ মাঠে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়কে ১—০ গোলে পরাজিত করেছে।

কলিকাতা প্রথম বিভাগীয় লীগ খেলার ফলাফল :—

শুক্রবার ১৭ই মার্চ্চ :—

জাভেরিয়ান্স ৩—বি এণ্ড এ আর—
আর্ম্মেনিয়ান্স ৩—পাঞ্জাব স্পো—১

শনিবার ১৮ই মার্চ্চ—পুলিশ—৩ রেঞ্জার্স—৩

সোমবার ২০শে মার্চ্চ —

ই: বি:—২　বি এণ্ড এ আর—১
পোর্ট কমি—১　আর্ম্মেনিয়ান্স—০
গ্রীয়ার স্পো:—১　কাষ্টমস—০
জাভেরিয়ান্স—২　ডালহৌসী—০

মঙ্গলবার ২১শে মার্চ্চ—

পুলিশ—৩　বি জি প্রেস—০
মোহনবাগান—১　রেঞ্জাস—৪
ডালহৌসী—০　মেডিক্যাল—২

*　*　*

ম্যানুয়েল অরটিজ পৃথিবীর ব্যানটাম ওয়েট চ্যাম্পিয়ন মুষ্টিযোদ্ধা। সম্প্রতি স্বীয় "পদবী" বজায় রাখার জন্যে সাউথ পো নামীয় ম্যাক্সিকোবাসী মুষ্টিযোদ্ধার বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতা করে বিপক্ষকে পরাজিত করেছেন। স্বীয় সম্মানিত পদবী বজায় রাখার জন্যে ইনি ক্রমান্বয়ে ৮ বার প্রতিদ্বন্দ্বীতা করে জয়ী হলেন।

*　*　*

হকি লীগ

বিভিন্ন টিমসমূহের অবস্থা

(১৮-৩-৪৪ পর্য্যন্ত)

প্রথম ডিভিশন

	খেলা	জ	ড্র	পরা	স্ব	বি	প
মহঃ স্পোর্টিং	৮	৫	৩	০	১৭	৫	১৩
পোর্ট কমিঃ	৭	৬	১	০	১৬	২	১৩
ইষ্টবেঙ্গল	৬	৪	২	০	৭	১	১০
গ্রীয়ার	৯	৪	২	৩	১৪	১২	১০
পুলিশ	৭	৩	৩	১	১৫	৮	৯
লিলুয়া	১০	৩	৩	৪	৭	৯	৯
জেভেরিয়ান্স	৮	৪	১	৩	১০	১৩	৯
বি-জি-প্রেস	৭	৩	২	২	৮	৫	৮
মিলিঃ মেডিঃ	৭	৩	২	২	৯	৮	৮
কাষ্টমস্	৮	৩	১	৪	১৪	১৪	৭
ডালহৌসী	৯	৩	১	৫	১০	১৭	৭
বি এণ্ড এ রেল	১০	৩	১	৬	১৬	২৯	৭
মোহন বাগান	৩	২	১	০	১১	৩	৫
রেঞ্জারস	৫	২	১	২	৭	৮	৫
আরমেনিয়ানস	১২	২	১	৯	৭	১৮	৫
মেসারারস	৬	১	১	৪	২	১২	৩
পাঞ্জাব স্পোর্টস	৮	০	২	৬	২	১১	২

ডোনাল্ড বাজ আমেরিকান পেশাদার টেনিস খেলায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অর্থাৎ নং ১ বলে স্বীকৃত। সম্প্রতি জন ক্রামার নামে একজন পেশাদার টেনিস খেলোয়াড় তাকে পরাজিত করে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছেন।

*　*　*

বঙ্গীয় প্রথম প্রাদেশিক সৌখীন কুস্তি প্রতিযোগিতায় নিম্নলিখিত মল্লযোদ্ধারা শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিয়েছেন :—

৭ ষ্টোন বিভাগে :—কানাই দে
৮ ঐ ঐ :—তারাপদ চক্রবর্ত্তী
৯ ঐ ঐ :—নীলকৃষ্ণ বসু
১০ ঐ ঐ :—যতীন গুহ
১১ ঐ ঐ :—ঘনশ্যাম দাস
১২ ঐ ঐ :—অনাদি ঘোষ

বাঙ্গালা দেশে মল্লযুদ্ধের প্রসার বিশেষ প্রয়োজন। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাঙ্গালায় বিশিষ্ট মল্লযোদ্ধার অভাব বড় বেশী।

দিতে হবে—নিজেকে রাখতে হবে এসব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। ভুলে যেও না তোমার ভবিষ্যৎ, ভুলে যেওনা তোমার লক্ষ্য!... যদি না পারো এখন নিজেকে স্থির রাখতে তবে মনে করো এখানেই তোমার জীবন-পথে বিরাট ফাটল ধোরে গেছে—উন্নতির সব আশা-ভরসার মূলে কুঠারাঘাত হোয়েছে—এ-ভাঙা আর কোনোদিন জোড়া লাগবে না। যদি ভাবী জীবনের দিনগুলোকে রঙীন কল্পনার মিঠে-রঙে রাঙিয়ে থাকো তবে এখনই তার ওপর দিয়ে টেনে দাও মোটা তুলির কালো পোঁচ!

ইতি—তোমার দাদা।

নাটমণ্ডপ

পরলোকে শ্রীমতী শৈল দেবী

রেডিও ও গ্রামোফোনে শ্রীমতী শৈল দেবীর গান সকলেই শুনিয়াছেন এবং শুনিয়া আনন্দলাভ করিয়াছেন। অকস্মাৎ অকালে তাঁহার মৃত্যু-সংবাদে আমরা মর্ম্মাহত হইলাম। বহু বাণী-চিত্রে বহু অভিনেত্রীর কণ্ঠে তিনি সুর জোগাইয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ২৬ বৎসর হইয়াছিল। এই শোক সন্তপ্ত পরিবারকে আমরা আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি।

এ বৎসরের এ্যাকাডেমী পুরস্কার

সকলেই হয়ত জানেন যে হলিউডে একটি প্রতিষ্ঠান আছে যাহা প্রতি বৎসর চিত্র-নির্ম্মাণ ব্যাপারে শ্রেষ্ঠের সম্মান করেন—তাহার নাম এ্যাকাডেমী অফ মোশন পিকচার্স, আর্টস এণ্ড সায়েন্সেস। ১৯৪৩ সালের চিত্রগুলি হইতে নিম্নলিখিত ছবি এবং ব্যক্তিবর্গ স্ব স্ব বিভাগে শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হইয়া পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন :

শ্রেষ্ঠ ছবি—CASABLANCA.

শ্রেষ্ঠ নট—পল লুকাস (The Watch On The Rhine চিত্রে অভিনয়ের জন্য)।

শ্রেষ্ঠ নটী—জেনিফার জোনস্ (Song Of Bernadette চিত্রে অভিনয়ের জন্য)।

শ্রেষ্ঠ পরিচালক—মাইকেল কার্টিজ (Casablanca)।

শ্রেষ্ঠ ডকুমেণ্টারী—Desert Victory

শ্রেষ্ঠ গায়িকা—এ্যালিস ফে (Hello, Frisco, Hello)।

শ্রেষ্ঠ আলোকচিত্র ও শব্দ-নিয়ন্ত্রণ—(Crash Dive)।

"Song Of Bernadette" ছাড়া সব ছবিগুলিই এদেশে মুক্তিলাভ করিয়াছে।

সিনেমা ও উদয়শঙ্কর

পাঠক পাঠিকাগণের স্মরণ থাকিতে পারে যে কিছুদিন পূর্ব্বে উদয়শঙ্কর প্রভাত ফিল্মের সহিত একটি নৃত্যবহুল ছবির জন্য চুক্তিবদ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়া পত্র পত্রিকাদিতে যথেষ্ট আলোচনা হইয়াছিল। তারপর শঙ্কর কোন একটি কাগজের প্রতিনিধিকে বলেন যে যুদ্ধ শেষ না হইলে তাঁহার পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করা সম্ভবপর হইবে না। সম্প্রতি তিনি একটি বোম্বায়ের প্রযোজকের প্রস্তাব প্রত্যাখান করিয়াছেন—ইহাতে উক্ত প্রযোজক পারিশ্রমিকের জন্য ব্ল্যাঙ্ক-চেক সই করিতে প্রস্তুত ছিলেন।

এখন আবার সংবাদে প্রকাশ যে আগামী বৎসরের জন্য আলমোরায় কালচার সেণ্টারের কার্য্যকলাপ বন্ধ থাকিবে এবং ইতিমধ্যেই তিনি কয়েকটি চিত্রনির্ম্মাতার সহিত কথাবার্ত্তা চালাইতেছেন।

সহরের সিনেমায়

রূপবাণীতে "শহর থেকে দূরে" ১৩শ সপ্তাহে পড়িল এবং ১ম ১১ সপ্তাহে দেড় লক্ষাধিক টাকার টিকিট বিক্রয় হইয়াছে। প্যারামাউণ্ট, আলেয়া ও সিটি সিনেমায় "মহাত্মা বিদুর" ৪র্থ সপ্তাহে পড়িল। গণেশে "রাম-রাজ্য" ৩৩শ সপ্তাহে পড়িল। মিনার্ভা সিনেমায় "শুক্রিয়া" ৪র্থ সপ্তাহেও প্রচুর দর্শক আকর্ষণ করিতেছে।

নানাকথা
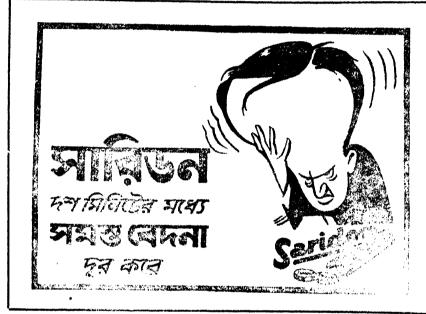
মিতালী ক্লাব—

উপরোক্ত ক্লাবের কর্ত্তৃপক্ষ সুকবি বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সুবিখ্যাত উপন্যাস "সুন্দরী"র নাট্যরূপ "স্বামীর ভিটা" শীঘ্রই মঞ্চস্থ করিবেন বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 'স্বামীর ভিটা'র পরিচালনা করিবেন জনপ্রিয় সৌখিন অভিনেতা শ্রীযুক্ত নীলমণি রায়। নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণ পরিচালনাও অভিনয়ে সাহায্য করিবেন: শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র নাথ মিত্র (যিনি শ্রীরঙ্গম-এ 'জীবন রঙ্গ' নাটকে শচীনের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন), শ্রীতুষার বন্দোপাধ্যায়, শ্রীসত্য দত্ত, শ্রীঅনাথ নাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীনগেন্দ্র নাথ ঘোষ, শ্রীযুগল কিশোর ক্ষেত্রী ও শ্রীসন্তোষ কুমার মল্লিক।

বাটানগরে নাটকাভিনয়

বিগত ২৯শে ফেব্রুয়ারী বাটানগরে এ্যামেচার প্লেয়াস দ্বিজেন্দ্রলালের 'পরপারে' অভিনয় করেন। অভিনয়ে সংগৃহীত অর্থ হইতে দুইশত টাকা স্থানীয় রিলিফ সেণ্টারে দুঃস্থদের সেবার জন্য দান করা হইয়াছে।

অভিনয় খুব উচ্চাঙ্গের হইয়াছিল। বিশ্বেশ্বরের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত ভোলানাথ দে প্রশংসনীয় অভিনয় করেন। অন্যান্য ভূমিকাগুলিও সুঅভিনীত হওয়ায় সমগ্র নাটকটি বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছিল।

অল বেঙ্গল কালচারাল এসোসিয়েশান

গত ৯ই মার্চ্চ দোলপূর্ণিমার দিন শ্রীযুক্ত গুরুপদ হালদার মহাশয়ের ৪৭নং হালদার পাড়া রোডস্থ 'দর্শনাগার' ভবনে 'অল বেঙ্গল কালচারাল এসোসিয়েশানের' উদ্যোগে পূর্ণিমা সম্মিলনীর' চতুর্থ অধিবেশন সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল মহাশয় সভাপতিত্ব করেন।

অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে কুমারী অশোকা ও শ্রীযুক্ত অজিত কুমারের পরিচালনায় কুমারী অশোকা, নমিতা ও বাণী হালদার, রমা ও মীরা ব্যানার্জি এবং শ্রীমান ধীরেন ও সোমেন ব্যানার্জির সমবেত কণ্ঠে 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতটি গীত হয়। কবিগুরুর 'অভিসার' কবিতাটি ফণী ঘোষ আবৃত্তি করেন। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের 'হোলি কথা' ও সুখেন্দু গোস্বামী, অনিল দাস, বিমলভূষণ, হেমন্ত মুখার্জি, সমর গুপ্ত, শৈলেন ভড় ও নিরঞ্জন বাবুর সুললিত কণ্ঠ সঙ্গীত রমণী ঘোষালের কৌতুককথা, বরাহ মারার শব্দানুকরণ, অজিত বসু ও গৌর গোস্বামীর বাঁশী ও ম্যাণ্ডোলা সমবেত ভদ্রমণ্ডলীকে যথেষ্ট আনন্দ দান করিয়াছিল। তবলা সঙ্গত করেন দুর্গা মিশ্র।

সঙ্গীতে ছাত্রের কৃতিত্ব

আশুতোষ কলেজের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র কুমার প্রদ্যোৎনারায়ণ গত তিন

বৎসর যাবৎ আন্তঃকলেজ সঙ্গীত প্রতিযোগীতায় ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়নসিপ লাভ করিয়া আসিতেছেন।

এই বৎসর তিনি চ্যাম্পিয়ানসিপ লাভ করিয়া মহারাজা যোগীন্দ্র নাথ রায় (মাচের) কর্তৃক প্রদত্ত স্বর্ণ পদক লাভ করিয়াছেন। ইনি শ্রীযুক্ত সুখেন্দু গোস্বামীর ছাত্র। আমরা এই উদীয়মান গায়কের উন্নতি কামনা করি।

সঙ্গীত জলসা

গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় কুমারসিং হলে (৪৬ ইণ্ডিয়ান মিরর ষ্ট্রীট) শ্রীযুক্ত সুধীন দত্তের উদ্যোগে একটি জলসার বন্দোবস্ত হয়। শ্রীতিমির বরণ ভট্টাচার্য্যের বাদ্য ও শান্তিদেব ঘোষের গান এই অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ হয়। পরে অভ্যাগতদের জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়। সুধীনবাবুর আতিথেয়তায় সকলে মুগ্ধ হন।

শুভ বিবাহ

গত ১০ই মার্চ্চ ৺সুধীন্দ্র নাথ ভঞ্জের জ্যেষ্ঠ পুত্র সুলেখক শ্রীসরোজেন্দ্র ভঞ্জের সহিত শ্রীযুক্ত বিজয়েন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যার শুভ পরিণয় হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষ্যে ১৮ই মার্চ্চ ১০ রঘুনাথ চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীটে প্রীতি-ভোজের আয়োজন ছিল। আমরা নব দম্পতীর সর্ব্বাঙ্গীন শুভ কামনা করি।

দীপালীর স্বত্বাধিকারী শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত, ১২৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, দীপালী প্রেসে মুদ্রিত ও দীপালী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

প্রধান সম্পাদক—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় :: সহঃ সম্পাদক—শ্রীধীরেন্দ্রমোহন মজুমদার বি. এল.

১৬শ বর্ষ VOL. XVI. } ১৭ই চৈত্র ১৩৫০ :: March 30, 1944 { ১৩শ সংখ্যা No. 13

আলোচনী

কলিকাতা কর্পোরেশনের নির্ব্বাচন-পর্ব্ব শেষ হইয়াছে। এবার জনসাধারণের মনে কোন প্রকার উৎসাহ না থাকিলেও এক শ্রেণীর দালাল ও নির্ব্বাচনের উমেদারগণের আগ্রহের অভাব ছিল না। কর্পোরেশনের মধুভাণ্ডার হয়তো আজও তেমনি সরস মাধুর্য্যে টলটল করিতেছে। আমরা বাহিরের লোক জানিব কেমন করিয়া? কিন্তু দীর্ঘদিন ধরিয়া ক্রমাগত লুঠতরাজ হইয়াও সেই সম্পদের আজও যে কিছু অবশিষ্ট আছে ইহাই তাজ্জবের কথা। এবার বহু নূতন মক্ষিকারও আমদানী হইয়াছিল। ইহাদের কুলশীল পরিচয় কি সে প্রশ্ন অবান্তর। পোষ্টারে বিজ্ঞাপনে ইহাদের জনসেবার আগ্রহ কতখানি তাহা বাহির করা হইয়াছিল। কর্পোরেশনে দীর্ঘকাল কাউন্সিলারী করিয়া যাঁহারা বাস্তু শ্রেণীতে পরিণত হইয়াছেন, তাঁহারা এতখানি বেহায়া হইতে পারেন নাই। ইহাদের সাধাসিধা পোষ্টারই দেখিয়াছি। গত সপ্তাহ দু'য়েক ধরিয়া সেই পুরাতন গয় গবাক্ষের দল মানুষকে স্বস্তিতে থাকিতে দেয় নাই। ভোটারদের পশ্চাতে এবং অন্তঃপুরেও মেয়ে দালাল লেলাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। আজ সহরের মানুষ বহু উৎপাৎ সহিয়া কতখানি মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে তাহার দু' একটি দৃষ্টান্ত চাক্ষুষ করিয়াছি। সেদিন দেখিলাম পল্লীর একটি পরিচিত ভদ্রলোকের মাথায় যেন খুন চাপিয়া গিয়াছে। ভদ্রলোক ঠাণ্ডা প্রকৃতির মানুষ। একটি ভোটসাধিকা না বলিয়া কহিয়া তাঁহার অন্তঃপুরে ঢুকিয়াছিলেন, ইহা লইয়া স্ত্রীলোকটির সহিত বচসা চলিতেছে দেখিলাম। শেষ পর্য্যন্ত হয়তো একটা ফৌজদারীই হইয়া যাইত যদি না অকুস্থলে বাবু কাউন্সিলারটির আবির্ভাব হইত। এই ধরণের vulgarity আজও চলিতেছে।

• • • • •

তবে এই শ্রেণীর জনসেবার উমেদারেরা একটা সামাজিক কর্ত্তব্য পালন করিতেছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। যখন বেকার সমস্যা প্রবল ছিল তখন দেখিয়াছি পল্লীতে পল্লীতে কেলোভুলোর দল বিঁড়ি ফুঁকিয়া সিনেমার গান গাহিয়া ভদ্রলোকের বাড়ীর আনাচে কানাচে ঘুরিয়া ও সাঁকোয় জটলা করিয়া দিন কাটাইয়াছে। এই সকল কেলো ভুলোরা A. R. P. Service-এর কল্যাণে পাড়া হইতে উজাড় হইয়াছে সত্য, তথাপি যাহারা অবশিষ্ট ছিল তাহাদের সংখ্যাও নগণ্য ছিল না। প্রতি পল্লীতেই হবু কাউন্সিলারের দল ইহাদের কাজে লাগাইয়াছেন। কিঞ্চিৎ অর্থযোগ ইহাতে হইবে। তাহাই বা মন্দ কি! ভোটের ফলাফল যাহাই হউক না তাহা লইয়া করদাতাদের এবার বিশেষ মাথা ব্যথা নাই। Augean Stable সাফ করিবার মত নির্লোভ কোন মহাপুরুষের আজও সাক্ষাৎ পাই নাই। ভোটযুদ্ধ শেষ হইল। কয়েক বৎসরের মত নিশ্চিন্ত হইয়া যাঁহারা কর্পোরেশনে প্রবেশ করিলেন দেশসেবার "সুবর্ণ" সুযোগ তাঁহারা লাভ করুন

ইহা কামনা করি। কাল পূর্ণ হইলে আবার আপনাদের সাক্ষাৎ মিলিবে।

* * *

কলিকাতায় কয়লা কেরোসিন এবং লবণেরও অভাব হইয়াছে। পল্লী অঞ্চলের তো কথাই নাই, বহুস্থানে লবণ একেবারে দুর্ঘট ইহা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে রেশন প্রথায় চাউল নামধেয় যে বস্তু পয়সা দিয়া মানুষ কিনিয়া খাইতেছে সে কথা নাই তুলিলাম। কিন্তু সেই অখাদ্য ফুটাইয়া যে মানুষ কোনপ্রকারে গলাধঃকরণ করিবে তাহারও আজ উপায় দেখিতেছি না। বর্ত্তমানে এই অখাদ্য চাউল বেচিয়া বাংলা সরকার কি পরিমাণ লাভ করিতেছেন তাহা দুর্ভাগা জনসাধারণকে জানাইলে তাহারা কৃতার্থ হইবে। বাংলায় যখন মানুষ না খাইয়া মরিতেছিল তখন পাঞ্জাব হইতে সস্তায় গম কিনিয়া মোটা লাভে ছাড়িয়া ইহারা যে লাভ করিয়াছিলেন তাহা বেশীদিনের কথা নয়। মানুষ রাতারাতি বদলায় না। গত বৎসরের শোচনীয় অবস্থার জন্য যাঁহারা দায়ী সেই সব মহারথেরা আজও রহিয়াছেন। যে Mal-administration বা কুশাসন গত বৎসরের বিপর্য্যয়কে আহ্বান করিয়া আনিয়াছিল তাহার জড় আজও মরে নাই। অন্ততঃ গত ২৩শে মার্চ্চের এসেম্বলি বক্তৃতা হইতে তাহাই মনে হইবে।

* * *

গত ২৩শে মার্চ্চ পরিষদে Civil Supply বিভাগের কার্য্যকলাপ লইয়া যে বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে তাহা হইতে এই বিভাগের বহু গলদের সন্ধান জনসাধারণের গোচর হইবে। বহু বক্তা বলিয়াছেন, ইহাদের কোন পরিকল্পনা নাই। প্রতিদিন যে সকল ফতোয়া ইহারা বাহির করিতেছেন, তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার মত ব্যবস্থা ও যোগ্যতাও ইহাদের নাই। মিঃ কেনেডি (একজন ইউরোপীয় সদস্য) বলিয়াছেন যে, কর্ত্তৃপক্ষের ধারণা আদেশ জারী করিতে পারিলেই কার্য্য শেষ হইল। সত্যকারের কতটুকু কি হইল ইহা দেখিবার প্রয়োজন নাই। বর্ত্তমানে কেবল বিজ্ঞাপন এবং প্রচারকার্য্যের সাহায্যে ইহারা কর্ম্মতৎপরতার পরিচয় দিতেছেন। রেশনিং-এর ফলে জনসাধারণের মধ্যে যে নূতন সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে সে বিষয়ে ইহাদের দৃষ্টিহীনতা আজ চরমে উঠিয়াছে। মিঃ কেনেডি বলিয়াছেন, গভর্ণমেণ্টের কতকগুলি বিজ্ঞাপন হইতে জানা যায় যে, তাঁহারা তাঁহাদের মজুদ খাদ্যশস্যের ষ্টক বিক্রয় করিয়া ফেলিতে চান। এজন্য টেণ্ডারও আহ্বান করা হইয়াছে। ইহা হইতে বোঝা যায় মনুষ্যের অখাদ্য বহু শস্য ইহারা ক্রয় করিয়াছিলেন। নানা কারণে এখন তাহা বিক্রয় করিয়া ফেলিতে বাধ্য হইতেছেন। সদস্য মহোদয় বলিয়াছেন, ইহা বাজারে বিক্রয় করিয়া গবর্ণমেণ্ট ভেজালের সুবিধা করিয়া দিতেছেন। পশুর খাদ্যের জন্য এই নিকৃষ্ট খাদ্যশস্য ব্যবহার করা চলিত, ইহা তিনি বলিয়াছেন। আমরা জানি রেশনিং-এর এই কয়েক সপ্তাহে বাংলা সরকার কলিকাতার মানুষের উপর দিয়া পরীক্ষা কার্য্যটা চালাইয়া লইতেছেন।

* * *

"দীপালী"র কলেবর ও মূল্য বৃদ্ধি হইবে ইহা গত সংখ্যায় আমরা জানাইয়াছি। এ সম্পর্কে বার্ষিক ও ষাণ্মাসিক বক্রী দক্ষিণা যাঁহার যাহা দেয় তাহা অনুগ্রহ করিয়া পাঠাইবেন। গত সংখ্যার বিজ্ঞপ্তি পাঠ করিয়া অনেকে আমাদিগকে পত্র লিখিয়াছেন। মৌখিক বহু আশ্বাস লাভ করিয়াছি। তাঁহাদের শুভেচ্ছা ও উপদেশ বহুমানে মাথায় তুলিয়া লইলাম, এই সুযোগে তাহা আমরা জ্ঞাপন করিতেছি।

উপন্যাসের প্রারম্ভ

(বড় গল্প)

—শ্রীশচীন্দ্রনাথ মিত্র

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

চার

লিলি তার ভ্যানিটী ব্যাগটি হাতে করে গাড়ী বারান্দার তলায় সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল। প্রকাশ গেরাজ থেকে গাড়ীটী বার করে লিলির সামনে এসে, হাত বাড়িয়ে পিছনের সীটের দরজাটী খুলে দিল। লিলি এগিয়ে এসে ফুট বোর্ডের ওপর পা দিয়ে গাড়ীতে উঠতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেল। মুহূর্ত্তকাল মুখ নীচু করে কী যেন ভেবে নিলে সে; তারপর মুখ চোখ লাল করে পিছনের সীটের দরজাটী বন্ধ করে দিয়ে সুমুখের সীটের দরজাটী খুলে, প্রকাশের পাশে গিয়ে বসল। গাড়ী ছেড়ে দিল।

কিছুদূর যাবার পর প্রকাশ আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করল: "পেছনের সীটে না বসে হঠাৎ এখানে এসে বসলেন যে?"

লিলি কোন উত্তর দিল না, মুখ ফিরিয়ে রাস্তার দিকে চেয়ে রইল। আড় চোখে তার দিকে চেয়ে প্রকাশ আবার বলল: "রাস্তায় পরিচিত কেউ দেখলে, হয়ত সন্দেহ করতে পারে যে……"

চকিতে লিলি প্রকাশের দিকে চেয়ে ভ্রুকুঞ্চিত করল। পূর্ব্ব কথার জের টেনে প্রকাশ বলল: "যে আমি আপনার কোন নিকট আত্মীয়।"

লিলি যেন নিশ্চিন্ত হল। প্রকাশের কথা বলবার সূচনা দেখে প্রথমে সে সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছিল, এখন নিশ্চিন্ত হয়ে ওষ্ঠ কুঞ্চিত করে অবজ্ঞার স্বরে বলল: "বেশ তো কী হয়েছে তাতে?"

"হয়তো ঘোষ সাহেব দেখলে রাগ করতে পারেন…"

লিলির মুখে একটা বিরক্তির রেখা ফুটে উঠল। গম্ভীর মুখে জিজ্ঞাসা করল: "কেন?"

"এই আমার পাশে বসে যাচ্ছেন বলে। হাজার হলেও আমি আপনাদের চাকর, এ ছাড়া অন্য পরিচয় তো আমার নেই।"

লিলি প্রকাশের মুখের ওপর থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে আবার রাস্তার দিকে চাইল। কিছুক্ষণ পরে পূর্ব্বের মতো গম্ভীর স্বরে বলল: "আছে আর একটা পরিচয়…"

প্রকাশ সবিস্ময়ে লিলির দিকে তাকাল। তার চোখে মুখে ফুটে উঠল একটা সংশয়ের দৃষ্টি; লিলি এবার কী বলে বসে!"

"আপনি শিক্ষিত ভদ্রলোক এবং আমাদের পরিবারের একজন শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু।"

এলগিন রোডের মোড়ে এসে তাদের থামতে হল। পুলিসে হাত দেখিয়েছিল। এই সময়ে ঈষৎ ইতস্ততঃ করে লিলি হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল: "প্রকাশবাবু, আপনি ওর কোন খবর রাখেন?"

প্রকাশ বিস্মিত হয়ে লিলির দিকে তাকাল, বলল: "কার সম্বন্ধে? মিষ্টার ঘোষের?"

: "হ্যাঁ……"

"বিশেষ কিছু রাখি না, কেন বলুন তো?"

"না—এই জিজ্ঞাসা করছিলাম যে… সে…"

সে কথাটা সম্পূর্ণ করতে পারল না, তার সঙ্কোচ দেখে প্রকাশ বলল: "কী বলছিলেন বলুন। অবশ্য আমাকে যদি আপনার বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি না হয়…"

বাধা দিয়ে ব্যস্ত হয়ে লিলি বলল: "না না, আমি জিজ্ঞাসা করছিলাম, ও এত টাকা নষ্ট করে কিসে, আপনি জানেন? বাবা বললেও আমার কিন্তু বিশ্বাস হয় না যে ও রেস খেলে। তাহলে এতদিনেও আমি জানতে পারতাম না—আপনি কিছু জানেন প্রকাশবাবু? ও কি সত্যিই রেস খেলে?"

এই সময়ে পুলিশ হাত নামিয়ে নিল; প্রকাশ গাড়ী ছেড়ে দিল। কিন্তু লিলির কথা শুনে তার মুখটা গম্ভীর হয়ে উঠেছিল, সে তৎক্ষণাৎ লিলির কথায় জবাব দিল না। নীরব দেখে লিলি আবার জিজ্ঞাসা করল: "কথা কইছেন না যে?"

প্রকাশ এবার উত্তর দিল। অত্যন্ত অসহায় ভাবে মুখ কাঁচুমাচু করে সে বললে: আমাকে মাফ্ করবেন লিলি দেবী, আপনার ভাবী স্বামী সম্বন্ধে আমি কোন রকম আলোচনা করতে ইচ্ছুক নই।"

এর পরে আর এ সম্বন্ধে কোন আলোচনা করা লিলির মতো শিক্ষিতা মেয়ের পক্ষে স্বাভাবিক নয়। কিন্তু সে তীব্র ঔৎসুক্য-কে দমন করতে সক্ষম হোল না। ব্যাকুল হয়ে সে বলল: "কিন্তু আপনি তো আমার শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু……"

"কিন্তু কারুর চরিত্র সম্বন্ধে কোন রকম বিরুদ্ধ আলোচনা করা যে উচিৎ নয় লিলি দেবী, উচিৎ কী?"

বিস্ফারিত নেত্রে তার দিকে চেয়ে লিলি যেন আপন মনেই বলল: "বিরুদ্ধ আলোচনা?…চরিত্র সম্বন্ধে? ওঃ তবে থাক্!"

সে আর কিছু জিজ্ঞাসা করল না। কিন্তু কে যেন তার মুখে কালী মাখিয়ে দিল। তার মুখ চোখের অবস্থা দেখে অনুশোচনায় প্রকাশের হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। রাজীবের সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে সে যদি আরও কিছু সংযমী হোত তাহলে লিলির মন অবশ্যই এতখানি দমে যেত না। কথাটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নেবার সুযোগ খুঁজতে খুঁজতে সে বলল: "আপনি… অকারণ…মানে চিন্তিত হচ্ছেন লিলি দেবী! আমার তো দৃঢ় ধারণা, যে পুরুষ আপনার মতো মেয়ের স্বামী হবে কোন রকম অমঙ্গল তার কাছে ঘেঁসবে না। ভগবান কখনও আপনার মনে দুঃখ দেবেন না।"

পার্ক ষ্ট্রীটের মোড়ে এসে—এবার আর পুলিস নয়—লাল আলো জ্বলে উঠল। প্রকাশকে আবার গাড়ী থামাতে হল। লিলি এতক্ষণ রাস্তার দিকে চেয়ে বিরসমুখে কি যেন ভাবছিল; হঠাৎ প্রকাশের দিকে মুখ ফিরিয়ে বড় করুণ ভাবে সে জিজ্ঞাসা করল: "তা হলে কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করব—উত্তর দেবেন?"

প্রকাশ লিলির মুখের দিকে চাইল। চোখ নামিয়ে নিয়ে লজ্জিত ভাবে লিলি বলল: "আমি লক্ষ্য করেছি ও গোড়া থেকেই আপনার ওপর কেমন যেন বিরূপ। কেন বলুন তো? ও কি পূর্ব্বে আপনাকে চিনতো?"

"চিনতো।"

বিস্মিত হয়ে লিলি বলল: "চিনতো কি করে? কোথায় পরিচয় হলো?" উত্তর দিতে গিয়ে প্রকাশ যেন একটু ইতস্ততঃ করল, পরে বলল: "আমি পূর্ব্বে একটী মেয়েকে পড়াতাম —তাদের বাড়ীতে।"

"মেয়েটীর নাম?"

"সুমিত্রা পুরকায়স্থ।"

"সুমিত্রা?"

তীব্র কণ্ঠে চীৎকার করে উঠেই হঠাৎ সে যেন অবসন্নের মতো সীটের উপর এলিয়ে পড়ল। ইতিমধ্যে লাল আলো নিভে গিয়ে সবুজ আলো জ্বলে উঠেছিল, পিছনের

সারবন্দী মোটরগাড়ী থেকে বিরক্তির হর্ণ গর্জ্জনের আধিক্যে ব্যতিব্যস্ত হয়ে প্রকাশ তাড়াতাড়ি গাড়ী ছেড়ে দিল। কিছুদূর অগ্রসর হবার পর জিজ্ঞাসা করল: "কী হয়েছে লিলি দেবী? ও রকম করে উঠলেন কেন? আপনি কি মেয়েটাকে চেনেন?"

"চিনি—আমরা এক কলেজেই পড়তাম।"

* * *

প্রকাশের সন্দেহটা যে অমূলক নয় সে কথা লিলি বুঝতে পারল তাদের গাড়ী যখন টাউন হলের উত্তর দিকে গিয়ে থামল। লিলির অপেক্ষায় রাজীব সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়েছিল। তাদের গাড়ী ঢুকতে দেখে সে লিলিকে অভ্যর্থনা করবার জন্য তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে হঠাৎ লিলিকে প্রকাশের পাশে বসে থাকতে দেখে ভীষণ ভাবে চমকে উঠল। রাজীবের এই ভাবান্তর প্রকাশ এবং লিলি উভয়েই লক্ষ্য করল। প্রকাশ মুখ নীচু করে বোধ হয় একটু হেসে নেবার চেষ্টা করল, কিন্তু লিলির জলদ গম্ভীর মুখের পানে চেয়ে সাহস করল না।

লিলি গাড়ী থেকে নামলে পর প্রকাশ গাড়ীটাকে একটা নিরাপদ স্থানে রেখে আসবার জন্য গিয়ারে হাত দিল। রাজীব গম্ভীরমুখে লিলির বাহুমূল আকর্ষণ করে বলল: "চল চল, মিটিং অনেকক্ষণ আরম্ভ হয়ে গিয়েছে।"

"দাঁড়াও প্রকাশবাবু আসুন……"

রাজীব তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল: "ও না হয় পরে আসবে'খন, তুমি আমার সঙ্গে চল না?" লিলি নড়ল না। তার বঙ্কিম ভ্রূযুগল অধিকতর বঙ্কিম করে বলল: "তুমি যাও—আমি প্রকাশবাবু এলেই যাচ্ছি।"

মুখ কালো করে রাজীব প্রকাশের অপেক্ষায় লিলির পাশেই দাঁড়িয়ে রইল। কিছুক্ষণ পরেই প্রকাশ এলো; তিনজনেই ভিতরে প্রবেশ করল।

পাঁচ

মিটিং শেষে গাড়ীতে ওঠবার সময়ে অনেক ইতস্ততঃ করে লিলি পিছনের সীটে রাজীবের পাশে গিয়ে বসল। রাজীবের গাড়ী কয়েকদিন পূর্ব্বে খারাপ হয়ে যাওয়াতে তাকে বাধ্য হয়েই লিলিদের গাড়ীতে উঠতে হোল।

লিলির মন অত্যন্ত খারাপ হয়ে গিয়েছিল। কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে পিতার মুখে শোনা রাজীবের বৈষয়িক গণ্ডগোলের কথা ছাড়াও তার মনের মধ্যে কাঁটার মতো খচ্ খচ্ করে আর একটী কথা ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছিল,—যে এই ভাবে পিছনের সীটে রাজীবের পাশে বসতে প্রকাশের প্রতি যেন অত্যন্ত অবজ্ঞার ভাব প্রকাশ করা হোল; তার প্রতি যেন অত্যন্ত অবিচার করা হোল। অথচ প্রকাশ যদি না আসতো তাহলে তাকে একটা ভাড়াটে ট্যাকসী চড়েই মিটিং শুনতে আসতে হ'ত।

একটা সিগারেট ধরিয়ে গাড়ীর কোনে মাথা রেখে অত্যন্ত পরিশ্রান্তের মতো রাজীব বসেছিল। হঠাৎ চমকে উঠে বললো: "ও হো-হোঃ একেবারেই ভুলে গিছ্লাম! কাল যে সুমিত্রার জন্মতিথি উৎসব, একটা Presentation কিছু চাই যে……"

লিলি কিয়ৎক্ষণ বিরক্তিপূর্ণ নয়নে রাজীবের দিকে চেয়ে রইল। তারপর নীরস কণ্ঠে বলল: "আমারও কিছু একটা দেওয়া দরকার। একটা শাড়ী…"

"শাড়ী? alright…"

পূর্ব্বের মত গাড়ীর কোণে মাথা রেখে আরাম করে বসে প্রকাশের উদ্দেশ্যে রাজীব বললে: "ড্রাইভার, গাড়ী ধরমতাল্লার দিকে ফেরাও…"

চোখ মুখ লাল করে রাজীবের দিকে চেয়ে লিলি বলল: "আঃ দেখতে পাচ্ছ না গাড়ী চালাচ্ছেন যে প্রকাশবাবু…..."

নির্ব্বিকার মুখে ধোঁয়া ছেড়ে রাজীব বলল: 'ওঃ তাই নাকি, ভুলে গিছ্লাম।" লিলি ভেবেছিল রাজীব নিশ্চয়ই প্রকাশের নিকট দুঃখ প্রকাশ করে ক্ষমা চাইবে; কিন্তু রাজীব যখন সে ধার দিয়েও গেল না তখন

মনে মনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে প্রকাশ্যে বিনীত ভাবে সে প্রকাশকে বলল: "প্রকাশ বাবু, দয়া করে একবার ধরমতলার দিকে যাবেন? আমার এক বন্ধুর জন্মদিন কাল,—একখানা শাড়ী কাল সকালবেলাতেই চাই কি না!"

এক সেকেণ্ডের জন্য পিছন দিকে মুখ ফিরিয়ে মৃদু হেসে সম্মতি জানিয়ে প্রকাশ ধর্ম্মতলার দিকে গাড়ী চালিয়ে দিল। ভিতরে বসে সিগারেট টানতে টানতে রাজীব আগামী কাল যে সুমিত্রাকে কী কী উপহার প্রদান করবে এবং তার উপহার প্রদানের অভিনবত্ব দেখে সমাজে কী রকম একটা সাড়া পড়ে যাবে অনর্গল মুখে সেই সব কথা বলে যাচ্ছিল।

হঠাৎ পুলিসে হাত দেখানোর জন্য গাড়ী ফ্রি-স্কুল ষ্ট্রীটের মোড়ে এসে দাঁড়াল। অন্যমনস্ক হয়ে নামতে গিয়ে হঠাৎ আবার বসে পড়ে অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে রাজীব প্রকাশকে বলল: ড্রাইভার—I mean প্রকাশবাবু, এখানে এলেন কেন? এখানে আসতে কে আপনাকে বলেছিল? হাজী সাহেবের শো রুমে চলুন।"

এই বলে বিরক্ত মুখে রাজীব আবার গাড়ীর কোণে আড় হয়ে পড়ল। প্রকাশ কিন্তু গাড়ী চালাল না; বিস্ফারিত নেত্রে লিলির মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। প্রকাশকে একদৃষ্টে লিলির মুখের দিকে চেয়ে থাকতে দেখে রাজীব এবার সক্রোধে ধমক দিয়ে উঠল: "কী দেখছেন হাঁ করে ওর মুখের দিকে? কথা বললে শোনেন না কেন?"

লিলির মুখের ওপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে, রাজীবের দিকে দৃকপাত মাত্র না করে প্রকাশ গাড়ী ঘুরিয়ে নিয়ে হাজী সাহেবের "শো-রুমের" দিকে চলল।

প্রকাশের প্রতি এই অদ্ভুত ব্যবহারে, দারুণ বিস্ময়ে, লিলি এতক্ষণ বিমূঢ় ভাবে রাজীবের দিকে চেয়েছিল। কিন্তু আর সে চুপ করে থাকতে পারল না। রাজীবের দিকে চেয়ে চাপা গর্জ্জনে সে বলল: "মিষ্টার ঘোষ, আপনার কাছ থেকে আমি ভদ্রলোকের মত ব্যবহারই প্রত্যাশা করি..."

লিলির মুখ থেকে এতকাল পরে হঠাৎ 'আপনি' সম্বোধন শুনে এবং তার উদ্দেশে অমন নিদারুণ শ্লেষাত্মক সুরে কথা কইতে শুনে, সে যে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছে এ কথা বুঝতে রাজীবের বিন্দুমাত্র বিলম্ব হল না। ফ্যাল ফ্যাল করে লিলির দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে আমতা আমতা করে বলল: "বা:—হাজী সাহেবের "শো রুম" থেকে তুমি কাপড় চোপড় কিনতে ভালবাস বলেই তো আমি ওকে ওখানে যেতে বললাম।

প্রকাশের সম্মুখে নিজের ভাবী-স্বামীর ওপর অতখানি ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠাটা তার যেন উচিৎ হয় নি, একথা লিলি পর মুহূর্ত্তেই বুঝতে পেরেছিল। নিজেকে যথাসাধ্য সম্বরণ করে নিয়ে গম্ভীর স্বরে অথচ ভদ্রভাবে লিলি বলল: "সেকথা ওঁকে পূর্ব্বে বলা উচিত ছিল। কোথায় যেতে হবে না হবে, আগে না বললে উনি জানবেন কী করে?"

গাড়ী এসে হাজী সাহেবের শো-রুমের সামনে থামল।

শো-রুমে তখন ভয়ানক ভীড়। দলে দলে স্ত্রী-পুরুষ দোকানের বিরাট হলটার মধ্যে ঘুরে ঘুরে নিজেদের জামা কাপড় প্রভৃতি পছন্দ করে ফিরছিল। বর্ত্তমান কলকাতার আধুনিক যুবকদের পছন্দ অনুযায়ী সস্তা জাপানী সিল্কের হাল ফ্যাসানের "রেডিমেড" সার্ট পাঞ্জাবী পায়জামা প্রভৃতি এত সুলভে সরবরাহ করতে এই প্রতিষ্ঠানটীর নাকি জোড়া নেই। যুগোপযোগী নিত্য নতুন ফ্যাসানের চোখ-ধাঁধানো শাড়ীর পাড় আবিষ্কার করতেও এরাই নাকি অপ্রতিদ্বন্দ্বী! বাঙ্গালী তরুণ তরুণীদের সিনেমা-প্রীতির পরিচয় পেয়ে এরাই নাকি সর্ব্ব প্রথমে সিনেমা অভিনেত্রীদের নামানুসারে শাড়ীর নামানুকরণ করতে আরম্ভ করে; তাই প্রয়োজন উপস্থিত হলেই সকলের আগে লোকের মনে পড়ে "হাজী সাহেবের" শো-রুমের কথা। বেচারা রাজীবের অপরাধ কি? দোকানের বিরাট জনতার দিকে চেয়ে লিলি রাজীবকে বলল: "আমি আর নামব না,—বড্ড Tired feel করছি। তুমি বরং আমার জন্যে একখানা··· এই রকম শাড়ী নিয়ে এস।"

ভ্রুকুটী-কুটীল চোখ-দুটীর দিকে চেয়ে রাজীব তাকে আর দ্বিতীয়বার অনুরোধ করতে সাহস করল না; আস্তে আস্তে গাড়ী থেকে নেমে দোকানের মধ্যে প্রবেশ করল। উদাস দৃষ্টিতে রাস্তার বিপুল জনস্রোতের দিকে চেয়ে চুপচাপ বসেছিল। লিলি মৃদু স্বরে ডাকল: "প্রকাশবাবু?"

প্রকাশ মুখ ফিরিয়ে লিলির দিকে চাইল। কুণ্ঠিত স্বরে লিলি বলল: "আপনি কিছু মনে করবেন না। মিষ্টার ঘোষের ব্যবহারের জন্য আমি অত্যন্ত লজ্জিত, এর জন্য দায়ী শুধু আমি···" প্রকাশ কোন কথা বলল না, শুধু একটু হাসল। কিছুক্ষণ পরে লিলি আবার বলল: প্রকাশবাবু—একটা কথা জিজ্ঞাসা করব···"

"কী বলুন?"

"তখন আপনি ও রকম করে আমার দিকে চেয়েছিলেন কেন বলুন তো? প্রকাশ তৎক্ষণাৎ কোন উত্তর দিল না। নিষ্পলক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে তারপর ঈষৎ ম্লান ভাবে হেসে বলল: "ও কিছু নয়···"

লিলি মুখ নীচু করল। এক মুহূর্ত্ত পরে সে যখন মুখ তুলে কথা কইল তখন তার কণ্ঠস্বরের মধ্যে একটা বেদনার সুর ফুটে উঠতে দেখে প্রকাশ বিস্মিত হল। লিলির চোখদুটি ছল ছল করছিল; মৃদুস্বরে সে বলল: "আমায় ক্ষমা করবেন প্রকাশবাবু"···

ব্যস্ত হয়ে প্রকাশ বলল: "ছি: ছি: কী বলছেন আপনি? আপনার দোষ কী?"

চকিতের মতো প্রকাশের চোখদুটীর মধ্যে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল, সে এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে লিলির দিকে তাকাল। প্রকাশের এই দৃষ্টি-তীব্রতার পরিচয় লিলি আজই আর একবার পেয়েছিল তাদের লাইব্রেরী ঘরের মধ্যে। তখনও সে চোখ নামিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছিল, এখনও তার মাথা যেন আপনা থেকেই নীচু হয়ে গেল। মুখ নীচু করে রুদ্ধ কণ্ঠে লিলি বলল: "আপনার সমস্ত অপমানের জন্য আমিই দায়ী, আমিই আপনাকে অপমান করলাম।"

প্রকাশের মুখে আবার হাসি ফুটে উঠল, স্নিগ্ধ কণ্ঠে সে বললে: "ছি: লিলি···ইয়ে··· দেবী···" (ক্রমশ:)

বিজনদা'র চিঠি

আমার আদুরে ভাই-বোনেরা—

'দীপালী'র পৃষ্ঠা-সংখ্যা বাড়াবার খবর যেই তোমরা পেয়েছ, ওমনি চিঠির পর চিঠি লিখে জানতে চেয়েছ যে তোমাদের বিভাগের পরিমাপটা আরো বাড়বে কি না ?···তোমাদের দাবী দেখি 'দীপালী'র ওপর সব চেয়ে বেশী, তা' না হ'লে যুদ্ধের দরুণ 'দীপালী'র বহু বিভাগ বন্ধ হয়ে গিয়েছে কিন্তু তোমাদের "ছুটির ঘন্টা"র আসর ঠিকই আছে। তোমাদের এই বিভাগের অভাব-অভিযোগ কিছুই নেই (আর সব বিভাগের তুলনায়) বল্লে বোধ হয় মিথ্যে কথা বলা হবে না। কি বলো ?···বেশ, শোন তবে যে, তোমাদের বিভাগে আরো এক পাতা বাড়বে ঠিক হয়েছে। খুসী তো সকলে এবার ?···কিন্তু এবারে একটা কাজের কথা আছে, "ছুটির ঘন্টা" তোমাদের আর তোমরা "ছুটির ঘন্টার" বলে যেমন দাবী আছে তোমাদের মধ্যে পরস্পরের, তেমন এবারে তোমাদের বিভাগটাকে খুব ভালো করে তুলতে হবে। শিশু-সাহিত্যের সাহায্যে জ্ঞান এবং আনন্দ নতুন উপায়ে যাতে লাভ করতে পারে তার বিতরণের ভারও তোমাদেরই হাতে। এই বিভাগ সম্বন্ধে তোমরা প্রত্যেকে আমাকে তাড়াতাড়ি তোমাদের নতুন পরিকল্পনা জানিও, আর আমিও যথাসম্ভব তোমাদের পরিকল্পনা কাজে লাগাবার চেষ্টা করবো।···তোমাদের লেখা উপন্যাসের পঞ্চদশ পরিচ্ছেদের জন্যে এখনও ভালো লেখা পাই নি। ওটা তাড়াতাড়ি পাঠিও।···এবারে তোমাদের বিভাগে সব তোমাদের লেখা দেখে খুব খুসী তো সকলে ? আজ আসি। স্নেহ নিও, কেমন ? —তোমাদের বিজনদা।

গল্প হলেও সত্যি

—শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

অসহযোগ আন্দোলনের যুগ।

দেশবন্ধু সতেরো লাখ টাকার ফী ছেড়ে দেশের কাজে নেবে পড়লেন।

গান্ধিজী ডাক দিলেন—যে যেখানে আছ, তরুণের দল, স্কুল কলেজ ছেড়ে বেরিয়ে এসো—বিদেশী শিক্ষায় আর দরকার নেই।

সে ডাক ভারতবাসীর মনে দোলা দিয়ে গেল, বাংলা দেশেও লাগলো সেই ঢেউ।

খেঁদু ম্যাট্রিক পাশ করে সবে কলেজে ঢুকেছিল, বললে—আর পড়বো না।

পিতা বললেন—তার মানে ?

—আর পড়বো না, গান্ধিজী বলেছেন···

—গান্ধিজী যা বলেন বলুন কিন্তু লেখাপড়া ছাড়া চলবে না।

—কিন্তু আমি যে ছেড়ে দিয়েছি।

—ছেড়ে দিয়েছ, বটে ! জেনে রেখো কলেজ ছাড়লে এ বাড়ীতে তোমার স্থান হবে না।

পুত্র মাথা হেঁট করে পিতার সামনে থেকে চলে এলেন ; কিন্তু কলেজে তিনি আর গেলেন না।

কলেজ ছাড়ার জন্য বাড়ীও ছাড়তে হোল।

কংগ্রেস আফিস ছিল অবারিত দ্বার, তরুণ কর্মীর দল এসে জড়ো হোত সেখানে, খেঁদুও তাদের মধ্যে একটু স্থান করে নিল।

অতি সাধারণ একটি ছেলে বিশেষ-চোখে লোকেরা কেনই-বা তাকে দেখবে। রাতটা সেইখানেই কাটে, দিনের বেলা কোনদিন কিছু খাওয়া হয়, কোনদিন বা উপবাস।

হাতে একটিও পয়সা নেই ! তা বলে কারুর কাছে হাত-পাতাও তো চলে না। পরিচিতদের বলেন—ভাই একটা টুইশনি করে দিবি ?

বন্ধু বলে, করবি কখন, সারাদিন তো কংগ্রেস কংগ্রেস করে ঘুরছিস ?

—সে সময় করে নেব'খন।

শেষে একটা টুইশনি জুটলো। সামান্য মাইনে, ম্যাট্রিক পাশ মাষ্টারকে কে আর বেশী টাকা দেবে ? খেঁদু তাতেই খুসি, তবু কিছু হোল।

সকাল-সন্ধ্যে ছেলে পড়ায়······রাত্রে কংগ্রেসের আফিসেই শুয়ে থাকে···অবসর মত কংগ্রেসের কাজে এদিক সেদিকে ঘোরে···। আধময়লা খদ্দরের জামা-কাপড়··· কোন পরিচয় নেই···আর পাঁচজনের মত অতি সাধারণ এক কিশোর।

সেদিনকার এই ছেলেটিকে দেখে কেউ ভাবেনি যে আট দশ বছরের মধ্যে এই কিশোরকুমার ভারতের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে যাবে। পণ্ডিত জহরলালজীও একদিন শ্রদ্ধাভরে এর পদধূলি গ্রহণ করবে, আর তারই সঙ্গে হাজার হাজার ভারতবাসী গৌরব করবে যে এমন ছেলে তাদের দেশেও জন্মায়।

এই ছেলেটী কে জান—যতীন দাস।

লাহোরের বোরষ্টাল জেলের কর্তৃপক্ষ এঁদের সঙ্গে যে ব্যবহার করেন তার প্রতিবাদে ইনি অনশন সুরু করেন। ৬২ দিন উপোস করার পর ১৯২৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইনি মারা যান। সেখান থেকে এঁর শব কলিকাতায় এনে দাহ করা হয়। যে ছেলে একদিন উপবাস থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য টুইশনি খুঁজেছে সেই ছেলে আত্মসম্মান রক্ষার জন্য একাদিক্রমে বাষট্টিদিন উপবাস করে আত্মত্যাগ করলো। কেরাণীজীবি বাঙালী ছেলেদের সঙ্গে এর কত প্রভেদ !

তোমাদের বিভাগ

"শুনতে গল্প আসলে সত্যি"

অর্চনা পাল (৩৪৩) ও কমল দত্ত (১০০৫)

আজ থেকে কয়েক বছর আগে··· কোলকাতায় বর্তমানে যে স্কুলের নাম হিন্দু-স্কুল,···তখনকার দিনে তার নাম ছিল 'হিন্দু কলেজ'। বাংলার মনীষীরা প্রায় সকলেই এ কলেজ থেকে অধ্যয়ন শেষ কোরে বার হয়েছিলেন—এবং পরে দেশের নানা কাজ কোরে গেছেন। এই কলেজের কয়েকজন ছাত্রের মধ্যে তর্ক ওঠে কে বড়—সেক্সপীয়ার না নিউটন? একটী ছাত্র, যাঁর মেধাশক্তি ছিল খুবই প্রবল, এবং সাহিত্যানুরাগীও ছিলেন, তিনি কবির পক্ষ নিয়ে বলেন—"সেক্সপীয়ার ইচ্ছে কোরলে 'নিউটন' হতে পারতেন, কিন্তু 'নিউটন' কখনও সেক্সপীয়ার হতে পারতেন না।" একথাটা কিন্তু কেউ সমর্থন কোরলে না।

এর বেশ কিছুদিন পরে ছাত্রদের ক্লাস চোলছে। গণিতের ক্লাস। রীজ সাহেব নামে জনৈক অধ্যাপক অংক কষাচ্ছিলেন। তিনি বোর্ডে গণিতের একটা জটিল প্রশ্ন দিয়ে ছেলেদের তা সমাধান করতে বললেন। প্রত্যেক ছাত্রই চেষ্টা কোরলো, কিন্তু কেউ পারলে না। শেষ বারের মত অধ্যাপক বোল্লেন—"আর কেউ চেষ্টা কোরবে?" যে ছাত্রটি কবি সেক্সপীয়ার-এর পক্ষ নিয়েছিল সে গিয়ে দাঁড়াল বোর্ডের সামনে—সকলের মুখে বিদ্রূপের হাসি ফুটে উঠলো—কবি কিন্তু অংকটি প্রণালী সমেত কোরে প্রমাণ কোরে দিলেন যে "সেক্সপীয়ার ইচ্ছে কোরলে নিউটন হতে পারতেন।" ইনি হচ্ছেন "মেঘনাদ বধ" কাব্যের কবি "মাইকেল মধুসূদন দত্ত"।

সত্যি গল্প

শ্রীসৌরীন্দ্র মোহন দেব (৭৮৬)

একজন বৈজ্ঞানিক; খু—ব বড় বৈজ্ঞানিক। সারা ইংলণ্ডে তাঁর নাম। একদিন তিনি ডিম কতক্ষণে সিদ্ধ হয় তার পরীক্ষা করবেন ঠিক করলেন। উনুনে জল চড়ান হল। বৈজ্ঞানিক মশায় একটা ঘড়ি ও একটা ডিম নিলেন। তারপর অন্যমনস্ক ভাবে তিনি ডিমের বদলে ঘড়িটা দিলেন জলে সিদ্ধ হতে; আর ডিমটাকে ঘড়ি মনে করে তার দিকে চেয়ে রইলেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁর একজন সহকারী সেখানে এসে

দেখল যে তার প্রভু একটা ঘাড় সিদ্ধ করছেন, ও আর একটা ডিমের দিকে তাকিয়ে আছেন। সে ভাবল বৈজ্ঞানিক মশায় বোধ করি কোন নতুন কিছু পরীক্ষা করছেন। সে জিজ্ঞেস করল, "স্যার কি করছেন?" বৈজ্ঞানিক উত্তর দিলেন—"একটা ডিম কতক্ষণে সিদ্ধ হয় তাই দেখছি। এই যে আমার হাতে আছে ঘড়িটা আর জলে সিদ্ধ হচ্ছে ডিমটা।" তাঁর সহকারী প্রভুর কথা শুনে হেসেই খুন, কথা বলবে কি? বৈজ্ঞানিক রেগে গিয়ে বললেন—"হাসছ কেন?" সহকারী তখন বলল—"স্যার আপনি সিদ্ধ হবার জন্যে ভুল করে ডিমটা রেখেছেন হাতে, আর ঘড়িটা দিয়েছেন জলে।" "তাই নাকি!" বলে বৈজ্ঞানিক দেখেন সত্যি তো! তিনি উল্টো পরীক্ষা করছেন।

* * *

আর একদিন সেই বৈজ্ঞানিক খরগোস নিয়ে পরীক্ষা করবেন। দুটো খরগোস, একটা বড়, একটা ছোট। এদের থাকবার জন্য একটা খাঁচাও তৈরী করা হল। তারপর খাঁচার দরজা করতে গিয়ে বৈজ্ঞানিক পড়লেন মুস্কিলে। খরগোস হচ্ছে দুটো, একটা বড় আর একটা ছোট—সুতরাং দরজাও দুটো দরকার, একটা বড় আর একটা ছোট। বড় দরজা দিয়ে বেরুবে বড় খরগোসটা আর ছোট দরজা দিয়ে বেরুবে ছোট খরগোসটা। একজন সহকারী বললে "দুটো দরজার দরকার নাই, একটা বড় হলেই চলবে।" বৈজ্ঞানিক বললেন, "কি করে হবে?" সহকারী বললে—"বড় দরজা দিয়ে যখন বড় খরগোসটা বেরুতে পারবে তখন ছোটটাও তেমনি ও দরজা দিয়ে বার হতে পারবে।" বৈজ্ঞানিক বললেন—"দূর বোকা, বড় দরজা দিয়ে বেরুবে বড়টা। কিন্তু ছোটটা বেরুবে কি করে? ছোটটা ত' আর বড় দরজা দিয়ে বেরুতে পারবে না, সেইজন্যই একটা ছোট দরজা করতে হবে।" কিছুতেই বৈজ্ঞানিককে বোঝান গেল না, যে বড় দরজা দিয়ে ছোটটাও বেরুতে পারবে।

এই যে বৈজ্ঞানিকের জীবনের দুটো সত্যি গল্প বললাম, তাঁর নাম কি জান? তাঁর নাম স্যার আইজ্যাক নিউটন্।

জানা উচিত

শ্রীশচীনন্দন আঢ্য (৯৬৮)

১। পৃথিবীর মধ্যে যত প্রকার ভাষা আছে তন্মধ্যে সংস্কৃতেরই অক্ষরের সংখ্যা বেশী।

২। ভারতে মোট ৪০৪৭৭ মাইল রেল পথ আছে।

৩। বৃটিশ ভারতে মোট চলার যোগ্য রাজপথ আছে ৩ লক্ষ মাইল।
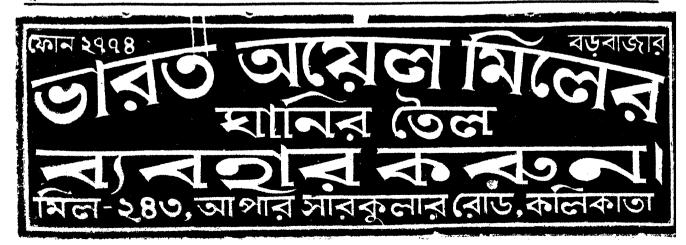
"জেনে রাখ"

(সংগৃহীত)

—শ্রীগঙ্গা রাম ঘোষ (১০৭৬)

(১) পরীক্ষার দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে সমুদ্রের সমস্ত জল শুষ্ক করিয়া বাষ্পাকারে পরিণত করিলে যে পরিমাণ লবণ অবশিষ্ট থাকিবে তদ্দারা ৫০ লক্ষ বর্গমাইল পরিমিত স্থান ১ মাইল উচ্চ করিয়া পূর্ণ করা যাইতে পারে।

(২) আমেরিকায় ব্রিষ্টনে একটি ক্লাব আছে তার নাম "বল্ড হেড্ (Bold Head) ক্লাব"। মাথায় টাক না পড়া পর্য্যন্ত কেহই এই ক্লাবের সভ্য হইতে পারিবে না।

(৩) নেপোলিয়ানকে একবার একটি অঙ্ক কষিতে দেওয়া হইয়াছিল। নেপোলিয়ান একাদিক্রমে বাহাত্তর ঘণ্টা আপন কক্ষে আবদ্ধ থাকিয়া উহা সঠিক করিয়াছিলেন।

(৪) রোমের 'কাটাকম্বস্' নামক সমাধি স্থান পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। এখানে ৬০ লক্ষ লোকের কবর আছে।

"জেনে রাখা ভাল"

শ্রীরাধাগোপাল বসাক (৭৩৭)

১। পৃথিবীর মধ্যে জাহাজ নির্ম্মাণের বৃহত্তম বন্দর কোথায়? "ফিলাডেলফিয়া।"

২। পৃথিবীর মধ্যে চার ভাগের তিন ভাগ পেট্রোল কোন রাজ্যের খনি হইতে পাওয়া যায়? "আমেরিকা"

৩। পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম মানচিত্র কোথায় এবং কত বড়? রোম নগরে। মানচিত্রখানি ২৪ হাত লম্বা এবং ২০ হাত চওড়া। জিনিষটা তৈয়ার করিতে ৪ লক্ষ টাকা খরচ হইয়াছে।

গল্প তবু সত্য

—জ্যোতির্ম্ময় গঙ্গোপাধ্যায় (১০৪৩)

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে ব্রেজিলে ঘোরতর রাষ্ট্র বিপ্লব উপস্থিত হইল। শত্রুর প্রচণ্ড আক্রমণে নগর রক্ষা যখন আর সম্ভব হইল না, তখন প্রধান সেনাপতি তাঁহার অধীনস্থ সেনা নায়কগণকে ডাকিয়া বলিলেন, "আমাদের মধ্যে কোন সেনাপতি মাত্র ৫০ জন সৈন্য লইয়া শত্রুদিগকে আক্রমণ করিতে পার? যদি কেহ এমন সাহসী থাক তবে অগ্রসর হও।" সেনানায়কের কথা শুনিয়া সকলে চিন্তিত হইয়া উঠিল। অবশেষে এক বাঙ্গালী যুবক উঠিয়া বলিলেন, "আমি প্রস্তুত আছি।"

যুবক ক্ষিপ্ত সিংহের মত শত্রুর উপর লাফাইয়া পড়িয়া ভীমবেগে যুদ্ধ করিতে লাগিল। শত্রুগণ সে আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া পলায়ন করিল। শত্রুর অনেক কামান যুবক অধিকার করিল, অনেক গোলন্দাজ তাঁহার হাতে বন্দী হইল। এই যুবকের বীরত্বে সমগ্র বাঙ্গালী জাতি গৌরবান্বিত। বঙ্গমাতার এই বীর সন্তান কে জান?—কর্ণেল সুরেশ চন্দ্র বিশ্বাস।

খেলার মাঠে

শ্রীউমেশ মল্লিক বি, এ

গত ২২শে মার্চ্চ ইণ্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়েশনের অন্তর্গত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের খেলোয়াড়দের "ছাড়পত্র" গ্রহণের শেষ দিনে বিশেষ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ক্লাব কর্ত্তৃপক্ষকে বিশিষ্ট খেলোয়াড় সংগ্রহে তৎপর দেখা যায়। এ বৎসর ১২৯ জন ফুটবল খেলোয়াড় ছাড়পত্র গ্রহণ করেন। সবিশেষ বিচার করে দেখলে ভবানীপুর বিশেষ লাভবান হয়েছে বলে মনে হয়। এ দলে ইষ্ট বেঙ্গল ক্লাবের সোমানা, আপ্পারাও, কালীঘাটের মোহিনী ব্যানার্জ্জী যোগ দান করায় দলটি বিশেষ শক্তিশালী হয়েছে। ভবানীপুরের কে দত্ত, নিলু মুখার্জ্জী এবং বিমল কর ইষ্টবেঙ্গল এবং বি এণ্ড এ রেলে যোগদান করলেও ভবানীপুর দল বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। কে, দত্তের সমপর্য্যায়ভুক্ত গোল রক্ষক না পেলেও ডি, সেন ভবানীপুরের পক্ষে বিশেষ কার্য্যকরী হবে। গড়গড়ী ভ্রাতৃদ্বয় ও ভবানীপুরের বিশেষ সহায়তা করবে।

ইষ্টবেঙ্গল দল সোমানা এবং আপ্পারাওএর অভাব বিশেষভাবে অনুভব করবে সন্দেহ নেই। প্রকৃতপক্ষে এ ২টি অবাঙ্গালী খেলোয়াড়ের ক্রীড়া-চাতুর্য্যের ফলে ইষ্টবেঙ্গল কয়েক বৎসর খেলার মাঠে বিশেষ আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। এ দলে এরিয়ান্সের শঙ্কর ঘোষ, ভবানীপুরের কাইজার, মোহনবাগানের টি, কর কাষ্টমসের গিয়াসউদ্দীন প্রভৃতি যোগদান করেছে। গত বৎসর ইঃ বিঃ দলের আক্রমণ বিভাগের উৎকর্ষের তুলনায় গোল-রক্ষকের অভাব বিশেষ উপলব্ধ হয়। এ বৎসরে কে, দত্তের আগমনে সে অভাব আর অনুভূত হবে না। মোহনবাগানে যোগদানকারী একমাত্র উল্লেখযোগ্য এ, ভৌমিক। বিশেষ সূত্রে প্রকাশ যে রাম ভট্টাচার্য্য পোর্ট কমিশনারে চাকরী গ্রহণ করায় বোধ হয় মোহনবাগানের হয়ে খেলা সম্ভব হবে না। সংবাদ সঠিক হলে মোহনবাগানের সমূহ বিপদ। কেন না চঞ্চল মুখার্জীর উপর খুব বেশী আস্থা রাখা যায় না। মোহনবাগানে আর যে সমস্ত খেলোয়াড় যোগদান করেছেন তার মধ্যে শালকিয়া ফ্রেণ্ডসের এস, কুণ্ড ও স্পোর্টিং ইউনিয়নের বি, বসু ছাড়া আর কেউ উল্লেখযোগ্য নয়। দুঃখের বিষয় মোহনবাগানে একজনও বিশিষ্ট সেণ্টার ফরোয়ার্ড যোগদান করেনি। নন্দ রায় চৌধুরীর পরিবর্ত্তে অন্য কেউ এ দায়িত্ব পূর্ণ অংশে যোগ দিয়ে মোহনবাগানকে সাহায্য করতে পারে কি না সে দিকে ক্লাব কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি রাখা উচিত ছিল। ১৯৩৫ সাল থেকে নন্দ রায় চৌধুরী মোহনবাগানকে সুখে দুঃখে সাহায্য করেছেন। বর্ত্তমানে তার পরিবর্ত্তে অন্য কাউকে সংগ্রহ করা উচিত।

মহমেডান স্পোঃ ক্লাবে কতকগুলি মুসলমান খেলোয়াড়যোগ দিয়েছেন। তাঁদের কোন খেলোয়াড়কে দল ত্যাগ করে যেতে শুনা যায় নি।

অমিতাভ মুখার্জ্জী ইষ্টবেঙ্গল ত্যাগ করে এরিয়ান্সে যোগ দিয়েছেন। অন্য কেউ উল্লেখযোগ্য নন।

ডালহৌসীতে মুলার যোগদান করেছেন মাত্র।

কালীঘাটে বহু নতুন খেলোয়াড় গ্রীয়ার, আলিপুর স্পোঃ প্রভৃতি থেকে যোগ দিয়েছে। মোহিনী ব্যানার্জ্জীর আপ্রাণ প্রচেষ্টায় এ দলটি কয়েক বৎসরে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হয়ে ওঠে। এ দলে বাঙ্গালী খেলোয়াড়রা সুযোগ এবং শিক্ষা পায়, কিন্তু উক্ত খেলোয়াড়টির অনুপস্থিতিতে এ দল কতখানি পূর্ব্ব সুনাম অক্ষুন্ন রাখতে পারবে তা সঠিক ধারণা করা যায় না। স্পোঃ ইউনিয়নে মহালক্ষ্মী স্পোঃ, প্যারাগণ ক্লাব প্রভৃতির খেলোয়াড়রা যোগ দিয়েছে।

*   *   *

গত সপ্তাহের প্রথম বিভাগীয় হকি লীগের ফলাফল :—

বুধবার ২২শে মার্চ্চ :—

ইঃ বি—২—জ্যাভেরিয়ান্স—০
মেসারার্স—২—আর্ম্মেনিয়ান্স—২
কাষ্টমস্—৩—পাঞ্জাব স্পো—০
পোর্ট কমিঃ—৬—বি এণ্ড এ আর—১

বৃহস্পতিবার ২৩ শে মার্চ্চ :—

রেঞ্জার্স—৩—মেসারার্স—১
ডালহৌসী—২—বি এণ্ড এ আর—১

শুক্রবার ২৪শে মার্চ্চ :—
কোন খেলা হয় নি।

শনিবার ২৫ শে মার্চ্চ :—

ইঃ বিঃ—২—লিলুয়া—০
পুলিশ—১—মেসারার্স—০
মিঃ মেডিকালস্—২—বি এণ্ড এ আর—০

সোমবার ২৭শে মার্চ্চ :—

পোর্ট কমিঃ—৫—পাঞ্জাব স্পো—০
মোহনবাগান—০—গ্রীয়ার—০
রেঞ্জার্স—২—কাষ্টমস্—০

মঙ্গলবার ২৮শে মার্চ্চ :—

জ্যাভেরিয়ান্স—০—লিলুয়া—২
মিঃ মেডিকালস্—৩—আর্ম্মেনিয়ান্স—০
মোহনবাগান—২—বি এণ্ড এ আর—১

হকি লীগ টেব্‌ল্

(২৬শে মার্চ্চ রবিবার পর্য্যন্ত)

	খেলা	জ	ড্র	পরা	স্ব	বি	প
পোর্ট কমিঃ	৮	৭	১	০	২২	৩	১৫
ইষ্টবেঙ্গল	৮	৬	২	০	১১	১	১৪
মহঃ স্পোর্টিং	৮	৫	৩	০	১৭	৫	১৩
পুলিশ	৯	৫	৩	১	১৯	৮	১৩
মিলিঃ মেডিঃ	৯	৫	২	২	১৩	৮	১২
জেভেরিয়ান্স	১০	৫	১	৪	১২	১৫	১১
গ্রীয়ার	৯	৪	২	৩	১৪	১২	১০
রেঞ্জারস্	৭	৪	১	২	১৬	১০	৯
কাষ্টমস্	৯	৪	১	৪	১৭	১৪	৯
লিলুয়া	১১	৩	৩	৫	৭	১১	৯
ডালহৌসী	১২	৪	১	৭	১২	[illegible]	৯
বি-কি-প্রেস	৮	৩	২	৩	৮	৮	৮
বি ও এ রেল	১৩	৩	১	৯	১৮	৩৯	৭
আরমেনিয়ানস	১৩	২	২	৯	৯	১০	৬
মোহনবাগান	৪	২	১	১	১২	৭	৫
মেসারারস	৯	১	২	৬	৭	১৮	৪
পাঞ্জাব স্পোর্টস	৯	০	২	৭	২	১৭	২

আন্তঃ স্কুল হকি প্রতিযোগিতায় সেণ্ট এনটনী ক্যালকাটা মাদ্রাসাকে ভবানীপুর মাঠে ৩—০ গোলে গত সোমবার পরাজিত করেছে।

*   *   *

রঞ্জী ট্রফী প্রতিযোগিতার ফাইনালের দিন আগামী ৩১ শে মার্চ্চের পরিবর্ত্তে ৭ই এপ্রিল স্থিরীকৃত হয়েছে। বলা বাহুল্য এই আকর্ষণীয় প্রতিযোগিতাটি বোম্বাইয়ের ব্রেবোর্ণ ষ্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিযোগী বাঙ্গলা দেশ এবং পশ্চিম ভারত রাজ্যদল।

বাঙ্গলা দেশের নির্ব্বাচিত নিম্নলিখিত খেলোয়াড়দের মধ্যে দল গঠন করা হবে।

কুচবিহারের মহারাজ (অধিনায়ক), কে ভট্টাচার্য্য, এন চ্যাটার্জ্জী, এ জব্বর, এ চ্যাটার্জী, এম মুস্তাফী, এ দেব, এস ব্যানার্জী, পি সেন, এম সেন, বি মিত্র, এ গাধিস, এ দত্ত, পি ডি দত্ত, ডি দাস, পি মুরিটা।

আন্তঃ স্কুল ক্রিকেট ফাইনালে হিন্দু স্কুল কাশিম বাজার স্কুলকে পরাজিত করেছে।

নাটমণ্ডপ

আগামী ৩রা ও ৪ঠা এপ্রিল সন্ধ্যা ৬॥ টায় সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ হলের বি, ই, এস, এ, থিয়েটারে রবীন্দ্রনাথের 'বাল্মীকি-প্রতিভা' মঞ্চস্থ হইবে। অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করিবেন শান্তি-নিকেতনের শিক্ষক, শিক্ষয়িত্রী ও ছাত্রছাত্রী সম্প্রদায়। এই গীতিনাট্যটি রবীন্দ্রনাথের একেবারে তরুণ বয়সের রচনা। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ঠাকুরবাড়ীতে 'বিদ্বজ্জন সমাগম' উপলক্ষে এই গীতিনাট্যটির প্রথম অভিনয় হয়। সে অভিনয়ে কবি স্বয়ং বাল্মীকির ভূমিকায় মঞ্চাবতরণ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি রাজকৃষ্ণ রায় প্রভৃতি তৎকালীন কলিকাতার বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সে অভিনয় দেখিয়া প্রচুর প্রশংসা করেন।

* * * *

মণি ঘোষের পরিচালনাধীনে অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশনের "সন্ধ্যা"র শূটিং চলিতেছে। বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করিতেছেন জহর গাঙ্গুলী, অহীন্দ্র চৌধুরী, শ্যাম লাহা, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, বিজয়া দাস বি-এ, মীরা দত্ত প্রভৃতি। প্রবোধ দাস ও শম্ভু শিং যথাক্রমে চিত্রগ্রহণ ও শব্দগ্রহণ করিতেছেন।

* * * *

মিনার্ভা সিনেমায় "শুক্রিয়া" সগৌরবে চলিতেছে। প্রাণপ্রাচুর্য্যে চঞ্চলা রমলার অভিনয় একবার দেখিলে আবার দেখিতে ইচ্ছা হয়। ইহাই তাঁহার অভিনয়ের বিশেষত্ব। অহঙ্কারে যে মেয়েটি ধরাকে সরা জ্ঞান করিত প্রেমরূপী সোনার কাঠির স্পর্শে কি ভাবে সে তাহার মনুষ্যত্ব ফিরিয়া পাইল তাহাই "শুক্রিয়া"র মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

* * * *

বাংলা ছবির অভাব ইতিমধ্যেই দেখা দিতে সুরু করিয়াছে। সেইজন্য পুরাতন ছবির পুনরাবির্ভাবে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। এই শনিবার হইতে চিত্রায় "প্রিয় বান্ধবী", পূরবী ও পূর্ণতে "সমাধান" এবং শ্রীতে "শেষ উত্তর" চলিবে।

* * * *

নিউ টকীজের "বন্দিতা"র শূটিং চলিতেছে ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে। এই কোম্পানীটির একটি জিনিষ লক্ষ্য করিবার আছে—অন্য কেহ করিয়াছেন কিনা জানি না। ইহাদের এক একখানি ছবি এক একটি ষ্টুডিওতে তোলা হয়। প্রমাণ স্বরূপ দেখুন—"এপার ওপার" তোলা হয় ফিল্ম প্রডিউসার্স ষ্টুডিওতে, "নারী" হইল নিউ থিয়েটার্স ২নং ষ্টুডিওতে, "অভিসার" হইল কালী ফিল্মসে, "দাবী" হইল কালী ফিল্মসে খানিকটা এবং ভারতলক্ষ্মীতে বাকীটা। "সমাজ" হইল ভারতলক্ষ্মীতে এবং "বন্দিতা" সুরু হইয়াছে ইন্দ্রপুরীতে। ইহার পরের ছবির বেলায় কর্ত্তৃপক্ষ কোন ষ্টুডিওতে যাইবেন?

* * * *

আগামী ৭ই এপ্রিল গণেশ টকী হাউসে ও তৎসঙ্গে পার্ক শো হাউসে চিত্রা প্রোডাকসান্সের "প্রতিজ্ঞা" মুক্তিলাভ করিবে। ইহাতে অভিনয় করিয়াছেন মতিলাল, স্বর্ণলতা, বেবী মীনা, হরি শিবদাসানী, বীণা কুমারী, সুনেত্রা প্রভৃতি। ছবিখানির সংলাপ অত্যন্ত সরল হিন্দী ভাষায়, সুতরাং বাঙ্গালী দর্শকের বুঝিতে কোনো অসুবিধা হইবে না। বম্বে পিকচার্স কর্পোরেশন ছবিখানির পরিবেশক।

* * * *

সারকোর "মহাত্মা বিদুর" প্যারামাউণ্ট, আলেয়া ও সিটিতে ৭ম সপ্তাহ চলিতেছে।

গত রবিবার একটি বিশেষ প্রদর্শনীতে আমরা ছবিখানি দেখিয়া আসিয়াছি। ভক্তশ্রেষ্ঠ বিদুরের কৃষ্ণভক্তির উপাখ্যান ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু নরনারী মাত্রেরই চিত্ত স্পর্শ করে। আলোচ্য চিত্রখানি সর্ব্বদিক দিয়া উৎকর্ষ লাভ না করিলেও পৌরাণিক চিত্রপ্রিয়দের যে ভালই লাগিবে তাহা আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি।

* * * *

শ্রীমতী প্রতিমা দাসগুপ্তা কিছুদিন যাবৎ বোম্বাইতে বসবাস করিতেছেন এ কথা সকলেই জানেন এবং ইহাও জানেন যে সেখানকার অনেকগুলি হিন্দী ছবিতে তিনি অভিনয় করিয়া ভারতব্যাপী সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন। এইবার তিনি প্রতিমা প্রোডাকশান নাম দিয়া নিজের কোম্পানী স্থাপন করিয়াছেন। প্রথম ছবির নাম "চোর"। তাঁহার লিখিত একখানি পত্রে জানা গেল যে ছবিখানির পরিচালনা করিবেন তিনি নিজে। বেগম প্যারা (তাঁহার ননদ) নামক উচ্চশিক্ষিতা এক মহিলা নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করিবেন। শ্রীমতী প্রতিমা একটি ছোট অথচ প্রয়োজনীয় ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করিবেন বলিয়া জানাইয়াছেন।

নানাকথা

রবীন্দ্র পরিষদে সাহায্য অনুষ্ঠান

আগামী ১৩ই এপ্রিল বৃহস্পতিবার চুঁচুড়া কৈরি রঙ্গমঞ্চে রবীন্দ্রনাথ স্মৃতি-রক্ষা ভাণ্ডারের সাহায্যকল্পে কলিকাতার খ্যাতনামা পুরুষ ও মহিলা শিল্পীগণের সহযোগিতায় একটি অভিনব অনুষ্ঠানের আয়োজন এবং ষড়ঋতু রঙ্গ (রবীন্দ্র সঙ্গীতে ঋতু বন্দনা) ও গোপী রায় রচিত নাটক "অধিকার" অভিনয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। উক্ত অনুষ্ঠান পরিচালনা করিতেছেন চুঁচুড়া রবীন্দ্র পরিষদ।

রবি-বাসর

গত রবিবার ১৩ই চৈত্র অপরাহ্ণ ৫।০ ঘটিকার সময় শ্রীচরণদাস ঘোষের আহ্বানে ১৩নং কৈলাস ব্যানার্জ্জি লেন, (হাওড়া) রবি-বাসরের বর্ত্তমান বর্ষের ২১শ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ঐদিন কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেন "রসের কথা" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন।

নিলকামারীতে নাট্যাভিনয়

গত ৫ই মার্চ্চ রবিবার নিলকামারী লিলি থিয়েটার মঞ্চে শ্রীতুলসী লাহিড়ীর "মায়ের দাবী" লিলি ক্লাব কর্ত্তৃক অভিনীত হইয়া গিয়াছে। মোটের উপর অভিনয় মন্দ হয় নাই, করুণার ভূমিকায় শ্রীজ্যোতিষ ঘোষ ও অশোকের ভূমিকায় ডাঃ প্রফুল্ল বোসের অভিনয় একপ্রকার ভালই হইয়াছিল।

* * *

গত ১৯শে মার্চ্চ রবিবার শচীন সেনের "সংগ্রাম ও শান্তি" লিলি ক্লাব কর্ত্তৃক বিশেষ সাফল্যের সহিত অভিনীত হইয়াছে। নিম্নলিখিত চরিত্রগুলি সুঅভিনীত হইয়াছিল—চন্দ্রশেখর—শ্রীবীরেন নিয়োগী, মনোহর—শ্রীদীনেন গাঙ্গুলী, অবিনাশ—শ্রীগিরীন ঘোষ ও নিত্যানন্দ—শ্রীনীহার সান্যাল। উক্ত নাটকে প্রতিমার ভূমিকায় মহম্মদ আজম ও দৌলতরামের ভূমিকায় ডাঃ প্রফুল্ল বোসের অভিনয় খুব চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। সৈয়দপুর হইতে আগত "ম্যাট্রিক" ছাত্রদের নিকট হইতে মহম্মদ আজম একটী রৌপ্য পদক উপহার পাইয়াছেন। স্থানীয় মহকুমা হাকিম, সার্কেল অফিসার ও মুনসেফবাবু প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন।

যাদুকর পি, সি, সরকার

ছত্রিশগড় রাজ্যের মহারাজাধিরাজ ভানু প্রতাপ দেও বাহাদুরের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষ্যে নিমন্ত্রিত হইয়া যাদুকর শ্রীযুক্ত পি, সি সরকার মহাশয় বিগত ২৬শে মার্চ্চ বোম্বাই মেইল যোগে মধ্যভারত যাত্রা করিয়াছেন।

আগামী সংখ্যা হইতে
—দীপালীতে—
সুসাহিত্যিক শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধরের
কার্ল মার্কস্
(বর্ত্তমান রাশিয়ার রোমাঞ্চকর ইতিহাস)
ধারাবাহিক ভাবে বাহির হইবে

সৈনিকদের প্রিয় আড্ডা

ইণ্ডিয়ান্ টী মার্কেট এক্স্প্যানশান বোর্ড ভারতীয় ও মিত্রবাহিনীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যে কতখানি করছেন, তার আরও একটি দৃষ্টান্ত সম্প্রতি পাওয়া গেছে। ভারতের প্রত্যেক বড়ো রেল-ষ্টেশনে যাত্রী সৈন্যদের জন্য বোর্ড অসংখ্য চায়ের ক্যান্টিন স্থাপিত করেছেন। ইতিপূর্ব্বে এঁরা সৈন্যদের জন্য কতকগুলি চায়ের গাড়ীর প্রবর্তন করে সামরিক কর্তৃপক্ষ এবং সৈন্যদের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছিলেন। আজ এই সব ক্যান্টিনের প্রতিষ্ঠায় বোর্ডের এ-প্রচেষ্টা আরো সম্পূর্ণতা লাভ করলো।

দিবারাত্রি ট্রেইন ও ষ্টিমারে ভ্রমণ করে সৈন্যরা যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ে তখন ষ্টেশনে ষ্টেশনে ইণ্ডিয়ান্ টী মার্কেট এক্স্প্যানশান বোর্ডের এই সব ক্যান্টিন তাদের বিনামূল্যে গরম তাজা করা চা এবং সেই সঙ্গে নামমাত্র মূল্যে জলখাবার ও সিগারেট জোগায়। পরিচ্ছন্নতা এবং বোর্ডের শিক্ষিত কর্মীদের সুশৃঙ্খল পরিচালনার ফলে এই ক্যান্টিনগুলো আজ সৈন্যদের একান্ত প্রিয় হয়ে উঠেছে এবং রাজকীয় বাহিনীর মধ্যে প্রতি মাসে প্রায় তিন লক্ষ আশি হাজার পেয়ালা চা বিতরণ করছে।

একজন সাংবাদিক সম্প্রতি এই রকম একটা ষ্টেশনে ক্যান্টিনের কাজ দেখে এতই মুগ্ধ হয়েছেন যে তিনি এ-সম্বন্ধে একটি বিবরণী লিখে আমাদের পাঠিয়েছেন। নীচে আমরা তার থেকে খানিকটা উদ্ধৃত করছি:

"শান্তির সময় এই ছোট্ট রেল-ষ্টেশনটি ছিলো গাড়ী বদলি করবার অসংখ্য ছোটো ছোটো ষ্টেশনেরই একটি। ষ্টেশনটির কোনোই গুরুত্ব ছিলো না এবং যাত্রীরাও এ ষ্টেশনটিকে বিশেষ আমলে আনতো না। আজ যুদ্ধের দরুণ ষ্টেশনটির গুরুত্ব বেড়ে গেছে। এক্ষেত্রে ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্স্প্যানশান বোর্ড যে তাঁদের সামরিক ক্যান্টিন প্রতিষ্ঠার জন্য এ ষ্টেশনটিকেও বেছে নেবেন এটা খুবই সঙ্গত ও স্বাভাবিক। ক্যান্টিনের জন্য বোর্ড ভারি সুন্দর প্রশস্ত একটি কুটীর পেয়েছেন। তার সঙ্গে আবার রয়েছে বাগান আর লন। যেখানে ব্রিটিশ এবং ভারতীয় সৈন্যদের আড্ডা জমে। কারণ ভোর বেলা থেকে রাত্তির ন'টা পর্যন্ত যে কোন সময়ে চা পাওয়া যায়। চা যদি ফুরিয়ে না যায় তবে ক্যান্টিন বন্ধ হয়ে যাবার পর বেশি রাত্রে এলেও চা না পেয়ে কেউ ফিরে যায় না। পরিষ্কার লম্বা টেবিলের চারধারে এসে বসে' সৈন্যরা গল্প করে। অসম্ভব সস্তা দামে এখানে বান্ ও বিস্কুট বিক্রি হয়; আর চায়ের তো কোন দামই লাগে না। তাছাড়া সৈন্যরা সিগারেটও এখানে সস্তায় পায়, দেশলাই পায় বিনামূল্যে। ক্যান্টিনটি অবশ্য আমোদ-প্রমোদের জায়গা নয়, কিন্তু আজ তাই প্রায় হয়ে উঠেছে। ক্যান্টিনের যিনি ম্যানেজার তিনি সর্ব্বদাই হাসিমুখে সৈন্যদের অভ্যর্থনা করেন। তিনি যেন এদের বন্ধু। যতই ব্যস্ত থাকুন, যদি কোনো ভারতীয় সৈন্য বাড়ীতে চিঠি লিখতে চায়, তবে কখনো তিনি তাকে বিমুখ করেন না। এখান থেকে চলে যাবার আগে "অসংখ্য পেয়ালা চায়ের জন্যে' কোনো সৈনিকই ম্যানেজারকে ধন্যবাদ দিয়ে যেতে ভোলে না।"

দীপালীর স্বত্বাধিকারী শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত, ১২৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, দীপালী প্রেসে মুদ্রিত।

প্রধান সম্পাদক—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় :: সহঃ সম্পাদক—শ্রীধীরেন্দ্রমোহন মজুমদার বি. এল.

১৬শ বর্ষ VOL. XVI. } ২৪শে চৈত্র ১৩৫০ :: April 6, 1944 | { ১৪শ সংখ্যা No. 14

আলোচনী

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় পরিষদে সম্পূর্ণ ফাইনান্স বিল বাতিল হইয়াছে। প্রধানতঃ কংগ্রেস ও মুসলীম লীগ পার্টি বাজেট প্রস্তাবগুলির বিরুদ্ধতা করিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্ট দল ভোটে পরাজিত হইয়াছেন। ইহা সত্ত্বেও বিরুদ্ধপক্ষ সম্মিলিত ভাবে শাসনভার গ্রহণ করিতে পারেন না, বর্ত্তমান অবস্থায় তাহা প্রায় অসম্ভব। অন্য কোন স্বাধীন দেশ হইলে এই পরাজয়ের পর সরকার পক্ষকে পদত্যাগ করিতে হইত। এ দেশের অফিসিয়াল শাসিত গঠনতন্ত্রে এইরূপ কোন বালাই নাই। আজ যাহা গণপ্রতিনিধিরা বাতিল করিলেন, কালই ভাইসরয়ের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করিবে। এইরূপ চলিয়া আসিতেছে। কাজেই সরকার পক্ষের পরাজয়ে একটা শাসনতান্ত্রিক land-slide ঘটিয়া যাইবে এইরূপ চিন্তা করিবার কারণ নাই।

* * *

এবার বাজেট আলোচনার মধ্যভাগেই কংগ্রেসদল অধিক সংখ্যায় পরিষদে যোগদান করেন। দলগত ভারসাম্য ইহার ফলে বিপর্য্যস্ত হইয়াছে এবং বাজেট আলোচনার প্রতি অধ্যায়ে প্রতিরোধ তীব্রতর হইয়াছে। কংগ্রেস ও লীগ একযোগে সরকারী প্রস্তাবের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছেন ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়। পরাজয়ের পর বক্তৃতায় ফাইনান্স মেম্বার কংগ্রেস ও লীগকে উদ্দেশ করিয়া উপদেশ বর্ষণ করিয়াছেন, প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের আমেজও তাহাতে ছিল। কংগ্রেস লীগ শুধু প্রতিরোধ ব্যবস্থায়ই মিলিত হইয়াছেন, গঠনমূলক কাজে তাহাদের মিলিত প্রচেষ্টা দেশের কল্যাণ সাধন করিত, মাননীয় সদস্য মহোদয় এইরূপ বলিয়াছেন। কিন্তু এই মিলনের পথে বাধা কোথা হইতে এবং কেন আসিতেছে তাহার সংবাদ মাননীয় সদস্য মহোদয় জানেন না ইহা কি আজও আমাদের বিশ্বাস করিতে হইবে?

* * *

লীগের সহিত এই মিতালীর পশ্চাতে কংগ্রেসের পাকিস্থান সমর্থনের মনোভাব রহিয়াছে এইরূপ কেহ কেহ বলিতেছেন। সম্প্রতি লর্ড ওয়াভেল ভারতের ভৌগোলিক অখণ্ডতার উপর জোর দিয়াছেন। বর্ত্তমান পরিষদে লীগের প্রতিরোধ প্রচেষ্টা ভারত সরকারের এই মনোভাবের প্রতিবাদ মাত্র। কোন কোন মহলের মত কংগ্রেস লীগের সহিত মিলিতভাবে যে প্রতিরোধ করিতেছেন তাহাতে প্রকারান্তরে পাকিস্থানের দাবী সমর্থন এবং লর্ড ওয়াভেলের অখণ্ড-ভারত-নীতির প্রতিবাদ করা হইয়াছে। আমরা ভিতরের কথা জানি না। মিঃ রাজাগোপালাচারীর লীগ-প্রীতি বর্ত্তমান পরিষদের কংগ্রেসী সদস্যদের উপর কতখানি প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহার উপর অনেকখানি নির্ভর করিতেছে। কংগ্রেস ভিন্ন নীতির বশবর্ত্তী হইয়া বর্ত্তমান কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টকে প্রতিরোধ করিতেছেন ইহা হওয়া অসম্ভব নয়। অন্ততঃ কংগ্রেস তাহাই করিবে ইহা জনসাধারণ প্রত্যাশা

করে। সে ক্ষেত্রে এই তথাকথিত unity আকস্মিক ছাড়া আর কিছুই নয়। এক শ্রেণীর রাজনৈতিক এই ব্যাপারকে উপলক্ষ করিয়া যে ধূম্রজালের সৃষ্টি করিতেছেন তাহা দেশব্যাপী ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করিবে। পরিষদের কংগ্রেসী দলের নেতা মিঃ ভুলাভাই দেশাইয়ের যে এ বিষয়ে দায়িত্ব আছে ইহা অনেকেই অনুভব করিবেন।

* * *

এদেশের Sedition আইনের ব্যাপকতার কথা সংবাদপত্রসেবীদের অজ্ঞাত নয়। এই আইনের ইতিহাস খুঁজিলে এ দেশের সাংবাদিক লেখকের দায়িত্বের স্বরূপ কতকটা বোঝা যাইবে। ইহার উপর রহিয়াছে ভারতরক্ষা আইনের জটিলতা। এই চক্রব্যূহের কেন্দ্রস্থলে থাকিয়া সাংবাদিককে নিত্য মত ও পথের সন্ধান দিতে হয়। ইহা তাহার দায়িত্ব ও গৌরব। কিন্তু তাহার জন্য যে মূল্য দিতে হয় তাহার তুলনা হয় না। সম্প্রতি আসামের সাপ্তাহিক পত্রিকা "Sylhet Chronicle"-এর নিকট একটি প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য কর্তৃপক্ষ এক হাজার টাকা জামিন দাবী করিয়াছিলেন। কর্তৃপক্ষের অভিযোগ এই যে, প্রবন্ধটিতে প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ ভাবে গবর্ণমেন্টের উপর ঘৃণা উদ্রেক করে এইরূপ আলোচনা ছিল। কলিকাতা হাইকোর্ট সম্প্রতি আপীলে আসাম সরকারের এই আদেশ নাকচ করিয়া দিয়াছেন। "সিলেট ক্রনিক্‌ল্" পত্রিকার পক্ষে ইহা সুখের কথা সন্দেহ নাই। এই ধরণের দায়িত্বহীনতা এদেশের executive শাসনের অঙ্গের ভূষণ। পত্রিকা সম্পাদক ও প্রকাশকের পক্ষে ইহা কতখানি মারাত্মক তাহার দৃষ্টান্ত প্রচুর রহিয়াছে। এদেশের বিচারালয় কর্তৃপক্ষীয় জুলুমবাজী হইতে সংবাদপত্রকে কতখানি রক্ষা করিতে পারে আজ তাহার বিচিত্র ইতিহাস রচিত হইতেছে।

উপন্যাসের প্রারম্ভ

(বড় গল্প)

—শ্রীশচীন্দ্রনাথ মিত্র

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ছয়

একহাতে একটা বাণ্ডিল নিয়ে, অপর হাতে দোকানের দ্বার-রক্ষী পাঠানটার হাতে কী একটা চিরকুট কাগজ দিয়ে রাজীব দোকান থেকে ফুট-পাথে নামল। তাকে দেখে অস্ফুট স্বরে একটা মন্তব্য প্রকাশ করে লিলি পরিশ্রান্তের মতো গাড়ীর কোনে নিজের দেহটা এলিয়ে দিল। রাজীব এসে গাড়ীর ফুটবোর্ডে পা দিয়ে যেমন গাড়ীর মধ্যে উঠতে যাবে ঠিক সেই সময় পাশ থেকে মিষ্টি গলায় কে যেন ডাকল: "আল্লো গস্।"

ছোট একটা লেডিস্ ছাতা দোলাতে দোলাতে একটা ফিরিঙ্গী যুবতী মেয়ে এগিয়ে এসে রাজীবের হাত চেপে ধরল।

"আল্লো গস্—তুমি এদিকে কোথায় এসেছিলে?"

তাকে দেখেই রাজীবের মুখ ছাইয়ের মতো সাদা হয়ে গেল। লিলিও কৌতূহলী হয়ে গাড়ীর মধ্যে থেকে বাইরে মুখ বাড়াল। লিলির দিকে সভয়ে একবার চেয়ে নিয়ে, কাষ্ঠ হাসি হেসে আমতা আমতা করে রাজীব বলল: "...ইয়ে...কেটি যে ভাল তো সব?"...

কেটী লিলিকে প্রথমে দেখতে পায় নি; এখন গাড়ীর মধ্য থেকে তাকে মুখ বাড়াতে দেখে তাড়াতাড়ি রাজীবের হাত ছেড়ে দিয়ে ঈষৎ অপ্রতিভ ভাবে সে বলল: "হ্যা... আমরা সব ভাল আছি কিন্তু..."

চোখের ইঙ্গিতে লিলিকে দেখিয়ে দিয়ে সে জিজ্ঞাসা করল; "উনি কে? তোমার কোন আত্মীয়? আমাদের পরিচয় করিয়ে দেবে না?"

ব্যস্ত হয়ে রাজীব বলল: "নিশ্চয়—নিশ্চয়—ইনি হচ্ছেন আমার একজন নিকট আত্মীয়া—মিস্ লিলি গুপ্তা..."

কেটী লিলির উদ্দেশে কর-মর্দ্দন করবার জন্য একটা হাত বাড়িয়ে দিল। লিলি মুখে কিছু না বলে গম্ভীর ভাবে তার কর-মর্দ্দন করল। পূর্ব্বকথার জের টেনে রাজীব বলল: "আর ইনি হচ্ছেন মিস্ কেটী স্মিথ—আমার একজন বিশ্বস্ত টাইপিষ্ট...বড় কাজের মেয়ে..."

এই বলে কেটির দিকে চেয়ে সে একটু হাসবার চেষ্টা করল। কেটীর পরিচয় শুনে লিলি আবার গাড়ীর কোণে নিজের দেহ এলিয়ে দিল। লিলির তাচ্ছিল্য এবং রাজীবের অস্বস্তির ভাব লক্ষ্য করে ঘটনার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে কেটীর বিলম্ব হল না। দু' একটা কথা বলে রাজীবের নিকট থেকে ভদ্রভাবে বিদায় গ্রহণ করে সে তাড়াতাড়ি প্রস্থান করল। রাজীব গাড়ীতে উঠে বসল, প্রকাশ গাড়ী ছেড়ে দিল।

গাড়ীর মধ্যে রাজীবের পাশে বসে লিলি গম্ভীর মুখে রাস্তার দিকে চেয়ে ছিল। প্রকাশের প্রতি রাজীবের অভদ্র ব্যবহারের নিমিত্ত তার মন পূর্ব্ব থেকেই খারাপ হয়েছিল। এখন আবার কেটীর আবির্ভাবে এবং ফুটপাতে দাঁড়িয়ে রাজীবের সঙ্গে তাকে ওই রকম ঘনিষ্ঠ ভাবে আলাপ করতে দেখে এবার সে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়ল। ভাবল—মনিবের নাম ধরে ডাকবার এবং তার সঙ্গে ওই রকম ঘনিষ্ঠ ভাবে আলাপ করবার স্পর্দ্ধা একটা নগণ্য টাইপিষ্টের পক্ষে অত্যন্ত অস্বাভাবিক!—হলেই বা সে লেডী টাইপিষ্ট! আর রাজীবের মতো একজন বাঙ্গালী যুবকের পক্ষে লেডী টাইপিষ্ট রাখবারই বা প্রয়োজন কী? দেশে কি পুরুষ টাইপিষ্ট পাওয়া যায় না? বহুকাল যাবৎ ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের মধ্যে মেলামেশা করার ফলে কেটীর মতো মেয়েদের সঠিক পরিচয় অবগত হবার অভিজ্ঞতা তার হয়েছিল। কেটীর ভাব-ভঙ্গী দেখে সে যে ঠিক কোন শ্রেণীর মেয়ে তা বুঝতে লিলির একমুহূর্ত্তও বিলম্ব হয় নি। কিন্তু কেন এ দুর্ব্বলতা রাজীবের? যে দেশের হাজার হাজার শিক্ষিত বেকার পয়সার অভাবে একবেলাও ভাল করে পেট পুরে খেতে পায় না, যে দেশের হাজার হাজার কেরাণী টাইপিষ্ট পয়সার অভাবে তাদের সারা জীবনের পরিশ্রমের বিনিময়েও তাদের ছোট ছোট ছেলে মেয়েগুলোর মুখে কখনও একটা স্বাস্থ্যকর খাদ্য তুলে দিতে পারে না, যে দেশের হাজার হাজার চাকুরীয়া পয়সার অভাবে তাদের ছেলেমেয়েদেরকে ভাল করে লেখাপড়া শেখাবার সুযোগ পায় না, পয়সার অভাবে উপযুক্ত বয়সে বিবাহ করতে না পারার জন্য যে জাতীয় মেরুদণ্ড আজ ব্যাভিচারের মারাত্মক বিষে জর্জ্জরিত! সেই দেশের ছেলে হয়ে কিসের লোভে, কী অজুহাতে পুরুষ টাইপিষ্টদের তুলনায় চার পাঁচগুণ বেশী বেতন দিয়ে রাজীব তার অফিসে লেডি টাইপিষ্ট নিযুক্ত করেছে? লিলির বুক কেঁপে উঠল। এতদিন পরে হঠাৎ আজ তার মনে সংশয় জাগল,

রাজীবকে চিনতে সে ভুল করে নি তো? সঙ্গে সঙ্গে নিজের চিন্তায় নিজেই সে বিস্মিত হল। এমন করে চিন্তা করবার প্রেরণা তার জীবনে আর তো কখনও আসেনি!

পার্ক ষ্ট্রীটের মোড়ে এসে যখন গাড়ী পৌঁছল তখন লিলি হঠাৎ রাজীবকে জিজ্ঞাসা করল: "তুমি এখন বাড়ী যাবে তো? তাহলে তোমায় নামিয়ে দিয়ে যাই।"

বাড়ী যাবার ইচ্ছা রাজীবের আদৌ ছিল না, সে মুখ কাঁচু-মাচু করে বলল: "গেলেও হয় না, গেলেও হয়..."

লিলি আর কিছু বললে না: কিছুক্ষণ পরে গাড়ী এসে লিলিদের গেটের মধ্যে ঢুকল। বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করবার সময় আজ প্রথম লিলি রাজীবের নিকট থেকে ভদ্র ভাবে বিদায় নিতে ভুলে গেল।

সাত

মিঃ গুপ্ত অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়লেন। রাজীব সুস্থ শরীরে এই কলকাতাতেই অবস্থান করছে অথচ আজ প্রায় পনের দিন হলো সে এ বাড়ীতে আসেনি। যে রাজীবের এক সময়ে সকাল-বিকাল নিয়মিত ভাবে এ বাড়ীতে হাজিরা দিতে কখনও ব্যতিক্রম হয় নি তার আজ হোল কী? বিশেষতঃ তার কারবারের অবস্থা ইদানীং এমনই শোচনীয় হয়ে দাড়িয়েছে যে মিঃ গুপ্তের তার সঙ্গে শীঘ্রই সাক্ষাৎ হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু সে নিয়মিত ভাবে অফিসেও যায় না, কখন কোথায় যায় তারও কোন স্থিরতা নেই,—এরূপ ক্ষেত্রে মিঃ গুপ্তর পক্ষে মনে মনে অস্থির হয়ে ওঠা ছাড়া আর উপায় কী? কন্যাকে ডাকিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: "হ্যাঁ মা, তার সঙ্গে তোমার কোন রকম ঝগড়া-ঝাঁটি হয় নি তো?"

লিলি সবিস্ময়ে বলল: "সে কি বাবা! আমি তার সঙ্গে ঝগড়া করতে যাব কেন?"

"তবে? আজ প্রায় পনের দিন হতে চলল—সে এ বাড়ীতে আসে নি কেন?"

"সেটাও কি আমার জানাবর কথা বাবা?"

ভ্রূকুঞ্চিত করে লিলি পিতার দিকে তাকাল। মিঃ গুপ্ত কন্যার মুখের দিকে না চেয়ে পূর্ব্ববৎ চিন্তিত স্বরে বললেন: "তাই তো...তা তুমি তাকে একবার জিজ্ঞাসা কর না কেন মা?"

"আমি তো তার কোন প্রয়োজন দেখছি না বাবা। তাছাড়া সে কখন কোথায় থাকে তাও তো আমি জানি না।"

অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে লিলি উত্তর দিল। এবার মিঃ গুপ্ত কন্যার মুখের দিকে চাইলেন। সঠিক ভাবে না জানতে পারলেও তিনি অনুমান করলেন রাজীবের সঙ্গে নিশ্চয়ই লিলির কোন রকম মান-অভিমানের পালা চলেছে। তার বিরক্তি পূর্ণ মুখের দিকে চেয়ে সস্নেহ হাস্যে মিঃ গুপ্ত বললেন: "পাগলি! কি হয়েছে বল দেখি? তুই কি তার উপর রাগ করেছিস? কিন্তু দেখিস মা, আজ বাদে কাল যে তোর স্বামী হবে তার সঙ্গে যেন কোন রকম অভদ্র ব্যবহার করে ফেলিস নি! তুই যা পাগলী মেয়ে, সে হয়তো তোকে ভুল বুঝতে পারে না!"

উত্তেজিত কণ্ঠে লিলি বলল: "তুমি থাম বাবা। কে আমাকে ভুল বুঝলো না বুঝলো তাতে আমার কিছু আসে যায় না।"

স্নিগ্ধ হাস্যে মিঃ গুপ্ত বললেন: "ওই দেখ, পাগলী মেয়ে কি বলে!" এমন সময় প্রকাশ এসে ঘরে ঢুকলো। লিলি তার উদ্দেশ্যে বলল: ""আজ বিকেলের কথা মনে আছে তো আপনার?"

"কী বলুন তো?"

প্রকাশ বিস্মিত হয়ে লিলির দিকে চাইল। লিলি মাথা হেলিয়ে কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে বলল: "যা ভেবেছি তাই। আজ বিকেলে আমায় থিয়েটারে নিয়ে যেতে হবে না বুঝি?..."

প্রকাশ কথাটা সত্যিই ভুলে গিয়েছিল। অপ্রস্তুত ভাবে বলল: "ইস্..."

"আপনারও দেখছি বাবার মতো "ইসে" ধরলো।"

লিলির কথায় প্রকাশ ও মিঃ গুপ্ত দুজনেই হেসে উঠলেন। রাজীব সম্বন্ধে

আলোচনা করতে গিয়ে পিতা-পুত্রীর মনের মধ্যে এতক্ষণ ধরে যে অশান্তির মেঘটা জমে উঠেছিল, সেটা যেন সরে গেল: ঘরের আবহাওয়া আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলো।

লিলি বলল: "জান বাবা, লিট্‌ল থিয়েটারে আজ একটা Charity show আছে। টাকাটা বীরভূমের দুর্ভিক্ষ Fund-এ যাবে। প্রকাশবাবু আর আমি দুজনে মিলে একটা বক্‌স্ নিয়েছি।"

কৃত্রিম বিস্ময়ে চোখ দুটো যতদুর সম্ভব বিস্ফারিত করে মিঃ গুপ্ত বললেন: 'বলিস কী? বাঙলা থিয়েটারে যাবি? প্রকাশ, সূর্য্যটা আজ কোনদিকে উঠেছে হে?'

সকলেই হেসে উঠলেন। চোখ মট্‌কে লিলি বলল: "বা: টাকাটা যে দুর্ভিক্ষ Fund-এ যাচ্ছে! সকলে মিলে বাংলা থিয়েটারকে এড়িয়ে চললে টাকা উঠবে কি করে বল? বাঙলা থিয়েটার কি থিয়েটার নয়?"

মিঃ গুপ্ত হাসলেন, কিন্তু মনে মনে অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। যে লিলি চিরকাল বাঙলা থিয়েটারকে ঘৃণার চক্ষে দেখে এসেছে সেই লিলি হঠাৎ আজ কিসের প্রেরণায় বাঙলা থিয়েটারের সুখ্যাতিতে এত মুখর হয়ে উঠল! বাঙলা থিয়েটারে Charity show আজ নূতন নয়, দুর্ভিক্ষ বন্যাও ভারতবর্ষে আজ নতুন নয়, তবে? মুখে কিছু না বললেও লিলির এই পরিবর্ত্তনে সত্যই তিনি সুখী হলেন। উৎসাহিত হয়ে উঠে তিনি কন্যাকে বললেন: "বেশ মা বেশ! আমি বড় সুখী হলাম। কিন্তু রাজীব? সে যাবে না?"

লিলির মুখ আবার গম্ভীর হয়ে উঠল। বলল: "আর কে যাবে না যাবে তা তো আমি জানি না বাবা।"

এই বলে সে দ্রুতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। রাজীবের সম্বন্ধে কন্যার এই অবজ্ঞা দেখে মিঃ গুপ্ত আবার বিচলিত হয়ে পড়লেন। প্রকাশকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন: "এদের হোল কী? তুমি কিছু জান বাবা?"

মিঃ গুপ্তের প্রশ্নে প্রকাশ একটু বিব্রত হয়ে পড়ল। সে বুঝতে পেরেছিল অনেক কিছুই, কিন্তু সকল কথাতো মিঃ গুপ্তকে খুলে বলা যায় না। ইতস্ততঃ করে সে বলল: "তা তো জানি না কাকাবাবু। তবে মনে হয় মিস গুপ্তার মনে একটা পরিবর্ত্তন এসেছে; মিঃ ঘোষের অনেক কিছুর সঙ্গে উনি যেন আজকাল নিজেকে ঠিক পূর্ব্বের মত খাপ্ খাওয়াতে পারছেন না।"

মিঃ গুপ্ত চিন্তিত স্বরে বললেন: "তাই তো, এ যে বড় ভাবনার কথা হল। ভবিষ্যতে যখন একসঙ্গে সংসার করতে হবে তখন দুজনার দুটো মতবাদ থাকলে তো ওরা সুখী হতে পারবে না!"

মিঃ গুপ্ত থামলেন। প্রকাশ কুণ্ঠিত মুখে তাঁর দিকে চেয়ে রইল। মুখ নীচু করে কিছুক্ষণ কী যেন চিন্তা করে মিঃ গুপ্ত মুখ তুলে বললেন: "দেখ বাবা প্রকাশ, আমি লক্ষ্য করে দেখেছি, লিলি যেন পূর্ব্বের মতো তোমার উপর অসন্তুষ্ট নয়; তা তুমি কেন ওকে বন্ধু ভাবে একটু বুঝিয়ে বল না বাবা!"

"আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করবো কাকাবাবু।" এই বলে সে তাড়াতাড়ি একটা বই চোখের সামনে খুলে বসল।

আট

অভিনয় আরম্ভ হবার কিছু পূর্ব্বে প্রকাশ ও লিলি তাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট বক্‌সটীতে গিয়ে বসল। উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোক সমাচ্ছন্ন বিরাট প্রেক্ষাগৃহটীর মধ্যে তখন অসংখ্য লোক গিস্ গিস্ করছিল। লিলি নীচের দিকে মুখ বাড়িয়ে দেখে বলল: "বাঙলা থিয়েটারে তো বেশ ভীড় হয় দেখছি।" মাথা নেড়ে প্রকাশ বলল: "শুনেছি সাধারণতঃ হয় না। তবে আজ Charity show বলেই বোধ হয় কিছু বেশী বিক্রী হয়েছে।"

লিলিকে মুখ বাড়াতে দেখে নীচের হল থেকে কয়েকটী যুবক এক প্রকার বিচিত্র সুরে শিস্ দিয়ে উঠল, তারা যেন এতক্ষণ একান্ত ভাবে লিলির মুখ বাড়ানোরই অপেক্ষা করছিল। ওদিকটায় পিট থেকেও কয়েকটি যুবক উচ্চৈঃস্বরে এমন একটা মন্তব্য প্রকাশ করল যা লিলিদের সমাজে অচল। অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে তাড়াতাড়ি মুখ সরিয়ে নিয়ে লিলি বলল: "বাংলা দেশের থিয়েটারগুলো উঠে যাওয়া উচিত। ছিঃ ছিঃ, যত সব ছোট-লোক বিড়িওয়ালার আড্ডা।" লিলির উষ্মা দেখে প্রকাশ হাসল। লিলি জিজ্ঞাসা করল: "হাসলেন যে?"

প্রকাশ বলল: "হাসলাম আপনার কথা শুনে। একদিনের জন্য থিয়েটার দেখতে এসে আপনি এতখানি উত্তেজিত হয়ে উঠলেন!"

ভ্রূকুঞ্চিত করে লিলি বললে: "হব না, ছিঃ ছিঃ······আচ্ছা ওরা তো সব ভদ্র মহিলা?"

[ইহার শেষ অংশ ১২শ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

কমরেড লেনিন

—শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

কার্ল মার্কস
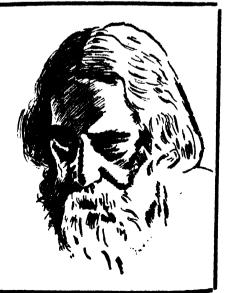
লেনিনকে বুঝতে হলে মার্কস্‌কে জানতে হবে। তাঁর কথাই আগে বলি:

ছোট বাড়ীখানির স্বল্প পরিসর বারান্দা, সেই বারান্দার সামনে একখানি ইজি চেয়ারের উপর বসে আছেন এক পঁয়ষট্টি বছরের বৃদ্ধ। মাথার চুল সাদা হয়ে গেছে, এলোমেলো পাকা দাড়ী, আনমনে আকাশের পানে তাকিয়ে তিনি কি যেন ভাবছেন। সামনের পথ দিয়ে কত মানুষের ভীড় এগিয়ে চলেছে, কিন্তু এই বৃদ্ধের পাশে আজ আর কেউ নেই, আজ তিনি বড় নিঃসঙ্গ, বড় একা।

একটি ছেলে পথ দিয়ে যাচ্ছিল, থমকে দাঁড়ালো, বললে—গুড্ মর্ণিং, ডক্টর!

আকাশের গা থেকে ডক্টরের চোখ নেমে এলো ছেলেটির মুখের উপর। ঠোঁটের কোণে একটুখানি হাসি টেনে এনে তিনি শ্রান্ত স্বরে বললেন—গুড্ মর্ণিং!

—কেমন আছেন, 'রেড টেররিষ্ট ডক্টর'?

—ভাল!

ছেলেটী চলে গেল, 'রেড টেররিষ্ট ডক্টর' ছেলেটীর চঞ্চল গতির পানে তাকিয়ে রইল। আজকের বার্দ্ধক্যের সঙ্গে কৈশোরের ঔজ্জ্বল্যকে মিলিয়ে দেখলো হয়তো। কত কথাই জেগে উঠলো তার মনে:

সে আজ প্রায় পঞ্চাশ বছর আগের কথা। ইস্কুলের পড়া শেষ হতেই বাবা একদিন ডেকে বললেন—কার্ল, তোমাকেও উকিল হতে হবে।

বাবা নিজে ছিলেন উকিল। কার্লকে তিনি ভর্তি করে দিয়ে গেলেন—'বণ বিশ্ববিদ্যালয়ে'।

কার্ল আইন পড়া সুরু করলেন। কিন্তু সে ওই কলেজের ক্লাশ-টুকুর মধ্যেই। তাছাড়া অবসর সময় তিনি আইন যত পড়েন তার চেয়েও বেশী পড়েন দর্শন ও ইতিহাস।

পড়তে পড়তে মাথার মধ্যে চিন্তার ঝড় ওঠে! কার্ল আর চুপ করে বইয়ের মধ্যে মনোনিবেশ করতে পারে না, কাগজ কলম নিয়ে বসেন, পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা লিখে চলেন। চিন্তাধারার ক্রমঃরেখা লিপিবদ্ধ হতে থাকে সাদা কাগজের বুকে কালির কালো রেখায়।

ছেলেটী পড়ে আর লেখে।

রাত্রিতে ঘুম নেই, চোখ দুটি লাল, মাথার চুল উস্কোখুস্ক, বহুদিনের অবিশ্রান্ত লেখাপড়ার ক্লান্তি জমে ওঠে দেহে আর মনে। অসুস্থতা দেখা দিল।
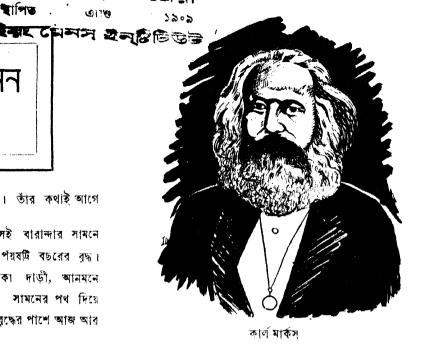
এতদিন দেহের দিকে তাকাবার অবসর মেলেনি, এবার ডাক্তারকে দেখাতে হোল, ডাক্তার বললেন—বিশ্রাম চাই, পড়াশুনা বন্ধ করুন।

একান্তভাবে বিশ্রাম করার নির্দেশ শুনেই তার মনটা খুসি হয়ে উঠলো, অনেকদিন ধরে নিরবচ্ছিন্ন বিশ্রাম করা তার ঘটে ওঠেনি, আজ সেই বিশ্রামের আশায় তিনি বেরিয়ে পড়লেন শহর ছেড়ে।

আবার সেই ত্রেভিস্! ছোট শহর, তার জন্মভূমি। সেখানে আছে যত একান্ত পরিচিত মুখ—মা বাবা ভাই বোন আর বান্ধবী জেনী।

জেনীদের বাগানে ঘুরে বেড়াবে। রঙীন ফুলগুলি হাওয়ার দোলা লেগে গায়ে মাথায় বসন্তের ছোঁয়া জাগিয়ে যাবে। অখণ্ড অবসর কেটে যাবে বড় পাইন গাছটীর গায় হেলান দিয়ে, তাকিয়ে থাকবে আকাশের দিগন্তে, এলোমেলো উড়ে যাওয়া মেঘগুলির পানে। পাশে বসে থাকবে জেনী, অনেক দিনের অনেক কথা হবে তার সঙ্গে, যখন আর কথা বলতে ভালো লাগবে না, জেনী একখানি গান গাইবে হয়তো। অপরূপ মাধুর্য্যে দিনগুলি তরল হয়ে আসবে বরফের মত।

কিন্তু সে-স্বপ্ন স্বপ্নই রয়ে গেল, খবর এলো জেনীর অসুখ।

কার্লও এবার শয্যায় আশ্রয় নিলেন।

কিন্তু চুপ চাপ পড়ে থাকার মত মন তাঁর নয়, রোগশয্যাতেই তিনি সুরু করলেন দার্শনিক হেগেলের দর্শন পড়তে।

রোগশয্যাতেই হেগেল পড়া শেষ হোল।

হেগেল তাঁর মনের মাঝে কি ঝড় তুলেছিল জানি না, অসুখ থেকে উঠেই তিনি এক নতুন কাজ করলেন। এতদিন ধরে মনের কোণে যখনই যা দোলা দিয়েছে, তখনই তা রূপায়িত করেছেন গল্পে, আর কবিতায়। আজ সহসা এক নতুন সত্তা উদ্‌ভাসিত হোল, মনে হোল:

ওগুলো সব একান্ত নিষ্প্রয়োজন। একটি একটি করে সব লেখা পুড়িয়ে ফেললেন, হাত এতটুকু কাঁপলো না।

তারপর আবার মন দিলেন কলেজের পড়াশুনায়।

কিন্তু আইনের ঘোরপ্যাঁচের চেয়ে দর্শনের গূঢ়তত্ত্বেই তাঁর সময় কাটে ভালো।

পিতার কিন্তু এসব ভালো লাগে না, একদিন বললেন—দেখো, তোমার সহপাঠীরা পড়াশুনা করে কেমন ভবিষ্যৎ গড়ে নিচ্ছে, তুমিও আগে তাই কর। পাশ করে একটা পাকা রোজগারের ব্যবস্থা করে সারাজীবন ধরে দর্শনের চর্চা করো, কেউ কিছু বলবে না।

কথাটা ছেলেটীর মনে লাগে না। সামান্য একটা চাকরীই কি জীবনের সবচেয়ে বড় সত্য হয়ে দেখা দেবে? টাকার বিনিময়ে নিজেকে বিক্রী করে ফেলাই কি সবচেয়ে বড় কথা!

কিন্তু মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলের শুধু পড়াশুনা করেই জীবন কাটানো চলে না, নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য একটা অর্থের ভিত্তি থাকা চাই, যার উপর নির্ভর করে সারাজীবন নিশ্চিন্ত থাকা চলবে। বন্ধু একদিন বললেন—আগে ডিগ্রিটা নাও, কলেজে অধ্যাপকের একটা চাকরী পাবে। ছাত্র মহলে তখন তোমার মতের অন্য একটা মূল্য দেখা দেবে, তাছাড়া আর্থিক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে সারা জীবনের মত।

—কিন্তু চাকরী তো!

—এতো সম্মানের চাকরী, কেরাণীগিরি তো নয়। নিজে পড়বে, ছেলে মেয়েদের পড়াবে···

কথাটা মার্কসের মনে লাগলো, তিনি পি-এইচ-ডি ডিগ্রি পাবার জন্য থিসিস্ লিখতে সুরু করলেন। ক'মাসের মধ্যে এপিকিউরাস ও ডেমক্রিটাসের দর্শন সম্পর্কে আলোচনা করে মার্কস ডক্টর উপাধি পেলেন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে।

ডিগ্রি হোল, কিন্তু চাকরী হোল না।

সোজা কথা যারা সহজভাবে বলতে পারে, স্বাধীনভাবে চিন্তা করে, স্পষ্ট মতামত ব্যক্ত করার মত স্পর্দ্ধা যারা রাখে, তাদের উপর ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার ভার দিতে কর্ত্তৃপক্ষেরা চিরদিনই শঙ্কিত হয়, প্রাশিয়াতেও তার ব্যতিক্রম হোল না! মার্কস্ অধ্যাপকের চাকরী পেলেন না।

কিন্তু সেজন্য বসে থাকতে হোল না বেশী দিন। রাইনল্যাণ্ড থেকে একখানি কাগজ বেরুতো—'রাইনিশ-জাইতুং'। এতদিন সেই পত্রিকাতে ইনি নিয়মিত লিখছিলেন, এখন সেটীর সম্পাদক হবার জন্য তাঁকে ডাকা হোল।

মার্কস্ সম্পাদক হলেন।

পরের কাগজে যে-সব কথা লিখতে এদ্দিন বাধা ছিল, নিজের কাগজে আর সে বাধা রইল না। মনে তখন তাঁর ভাবী কালের চিন্তা, চোখে তখন নতুন দিনের স্বপ্ন, লেখনীর মুখেও সেই বিপ্লবী চিন্তাধারা ফুটে ওঠে ছত্রে ছত্রে।

সম্পাদকীয় প্রবন্ধ পড়েই পুলিশের টনক নড়ে উঠলো, পত্রিকার পরিচালকদের ডেকে বললে—সুর নরম করতে হবে!

সেই আদেশই হাত-ফের হয়ে এলো মার্কসের কাছে। মার্কস্ মৃদু হাসলেন, বললেন—আমি পারবো না, চাকরী ছাড়লাম

চাকরী ছেড়ে দিয়ে আবার তিনি ডুবে গেলেন পড়াশুনার মধ্যে।

দিনের পর দিন, রাতের পর রাত পড়তে পড়তে বোধ হয় একদিন মার্কসের মনে শ্রান্তি এল, একান্তভাবে মনের মত কাউকে কাছে পাবার কামনা জাগলো মনে, ক্লান্তি-বিনোদিনী এক সাথীর অভাব দোলা দিয়ে গেল তাঁর অন্তরে। সেইদিনই জেনীকে ডেকে বললেন—আমি তোমাকে জীবন-সাথী করতে চাই!

জেনী বয়সে ছিলেন চার বছরের বড়। মস্ত বড় লোকের মেয়ে, কিন্তু সেজন্য দম্ভ ছিল না এতটুকু। কার্লের জ্ঞান আর ব্যক্তিত্ব তাঁকে মুগ্ধ করেছিল, মৃদু হেসে বললেন—ক্ষতি কি!

জেনীর বাবা ছিলেন গবর্ণমেণ্টের প্রিভি-কাউন্সিলার, পয়সার চেয়ে তিনি ব্যক্তিত্বকেই পছন্দ করতেন বেশী। কার্লের পড়াশুনার গভীরতা আর সত্যানুসন্ধানী মতকে তিনি ভালবাসতেন, সাধারণ ঘরে মেয়ের বিয়ে দিতে তাই তাঁর কোন আপত্তিই উঠলো না। (ক্রমশঃ)

প্রশ্ন

(নারীদের প্রয়োজনীয় সমস্ত প্রশ্ন ও উত্তর এই বিভাগে নিয়মিত প্রকাশিত হইবে। নাঃ সঃ)

প্রত্যেক ছেলের যেমন তাহার ভাবী স্ত্রী সম্বন্ধে একটা কল্পনা থাকে তেমনি মেয়েদের মনেও তাহাদের ভাবী স্বামীটির সম্বন্ধে একটা ধারণা গড়িয়া উঠে। অবশ্য স্বামী বলিতে স্বামীর পরিবার, সাংসারিক অবস্থা, তাহার চেহারা ও অন্যান্য বহু বিষয় অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

আমার বন্ধুদের মধ্যে অনেককেই তাহাদের কল্পিত স্বামীর সম্বন্ধে আমি জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াছি। অনেকে লজ্জিত হইয়া প্রশ্নটি এড়াইয়া গিয়াছে; কেহ কেহ যা তা একটা মিথ্যা কথা বলিয়াছে; এবং কেহ কেহ ঠিক সত্য কথাও বলিয়াছে। বয়ঃপ্রাপ্তা অবিবাহিত মেয়ের পক্ষে স্বামী সম্বন্ধে আলোচনা করা যে খুব অন্যায় বা গর্হিত কার্য্য ইহা আমি মনে করি না। যাহাকে লইয়া চিরজীবন ঘর করিতে হইবে যাহার জীবনের ও পরিবারের সঙ্গে একটি মেয়ের সমগ্র জীবন অচ্ছেদ্যভাবে আবদ্ধ, তাঁহার সম্বন্ধে আলোচনায় অন্যায়টা কোন্‌খানে?

বিলাতী মেয়েদের ম্যাগাজিনে অনেক বিষয় প্রকাশ্যে আলোচিত হয়, যাহার আমরা সু বা কুফল ঠিকই ভোগ করি, কিন্তু আলোচনা করিতে লজ্জিত হই। ইহাকে আমি দূষ্য বিবেচনা করি।

হয়ত স্বনামে এ সম্বন্ধে প্রকাশ্যে আলোচনা করিতে কেহই রাজী হইবেন না। না হউন, বেনামে বা ছদ্মনামে আলোচনা হইলেই বা ক্ষতি কি?

অতএব আমি আমার অবিবাহিতা ভগিনীদের নিকট একটি প্রশ্ন উপস্থাপিত করিতেছি।

প্রশ্ন (১)

তাঁহারা কি প্রকার স্বামী চাহেন?

—কুমারী অনুপমা দেবী
হাজরা রোড, কলিকাতা

[পত্রের উত্তরগুলি আমরা বেনামে বা ছদ্মনামে প্রকাশিত করিতে প্রস্তুত আছি কিন্তু তাহাতে লেখিকার আসল নাম ও ঠিকানা থাকা দরকার। বলা বাহুল্য নারীলোক বিভাগের সব কিছুই গোপন রাখা হয়, এ বিষয়ে সকলেই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন। নাঃ সঃ]

প্রশ্ন (২)

আজকালকার মেয়েরা বিবাহ করিয়া সংসারধর্ম্ম পালন ইচ্ছা করেন, না স্বাধীনভাবে জীবিকা উপার্জ্জন করিয়া স্বতন্ত্রভাবে বাঁচিতে চাহেন?

—কুমারী নিরুপমা দেবী
হাজরা রোড, কলিকাতা

[উত্তরগুলি খুব সংক্ষিপ্ত হওয়া চাই। কি নামে উত্তর প্রকাশিত হইবে, তাহাও জানাইবেন। নাঃ সঃ]

রান্নাঘর

ডালবাটার পুরী

ছোলার ডাল সিদ্ধ করিয়াই সকলে ডালপুরী করিয়া থাকেন। সময় বা কয়লার অভাবে আজকাল যখন তখন ডালপুরী করা কঠিন হইয়াছে, কিন্তু ডাল বাটিয়া ডালপুরী খুব ভাল হয়। কয়লা এবং সময়ও খুব কম লাগে। মটর কিংবা ছোলার ডাল একটু ঘিঁচ রাখিয়া বাটিতে হইবে, তাহাতে পরিমাণমত: আদা, মসলা, লঙ্কা, পেঁয়াজ বাটা, ও নুন, হলুদ, মিষ্টি দিয়া অল্প ঘিতে জীরা ফোড়ন দিয়া ডাল বাটাটি ভাল করিয়া ভাজিতে হইবে। বেশ ভাল ভাজা ভাজা হইলে নামাইয়া একটু সুগন্ধ ভাল ঘি মাখাইয়া লইলে ভাল হয়। তারপর আটার নেচির মধ্যে পুরিয়া বেলিয়া অল্প ঘি দিয়া চাটুতে সেঁকিয়া লইলেও হয়, আবার বেশী ঘি দিয়া কড়ায় ভাজিয়া লওয়া যায়। তবে অল্প ঘি দিয়া বেশী পুর দিয়া চাটুতে সেঁকিয়া লইলে ডালপুরী খুব খাস্তা হয়। ডালপুরীর আটা সামান্য নুন, সোডা ও ময়ান দিয়া মাখিতে হয় তাহা সকলেই জানেন নিশ্চয়। মোট কথা সিদ্ধ ডালে না করিয়া বাটা ডালে বেশ সুস্বাদু ডালপুরী হয়।

—শ্রীমতী কাত্যায়নী দেবী
কলিকাতা

ভাত

ভাতের ফেন বাদ দিয়া ভাত রান্না করার নিয়ম বাংলাদেশের সর্ব্বত্র। এটি স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল নহে বলিয়া, পূর্ব্বে অনেক আলোচনা হইয়াছে। কিন্তু আজিকার সমস্যা শুধু স্বাস্থ্যের নহে, সাশ্রয় কিসে হয় তাহাই এখন ভাবিবার কথা। ভাতের ফেন বাদ না দিলে ভাত ভাল হয় না
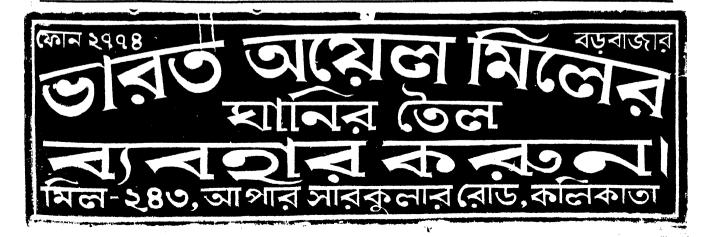
তাহা মেয়েরা সকলেই জানেন, সেইজন্যই ফেনশুদ্ধ ভাতের প্রচলন আমাদের দেশে হয় নাই। কিন্তু কুকারে ভাত রান্না করিলে এই সমস্যার সমাধান হয়। আজিকার বক্তব্য আমার তাহাই।

আমি ভালরূপে নিজে পরীক্ষা করিয়াছি—যে চাউল ফেন বাদ দিয়া—নয়জনের ভাত হয়, ঠিক সেই পরিমাণ চাউলই কুকারে রান্না করিলে এগার জনের ভাত হয়। ফেন বাদ না দেওয়ায় ভাত বাড়ে বেশী। আজিকার এই সঙ্কটের দিনে এ সাশ্রয়টুকু কম বলিয়া মনে হয় না। তবে অনেক পুরাণ-পন্থী ভগিনীকে বলিতে শুনিয়াছি "কুকারে রান্না খরচের দিক দিয়া খুব বেশী, ওটি একটি আধুনিক বিলাসিতা ছাড়া আর কিছুই না।"

আমি ইকমিক কুকারে কাঠকয়লায় রান্নার কথা বলিতেছি না, নিকটস্থ বালতির দোকানে পুরু টীনের বড় চোঙ্গা (সিলিণ্ডার) ঢাকনি সমেত গড়াইয়া লইতে ৮,৯ টাকার অধিক খরচ পড়ে না। বাটিগুলি পিতলের গড়াইয়া লইতে হয়। নিজের পরিবারের লোকসংখ্যা মাফিক কুকার গড়াইয়া লওয়াই সুবিধা, নতুবা টিনের তৈরী কুকার এখনও কিনিতে পাওয়া যায়। অবশ্য যাঁহারা কুকার সম্বন্ধে কিছুই জানেন না, তাঁহারা হয়ত বুঝিতে পারিবেন না। তবে কুকারের প্রচলন আজকাল অনেক স্থানেই হইয়াছে এবং অনেকেই জানেন বলিয়া আশা করি। আজকাল চাউল পাওয়া যায় হরেক রকম, ইহাও হাঁড়িতে রাঁধা অপেক্ষা কুকারেই সুবিধা, কেন না কুকারে তিনটী বাটিতে তিন রকম ভাত রান্না চলে। গুঁড়ো কয়লার গুলের আঁচেও রান্না হয়, আবার এমনি সাধারণ উনুনে কয়লার আঁচে কুকার বসাইলেও বেশ হয়। প্রথম পাঁচ সাত দিন খুব অসুবিধা মনে হইবে। হয়ত কোনদিন জল বেশী হইল, কোনদিন চাউল বেশী হইল এমনি ধারা কয়েকদিন চলিবার পর রান্না অভ্যাস হইয়া যায়। পরে এত সুবিধা মনে হয় যে কুকার ব্যতীত ভাত রান্না ভালই লাগে না। খাইতেও কুকারের ভাত সুস্বাদু হয়। প্রথমটা কুকার গড়ান বা কেনা মহা হাঙ্গামা মনে হইলেও যাঁহাদের ক্ষমতা আছে—তাঁহাদিগকে আমি অনুরোধ করি কুকারে রান্নার জন্য। আর পাঁচ সাত দিনেই হাল ছাড়িয়া না দিবার জন্যও অনুরোধ করি। অন্ততঃ দুটি মাস না রাঁধিলে হাত পাকে না, কুকারে অল্প দুটি ভাত বা মাংস সব করিয়া অনেকে রাঁধেন। কিন্তু বাড়ীর সকলের জন্য ভাত রাঁধার ব্যবস্থা করিলে সুবিধা সাশ্রয় বা স্বাস্থ্য সবই হইবে। স্থান থাকিলে ডাউলটাও কুকারে সিদ্ধ করিয়া লওয়া যায়।

শ্রীমতী কাত্যায়নী দেবী
কলিকাতা

পোষাক পরিচ্ছদ

ইংরেজী বর্ণমালা প্যাটার্ণ

—শ্রীমতী বীণাপাণি ক্ষেত্রী

E

(৭ ঘরে উঠিবে)

১ম কাঁটা—৩ ঘর সাদা, ৩ ঘর কাল, ১ ঘর সাদা।

২য় কাঁটা—১ ঘর কাল, ৩ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ২ ঘর সাদা।

৩য় কাঁটা—১ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ৪ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল।

৪র্থ কাঁটা—১ ঘর সাদা, ২ ঘর কাল, ৪ ঘর সাদা, ২ ঘর কাল।

৫ম কাঁটা—২ ঘর সাদা, ২ ঘর কাল, ৩ ঘর সাদা।

৬ষ্ঠ কাঁটা—৩ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ২ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল।

৭ম কাঁটা—১ ঘর সাদা, ২ ঘর কাল, ৪ ঘর সাদা।

F

(১২ ঘরে উঠিবে)

১ম কাঁটা—৮ ঘর সাদা, ৩ ঘর কাল, ১ ঘর সাদা।

২য় কাঁটা—১ ঘর কাল, ৩ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ৭ ঘর সাদা।

৩য় কাঁটা—৬ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ৩ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ১ ঘর সাদা।

৪র্থ কাঁটা—৪ ঘর সাদা, ৪ ঘর কাল, ৪ ঘর সাদা।

৫ম কাঁটা—৫ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ৩ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ২ ঘর সাদা।

৬ষ্ঠ কাঁটা—১ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ৫ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ৪ ঘর সাদা।

৭ম কাঁটা—১ ঘর সাদা, ৯ ঘর কাল, ২ ঘর সাদা।

৮ম কাঁটা—১১ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল।

বিজনদা'র চিঠি

আমার আদুরে ভাই বোনেরা—
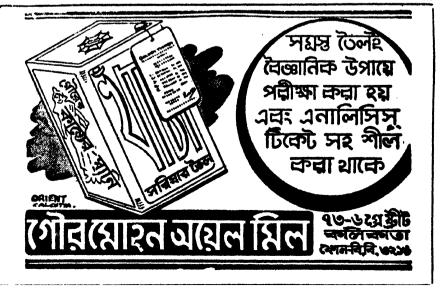
সকলে আশা করে আছো নিশ্চয়ই চিঠির উত্তর পাবার জন্যে, কিন্তু এবারে তা দিতে পারলাম না, কারণ দীপালীর কলেবর বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের এই আসরে নতুন পরিকল্পনায় সাজাবার চিন্তাটাই প্রবল হয়ে উঠেছিল আমার মনে মনে। অল্পের মধ্যে সবাই খুসী হও, আনন্দ পাও, জ্ঞান লাভ করো এবং যারা তোমাদের আসরের সভ্য নন এমন সব পাঠক তাঁরাও যাতে এই সঙ্গে আনন্দ পান তারই ব্যবস্থা করতে বড় ব্যস্ত ছিলাম। তার প্রমাণ এবারেই দেখতে পাচ্ছো।...হ্যাঁ, তোমাদের কাছ থেকে নতুন পরিকল্পনা পেয়েছি অনেক, তার মধ্যে অনেকগুলো এবারে কাজেও লাগান হয়েছে তাও বোধ হয় তোমরা দেখেছ। ভবিষ্যতে আরো কাজে লাগাবার চেষ্টায় রইলাম।...এবারে প্রত্যেকটা বিভাগের সম্বন্ধে সামান্য একটু করে তোমাদের কাছে পরিচয় দিই। তাতে তোমাদের লেখা পাঠাবার সুবিধা হবে।

ও দেশের কথা বা গল্প ঃ—এ বিভাগের জন্য তোমাদের লেখা পাঠাতে হবে—স্বাধীন দেশের লোকেরা তাদের দেশের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্যে কি ব্যবস্থা করেছেন—ঐ ধরণের প্রবন্ধ অথবা বিদেশী গল্পের অনুবাদ বা ছায়া নিয়ে লেখা গল্পও ছাপা হবে।

শোন মন দিয়ে ঃ—এখানে তোমরা জাতকের গল্প, ঐতিহাসিক গল্প বা ঐ ধরণের পৌরাণিক গল্প খুব ছোট্ট করে লিখে পাঠাবে।

মনে মনে ঃ—এটা সত্যিই একটা মজার বিভাগ। তোমাদের মনে সময় সময় কত বিচিত্র কল্পনা জেগে ওঠে তো? ঠিক যেমন এবারে আমাদের আসরের এক ভায়ের মনে ট্রেণে যেতে যেতে জেগে উঠে ছিল। ঠিক ওমনিটী—তোমাদের মনের কথা এ বিভাগে জানান হবে। এ ধরণের মনের কথা লিখে জানিও।

কেমন করে হলো?—এ বিভাগটায় শুধু ম্যাজিক শেখান যে হবে তা' নয়। বিভিন্ন প্রকারের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ ও আবিষ্কারের কথা ও কাহিনী শোনান হবে।...এর পর আর সব বিভাগের সঙ্গে আর পরিচয় করিয়ে দেবার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না, কারণ তা তোমরা পড়লেই বুঝতে পারবে। তবে লেখা পাঠাবার সময় একটা কথা মনে রেখো যে, লেখা যত সহজ ও সরল ভাষায় আর ছোট লেখা হবে ততো মনোনীত হবার সুবিধে আর ছাপাও হবে তাড়াতাড়ি। তবে এবার থেকে যখনই কেউ লেখা পাঠাবে তখনই লেখার ওপর লিখে জানাবে যে তুমি 'ছুটির ঘণ্টা'র কোন বিভাগের জন্যে লেখা পাঠালে।...এবারে জানিয়ে দিই যে, গত প্রতিযোগিতার ফলাফল ও নতুন প্রতিযোগিতা আর চিঠির উত্তর আসছে বারে তোমরা জানতে পাবে।...ভালো কথা, তোমাদের "বীরুকে" নিয়ে এই শেষ সময় যে আমি ভীষণ মুস্কিলে পড়লাম। তার জন্যে পঞ্চদশ পরিচ্ছেদের উপযুক্ত লেখা এখনও পেলাম না কিন্তু তোমাদের কাছ থেকে। ওটা তোমরা তাতাতাড়ি পাঠিও কিন্তু!...আজ তোমাদের স্নেহ জানিয়ে এখনকার মত বিদায় নিই। এবারে তোমাদের আসর নতুন পরিকল্পনায় সাজানো কেমন হয়েছে সকলে জানিও। কেমন?

—তোমাদের : বিজনদা

মনে রেখো

"উদয়ের পথে শুনি কার বাণী
ভয় নাই, ওরে ভয় নাই।
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই তার, ক্ষয় নাই॥"

—রবীন্দ্রনাথ

মনে মনে

— শ্রীনৃপেন সেনগুপ্ত (৩৮৯)

কটা-কট্...খটা-খট্ কটা-কট্, খটা-খট......রেলের গাড়ী ঝড়ের বেগে ছুটে চলেছে। তারই একটা কামরায় বসে অলস ভাবে চেয়ে আছি বাইরের দিকে। যন্ত্র দানবের এই প্রবল গতির উন্মত্ততা সহ্য করতে না পেরে সারা প্রকৃতি যেন থর থর করে কাঁপছে—আশপাশের মাঠ, জলা, লতা-পাতা, গাছগুলো ঘুরতে ঘুরতে পেছনে সরে যাচ্ছে। যতদূর চোখ যায় ততো দূরের ভেতর চলেছে গাড়ীর এই উদ্দাম বেগের প্রতিক্রিয়া; চোখে-দেখা ভূ-খণ্ডের সমগ্র অংশটা অসহায়ের মত ঘুরে ঘুরে গাড়ীর পেছনটায় মিলিয়ে যাচ্ছে।

একখানা গোরুর গাড়ী এসে রেল-লাইনের পাশে গেটের মুখে দাঁড়িয়ে পড়েছে। ট্রেণ পেরিয়ে গেলে "গেইট" খোলা হবে, তখন লাইন পার হয়ে গরুর গাড়ী আবার গড়িয়ে চলবে তার গন্তব্য স্থানের দিকে। গোরু দুটো হাঁ করে এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে বিপুল বেগে ছুটে-চলা ট্রেণের দিকে। তাদের চাউনির ভেতর কত ক্লান্তি আর অবসাদ যেন বাসা বেঁধে আছে। মনে হয় অনেক পথ মাল-বোঝাই গাড়ীখানাকে তারা টেনে এনেছে—আর বুঝি এগোতে পারছে না, পা ভেঙে আসতে চাইছে বার বার। গাড়োয়ানও পা গুটিয়ে বসে ট্রেণের দিকে চেয়ে আছে। ও কি ভাবছে জানি না, কিন্তু গোরু দুটোর মনের কথা আমি বুঝতে পেরেছি। তারা হয়তো ভাবছে : হায়রে! আমাদের ভগবান কেন সৃষ্টি করেছেন? আমরা যদি মানুষের তৈরী হতাম তাহলে এই রেলগাড়ীর মতো ছুটে চলে যেতে পারতাম। বোঝা টানতে এতখানি ক্লান্ত আমাদের আর হতে হতো না—এক পা দু' পা করে সুদীর্ঘ পথে পাড়ি দিতে হতো না। ছুটে চলতাম—এই রেল গাড়ীর মত শুধু দৌড় আর দৌড়। শ্রান্তি ক্লান্তি ক্ষুধা তৃষ্ণা কিছু নেই—চলতাম শুধু এগিয়েই! কিন্তু ভগবান আমাদের

পঙ্গু করে দিয়েছেন—গতি আমাদের নেই—দীর্ঘ পথ বোঝা টেনে নিতে আমরা অক্ষম! তবুও চলতে হয়, প্রাণের মায়া ছেড়ে দিয়ে বোঝা বইতে হয় কত দূর তার ঠিক নেই। ভগবান আমাদের কাজের ভার দিয়েছেন, কিন্তু তার পুরো সামর্থ দেন নি। মানুষের সৃষ্টি এই রেলগাড়ী আর ভগবানের সৃষ্টি আমরা। উঃ কত বড় মানুষের এই সৃষ্টি—ভগবানের সৃষ্টির চাইতে কত বৃহৎ!!

গোরু দুটার আক্ষেপ হয়তো ভগবানের কানে পৌঁছায় নি—যদি তিনি শুনতে পেতেন তাহলে হয়তো বলতেন: ওরে, তোদের রেসের গাড়ীর মতো গতি দেবার কোনও দরকার ছিল না—কারণ বোঝা টানতে তো আর আমি তোদের পাঠাই নি এ পৃথিবীতে! নিজের ভাগ্য দোষেই তো আজ তোদের সাধ্যের বাইরে কাজ করতে হচ্ছে…

এতক্ষণে গাড়ী আমার গন্তব্য স্থানে এসে থেমেছে।

গল্প শোন

—মিলন কুমার ঘোষ (১১১৩)

এক রাজা ছিলেন। রাজার অনেকগুলি গুণ ছিল। তাঁর মধ্যে গর্ব্ব, স্বার্থপরতা কিছুই ছিল না। তিনি ন্যায়বান ছিলেন। তিনি মনে করতেন যে প্রজাদের মঙ্গলের জন্যই তিনি রাজা হয়েছেন। একদিন রাজার মনে এক খেয়াল জেগে উঠল। তিনি একটি প্রকাণ্ড গম্বুজ নির্ম্মাণ করালেন। তার উপরে একটা প্রকাণ্ড ঘণ্টা বাঁধা হল আর তারই সঙ্গে একটি দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হল নীচে পর্য্যন্ত। যার যখন বিচারের প্রয়োজন হবে সে তখনই এসে ঘণ্টা বাজালে রাজা মশায় তাকে নিজের সভায় ডাকিয়ে তার অভিযোগ শুনে ন্যায় বিচার করবেন। রাজা মশাইয়ের এই নিয়মের অর্থ হচ্ছে যে আগে রাজাকে বড়ই বিপদে পড়তে হত। সকলেই একসঙ্গে রাজ্যের শৃঙ্খলা ভেঙে রাজসভায় হাজির হয়ে হট্টগোল সুরু করত। এখন আর রাজা মশাইকে সে বিপদে পড়তে হবে না।…

এখন হতেই যার যা নালিশ বা বিচারের প্রয়োজন হত ঘণ্টা বাজালেই রাজা একে একে সব শুনে তার প্রতিকার করতেন। বহুদিন কেটে গেছে, এবং সময়ের গতিতে দড়িও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে গেছে। দড়িটাকে বড় রাখবার জন্য রাজা একটা প্রকাণ্ড আঙুর গাছের ডালে বেঁধে দিলেন। একদিন ভোর বেলায় বিছানায় শুয়ে রাজা মশায় ঘণ্টার আওয়াজ শুনতে পেলেন। তিনি শয্যা ত্যাগ না করেই মন্ত্রীকে আদেশ করলেন ওর অভিযোগ শোনবার জন্য। মন্ত্রী মশায় বাইরে এসে দেখেন যে তাঁর নিজেরই বুড়ো ঘোড়াটা ডাল কামড়ে দাঁড়িয়ে আছে। মন্ত্রীমশায় তা দেখে অবাক হয়ে গেলেন, তখন কি করবেন কিছুই ভেবে পেলেন না। মন্ত্রী মশাইয়ের ফিরে আসতে বিলম্ব হচ্ছে দেখে রাজামশায় নিজেই গেলেন সেখানে! ঘোড়াটাকে দেখে তিনি বললেন যে বনের পশুরাও ন্যায় বিচার চায়! তা' ওরা নিশ্চয়ই পাবে। তারপর মন্ত্রীমশাইয়ের দিকে ফিরে বললেন যে, তুমি ওকে যৌবন-কালে খুব ভালবেসেছ আর এখন বুড়ো হয়েছে বলে ভালবাস না। কেন না ও বুড়ো বয়সে সে রকম কাজ করতে পারে না বলে তুমি ওর উপর অকৃতজ্ঞ হয়ে তাড়িয়ে দিয়েছ। কিন্তু, তুমিও ত' এখন বয়সে বুড়ো ও অকর্ম্মণ্য হয়ে পড়েছ তাই এখন তুমিও আগেকার মত কাজ করতে পারছ না, অতএব তোমাকেও আমার আর দরকার নেই। মন্ত্রীমশায় কেঁদে পড়লেন রাজা মশাইয়ের পদতলে। রাজামশায় তাঁকে ধরে তুললেন। তখন মন্ত্রীমশায় বললেন, আমি মন্ত্রী হয়ে প্রজাদের ন্যায়ের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি কিন্তু আমি ত' কিছু ন্যায় বিচার করিনি, সত্যিই আমি মন্ত্রী হবার অনুপযুক্ত। রাজা তাঁর পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করলেন এবং বললেন, না, তুমি যৌবনেও আমার কাজ করেছ; বুড়ো বয়সেও তুমি আমার দয়া থেকে বঞ্চিত হবে না। যদি সে কাজ আমি করি তাহলে আমারও ন্যায় বিচার করা হবে না, অতএব তুমি থাকো। রাজামশাই মন্ত্রীমশাইকে বিদায় দিলেন না, আর ঘোড়াটাও আবার পুরাতন প্রভুর যোগ্য আদর লাভ করল।

শোন মন দিয়ে

—শ্রী কিষণ চাঁদ বর্মন (৫৩)

বুদ্ধদেবের জীবনী থেকে আজ ছোট্ট একটি চমৎকার গল্প বলবো। বুদ্ধদেব সংসার ছেড়ে চলেছেন সত্যের সন্ধানে। তখোনো অবশ্য তাঁর নাম "বুদ্ধ" (জ্ঞানী) হয় নি। সিদ্ধার্থ নামেই তখনও তিনি পরিচিত। রাস্তায় যেতে যেতে অনেকদূর এসে তিনি দেখতে পেলেন প্রকাণ্ড এক সরোবর··· তারই এক পাড়ে বসে একটি ছোট্ট কাঠবিড়ালী। চামরের মতো তার ছোট্ট ল্যাজ্‌টি একবার হ্রদের জলে ডুবোচ্ছে আর ল্যাজ্‌টিকে জল থেকে তুলে জলটা হ্রদের পাড়েতে ঝেড়ে ফেলে আবার জলে ডুবোচ্ছে। বুদ্ধদেবের কাঠবিড়ালীর কীর্ত্তি দেখে ভারী আশ্চর্য্য লাগলো, তার সংগে কৌতূহলও হলো যথেষ্ট। তাই কাঠ-বিড়ালীকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন যে কেন সে অমনি করছে···

কাঠবেড়ালী গম্ভীর ভাবে উত্তর দিল: হ্রদের সমস্ত জলটা আমি এমনি করে ছেঁচে তুলে ফেলবো···

বুদ্ধদেব কাঠবেড়ালির এই উত্তর শুনে হেসে তাকে বল্লেন: তুমি তো আচ্ছা নির্ব্বোধ, হাজার বছর ধরেও কি তুমি জন্মের পর জন্ম এমনি করে হ্রদের জলটাকে নিঃশেষ করতে পারবে?

কাঠবেড়ালি একটু বিরক্ত ভাবেই জবাব দিল: তা হোক মশাই, যত দিনই হোক, আমি এ থেকে বিরত হবো না।

বুদ্ধদেব এ থেকে এক চমৎকার শিক্ষা পেলেন। কোন কাজ, সে যত কঠিন আর দীর্ঘ দিনের আয়াস-সাধ্যই হোক না কেন তা থেকে কখোনো বিরত হওয়া উচিত নয়। সামান্য একটি কাঠবিড়ালীর খেলা বা বাতুলতা বলে আমাদের সাধারণ চোখে যা প্রতীয়মান হয় বুদ্ধের মত পৃথিবীর একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীর চোখে সামান্য এক কাঠবিড়ালীর এই কাজ কিন্তু নগণ্য বলে গণ্য হয় নি। ভবিষ্যতে যে অসামান্য অধ্যবসায় এবং তপস্যার বলে বুদ্ধদেব সত্যের আলোকের সন্ধান পেয়েছিলেন একদিন কে বলতে পারে যে এই সামান্য একটি কাঠ-বেড়ালির অধ্যবসায়ের দৃষ্টান্ত তাঁকে অনুপ্রাণিত করে নি?

ও দেশের কথা

—বিনয় ভৌমিক (৮২৮)

ইংরাজীতে একটা প্রবাদ বাক্য আছে: 'চাইল্ড ইজ্‌ দি ফাদার অফ্‌ এ ম্যান্‌"

আধুনিক জগতকে এ কথাটার সত্যতা বোধ হয় নূতন করে বুঝিয়ে দিতে হবে না, জাতির উন্নতি করতে হলে, দেশের মঙ্গল করতে হলে, দেশের ছোট ছোট ছেলেমেয়ে-দের শিক্ষার প্রতি যে মনোনিবেশ করতে হয় সব চাইতে বেশী, তা পৃথিবীর যে কোন শিক্ষিত ও উন্নত জাতির দিকে তাকালেই দেখা যায়। এখানে রাশিয়ার ছেলেমেয়েদের শিক্ষার বিষয় কিছু বলবো।

অঙ্কুর থেকে বনস্পতি গড়তে হলে অঙ্কুরটিকে যে কতখানি যত্ন করতে হয়, য়ুরোপের এ বিরাট জাতটি বেশ ভাল করেই তা বুঝে নিয়েছে। তারা বুঝেছে যে জাতিকে মহান করতে হলে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের দিতে হবে উপযুক্ত শিক্ষা—বিশ্ববিদ্যালয়ের রুটিন-বাঁধা ডিগ্রীলাভের শিক্ষা নয়, অথবা সে শিক্ষা নয়, যা অভিভাবক-দের দ্বারা অর্পিত যে শিক্ষার বোঝা অনিচ্ছা-সত্ত্বেও বয়ে নিয়ে যেতে হয় তরুণ প্রাণগুলির। আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের শিক্ষায় এই কারণেই একটা গলদ রয়ে যায় যে, তাদের নিজস্ব রুচিটিকে ঠিকমত বুঝে না নিয়ে চাপান হয় বাঁধাধরা শিক্ষার বোঝা—তাই সেটা হয়ে পড়ে কু-শিক্ষা, এই 'বুঝে নেওয়া' ব্যাপারটী রাশিয়াতে চমৎকার!

সেখানে এক একটি সহরে আছে এক একটি মিউজিয়ম। সেই মিউজিয়মটি এক একটি ছোট খাটো বিশ্ববিদ্যালয়। সেখানে নানাপ্রকার কলের জিনিষ আছে। কোথাও কলের পুতুল বিরাট কারখানা চালাচ্ছে, কোথাও হচ্ছে বিজ্ঞানের অনুশীলন, কোথাও বা নানারকমের শিল্পকলার নির্ব্বাচন, আবার কোথাও কলের পুতুল কৃষিকার্য্যে ব্যস্ত, এ রকম অসংখ্য আদর্শ স্থাপিত আছে সেখানে মডেলের আকারে। ওখানে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের রোজ দিয়ে আসা হয় ঐ মিউজিয়মে। সেখানে তাদের অবাধ স্বাধীনতা—স্কুলের মতন ভয়ে জড়সড় হয়ে থাকতে হয় না। ছেলেমেয়েরা ঐ সমস্ত মডেলগুলি খুব ভাল করে দেখে নেয়, অবশ্যি যার যেটা ভাল লাগে সে সেটাই দেখছে ভাল করে। এ রকম করে হয়ত এক বছর তাদের রীতিমত মিউজিয়মে এক রকম প্রাথমিক শিক্ষা হয়।

এদিকে মজা হচ্ছে মিউজিয়মের কর্ত্তৃপক্ষ সারাটি বছর লক্ষ্য করেন কোন ছেলের মন বেশীর ভাগ দিনই আকৃষ্ট রয়েছে কোন জিনিষটার ওপর বেশী? চিত্রকলা, কৃষি-বিদ্যা না অন্য কিছু! যেটার ওপর যাকে বেশী দিন আকৃষ্ট হতে দেখা যায় সেইটাই হল ছেলেদের ব্যক্তিগত রুচি। ছেলেদের অভিভাবকদের তখন মিউজিয়মের কর্ত্তৃপক্ষরা জানান তাদের ছেলেমেয়েদের রুচির কথা এবং অভিভাবকও সে অনুযায়ী ব্যবস্থা করেন তাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার।

এইভাবে নিজের রুচি অনুযায়ী শিক্ষালাভ করে রাশিয়ার কিশোর কিশোরী দল, তারা সত্যি এক একদিন মানুষ হয়ে উঠবে। আমাদের দেশেও ছেলেমেয়েদের জন্য রাশিয়ার মত ওমনি পরীক্ষার ব্যবস্থা যদি করা যায় তাহলে ভবিষ্যতে ভারতবাসী যে অশিক্ষিত—এ অপবাদ অচিরেই ঘুচবে বলে আশা করা যায়।

একটুখানি হাসো ?

—বিনয় ভৌমিক (৮২৮)

বাবা—কিরে খোকা, ওজন নিলি?

ছাত্র—হাঁ বাবা নিয়েছি। মাষ্টারমশাই বলছিলেন একমন না হলে পড়াশুনো হয় না। আমার ত' তাহলে পড়াশুনো হবে না বাবা, কারণ আমি মোটে ছত্রিশ সের।

* * *

শিক্ষক—'লংফেলো' কে ছিলেন বল তো?

ছাত্র—আজ্ঞে স্যার, ও বাড়ীর মহেশবাবু, সাড়ে ছ' ফুটের কম তিনি ছিলেন না স্যর।

টুকে রাখো

—শ্রীকিরণকুমার মিত্র (৮৪৭)

১। যে মানুষের ভুল ত্রুটি ধরে দেয়, সে শত্রু নয়, মিত্রই।

২। মানুষের ওপরে সব চেয়ে বড় অত্যাচার চলে সভ্যতার নামে।

৩। মানুষ সব চেয়ে বেশী সময় নষ্ট করে কথায়—আর তা দিয়ে কাজ হয় সব চেয়ে কম।

৪। জাতির সমন্বয়ে মহাজাতি তৈরী হতে পারে, কিন্তু মানুষের সমন্বয়ে মহামানব তৈরী হতে পারে না।

৫। "কোন কিছুর ভান যদি ভাল হয় তবে তা ধর্ম্মের।"

মজার খবর

—শ্রীসমীরণ সেন

পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট রাজ্য হচ্ছে মনাকো। সে রাজ্যের রাজস্বের বেশীর ভাগ অর্থ সংগ্রহ হয় জুয়াখেলার ট্যাক্স থেকে। ওখানকার সেনাবাহিনীর মোট সংখ্যা হচ্ছে ১১০ জন; তার মধ্যে ৭৫ জন অশ্বারোহী, ৭৫ জন পদাতিক আর ২০ জন গোলন্দাজ সৈন্য।

* * *

পৃথিবীর আর একটা ছোট রাজত্ব হচ্ছে ইউরোপের অ্যাণ্ডোরা দেশ। এ রাজত্বের না আছে সৈন্য আর না আছে পুলিস, তাই সেখানেও ট্যাক্স নেই। খুব মজার দেশ নয়? ইচ্ছে হচ্ছে সেখানে গিয়ে রাজা না হতে পারলেও প্রজা হয়েও বাস করি!

* * *

বিশ্বজয়ী কুস্তীগীর পালোয়ান গামার নাম তোমরা সকলেই জানো। তাঁর রোজ সাধারণ খাবার তালিকা কি জানো?—আড়াইসের রুটী, তিনসের ঘি, একসের দুধ, আর এক সের বাদাম। ঐ তো গেল সাধারণ সময়ে এঁর খাওয়ার তালিকা; কিন্তু যখন এঁকে কুস্তি লড়তে হয় তখন ও ছাড়াও খানিকটা মুক্তাভস্ম, সাতটা মুর্গীর ইয়্, কিছু সোনার পাত, খানিকটা দারচিনি আর পাঁচ সের ঘোল।...বলো তো তোমরা আজকের দিনে ওর জন্যে ক'খানা "রাসন কার্ড" সরকারের কাচ থেকে আদায় করতে হবে?...ভাবছো বোধ হয় ওর খাওয়ার জন্যে কত টাকা খরচ হয় রোজ, নয়? কিন্তু জানো কি উনি রোজ ছ' হাজার বৈঠক আর দেড় হাজার ডন দেন এবং এক দমে আট মাইল দৌড়ে আসেন। উনি যেমন খান তেমনি ব্যায়ামও করেন।

কেমন করে হল ?

—শ্রীরণজিৎ কুমার মুখোপাধ্যায় (৭১৮)

এসো একটা ম্যাজিক দেখিয়ে দি তোমাদের। তোমাদের মধ্যে যে কেউ একজন উঠে একই মাপের দুটো কাঁচের গেলাস নিয়ে এসো।

এনেছো? বেশ! একটা গেলাস তোমার হাতে রাখো—আমায় দাও অপরটা।

একটা টাকা আছে তোমার পকেটে? —দাও তো!

একখানা রুমাল চাই যে—আচ্ছা থাক্, আমার কাছেই আছে।

এইবার ছাখো, তোমার টাকাটা তোমারি হাতের গেলাসে ফেলে দিয়ে রুমাল চাপা দিলুম। ভালো কোরে নেড়েচেড়ে ছাখো টাকাটা ঠন্ ঠন্ কোরছে কি না গেলাসের ভেতর! কোরছে তো? বেশ! আচ্ছা থামো, আমার যাদুকাঠি ছুঁইয়ে দি। লাগ্, ভেল্কি লাগ্—ভানুমতির খেল্—এক, দুই, তিন—ব্যাস্!

কি হোল? টাকাটার যে কোনো সাড়া শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না! দেখি রুমালটা তুলে টাকাটা আছে কি না!

আরে ফক্কা? টাকাটা গেলো কোথায়? ওমা! আমার গেলাসে একটা টাকা এলো কোত্থেকে? ছাখো তোমার কি না? অ্যাঁ, তোমার?—বাঃ এতো বড়ো তাজ্জব কি বাত্!

আচ্ছা, এইবার কায়দাটা শোনো। প্রথমে একটা টাকার (কাগজ নয় মুদ্রা) একপাশে খু-উ-ব সরু একটা ছ্যাঁদা কোরে বিঘত্খানেক শক্ত সুতোর একদিক বেঁধে সুতোর অপরদিক একখানা রুমালের মধ্যি-খানে বেঁধে দাও। রুমালের রং সুতোর সংগে এক হওয়া চাই কিন্তু!

কারুর কাছ থেকে একটা টাকা নিয়ে সেটা নিজের হাতের মধ্যে লুকিয়ে রেখে রুমালে বাঁধা টাকাটা তার গেলাসে ফেলে দিয়ে রুমাল চাপা দাও। রুমালটা তুলে নেবার সময় টাকাটাও তুলে নিয়ে পকেটে রাখো আর নিজের হাতের টাকাটা নিজের গেলাসে ফেলে নাড়তে থাকো। এর পরে আর কিছু না বোল্লেও চোল্বে বোধ হয়?

উপন্যাসের প্রারম্ভ

(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর)

নীচে উপবিষ্ট কয়েকটী মেয়ের দিকে সে প্রকাশের দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

"নিশ্চয়ই…"

"আশ্চর্য্য, ওই সব লোকগুলোর পাশে বসে play দেখতে ওদের ঘেন্না করে না?"

প্রকাশ কোন উত্তর দিল না। শুধু একটু হাসল। লিলি আবার বলল: "ওপরে তো মেয়েদের বসবার বন্দোবস্ত আছে, ওরা সেখানে বসে না কেন?"

প্রকাশ আবার পূর্ব্বের মতো একটু হাসল। কোন উত্তর দিল না। লিলি এবার রাগ করল; প্রকাশের বাহুর উপর আচমকা একটা চড় মেরে সে বলল: "কী তখন থেকে কেবল ফিক্ ফিক্ করে হাসছেন? আমার কথাগুলো বুঝি কানে যাচ্ছে না? উত্তর দিচ্ছেন না কেন?"

চর খেয়ে প্রতিবাদের সুরে প্রকাশ বলল: "বাঃ, ওরা ওপরে বসেন না কেন তা আমি কি করে জানব?"

পরে মুখ নীচু করে অস্পষ্টস্বরে বলল: "মেয়েদের মনের কথা আমি জানব কি করে?"

"ই-স্"…

বলে ফেলেই লিলি অন্য দিকে মুখ ফেরাল। প্রকাশ আড়-চোখে চেয়ে দেখল লিলির মুখ আরক্ত হয়ে উঠেছে, সে তখন কৃত্রিম বিস্ময়ে চক্ষু দুটি বিস্ফারিত করে বলল: "এঃ, আপনারও দেখছি বাবার মতো "ইসে" ধরলো।"

"যা:—আপনি ভারি দুষ্টু…" লিলি তার আঁচল দিয়ে মুখ ঢাকল।

হঠাৎ অডিটোরিয়ামের সব আলো আস্তে আস্তে নিভতে আরম্ভ করল। ড্রপ পূর্ব্বেই উঠে গিয়েছিল, এখন স্ক্রীন সরে গিয়ে অভিনয় আরম্ভ হল। নাটকের বিষয়-বস্তুটী ছিল "কচ ও দেবযানী"র বিরহ-মিলনের সেই চিরন্তন অশ্রু-সজল কাহিনী; কিছুক্ষণের মধ্যেই অভিনয় জমে উঠল। প্রকাশ ও লিলি মুগ্ধ হয়ে অভিনয় দেখতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে পাশের খালি বকস্‌টীতে একটী সুবেশা তরুণী সমভিব্যাহারে একজন সাহেবী-পরিচ্ছদধারী বাঙ্গালী যুবক এসে প্রবেশ করল। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে লিলিদের দিকে পিছন করে বসতে বসতে তরুণীটি নীচু গলায় বিরক্তির স্বরে বলল: "তুমি যে শেষে একটা বাঙলা থিয়েটারে এসে ঢুকবে তা বুঝতে পারি নি! তুমি যে বাঙলা থিয়েটারের টিকিট কিনেছ এ কথা তোমার আগে বলা উচিত ছিল…"

বাধা দিয়ে ইংরাজী-বাঙলায় মিশ্রিত ভাষায় যুবকটী বলল: "মেজাজ খারাপ কর না ডারলিং। দেখনা একটা নূতন কিছু তো বটে!"

যুবকের কণ্ঠস্বর শুনে এ পাশের বকসে লিলি ও প্রকাশ দুজনেই চমকে উঠল। বিস্ফারিত চক্ষে লিলির দিকে চেয়ে প্রকাশ ফিসফিস করে বলল: "এ যে মিষ্টার ঘোষ…"

বাধা দিয়ে তার একটা হাত চেপে ধরে লিলিও ফিস ফিস করে বলল: "চুপ…" এই বলে সে উভয় বকসের মধ্যে যে কাঠের পার্টিশানটী ছিল, তার আড়ালে সরে গিয়ে ইসারা করে প্রকাশকেও সরে আসতে বলল। ও পাশের বকসের তরুণীটী তখন বলছিল: "না ঘোষ, চল অন্য কোথাও যাই। বাঙলা থিয়েটারে Public womenদের নাচ গান দেখতে এসেছি একথা কেউ যদি শোনে, তাহলে সমাজে আর মুখ দেখাবার উপায় থাকবে না।"

রাজীব বলল: "তুমি ভুল করছ সুমিত্রা। তুমি যাদের দেখে ফেলবার ভয় করছ, তারা কখনও বাঙ্গলা থিয়েটারে আসে না। কী করি বল? জোর করে Charityর টিকিট গছিয়ে দিয়ে গেল…টাকাটা নষ্ট হবে, তাই…"

"কিন্তু আমার নিজেরই যে বড় বিশ্রী লাগছে…"

রাজীব বলল: "কিন্তু আর কোথায় যাবে বল? একটা নির্জ্জন জায়গা তো চাই! তুমি বাঙলা থিয়েটারের নিন্দে করছিলে, কিন্তু এর "হায়ার" সীটগুলো কি রকম নির্জ্জন দেখ দেখি! ইংরিজী থিয়েটারের মত crowdy নয়। দেখ…দেখ…"

রাজীব ষ্টেজের ওপর নৃত্যরতা একটী মেয়ের দিকে সুমিত্রার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল: "দেখ দেখ, মেয়েটার "পোজ"গুলো বেশ appealing নয়?"

সুমিত্রা গম্ভীর ভাবে বলল: "ইংরিজী ফিল্ম-টিল্ম দেখে বোধ হয়; না হলে অত উঁচু standard-এর art এ দেশে পাবে কোথায়?" উভয়ে মনোযোগ সহকারে মেয়েটির নাচ দেখতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে সুমিত্রা আস্তে আস্তে ডাকল: "ঘোষ"…

"উঁ…"

"দাদা তো আসছে হপ্তাতেই বিলেত যেতে চাইছে, কিন্তু তুমি কি সত্যিই ওকে "প্যাসেজটা" ধার দেবে?" সুমিত্রার মুখের অতি নিকটে নিজের মুখটী এনে গদগদ স্বরে রাজীব বলল: "ধারের কথা বলছ কেন সুমিত্রা? টাকাটা আমি তাকে unconditionally দোব, তোমার দাদার যদি কখনও সুবিধা হয় দেবেন; না হয় নাই দেবেন! তোমার মতো বান্ধবীর দাদাকে চার পাচ হাজার টাকা দান করার মতো means আমার আছে সুমিত্রা! দেখ সমাজে যতো মেয়েদের সঙ্গে মিশেছি—লিলির সঙ্গে আমার বিয়ে হবে শুনে সকলেই আমাকে ভুল বুঝেছে, শুধু তুমি আমাকে ভুল বোঝ নি। আর তোমার দাদাকে টাকা ধার দিয়ে আমি সুদ নেবো? তুমি বল কী সুমিত্রা?"

দুজনেই কিছুক্ষণ চুপ চাপ বসে রইল। তারপর আবার রাজীব বলল: "কিন্তু সাবধান, কথাটা গোপনে রেখ,—বিশেষ করে লিলিদের বাড়ীর কেউ যেন না জানতে পারে।"

এবার সুমিত্রা খিল খিল করে হেসে উঠল: বলল, "তুমি ভারী অদ্ভুত লোক ঘোষ! লিলিকে তুমি এত ভয় কর?"

রাজীবও হেসে বলল: "যতদিন না আমাদের বিয়েটা হচ্ছে, ততদিন ওকে সন্তুষ্ট করে চলাই আমার কর্ত্তব্য।"

"অথচ তুমি ওকে ভালবাস না…"

"ওর চেয়ে ওর বাপের জমিদারীকে আমি ঢের বেশী ভালবাসি।"

দুজনেই আবার খিল খিল করে হেসে উঠল। এ পাশের বক্সে লিলির অবস্থা তখন অত্যন্ত শোচনীয়। সে এতক্ষণ প্রকাশের উরুতের ওপর মাথা রেখে হাঁটু মুড়ে শুয়ে নিঃশব্দে কাঁদছিল। প্রকাশ ফিস ফিস করে বলল: ছিঃ মিস গুপ্তা! এ ভাবে বিচলিত হওয়া আপনার মতো মেয়ের উচিত নয়। মনকে দৃঢ় করুন, লোকে দেখলে কি ভাববে?"

প্রকাশের কথায় লিলির কান্না আরও বেড়ে গেল। সে তার কোলের মধ্যে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। প্রকাশ ব্যস্ত হয়ে বলল: "ছিঃ লিলি, ছেলেমানুষী কর না..."

সে তাকে বার কয়েক উঠে বসাবার চেষ্টা করে শেষে অকৃতকার্য্য হয়ে বলল: "লক্ষীটী লিলি, ভাব তো ওই সুমিত্রাই যদি হঠাৎ তোমাকে এ ভাবে কাঁদতে দেখে..."

এবার লিলি উঠে বসল। রুদ্ধকণ্ঠে সে বলল: "আমাকে বাড়ী নিয়ে চলুন প্রকাশবাবু, আমি আর থাকতে পারছি না।"

"বেশ তাই চলুন..."

উভয়েই উঠে দাঁড়াল। এমন সময় একটা ড্রপ পড়ল, সব আলোগুলি একসঙ্গে জ্বলে উঠল। চতুর্দিক হঠাৎ আলোকিত হয়ে উঠতে দেখে লিলি চমকে ওঠে আঁচল দিয়ে নিজের মুখ ঢাকল। প্রকাশ মৃদুস্বরে তাড়াতাড়ি বলল: "গালের ওপর থেকে জলের দাগগুলো মুছে ফেলুন।"

আঁচল দিয়ে মুখটি ভাল করে মুছে নিয়ে, কম্পিত পদে প্রকাশের হাত ধরে সে দরজার দিকে এগিয়ে চলল। দরজা খুলে বাইরে বেরুতেই একেবারে মুখোমুখী হল রাজীব ও সুমিত্রার সঙ্গে। ওরাও আইসক্রীমের সন্ধানে বাইরে বেরিয়েছিল।

ঠিক পাশের বক্স্ থেকে প্রকাশের সঙ্গে লিলিকে বেরিয়ে আসতে দেখে ওরা হঠাৎ যেন কেমন দিশেহারা হয়ে গেল। কিছুক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল করে লিলির দিকে চেয়ে থেকে বহুকষ্টে একটা ঢোক গিলে অস্ফুটস্বরে রাজীব বলল: "লিলি..."

প্রকাশকে দেখে সুমিত্রারও মাথা ঘুরে গিয়েছিল। কিয়ৎকাল বিমূঢ় ভাবে তার দিকে চেয়ে থেকে সেও বলল: "প্রকাশদা..."

লিলি কিন্তু ওদের দিকে চাইতে পারল না; মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল। তার একটি হাত প্রকাশের মুষ্টির মধ্যে ধরা ছিল। হঠাৎ প্রকাশ অনুভব করল যে তার হাতটী থর থর করে কাঁপছে। দৃঢ় মুষ্টিতে লিলির বাহুটী ধরে অগ্রসর হতে হতে হঠাৎ থেমে গিয়ে প্রকাশ রাজীবকে বলল: "ভাল কথা মিষ্টার ঘোষ, লিলির তরফ থেকে একটী কথা আপনাকে জানাবার জন্যে আমার ওপর ভার পড়েছে!"

স্নিগ্ধ হাস্যে ভদ্রভাবে প্রকাশকে কথা বলতে শুনে রাজীবের চোখে আশার আলোক জ্বলে উঠল। সে উদ্‌গ্রীব হয়ে প্রকাশের মুখের দিকে চাইল। পূর্ব্ব কথার জের টেনে প্রকাশ তখন ধীরে ধীরে বলল: "ভবিষ্যতে কোন অজুহাতে, আপনি আর লিলির সুমুখে যাবার চেষ্টা করবেন না বা তাকে আর ঘরোয়া নাম ধরে ডাকবার চেষ্টা করবেন না! আচ্ছা Goodbye..."

তারা চলে গেল।

প্রকাশের মুখ থেকে সব কথা শুনে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে মিঃ গুপ্ত বললেন: "ভাগ-ইস..."

খেলার মাঠে

শ্রীউমেশ মল্লিক বি, এ

গত সপ্তাহের প্রথম বিভাগীয় হকি লীগের ফলাফল :—

বৃহস্পতিবার ৩০ শে মার্চ্চ :—

ইষ্টবেঙ্গল—০ কাষ্টমস্—০
মোহনবাগান—০ মিঃ মেডিক্যালস্—০
গ্রীয়ার—১ লিলুয়া—০

শুক্রবার ৩১শে মার্চ্চ :—

পোর্ট কমিঃ—৫ জ্যাভেরিয়ান্স—১
রেঞ্জার্স—৩ ডালহৌসী—১
বি, জি, প্রেস—৩ কাষ্টমস্—০
পাঞ্জাব স্পো—১ মেসারার্স—১

শনিবার ১লা এপ্রিল :—

ইষ্টবেঙ্গল—১ গ্রীয়ার—০
পুলিশ—১ জ্যাভেরিয়ান্স—০
পোর্ট কমিঃ—৩ মিঃ মেডিক্যালস্—০

সোমবার ৩রা এপ্রিল :—

কাষ্টমস্—১ মেসারার্স—০
গ্রীয়ার—১ জ্যাভেরিয়ান্স—২
মোহনবাগান—১ পোর্ট কমিঃ—১
বি, জি, প্রেস—৪ মহঃ স্পোঃ—২

মঙ্গলবার ৪ঠা এপ্রিল :—

পুলিশ—০ ইষ্টবেঙ্গল—৩
রেঞ্জার্স—১ জ্যাভেরিয়ান্স—০
মহঃ স্পো—১ আর্মেনিয়ান্স—০

আগা খাঁ কাপ প্রতিযোগিতায় পুলিশ দল প্রথম রাউণ্ডে বাঙ্গালোর এ, এফ, আইকে ৪—১ গোলে পরাজিত করেছে।

* * *

মুসৌরী ও নৈনিতালে রেডক্রশের সাহায্য কল্পে কয়েকটি টেনিস খেলার ব্যবস্থা হয়েছে। চম্, দিলীপ বসু, ইফতিকার আমেদ, ঘউস মহম্মদের যোগদানের সম্ভাবনা আছে। আশা করি অর্থ প্রাপ্তির দিক দিয়ে উদ্যোগীরা লাভবান হবেন।

বাঙ্গোলোরে বরোদা একাদশ বনাম অবশিষ্ট কয়েকটি মিলিত দলের একাদশের মধ্যে একটি প্রদর্শনী ক্রিকেট খেলা আরম্ভ হয়েছে। বরোদা দলের পক্ষে ডব্লিউ ঘোরফোড়ে এবং বিপক্ষ দলে ভি, ভি, হিন্দেলকার অধিনায়কত্ব করেছেন। আমীর ইলাহির প্রথম দিনের বোলিং বিশেষ মারাত্মক হয়। ফলে ৭ উইকেটে প্রতিপক্ষ দল মাত্র ৬৭ রাণ সংগ্রহ করে। গরুদাচারের ৯৬ রাণও প্রথম-দিনের প্রশংসনীয় ঘটনা।

ফটো—SNAP
কুচবিহারের মহারাজা—রঞ্জী ট্রফীর ফাইনালে উন্নীত বাংলা দলের অধিনায়ক।

হকি লীগ টেবল্

(রবিবার ১লা এপ্রিল)

	খেলা	জ	ড্র	পরা	স্ব	বি	প
পোর্ট কমিঃ	১১	১০	১	০	৩৫	৪	২১
ইঃ বিঃ	১০	৮	২	০	১৮	১	১৮
পুলিশ	১০	৬	৩	১	২০	৮	১৫
মিলিঃ মেডিঃ	১৩	৬	৩	৪	১৭	১৩	১৫
রেঞ্জারস্	১০	৭	১	২	২১	১২	১৫
মহঃ স্পোর্টিং	৮	৫	৩	০	১৭	৫	১৩
গ্রীয়ার	১২	৫	৩	৪	১৫	১৩	১৩
বি-জি-প্রেস	১০	৫	২	৩	১৩	৯	১২
লিলুয়া	১৩	৪	৩	৬	৯	১২	১১
জেভেরিয়ান্স	১৩	৫	১	৭	১৩	২৩	১১
মোহনবাগান	৭	৩	৩	১	১৪	৮	৯
কাষ্টমস্	১২	৪	১	৭	১৭	২০	৯
ডালহৌসী	১৩	৪	১	৮	১৩	২৪	৯
বি এণ্ড এ আর	১৪	৩	১	১০	১৯	৪১	৭
আরমেনিয়ানস	১৪	২	২	১০	৯	৩	৬
মেসারারস	১১	১	৩	৭	৯	২১	৫
পাঞ্জাব স্পোর্টস	১১	০	৩	৮	৪	২২	৩

অবশিষ্ট মিলিত দল প্রথম ইনিংসে ১৯৩ রাণ করে এবং প্রথম দিনের খেলায় বরোদা একাদশ ২ উইকেটে ৫৫ রাণ সংগ্রহ করে। দ্বিতীয় দিন বরোদাদল ৩২২ রাণ সংগ্রহ করে। হাজারীর ১৩৩ রাণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ক্রিকেট কনট্রোল বোর্ড অফ ইণ্ডিয়ার অনুরোধ পত্র সিলোন ক্রিকেট প্রতিষ্টান মনোনীত করায় আশা করা যায় আগামী বৎসরের জানুয়ারী মাস থেকে এপ্রিলের মধ্যে একটি সর্ব্ব-ভারতীয় ক্রিকেট দল সিলোন যাত্রা করবে।

* * *

আগামী কাল ৭ই এপ্রিল রঞ্জী ট্রফী প্রতিযোগিতার ফাইনালে প্রতিপক্ষতা করবার জন্য বাঙ্গালাদল বোম্বাই সহরের উদ্দেশে যাত্রা করেছে।

* * *

মেক্সিকো অধিবাসী পৃথিবীর লাইট ওয়েট চ্যাম্পিয়ন বক্সার জুরিটা পৃথিবীর ভূতপূর্ব্ব লাইটওয়েট চ্যাম্পিয়ন বক্সার ব্লু জ্যাকের নিকট ১০ রাউণ্ডের প্রতিযোগিতায় পরাজিত হয়েছে। "পদবী"র জন্য নির্দ্ধারিত প্রতিদ্বন্দ্বীতা না হওয়ায় জুরিটা এক্ষেত্রে বেঁচে গেল। সম্প্রতি এগনটকে পরাজিত করে জুরিটা উক্ত সম্মান লাভ করেছে। ন্যাশনাল বক্সিং এসোসিয়েশন এগনটের পরাজয়ে জুরিটাকে লাইটওয়েট চ্যাম্পিয়ন বলে সরকারী ভাবে স্বীকার করেছে।

রেনবো ক্লাব

গত ২রা এপ্রিল রবিবার অপরাহ্ণ ৫॥০ ঘটিকায় সুসাহিত্যিক শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের ভবনে স্বর্গীয় প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের স্মৃতিপূজা অনুষ্ঠিত হয়। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ, পি এইচ ডি, মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

প্রভাতকুমার সম্বন্ধে সুকবি বসন্তকুমার, নরেন্দ্র দেব, মন্মথনাথ ঘোষ ও কেশব বাবু বক্তৃতা করেন। সর্বশেষে সভাপতি মহাশয় পরলোকগত ঔপন্যাসিক ও ছোট গল্পের যাদুকর প্রভাতকুমার সম্বন্ধে একটি সুচিন্তিত ও তথ্যবহুল অভিভাষণ দেন।

রবি-বাসর

গত রবিবার ২০শে চৈত্র অপরাহ্ণ ৫॥০ ঘটিকার সময় শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দুকুমার গাঙ্গুলীর আহ্বানে ৮৪-বি শম্ভুনাথ পণ্ডিত-ষ্ট্রীটে বর্ত্তমান বর্ষের ২২শ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ঐদিন সম্পাদকের নিবেদন পাঠ করেন শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু এবং শ্রীমতী বেণু দেবী (মুখোপাধ্যায়) কর্ত্তৃক "আর্ট কাহাকে বলে" নামক প্রবন্ধ পঠিত হয়।

রবীন সরকার সম্প্রদায়

কলিকাতার ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলে গত ২৫শে মার্চ্চ এবৎসরকার প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীদের আনন্দ পরিবেশন করিবার জন্য মুষ্টিযোদ্ধা রবীন সরকারের সম্প্রদায় কর্ত্তৃক হাস্যকৌতুক ও মুষ্টিযুদ্ধ প্রদর্শিত হয়, তন্মধ্যে শৈলেন সরকার বনাম রবীন বসু এবং শৈল নন্দী বনাম বিশ্বনাথ মিত্রের প্রদর্শনী মুষ্টিযুদ্ধ এবং মুষ্টিযোদ্ধা শৈলেন সরকারের "আবৃত্তি প্রতিযোগিতা" নামক হাস্যরসাত্মক নক্সাটি বিশেষ উপভোগ্য হয়।

সাবিত্রী বালিকা বিদ্যালয়ের অনুষ্ঠান

গত ২৬শে মার্চ্চ রবিবার প্রাতে সালিখা সাবিত্রী বালিকা বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে বিদ্যালয়ের ১ম বার্ষিক স্পোর্টস্ সম্পন্ন হইয়াছে। এই স্পোর্টসের প্রবর্ত্তনা করেন শ্রী আমোদলাল চট্টোপাধ্যায় ও বিজয় রায়। হাওড়া জিলার খেলার ইতিহাসে ইহাই বোধহয় বালিকা-বিদ্যালয়ের প্রথম স্পোর্টস্ (Out door)। বিভিন্ন বিষয়ে তীব্র প্রতিযোগিতা পরিলক্ষিত হয়। দড়ি টানায় আমন্ত্রিত ভদ্রমহিলাদিগের দল প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীতার পর বিদ্যালয়ের দলকে পরাজিত করে এবং শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ভানকুনী) প্রদত্ত সুদৃশ্য 'শৈলজা স্মৃতি চ্যালেঞ্জ কাপ' বিজয়ী হন। শ্রীমতী আরতি সেন, বি এ, সভানেত্রী ও শ্রীমতী সুধা সেন প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীমতী আরতি সেন ও শ্রীমতী সুধা সেন "নারী ও নারীর কর্ত্তব্য" বিষয়ক সুন্দর বক্তৃতা দেন। ইহা ব্যতীত মিঃ পি কে, সেন, সত্য কিঙ্কর সেন, খগেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, ললিতমাধব সেন নীরদ বরণ রায় প্রমুখ ভদ্রমহোদয়গণ বক্তৃতা প্রদান করেন। সত্যকিঙ্কর সেন, সরোজ ঘোষ, অরুণ প্রসাদ কুমার, তারক চ্যাটার্জ্জি, কালী রায়, বিকু রায় প্রমুখ বিচারকের কার্য্য করেন।

প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করেন শ্রীমতী আরতি সেন। কুমারী মীরা চ্যাটার্জ্জি ও কুমারী চন্দ্রা গাঙ্গুলীকে সঙ্গীতের জন্য শ্রীমতী সুধা সেন দুইখানি রৌপ্যপদক পুরস্কার দেন।

ন্যাশনাল সুইমিং এসোসিয়েসন

আগামী ৮ই এপ্রিল শনিবার ন্যাশন্যাল সুইমিং এসোসিয়েসনের ২১তম বার্ষিক সন্তরণের উদ্বোধন হইবে। ঢাকার নবাব খাজা হবিবুল্লা বাহাদুর উদ্বোধন উৎসব সম্পন্ন করিবেন। সকল সভ্য-দিগকে এই উৎসবে যোগদান করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে। শিক্ষানবীশদের আগামী রবিবার ৯ই এপ্রিল হইতে সন্তরণ শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

যাদুকর পি, সি, সরকার

যাদুকর শ্রীযুক্ত পি সি সরকার মহাশয় মহাশয় ২৯শে ও ৩০শে মার্চ্চ তারিখে মধ্য ভারতে ছত্রিশগড়ের মহারাজাধিরাজ ভানু প্রতাপ দেও বাহাদুরের রাজ্যাভিষেক উৎসবে তাঁহার যাদুবিদ্যা প্রদর্শন করিয়াছেন। বহু উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্ম্মচারী এবং পার্শ্বস্থ উদয়পুর, শোনপুর, পাটনা, চুইখেদন প্রভৃতি রাজ্যের অধিপতিগণ উপস্থিত ছিলেন।

বর্দ্ধমানে অভিনয়

গত ৫ই চৈত্র, শনিবার, বর্দ্ধমান War Technician-এর প্রাক্তন ছাত্রগণের বিদায় উপলক্ষে, বর্দ্ধমান Technical-এর ছাত্রগণ কর্ত্তৃক এবং মৌলভী মহম্মদ মামুদের ও মৌলভী মহম্মদ আজাম মহাশয় এবং টেকনিক্যাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মহাশয় প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের তত্ত্বাবধানে ৺নিশিকান্ত বসুর "ললিতাদিত্য" নাটক খানি স্থানীয় ই, আই, আর রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়। অভিনয় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে। নাট্য পরিচালনায় শ্রীযুক্ত তারা গতি চক্রবর্ত্তী মহাশয় প্রশংসার দাবী করিতে পারেন। সঙ্গীত পরিচালনায় শ্রীপ্রাণগোবিন্দ চট্টোপাধ্যায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, তাঁহার একখানি নিজের গান ভালই হইয়াছিল। প্রফুল্ল রঞ্জন চৌধুরীর রঙ্গমঞ্চ পরিচালনা উল্লেখযোগ্য। ভূমিকায় তারক বিশ্বাসের "অরুণা", মৃত্যুঞ্জয়ের "ভূপাল" এবং অহীভূষণের "পিয়ারীলাল" প্রথম শ্রেণীর। ললিতাদিত্যের ভূমিকায় বিমল কপুর ভালোই। শিবুর "জয়ন্ত" এবং জয়াপীড়ের ভূমিকায় পূর্ণ ঘোষ উচ্চাঙ্গের অভিনয় করিয়াছেন। এই অভিনয় দেখিতে স্থানীয় বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

কুমারী রমলা লাহিড়ীর কৃতিত্ব

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন উৎসবে ঊনবিংশ বর্ষীয়া কুমারী রমলা লাহিড়ী সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ইনি ব্যারিষ্টার মিঃ কে, লাহিড়ীর কন্যা। কলিকাতার খেলা ধূলা মহলে ও গার্ল গাইডদের মধ্যে ইঁহার নাম সর্ব্বজনপরিচিত। বাস্কেট বল, ব্যাডমিণ্টন ও দৌড়-ঝাঁপে ইঁহার কৃতিত্ব অসাধারণ। গার্ল গাইডদের পঞ্চম কলিকাতা বাহিনীতে ইনি গত দুই বৎসর ধরিয়া অধিনায়কতা করিয়া আসিতেছেন। আজ পর্য্যন্ত ২২ বৎসরের কম-বয়স্কা কেহই এ পদ লাভ করিতে পারেন নাই, সে হিসাবে ইঁহার কৃতিত্ব অবশ্য স্বীকার্য্য। তাহা ছাড়া গার্ল গাইড ক্লাবের ইনি গত বৎসর হইতে সেক্রেটারী। ইনি বেঙ্গল উইমেন্স্ স্পোর্টস্ এসোসিয়েশনের একজন মেম্বার এবং বাস্কেট বল খেলায় একজন সুযোগ্য রেফারী। তাহা ছাড়া গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় মহিলাদের ক্রীড়া-প্রতিযোগিতায় কয়েকটি বিষয়ে পারদর্শিতা দেখাইয়া পুরস্কার লাভও করিয়াছেন।

এই সমাবর্ত্তন-উৎসবে কুমারী রমলা তাঁহার বি, টি ডিগ্রি লাভ করিয়াছেন। পরীক্ষায় তিনি তৃতীয় স্থান অধিকার

করিয়াছিলেন। ইংরাজী ও মানসিক স্বাস্থ্যে (Mental Hygiene) বিশেষ স্থান অধিকার করেন। এখানে উল্লেখযোগ্য এই যে যাঁহারা ১ম ও ২য় স্থান অধিকার করিয়াছেন তাঁহাদের কেহই কোন বিষয়ে বিশেষ স্থান অধিকার করিতে পারেন নাই। আই, এ পরীক্ষাতেও ইনি ২৯শ স্থান অধিকার করেন। লরেটোতে ইনি শিক্ষা লাভ করেন।

শুধু ইহাই নয় দিল্লী হইতে কুমারী রমলা এ, আর, পি পরীক্ষায় পাশ করেন সম্মানের সহিত। তারপর সেণ্ট জনস্ এম্বুলেন্স ব্রিগেডের প্রাথমিক সাহায্য (First Aid) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

লণ্ডনের এসোসিয়েটেড বোর্ডের নিকট হইতে সঙ্গীতে সার্টিফিকেটও প্রাপ্ত হইয়াছেন।

খেলাধূলা, পড়াশুনা এবং সঙ্গীতে এরূপ সমান দক্ষতা খুব কমই দেখা যায়।

কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ

—কেনোপনিষৎ ১, ২

—শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার আই-সি-এস

মন তোর চায় যারে
প্রাণ যারে চায়
তোর আঁখি দুটি যার লাগি
পথ পানে ধায়
তোর কান যার আশাপথে
কান পেতে রয়
তোর রসনায় যার তরে
মধু উপচয়—
মনে ভেবে ছাখ্ তুই
ত্যজি শঙ্কায়
তোর প্রাণ মন বাণী ধায়
কার প্রেরণায়।
যদি চিত্তের চিত্ত যে
সেই তা পাঠায়
তবে দূর কর এই তোর
লোক-লজ্জায়॥

শ্রোত্রের শ্রোত্র সে
চক্ষুর চোখ
সে যে প্রাণের চিরন্তন
উৎস-আলোক।
বাক্যের বাক্য সে
বক্ষের বুক
সে যে হর্ষের হর্ষ রে
দুঃখের দুঃখ।
মনে ভেবে ছাখ তুই
ত্যজি শঙ্কায়
এই প্রাণ মন বাণী তোর
তাঁরি প্রতিছায়।
যদি প্রণয়ের ধারা মিশে
অমৃততায়—
তবে দূর কর এই তোর
লোক লজ্জায়॥

নাটমণ্ডপ

শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্সের বহু-বিজ্ঞাপিত কথা-চিত্র "মাটির ঘর" খুব শীঘ্রই 'উত্তরা'য় মুক্তিলাভ করিবে। তরুণ নাট্যকার বিধায়ক ভট্টাচার্য্যের এই নাটকখানি রঙ্গমঞ্চে অভাবিত সাফল্যের সহিত বহুদিন অভিনীত হইয়াছিল, এক্ষণে তাহার চিত্ররূপ যে পরিবর্দ্ধিত, পরিবর্জ্জিত ও পরিমার্জ্জিত হইয়া চিত্রপ্রিয়দের অধিকতর খুসী করিবে, তাহা বলাই বাহুল্য। ইহাতে অভিনয় করিয়াছেন বঙ্গের শ্রেষ্ঠ অভিনেতৃবৃন্দ: শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী, ছবি বিশ্বাস, পদ্মা দেবী, জহর গাঙ্গুলী, রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, মলিনা, তুলসী লাহিড়ী, ইন্দু মুখোপাধ্যায়, জ্যোৎস্না গুপ্তা, রণজিত রায়, মনোরমা প্রভৃতি। পরিচালনা করিয়াছেন হরি ভঞ্জ।

* * *

ইষ্টার্ণ টকীজ কিছুদিন আগে তাহাদের ছবি "নীলাঙ্গুরীয়"র সমালোচনা প্রতিযোগিতা আহ্বান করিয়াছিলেন। সেই সমালোচনা প্রতিযোগিতার ফলাফল নিম্নে প্রদত্ত হইল:

১ম পুরস্কার (২৫০৲ টাকা)—
শ্রীগণেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী (ব্রাহ্মণবাড়িয়া)

২য় পুরস্কার (১২৫৲ টাকা)
শ্রীধীরেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য (ময়মনসিং)

৩য় পুরস্কার (৭৫৲ টাকা)
শ্রীউমাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় (খুলনা)

তাহা ছাড়া নিম্নলিখিতগণ ২০৲ টাকা হিসাবে দশটি সান্ত্বনা পুরস্কার পাইয়াছেন:—

কনক কুমার সিংহ, দিলীপ চন্দ্র ঘটক, এস, কে, ঘোষ, সুনীল চন্দ্র দত্ত, সনৎ কুমার মুখোপাধ্যায় এবং তারাপদ চক্রবর্ত্তী (কলিকাতা), তাপস রঞ্জন সরকার (ময়মনসিং), অনিল কুমার চট্টোপাধ্যায় (খুলনা), বিজন ভট্টাচার্য্য ও ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় (বাঁকুড়া)।

* * *

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের অধিনায়কত্বে কালী ফিল্মসের "বিপর্য্যয়" চিত্রখানির শুটিং চলিতেছে। গিরীণ চক্রবর্ত্তী সঙ্গীত পরিচালনা করিতেছেন।

* * *

বড়ুয়া লিমিটেডের নূতন ছবি "চাঁদের কলঙ্ক" খুব শীঘ্রই কলিকাতায় তিনটি চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করিবে। ইহাতে অভিনয় করিতেছেন বড়ুয়া, যমুনা, রবি রায়, ইন্দু মুখোপাধ্যায়, ললিত চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি। সুবল দাশগুপ্ত সঙ্গীত পরিচালনা করিয়াছেন।

* * *

চিত্ররূপার "সন্ধি"র হিন্দী সংস্করণে নায়িকার অংশে কমলা কোটনীস নাম্নী একজন অভিনেত্রী কয়েকদিন অভিনয় করেন। পরে তাঁহার সহিত কোম্পানীর কোন কারণে ছাড়াছাড়ি হইয়া যায়। উক্ত ভূমিকাটিতে বোম্বায়ের উদীয়মানা প্রতিভাশালিনী চিত্রনটী শ্রীমতী চন্দ্রপ্রভা অভিনয় করিবেন। ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে ছবিখানি গৃহীত হইতেছে এবং অপূর্ব্ব মিত্র পরিচালনা করিতেছেন।

* * *

নিউ থিয়েটার্সে "দুই পুরুষ" ও "উদয়ের পথে"র কাজ খুব জোর চলিতেছে।

* * *

পরিচালক দেবকী বসুর আগামী প্রচারমূলক হিন্দী চিত্র "স্বরগসে সুন্দর দেশ হামারা"য় অভিনয় করিবেন পদ্মা দেবী, বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিন গুপ্ত, হীরালাল প্রভৃতি।

* * *

বোম্বায়ের রাজলক্ষ্মী পিকচার্সের হইয়া ফণী মজুমদার "রাজকুমার" নামক একখানি হিন্দী চিত্র তুলিতেছেন। নীরেন লাহিড়ীও রাজলক্ষ্মী প্রোডাকশানের হইয়া "গরমিলে"র হিন্দী সংস্করণ তুলিবেন। প্রকাশ, নারগিস, বনমালা, পাহাড়ী সান্যাল, জাগিরদার ও মুবারক অভিনয় করিবেন।

* * *

বি, ই, এস, এ থিয়েটারে শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষকগণ কর্ত্তৃক অভিনীত রবীন্দ্রনাথের "বাল্মীকি প্রতিভা" দেখিলাম। ইহা কবির বিংশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালের রচনা, ইংরাজী অপেরার অনুকরণে লিখিত। সেইজন্য শুধু নৃত্যগীতের ভিতর দিয়াই নাটকের রূপটি রূপায়িত হইয়াছে। "বাল্মীকি প্রতিভা"র উপস্থাপনায় অভিনবত্ব আছে অঙ্গ-সজ্জায়, দৃশ্য-সজ্জায় এবং নাটকীয় সংঘাতে অভিনয় মনোজ্ঞ হইয়াছে।

জনৈক অভিনেতার 'শিকার নৃত্য'টি বিশেষ উপভোগ্য। তাহা ছাড়া লক্ষ্মী ও সরস্বতীর ভূমিকায় অরুন্ধতী গুহ ঠাকুরতা ও সুচিত্রা মুখোপাধ্যায়কে মানাইয়াছিল চমৎকার। শান্তিদেব ঘোষের গান ও অভিনয় ভালই। দস্যুদের ভূমিকাগুলিও সুঅভিনীত।

* * *

গত শুক্রবার গণেশ টকী হাউসে চিত্রা প্রোডাকশানের "প্রতিজ্ঞা"র বিশেষ প্রদর্শনীতে আমরা আহুত হইয়াছিলাম।

"প্রতিজ্ঞা"র গল্পে নূতনত্ব বিশেষ না থাকিলেও গল্পটি সুকথিত। জীবনের সহিত জ্যোতির বিচিত্র ঘটনার মধ্য দিয়া আলাপ এবং তাহাই পরে প্রেমে পরিণত হয়। একদিন তাহাদের বিবাহ হইয়া গেল। জ্যোতির কাকা খুব অবস্থাপন্ন ছিলেন। ইঞ্জিনীয়ারিং পড়িতে জীবন তাঁহারই অর্থে বিলাত গেল। বিলাত হইতে ফিরিলে দেখা গেল যে জীবন সম্পূর্ণ বদলাইয়া গিয়াছে। একদিন জীবনের বন্ধু-বান্ধবের সম্মুখে জ্যোতি মদ্য পান করিতে এবং গান গাহিতে অস্বীকার করায় জীবন তাহাকে অপমান করে এবং জ্যোতি তৎক্ষণাৎ জীবনের ছোট ভগ্নী রূপকে সঙ্গে করিয়া গৃহ হইতে চলিয়া যায়। তাহারা অতি কষ্টে দিনাতিপাত করিতে থাকে। বহু ঘটনা বিপর্য্যয়ের পর জীবন যখন অন্ধ হইয়া দুর্দ্দশার চরমে পৌঁছিল তখন তাহার চোখ ফুটিল এবং শেষে কিভাবে জ্যোতির সহিত তাহাদের মিলন হইল তাহা পর্দ্দায় দ্রষ্টব্য।

পরিচালক মহাশয় গল্পটি যদিও সাধারণ ভাবে বলিয়া গিয়াছেন তথাপি ইহা বুঝিতে কোথাও বাধে না। তদুপরি মতিলাল, স্বর্ণলতা ও বেবী মীনার চমৎকার অভিনয়ে "প্রতিজ্ঞা" দর্শক মাত্রেরই অন্তর স্পর্শ করে। গানগুলির সংখ্যা যদিও খুব বেশী, তবু কয়েকখানির সুর সুখশ্রাব্য।

দীপালীর স্বত্বাধিকারী শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত, ১২৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, দীপালী প্রেসে মুদ্রিত ও দীপালী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।
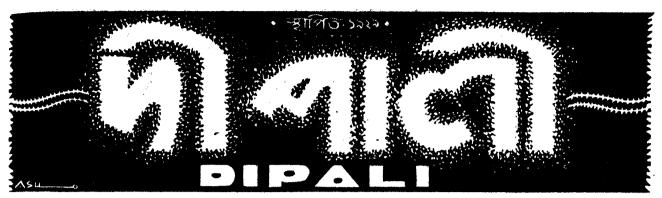
প্রধান সম্পাদক—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় :: সহঃ সম্পাদক—শ্রীধীরেন্দ্রমোহন মজুমদার বি. এল.

১৬শ বর্ষ VOL. XVI. } ৩১শে চৈত্র ১৩৫০ :: April 13, 1944 { ১৫শ সংখ্যা No. 15

আলোচনী

লক্ষ্ণৌ সহরে সম্প্রতি যে নেতৃ সম্মেলন হইয়া গেল তাহা উল্লেখযোগ্য। ইহা Non-party বা কোনো দলীয় ব্যাপার নয়, বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। এই সম্মেলনের ফলে এ দেশের রাজনৈতিক গুমোট ভাব কাটিয়া রাতারাতি সম্প্রীতির সুবাতাস বহিতে আরম্ভ করিবে এইরূপ প্রত্যাশা কেহ করে না। ইহা সত্ত্বেও স্যার তেজ বাহাদুর সাপ্রু তাঁহার অভিভাষণের স্থানে স্থানে যে সকল মূল্যবান কথা বলিয়াছেন তাহা এদেশের রাজনীতিক মাত্রেরই চিন্তার খোরাক যোগাইবে। গত আগষ্ট ১৯৪২ সালে কংগ্রেস যে আন্দোলন আরম্ভ করেন তাহা লইয়া ভারত সরকার দেশে ও বিদেশে যে প্রচার চালাইয়াছেন তাহার দায়িত্ব তাঁহারা অস্বীকার করিতে পারেন না। ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও তাহার নেতৃবর্গের যে পরিচয়-লিপি সারা পৃথিবীতে প্রচারিত হইতেছে তাহা যেমন অদ্ভুত তেমনি দায়িত্বহীন। এদেশের রাষ্ট্রনৈতিক পরিস্থিতির চরম পরিহাস এই যে, সেই সব নেতারা আজও কারারুদ্ধ রহিয়াছেন একটা আরোপিত অপরাধের বোঝা বহিয়া, পক্ষ সমর্থনে বা সত্যের খাতিরে কিছু বলিবার সুযোগও যাহাদের দেওয়া হয় নাই।

* * *

স্যার তেজবাহাদুর তাঁহার দীর্ঘ অভিভাষণের মধ্যে এই কথাটাই বিশেষ জোর করিয়া বুঝাইতে চাহিয়াছেন। গত ১৯৪২ সালের মে ও আগষ্টের মধ্যে যখন রাজনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমশঃ একটা সঙ্কটের মুখে আগাইয়া যাইতেছিল তখন ভারত সরকার কি করিতেছিলেন, এ প্রশ্ন স্যার তেজবাহাদুর করিয়াছেন। ইহার জবাব পাওয়া যায় না। নিরপেক্ষ Tribunal বা বিচারকগোষ্ঠি নিয়োগ করিয়া সমস্ত আরোপিত অভিযোগের মূল অনুসন্ধান করিবার প্রস্তাব ব্যর্থ হইবে ইহা ধরিয়া লওয়া যায়। তথাপি স্যার তেজবাহাদুর এই দুইটি সময়োপযোগী প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া দেশবাসীর ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

* * *

১৯৪২ সালের আগষ্ট ক্রমশঃ দূরে সরিয়া যাইতেছে। সময়ের ব্যবধান আজ এদেশের চিন্তাশীল রাষ্ট্রনৈতিকের সমক্ষে সেদিনের রাজনৈতিক পরিস্থিতির সম্পূর্ণ অর্থ পরিস্ফুট করিয়া তুলিতেছে। এই ব্যবধানের পরপার হইতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলিয়া দেখিতে পাইতেছি, ভারত সরকার যেন তৎকালে সঙ্কটকে আবাহন করিয়া আনিয়াছিলেন। লর্ড লিনলিথগোর অনমনীয় মনোভাবের অন্য কোন অর্থ আমরা খুঁজিয়া পাই না। যে গঠনমূলক পরিকল্পনা ও সহানুভূতি কংগ্রেসের সমস্ত প্রচেষ্টাকে সার্থক করিয়া তুলিত, ভারত সরকারের সেদিনকার উপদেষ্টা মহলে সে মনোভাবের সামান্যতম ইঙ্গিতও পাওয়া যায় নাই। ইহা একটু বিচিত্র বলিয়াই মনে হইবে। সমস্যা সমাধানের আপ্রাণ চেষ্টায় কংগ্রেস প্রাণহীন পাষাণ প্রাচীরে মাথা ঠুকিয়া রক্তাক্ত হইয়াছিল। স্যার ষ্ট্যাফোর্ডের ভারত আগমন হইতে ১৯৪২ আগষ্ট

পর্য্যন্ত কংগ্রেসের বিভিন্ন কার্য্যাবলীর ইতিহাস যাঁহারা আলোচনা করিবেন তাঁহাদের নিকট এই সত্যটাই যেন অধিকতর স্পষ্ট হইয়া উঠিবে।

* * *

কলিকাতায় বর্ত্তমানে কয়লার যে দুর্ভিক্ষ হইয়াছে সে সম্বন্ধে একটা প্রেস রিপোর্ট পাঠ করিতেছি। সংবাদটি সরকারী মহল হইতে অনুপ্রাণিত কিনা জানি না। বলা হইয়াছে যথেষ্ট ওয়াগনের অভাবে বাংলা দেশে উপযুক্ত পরিমাণে কয়লা আমদানী করা যাইতেছে না। সরকারী মহল হইতে এ সম্বন্ধে যথেষ্ট পরস্পরবিরোধী উক্তি আমরা অক্লেশে গলাধঃকরণ করিয়াছি। একথা বলা হইয়াছে, খনি হইতে কয়লার উৎপাদন সম্প্রতি কমিয়াছে, বর্ত্তমান সঙ্কটের ইহাই কারণ। ওয়াগনের অভাবের কথাও বর্ত্তমানে বলা হইতেছে। এই ধরণের দায়িত্বহীন উক্তি করিতে ইহাদের বাধে না। আশ্চর্য্য ইহাই! অথচ সরকারী ব্যবস্থার প্রতি জনসাধারণের আস্থা আজও ফিরিয়া আসিল না বলিয়া কাঁদুনী চলিতেছে। ন্যাকামিরও একটা সীমা আছে।

* * *

মার্কিণ মুল্লুক আজব দেশ সন্দেহ নাই। ইতিপূর্ব্বে মার্কিনী criminal gang ও তাহাদের বিচিত্র কার্য্যাবলীর সংবাদ সাধারণের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে। মুক্তিমূল্য বা ransom আদায় করিবার জন্য উপযুক্ত শিকারকে গুম করিয়া রাখিবার প্রথা সেখানে আছে। সময়ে সময়ে তাহা শোচনীয় পরিসমাপ্তি লাভ করে। কিছুদিন পূর্ব্বে Lindburg Baby সম্বন্ধে যে শোচনীয় ঘটনা ঘটে তাহার ফলে গোটা আমেরিকায় অসাধারণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। সম্প্রতি নিউ ইয়র্ক হইতে যে সংবাদ এদেশের পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে একটি ছাত্রীর রহস্যজনক অন্তর্ধানের সংবাদ পাওয়া যাইবে। মহিলাটি কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী এবং ভারতীয়। তাহার পিতা ডাঃ জন মাথাই একজন সুপরিচিত অর্থনীতিক। এই ঘটনার মধ্যে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে পুলিশ এ পর্য্যন্ত কোন প্রকার সূত্র আবিষ্কার করিতে পারে নাই। বালিকাটির ব্যক্তিগত জীবন অত্যন্ত ঘরোয়া ছিল। নির্জ্জনে গৃহে বাস করিতেই তিনি পছন্দ করিতেন, এইরূপ বলা হইয়াছে। মিস্ মাথাই International House নামক যে হোটেলে বাস করিতেন তাহার প্রত্যেকটি স্থান খুঁজিয়াও কোন সূত্র পাওয়া যায় নাই। ব্যাপারটি অত্যন্ত রহস্যাবৃত বলিয়া মনে হইতেছে। ইতিমধ্যেই এই ঘটনা লইয়া ওদেশে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে।

* * *

কলিকাতার "Statesman" পত্রিকা জেনারেল উইনগেট-এর মৃত্যুসংবাদ সম্বন্ধে মন্তব্য করিতে গিয়া এদেশের সংবাদ নিয়ন্ত্রণ নীতির নিন্দা করিয়াছেন। গত ২৪শে মার্চ্চ জেনারেল উইনগেট নিহত হন। সংবাদটী বিলাতে যথাসময়ে প্রচারিত হইয়াছিল। ফলে বিলাতি কাগজগুলি ১লা এপ্রিলের প্রভাতী সংস্করণেই এ সম্বন্ধে সম্পাদকীয় আলোচনা করেন। কিন্তু কলিকাতায় ১লা এপ্রিল প্রাতঃকালে রেডিও মারফৎ প্রথম এই সংবাদ জ্ঞাপন করা হয়, যদিও গুজব কয়েকদিন পূর্ব্ব হইতেই চলিতেছিল। বাঙ্গলা দেশ ঘটনাস্থল হইতে নিকটবর্ত্তী। পূর্ব্ব সীমান্তে যে যুদ্ধ চলিতেছে তাহার সহিত সম্বন্ধও তাহার ঘনিষ্ঠ ও প্রত্যক্ষ। ইহা বিবেচনা করিলে সংবাদ দানের এই রীতির প্রশংসা করা চলে না। পত্রিকাটি বলিয়াছেন—"It looks as if the time table were carefully arranged for some purpose that we cannot guess, which however did not include the interests of news paper readers in this country"

অর্থাৎ আমরা অনুমান করিতে পারিতেছি না হয়তো এইরূপ কোন কারণ বশতঃ কর্ত্তৃপক্ষ বর্ত্তমান সংবাদটীর প্রচার ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিলেন। কিন্তু এই ব্যবস্থা যে সংবাদ পত্র পাঠক জনসাধারণের স্বার্থের অনুকূল নয় তাহা বলা যায়…

প্রস্তরযুগ

(গল্প)

—শ্রীঅমিতাভ দাশগুপ্ত

পৈতৃক বাড়িটা ছিল বলে অবনী বেঁচে গেল।

সংসারটা ছোট হলেও আয়টা তদনুপাতে আরো বেশী সংক্ষিপ্ত। কাজেই অভাব আর অনটন দুটোই এ-সংসারের একেবারে মজ্জাগত। কিন্তু ভোবেনি কখনও, সেটা অবনীর বাহাদুরী নয়, এমন কি তার স্ত্রী সুরুচিরও না। অবশ্য সুরুচি কথায় কথায় শুনিয়ে রাখে অবনীকে—

'আমি ছিলাম বলে তাই মাসগুলো গড়িয়ে যায়। টের ত' পাও না, যে কোথা দিয়ে কি আসছে।'

অবনী লোক ভাল আর স্ত্রীকে ভালও বাসে, তাই মৃদু হেসে শুধু বলে—

'তাই নাকি!'

সংক্ষিপ্ত উত্তর পেলে সুরুচি ভাবে তাকে ঠাট্টা করা হচ্ছে। তাই অবনীর কথায় চটে গিয়ে বলে—

'নয় ত কী! আমি মরে গেলে টের পাবে, যে তোমার ঐ মাস বরাদ্দয় বাঁধা চল্লিশটাকায় মাস কাটে না সহজভাবে। অনেক বুদ্ধিরও দরকার।'

'ও!'

সুরুচি আর সহ্য করতে পারে না, ঝংকার দিয়ে বলে—

'ঠাট্টাই কর আর যাই কর, তোমার ও চল্লিশ টাকায় আমি আর সংসার চালাতে পারব না—এই আমি সোজা কথা বলে দিলাম।'

অবনী এবার উত্তর দেয়—

'না পারলে নাই; আমার কি, ছেলে-মেয়েগুলোই না খেয়ে মরবে।'

'গরীবের ছেলেমেয়ে না হওয়াই উচিত।' সুরুচি মুখে কাপড় গুঁজে ছুটে পালায়।

অবনীর মুখ এক নিমেষে ফ্যাকাশে হয়ে যায়।

অবনী রাগ করতে পারে না সুরুচির ওপর; এমন কি অভিমানও না। সত্যিই ত বেচারী মাথা ঠিক রাখে কি করে। আগে যা'ও বা চ'লত এখন যুদ্ধের কল্যাণে তা' একেবারে অচল হতে বসেছে। স্কুল মাষ্টারি করে চল্লিশ টাকা যার মোট আয়, সে পঞ্চাশ টাকা মণ চাল কিনে খাবে কি করে? নেহাৎ মফঃস্বল সহর বলে ধার টার সহজেই পাওয়া যায়, আর তার উপরেই মাস কাটে। এগুলো

পড়ে ছেলেমেয়েগুলো শুকিয়ে মরছে প্রতিদিন।—সে ব্যথা অবনীর কাছে যত না নির্মম হয়ে দেখা দেয়, সুরুচিকে সহ্য করতে হয় তার থেকেও অনেক বেশী নির্মমতা, অনেকখানি তীব্রতা। কিন্তু অবনীরই বা দোষ কি, তার ইঙ্গিতে ত' আর জিনিষপত্রের দাম বাড়েনি। তাছাড়া রোজগার বাড়াবার চেষ্টাও সে যথেষ্ট করেছে, উঞ্ছবৃত্তির মত ছিটে ফোঁটা হয়ত জুটেছে কিন্তু সুরুচির চিন্তাকে তা' লঘু করতে পারেনি। বরং ঠোঁট উল্টে সুরুচি বলেছে—

'মোটে!'

অবনী লজ্জিত হয়ে ফিরে এসেছে।

ঘরের চৌকিটার ওপর বসে অবনী ভাবছিল এইসব কথা। ঘর অন্ধকার, কারণ খরচ কমাবার জন্যে সুরুচির ব্যবস্থায় সন্ধ্যের পর আলো জ্বালা হয় না। সন্ধ্যের আগেই ছেলেমেয়েগুলোকে আধপেটা খাইয়ে শুইয়ে রাখে। তারপর রান্নাঘরের শিকল তুলে ভিতরের ঘরটার রোয়াকে এসে বসে পা ছড়িয়ে, রাত দশটায় টিউশনি থেকে ফিরলে একটা প্রদীপ জ্বেলে অবনীকে ভাত বেড়ে দেয়। খাওয়ায়, নিজে খায়। তারপর আবার অন্ধকার। পাঁচীল ঘেরা বৃহৎ বাড়িটা প্রেতের মত রাত্রিকে পাহারা দেয়। বিগত যৌবনের মত এই বাড়িটা একদিন চটুলতায় ছিল উচ্ছ্বসিত। মোটা মোটা থাম ঘিরে ছিল বলিষ্ঠ আত্মার পরিচয়। আর আজ? অন্ধকারে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে কাঁদছে। একপুরুষের ব্যবধানেই তার সমস্ত রূপ যেন নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে।

অবনী ভেবেছিল বড় মেয়ের বিয়ের দেনা শোধ করে বাড়িটা সারিয়ে নেবে, যাতে দ্বিতীয় মেয়ে সন্ধ্যার বিয়েতে অন্ততঃ বাড়িটা একটু সাজিয়ে গুছিয়ে তুলতে পারে। কিন্তু সেই, আর্তনাদ। মানুষের হাতে লাঞ্ছিত বিজ্ঞানের সকরুণ আর্তনাদ সমস্ত বিশ্বকে ছাপিয়ে উঠেছে। অবনীর শিরদাঁড়াটা সোজা হয়ে ওঠে অন্ধকারে, মানুষটাকে যদি হাতের মুঠোয় পেত, তাহলে—

'খাবে এখন?'

কখন নিঃশব্দে এসে সুরুচি ঢুকেছে ঘরে টের পায়নি, তাই চ'মকে উঠল'—'এ্যাঁ!'

সুরুচি একপাশে এসে দাঁড়াল, জিগ্যেস করল—'কি ভাবছ?'

অবনী শুধু বললে—'কিছু না।'

সুরুচি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে নিঃশব্দে চৌকির একপাশে বসে পড়ল। যেন দু'জনের চিন্তাধারা একজায়গায় এসে মিশে গিয়ে হঠাৎ মুখ বন্ধ হয়ে গেল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে অবনী বলে—

'চল, খেতে দেবে চল।'

'এস।'

বলে সুরুচি উঠে গেল প্রদীপ জ্বেলে ভাত বাড়তে।

কিন্তু অবনী উঠল না। অবনীর মাথায় পাক খেয়ে চলেছে কত চিন্তা। অবনী ভাবে তার মত দুঃখ দুর্দ্দশায় বুঝি পৃথিবীর আর কোন মানুষ পড়েনি। রাস্তার ভিখিরী—তারও দিন চালাবার একটা নিশ্চিন্ত উপায় আছে। হয়ত মাথার উপরে কোন আচ্ছাদন নেই। হয়ত দুরন্ত শীতে আর প্রচণ্ড বর্ষায় ছুটাছুটি করে মরে; কিন্তু দুঃশ্চিন্তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে। অবনী মনে মনে হাসে। সুরুচির কতটুকু পরিচয় বাইরের জগতের সঙ্গে? পরিচয় থাকলে দেখতে পেত মানুষ আজ কত নীচে নেমে গিয়েছে। তার সেই নীচতার প্রতিদান স্বরূপ প্রকৃতি দিয়েছে কত লাঞ্ছনা। এই ত' সেদিনও কাগজে দেখেছিল ভিসুভিয়াসের অগ্নি গহ্বর থেকে গলিত উত্তপ্ত মৃত্যু নেমে এসেছে কত শত নরনারীর উপরে। যাদের গৃহ ছিল, সংসার ছিল, শান্তি ছিল, তারা এক নিমেষে নেমে এসেছে পথের ধূলোয়,—তারা হয়েছে লক্ষ্মীছাড়া। না, অবনী সুখে আছে। পাশে নেই ভিসুভিয়াস, মাথার উপরে নেই অব্যর্থ মৃত্যু, দেহকে ঘিরে আছে ইট দিয়ে গাঁথা পাথরের মত শক্ত দেয়াল। প্রাচীনের কল্যানী আশীর্ব্বাদ তার অক্ষয় কবচ। সুরুচিকে বুঝিয়ে দিতে হবে কথাটা ভাল ক'রে।

হঠাৎ ওপাশের দালান থেকে ছোট ছেলেটা তীব্র ভাবে কেঁদে উঠল।

'কি হোল?'

সুরুচি ছুটে গেল সেদিকে, অবনী উঠে গেল।

সুরুচি আলো জ্বালতে জ্বালতে জিগ্যেস ক'রল—

'কি হোল রে, সুকু?'

সুকু তখন আর্তনাদ করছে যন্ত্রণায়, বললে—'কি একটা যেন কামড়াল'।'

অবনী ছুটে এল। সুরুচি আলোটা হাতে নিয়ে মশারী তুলতেই, মেজ মেয়ে ছবি চীৎকার করে উঠল—

'ঐ দেখ মা কত বড় একটা কেঁকড়া বিছে, মশারী বেয়ে উঠছে দেখ।'

'কই দেখি।' সুরুচি আতঙ্কিত কণ্ঠে ব'ললে। অবনী ধমক দিয়ে উঠল'—

'ছেলেটাকে আগে বের কর, তারপর বিছে মের।'

সুরুচি একমুহূর্ত্ত থেমে বললে—

'কিন্তু বিছেটা আগে মারা দরকার। আর কাউকে কামড়াতে পারে।'

'সর, দেখছি আমি, তুমি সুকুকে নাও। —মধু আর চুণ লাগিয়ে দাও।'

'থাক্, তোমাকে আর উপদেশ দিতে হবে না।' বিরক্তির স্বরে বললে সুরুচি।

'ব'লতে হবে না মানে?'

'কিছু না।'

'না ব'লে ব'লে ত' সংসার যা হ'চ্ছে তা দেখতেই পাচ্ছি। আজ সুকুকে কাঁকড়া বিছে কামড়াল, কাল হয়ত—'

সুরুচি ঝংকার দিয়ে উঠল—

'কি যা তা বকছ। যাও তোমায় বিছে মারতে হবে না, তুমি নিজের ঘরে যাও।'

অবনী বিছেটাকে তখন ঘায়েল ক'রে এনেছে।

সুরুচি বললে—

'না। পারব না আমি কোন কাজ ক'রতে। পার নিজে কর।' ব'লে সুকুকে মাটিতে শুইয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

'যার আলো জালবার ক্ষমতা নেই, সে আবার বিয়ে করে কোন লজ্জায় তা'ত ভেবে পাইনে।'

অবনী অবাক হ'য়ে বলল—

'তাই বলে ছেলেটাকে মাটিতে শুইয়ে দিলে?'

'পার নিজে তুলে রাখ।' চাবির গোছাটা খুলে ঝণাৎ ক'রে ফেলে দিয়ে ব'লল—

'এই রইল চাবি।'

'সে পরে হবে, কিন্তু যা বলছি তাই ক'রে যাও আগে।' কঠিন কণ্ঠে ব'ললে অবনী।

সুরুচি একটু থমকে গেল। ঘুরে দাঁড়িয়ে শান্ত কণ্ঠে ব'ললে—

'হুকুম? হুঁ—ভাত দেবার কেউ নয়, নাক কাটবার গোঁসাই।' অবনীর সমস্ত ধৈর্য্য এক নিমেষে শেষ হ'য়ে গেল। বাঘের মত লাফিয়ে পড়ল সুরুচির ঘাড়ে। চুলের মুঠি ধ'রে বার বার ঠুকে দিল তার মাথাটা মোটা মোটা ইটের দেয়ালে। সুরুচি প্রস্তুত ছিল না এজন্যে, তাই অপ্রত্যাশিত আঘাতে চীৎকার করে সুরুচি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল মাটিতে। ছেলেমেয়েগুলো ভয় পেয়ে চীৎকার সুরু ক'রে দিল। ছবি আর্তনাদ ক'রে উঠল'—'বাবা, কি ক'রলে। মা বোধ হয় ম'রে গেল! বাবা!'

অবনীর হঠাৎ খেয়াল হোল কী কাণ্ডটা সে এইমাত্র করে বসেছে। স্তম্ভিত হ'য়ে গেল। চোখের সামনে ভেসে উঠল', ভিসুভিয়াসের অগ্ন্যুদ্গার, পোলাণ্ডের সীমান্তে পিশাচের আর্তনাদ, রাজপথ দিয়ে কংকালের শোভাযাত্রা। কোথায় আমাদের রক্তের মত তাজা বলিষ্ঠ প্রাণ? যা আছে, তা শুধু পাথরের দেয়ালে বন্দী সর্বনাশা ক্ষুধা!

সভ্যজগতের মানুষ ফিরে এসেছে প্রস্তরযুগে!

বাংলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের স্থান

—শ্রীদুর্গাচরণ ঘোষ

শরৎচন্দ্র যে সাহিত্য-জগতে যুগান্তর আনিয়াছেন, এ কথা সকলেই স্বীকার করেন। মানবের শাশ্বত দুঃখ ও অশ্রুর স্পর্শে, অন্যায়ের অভিযোগে তিনি সাহিত্যের ভাষা করিলেন সরস। সেই জন্যই বলিতেছি, শরৎচন্দ্রের পূর্ব্বেও সাহিত্য ছিল—পরেও থাকিবে—শুধু মধ্যযুগে তিনি সাহিত্য-গগনে যে অপূর্ব জ্যোতি বিকীরণ করিয়াছেন, তাহা চির অম্লান, চির সুন্দর, চির সত্য হইয়া রহিবে।

বঙ্কিমবাবু ও রবিবাবুর নায়ক নায়িকারা সাহিত্যের উচ্চস্তরের জীব। তাহাদের কোথাও মলিনতা নাই—সম্পূর্ণতা নাই—আত্মবিলাপের করুণ আর্ত্তনাদ নাই। তাহারা আমাদের অন্তরের সহিত সম্বন্ধ রাখিল না—হৃদয়কে নিবিড়ভাবে স্পর্শ করিল না। তাঁহাদের লেখা বাংলার জনসাধারণের মধ্যে মিশিতে পারে নাই।

কিন্তু মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও জনসাধারণের প্রতি সহানুভূতি ও মননশক্তির প্রভাবে শরৎচন্দ্র সাহিত্যের পরশকাঠিতে জাগাইলেন মানুষের ম্রিয়মাণ প্রাণকে ভাবের ও রুচির ঐশ্বর্য্যে।

চন্দ্রালোকের মত সাহিত্যে শরৎবাবুর দানের কার্পণ্য নাই,—পুষ্পের সৌরভ বিকাশের মত কৃত্রিমতা নাই—প্রকৃতিজাত সৌন্দর্য্যের মত রিক্ততা নাই।—তাই সাহিত্য-জগতে তিনি সর্ব্বোচ্চ আসন অধিকার করিয়াছেন। দরিদ্রের পর্ণকুটির হইতে ধনীর প্রাসাদ পর্য্যন্ত তিনি জ্বালাইলেন প্রেমের আগুন—ত্যাগের আদর্শ।

শরৎচন্দ্রের নায়ক নায়িকারা আমাদের কাছে এত পরিচিত কেন? ইহার উত্তর: তাঁহার নায়ক নায়িকারা আমাদের মতই সুখদুঃখে আপনার ভাগ্য লইয়া এই জগতের সম্মুখীন হইয়াছে, আমাদের মতই ভালো বাসিয়াছে—আবার ব্যর্থ হইয়া তাহাদের জীবন-প্রদীপ মায়া-মরীচিকার মতই দগ্ধ হইয়াছে। যে কাহিনী এত স্বাভাবিক তাহা কাহাকে না অভিভূত করে?

সাহিত্য-জগতে শরৎচন্দ্র সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন তাহার মূলে আছে প্রধানতঃ তাঁহার সাহিত্য ও তাঁহার মন।

তিনি গল্প লিখিবেন বলিয়া সাহিত্য সৃষ্টি করেন নাই। তিনি যাহা দুনিয়ার মাঝে দেখিয়াছেন, যাহা তাঁহার মনটিকে অভিভূত করিয়াছিল তাহাই লিখিয়াছেন! জীবনের দুঃখ কষ্ট যে কতখানি নির্ম্মম ও করুণ হইতে পারে তাহাই তিনি দেখাইয়াছেন তাঁহার সাহিত্যে। তাঁহার সাহিত্য সম্বন্ধে আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মহোদয় কবিশেখর কালিদাস রায় এক স্থানে বলিয়াছেন,

"—সত্যই শরৎচন্দ্র তাঁহার জীবন দিয়াই তাঁহার সাহিত্য গড়িয়াছেন—নির্জ্জীব প্রতিমায় তিনি চেষ্টা করিয়া প্রাণ সঞ্চার করেন নাই। তিনি নিজের চারিপাশে যাহা দেখিয়াছেন, তিনি যাহা জীবনের নানাক্ষেত্রে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছেন যাহা নিত্যই চোখের সম্মুখে ঘটিতেছে—নিজের জীবনে যাহা ঘটিয়াছে, তাহাই তিনি সাহিত্যে রূপ দান করিয়াছেন! তাঁহার রচনার চরিত্রগুলিকে সৃষ্ট না বলিয়া দৃষ্ট বলিলেই ঠিক হয়! এই চরিত্রগুলি জীবন্ত মানুষ—এইগুলি Ideas personified নয়, বরং Persons idealised বলা যাইতে পারে। আপন জীবনকে তিনি রূপে রসে ভাববৈচিত্র্যে সম্পূর্ণাঙ্গ ও অমর করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। এ সাহিত্য তাঁহার জীবনের জ্বলন্ত প্রাণবন্ত অভিব্যক্তি।"

এইরূপ সাহিত্যের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়াই—তিনি আজ এত উচ্চে। শরৎচন্দ্রের সাহিত্য বাংলার মাটীর নিজস্ব সম্পদ—বাংলার প্রাণ মন ঐগুলিতে একান্ত ভাবে বিজড়িত আছে। তাঁহার সাহিত্য সাধারণের। অতি সাধারণ বস্তু—যাহা প্রত্যেকের জীবনের সঙ্গে একান্তভাবে মিশিয়া আছে—তাহাই তাঁহার সাহিত্যে রূপ পাইয়াছে—। শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় মহাশয় একস্থানে বলিয়াছেন—"তাঁহার সাহিত্যই সাক্ষ্য দেয়, তথাকথিত অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল না তাহাদের ভোগ-সর্বস্বতা ও অহঙ্কারের জন্য। তাই তাহাদের কথা লইয়া তিনি যে সাহিত্য রচনা করিয়াছেন তাহা তেমন জমে নাই।"......

পতিত, দরিদ্র, অস্পৃশ্য—ইহাদের উপরেই তাঁহার স্নেহ ছিল সর্ব্বাপেক্ষা বেশী, তাই ইহাদের কথাই তাঁহার সাহিত্যে বেশী স্থান-লাভ করিয়াছে। ইহাদের প্রাণের অব্যক্ত বেদনা তিনি কলমের মুখে ফুটাইয়াছেন। সমাজের চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়াছেন ইহাদের মধ্যেও ভগবান আছেন। ইহাদের প্রতি অপমান ভগবানকেই গিয়া আঘাত করে। এইজন্যই বাংলার জনসাধারণের নিকট হইতে তিনি এত জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করেন।

বাংলা সাহিত্যে তাঁহার এই জনপ্রিয়তার কারণ: তাঁহার পূর্বে এতখানি দরদ দিয়া বাংলাকে কেহ দেখে নাই—এমন নিবিড় করিয়া ভালোবাসে নাই। পল্লীমায়ের সুখ-দুঃখভরা রূপ এমন করিয়া কেহ ফুটাইতে পারে নাই।—তাইতো বাংলার লোকে তাঁহাকে এমন নিবিড় করিয়া কাছে টানিয়া লইয়াছে।

বাংলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের স্থান সবাকার উচ্চে কেন?—ভগবান শরৎচন্দ্রকে একটী সোনার কাঠি দিয়াছিলেন—সেটী হইতেছে—মানুষের প্রতি দরদ। এই দরদের পরশ কাঠি দিয়াই তিনি প্রতিটি চরিত্র জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। মানুষ তাই তাঁহাকে এত ভালবাসিত। এই প্রসঙ্গে শ্রীকালিদাস রায় মহাশয় বলিয়াছেন—'যাহারা তাঁহার সাহিত্য পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা জানেন—মানুষের প্রতি তাঁহার কতখানি দরদ ছিল। এ দরদ তাঁহার সাহিত্য রচনাতেই ফুরাইয়া যায় নাই—এ দরদ তাঁহার সাহিত্য সৃষ্টির গোপন উপাদান মাত্র নয়। তাঁহার লৌকিক ও ব্যবহারিক জীবনেও এই দরদের পরিচয় পাওয়া যায়। লাঞ্ছিতের প্রতি দরদের জন্যই তিনি রাজনীতিক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। দুঃখী দরিদ্রের কথা লইয়া তিনি আলোচনা করিতে ভালোবাসিতেন—তাহাদের কথা বলিতে বলিতে তাঁহার চোখ ছল ছল করিয়া উঠিত—তাঁহার কণ্ঠস্বর গদগদ হইয়া উঠিত।"

লিপটনের চা খেতে খেতে অসাবধানে কথা বলবেন না।

উপেক্ষিত, পতিত, ভ্রান্ত, পাপসম্পৃক্ত যাহারা তাহাদের প্রতি তাঁহার দরদ ছিল খুবই বেশী, পথভ্রষ্ট ও অপরাধী বলিয়া কেহ শরৎচন্দ্রের সহানুভূতি হারায় নাই। শরৎচন্দ্র বলিতেন—"দেখ, কেহ জীবনে ভুল করেছে বা অপরাধ করেছে বলে তাকে ঘৃণা করা মহাপাপ। আমরা নিজেরা এত বেশী ভুল করি যে আমাদের ঘৃণা করবার কোন অধিকারই নাই। অনেক সময়ে আসামী ও বিচারকের মধ্যে পার্থক্য থাকে অতি সামান্য। একই পাপ করে একজন ধরা পড়েছে বলে আসামী আর একজন ধরা পড়েনি বলেই বিচারাসনে বসে বিচার করছে। তারপর যাদের আর্থিক দৈন্য তোমরা তাদেরই করুণার পাত্র মনে কর, যারা morally poor বা intellectually poor তাদের ঘৃণা কর কেন? সকল শ্রেণীর দরিদ্রই সমাজে করুণার পাত্র। কাউকে দিতে হবে ভিক্ষা, কাউকে দিতে হবে শিক্ষা—আবার কাউকে বা দিতে হবে সৎপথে দীক্ষা—কিন্তু সহানুভূতি দিতে হবে সকলকেই।"

আমি শরৎচন্দ্রকে একজন Philanthropist বানাইতে চাহি না। তিনি দুঃখ দূর করিবার ব্রত গ্রহণ করেন নাই। আমার প্রতিপাদ্য—তাঁহার হৃদয়টা ছিল কারুণ্যঘন। নিজে যে বেদনা ও অশান্তি তিনি অনুভব করিতেন তাহা হইতে মুক্ত হওয়ার জন্য তিনি চেষ্টা করিতেন। পশুপক্ষীর প্রতিও তাঁহার দরদ ছিল মানুষের মতই। জীবজগতের প্রতি এই অপরিমেয় মমতা লইয়াই তিনি চন্দ্রনাথের শেষে ভরতের মৃগশিশুর উপাখ্যানটী লিখিয়াছিলেন। শরৎচন্দ্রের রচনায় যে দরদ ফুটিয়াছিল তাহা সাহিত্য সৃষ্টির জন্য মর্মের বাহির হইতে আমদানী করা নয়—তাহা তাঁহার মর্মের গভীর স্তরের গূঢ়তম সম্পদ।

শরৎচন্দ্রের মধ্যে আরও একটা জিনিষ ছিল—যাহার জন্য লোকে তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত, ভালোবাসিত। যাহার স্পর্শে তাঁহার সাহিত্য এত করুণ হইয়া উঠিয়াছে। তাহা হইতেছে—দুঃখ। আজীবনকাল তিনি এই দুঃখের মাঝে নিজেকে ডুবাইয়া রাখিয়াছিলেন। এ যে কতখানি নিদারুণ মর্মস্পর্শী হইতে পারে তাহা তিনি বুঝিয়াছিলেন। তাই তাঁহার সাহিত্য দুঃখ দিয়া ঘেরা। দুঃখের কাহিনী আরও অনেকে লিখিয়াছেন কিন্তু তাহা এমন জীবন্ত হইয়া উঠে নাই—এমন ভাবে মানুষের হৃদয় স্পর্শ করে নাই। তাঁহারা উপর হইতে মানুষের যা দুঃখ ও অভাব দেখিয়াছেন—তাহাই লিখিয়াছেন। মানুষের মনের খবর পান নাই। তাই তাঁহাদের লেখায় দুঃখের খোলসটুকু মাত্র পড়িয়াছে। কিন্তু শরৎচন্দ্র অন্তরের সহানুভূতি দিয়া মানুষকে ভালোবাসিয়াছিলেন—মানুষের আন্তরিক কষ্ট ও অভাব বুঝিয়াছিলেন—তাই তাঁর সাহিত্যে দুঃখ এত নিবিড়ভাবে রূপ পাইয়াছে। শ্রীকালিদাস রায় মহাশয়ের নিম্নলিখিত বিবরণ হইতে জানা যায় যে তিনি দেশ ও দেশবাসীকে ভালোবাসিয়া, শুধু তাহাদের দুঃখ কষ্টের কথা ভাবিয়া এবং লিখিয়া এত বড় হইয়াছেন। কবিশেখর কালিদাস রায় বলেন—"

"......এই বলিয়া তিনি একের পর এক বিচিত্র ধরণের দুঃখের কাহিনী বিবৃত করিয়া যাইতেন তাঁহার স্বভাবস্নিগ্ধ সরস ভঙ্গিতে। একটা অপূর্ব বেদনা-বিলাস দেখিয়াছি তাঁহার মধ্যে। দিনের পর দিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাঙ্গালী জীবনের বিচিত্র দুঃখের কাহিনী তাঁহার মুখে শুনিয়াছি। ইহাতে তাঁহার ক্লান্তি ছিল না। হৃদয়ের গভীর বেদনানুভূতির প্রকাশ করিয়া তিনি কি আত্মপ্রসাদ—কি তৃপ্তিলাভ করিতেন তিনিই জানিতেন। তাঁহার কাছ হইতে কখনও উল্লসিত হৃদয়ে ফিরিতে পাই নাই—বেদনা-ভারাক্রান্ত চিত্তে দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে গৃহে ফিরিতে হইয়াছে।"

ভাণ্ডারভরা সুখ স্বাচ্ছন্দ্য আরাম বিলাসকে এমন করিয়া সাধে সুখে বেদনার অশ্রুধারায় ধৌত করিয়া ভোগ করিতে কাহাকেও দেখি নাই। ভগবান শরৎচন্দ্রকে বেদনার নবনী দিয়া গড়িয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি অনেক দুঃখ পাইয়াছিলেন—চিরদিন দুঃখীদের মধ্যেই কাটাইয়াছিলেন—দুঃখ দিয়া তিনি তাঁহার পরিকল্পিত চরিত্রগুলির বেদনাঘন জীবনে তাঁহার নিজের জীবনেরই আংশিক অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে। পরবর্তী জীবনে তিনি মান যশ ও প্রতিষ্ঠার চূড়ান্ত সীমায় উঠিলেন—কমলার কৃপাও লাভ করিলেন—সাংসারিক দুঃখ কষ্ট তাঁহার কিছুই থাকিল না—সন্তান-সন্ততির দল আসিয়া তাঁহার শান্তিভঙ্গ ঘটাইল না—নিশ্চিন্ত জীবনে তিনি প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তাঁহার জীবনের সকল অঙ্গেরই পরিবর্তন হইল—কেবল দরদী হৃদয়টি অপরিবর্তিত থাকিয়া গেল। দরদের দণ্ড হইতে তিনি অব্যাহতি পাইলেন না। জীবনের উৎসব ক্ষেত্রেও তিনি দুঃখের স্মৃতি, দুঃখের স্বপ্ন, দুঃখের চিন্তায় অন্যমনা ও উদাসী হইয়া রহিলেন। কারুণ্যঘন হৃদয় তাঁহাকে সুখৈশ্বর্য্য ভোগ করিতে দিল না। বালিগঞ্জের আত্মসুখসর্বস্ব ভোগ-পিপাসার পরিবেষ্টনীর মধ্যে গৃহনির্মাণ করিয়া তিনি বাস করিতে আসিয়াছিলেন—কিন্তু তাঁহার মন পড়িয়া থাকিল রূপনারায়ণের কূলে দুঃখী কাঙ্গালদের কুটীরে। তাই বার বারই তিনি সেখানে ছুটিয়া যাইতেন—দুর্গত বঙ্গদেশ হইতে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্য্যন্ত তিনি আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারেন নাই।"

এতখানি ভালবাসা ছিল বলিয়াই তিনি অমন সাহিত্য সৃষ্টি করিতে পারিয়াছিলেন। এতখানি দরদ ছিল বলিয়াই তিনি আজ এত উচ্চে। মানুষকে তিনি বড় ভালোবাসিতেন, বিশেষ করিয়া দুঃখীদের, যাদের ভালোবাসিবার কেহই নাই। তাই সাহিত্যে তাহাদের কথাই রূপ পাইয়াছে। মানুষের মনের কথা
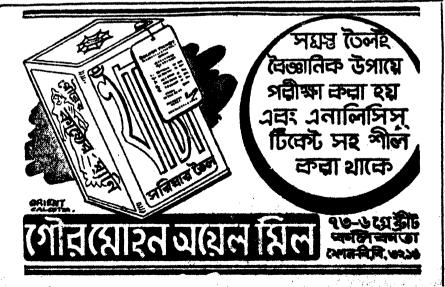
টানিয়া তিনি সাহিত্যে রূপ দিয়াছেন! তাইতো মানুষ তাহাকে এতখানি ভালবাসে। তাঁহার আগে এমন প্রাণস্পর্শী ভাবে আর কোন লোকই লিখিতে পারেন নাই। তাঁহার প্রত্যেকটী কথা মাপা, প্রত্যেকটি কথাই দীর্ঘ অভিজ্ঞতার পরিচায়ক। প্রত্যেকটি কথা হৃদয়ের সহিত গাঁথিয়া যায়। তাই তিনি শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী।

শরৎচন্দ্র শুধু সাহিত্য-স্রষ্টা নহেন—সাহিত্যিকেরও স্রষ্টা, যুগপ্রবর্তক মহা-সাহিত্যিক। এত বড় সাহিত্যিক শতাব্দীতে একটীও জন্মে কি না সন্দেহ। শরৎচন্দ্রের গুরু রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু কথাসাহিত্যের দিক দিয়া শিষ্য গুরুকে ছাড়াইয়া গিয়াছেন। শরৎচন্দ্রের লেখায় আমরা ভাবের গভীরতা, অকৃত্রিম সহৃদয়তা, অনুভূতির গাঢ়তা, চিত্রের অপূর্ব সৌন্দর্য্য, সঙ্গীতের মাধুর্য্য, কাব্যের সরসতা—সমস্তই একাধারে পাই। অবশ্য অন্যান্য বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র অপেক্ষা অনেক উচ্চে উঠিয়াছেন। এত উচ্চে যে সেখান হইতে শরৎচন্দ্রকে দেখাও যায় না। তাই তিনি জগতের পূজ্য—তাঁহার প্রতিভা-কিরণ জগতের সবাই দেখে।

কথা-সাহিত্য ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথেরও উপরে। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে আমরা পাইলাম বিশ্বজনীনতা। ইহা আমাদের বিশ্বের সহিত হাত মিশাইতে শিখাইল। কিন্তু শরৎচন্দ্রের লেখায় পাইলাম বাংলার নাড়ির টান। রবীন্দ্রনাথ তাই বিশ্বের আর শরৎচন্দ্র বাংলার নিজের। এর আগে বাংলা মায়ের দুঃখভরা রূপ কেহই দেখান নাই, এমন করিয়া কেহ ভালোবাসেন নাই—তাইতো বাংলার জনসাধারণ শরৎচন্দ্রকে আপনাদের মধ্যে নিবিড় ভাবে টানিয়া লইয়াছে। তাইতো শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের চেয়েও জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের স্থান যে শরৎচন্দ্রের উপরে ইহা আমরা জানি, তবু নিজের হৃদয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই দেখিতে পাইব—সেখানে রবীন্দ্রনাথের স্থান নাই—অকৃত্রিম দরদ দিয়া শরৎচন্দ্র সেখানের সমস্তটাই অধিকার করিয়া বসিয়া আছেন। তাই বলিতেছি শরৎচন্দ্রের স্থান শুধু সাহিত্যেই নয় বাঙ্গালীর মনের সর্বোচ্চ আসনে। শরৎচন্দ্র লেখার দ্বারা লোকের শ্রদ্ধা পাইয়াছেন রবীন্দ্রনাথের চেয়েও বেশী। তাহার কারণ তিনি লোকের মনের কথা তাঁহার সাহিত্যে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"মানুষ শুনিতে চাহে মানুষের গল্প, আমি তাই মানুষের গল্প লিখি, তাই তোমরা আমাকে এত ভালোবাসো।"

প্রকৃতই এই মানুষের কাহিনী লিখিয়াই তিনি মানুষের কাছ হইতে এত ভালোবাসা কুড়াইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য অভিজাত শ্রেণীকে ঘিরিয়া, শরৎচন্দ্রের সাহিত্য সাধারণকে ঘিরিয়া। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র উভয়েই এই পৃথিবীকে দেখিয়াছেন বিভিন্ন ভাবে। রবীন্দ্রনাথ দেখিয়াছেন কল্পনালোক হইতে—শরৎচন্দ্র দেখিয়াছেন দারিদ্র্যের সহিত—দুঃখের সহিত—মিশিয়া। নিজেকে সকল রস হইতে বঞ্চিত করিয়া তিনি রসাস্বাদন করিয়াছিলেন। শ্রদ্ধেয় শ্রীকালিদাস রায়, কবিশেখর, বলিয়াছেন—"রবীন্দ্রনাথ দুনিয়াকে দেখিয়াছেন বাতায়ন হইতে। দুনিয়ার যাহা কিছু তিনি দেখিয়াছেন তাহাই তাঁহার কাছে জানালার ফ্রেমে আঁটা ছবি হইয়া উঠিয়াছে—আমাদের অতি সাধারণ অতি পরিচিত দৃশ্যগুলিও তাঁহার কাছে তাই অপূর্ব লাগিয়াছে—যাহা কিছু কদর্য্য কুৎসিৎ তাহাও তাঁহার চোখে চিত্রমাধুরী লাভ করিয়াছে। সব কিছুর মধ্যেই তিনি তাহার অন্তরের শ্যামসুন্দরের হাসিমুখ দেখিতে পাইয়াছেন—সংসারকে তিনি ঠিক চিনিতে পারেন নাই। কিন্তু...শরৎচন্দ্র এই দুনিয়াকে দেখিয়াছেন মুক্ত প্রান্তরে দাঁড়াইয়া। মানব সমাজকে দেখিয়াছেন সমাজ সংসারের বাহির হইতে। বাহির হইতে দেখিয়াছেন বলিয়াই পরিপূর্ণভাবে চমৎকার ভাবে দেখিয়াছেন—ভিতর হইতে দেখিলে সমস্তটুকু চোখে পড়িত না—অতি-পরিচয়ের গ্লানি দৃষ্টিকে ম্লান করিয়া দিত। লোকচক্ষুর অন্তরালে যাহা কিছু কদর্য্য কুৎসিৎ তাহাও তাঁহার দৃষ্টি এড়ায় নাই—তাঁহার হৃদয়ের গভীর সহানুভূতি লাভ করিয়া তাহা সাহিত্যে কারুণ্য রসেরই সৃষ্টি করিয়াছে, বীভৎস রসের নয়। এই দুনিয়ার নাট্যমঞ্চে নিজে একজন অভিনেতা হইলে তিনি রঙ্গলীলাকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করিতে পারিতেন না। ভাগ্যে তিনি সংসারী ছিলেন না এবং সংসার রসে মগ্ন হন নাই—তাই আমরা সংসারকে সাহিত্যের মধ্য দিয়া এমনভাবে পাইলাম। ভাগ্যে তিনি গ্রন্থাসক্ত ছিলেন না—ভাগ্যে তিনি বই বুজাইয়া মানব সংসারটিকে পাঠ করিয়াছিলেন সহস্রাক্ষ হইয়া—তাই এমন সাহিত্য পাইয়াছি। মোট কথা শরৎচন্দ্র পড়িয়া শুনিয়া যাহা পাইয়াছেন, তাহার চেয়ে বেশী পাইয়াছিলেন হৃদয় দিয়া ভাবিয়া, তাহার চেয়ে বেশী পাইয়াছেন চোখে দেখিয়া। তিনি এই দুনিয়াকে দেখিয়াছেন হাজারটা চোখে।"

সত্যই শরৎচন্দ্র সহস্ররূপে সমাজ ও সাহিত্যকে দেখিয়াছিলেন। সর্বাপেক্ষা বড় কথা তাঁহার হৃদয়। শুধু এই কারুণ্যে ঘেরা হৃদয়টীর দ্বারা তাঁহার সাহিত্যকে এমন মধুর করিয়াছেন। রায় বাহাদুর শ্রীদীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয় বলিয়াছেন—"শুধু শরতের লেখনী ভারতের দান নহে—তাহার হৃদয়টী দেবলোক হইতে প্রাপ্ত, এ মর-জগতে এমন হৃদয়ের পরিচয় অতি অল্পই ঘটে।"

শুধু তাঁহার লেখাই করুণ নহে তাঁহার মনটাও সেইরূপ করুণ। লেখক শরৎচন্দ্রের চেয়ে আসল মানুষ শরৎচন্দ্র আরও সুন্দর, আরও মধুর।

তিনি যে কি তাহা তাঁহার সহিত যাহারা মিশেন নাই তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন না—কতখানি দেশপ্রেম, কতখানি সহানুভূতি ও মধুর হৃদয়ের অধিকারী হইয়া তবে তিনি শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পীর আসন পাইয়াছেন।

তাঁহার মনের মাঝে একটা উদাসী পুরুষ নিভৃতে বসিয়া গোপীযন্ত্র বাজাইয়া গিয়াছে। সেই বাউল তাঁহাকে ভবঘুরে করিয়াছে—দেশ-বিদেশ ঘুরাইয়াছে, মানুষের সহিত অন্তরঙ্গ ভাবে মিশাইয়াছে—তাই তিনি সংসারকে এত ভালোভাবে বুঝিতে পারিয়াছেন এবং এইখানেই রবীন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার প্রভেদ।

রবীন্দ্রনাথের চেয়েও তিনি গভীরভাবে লোক চরিত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাই কথা-সাহিত্যে তিনি অপরাজেয় শিল্পী। তিনি কথা-সাহিত্যের স্রষ্টা। তাই সাহিত্যে তাঁহার স্থান সবাকার উচ্চে।

কমরেড লেনিন

—শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সেই বছরেই মার্কসের সঙ্গে জেনীর বিয়ে হয়ে গেল।

মধ্যবিত্ত ইহুদীদেরের এক বেকার ছেলে, আর অভিজাত জার্মান মেয়ে···মেয়ের বাবা প্রিভি-কাউনসিলার আর ছেলে বিপ্লবী···সারা সহরটার বুকে হৈ-চৈ পড়ে গেল, অভিজাত আত্মীয়েরাও এজন্য জেনীকে কম লাঞ্ছনা দিল না।

কিন্তু জেনী তো আর পাঁচজনের মত পয়সার ওজন দেখে স্বামী পছন্দ করেন নি!

বিয়ের পর দুজনে এলেন প্যারিসে।

সেখানে ফ্রাংকো-জার্মান ইয়ারবুকের সম্পাদন করার ভার পড়লো মার্কসের উপর।

এইখানেই এংগেল্‌সের সঙ্গে মার্কসের পরিচয় পাকা হোল।

জার্মান ইয়ারবুকের জন্য তিনি প্রবন্ধ পাঠিয়েছিলেন ইংলণ্ড থেকে, তারপর একদিন এসে আলাপ করলেন মার্কসের সঙ্গে।

এংগেলস্‌ মার্কসের চেয়ে দু'বছরের ছোট। বার্মেনের এক জার্মান ধনীর ঘরে তাঁর জন্ম। ইস্কুল কলেজে পড়াশুনা করার সঙ্গে সঙ্গে দুটি বিষয় তিনি ভালোভাবেই আয়ত্ত করেছিলেন—মদ খাওয়া আর কবিতা লেখা!

কলেজ থেকে বেরিয়েই ইনি নাম লেখালেন সেনাদলে।

তারপর সেখান থেকে গেলেন ইংলণ্ডে। নিজেদের সূতোর কারখানা ছিল, সেই অফিসে হলেন কেরাণী।

এই চাকরী করতে করতে, তাঁর রুচি বদলে যায়,—মদ খাওয়ার অভ্যাস কমে, কবিতা লেখাও বন্ধ হয়।

সাহিত্যের নেশা ছাড়লো বটে কিন্তু লেখার নেশা ছাড়লো না, কবিতা ছেড়ে ধরলেন দর্শন।

এই দর্শন নিয়েই হোল মার্কসের সঙ্গে তাঁর পরিচয়।

সাধারণ আলাপ পরিচয় নয়। এংগেলসের পড়াশুনা ছিল খুবই। দশদিন ধরে চললো কেবল দর্শন আর মতবাদের আলোচনা।

আলোচনা ও মতামত শেষে এমন ভাবে মিললো যে বন্ধুত্ব হয়ে গেল চিরস্থায়ী। সুখে দুঃখে যখনই প্রয়োজন হয়েছে, তখনই এংগেলস মার্কসের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন সম্পদ আর সান্ত্বনা নিয়ে।

এদিকে যত আশা নিয়ে ইয়ারবুক বেরিয়েছিল, সে-ভাবে চললো না, দ্বিতীয় খণ্ড আর বেরুলো না, একখানি বেরিয়েই বন্ধ হয়ে গেল।

মার্ক্‌স্‌ এই সময় একখানি বই লিখছিলেন—'হোলি ফেমিলি।' এংগেল্‌সের সঙ্গে যুক্ত নামে বইখানি বেরুলো! সঙ্গে সঙ্গে পুলিশেরও নজর পড়লো তাঁর উপর। মার্কস্‌ জার্মান প্রজা, ফরাসী সরকার আদেশ করলেন—দেশ ছেড়ে চলে যাও।

মার্কসের হাতে তখন একটিও পয়সা নেই, কোথায় যাবেন? খরচ দেবে কে?

কি-ভাবে যেন এংগেলসের কানে কথাটা গেল, তখনই তিনি টাকা পাঠিয়ে দিলেন পথ খরচের জন্য। মার্কস চলে গেলেন প্যারিস থেকে ব্রুসেলসে।

সেখানেও থাকতে পারলেন না, চলে গেলেন ইংলণ্ডে।

তারপরেই আটশো পাতার এক বিরাট বই বেরুলো—দি জার্মান ইডিওলজি!

এই সময় ফরাসী দার্শনিক প্রুধনের সঙ্গে ঘটলো মার্কসের মত-বিরোধ। প্রুধন ছিলেন ফরাসী শ্রমিকদলের নেতা। প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন ছাপাখানার কম্পোজিটার, কিন্তু রীতিমত পড়াশুনা করে পরে তিনি শ্রেষ্ঠ মনিষীর পর্য্যায়ে উঠেছিলেন। তাঁর ধারালো যুক্তির জন্য সারা য়ুরোপে ছড়িয়ে পড়লো তাঁর নাম। তথাপি আভিজাত্যের ছোঁয়া লাগলো না তাঁর মনে। সাধারণ একটা উলের জামা আর সামান্য খড়ম পায়ে দিয়ে তিনি প্যারিসের পথে পথে ঘুরতেন। সম্পত্তির মূল সূত্র তিনি আলোচনা করেন, তিনিই সবার আগে স্পষ্ট কথায় জগদ্-
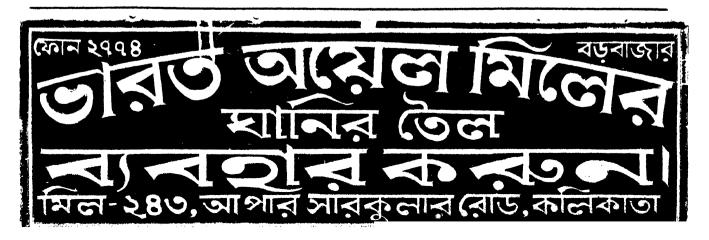
[ধন]ীকে শোনালেন—প্রোপার্টি ইজ্ থেফ্‌ট্—চুরী না করলে পয়সা করা যায় না। কিন্তু সেজন্য এই চুরীর ব্যাপার নিয়ে হৈ চৈ করার কিছু নেই। ধীরে ধীরে নিজের আগুণেই ওই নীতি পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। ততদিন পর্য্যন্ত ধনীরা যাদের লুটে খাচ্ছে তাদের করার মত কিছু নেই, তারা শুধু সয়ে যাক্।

এই 'সয়ে যাওয়ার' ব্যাপারেইপ্রুধনের সঙ্গে ঘটলো মার্কসের মতভেদ। মার্কস লিখলেন—জনগণের ইতিহাসে দুটি দল আছে। শ্রমিক আর ধনিক। এদের স্বার্থ পরস্পর-বিরোধী সেইজন্যই আত্মরক্ষা করার জন্য এরা পরস্পরের সঙ্গে দ্বন্দ্ব করবেই। এই দ্বন্দ্বেরই আরেক নাম হচ্ছে বিপ্লব। এর মূল কথা হচ্ছে— জয় নচেৎ মৃত্যু। যুদ্ধ ও ধ্বংসের মধ্যে দিয়ে এই বিপ্লব অগ্রগামী হবে।

এই বিপ্লবকে কার্য্যকরী করার উদ্দেশ্যে মার্কস এবার কমিউনিষ্ট লীগ স্থাপন করেন। এবং এংগেলসের সঙ্গে মিলে কমিউনিষ্টদের কি করতে হবে তারই মূল কথাগুলি লিপিবদ্ধ করলেন একখানি পুস্তিকায়, সেইটিই হোল প্রসিদ্ধ 'কমিউনিষ্ট মেনিফেষ্টো।' তাতেই মার্কস ঘোষণা করলেন—দুনিয়ার মজুর এক হও!

দেশ-বিদেশের বিপ্লবী জড়ো হতে লাগলো মার্কসের চারিপাশে, সভা-সমিতি গড়ে উঠতে লাগলো এক একটি করে।

বেলজিয়ামের রাজা আর সইতে পারলেন না, পুলিশ লাগিয়ে সভা সমিতিগুলি ভেঙে দিলেন, আর তারই সঙ্গে যত বিদেশী বিপ্লবী ছিল সবাইকে গ্রেপ্তার করলেন। মার্কস আর জেনীও সে দল থেকে বাদ পড়লো না।

ক'দিন পরে মার্কসকে ছেড়ে দেওয়া হোল বটে, কিন্তু তাড়িয়ে দেওয়া হোল বেলজিয়াম থেকে।

ফ্রান্সের কমিউনিষ্টরা নিমন্ত্রণ জানালো।—মার্কস এখানে এসো—

ফ্রান্সে তখন যত জার্মান বিপ্লবীরা এসে জুটেছিল। তারা সেখান থেকে চেষ্টা করছিল জার্মানীতে বিপ্লব ঘটাবার জন্য। তাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হোল না, জার্মানীতে রাজনৈতিক দুর্যোগ দেখা দিল:

রাষ্ট্রের কর্ণধার মেটারনিক ভিয়েনা ছেড়ে লণ্ডনে পালালেন।

মিলানের লোকেরা পথে পথে পাঁচদিন ধরে লড়াই চালালো অষ্ট্রিয়ান সৈন্যদের সঙ্গে।

বার্লিনে দুশো লোকের জীবন গেল পুলিশের গুলিতে। ক্রমশঃ

আধুনিক শিক্ষা

—শ্রীমতী সুহাসিনী দাস, ধানবাদ

আজকাল ছেলেমেয়েদের শিক্ষার পরিণতি মোটেই আশাপ্রদ বলিয়া মনে হয় না। পুরাকালে 'বিনয়' বিদ্যার ভূষণ বলিয়া পরিগণিত হইত, কিন্তু আজকাল অধিকাংশ বিদ্বান বিদুষীরা আত্মম্ভরিতাই শিক্ষার লক্ষণ বলিয়া মনে করেন।

শিক্ষাকালীন শিক্ষার্থীদের সর্ব্ববিধ বিলাসিতা বর্জ্জন ও ব্রহ্মচর্য্য পালন, শারীরিক শ্রমসাধ্য কার্য্য অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল, কিন্তু আজ কাল তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত নীতিই প্রতি-পালিত হইতে দেখা যায়। স্কুল কলেজে বিদ্যাভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে বিলাসিতার সুঅভ্যাসটি (?) ইহাদের পুরাদস্তুর রপ্ত হইয়া উঠিতেছে; ধনী পিতামাতারা সে দাবী মিটাইবার ক্ষমতা রাখেন, তাঁহাদের তবুও রক্ষা! কিন্তু মধ্যবিত্ত অভিভাবকগণ পুত্রকন্যাদের স্কুল কলেজের ন্যায্য দাবী জোগাইতেই কাতর, ইহার উপর তাঁহাদের সিনেমা, থিয়েটার, চায়ের দোকান, নিত্য নূতন ফ্যাসানের পোষাক পরিচ্ছদ, প্রসাধনের উপকরণাদির জন্য ব্যয় স্বীকার করিতে তাঁহাদের কষ্টের সীমা থাকে না। পুত্র কন্যাদের বিলাসিতার দায়ে তাঁহাদিগকে সংসারের অন্যান্য রুগ্ন, বৃদ্ধ, শিশুদের দুগ্ধাদির আবশ্যকীয় ব্যয় সকল সঙ্কোচ করিতে হয় এবং নিজেরা বহু কষ্ট সহ্য করেন; ইহাতে কোনও পিতামাতা অক্ষম হইলে বা অস্বীকার করিলেই মহা অনর্থ! আর্থিক অসঙ্গতি আজ কালকার দিনে পিতামাতার একটি অমার্জ্জনীয় অপরাধ। দরিদ্র অশিক্ষিত পিতামাতারা আজকাল শিক্ষিত পুত্রকন্যাদের ভক্তিশ্রদ্ধা লাভে বঞ্চিত। গুরুজনের অবাধ্যতা, অসাক্ষাতে তাঁহাদেরই দোষের আলোচনা, প্রতিপদে তাঁহাদের অসম্মান করা ইহাদের নিকট দূষণীয় বলিয়া মনে হয় না।

অধুনা তরুণ তরুণীগণ পোষাক প্রসাধন স্কুল কলেজ যাওয়া, বাজে গল্পের পুস্তক পাঠ ছাড়া আরও কয়টী মহৎ কার্য্যে ইহারা অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিয়া থাকেন; সখাসখী পরিবৃত হইয়া অসার অর্থহীন গল্প, অভিনেতা অভিনেত্রীবর্গের সমালোচনা আর দৃষ্ট অদৃষ্ট তরুণ তরুণীদিগের সর্ব্ববিধ কার্য্যকলাপের বিবরণ সংগ্রহ; মধ্যে মধ্যে পৃথিবী স্বদেশ সমাজ, যুদ্ধ মানবত্ব প্রভৃতি মহত্তর আলোচনা করিলেও ইহারা বেশীর ভাগ সময়ই নিরর্থক তরল গল্পে নষ্ট করিয়া থাকেন। বন্ধু বান্ধবীদের মধ্যে তর্কের খাতিরে ইহারা খুব বড় বড় কথা বলিলেও কার্য্যক্ষেত্রে ইহাদের ঔদার্য্য মহত্ত্ব বা বীরত্বের পরিচয় খুব কমই পাওয়া যায়! ইহাদের প্রাণশক্তির প্রাচুর্য্য মাত্র তরুণ তরুণীদের সেবা ও সহায়তায়।

লেখা পড়ার অজুহাতে ইহারা সাংসারিক সর্ব্ববিধ কর্ম্মই পরিত্যাগ করিয়াছেন, নিজেদের প্রয়োজনীয় অতি ক্ষুদ্র কার্য্যগুলিও দাসদাসী মাতা এমন কি অতি শিশু ভ্রাতা ভগিনীদের দ্বারাও করাইতে ইহারা কুণ্ঠিত হন না; ইহারা স্কুল কলেজের সার্টিফিকেট বা ডিগ্রী লইয়া বা লইতে গিয়া সংসারের অন্য সকলের মস্তক যেন একেবারে ক্রয় করিয়া লইয়াছেন। ইহাই যদি শিক্ষিতের আদর্শ হয় তবে সে শিক্ষার কোনও প্রয়োজন আছে কি? বরঞ্চ ৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্বে এবং তৎপূর্ব্বে যে সমস্ত সুশিক্ষিতেরা বিদ্যা, বুদ্ধি, এবং উন্নত স্বভাব, চরিত্রের যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন তাহা জগতে অতুলনীয়! সেই সব মহাত্মাদের নাম যথাক্রমে দ্বারকা নাথ ঠাকুর, রামমোহন রায়, রাজনারায়ণ বসু, মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর, কেশব চন্দ্র সেন, ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর ইত্যাদি; উক্ত মহোদয়-গণের বিশ্ববিখ্যাত পাণ্ডিত্য সকলেই জ্ঞাত আছেন। স্বর্ণকুমারী দেবী, অনুরূপা দেবী, অবলাসুন্দরী দাসগুপ্তা, কামিনী রায়, গিরিবালা রায় এই সব সুশিক্ষিতারাও আজকালকার মেয়েদের আদর্শস্থানীয়া হইয়া আছেন।

যে শিক্ষা সংসারের সুখশান্তিকে ব্যাহত করে, দুঃখপূর্ণ সংসারে আরও দুঃখ বাড়ায়, সেই কুশিক্ষার সংস্কার আশু প্রয়োজন! অবশ্য আজকাল শিক্ষিত শিক্ষিতাদের সদ্‌দৃষ্টান্ত একেবারেই যে নাই তাহা নহে, কিন্তু তাহা স্বল্প সংখ্যক, যে স্থানে অধিকাংশই কুফল সেই স্থলে সতর্কতাই বিশেষ প্রয়োজন।

প্রশ্নোত্তর

১৯নং প্রশ্নের উত্তর

বী, পা, রা, কুমিল্লা : স্বামী হওয়া চাই সুদর্শন ও অর্থশালী।

কেয়া, ভবানীপুর, কলি : স্বামীর প্রচুর অর্থ থাকা চাই।

মণি, আসানসোল : তাঁর লেখাপড়া ভাল জানা চাই এবং চাকরী না করিলেও সুখে দিন চলে এমন অবস্থা হওয়া চাই।

কঃ দঃ পার্কসার্কাস, কলি : আই, সি, এস্, স্বামী আমার কাম্য।

রিয়া, পার্কসার্কাস, কলি : ধীর, নির্ভীক, সদ্বংশজাত, শিক্ষিত এবং যে সমাজের কুসংস্কার দেখিতে পারে না, এমন স্বামী চাই।

শী, চ, চন্দননগর : ডাক্তার স্বামী আমার পছন্দ।

টুমু, মেদিনীপুর : স্বামী গুণবান হওয়া চাই। রামের মত স্বামী পাব—অর্থাৎ লোকটি খুব ভাল হওয়া চাই।

খুকু, চক্রধরপুর : আমাদের পছন্দ ও অপছন্দে কি যায় আসে? পিতামাতাই ত' পাত্র ঠিক করেন।

ক, সে, শ্যামবাজার, কলি : স্বাস্থ্যবান ও সুপুরুষ স্বামী চাই। সঙ্গীতে তাঁহার দখল থাকিলে বেশী খুসী হইব।

ম, রা, বাঁকুড়া : আমার স্বপ্ন, আমার স্বামী হইবে একজন নামকরা চিত্রাভিনেতা, যিনি সব বইতেই হিরো হইয়া অবতীর্ণ হইবেন।

সুশিক্ষিতের অন্তঃকরণ জ্ঞানের আলোকে হীরকদ্যুতির ন্যায় সমুজ্জ্বল, সর্ব্বপ্রকার নীচতা, সঙ্কীর্ণতা, গোঁড়ামীর গ্লানি হইতে বিমুক্ত, সেই মহানের চরিত্র, জ্ঞান, কর্ম্মের গৌরবে সংসার সমাজ গৌরবান্বিত। তাঁহার মঙ্গল হস্ত অনাথ, আতুর, শিশু, বৃদ্ধ দেশের ও দশের অভাব মোচনার্থে সর্ব্বক্ষণ নিয়োজিত থাকে। এই সব সুশিক্ষিতেরাই দেশের আশা, উজ্জ্বল ভবিষ্যতের উদ্যোক্তা।

এই সংসার মরুতে 'বিদ্যা' একটি অমূল্য অমৃতময় ফল, প্রত্যেক পিতা মাতার পুত্রকন্যাকে অতি সযত্নে এই মহার্ঘরত্ন অর্জ্জন করিতে সুযোগ দিতে হইবে, আর বিশেষ সন্তর্পনে লক্ষ্য রাখিতে হইবে, যেন বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের নৈতিক চরিত্র গঠনের সুশিক্ষা লাভ হয়, বৃথা অহঙ্কারী ও বিলাসী হইয়া না ওঠে; অলসতা নিবন্ধন অকর্ম্মণ্য না হয়, স্বাস্থ্যহানি না ঘটায়, ভগবদবিশ্বাসী এবং সর্ব্ববিষয়ে দেশের আদর্শ সুসন্তান হয়।

করিতে চাই।

ক, সে, শ্যামবাজার, কলিঃ ঐ

কেয়া, ভবানীপুর, কলিঃ স্বামী অর্থশালী না হইলে বিবাহ করিতে রাজী নই।

খুকু, চক্রধরপুর : বিবাহ করাই ভাল, নচেৎ অন্যের গলগ্রহ হইতে হয়।

জা, খা, ভবানীপুর, কলি : স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে চাই।

ক : হ, পার্কসার্কাস কলি : প্রথমটা কিছুদিন স্বাধীনতা ভোগ করিয়া, পরে বিবাহ করাই যুক্তিযুক্ত। তাহা হ'লে দুইটা দিকই দেখা হইবে এবং কোন্‌টা ভাল কোন্‌টা মন্দ বোঝাও যাইবে।

টুটু, কৃষ্ণনগর : বিবাহের ব্যাপার ছেলেমেয়েদের হাতে ছাড়িয়া দেওয়াই উচিত। বাপ মায়েরা যেন ইহাতে মাথা না ঘামান।

কে, চন্দ্র, টালিগঞ্জ, কলি : আমিও স্বাধীনতাকামী।

ও, খা, খুলনা : বিবাহ করাই ভাল, স্বাধীন থাকা মোটেই সম্ভব নয়। একটা আশ্রয় চাই। স্বাধীনতা বাজে কথা।

রে, সা, হুগলি : বিবাহ প্রত্যেকেরই করা উচিত।

ম, লা, শ্রীরামপুর : তেমন বিদ্যাবুদ্ধি ও সাহস থাকিলে স্বাধীন ভাবে থাকা যায়।

লী, মু, নৈহাটি : বিবাহ করা স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম।

পোষাক পরিচ্ছদ

ইংরেজী বর্ণমালা প্যাটার্ণ

—শ্রীমতী বীণাপাণি ক্ষেত্রী

G

(৭ ঘরে উঠিবে)

১ম কাঁটা—৩ ঘর সাদা, ৩ ঘর কাল, ১ ঘর সাদা।

২য় কাঁটা—১ ঘর কাল, ২ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ৩ ঘর সাদা।

৩য় কাঁটা—২ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ২ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ১ ঘর সাদা।

৪র্থ কাঁটা—২ ঘর সাদা, ৩ ঘর কাল, ১ ঘর সাদা, ২ ঘর কাল।

৫ম কাঁটা—১ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ৩ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ১ ঘর সাদা।

৬ষ্ঠ কাঁটা—১ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ৩ ঘর সাদা, ২ ঘর কাল।

৭ম কাঁটা—১ ঘর কাল, তিন ঘর সাদা, ২ ঘর কাল, ১ ঘর সাদা।

৮ম কাঁটা—২ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ৪ ঘর সাদা।

৯ম কাঁটা—২ ঘর কাল, ২ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ৩ ঘর সাদা।

১০ম কাঁটা—৪ ঘর সাদা, ২ ঘর কাল, ১ ঘর সাদা।

বিজনদা'র চিঠি

আমার আদুরে ভাই বোনেরা—

নতুন পরিকল্পনায় তোমাদের আসর গত বারে সাজিয়ে প্রকাশ করতে শুধু যে তোমরাই খুসী হয়েছ তা নয়, দীপালীর বহু পাঠক-পাঠিকা খুসী হয়ে তাঁদের অভিনন্দন জানিয়েছেন আমাকে। কিন্তু তাঁদের সে অভিনন্দন আমি হাসি মুখে আমার ভাই-বোনেদের (অর্থাৎ তোমাদের) জন্যে নিয়ে, তাঁদের কাছে তোমাদের হয়ে আমি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছি।···এবারে চিঠির উত্তর দেবার আগে তোমাদের কাছ থেকে যে সব নতুন পরিকল্পনা আমি চেয়ে পাঠিয়েছিলুম তার বেশীর ভাগ একই ধরণের যে সব চিঠি পেয়েছি তার দু' একটা পড়ে শোনান আমি ("দীপালী"র কর্তৃপক্ষরা অর্থাৎ আমার মত তোমাদের মঙ্গল কামনা যাঁরা করেন তাঁরাও) মনে করি। শোন এক ভাই লিখেছে:

···"দীপালীর দাম বেড়েছে এবং তার সংগে সংগে আমাদেরও পাতা বেড়েছে শুনে সুখী হলুম। শুধু দামই যদি বাড়তো তাহলে অসুখীই হতাম হয়তো, কিন্তু কর্তৃপক্ষ তো শুধু বেশী পয়সাই নিচ্ছেন না, তার সংগে বেশী আনন্দটাও দেবেন বলছেন। তা যদি হয়, তাহ'লে রসপিপাসুরা আপত্তি করবার কিছু পাবেন না। বেশী আনন্দ বেশী পয়সা। যাক্‌গে···এখন নিজেদের কথাই বলি। জানতে চেয়েছেন ছুটির ঘণ্টার নতুন পরিকল্পনা আমাদের কাছ থেকে। ওটা আপনার মাথাতেই গজাবে ভাল, তবে দু'চারটে কথা আমার বলবার আছে। ছুটির ঘণ্টার ভাই বোনেরা রাগ করবেন না···প্রায়ই দেখি—'জেনে রাখা ভাল,' 'জানা দরকার' 'সংগ্রহ' ইত্যাদি ধরণের লেখাতে ছুটির ঘণ্টার ক'টা পাতা মিছামিছি বোঝাই করা থাকে। আমার মনে হয়, এগুলি ছাপিয়ে কোনই লাভ নেই—ওগুলো পড়ে না কেউই। কাজেও বিশেষ লাগে না, আর অনবরত জেনেই বা রাখি কত? বাজারে সাধারণ জ্ঞানের বইয়ের অভাব নাই, সকলেরই কাছে ১টাও অন্ততঃ এ ধরণের বই আছে—তাতেই সব পাওয়া যায়—তখন শুধু শুধু এগুলো দিয়ে পাতা নষ্ট করা কেন? যারা এগুলো পাঠান, তাঁদেরও এগুলো ক্ষতিকর—এতে নামটা ছাপার হরফে দেখে আনন্দ মেলে বটে, কিন্তু জ্ঞানের উৎকর্ষ মোটেই হয় না—চিন্তা ব্যাহত হয়, নিজেদের স্বাভাবিক বুদ্ধিবৃত্তি বা চিন্তাশক্তি জড়ত্ব প্রাপ্ত হয়, এতে করে কেউই কোনদিন স্বাধীনভাবে দু'এক কলম বাংলা লিখতে পারবেন না। আপনাদের এগুলোকে প্রশ্রয় না দেওয়াই উচিত। সকলকে স্বাধীনভাবে ভাবতে বলুন, নিজস্ব বলে কিছু তারা সৃষ্টি করুক—এখান সেখান থেকে সংগ্রহ করলে কি ফল হবে তাদের? ছুটির ঘণ্টার আদর্শের প্রতিকূল এটা। আর বাজে চিঠিগুলোর উত্তর দিয়ে পাতা নষ্ট না করাই ভাল—এক একটা চিঠির উত্তর দেখলে সত্যিই রাগ হয়···বরং মাঝে মাঝে মনোনীত অমনোনীত লেখার তালিকা প্রকাশ করে দেওয়াই ভাল। বাজে লেখা ছেপে কাগজ নষ্ট না করাই শ্রেয়: এ বাজারে।···"

···এবার আর এক বোনের লেখা চিঠি পড়ি শোন···

"···আচ্ছা বিজনদা, তোমার ও "চিঠির থলি"তে চিঠির উত্তর দেওয়ার মানে কি হয় বলতে পারো? চিঠির উত্তর বিশেষ দরকারী না হ'লে জবাব দিও না। এতে অনেক ভাই-বোনেরা রাগ করবে জানি, তা' তারা করুক। আর যারা রাগ করবে তারাই চায় ছাপার অক্ষরে নিজের নাম জাহির করতে। কারণ বাজারের সাধারণ জ্ঞানের বই খুলে দেখলে যে সব প্রশ্ন তারা করে তার উত্তর তারা তা' থেকেই পেতে পারে। এই ধরো না, তোমার কথাই বলি (জানি, তুমি এতে বোনের ওপর রাগ করবে না, কারণ এ কথাটা সম্পূর্ণ সত্যি)—পৃথিবীতে "সবজান্তা" পণ্ডিত হয়ে কেউ বসে নেই, আর তুমিও তাদের ব্যতিক্রম নও,

অতএব তুমিও ঐ সব উত্তর সাধারণ জ্ঞানের বই থেকেই তো সংগ্রহ করো; কেমন, তাই নয় কি? এখন কথা হচ্ছে যে, সে সংগ্রহ আমরাও একটু চেষ্টা করলেই তো নিজেরাই করে নিতে পারি। আমরা যদি নিজেরা সে চেষ্টা করি তো আমরাও সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে আরো নতুন কিছু সংগ্রহ করতে পারবো, অতএব সে চেষ্টাই আমাদের করা উচিত। তুমি তার উত্তর দিয়ে, আমার মনে হয়, উপকারের থেকে অপকারই বেশী করছো। আদর দিয়ে ভাই-বোনের "মাথা খাওয়া" আর কি? আমার মতের সঙ্গে আশা করি তোমার ও আর সব ভাই-বোনেদের মতের মিল হবে…।" এরপর চিঠিখানা আর পড়ে শোনাবার দরকার হবে বলে মনে হয় না। শুধু যে দুখানা চিঠি পড়ে শোনালাম তাদের মতের সঙ্গে বহু ভাই-বোনের মতের মিলও আছে দেখেছি, তাছাড়া আমিও কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ও বিষয় নিয়ে বহু আলোচনা করেছি, তাতে তাঁরাও সম্পূর্ণরূপে তোমাদের ঐ অভিমতকে সমর্থন করেন। অতএব "চিঠির উত্তর"—এই বিভাগটার সংস্কার করা খুবই দরকার বলে মনে করি। এই বিভাগটা এই জন্যেই রাখা দরকার যে তোমাদের বিভাগ সম্বন্ধে কিছু জানাতে হলে এই বিভাগ মারফত আমার কাছ থেকে তোমরা সকলে তা জানতে পারবে।…কি বলো, সেইটাই ভালো নয় কি?

প্রতিযোগিতা: গত ২৭নং প্রতিযোগিতার ফলাফল এবারে জানাচ্ছি…১ম, শ্রীমান্ সুহাসকুমার দাস (৯৪৯), ২য়, শ্রীমতী ছন্দা দেবী (১০৯৩) ও ৩য় শ্রীমান বিনয় ভৌমিক (৮২৮)।…নতুন প্রতিযোগিতা আসছে বারে জানাবো।

এর শেষ কোথায়: তোমাদের লেখা উপন্যাস এবারে গেল। পরের পরিচ্ছেদটাও তোমরা লিখতে পারবে, কারণ উপন্যাসের আর একটা পরিচ্ছেদ বাড়ান হ'লো। ওটা শেষ হবে সপ্তদশ পরিচ্ছেদে। আর ঐ পরিচ্ছেদটী লিখবেন একজন খ্যাতনামা লেখক।

মনে রেখো

"আমরা সবাই পথিক। মানুষের মনুষ্যত্বের পথে চলবার সর্ব্বপ্রকার দাবী অঙ্গীকার করে আমরা সকল বাধা ভেঙ্গে চুরে চলব। আমাদের পরে যারা আসবে তারা যেন নিরুপদ্রবে হাঁটতে পারে, তাদের অবাধ মুক্ত গতিকে কেউ যেন না রোধ করতে পারে—এই আমাদের পণ।" —শরৎচন্দ্র

নতুন বিভাগ: তোমাদের এই আসরে আরো নতুন বিভাগ আসছে বারে প্রকাশিত হবে।

বর্ষ শেষ ও নববর্ষ: আজ বছর শেষ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তোমাদের মনে হয় না কি যে, এই যে ৩৬৫ দিন পার হয়ে গেল এর মধ্যে আমরা কি করেছি? যে বছরটা ৩৬৫ দিন আমাদের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল তাকে আজ ছেড়ে দিতে মনে ব্যথা লাগে বৈকি?…কিন্তু মনে আনন্দও কম হয় না যে আসছে কাল আবার একটা নতুন বছরের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হবে। দেখতে দেখতে সেও নতুন থেকে হয়ে উঠবে পুরাতন। তাকেও ছেড়ে দিতে আজকের মতই মনে ব্যথা জাগবে আজ থেকে ৩৬৫ দিন পরে।…কিন্তু এমনি করেই কি দিনের পর দিন গতানুগতিক ভাবে কাটিয়ে যেতে হবে?…একথা ভুললে তো তোমাদের চলবে না যে, সময়ের দাম কেউ দিতে পারে না, আর তোমরাই জাতির ভবিষ্যৎ! তোমাদের মুখ চেয়ে আজ আমাদের জাতি রঙীন কল্পনার জাল বুনে চলেছে। কত আশা তোমাদের ওপর তারা রাখে।…নববর্ষে তোমরা মানুষ হয়ে ওঠো এই প্রার্থনাই আজ করে তোমাদের স্নেহ জানিয়ে আজকের মত বিদায় নিলাম। তোমাদের: বিজনদা

এর শেষ কোথায়......

(আসরের ভাই-বোনেদের লেখা ধারাবাহিক বারোয়ারী উপন্যাস)

(১৫)

উমারাণী ক্ষেত্রী (১০৬৩)

......তারপর বেশ ক'টা দিন কেটে গিয়েছে। কল্যাণী দেবী, রেবা, রান্থ এবং সমীরকে নিয়ে বীরু সোনার গাঁয়ে গিয়েছিল, সেখানে দিনকতক থেকে আবার কোলকাতায় সবাই ফিরে এসেছেন...সোনার গাঁয়ে যাওয়া শুধু বেড়াবার উদ্দেশ্যেই নয়, ওই সময় সকলে মিলে গ্রামের প্রত্যেকটি অঞ্চলে ওঁরা ঘুরে বেরিয়ে স্বচক্ষে সব অবস্থা দেখেছেন। ভীষণ মহামারীর তাণ্ডব লীলার পর সারা গ্রামখানা যে নগ্ন এবং বীভৎস মূর্ত্তি ধারণ করেছিল তার জের এখনও চলছে। স্বচক্ষে না দেখলে কল্যাণী দেবী, সমীর বা রেবার হয়তো তা বিশ্বাসই হোত না—কারণ সহরের বিলাসী জীবনযাত্রার মধ্যে বাস করে, সুদূর পল্লীর রোগ এবং অনাহারাক্রান্ত অধিবাসীদের শোচনীয় অবস্থা কল্পনা করা অসম্ভব। এবং গ্রামের এই দুর্দশার প্রতিকার শুধু খবরের কাগজে এবং মাসিক পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে অথবা লম্বা চওড়া বক্তৃতা করে যাঁরা আবহমান কাল ধরে করে আসছেন তাঁরা কেউই চাক্ষুষভাবে এই সমস্ত ভয়াবহ অবস্থার সংগে পরিচিত নন। রোগ এবং মহামারীর দাবানলের আঁচ তাঁদের গায়ে মোটেই লাগে না, এ আঁচের তীব্রতার বহুদূরে অবস্থান করে শুধু কাগজের কলমের আর গলাবাজীর জোরে তাঁরা নিজেদের মস্ত বড় দেশপ্রেমিক বলে জাহির করে আসছেন। বীরু এই ধরণের ফাঁপা দেশহিতৈষী ছিল না, ছেলেবেলা থেকে দুঃখ জিনিষটার সংগে সে প্রত্যক্ষভাবে পরিচয় লাভের বহু সুযোগ পেয়েছে, এবং তাই সে এ বস্তুটিকে জানতো আর ভালভাবেই চিন্‌তো। নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থের কাছে দেশের এবং দশের স্বার্থ বলি দিতে সে কখনই রাজী ছিল না। তবে অনেক সময় আন্তরিক ইচ্ছা উপযুক্ত অর্থের অভাবে পার্থিব রূপ পেতে পারে না। বীরুরও হয়েছিল তাই। মনে তার বহু সদিচ্ছা, বহু সং পরিকল্পনা জাগতো, কিন্তু তার সে সব ইচ্ছা বা পরিকল্পনাকে বাস্তবের রূপ দেবে সে কি দিয়ে? তার জন্য চাই উপযুক্ত অর্থবল। দেশে ধনীর অভাব নাই। বিলাসিতার আবাসভূমি সহরে এই ধনীদের আড্ডা। লোকে বলে দেশে দুর্ভিক্ষ হয়েছে, দেশ গরীব, কিন্তু সহরের অগণিত সিনেমার দ্বার সর্ব্বদাই রুদ্ধ, বলে 'তিলধারণের স্থান নেই'! ধনীর হাজার হাজার চোখ ধাঁধানো রঙের মূল্যবান হাওয়াগাড়ী সহরের বুকে দিবারাত্র ঘুরে বেড়ায়, হতভাগা ভিখিরী অনাহারীর দল ফুটপাথে পড়ে থাকে নির্জ্জীবের মতো, ধনীর বিলাসযানের বিকট শব্দে ক্ষীণ হৃদয় তাদের সতত চম্‌কে ওঠে। হাজার হাজার টাকা তাদের প্রত্যহ খরচ হয়ে যায় শুধু বিলাস-বাসনা চরিতার্থের জন্যে—কে তাদের হিসেব রাখে? কিন্তু একটা পয়সা চাইতে যাও ধনীর দুয়োরে এইসব অনাহারী আত্মার একদানা খাবারের জন্যে—বিদ্রূপ পেতে পারো, খোট্টা দারোয়ানের লাঠির গুঁতো মেলাও আশ্চর্য্য নয়, কিংবা হয়তো ভাগ্য বিরূপ হ'লে ধনীর আদরে পোষা বুল্‌ডগ, বুল্‌ টেরিয়ার, কি গ্রে হাউণ্ডের এক আধটা দাঁতের কামড়ও তোমার ভাগ্যে জুটতে পারে। বীরু এইসব কথাই ভাবে। কোথা থেকে সে টাকা পাবে? জন্মাবধি সে গরীবের সন্তান—মোটা ভাত কাপড় পেলেই সে নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করে। তার নিজের নেই টাকা, কার কাছে সে চাইতে যাবে? ভগবানের কাছে সে নিয়তই এজন্যে প্রাণের অভিমান, অভিযোগ জ্ঞাপন করতো। অন্তরে প্রকৃত সদিচ্ছা থাকলে ঈশ্বর একদিন তা পূর্ণ করেনই। বীরুকে ভগবান জুটিয়ে দিলেন এই আদর্শ মহিলাটিকে তার সদিচ্ছা বা সং পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দেবার পাথেয় করে। কল্যাণীদেবীকে সে পেল নিজের মা'র মতো—সময় সময় যেন সে তার চেয়েও কিছু উঁচুতে বলে তাঁকে মনে করত।

...কল্যাণী দেবীর অর্থেই বীরু সোনারগাঁয়ে গিয়ে ছোট একটা দাতব্য চিকিৎসালয় আর গরীব ছেলেমেয়েদের জন্যে একটা অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে এসেছে। ভবিষ্যতে তাঁরই অর্থে একটি অনতিবৃহৎ হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনাও তার আছে। বীরু তাই ভাবে—আজ সব ধনীদের অর্থই যদি কল্যাণী দেবীর অর্থের মতো দেশের কাজে ব্যয়িত হোত?......হঠাৎ তার চিন্তাস্রোতে এসে বাধা দিলেন কল্যাণী দেবী নিজে...

: পাগলা ছেলে, দিনরাত তুই কি ভাবিস্ বলতো একলা বসে? আমি তোর মা, আচ্ছা আমায় তুই বলবি না কিসের তোর এত ভাবনা?

: কই মা-মণি, ভাবিনি তো কিছু? তুমি সব সময়েই আমায় ভাবতে দেখ, বীরু হেসে উত্তর দিল।
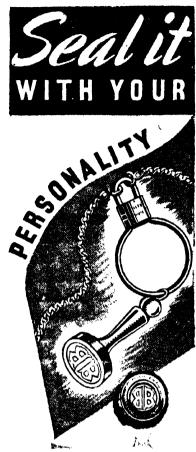
: জানি, তুই আমাকে আজও নিজের মা বলে ভাবতে পারিস নি, তাই তোর মনের কথা আমায় জানাতে তোর বাধে...অভিমানভরে কল্যাণী দেবী ঐ কথা বলে বীরুর দিকে চেয়ে থাকেন।

: ভগবান জানেন, যদি সম্ভব হোত তাহলে তোমায় আমার বুকখানা চিরে দেখাতুম যে মা-মণি তোমার আসন আমার হৃদয়ের কোথায়···তুমি আমায় ভুল বুঝোনা মা-মণি···!

: জানি রে ক্ষ্যাপা ছেলে, সব জানি আমি, কিন্তু সত্যি বাবা বলতো কি তুই ভাবিস্ এতো···মায়ের কাছে ছেলের মন লুকানো থাকে না, সে একদিন ধরা পড়বেই। কল্যাণী দেবী সস্নেহে বলেন।

: সত্যি কথা বললে তুমি বিশ্বাস করবে তো মা-মণি?

: ছেলেকে মা বুঝি কখনো অবিশ্বাস করে?

: বেশ তবে শোন—ভাবছিলুম,দেশে তো এত ধনী, এত টাকা, কিন্তু ভাল কাজে আমাদের মা-মণির মতো ক'জন এত টাকা বিলিয়ে দেয় দেশের কাজে···ভাবছিলুম তুমি কতো মহিয়সী, কত···

: থাক,···মায়ের প্রশংসা ছেলের মুখে আমি শুনতে আসিনি···

: এই দেখ, বল্লুম আমি, যে তুমি বিশ্বাস করবে না আমার কথা···বলে বীরু হো হো করে হেসে উঠলো···

: তুই আজকাল ভারী দুষ্টু হয়ে উঠেছিস বীরু। কিন্তু একটা সুখবর এসেছে একটু আগে, তোকে আমি বলব না, তুই আমার কাছে সব কথা লুকোস—

: বেশ তো সুখবরটা ছেলে না জানলেও তার মা-মণি তো জানে, তাহলেই হোল। সে তো সুবিধের কথা, মিষ্টিটা বেশ ভাল করেই আদায় করা যাবে'খন মায়ের কাছ থেকে···

—রাণু, রেবা, সমীর ওরা এখুনি এসে পড়লো বলে, আমায় আর মিষ্টি খাওয়াতে হবে না। ওরা এসে এখুনি তোর ঘাড় ভেঙেই কত মিষ্টি খাবে দেখবি···সগৌরবে কল্যাণী দেবী কথাগুলো বলে হেসে উঠলেন।

: বীরু একটু বিস্মিতভাবেই জিজ্ঞাসা করলো: আচ্ছা মা-মণি কি ব্যাপারটা বল তো? সুখবর, মিষ্টি খাওয়া, এসব কিছু তো বুঝতে পারছি না আমি!

: আমার দুষ্টু ছেলে যে আমাদের মুখ উজ্জ্বল করেছে, তাই সাধে কি আর এই পাগলা ছেলেটাকে আমি এত ভালবাসি।··· কথাগুলো বলেই অতিরিক্ত স্নেহভরে বীরুকে কল্যাণীদেবী বুকে চেপে ধরে তার গালে চুমো দিতে লাগলেন···বীরুর বিস্ময়ের ঘোর তখনো কাটেনি, কল্যাণীদেবীর বুকের মধ্যে মাথা গুঁজে সে মনে মনে রীতিমত কৌতূহলী হয়ে উঠলো। সুখবরটা কি হতে পারে? এমন সময় হৈ চৈ করতে করতে একসঙ্গে সমীর, রেবা আর রাণু সে ঘরে এসে ঢুকে বল্লে: বীরুদা কই, বীরুদা, এই যে বাঃ এরি মধ্যে মার আদর খাওয়া হচ্ছে··· উঁহু, সেটি চলছে না, বার করো টাকা। আজ আমরা তিনজনে খাবারের দোকান উজোড় করে মিষ্টি খাবো, ছাড়ো মা, বীরুদাকে আমাদের ছেড়ে দাও···

: দেখলি তো বলতে বলতে আসামীরা এসে পড়েছে, এইবার ঠাণ্ডা কর এদের। বলে কল্যাণী দেবী আবার হাসতে সুরু করলেন।

: কি যে হয়েছে তা তো এখনো তোমরা আমায় জানালে না মা-মণি, শুধু আমায়

খেলার মাঠে

শ্রীউমেশ মল্লিক বি, এ

রঞ্জী ট্রফী প্রতিযোগিতার অবসানের পর বাঙ্গলা দলের শোচনীয় পরাজয়ের কথাই সর্ব্বাগ্রে মনে পড়ে। পশ্চিম ভারত রাজ্য দল প্রতিপক্ষ বাঙ্গলা দলকে ফাইনালে এক ইনিংস এবং ২৩ রাণে পরাজিত করে এ বৎসরের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিয়েছে। বোম্বাইএ ব্রেবর্ণ ষ্টেডিয়ামে প্রথম কয়েকদিন দর্শনার্থীদের সমাগম হয়, কিন্তু বাঙ্গলা দলের দ্বিতীয় ইনিংসের প্রথম দিনের পর অবশ্যম্ভাবী পরাজয়ের কথা স্মরণ করে শেষ দিন জনসমাগম মোটেই সন্তোষজনক হয়নি।

বাঙ্গলা দল ১ম ইং ২৩৪ রাণ সংগ্রহ করে
বাঙ্গলা দল ২য় ইং ১৭৬ রাণ সংগ্রহ করে
পশ্চিম ভারতরাজ্য দল ১ম ইংএ ৪৩৩ রাণ সংগ্রহ করে। ফলে বাঙ্গলা দল এই গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতায় ১ ইং ও ২৩ রাণে পশ্চিম ভারত রাজ্য দলের নিকট পরাজয় বরণ করে।

বাঙ্গলা দল প্রতিদ্বন্দ্বীতা আরম্ভের প্রথম দিনে বিশেষ নিম্নস্তরের ক্রীড়া প্রদর্শন না করলেও পরের দিনের প্রতিপক্ষতায় তাদের বৈশিষ্ট্যহীন খেলাই সকলের চোখে পড়ে। বাঙ্গলা দলের পক্ষে নির্ম্মল চ্যাটার্জ্জী সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত স্তরের খেলায় পরিচয় দেন। পি, সেনও প্রথম দিনে সামান্য উৎকর্ষের পরিচয় দেয় কিন্তু দ্বিতীয় ইনিংসে রাণ সংখ্যা মাত্র ১। এ, চ্যাটার্জীও কিছু বিশেষত্বের পরিচয় দেয়। এ, দেব প্রথম ইনিংসে ১ রাণ সংগ্রহ করলেও দ্বিতীয় ইনিংসে নির্ম্মল চ্যাটার্জী ব্যতীত তাঁর ৩৩ রাণই উল্লেখযোগ্য। এম সেন, শিশির মুস্তাফী প্রভৃতির খেলা নৈরাশ্যজনক হয়।

এন চ্যাটার্জী, এ চ্যাটার্জী এবং পি সেনের উল্লেখযোগ্য খেলার পরিচয় তাদের রান সমষ্টি। এন, চ্যাটার্জী প্রথম ইংএ ৪০ রান করলেও দ্বিতীয় ইং ৭০ রাণ তার সুনাম অক্ষুন্ন রাখে।

এ, চ্যাটার্জী প্রথম ইংএ ৬৮ রাণ এবং পি, সেন ৭১ রান করে দলগত সাহায্য করে। বোলিংএ একমাত্র বিমল মিত্রই যা ৮০ রাণে ৪ উইকেট উল্লেখযোগ্য। এ, দেবের বাঙ্গলা দলের শেষ সময়ে দৃঢ়তা প্রদর্শন প্রশংসনীয়। বিজয়ী দলের জি কিষাণচাঁদ, ওমার খাঁ। সৈয়দ আমেদ, পুরুষোত্তম যথাক্রমে ১১১ রাণ, ৭৫, ৮৪ নট আউট ও ৫৬ রাণ করে জয়লাভে সাহায্য করে। প্রথম ইংএ শান্তিলালের ৫০ রাণে ৬ উইঃ দ্বিতীয় ইং সৈয়দ আমেদের ২৩ রাণে ৪ উইঃ, পুরুষোত্তমের ৫০ রাণে ৪ উইকেট সংগ্রহ করা বাঙ্গলা দলের বিপর্য্যয়ের কারণ হয়।

পশ্চিম ভারত রাজ্যদল এই প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করায় আমরা তাঁদিকে আমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি।

কর্ম্মে নিরত সৈন্যদলের জন্য বিশেষ এক খেলার ব্যবস্থাপনা ইডেন উদ্যানে হওয়ায় বাঙ্গলা দেশের ক্রীড়ামোদীদের আর এক স্তরের খেলা দেখার সুবিধা হবে। এই অনুষ্ঠানে সর্ব্বসমেত ২০টি দল যোগদান করেছে। এই ২০টি দলের মধ্যে ২টি বিভাগ করা হবে। প্রত্যেক বিভাগে লীগ অনুযায়ী পরস্পর ৯টি করে খেলায় প্রতিযোগিতা করবে। অবশেষে দুই বিভাগের শ্রেষ্ঠ প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে এক প্রতিযোগিতা হবে। প্রাদেশিক হকি প্রতিষ্ঠান বিজয়ীদের পুরস্কারের ব্যবস্থা করবে। প্রতিদিন ২টি করে খেলা হবে।

গত সপ্তাহের প্রথম বিভাগীয় হকি লীগের ফলাফল :—

বুধবার ৫ই এপ্রিল :—
মোহনবাগান—১ মেসারার্স—০
মহঃ স্পোঃ—৪ কাষ্টমস—০
রেঞ্জার্স—৩ পাঞ্জাব স্পোঃ—০
গ্রীয়ার—১ ডালহৌসী—০

বৃহস্পতিবার ৬ই এপ্রিল :—
পোর্ট কমিঃ—৫ লিলুয়া—০
মোহনবাগান—১ পাঞ্জাব স্পোঃ—০
পুলিশ—৩ কাষ্টমস—৩

শুক্রবার ৭ই এপ্রিল :—
মহঃ স্পোঃ—১ মোঃ বাঃ—০
ইষ্টবেঙ্গল—২ পাঞ্জাব স্পোঃ—১

শনিবার ৮ই এপ্রিল :—
বি, জি, প্রেস—২ ডালহৌসী—১
ইঃ বিঃ—২ মেসারার্স—১
পুলিশ—০ মোঃ বা—০

সোমবার ১০ই এপ্রিল :—
মেসারার্স—২ গ্রীয়ার—০
মোহনবাগান—২ কাষ্টমস—১
পুলিশ—০ ডালহৌসী—৩
রেঞ্জার্স—২ বি, জি, প্রেস—১

মঙ্গলবার ১১ই এপ্রিল :—
রেঞ্জার্স—৪ বি এণ্ড এ আর—০
মোহনবাগান—১ বি, জি, প্রেস—২
পোর্ট কমিঃ—১ মহমেডান—১

১ম ডিভিসন হকি লীগ টেবল্‌

(রবিবার ১লা এপ্রিল)

	খেলা	জ	ড্র	পরা	স্ব	বি	প
ইঃ বিঃ	১৩	১১	২	০	২০	১	২৪
পোর্ট কমিঃ	১৩	১১	২	০	৪১	৫	২৪
মহঃ স্পোর্টিং	১২	৮	৩	১	২৭	৯	১৯
রেঞ্জারস্‌	১২	৯	১	২	২৫	১২	১৯
পুলিশ	১১	৬	৫	২	২৩	১৪	১৭
বি-জি-প্রেস	১২	৭	২	৩	১৯	১২	১৬
মোহনবাগান	১২	৫	৫	২	১৭	১০	১৫
মিলিঃ মেডিঃ	১৩	৬	৩	৪	১৭	১৩	১৫
গ্রীয়ার	১৪	৫	৪	৫	১৭	১৬	১৪
জেভেরিয়ান্স	১৫	৬	১	৮	১৫	২৫	১৩
কাষ্টমস	১৫	৫	২	৮	২৩	২৭	১২
লিলুয়া	১৪	৪	৩	৭	৯	১৭	১১
ডালহৌসী	১৫	৪	২	৯	১৫	২৭	১০
বি এণ্ড এ আর	১৪	৩	১	১০	১৯	৪১	৭
আরমেনিয়ানস	১৫	২	২	১১	৯	২৬	৬
মেসারারস	১৪	১	৩	১০	৯	২৭	৫
পাঞ্জাব স্পোর্টস	১৪	০	৩	১১	৩	২৪	৩

ধাঁধায় ফেলে কি যে কর তোমরা বুঝতে পারি না…

বীরু একটু বিরক্তির সংগেই ও কথাগুলো বল্লে।

: অমন ডাক্তারী পাশ সবাই তোমার মত করতে পারে বীরুদা, তা বলে অত গর্ব্ব কিসের ?…রাণু হাসতে হাসতে ওর উত্তরে বলে ওঠে। রেবা, সমীর ওরাও রাণুর কথায় সায় দিল—বীরু কতক আনন্দে, কতক বিস্ময়ে খানিকক্ষণ হতভম্ব হয়ে সকলের মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে রইলো—এদের কথা সত্যি নাকি ?

(তারপর ?)

নাটমণ্ডপ

"স্বামীর ঘর" নির্ম্মাতা ইউরেকা পিকচার্স তাঁহাদের "দোটানা" ছবির মহরৎ করিয়াছিলেন কিছুদিন আগে,এ খবর আমরা কয়েক সপ্তাহ আগে জানাইয়াছিলাম। তখন সে ছবি পরিচালনা করিতেছিলেন মণি বর্ম্মা। সম্প্রতি পরিচালক বদল হইয়া গিয়াছে। এখন "স্বামীর ঘর"এর পরিচালক বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্রই "দোটানা" পরিচালনা করিবেন।

* * *

কলিকাতায় বর্ত্তমানে বিভিন্ন ষ্টুডিও গুলিতে নিম্নলিখিত ছবিগুলি গৃহীত হইতেছে :

নিউ থিয়েটার্স—সুবোধ মিত্রের পরিচালনায় "দুই পুরুষ" সমাপ্তির পথে চলিয়াছে। বিমল রায়ের পরিচালনায় "উদয়ের পথে"র আর সামান্যই বাকী। হেমচন্দ্রের পরিচালনায় "My Sister"-এর কাজ চলিতেছে। তবে এই ছবিতে আখতার জীহান নাম্নী যে নবাগতা অভিনেত্রীটিকে দেখিবার কথা শোনা গিয়াছিল তাহা আর শেষ পর্য্যন্ত ঘটিয়া উঠিবে না।

চিত্ররূপার "সন্ধি" (বাংলা) ও "সুলা" (হিন্দী) অপূর্ব্ব মিত্রের পরিচালনায় অগ্রসর হইতেছে। "সন্ধি"তেও শ্রীমতী সুমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায় নাম্নী একজন শিক্ষিতা ভদ্রমহিলার দেখা পাওয়া যাইবে।

শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্সের—"মাটির ঘর" উত্তরায় মুক্তি-আসন্ন। বিধায়ক ভট্টাচার্য্য রচিত এই নাটকখানি এক সময় রঙ্গমঞ্চে প্রচুর জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিয়াছিল, সুতরাং আশা করা যায় বইখানি চিত্রেও সমধিক জনপ্রিয়তা লাভে সমর্থ হইবে। অহীন্দ্র চৌধুরী, ছবি বিশ্বাস, জহর গাঙ্গুলী, মলিনা, পদ্মা, জ্যোৎস্না গুপ্তা প্রভৃতি তাহাতে অভিনয় করিয়াছেন। বর্ত্তমানে গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় 'গৃহলক্ষ্মী' নামক আর একখানি সামাজিক ছবির কাজ চলিতেছে।

কালী ফিল্মস ষ্টুডিওতে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় রচিত ও পরিচালিত "অভিনয় নয়"-এর শূটিং চলিতেছে।

এম, পি, প্রোডাকশনের—"বিদেশিনী"র চিত্ররূপ এখনও শেষ হয় নাই। কানন দেবীকে তারকায়িত করিয়া পরিচালক প্রেমেন্দ্র মিত্র ছবিখানিকে ধীরে ধীরে সমাপ্তির পথে লইয়া চলিয়াছেন।

নানাকথা

মিলন-বীথি

গত শুক্রবার ৭ই এপ্রিল সন্ধ্যা ৬টায় শ্রীযুক্ত রাধানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এল মহাশয়ের সভাপতিত্বে 'মিলন-বীথির' একাদশ বার্ষিক সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে।

বীথির সাধারণ সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুধীর কুমার সেন চৌধুরী মহাশয় কর্ত্তৃক বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী পাঠের পরে বর্ত্তমান বর্ষের জন্য নিম্নলিখিত কর্ম্মকর্ত্তা ও কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সভ্য নির্ব্বাচিত হয়।

সভাপতি—মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত রূপেন্দ্রকুমার মিত্র, সহঃ সভাপতি—(১) শ্রীযুক্ত রাধানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এল, (২) সুকবি বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় (৩) মিঃ এস্, ওয়াজেদ আলী,, বি-এ (ক্যান্টাব) বার-এট-ল (৪) মিঃ ডি, এন্, ধর, (৫) শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। সাধারণ সম্পাদক—শ্রীযুক্ত সুধীর কুমার সেন চৌধুরী, সহঃ সাধারণ সম্পাদক—শ্রীযুক্ত সন্তোষ রঞ্জন সেনগুপ্ত।

সহযোগী সম্পাদক—(১) শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ দাস (নাট্য বিভাগ) (২) শ্রীযুক্ত বীরেন দাস গুপ্ত (ঐ সহকারী) (৩) শ্রীযুক্ত কালী চরণ সেন (অর্থবিভাগ) (৪) শ্রীযুক্ত রমেশ ভট্টাচার্য্য (ঐ) (৫) শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ কর, বি-এল (সাহিত্য বিভাগ)

নাট্যাচার্য্য—শ্রীযুক্ত রাধানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এল।

২৪ পরগণা স্পোর্টস এসোসিয়েশন

উক্ত এসোসিয়েসনের ১৯৪৪-৪৫ সালের কার্য্যকরী সমিতির সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণ :

সভাপতি—২৪ পরগণার ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট

ওয়ার্কিং সভাপতি—শ্রীশিবপ্রসন্ন ঘোষাল (বেলঘরিয়া)

সহ সভাপতি—এস, ডি, ও (ব্যারাকপুর)
এস, ডি, ও (আলিপুর)

সহঃ সম্পাদক—শ্রীকানাইলাল ঘোষ (টী, পি, এম, এ, সি)
শ্রীবিজলী মুখার্জ্জী (আড়িয়াদহ এস, সি)

সম্পাদক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ শিকদার (খড়দহ)

কোষাধ্যক্ষ—শ্রীখগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (বরানগর এস্, সি)

সভ্যগণ—শ্রীননী ভট্টাচার্য্য (ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক), পঞ্চানন গাঙ্গুলী (প্যারাগণ এস, এ), কালী চ্যাটার্জ্জী (পানিহাটী এস) নির্ম্মল মিত্র (মোহিনী এস, সি), সুকুমার ঘোষ (ঘোষবাগান এস, সি), বনবিহারী ঘোষ (ডিষ্ট্রীক্ট অর্গানাইজার), শৈলেন্দ্রনাথ সিংহ (আলিপুর), রবীন্দ্রনাথ ঘোষ (আলিপুর)।

জুপিটার স্পোর্টিং ক্লাব

গত রবিবার ৯ই এপ্রিল সুকবি শ্রীবসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়ের পৌরহিত্যে ১৭৬-এ রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীটে উক্ত ক্লাবের বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। কবি এই ক্লাবের একজন সহঃ সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

বড়ুয়া লিমিটেডের—'চাঁদের কলঙ্ক' শীঘ্রই মুক্তিলাভ করিবে। ইহাতে বড়ুয়া, যমুনা, পূর্ণিমা, রবি রায়, ইন্দু মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি অভিনয় করিয়াছেন।

নিউ টকীজের "সমাজ" নামক একখানা ছবি, শুনা যাইতেছে, হেমন্ত গুপ্তের পরিচালনায় শেষ হইয়া গিয়াছে। "বন্দিতা" নামক আর একখানি ছবির মহরৎও হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। দুইখানি ছবিরই নায়িকা শ্রীমতী ছায়া দেবী এবং দ্বিতীয়খানির নায়ক ছবি বিশ্বাস।

নিউ সেঞ্চুরী প্রোডাকশানের—"প্রতিকার" ছবি বিশ্বাসের পরিচালনায় অগ্রসর হইতেছে। আশা করি, অভিনেতা হিসাবে বিশ্বাস মহাশয় যেরকম বাংলার চিত্রপ্রিয়দের চিত্ত জয় করিয়াছেন পরিচালক রূপেও তাঁহার সে সুনাম অম্লান রাখিবেন। এই ছবিতেও কয়েকটি নূতন মুখের সন্ধান পাওয়া যাইবে বলিয়া প্রকাশ, তন্মধ্যে শ্রীমতী বরুণা অন্যতম।

চিত্রভারতীর "শেষ-রক্ষা" বহুদিন শেষ হইয়া গিয়াছে এবং তাহা রূপবাণীর পরবর্ত্তী আকর্ষণ বলিয়া জানা গিয়াছে। কিন্তু "শহর থেকে দূরে" এখনও যে বিপুল দর্শক আকর্ষণ করিতেছে তাহাতে "শেষ-রক্ষা" আসিতে বেশ কিছু দেরীই আছে বলিয়া মনে হয়।

অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশানের দ্বিতীয় বাংলা সবাক ছবি "সন্ধ্যা"র কাজ চলিতেছে। ইহার পরিচালক মণি ঘোষের ইহাই প্রথম ছবি হইলেও পরিচালনা-কার্য্যে তিনি বেশ শক্তির পরিচয় দিতেছেন বলিয়া প্রকাশ।

দীপালীর স্বত্বাধিকারী শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত, ১২৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, দীপালী প্রেসে মুদ্রিত ও দীপালী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

প্রধান সম্পাদক—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় :: সহঃ সম্পাদক—শ্রীশ্রীরেন্দ্রমোহন মজুমদার বি. এল.

১৬শ বর্ষ VOL. XVI. | ৭ই বৈশাখ ১৩৫১ :: April 20, 1944 | ১৬শ সংখ্যা No. 16

দীপালীর কলেবর ও মূল্য বৃদ্ধি হইল

সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ আইনের নির্দ্দেশ অনুযায়ী দীপালীর কলেবর বৃদ্ধি হইল—এবং মূল্যও হইল :

প্রতি সংখ্যা	...	চার আনা
ডাকে	...	সাড়ে চার আনা
বার্ষিক চাঁদা	...	১২৷৹
ষাণ্মাসিক „	...	৬৷৷৹
ত্রৈমাসিক „	...	৩৷৷৹

যাঁহারা ৬৲ টাকা কিংবা ৩৷৷৹ টাকা দিয়া বার্ষিক কিংবা ষাণ্মাসিক গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন তাঁহারা যেন দয়া করিয়া অবিলম্বে বাকী টাকাটা পাঠাইয়া দিয়া আমাদিগকে যেমন এই দীর্ঘকাল অনুগৃহীত করিয়া আসিতেছেন, তেমনি সাহায্য করিয়া বাধিত করিবেন।

দীপালী কার্য্যালয়

১২৩/১ আপার সাকুলার রোড

কলিকাতা

ফোন : বড়বাজার ৩২৫৩

টেলিগ্রাম : DIPALI

আলোচনী

দুর্ভিক্ষের নিঃশব্দ হস্তাবলেপে আজও কত লোক যে মরিতেছে আমরা তাহার হিসাব রাখি না। তিল তিল করিয়া যাহারা মরিতেছে সংবাদপত্রে তাহাদের বিদায়বার্ত্তা ঘটা করিয়া প্রকাশ করিবার মত নহে। তথাপি তাহা কত সত্য! সম্প্রতি বাংলার Director of Public Information মহোদয় যে তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহার গুরুত্ব অসাধারণ। তাহার বিবৃতি হইতে জানা যায় গত ১৯৪৩ সালের ১৬ই অক্টোবর হইতে বর্ত্তমান বৎসরের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত কলিকাতা ও বাংলা দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে ৯৯,৫৬৬ জন দুঃস্থ নিরন্নকে ভর্ত্তি করা হইয়াছিল। সংক্ষিপ্ত সংবাদ হইতে ইহার বেশী কিছু জানা যায় না। কিন্তু ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে একটি লুণ্ঠিত অসহায় প্রদেশের শ্রীহীন অন্নহীন বিধ্বস্ত চেহারা, যাহা আমরা ঘটনার আবর্ত্তের কেন্দ্রস্থলে থাকিয়া আজও সম্পূর্ণ কল্পনা করিতে পারিতেছি না। যে দূরত্বের ব্যবধান আমাদের দৃষ্টিশক্তিকে পরিচ্ছন্ন করিয়া তোলে আজ তাহার অভাব আমাদের আছে ইহা সত্য। তাহার উপর রহিয়াছে এই প্রদেশের রাষ্ট্রনীতিক তরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাত। এই ভয়াবহ মন্বন্তরের সত্য পরিচয় প্রকাশ হয় তো আজ সেই দিক দিয়া অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে।

* * *

নূতন "Secondary Education Bill" পাশ করাইয়া লইবার জন্য তোড়জোড় চলিতেছে। বলা হইয়াছে প্রধান প্রধান বিষয়ে ইহা ১৯৪২ সালের বিলকেই অনুসরণ করা হইয়াছে। সমস্ত বিলটির মধ্য দিয়া এক শ্রেণীর সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যাইবে যাহা এ যুগে অচল। সত্যকারের শিক্ষা বিস্তার এখানে সত্যিই গৌণ বা Secondary, সাম্প্রদায়িক স্বার্থ রক্ষার প্রয়োজন মুখ্য। ইহাদের প্রস্তাবের অর্থ ভুল বুঝিবার সুযোগ অল্প। স্কুলের জন্য যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ করা প্রয়োজন ইহা আমরা বুঝি, কিন্তু সাম্প্রদায়িক অনুপাত কসিয়া শিক্ষক নিয়োগ করিতে হইবে ইহা সত্যই দুর্ব্বোধ্য। যোগ্যতার প্রশ্ন কর্ত্তৃপক্ষের নিকট বিচার্য্য নহে। উপযুক্ত grant বা সাহায্য দিয়া স্কুলকে স্বাবলম্বী করিয়া তুলিবার প্রস্তাব বিলে আছে—কিন্তু সাহায্যদানের সময় দেখিতে হইবে সাম্প্রদায়িক স্বার্থ পুষ্ট হইতেছে কি না। ঠিক সেই কারণেই দেখিতেছি, বিলটিকে পাঠ্যপুস্তক নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা ও সাম্প্রদায়িক হার কসিয়া নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। বাংলাদেশের সম্পূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা লইয়া চলিতেছে ছিনিমিনি খেলা, ইহার প্রতিরোধ করিতে জাতীয়তাবাদী বাঙ্গালীকে বহু শক্তিক্ষয় করিতে হইবে।

* * *

কলিকাতার বাড়ী-ভাড়া নিয়ন্ত্রণ আদেশ সম্পর্কে কর্ত্তৃপক্ষকে যে অনুসন্ধান করিতে হইয়াছিল তাহা হইতে প্রকাশ কলিকাতার লোকসংখ্যার শতকরা ৯২জন ভাড়াটিয়া।

সর্ব্বসমেত কলিকাতায় বাড়ীর সংখ্যা ৭৪, ৩৬১, ইহার মধ্যে ৫২,৪৪৫ ভাড়াটিয়া বাড়ী। বস্তির গৃহগুলির সংখ্যা ৭৯৪০। লক্ষ লক্ষ চলমান মানুষের স্বার্থ ও কোলাহল মুখরিত এই নগরীর চেহারা ইহা হইতে আন্দাজ করা যাইবে। সহর মানুষকে টানে স্বার্থের হাতছানি দিয়া। ইহা নির্ম্মম, করুণার লেশমাত্র ইহার কোথাও নাই। নরম শীতল মাটির স্পর্শ নগরের কোথাও মিলিবে না। ইহার বিরাট শাখা প্রশাখায় মানুষ তু'দিনের জন্য আশ্রয় লইতেছে তাহার পর প্রয়োজন-শেষে একে একে বাসা ভাঙ্গিয়া চলিয়া যাইতেছে। পিছন দিকে তাকাইবার কাহারও প্রয়োজন নাই।

* * *

দীর্ঘদিন হইতে শুনিতেছি, কলিকাতা ও তাহার নিকটবর্ত্তী শিল্পপ্রধান অঞ্চলগুলিতে যক্ষ্মারোগ দ্রুত প্রসারলাভ করিতেছে। সহর ও শিল্পপ্রধান অঞ্চলগুলির দূষিত আবহাওয়া আজ এই ব্যাধির বিষ গ্রামান্তরেও ছড়াইয়া দিতেছে। ফলে বর্ত্তমানে যে বিশেষ আশঙ্কাজনক অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। সহরের বস্তিগুলির দিকে চাহিলে মনে হয় যেন আমরা পরিত্যক্ত ক্লেদাক্ত আবহাওয়ায় প্রবেশ করিয়াছি। কর্পোরেশন ইহাদের প্রতি বিমুখ, সরকারী শাসন-বিধাতাদের তো কথাই নাই। টাকার সনাতন অভাব ইহাদের আছে—ইহারা অসহায়। আমরা সভ্য হইতেছি—ধীরে ধীরে ভাগীরথীর সুদীর্ঘ তটরেখা জুড়িয়া চিমনি কল ও বস্তির সমারোহ গড়িয়া উঠিল। আজ "শ্যামবিটপীঘন" ভাগীরথীর সে মায়া অদৃশ্য হইয়াছে। চিমনির ধূম্রজাল লোভার্ত্ত মানুষের ক্ষুধা ও কামনার নগ্নতা বহিয়া আনিতেছে। এই সভ্যতার বিরাট পাষাণভার যাহারা বহন করিতেছে সেই মানুষগুলির স্বাস্থ্যরক্ষা ও বাঁচিবার সুবিধা কতটুকু তাহা দেখিবার প্রয়োজন নাই। আজ যক্ষ্মা প্রসারলাভ করিতেছে ইহার সতর্কধ্বনি পথে ঘাটে প্রাচীর-চিত্রে বুঝাইবার চেষ্টা হইতেছে। ইহার ব্যর্থতা আমরা দীর্ঘদিন ধরিয়া লক্ষ্য করিয়াছি। কিন্তু সত্যকারের কাজ এই দিকে আজও কিছু ঘটিয়া উঠিল না। যেটুকু হইতেছে তাহা বেসরকারী প্রচেষ্টায়। এই দিক হইতে যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালের কর্ত্তৃপক্ষের প্রচেষ্টা বাঙালী শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিবে। জানা গিয়াছে, যক্ষ্মারোগ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ব্যক্তিদের জন্য কলিকাতার ত্রিশ মাইল পশ্চিমে ফুলেশ্বরে গঙ্গাতীরে একটি আশ্রম নির্ম্মাণের আয়োজন হইতেছে। এই উদ্দেশ্যে স্বর্গীয় যমুনালাল বাজাজ উক্ত স্থানে ৪০ বিঘা জমি যাদবপুর হাসপাতাল কর্ত্তৃপক্ষের হস্তে দান করিয়াছেন। ইহার উপর গৃহনির্ম্মাণ ও অন্যান্য ব্যবস্থা সমাপ্ত করিবার জন্য ব্যয় হইবে প্রায় তিন লক্ষ টাকা। আমরা আশা করি বাংলা সরকার এই টাকাটা দান করিয়া জনসাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন।

* * * *

১৩৫০ বঙ্গাব্দের শেষ হইয়াছে। বর্ষশেষের সঙ্গে আমাদের মনের সমস্ত গ্লানি কাটিয়া গিয়াছে জানিতে পারিলে সুখী হইতাম। আজও বিগত বৎসরের জের দেশের স্বাস্থ্য ও অর্থনীতিক অবস্থাকে জটিল করিয়া তুলিতেছে। বাংলার প্রায় ৪০ লক্ষ লোকের অন্ন যোগাইবার ভার কেন্দ্রীয় সরকার স্বহস্তে লইয়াছেন সত্য। কিন্তু চাউলের মূল্য আজও ১৬৲১৭ টাকার নীচে নামে নাই। জাতি খোঁড়াইয়া

কালবৈশাখী

—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

এল বৈশাখ কালভৈরব
কালবৈশাখী রঙ্গে
উড়ায়ে জটিল জটাজুটজাল
বিপুল নৃত্যভঙ্গে।
মেঘমৃদঙ্গে বাজে পটতাল
বাজে ডম্বুরু শত করতাল
দিগ্‌বারণের বৃংহনে ফুটে
রোমাঞ্চ নভ-অঙ্গে।

উন্মীল তব তৃতীয় নেত্র,
পুলকমত্ত আস্য,
মুহু মুহু ক্ষরে বিদ্যুৎজ্বালা
আননে অট্টহাস্য।
শঙ্কাস্তিমিত ললাটচন্দ্র
বাজায় ডঙ্কা জীমূতমন্দ্র
কুণ্ডলাকারে কজ্জল-কাল
মহানাগ ফিরে পার্শ্ব।

তাণ্ডবে মাতে নটনাথ আজি
কালবৈশাখী নৃত্যে
গগনে পবনে ভবনে ও বনে
নন্দি নিখিল চিত্তে।

ঝরিয়া পড়িছে বনানীর শিরে
প্রসাদের মত ফুলমালা ছিঁড়ে
সজল স্নেহের মুকুতার মালা
শিবের পৌরহিত্যে।

এক হাতে দাহ, আর হাতে স্নেহ,
একে হরে, দেয় অন্য,
জীবন-মৃত্যু একটি বৃন্তে
ফুটাও করি অনন্য।
তরুলতা হতে অবচয়ি পাতা
ঝঞ্ঝায় নত করি দিয়ে মাথা
সাজাও আবার নবপল্লব-
-গৌরবে করি ধন্য।

বাঘনখে তব খণ্ডিতা মহী
নদনদীহ্রদকুঞ্জে—
শৈলশিখরে তুষার বিথার
অট্টহাসির পুঞ্জে।
ছন্দিত তব তাণ্ডব-দোলে
জীবনমৃত্যু খেলে হিন্দোলে—
সিন্ধু উথলি আকাশের পানে,
কানে কানে কথা গুঞ্জে।

কৈলাসে তব কত অনাগত
হেথা হোথা সুখসুপ্ত,
কত না প্রলয় মরণ বহ্নি
ভস্ম-শিলায় লুপ্ত :
কত লোকপাল রাজ্যেশ্বর
কত গুণী, কত খুনী তস্কর,
কত কথা ব্যথা সঙ্গীত রূপ
কত অপরূপ গুপ্ত।

পদতাণ্ডবে জীবনের দোলা,
অঙ্গে মরণভস্ম,
শিঙায় কুহরে নিখিল-কণ্ঠ
তালে তালে জাগে হর্ষ।
ভৈরব, তব নৃত্যশালায়
আমাদেরই পূজা প্রদীপ জ্বালায়-
তাই এলে কি হে বরাভয়রূপে
কালবৈশাখী-স্পর্শ ?

২৫শে মে ১৯৩৩

চলিতেছে। সহরের বাহিরে গ্রামাঞ্চলে আঁধার নামিয়া আসিয়াছে। ইহারই মধ্যে মুখরক্ষার যেটুকু চেষ্টা সরকার বাহাদুর করিতেছেন তাহার ক্ষুদ্রতা আমরা প্রতি মুহূর্ত্তে অনুভব করিতেছি।

* * *

গত বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ সাড়ে ৫টায় "আনন্দবাজার পত্রিকা"র সম্পাদক প্রফুল্ল কুমার সরকার মহাশয় পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬১ বৎসর হইয়াছিল। তিনি যকৃতের পীড়ায় ভুগিতেছিলেন। তাঁহার বিধবা স্ত্রী শ্রীযুক্তা নির্ঝরিণী সরকার, এক পুত্র ও দুই কন্যা বর্ত্তমান।

প্রফুল্লকুমার 'আনন্দবাজার পত্রিকার' অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে পত্রিকার যে ক্ষতি হইবে তাহা ছাড়াও সাহিত্য ও সমাজ সেবার বিস্তৃত ক্ষেত্রে আমরা তাঁহার অভাব অনুভব করিব। ব্যক্তিগতভাবে যাহারা প্রফুল্ল কুমারের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিয়াছেন তাঁহারা এই হৃদয়বান খাঁটি দেশসেবকের অভাব দীর্ঘকাল অনুভব করিবেন। আমরা তাঁহার আত্মার কল্যাণ কামনা করি।

ঘরে-বাইরে

-কুম্ভক ভট্ট

ক'বছর বিদেশে ছিলুম—কলকাতার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক ছিল না। সম্প্রতি কলকাতায় ফিরেছি। ফিরে মনে হচ্ছে, আগেকার সহরের সঙ্গে এখনকার সহরের অনেক জায়গায় অমিল ঘটে গেছে।

যুদ্ধের গোলযোগে আমাদের মনের মধ্যে বিপর্য্যয় রকমের ওলোট পালোট হয়ে গেছে—জীবনে যে বৈচিত্র্য ছিল, যে আনন্দ ছিল, আজ সে বৈচিত্র্য, সে আনন্দ হারিয়ে মন যেন দিশাহারা হয়ে উঠেছে! সমাজের নানাদিকে ভাঙ্গন ধরেছে—যে পথে সকলে চলেছিলুম, সে পথের মাঝে মাঝে কাঁটা তারের বেড়া উঠেছে,—সিধা সহজ পথ ছেড়ে বাঁকা-চোরা কত গলি ঘুঁজির সৃষ্টি হয়েছে—চলতে গিয়ে পদে পদে থম্‌কে দাঁড়াতে হয়—কোথাও বা বেঁকে গলি-ঘুঁজির মধ্যে চলতে থাকি—কোথায় চলেছি, গন্তব্য স্থানে পৌঁছুতে পারবো কি না সে-সম্বন্ধে মন পদে পদে দ্বিধা সংশয়ে আচ্ছন্ন হয়ে ওঠে।

আপনারা ভাবছেন, দার্শনিক তত্ত্ব পেড়ে বসবার উপক্রম করছি—তা কিন্তু নয়। শহরে এসে মনকে নিয়ে সত্যই ক'দিন অত্যন্ত উতলা হয়ে দিন কাটছিল! কিন্তু ভাবলুম, এমন উন্মনা হলে তো চলবে না—বাঁচতে যখন হবে—

তাই আর পাঁচজনের মতন মন ফেরালুম সহরের বেতার-আসরের দিকে, থিয়েটার বায়োস্কোপের দিকে, আর বাংলা সাহিত্যের দিকে!

এ সবদিকে দেখছি—তেমনি বিপর্য্যয়, বিশৃঙ্খলা আর নকলিয়ানা!

সে কি রকম বিশৃঙ্খলা বলি। দুর্ভিক্ষের যে দারুণ অশনিসম্পাত হলো বাঙলার বুকে, ভেবেছিলুম, যাঁরা নিজেদের অপ্রতিদ্বন্দ্বী সাহিত্যস্রষ্টা বলে কোমর বেঁধে আত্ম-প্রচার করে' বেড়াচ্ছেন—সে অশনিপাতের ছবি দেখে তাঁরা শিউরে উঠবেন। শুধু এখন যাঁরা বেঁচে আছেন তাঁদের শিউরে ওঠা নয় ভাবীকালের পাঠক পাঠিকাও সে ছবি দেখে এ মহা-বিপত্তির পরিচয় পাবেন। "আনন্দমঠে" ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের ছবি দেখে আমরা যেমন শিউরে উঠি,—তেমনি।

তিনটি কবিতা হাতে পড়লো—কবিতা তিনটি লিখেছেন—"অমিয় চক্রবর্ত্তী"। ইনি কি ডক্টর অমিয় চক্রবর্ত্তী—এককালে

রবীন্দ্রনাথের সেক্রেটারি ছিলেন বোলপুর শান্তিনিকেতনে? সেই আবহাওয়ায় বাস করেছেন বলে জংধ্বজা তুলে নিজেকে কাব্যি হাটে প্রচার করছেন? বালখিল্য কবি-সাহিত্যিকদের বাহবা দিয়ে তাদের কাছ থেকে বাহবা আদায় করছেন?

বঙ্কিমচন্দ্র লিখে গেছেন, যদি লেখক হতে যাও তো মনের ভাব সহজ সরল ভাষায় লিখো! এ কথা লেখক মাত্রের শিরোধার্য! কিন্তু আধুনিক সাহিত্যিক বলে' যাঁরা বীরদর্পে আত্মপ্রচার করেন, তাঁরা প্রাচীন এবং সুবোধ্য বলে বঙ্কিমচন্দ্রকে "হুট্-আউট' করে বেড়ান—তাঁদের আদর্শেই বয়সে খুব আধুনিক না হলেও এইখানে আধুনিকের বাহবা পাবার লোভে অমিয় চক্রবর্ত্তী মহাশয় আশ্চর্য্য ঘোরালো এবং প্যাচালো ষ্টাইলে এবং ততোধিক প্যাচালো ভাষায় মিলহীন কবিতা লিখে ছাপিয়েছেন। লেখার নমুনা তুলে দিচ্ছি, যদি কেউ চট্ করে অর্থ বলে দিতে পারেন, তাঁকে—কি দেবো? তিনি যা চাইবেন, দেবো। "অন্ন চাই" কবিতায় অমিয় চক্রবর্ত্তী লিখেছেন—

"পাথরে মোড়ানো হৃদয় নগর
জন্মে না কিছু অন্ন"

আমাদের জিজ্ঞাস্য—"মোড়ানো" কথাটা—ওটা কি? "মোড়া"য় একটি অক্ষর কম বলে মোড়া-কে মুচ্‌ড়ে তেবড়ে 'মোড়ানো' করা হয়েছে! কিন্তু এভাবে কথা তৈরী করলে সঙ্গে সঙ্গে অর্থ লিখে দিলে ভালো হয় না কি?

তিনটি কবিতাই ঘোরালো উদ্‌ভুট্টে ভাষায় ভঙ্গীতে লেখা। আমাদের পাড়ায় থাকে কালাচাঁদ। সে বলে দুর্ব্বোধ্য ভাষায় না লিখতে পারলে আধুনিক সাহিত্যিকদের দলে নাকি হুঁকো কল্কে মেলেনা।

কালাচাঁদের কথা হয়ত সত্য, নাহলে এই যে আর একখানি বই দেখছি—"কেন লিখি?" বাঙালার বিশিষ্ট কথাশিল্পীদের জবানবন্দী। নগদ একটাকা মূল্য দিয়ে কিনেছিলুম—"বিশিষ্ট কথাশিল্পী" কথাটুকু ছাপা দেখে। কিনে সূচীপত্রে দেখি, "বিশিষ্ট কথাশিল্পী" বলে পনেরো জনের জবানবন্দী নেওয়া হয়েছে। এই পনেরো জনের মধ্যে আবুল মনসুর আমেদ, অমিয় চক্রবর্ত্তী, গোপাল হালদার, জীবনানন্দ দাশ, বিষ্ণু দে, ধূর্জ্জটী মুখোপাধ্যায় শাহাদাৎ হোসেন—এই ছ'জনকে কথাশিল্পী বলে চালানোয় প্রকাশক "ফ্যাশিষ্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ" বিশিষ্ট রকমের ধাপ্পা চালিয়েছেন।

বাংলার বিশিষ্ট কথাশিল্পী বলে' বন্ধু-মহলের সার্টিফিকেটের তোয়াক্কা না রেখেও যাঁরা দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন, তাঁদের অনেককে বাতিল করা হয়েছে। তারপর অমিয় চক্রবর্ত্তী, বিষ্ণু দে, ধূর্জ্জটীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—এঁরা ছাপার অক্ষরে কথা গেঁথেছেন বলে যদি প্রকাশকসঙ্ঘ তাঁদের কৌশল করে কথাশিল্পীদলে এঁদের ভর্ত্তি করে থাকেন, তা হলেও কথাশিল্পীর এই "বিশিষ্ট" অর্থ তাঁদের বিজ্ঞাপনী-পত্রে প্রকাশ করা উচিত ছিল। কম্পোজিটররাও কথা গাঁথেন—তাঁদের কেন কথাশিল্পীর দল থেকে বাদ দেওয়া হলো? এ মনোভাবে তাঁদের ফ্যাশিজম্ প্রকট হয়েছে, তা নিজেদের সদর্পে ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী বলে প্রচার করা সত্ত্বেও।

বইখানি নাড়াচাড়া করে দুঃখ হচ্ছিল এই ভেবে, গাঁয়ে-না-মানা মুড়লীয়ানায় এভাবে শক্তি সামর্থ্য ক্ষয় না করে স্পষ্ট যদি অমিয় চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের ইঙ্গিতমত "শাবল হাতুরি যন্ত্র" নিয়ে গ্রামে গিয়ে অন্ন বাঁচাতেন ("অন্নদাতা" কবিতা), তাহলে বাঙালী কৃতার্থ হতো।

এ বইখানির সম্বন্ধে বারান্তরে আর একটু আলোচনা করবার ইচ্ছা রইলো।

কমরেড লেনিন

—শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

মার্কস এলেন রাইনল্যাণ্ডে। নতুন কাগজ বের করলেন—নিউ রাইনিশ্ জাইতুং। উগ্র মতামতের জন্য অল্পদিনেই কাগজখানির উপর পুলিশের দৃষ্টি পড়লো। মার্কস কিন্তু সব কিছু উপেক্ষা করে কাগজখানিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সর্বস্ব পণ করলেন। তথাপি নানা বিপর্য্যয়ের মধ্যে পড়ে কাগজখানি একবছরের মধ্যেই উঠে গেল। মার্কসও সর্ব্বস্বান্ত হলেন। পৈতৃক যা কিছু ছিল সবই তো গেল, শেষে এমন দিন এলো যে স্ত্রীর গায়ের গহনা বন্ধক দিয়ে মার্কসকে দুটি অন্নের সংস্থান করতে হোল।

মার্কস ফিরলেন প্যারিসে।

সেখানকার মন্ত্রী বললেন—তোমার এখানে থাকা চলবে না।

মার্কস গেলেন লণ্ডনে।

এখানে এংগেলসের সঙ্গে কমিউনিষ্ট লীগের কাজ সুরু হোল পুরোদমে।

কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই দেখা দিল দলাদলি।

কিন্তু যাকে নিয়ে দলাদলি তিনি দলের বাইরে চলে এলেন। অন্তরে ছিলেন চিরন্তন বিপ্লবী, শ্রমিক-বিপ্লবকে জাগিয়ে তোলাই ছিল তার ঐকান্তিক আগ্রহ, দল পাকিয়ে নিজেকে বড় করে রাখার মত মনোভাব তার ছিল না, তিনি তাই নিজেকে গুটিয়ে আনলেন পড়াশুনা আর প্রবন্ধ লেখার মধ্যে।

ডক্টর মার্কস পয়সা রোজগার করাটাই জীবনের চরম লক্ষ্য বলে কোনদিন মনে করেন নি। অর্থবাদী জগৎ সে অপরাধ ক্ষমা করলো না। দার্শনিক মার্কস প্রবন্ধ লিখে যে পয়সা পেতেন তাতে তাঁর কুলাতো না। অক্টোপাসের মত নানাদিক থেকে দারিদ্র্য তাঁকে আক্রমণ করলো। তা থেকে রক্ষা পাবার জন্য একে একে অনেক কিছুই গেল। সামান্য যে ক'খানা বাসন কোসন ছিল, তাও গেল।

কিন্তু সেই সামান্য টাকাতে ক'দিনই বা আর চলবে! স্বল্লাহার আর অনাহারের ফলে জীবনীশক্তি কমে আসতে লাগলো। মৃত্যুর ছায়া এসে পড়লো ছোট্ট সংসারটির উপর। ছোট্ট এক বছরের মেয়েটির হলো নিউমোনিয়া। দুধ কেনার পয়সা নেই, তা ডাক্তার দেখানো হবে কোথা থেকে। মেয়েটি মায়ের কোলে ছটফট্ করতে লাগলো।. পিতা সেদিকে তাকাতে পারলেন না, দর্শনের চেয়েও বড় কিছু বুকের মাঝে গুমরে উঠতে থাকে। সামনে খোলা বইয়ের পাতা থেকে দৃষ্টি চলে যায় কোন সুদূরে। নিজের অক্ষমতার কথা ভেবে তাঁর দুচোখ ঝাপসা হয়ে যায় কি না জানি না। যারা তাঁর চেয়েও অক্ষম, যাদের ঘরে প্রতিদিন এই দৃশ্য ঘটছে তাদের কথাই আজ হয়তো বড় বেশী করে মনে পড়ে। যাদের মুক্তির কথা আজ তাঁকে সর্বহারা করলো, তাদের মুক্তি সত্যিই কোন দিন আসবে কি না কে জানে, শ্রমিকরা যেদিন সত্যি জাগবে, সেদিনই জগৎ জানবে মনুষ্যত্বের মূল্য অর্থের চেয়েও বেশী। কিন্তু এই অন্ধকার পার হয়ে সেই আলোর দিশা তো চোখে পড়ে না।

তিনদিন ছটফট্ করে মায়ের কোলে মেয়েটি স্থির হয়ে গেল। রাত্রির অন্ধকারে ছোট ঘরখানি চাপা কান্নায় গুমরে উঠলো। মার্কসের চোখে কিন্তু জল নেই, তিনি তখন আলোর ঠিকানা খুঁজছেন। বিপ্লবী তিনি, আঘাতের পর আঘাত তো তাঁকে বুক পেতে নিতে হবে, কিন্তু সেজন্যে ভাবী কালের দিক্ নির্দেশ করতে ভুলে গেলে তো চলবে না। জল জ্বল করে ওঠে দুই চোখ, নতুন দিনের আলো ভেসে ওঠে বোধ হয় প্রতিফলকে।

মেয়েটীর দেহ ঘরের মধ্যে পড়ে থাকে সারা রাত। শোকের উপর জেগে থাকে দুর্ভাবনা, কাল সকালে কফিন কিনবেন কি দিয়ে!

পরদিন সকালে প্রতিবেশীর কাছে গিয়ে জেনী হাত পাতলো, কিছু
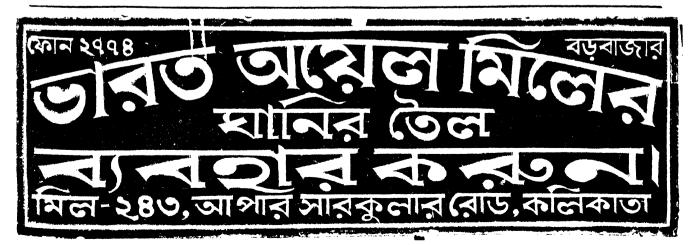
ধার চাই। দু'পাউণ্ড পাওয়া গেল, তাই খরচ করে মেয়েটিকে কবর দেওয়া হোল।

জেনী কিন্তু এই অর্থাভাবের জন্য কালকে কোনদিন কোন কথা বলেনি, বিপ্লবীর স্ত্রী সে, শোক ও দারিদ্র্য যে তার চিরন্তন সহচরী।

সেদিন মার্কস বৃটিশ মিউজিয়ামের বইয়ের পাতার মধ্যে একান্তভাবে নিবিষ্ট হতে পেরেছিলেন কি না জানি না। সেদিন তাঁর চোখের দৃষ্টি হয়তো অক্ষমতার বেদনায় ঝাপ্‌সা হয়ে গিয়েছিল, হয়তো-বা অশ্রুর বদলে সেই চোখে দেখা দিয়েছিল বিপ্লবীর জ্বালা, যে-সব সর্বহারার দল তারই মত দুঃখ পাচ্ছে তাদের বেদনার নিবিড় অনুভূতি। একটা আলোকের সঙ্কেত জানাবার জন্যে সেই দিনই বোধ হয় একটা উগ্র কামনা জেগেছিল তাঁর মনে, তিনি বলেছিলেন যত দুঃখ দুর্দশাই আসুক আমি ঠিক আমার লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছাব, আমি ধনীর টাকা তৈরীর যন্ত্র হতে পারবো না।

এই নিষ্ঠাই তাঁকে ভাবী কালের নির্দেশক হিসাবে চির-স্মরণীয় করেছে।

ক্রমশঃ মার্কসের দারিদ্র্য চরমে গিয়ে পৌঁছাল : ছোট্ট ভাড়াটে বাড়ী, ছোট ছোট পায়রার খোপের মত ঘর। আলো হাওয়ার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই বললেই হয়। তার উপর ভালো খাবার নেই। বাড়ী শুদ্ধ সবাই তাই অসুস্থ। হাতে একটি পয়সা নেই, তার উপর আছে বাড়ী ভাড়ার তাগিদ, আর, পাওনাদারদের কটূক্তি। কিভাবে যে দিন কাটছে তা ধারণা করা যায় না। এসবের মধ্যেও কিন্তু মার্কসের চিত্তের দৃঢ়তা এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয় না, দিনের পর দিন ধরে বৃটিশ মিউজিয়ামে পড়াশুনা ঠিক চলেছে।

মিউজিয়াম থেকে বাড়ী ফিরেও পড়ার বিরাম নেই। ঘরের এক কোনে এক টেবিল বইয়ের সামনে মার্কস তন্ময় হয়ে বসে থাকে। চুরুটের ধোঁয়ায় ছোট্ট ঘরখানি ঝাপ্‌সা হয়ে ওঠে। তারই মধ্যে ভাল করে ঠাহর করলে চোখে পড়ে এখানে সেখানে খবরের কাগজের গাদা, পুরাণো বই, ছেলেদের খেলনা, সেলাইয়ের কল, ভাঙাচোরা আসবাবপত্র— সারা ঘর জুড়ে ধুলো আর আগোছালো ভাবটি যেন সব ছাপিয়ে উঠেছে, বিপ্লবী মনের কানায় কানায় ছুঁয়ে চলেছে দারিদ্র্য-ঘেরা সঙ্কীর্ণ পরিবেশ। হঠাৎ ভিতরে গিয়ে ঢুকলে বসার কোন আসন পাওয়া যাবে না ; ধুলো ভরা পায়া-ভাঙা একখানি চেয়ার, তার উপর কোন রকমে বসতে পারলেও জামা কাপড় নষ্ট হবেই। কিন্তু সেজন্য মার্কস কি জেনীর কোন সঙ্কোচ নেই, কারণ তারা জানে ভাবী কালের দিক নির্দেশ যাঁরা করেন বর্তমানকালের মানুষ তাকে স্বাচ্ছন্দ্য দিতে চায় না, সেইজন্যই স্বার্থপর পারিপার্শ্বিকতার কাছ থেকে তাঁরা কোন সুবিধা চান না। আর যারা সেখানে আসে তারাও মানুষের কাছে আসে, আসবাবপত্র দেখতে আসে না।

(ক্রমশঃ)

প্রত্যাখ্যান

(উপন্যাস)

শ্রীসুধাংশু কুমার হালদার, আই, সি, এস্

(১)
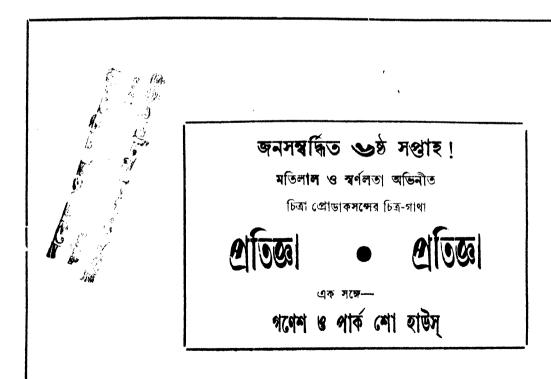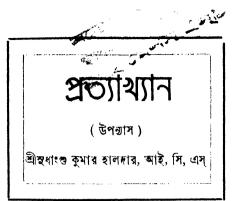
চূণবালি-খসা বাইরের ঘরের মেঝের ওপর দড়ি দিয়ে আষ্টে পৃষ্ঠে বাঁধা একটা বিছানার মোট, পাশে একটা কালোরঙের টিনের বাক্স। বাড়ীর ঘরগুলো সমস্ত খালি। কোথাও দু'একটা ভাঙা কুলোডালা, একটুকরা ভাঙা আর্শি, ছেঁড়া জুতা, ন্যাকড়ার ফালি, কাণা কলসী, কতকগুলো বইয়ের পাতা ছড়ানো, এলোমেলো হাওয়ায় এধারে ওধারে উড়ছে। পাচীলের পাশের আমগাছটা থেকে একটা কোকিল অবিশ্রান্ত ডেকে যাচ্ছে।

দূর সম্পর্কের খুড়ো ভবানীচরণ এইমাত্র খবরটা পেয়েই উদ্ধশ্বাসে ছুটে এসেছেন। ভাল ক'রে কাছাটা-কোঁচাটা গোঁজবারও সময় পান নি। 'অসীম কোথা, অসীম কোথা ?' করতে করতে একেবারে এসে পড়লেন সেই ঘরটায়—অসীমের মায়ের যেটা ছিল ঠাকুরঘর। নৈবেদ্যহীন, নির্মাল্যহীন শূন্য তাম্র সিংহাসনে বিগ্রহ, তারই সামনে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে পড়ে আছে অসীম।

ভবানীচরণ একটু অপেক্ষা করলেন। যে সব চোখা চোখা বিশেষণগুলা তাঁর জিহ্বাগ্রে এসেছিল, সেগুলাকে সামলে নিলেন। এমনটা যে দেখবেন ভাবতে পারেন নি। কিছুক্ষণ পরে একবার কাশলেন। অসীমের সম্বিৎ ফিরে এল। সে আস্তে আস্তে ঘর ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়াল।

"তাহ'লে যা শুনলুম তাই ঠিক ? চলে যাওয়াই মনস্থ করেছ ?" ভবানীচরণ বললেন। অসীম চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল।

"কিন্তু বাবাজী, লুকোচুরির দরকারটা কি ছিল ? বাড়ী বাগান সব ঐ দত্তদের মাত্র পাঁচশো টাকায় বেচেছ শুনলুম। আমি একটা আঁচ পেয়েছিলুম, তবে বিশ্বাস করিনি। কেন, আমাকে একবার জিগেস করলে না কেন ? আমিই না হয় কিনতুম। আমাদের বংশের পৈতৃক ভদ্রাসন আমাদেরই থাকত।

"আপনি দাম দিতেন না"—অসীম বলল।

"বটে ! তা একবার জিগেস ক'রে দেখলেও তো পারতে !"

"আপনাকে বললে আপনি অন্যকাকেও কিনতে দিতেন না। যেমন সেবার জমি বিক্রির সময় বাধা দিয়েছিলেন। শেষে জলের দরে বেনামীতে কিনে নিলেন।"

"দেখ অসীম, তুমি ছেলে মানুষ, তায় সন্ত মাতৃশোক পেয়েছ, তাই তোমায় কিছুই বললুম না। নইলে—"

"আপনার অনন্ত দয়া"—অসীম বললে।

"ধর্মে সইবে না অসীম, ধর্মে সইবে না"—ক্রোধে ভবানীচরণের কাছা খুলে গেল, "দূর সম্পর্কের হ'লেও আমি তোমার খুড়ো, পিতৃতুল্য, আমার অভিসম্পাত—"

প্রত্যুত্তরে অসীম শুধু বলল, "যান" এবং নিজেই বাইরের ঘরে চলে গেল ! ভবানীচরণ নিষ্ফল আক্রোশে কিছুক্ষণ হাত-পা ছুঁড়লেন, সদরে গিয়ে মামলা রুজু ক'রে বিক্রীকোবালা নাকোচ ক'রে দেবেন ভয় দেখালেন, তারপর নিজের হাঁকডাকে নিজেই পরিশ্রান্ত হ'য়ে খিড়কির দরোজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। অসীমের মুখচোখ লাল দেখে সদরের দিকে ঘেঁসতে তাঁর সাহস হ'ল না।

আমগাছের কোকিলটা তাঁকে ব্যঙ্গ ক'রে ডেকে উঠল—কুহু, কুহু। বাইরের ঘরে তখন দত্তগিন্নী এসে বিছানার মোটটার ওপর বসেছেন। অসীমকে দেখে বললেন, "আজই চলে যাবি বাবা ?"

"হ্যাঁ মাসীমা।"

"অত তাড়া কেন রে ? বাড়ী ঘরদোর বেচেছিস ব'লে তাই কি অভিমান হয়েছে ?"

"না মাসীমা, অভিমান আমার কারো ওপর নেই। তোমার দয়ার কথা ভুলব না কোনোদিন। দেনাটেনা শোধ ক'রে যা সামান্য কিছু বেঁচেছে তাই নিয়ে ভাগ্য পরীক্ষা করতে চললুম। এখানে বসে থাকলে শুধু এক প'চে মরা ছাড়া আর কিছু হবে না কোনোকালে।

"বালাই ষাঠ" ব'লে দত্তগিন্নি উঠে দাঁড়ালেন। তারপর বললেন, "ত্যাখ অসীম, তোর মা আর আমি প্রায় একই সঙ্গে এ গ্রামে বউ হয়ে সংসার করতে ঢুকি। কোথায় ছিলি তখন তুই। তোর মায়ের কপাল পুড়তে দেখলুম, তোর দূর সম্পর্কের খুড়ো একটু একটু ক'রে তোদের সর্বস্ব আত্মসাৎ করছে দেখলুম, তবু যতদিন সে অভাগী বেঁচেছিল তুই পাহাড়ের আড়ালে ছিলি। কত দুঃখে কষ্টে তোকে মানুষ করেছে তা তুই জানিস না, একখানি একখানি ক'রে গয়না বেচে তোকে লেখাপড়া শিখিয়েছে, তুই এম এ, পাশ করে মানুষ হলি, আর আজ—"

"থাক মাসীমা, ওসব কথা আর বোলো না।"

"না বাবা, তুই জন্মের মতন এ গ্রাম ছেড়ে চলে যাচ্ছিস, আজ যদি না বলি তবে আর বলবার সময় পাবো কখন ? আমাকে তোর নিজের মাসী বলেই মনে করিস।"

"গাড়ী আমার ঠিক সাড়ে বারোটায়। সকাল সকাল দুটি খেতে দিও, এবার শেষ বারের মতো প্রসাদ খেয়ে যাবো মাসীমা।"

দত্তগিন্নি খানিকক্ষণ কথা বলতে পারলেন না, তাঁর কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হ'ল। তারপর নিজের কোমরে গোঁজা একটা পুঁটলি বার ক'রে বললেন, "এটা তোকে নিতেই হবে। এ তোর মাসীর দান।"

"না মাসীমা, আমি কিছুতেই আর কিছু নিতে পারব না। এমনি

তো তোমার স্নেহের ঋণ শোধ দিতে পারব না কোনো জন্মে, তার ওপর আর ঋণের বোঝা বাড়িও না।"

"কর্ত্তাকে কত ক'রে বললুম তোকে পুরাপুরি হাজার টাকা দিতে, তা কে নাকি রটিয়ে বেরিয়েছে তোর বাড়ীঘর সব বন্ধক আছে। আমার মনে হয় তোর খুড়ো ভবানীরই এই কাজ। কর্ত্তা বললেন, পাঁচশো টাকার এক পয়সা বেশী দেব না। তা বাবা, ওসব বিষয় সম্পত্তির কথা ওরা পুরুষ মানুষরা বুঝুক গিয়ে। আমি তোর মাসী হই, আমার সঙ্গে তোর তো ব্যবসাদারির সম্পর্ক নেই। এ আমার নিজের গায়ের গয়না, আমার বাপ দিয়েছে, তোকে নিতেই হবে।"

অসীম বললে, "না মাসীমা, ও তুমি পটুর বিয়ের জন্যে রেখে দাও।"

"নিবিনে তাহলে ?"

"না মাসীমা"—একটুখানি থেমে অসীম বললে, "আজ সকালে ঠাকুর প্রণাম করবার সময় বলেছিলুম, তুমি আমার সব কেড়ে নিয়ে আমায় পথে বসিয়ে দিলে, সেই ভাল হ'ল, সেই ভাল হ'ল ঠাকুর। ভট্টাচার্যিদের বাড়ীতে তুমি পরম সমাদরে থেকো, আর আমি এ-মুখো হবো না, তোমার মুখ দেখবার জন্যেও নয়। কিন্তু মাসীমা, এ গর্ব হয়তো আমার থাকবে না, তোমার মুখখানি দেখবার জন্যে হয়তো আমায় আবার আসতে হবে। ঠাকুর শুধু কান ধরে পথে বার ক'রে দেয়, আর মাসীমা এসে পথ থেকে হাত ধরে তোলে।"—দত্তগিন্নীর পায়ের কাছে মাথা রেখে অসীম ছোট ছেলের মতো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

"ওরে বাঁদর ছেলে, ঠাকুর দেবতার নামে অমন কথা বলতে নেই রে!"—দত্তগিন্নী দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে বারম্বার অসীমের হ'য়ে দেবতার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিলেন।

গোরুর গাড়ীতে বাক্স বিছানা ষ্টেশনের জন্যে রওনা ক'রে দিয়ে অসীম বেরিয়ে পড়ল।

কোকিলটা তখনো ডেকেই চলেছে।

ছোট একটুখানি ফুলবাগানে অসীমের মা নিজের হাতে ফুল লাগিয়েছিলেন—সেখানটিতে এসে দাঁড়াল। আজ দু'মাস ধরে তাদের যত্ন হয় নি, বেলফুল, টগর, চাঁপা সব অনাদরে ফুটে রয়েছে। দুর্বাঘাস আর ভাঁট গাছ গজিয়ে উঠেছে অবাধে।···ইঁট দিয়ে বাঁধান তুলসীতলায় তৈলহীন প্রদীপটি তেমনি রয়েছে। এইখানে প্রতি সন্ধ্যায় তার মা আলো জেলে দিতেন, প্রণাম করতেন। আজ তিনি কোথায় আলো জেলে দিতে গেছেন কে জানে!···তাঁর সেই প্রণামনত শুভ্র মূর্তিটি অসীমের মনে জেগে উঠল। বৈধব্য-ক্লিষ্ট ঋজু দেহটি যেন একটি ম্লান অগ্নিশিখার মতো, চোখ দুটি যেন দূরের মায়ার স্বপ্ন দেখছে।···তাঁর প্রাণহীন দেহখানি এইখানেই শোয়ানো হয়েছিল।···অসীম মুখ ফিরিয়ে নিয়ে চলে গেল। খিড়কি দরজার পাশ দিয়ে সঙ্কীর্ণ পথ, দুধারে রাংচিত্রের বেড়া দেওয়া বাগান। পুকুরের জল কমে এসেছে, শ্যাওলা ঢাকা ঘাটের সিঁড়ি জল ছেড়ে উপরে উঠে এসেছে যেন। ছেলেবেলায় এইখানে তার হাত ধরে মা তাকে স্নান করতে নিয়ে আসতেন,—কত ভয়, কত আশঙ্কা সঙ্কিত হ'য়ে উঠেছিল তার মনে ঐ ভাঙা ঘাটটিকে নিয়ে! ওরি নীচেই নাকি থাকে এক জটিল জটাই বুড়ী,—তার জলসিক্ত জটায় জটায় ছোট্ট ছোট্ট ঘুন্টি বাঁধা। যখন আকাশ ভ'রে বৃষ্টি নামত, মায়ের বুকে মুখ লুকিয়ে সে কতদিন শুনতে পেয়েছে বৃষ্টিধারার তালে তালে জটাই বুড়ীর জটানাড়ার ঝম ঝম্।···পুকুরের জলের ওপর নুয়ে পড়েছে খোঁচা খোঁচা আঁশওয়ালা কুমীরের মতো ঐ খেজুর গাছ। কিশোর বয়সে তার ওপর থেকে কতবার লাফ দিয়ে পড়েছে সে এই পুকুরের জলে! পূবদিকে এক মস্ত নালার ধারে দাঁড়িয়ে একটা আমগাছ। তার ওপর ওঠাই যায় না, এত উঁচু সেটা। আম পাড়তে এসে মথুর বলত ওর মগ্‌ডালে চড়লে নাকি ইষ্টিশান দেখা যায়! নালার ওপরে ঐ বেল গাছ। ধব্‌ধবে জ্যোৎস্নায় সেখানে নাকি কত রাত্রে দেখা গেছে এক ব্রহ্মদৈত্যকে, বেলের আঠায় মাজা তাঁর সাদা পৈতার গোছা চাঁদের আলোতে ঝক্ ঝক্ করছে। নিভৃত পল্লীগ্রামের এই বাড়ী, বাগান, পুকুর,—ভেবে দেখলে এরা কত তুচ্ছ, কত অকিঞ্চিৎকর! সমগ্র বিশ্বের কলকোলাহলের কাছে কতটুকুই বা এদের দাম! কিন্তু তবু কত গভীর এদের আকর্ষণ!···ঐ যে সেই নোনাগাছটা আজও ওখানে রয়েছে ঐ পাজাটার ধারে! কী লোভনীয়ই না ছিল ছেলেবেলায় সেই নোনাগুলি! আমবাগানটা প্রদক্ষিণ ক'রে অসীম রাস্তায় এসে দাঁড়াল। তরুর ছায়ায় ঢাকা বাড়ীটার দিকে একবার শেষ চাওয়া চেয়ে সে একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে গেল। আজ ওখানে আর তার জন্যে ভাত বেড়ে রেখে মা বসে নেই!···

দত্তদের বাড়ী নামমাত্র আহার শেষ করে সে ষ্টেশনের পথ ধরল। কিন্তু সোজা ষ্টেশনে গেল না। একটা মস্ত প্রাচীন অশোথ গাছ তার অজস্র ঝুরি নামিয়ে দিয়ে এই রাস্তার মোড়ে গ্রামের বৃদ্ধ প্রপিতামহের মতো ব'সে আছে। এখান থেকে একটা পথ সোজা গঙ্গার ধারে চলে গেছে। তার মনে পড়ল কতবার মায়ের সঙ্গে গঙ্গাস্নান সেরে এই পথ বেয়ে সে বাড়ী ফিরেছে,—ছোট্ট একটি ঘটি থেকে মা এই অশোথ গাছের মূলে গঙ্গাজল ঢেলে গেছেন। তার কী খেয়াল হ'ল কে জানে,—নত হ'য়ে অশোথ গাছটিকে বারম্বার প্রণাম করলে। গঙ্গাজলের বদলে তার দু'ফোঁটা চোখের জল গাছের মূলে ঝরে পড়ল।

গঙ্গাতীরের শ্মশান,—কতবার পাশ দিয়ে যেতে যেতে ভয়চকিত দৃষ্টিতে চেয়ে দেখেছে সে! তারপর একদিন এইখানেই তার মায়ের চিতা জ্বলে উঠল। সেদিন তার শুষ্ক রুক্ষ মনে ভয়ও ছিল না, কোনো অনুভূতিই ছিল না। সব যেন জট পাকিয়ে শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে গিয়েছিল। তিনটে খিলানওয়ালা একটা দালান,—খিলানগুলা যেন বিকট হাঁ করে আছে। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় কালো হ'য়ে গেছে। তাদেরই ফাঁক দিয়ে গঙ্গার সাদা জল দেখা যায়। ওরাই যেন জীবন ও মৃত্যুর তোরণ দ্বার,—ওদেরই মধ্য দিয়ে জীবন্ত মানুষ মহাশূন্যে মিশিয়ে যায়। অসীম নেমে গেল,—যেখানে তার মায়ের চিতা ছিল সেখানে এখনো কতকগুলা কাঠ কয়লা আর ছাই পড়ে রয়েছে। সেখানটিতে মাথা ঠেকিয়ে বলল, "মা চললুম।"···ধীরে ধীরে ষ্টেশনের পথ ধরল।

যথাসময়ে বাঁশী বাজিয়ে গাড়ী ছেড়ে দিলে। ষ্টেশনের যাত্রীশালা নীরব নিস্তব্ধ হয়ে গেল, টিকিটবাবু টাকা গুণতে লাগলেন, ষ্টেশনমাষ্টার মাথার টুপিটা খুলে চেয়ারে এলিয়ে পড়লেন···কেউ জানল না কতখানি দুঃখ নিয়ে একজন চিরদিনের জন্য তার শৈশব কৈশোরের কত মায়ায় গড়া কত প্রিয় জন্মভূমি পরিত্যাগ ক'রে চলে গেল। (ক্রমশঃ)

মূর্তি

(গল্প)

—শ্রীসরোজ মুখোপাধ্যায়

—দেখ্, দেখ্ রাধা, এই মূর্তিটি কি সুন্দর হয়েছে। আচ্ছা এর চোখদুটি যদি আর একটু টেনে দি তা'হলে আরো সুন্দর হয় না কি ?

—ছাই হয়েছে! এটা আবার একটা মূর্ত্তি হ'লো নাকি ? কই আমার ত' একটা মূর্ত্তি গড়ে দিতে পারলে না।—দুষ্ট হাসি হেসে রাধা বলে।

শ্যামল তাহার কথায় কান না দিয়াই বলিতে থাকে—রাধা, কাল্‌কে আমি পাখী শীকার করতে যাব, তুই যাবি আমার সঙ্গে ?

—না আমি যাব না, রাধা মুখ ফিরাইয়া লয়।

—কেন ? বলিয়া শ্যামল জিজ্ঞাসু নেত্রে রাধার পানে চায়।

—সামনে তোমার প্রবেশিকা পরীক্ষা না ? রাধা বলে।

শ্যামল উত্তর দেয়—তাতে কি হয়েছে ? কাল ভোরে মা নিমন্ত্রণে যাবেন, আর আমি সেই ফুরসুতে, বুঝলি—তুই না গেলে বয়ে গেল, বলিয়া শ্যামল রাধাকে দুইটি বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখাইল।

রাধাও নাক বাঁকাইয়া শ্যামলকে জানাইয়া গেল যে সে তাহার মাকে এই কথা বলিয়া দিবে।

*　　*　　*

পরদিন ভোরে শ্যামলের মা অর্থাৎ ব্রজবালা পূজা আহ্নিক সারিয়া শ্যামলের ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে শ্যামল মনোযোগের সহিত তাহার পড়া পড়িতেছে। তিনি যাইবার আগে শ্যামলকে বলিলেন—শ্যামু আমি যাচ্ছি, আস্‌তে হয়ত রাত হবে, তুই কোথাও যাসনি। আর হাঁ—এবেলা আন্নাপিসিকে তোর জন্যে লুচি বেঁধে দিতে বলেছি।

খানিক পরে শ্যামল আড়চোখে চাহিয়া দেখিল—তাহার মা চলিয়া গিয়াছেন। সে বইগুলি বন্ধ করিয়া উঠিবার উদ্যোগ করিল। তাহার পর আর বিন্দুমাত্র দেরী না করিয়া শ্যামল তাহার দাদার বন্দুকটি কাঁধে করিয়া বাহির হইয়া গেল। নদীর ধারে যাইতে হইলে রাধাদের বাড়ীর সাম্‌নে দিয়া যাইতে হয়। শ্যামল যখন রাধাদের বাড়ীর সামনে আসিল, তখন সে একবার ভাবিল যে রাধাকে ডাকিয়া লইয়া যায়, কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাহার বুকে অভিমানের সুর বাজিতেই সে হন্ হন্ করিয়া হাঁটিতে সুরু করিল। শ্যামলকে যাইতে রাধাও দেখিয়াছিল এবং সেও শ্যামলের পিছু পিছু চলিতে লাগিল। শ্যামল নদীর ধারে পৌঁছাইয়াই যেই নৌকায় উঠিতে যাইবে, অমনি তাহার কানে গেল—"শ্যামলদা দাঁড়াও, আমিও যাব।" শ্যামল পিছু ফিরিয়া দেখে রাধা দৌড়াইতে দৌড়াইতে আসিতেছে। রাধা কাছে আসিলে শ্যামল তাহার হাত ধরিয়া নৌকায় উঠাইতে উঠাইতে বলিল—"আমি জানতাম যে তুই আসবি।"

এমনি করিয়াই ইহাদের মান অভিমানের খেলা সুরু হয়। নৌকা নদীর তীর ছাড়িয়া চলিতে থাকে। মাঝি গান গায়। তাহার গান যে সেই রাধাকৃষ্ণেরই বিরহের গান। শ্যামল চাহিয়া থাকে সুনীল আকাশের পানে। আর রাধা সে যেন গান শুনিয়া আত্মহারা হইয়া যায়। নদীর তীর বাহিয়া উহারা চলিতে থাকে, কোথায় তাহা উহারা জানে না। একটি জায়গায় আসিয়া হঠাৎ শ্যামল দাঁড়াইয়া পড়ে। রাধা চাহিয়া

কৃষ্ণচন্দ্র দে		শ্রীমতী কনক দাস	
P 11869	ঘন অম্বরে মেঘ সঘন / সঘন বন গিরি	P 11872	আর নাইরে বেলা / [illegible]

সুধা বন্দ্যোপাধ্যায়		কুমারী [illegible] রায়	
N 27390	গহন রাতে শ্রাবণ ধারা / বাদল ধারা হ'ল সারা	N 27436	[illegible]

শ্রীমতী বীণা চৌধুরী		সন্তোষ সেনগুপ্ত	
N 27430	বলেছিলে মনে রবে / মোর কুঞ্জে এলো	N 27437	[illegible] / [illegible]

জগন্ময় মিত্র		ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র	
N 27400	যে ফুল আমারে দাও / ভুলে গেছি তব পরিচয়	N 27439	[illegible]

মৃণালকান্তি ঘোষ		ক্ষিতীশ বসু এণ্ড পার্টি	
N 27403	জগৎ জুড়ে জাল / দেখে যারে রুদ্রাণী মা	N 27438	[illegible]

হিজ মাষ্টার্স ভয়েস

শ্রেষ্ঠ শিল্পীবৃন্দ ★ নিখুঁত রেকর্ড

দি গ্রামোফোন কোং লিঃ : দমদম, বোম্বাই, মাদ্রাজ, দিল্লী

VR. 130

বোম্বাই, লাহোর, প্রভৃতি স্থানে যে চিত্র অভূতপূর্ব্ব হর্ষ-বিস্ময়ের সৃষ্টি করিয়াছে

সেই অপূর্ব্ব চিত্রখানি

ওয়াপস্

অবিলম্বে

নিউ সিনেমা, চিত্রা এবং রূপালীতে

প্রদর্শিত হইবে।

ওয়াপস্ সত্য সত্যই বিস্ময়কর এক চিত্র।

দেখে শ্যামলের বন্দুকের নল একজোড়া সুন্দর পাখীকে মারিতে উদ্যত হইয়াছে।

"ওদের মেরো না, শ্যামলদা" বলিয়া রাধা শ্যামলের হাত ধরে, আর সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকের আওয়াজ হয়, গুম্। কিন্তু লক্ষ্য ব্যর্থ হয়। শ্যামল রাধার দিকে চাহিয়া বলে, তোমার জন্য আজ আমার লক্ষ্য ব্যর্থ হ'ল। রাধা কিছু উত্তর দেয় না, দীর মূর্ত্তিতে মাটির দিকে চাহিয়া থাকে। শ্যামল রাধার এরূপ শান্ত মূর্ত্তি সহিতে পারে না, সে রাধার মুখ তুলিয়া ধরিয়া বলিতে থাকে—"রাধা, রাগ করিস্‌নি—উড়ে গেছে ভালই হয়েছে—আমি আর ওই নিরীহ জীবগুলিকে হত্যা করবো না।" রাধার মুখে মুহূর্ত্তের মধ্যে আনন্দের রেশ প্রবাহিত হয়।

এমনি করিয়াই দিন চলিতে থাকে। শ্যামল প্রবেশিকা পরীক্ষায় বেশ ভালভাবেই উত্তীর্ণ হইল। রাধার আর আনন্দ ধরে না। শ্যামলের এক দূর সম্পর্কের মামা হঠাৎ কলিকাতা হইতে আসিয়া হাজির! তিনি শ্যামলদের বাড়ীতে এক সপ্তাহ থাকিবেন। শ্যামল পাশ করিয়াছে শুনিয়া শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন। এবং শ্যামলের তৈরী মাটির মূর্ত্তিগুলি দেখিয়া দ্বিগুণ আনন্দিত হইলেন। তিনি ব্রজবালাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—ব্রজ, শ্যামু ত' পাশ করল, এবার ও কি করবে?

ব্রজবালা বলিলেন—তা তুমি দাদা একটা কিছু ঠিক করে দাও। আমি ত এসব কিছুই বুঝি না।

দাদা ওরফে কিরীটবাবু কিছুক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন—দেখ্ ব্রজ, আমার মতে আর ওকে পড়িয়ে দরকার নেই, তার চেয়ে ও কিছু হাতের কাজ শিখুক। ও যখন মূর্ত্তি গড়তে পারে, আমার মতে ও কলকাতায় গিয়ে আর্ট স্কুলে ভর্ত্তি হলে উন্নতি করতে পারবে।

ব্রজবালা ছেলেকে কলিকাতায় পাঠাইতে হইবে শুনিয়া প্রথমে তেমন কোন গা করিলেন না। কিন্তু তিনি যখন দেখিলেন তাহার ছেলের ইহাতে ইচ্ছা আছে এবং তাহার দাদা উহার খরচ বহন করিতে রাজি আছেন তখন তিনি সম্মত না হইয়া পারিলেন না।

শ্যামলের প্রথমে রাধাকে ছাড়িয়া কলিকাতায় যাইতে ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু পরে সে যখন শুনিল যে কলিকাতায় গেলে মানুষ হইয়া ফিরিবে এবং অর্থ উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হইবে, সে তখন রাজি না হইয়া পারিল না।

শ্যামল এই শুভসংবাদ রাধাকে জানাইবার জন্য তাহাদের বাড়ীর দিকে ছুটিল। সে পৌঁছাইয়া দেখে যে রাধা তাহার পাখী শ্যামুকে ছোলা দিতেছে। এই সংবাদ শুনিয়া রাধা প্রথমে বড় আঘাত পাইয়াছিল, কিন্তু পর মুহূর্ত্তে শ্যামলের মঙ্গলের কথা ভাবিয়া হাসিমুখে বলিল—তুমি মানুষ হয়ে ফিরবে এর চেয়ে আর আনন্দের কি আছে?

শ্যামল উত্তর দেয়—আমি জানতুম রাধা তুমি এতে মত দেবে। প্রত্যেক সপ্তাহে আমি তোমায় চিঠি দেব, তার উত্তর দেবে তো?

—দোব, বলিয়া রাধা মাটির দিকে চাহিয়া থাকে। খানিক পরে সে ফিরিয়া দেখে যে শ্যামল চলিয়া গিয়াছে। পাখীর দিকে চাহিয়া দেখে যে খাঁচার দরজা খোলা এবং পাখীটা খাঁচার উপর বসিয়া আছে। রাধা যেই পাখীকে ধরিতে যাইবে, অমনি পাখীটা উড়িয়া গেল। রাধা চেঁচাইল শ্যামু—শ্যামু,—পাখী উড়িতে উড়িতে তাহার বুলি আওড়াইল—রাধা—রাধা—। রাধা আবার ডাকিল, শ্যামু ফিরে আয়; কিন্তু কেউ উত্তর দিল না—তাহারই প্রতিধ্বনি ফিরিয়া

বছর দেড়েক কাটিয়া গিয়াছে। কালের স্রোতের সঙ্গে শ্যামলেরও অনেকখানি পরিবর্তন হইয়াছে। তাহাকে আমরা দেখিতে পাই আর্ট স্কুলের একটি ঘরে। তুলি হাতে করিয়া তাহার মডেলের গায়ে রং দিতেছে। সে সত্যই আজ প্রশংসার

পাত্র। তাহার কাজে ও তাহার ব্যবহারে স্কুলের শিক্ষক তাহাকে যথেষ্ট স্নেহ করেন। শ্যামলের তৈরী ছবি ও মূর্ত্তি সত্যই চমৎকার। সে যে মূর্ত্তিটিতে finishing touch দিতেছিল সেটি হইল প্রেমময়ী শ্রীরাধার মূর্ত্তি। তাহার তৈরী কয়েকটি মূর্ত্তি ও ছবি শীঘ্রই যে চিত্র-প্রদর্শনী হইবে তাহাতে সে পাঠাইবে। শ্রীরাধার মূর্ত্তিটিও পাঠাইবে বলিয়া সে আজ কয়েকদিন ধরিয়া শেষ করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে।

প্রদর্শনী আরম্ভ হইয়াছে। প্রত্যেক দিন বহু সহস্র নরনারী উহা দেখিতে আসিতেছেন। কত সুন্দর সুন্দর ছবি ও মডেল—যেন চোখ ঝলসাইয়া দেয়। কিন্তু সকলেরই দৃষ্টি পড়ে শ্যামলের তৈরী শ্রীরাধার মূর্ত্তিটির উপর। সকলের মুখে এক কথা।—এ মূর্ত্তিটি যেন জীবন্ত। কেহই উহা হইতে চোখ ফিরাইয়া লইতে পারে না।

তৃতীয় দিনে আসেন রাজা দীনেন্দ্র রায় ও তাঁহার কন্যা রাজকুমারী আলোকময়ী। রাজকুমারীর পছন্দ হয় শ্যামলের তৈরী সব মূর্ত্তিগুলি। তিনি জিদ ধরেন যে ওগুলি সব তিনি কিনিবেন। রাজা দীনেন্দ্রনাথ তাঁর একমাত্র কন্যার আব্দার কোনদিনই অগ্রাহ্য করেন নাই, তাই আজও তিনি সহজেই সম্মত হইলেন। অবিলম্বে শ্যামলকে জানান হইল যে রাজা বাহাদুর ও তাঁহার কন্যা আলোকময়ী শ্যামলের তৈরী সব মূর্ত্তিগুলি কিনিতে চান। শ্যামল ইহা শুনিয়া আনন্দিত হইল, কিন্তু সে শ্রীরাধার মূর্ত্তিটি বিক্রয় করিতে অসম্মতি জানাইল। রাজকন্যাও ছাড়িবার পাত্রী নহেন। তিনি নিজে শ্যামলের সহিত দেখা করিয়া কত অনুনয় বিনয় করিলেন, কিন্তু শ্যামলের দৃঢ় সঙ্কল্প কিছুতেই টলিল না। অবশেষে আলোকময়ী শ্রীরাধার মূর্ত্তিটি বাদে সবই মোট পাঁচ হাজার টাকায় ক্রয় করিলেন।

টাকা পাইয়া শ্যামল আনন্দে আত্মহারা হইয়া গেল। এই শুভসংবাদ জানাইল মাকে ও রাধাকে। সপ্তাহখানেক কাটিয়া যায় কিন্তু কাহারও উত্তর আসে না। এদিকে শ্যামল অধীর হইয়া উঠে। একদিন সকালে সে তার মায়ের চিঠি পায়। তিনি শ্যামলকে আশীর্ব্বাদ দিয়াছেন এবং জানাইয়াছেন যে সকলেই ভাল আছে। হঠাৎ শ্যামলের মুখ বিষণ্ণ হইয়া উঠে—"রাধার বিয়ে"। তাহার মা জানাইয়াছেন যে রাধার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহার মা ও বাবা তাহার বিয়ে কেনারামের সঙ্গে দিয়াছেন। তিনি আরও লিখিয়াছেন তাঁহার একান্ত ইচ্ছা ছিল যে তিনি রাধাকে বৌ করিয়া ঘরে আনিবেন, কিন্তু তাহা আর হইল না। রাধার বাবা স্পষ্ট জানাইয়া দিয়াছেন, যে ছেলে মূর্ত্তি গড়িয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে তার সঙ্গে রাধার বিবাহ দিবেন না। শ্যামল ঠিক করিতে পারে না সে সে কি করিবে। সে ভাবিতে থাকে তাহার ও রাধার ভাগ্যের কথা।

কেনারাম, হ্যাঁ কেনারামের পয়সা আছে, কিন্তু ছেলেটির বয়স হইয়াছে এবং স্বভাব চরিত্রও ভাল নয়। রাধা কতই না কষ্ট পাইতেছে! বিধাতার এমনই কঠোর বিধান। শ্যামল আর ভাবিতে পারে না।

মাসখানেক কাটিয়া গিয়াছে। ব্রজবালা শ্যামলের কোন খবর পান নাই। তিনি একরকম আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া শ্যামলের সংবাদের জন্য ব্যস্ত হইয়া আছেন। একদিন সন্ধ্যায় শ্যামলের চিঠি আসিল যে সে এক অসহায়া হিন্দু বালিকাকে বিবাহ করিয়াছে এবং সামনের মঙ্গলবার সকালে তাহার স্ত্রীকে লইয়া গ্রামে ফিরিবে। ঐ দিনই বৌভাতের সমস্ত আয়োজন করিতে

মাকে লিখিয়াছে। এই শুভ সংবাদটি পড়িয়া ব্রজবালা হাসিবেন কি কাঁদিবেন কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না। তিনি অনতিবিলম্বে সকলকে জানাইলেন যে তাহার ছেলে এক সুন্দরী বৌ লইয়া দেশে ফিরিতেছে।

রাধা আজ মাস খানেক হইল শয্যাশায়ী। তাহার কেবলই মনে পড়ে, শ্যামলকে। কতবার ঘুমের ঘোরে 'শ্যামলদা—শ্যামলদা' বলিয়া চেঁচাইয়া উঠে। ইহার জন্য তাহার স্বামী তাহাকে কতবার গালি দিয়াছে। কিন্তু তবুও রাধা শ্যামলকে তাহার হৃদয় হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারে না। শ্যামলের স্ত্রী লইয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তনের খবর রাধার কানেও পৌছিল।

মঙ্গলবার আসিল। ব্রজবালার আনন্দ আর ধরে না। বাড়ীতে আনন্দের কোলাহল। গাড়ী আসিয়া থামে বাড়ীর সামনে। সকলে শাঁখ বাজাইতে থাকে, গাড়ীর ভিতর হইতে সবার আগে নামে শ্যামল। সে সকলকে অনুরোধ করে সরিয়া যাইতে। কারণ সে কাহাকেও সন্ধ্যার আগে বৌ দেখাইবে না, এমন কি তার মাকেও না। সকলে সরিয়া যায়, শ্যামল তাহার স্ত্রীকে লইয়া বাড়ীর মধ্যে একটি ঘরের ভিতর প্রবেশ করে, এবং দরজা বন্ধ করিয়া দেয়।

রাধা শোনে যে তাহার শ্যামলদা বৌ লইয়া আসিয়াছে। সে আর থাকিতে পারে না, শ্যামলের বৌ দেখিবার জন্য অধীর হইয়া উঠে। কিন্তু তাহার স্বামী তাহাকে স্পষ্টই জানাইয়া দিয়াছেন যে রাধা শ্যামলের বাড়ী গেলে উহাকে তাহার বাড়ী হইতে বিদায় করা হইবে। রাধা আজ আর কাহারও বাধা মানিল না। সে তাহার শ্যামলদা'র বৌ দেখিতে যাইবেই। অতি কষ্টে সে বিছানা হইতে উঠিয়া পড়ে। মনে হয়—মরিতে পারিলে সে বাঁচিয়া যায়; এ জীবন অসহ্য। চোখের সামনে পড়ে একটি শিশি যাহার উপর বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে—বিষ। হ্যাঁ,—এই শিশির ভিতরের জিনিষটি খাইলেই সে বাঁচিয়া যাইবে। রাধা ছুটিয়া যায় আলমারীর কাছে, উহার ভিতর হইতে শিশিটি বাহির করিয়া বিষ মুখে ফেলিয়া দেয়। অট্টহাসি—হ্যাঁ, রাধারই হাসি। সকলে চমকিয়া যায়। মুহূর্ত্তের মধ্যে রাধা ছুটিয়া যায় শ্যামলের বাড়ী।

—শ্যামলদা' তোমার বৌ কই? রাধা হাঁপাইতে হাঁপাইতে জিজ্ঞাসা করে। শ্যামল আশ্চর্য্য হয় রাধার ক্ষীণ মূর্ত্তি দেখিয়া। শ্যামল তেমনই এক দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে রাধার দিকে।

"কথা কইছ না কেন শ্যামলদা? তোমার বৌকে একটিবার দেখাও, দেরী করো না" রাধা চিৎকার করে উঠে।

"রাধা" শ্যামল ডাকে।

"এই বুঝি তোমার বৌ? ঘোমটা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে?"

শ্যামল উত্তর দেয়—"হ্যাঁ"!

রাধা ছুটিয়া যায় শ্যামলের বৌ-এর কাছে, টানিয়া খুলিয়া দেয় তার ঘোমটা। "একি শ্যামলদা এযে মূর্ত্তি!"

"হ্যাঁ—তোমারই মূর্ত্তি", শ্যামল বলিয়া উঠে।

রাধা আর থাকিতে পারে না, মাটিতে পড়িয়া যায়। শ্যামল কাছে আসিয়া রাধার মাথা কোলে তুলিয়া লয়।

রাধা বলে—"শ্যামলদা, আমি চললাম, তুমি বিয়ে করে সুখী হয়ো।"

শ্যামল উত্তর দেয়—"তুমিত যেতে পার না। আমি শুধু তোমার মূর্ত্তি গড়িনি এতে প্রাণও সঞ্চার করেছি।"

রাধা আর কথা বলে না। সে চিরকালের জন্য ঘুমাইয়াছে। কিন্তু রাধার মূর্ত্তিটিত' ঘুমাইতে পারে না, এই রহিল শিল্পী শ্যামলের চির-সান্ত্বনা।

বর্ত্তমান যুদ্ধে চীনা নারী!

—কুমারী বাণীগুপ্তা এম্. এ, বি. টি

সহস্র বৎসর পূর্ব্বের কথা। চীনদেশে তখন তান্ রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত। হোয়া-মু-লান নামে একটি বালিকা পুরুষের ছদ্মবেশে চীনা সৈন্য বিভাগে প্রবেশ করে। আক্রমণকারী দুর্দ্ধর্ষ তাতারদের বিরুদ্ধে সে কঠোর সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করে। সুদীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর অসাধারণ বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করার পর সে সেনানায়কের পদগৌরব অর্জন করে।

বর্ত্তমান চীনা সমরবিভাগে কোনও নারী সেনাপতির অবস্থিতির কথা আমরা জানি না। কিন্তু চীনা নারীরা যে প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছেন তার পরিচয় আমরা প্রতিদিনই পাচ্ছি। বিশেষ ক'রে এঁদের সংযোগ স্থাপিত হয়েছে চীনার গেরিলা বাহিনীর সঙ্গে। এ ছাড়া সহস্র সহস্র চীনা রমণী সেনাবাহিনীকে সাহায্য করছেন নানা উপায়ে।

কিছুদিন আগের কথা। সৈন্যবিভাগে নারীদের প্রবেশ অধিকার স্বীকৃত হয়নি তখনও সরকারী ভাবে। হুনান প্রদেশের একটি মেয়ে—নাম তার কিউলিং। দেশকে রক্ষা করবার দুর্দম বাসনা নিয়ে পুরুষের ছদ্মবেশে সৈন্যদলে সে যোগ দেয়। দীর্ঘ আট বৎসর এইভাবে আপনার সত্য পরিচয় গোপন রেখে সে সৈন্যদলের সাহায্য করে। অবশেষে নানচাং-এর উত্তরে তান্ কুলিং-এর যুদ্ধে ভীষণভাবে আহত হওয়ায় পরে সকলে তার পরিচয় জানতে পারে।

আমেরিকা ও ইংলণ্ডে যথারীতি নারী সাহায্য-বাহিনী গঠিত হয়েছে। চীনদেশে তেমন কোনও প্রতিষ্ঠিত বাহিনী নেই। কিন্তু সে দেশের সমর কর্ত্তৃপক্ষ যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় মেয়েদের সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অবহিত হয়েছেন। তাই তাঁরা নারী স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনীকে স্বীকার করে নিতে সম্মত হয়েছেন। স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে সহস্রবিধ উপায়ে সেনাদলকে সাহায্য করে চলেছে।

সৈন্য বিভাগে নারী ও পুরুষের মধ্যে কোন প্রকার পার্থক্য করা হয় না। বে-সরকারী সৈন্য সাধারণত প্রতিমাসে এক আমেরিকান ডলার উপার্জন করে—নারী সৈন্যও তাই পেয়ে থাকে। পোষাক পরিচ্ছদেও তারা পুরুষ বাহিনী থেকে পৃথক নয়।

গেরিলা বাহিনীতে নারীরা শত্রুর সঙ্গে প্রত্যক্ষ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছেন। এ ছাড়াও ছোট ছোট কতকগুলি নারী সৈন্যবাহিনী

তাঁরা গঠন করেছেন। তাদের মধ্যে যুদ্ধের প্রারম্ভে মাংচাই নারীবাহিনী কর্তৃক গঠিত মরণজয়ী দল বা Dare to Die Corps ও কোয়াংসির গার্লস ইউনিট সমধিক প্রসিদ্ধ। সুচাও ও কুনকুন্ কানের যুদ্ধে এঁরা বিজয়ী হয়েছিলেন।

আমেরিকার গার্ল স্কাউটদের মত চীনা গার্লস গাইডরাও এই যুদ্ধে কম সাহায্য করছে না। বয়স যদিও তাদের বেশী নয় তবুও চীনের আশি হাজার গার্লস গাইডের মধ্যে তিন হাজার গাইড সৈন্যদলের সঙ্গে যোগ দিয়ে শত্রুর সঙ্গে মুখোমুখি যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। কিয়াংসি রণক্ষেত্রে এই গাইড দলের অন্যতম সাহসী যোদ্ধা মিস লি আই আহত হন।

সৈন্যদলে নিযুক্ত চীনা রমণীর বিন্দুমাত্রও বিলাস-বাহুল্য নেই। তাদের তুলনায় আমেরিকার নারী সাহায্যবাহিনীর জীবন যাত্রা যথেষ্ট আড়ম্বরপূর্ণ। সত্যকারের সৈনিকের সুকঠোর জীবনকে চীনা নারী বরণ করে নিয়েছে সানন্দে, স্বেচ্ছায়। বিলাস ও সৌন্দর্যচর্চ্চা বর্জ্জিত সে জীবন।

প্রখর গ্রীষ্মে তাদের নগ্নপদে চলাফেরা করতে হয়। উত্তাপ নিবারণের জন্য তৃণ বা বাঁশের নির্মিত এক প্রকার শিরস্ত্রাণ তারা ব্যবহার করে। পরিধানে থাকে সুতীর সবুজ কোট, ব্লাউজ ও সর্টস।

শীতকালে পায়ে থাকে ঘাসের চটিজুতা, কাপড়ের তৈয়ারী শিরস্ত্রাণ—তাতে মুখেরও কিছুটা আবৃত থাকে। পরিধেয় হ'ল তুলোর পোষাক—ফার কোট। পরিধেয় কোটের বাঁ দিকের বুক পকেটের উপরে চারকোণ বিশিষ্ট—এক টুকরা সাদা কাপড়ের পরে লেখা থাকে সৈনিকের নাম, শ্রেণী ও ক্রমিক সংখ্যা। পোষাকের কলারের সঙ্গে সেলাই করা থাকে সৈন্য বিভাগের পরিচয়-চিহ্ন। সে পরিচয়-চিহ্ন ধাতব পদার্থ কিংবা পুরু কাগজের উপরে অঙ্কিত।

প্রত্যক্ষ যুদ্ধে যাঁরা লিপ্ত নেই তাঁদের জন্য আছে অন্যান্য বহু কাজ। সেবা, প্রাথমিক চিকিৎসা, অপর নারীদের শিক্ষিত করে তোলা, ফ্যাক্টরীর জন্য নারী শ্রমিক সংগ্রহ করা, সাহায্যহীন অক্ষম লোকদের ছোট ছোট অর্থকরী কাজ শিক্ষা দেওয়া। যুদ্ধে নিহত ব্যক্তিদের ও শ্রমিকদের ছোট ছেলেমেয়েদের সুশিক্ষিত করা, সৈন্যদের চিঠি লিখে দেওয়া, বস্ত্রাদি পরিষ্কার করা ও চিকিৎসা বিভাগের অন্যান্য কাজ এই সব নারীবাহিনীর কার্য-তালিকাভুক্ত।

বর্ত্তমান যুদ্ধের পূর্ব পর্য্যন্ত আহত চীনা সৈন্যদলের সাহায্যের বিশেষ কোনও ব্যবস্থা চীনদেশে ছিল না। ১৯৩৯ খৃঃ ম্যাডাম চিয়াং কাইশেকের অনুপ্রেরণায় গঠিত হয়েছে সার্ভিস কোর অফ দি উইমেনস্ অ্যাডভাইসরি কমিটি। এর উদ্যোক্তা হলেন নিউ লাইফ মুভমেণ্ট প্রোমোশন অ্যাসোসিয়েশন। এঁরা আহত সৈনিকদের ন্যায়সঙ্গত অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্ব নিয়েছেন। এদের প্রচেষ্টায় আজ চীন দেশে আহত সৈনিকদের সুখ সুবিধার জন্য অনেক ব্যবস্থাই কার্যকরী হয়ে উঠেছে।

—(ইংরাজী হইতে)

প্রশ্নোত্তর

১নং প্রশ্নের উত্তর

[সকলেই প্রায় লম্বালম্বা চিঠি দিয়াছেন। কেহ কেহ তাঁহাদের মতামতের স্বপক্ষেও বহু যুক্তি-তর্কের অবতারণা করিয়াছেন। বেশী কথা লিখিলেই বা বেশী কথা বলিলেই যে বেশী পাণ্ডিত্য প্রকাশ হয়, এইরূপ অনেকের ধারণা আছে। কিন্তু উত্তরগুলি দেখিয়াও কি ভগিনীরা, কি ভাবে উত্তর দেওয়া প্রয়োজন বুঝেন না?

এমন একটি যুগোপযোগী প্রশ্নের বিরুদ্ধেও কেহ কেহ তর্ক তুলিয়াছেন। ইঁহাদের বুদ্ধির তারিফ আমরা করি না। আমরা নারী-প্রগতি, নারী-স্বাধীনতা প্রভৃতি নানা-বিধ গালভরা বুলি আওড়াই, কিন্তু তাঁহাদের চিন্তায় স্বাধীনতা ও তাহা প্রকাশ করিবার মত সৎসাহস কই?—পরি : না : লো :]

স, পা, বরানগর : ব্যারিষ্টার স্বামী আমার পছন্দ।

কু, খা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া : স্বামী চাই দেশসেবক, যিনি দেশের ও দশের জন্য নির্য্যাতন সহিতে প্রস্তুত।

অ : ম, চট্টগ্রাম : ইস্কুল মাষ্টার বা কেরাণী স্বামী যেন না হয়।

গী : মু, ময়মনসিং : স্বামী লেখাপড়ায়, খেলাধূলায় এবং প্রগতিতে ভাল হওয়া চাই।

চন্দ্রা, শ্যামবাজার : আর কিছু থাকুক, বা না থাকুক, স্বামীর চেহারা ও টাকা থাকা চাই।

অ : হা, কালীঘাট : অর্থ চাই না, চাই স্বামীর স্বাস্থ্য, চরিত্র ও শিক্ষা।

সোনা, ইটালী, কলি : মানুষ হইয়াও যিনি দেবতার মত; গরীব হইয়াও যিনি মহাধনবান, মূর্খ হইয়াও মহাপণ্ডিত এবং কুৎসিত কদাকার হইয়াও চির শাশ্বত সুন্দর [কিছু বোঝা গেল না—পরি : না : লো :]

পুরী, বর্দ্ধমান : যা চাওয়া যায়, ত যখন পাওয়া যায় না, তখন যা সব সে আছে তাই আমার কল্পনা। তারপর ত' আছেই

ক : ব, ধানবাদ : বেশী বড় কিছু কল্পনা করি নি, কারণ তা আমাদের সাধ্যাতীত মোটামুটি গৃহস্থঘর, ঘরে ভাতকাপড় থাকবে লেখাপড়া জানবে, চাকুরী বাকুরী করবে এই আর কি!

২নং প্রশ্নের উত্তর

গৌ : চ, জামালপুর (মুঙ্গের) বিবা করিয়া সংসার পালনই আমার ইচ্ছা।

চ, চ, মাণিকতলা, কলি : ঐ

প, ভ, পাটনা : ঐ

ন, ক, মধুপুর : স্বাধীনভাবে থাকিে চাই।

মধু, পার্কসার্কাস, কলি : মনোমত স্বা না পাইলে বিবাহ করা উচিত নয়।

অ, মু, বরিশাল : বিবাহ সেকেলে বিবাহ কোনদিনই সুখের হয় না।

দৌ, বাঁকুড়া : বিবাহে মেয়েদের মত প্রধান হওয়া চাই। তা যদি হয়, আমি বি করব, নচেৎ নয়।

মে, হ, কুমিল্লা : স্বাধীনভাবে থাক পারলে ভালই। আমার ইচ্ছা তাই।

চু, মি, মেদিনীপুর : বিবাহ নি করিব।

ক, ব, কলি : বিবাহ না করিলে শে পস্তাইতে হইবে। অতএব বিবাহ কর আমার ইচ্ছা।

মি, সে, শান্তিপুর : যাহারা বিব করিব না বলে, তাহারা ঠিক বলে ন বিবাহ মেয়েদের ধর্ম্ম ও আশ্রয়।

খু : গু, নাগপুর : বিবাহ করাই ইচ্ছ

চ, মি, রাঁচী : আমি স্বাধীন ভা থাকিয়া দেশ সেবা করিব।

বিজনদা'র চিঠি

আমার আদুরে ভাই-বোনেরা,

আমাদের আসরের এক প্রিয় ভাই শ্রীমান ওয়াহেদ খান চৌধুরীকে (৬১০) তোমরা

সকলেই জান। শুধু সে আমাদেরই প্রিয় ছিল না, নাটোরের (রাজসাহী) সাহিত্য-রসিক গুণীসমাজের কাছে তার একটা বিশেষ স্থান ছিল। এত অল্প বয়সে নিজ চরিত্রমাধুর্য্যে সরলতায় ও অমায়িক ব্যবহারে সেখানকার ছোট বড় সকলের হৃদয় সে জয় করেছিল। ভাইটী ছিল ওখানকার "পল্লব" পত্রিকার সহকারী সম্পাদক। এমন এক গুণী ভাইকে আজ আমরা হারিয়ে যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি। এর সম্বন্ধে আজ আর কিছু বলার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। তবে ওর পরিচয়ে এইটুকু বল্লেই যথেষ্ট হবে যে, আমাদের এই আসরের আকাশের একটী তারা খসে গেল। ...আমাদের এই প্রিয় ভাইটীর আত্মা অক্ষয় শান্তি লাভ করুক এ ছাড়া আজ আমাদের কোন বড় প্রার্থনা ভগবানের কাছে জানাবার নেই। তোমাদের: বিজনদা

রানু আর ত'ার দাদা

—রূপকুমার

দাদা,

তুমি তো বেশ বলে চলে গেলে কিন্তু আমার অবস্থাটা কি ভীষণ যে হয়ে দাঁড়িয়েছে তা তুমি কল্পনাই করতে পারবে না। মা তো সব সময়ই রেগে আছেন আমার ওপর। দিনের মধ্যে প্রায় ছ'শোবার সেই এক কথা মা আমায় শোনায়: খিঙ্গি মেয়ের লেখা পড়া এতো কিসের? পুরুষ মানুষের মত চাকরী করবি না কি? গেরস্থ ঘরের মেয়ে সংসারের কাজ শেখ, বুঝলি?... এই তো সেদিন মাকে লুকিয়ে লুকিয়ে খাওয়ার পর বই নিয়ে ছাদের ওপর বসে সবে পড়ার বইখানা পড়বো বলে খুলেছি, ওমনি মা কোথা থেকে চিলের মত ছোঁ মেরে আমার বইখানা নিজের হাতে তুলে নিয়ে বল্লেন: এখুনি আমি বইখানা উনুনের আগুনে দিয়ে আসিগে। এ আপদের 'তা' হলে শান্তি হয়।...যাই হোক, বহু কষ্টে মাকে সেবারের মত বুঝিয়ে বইখানা ফিরৎ পেয়েছি, কারণ অজুহাতটা দেখিয়েছি যে ঐ বইখানা তুমি আমায় কিনে দিয়েছ বলে। তবে সর্ত্ত হয়েছে যে, যেন আর আমি কোন দিন বই নিয়ে না বসি।... ...গতকাল হঠাৎ মনে একটা প্রশ্নের উদয় হ'লো রান্না-ঘরে বসে মায়ের সঙ্গে কাজ করতে করতে। কাজ সেরে যেই কাকাবাবুর কাছে গিয়ে বসে সবে প্রশ্নটি করেছি: আচ্ছা কাকাবাবু, আমরা এই যে পৃথিবীতে বাস করি এ পৃথিবী এলো কোথা থেকে?...কাকাবাবু আমার প্রশ্নের উত্তর যেই দিতে যাবেন, ওমনি রান্নাঘর থেকে মায়ের ডাক এলো: কৈ রে রাণু, কোথায় গেলি? তোর কাকাবাবুর জলখাবারের ময়দাটা মেখে দিয়ে যা।...ব্যাস্, হয়ে গেল। এমনি আমার অবস্থা! কাকাবাবু অফিস থেকে যখন খেটে খুটে বাড়ী ফেরেন তখন তাঁর শরীর ক্লান্তিতে ভরে ওঠে, তাই আর বিরক্ত করি না তাঁকে।...এখন কি করি বলতো? এমনি করে মনের মধ্যে প্রশ্নগুলো কি গুমরে মরবে? —তোমার বোন রাণু

মনে রেখো

"জীবে দয়া করে যেই জন
সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।"
—স্বামী বিবেকানন্দ

একটি দিনের ডায়েরী

—শ্রীসুহাসকুমার দাস (৯৪৯)

—ছোড়দা! ও ছোড়দা!! বলি এখনও কি তোমার ঘুম ভাঙ্গলো না।···আমরা সেই কোন সকালে উঠেছি আর তুমি কিনা এখনও শুয়ে শুয়ে নাক ডাকাচ্ছো কেমন?—কখন উঠবে শুনি?

মনে ভাবলাম বলি—যা উঠবো না। একটুখানি ঘুমিয়েছি অমনি কানের কাছে এসে যত সব গোলমাল···গলায় যেন একেবারে সানাই বাজছে? আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে ও আবার আরম্ভ করলো: কিগো এখনও উঠলে না যে বড়,—বলবো দাদাকে?

—না: এ জ্বালালে দেখছি, একটা লেপও ছাই নেই, কী দিয়ে যে মুড়ি দি? কিন্তু মুড়ি আর দিতে হল না। পাশের ঘর থেকে দাদা বেরিয়ে এসে বললেন, কিরে, পরীক্ষা দিয়ে তুই কি একেবারে পীর হয়ে গেছিস নাকি?···কত বেলা হয়ে গেছে উঠে দেখ দিকিনি একবার?···এত বেলায় বাজার গেলে কিছু কি আর পাওয়া যাবে? এই এখানে টাকা রেখে গেলাম, বাজার থেকে আসবার সময় 'পাল ফার্মেসী' থেকে মেজদার ওষুধটা নিয়ে আসিস, বুঝলি?

না—আর উপায় নেই, কোনরকমে রাগে গজ্ গজ্ করতে করতে উঠে পড়লাম। মনে মনেই বল্লাম, না বুঝে আর উপায় কি··· বেশ হাড়ে হাড়েই বুঝছি। যত সব আমার ওপর দিয়েই। পরীক্ষা দিয়ে একদণ্ড জিরোবার উপায় নেই। আর দোষই বা দেবো কাকে? সবই ভাগ্য। দু'দিন হল আমার পরীক্ষার মধ্যে—'ট্রেণ এক্সিডেন্টে' মেজদার হাতটাও 'ফ্র্যাকচার' হয়ে গেল ছাই। এতদিন কষ্ট করে পরীক্ষা দেবার পর ভেবেছিলাম—বেশ ক'দিন আরামে ঘুরে বেড়াবো, কিন্তু তা আর হল কই?···দাদাকে দিয়ে কী আর বাজার করা চলে? এক পয়সার জিনিষ কিনতে গিয়ে আধপয়সা লোকসান করে বসবে—কেবল টাকা দিয়েই খালাস। মেজদা ভাল থাকলে আমার এসবের বেশ একটু সুবিধে হ'ত, কিন্তু ভগবান বিরূপ।

কথাগুলো ভাবতে ভাবতে বিছানা থেকে নেমে পড়লাম, দেখি অনেক বেলা হয়ে গেছে!···একেবারে আটটা!! না: আর এক মিনিটও নয়। সাড়ে আটটায় লাইব্রেরী বন্ধ হবে—কাল আবার বেস্পতিবারের পুরো বন্ধ। বইটা আজ বদলাতেই হবে—উঃ, একেবারে পনেরো দিন বদলানো হয়নি। না, সুধীরদার হাত থেকে আর বাঁচা গেল না দেখছি। এমনিতেই যে তিরিক্ষী মেজাজ—একদিনের জায়গায় দুদিন হলেই চটে আগুন, তার ওপর আবার একেবারে একসঙ্গে পনেরো দিন।

তাড়াতাড়ি মুখ ধুয়েই বাজারের থলি আর লাইব্রেরীর বইটা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। অন্যদিনে চা, জলখাবার খেয়ে তবে বেরুই, কিন্তু আজ আর খাওয়া হলো না,—খেতে গেলে ওদিকে আবার অনেক ঝঞ্ঝাট, লাইব্রেরী বন্ধ হবে, মাছও পাওয়া যাবে না।

আমাকে চা না খেয়ে বেরুতে দেখেই দিদি জিজ্ঞাসা করলো: কিরে চা খেয়ে যাবি না? মনে মনে ভাবলাম এই সুযোগ। রাগটা খাওয়ার ওপরই মানায় ভাল। তাড়াতাড়ি মুখটা আর একটু গোমড়া করে বল্লুম: না খাব না'। আমার কথা শুনে দিদি এবার মার কাছে নালিশ জানাল। চলে যেতে যেতে শুনতে পেলাম, মা বলছেন—তা ওর রাগ করবারই তো কথা বাপু;—ওই কি যত চোর-দায়ে ধরা পড়েছে? প্রমোদটা একেবারে দিন দিন যেন কি হয়ে যাচ্ছে? কেবল টাকা দিয়েই খালাস—কেন একদিন কি আর বাজারটা করতে নেই?

মার কথা শুনে বুকটা প্রায় দশহাত হয়ে গিয়েছিল—আর এরকম কথা শুনলে কারই বা না হয়?

বাড়ীর মোড়টা ঘুরতে যাবো এমন সময় ছোট বোন শিউলির আবার সেই ডাক: ছোড়দা—একটা মোটা দেখে বাঁধানো ভারতবর্ষ আনিস। আমি মনে মনে বললাম যে যার তালে আছে। কোথায় কোনরকমে ফাঁকে ফুঁকে একখানা বই বদলে নেবো না একেবারে মোটা ভারতবর্ষ। চাইলে কী আর রক্ষা আছে? একসঙ্গে অনেক কথা শুনিয়ে দেবে'খন।

অভ্যেস থাকা সত্ত্বেও 'বাজার করার' হাজার ঠেলা—বেশ ভাল ভাবেই অনুভব করলাম। মাসখানেক মাত্র বাজার করিনি, এর মধ্যেই জিনিষ পত্রের দাম যে এত বদলে গেছে তা কল্পনাও করতে পারিনি।··· দু'আনার আলু ছ'আনা···চার পয়সার বেগুন চার আনা, আর মাছের তো কথাই নেই—সব যেন একেবারে আগুন। অন্য সময়ে বাজার করার মধ্যে বেশ লাভ ছিল। দু'চার আনা পয়সা প্রায় বেঁচে যেতো, কিন্তু আজ হল ঠিক তার উল্টো—পকেট থেকে বেশ ক'আনা পয়সা বেশী খরচ হয়ে গেল।

বরাতে দুঃখ থাকলে কী আর রক্ষে আছে? পাল ফার্মেসীতে ওষুধ নেই। আনতে হবে কোলকাতা থেকে—না, আর পারা গেল না দেখছি।

রাগ ক'রে আর কতক্ষণ থাকা যায়,—বাড়ীতে গিয়ে কিছু খেয়ে নিয়েই ছুটলাম ষ্টেশনে। ন'টা ক'তর ট্রেণ—সিগনাল দিয়ে দিয়েছে।

···ওষুধ নিয়ে বাড়ী ফিরেছিলাম অনেক বেলায়—তারপর খাওয়া দাওয়া শেষে বেশ একটু ঘুমিয়েছিলাম—উঠে দেখি প্রায় সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। আরে যাঃ। আজ যে আবার রেশন আনার দিন—না আর পারা গেল না দেখছি। কোথায় ভাবলাম আজ একটু লেকের দিকে বেরিয়ে আসবো—না, মাঝখান থেকে সমস্ত বিকেলটাই মাটী হয়ে গেল। রেশন আনা কি আর দু'এক মিনিটের কাজ?

দোকান থেকে বাড়ী ফেরার পর গেলাম গৌরদের বাড়ী। গৌর আমারই বন্ধু। ক'দিন ধরে ম্যালেরিয়ায় ভুগছে। এতদিন পরীক্ষার হেপাজতে ওর কাছে যেতে পারিনি। ওর অসুখের কথা শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেল। অসুখ বিসুখগুলো একেবারে বিশ্রী। রোগ যেন ওকে ধরেই আছে—কিন্তু ওরই বা দোষ কি? এই বয়সেই চাকুরিতে ঢুকেছে। পড়ার ভাবনার জায়গায় ভাবতে হয় ওকে চাল, ডাল, আটা, ময়দার কথা। এছাড়া ওভার-টাইম রাত ডিউটিও আছে—এতে কি আর স্বাস্থ্য থাকে?

ওর কাছ থেকে বাড়ীতে ফিরতেই শুনলাম—ভেতরের ঘরে বেশ একটু হৈ-হল্লা চলছে, ব্যাপার কী? আমার গলা পেয়েই শিউলি ছুটে এসে বল্লো: ছোড়দা শুনেছিস? মন্তুদা এইমাত্র বলে গেল দীপালীতে এবার আমার 'এর শেষ কোথায়' উঠেছে—আমি বল্লাম: তাই নাকি? খানিকটা আনন্দ হল—ঈর্ষাও যে খানিকটা হ'ল না এমন নয়। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলুম, আর দেরী নয়—আমায় একটা অংশ বার করতেই হবে।

খাওয়া দাওয়া সেরে বসে গেলাম কাগজ কলম নিয়ে—কিন্তু বিপদ—প্লট আর মাথায় আসে না। অনেক ভেবে একটা ঠিক করলুম, কলম ধরে লিখতে যাবো এমন সময় দাদা বাড়ীতে ফিরেই লাফিয়ে উঠলেন: এইরে! আমি বল্লাম: কি হ'ল?
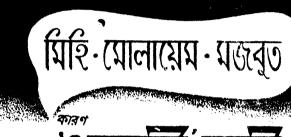
—যা, একদম ভুলে গেছি আজ সাত

'প্রভাতী' শাড়ী

মিশরী তুলা হইতে কাটা সূক্ষ্ম সুতায় প্রস্তুত এবং প্রত্যেকটি সুতা আবার মাড় দিয়া পাকান • রং এবং ঢং-এর অদ্ভুত-পূর্ব্ব সমাবেশ কেবলমাত্র "প্রভাতী"-শাড়ীতেই আছে।

প্রভাতীর বিভিন্নবর্ণের জর্জ্জেট, ক্রেপ্ ও গরদ
সুন্দর অথচ সস্তা

দি সিল্কটন লিঃ

৪ নং গণেশ চন্দ্র এভিনিউ (পাইকারী)

- ১৪০-সি, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট (হাতিবাগান মার্কেট)
- ৫৭-১ই, কলেজ ষ্ট্রীট (কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট)
- ৭০ নং আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড (জগুবাবুর বাজার)

ডালিয়া টেলারিং কোং লিঃ - ২৭৫ বৌবাজার ষ্ট্রীট (লালবাজারের কাছে)

তারিখ, টিকিট কাটাতে ভুলে গেছি রে—যা ভাই একটু কষ্ট ক'রে, কেটে এনে দে, নইলে ডিপোজিটটা একেবারে মাঠে মারা যাবে।

বাধ্য হয়েই উঠে পড়লাম। তারপর কোন রকম করে দু'ঘণ্টা বাদে টিকিট কেটে নিয়ে যখন বাড়ী ফিরলাম তখন পাড়া নিশুতি হয়ে পড়েছে, আমাদের বাড়ীরও প্রায় সকলেই শুয়ে পড়েছে। আলোটা নিভিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়লাম। কিছুক্ষণ আগে বীরুর ভাগ্য গণনা করছিলাম কিন্তু এখন আমার মন বুঝি আমারটাই গুণে দেখতে চায়। *

* ২৭নং প্রতিযোগিতার ১ম পুরস্কার প্রাপ্ত রচনা।

সব সত্যি

শ্রীনির্ম্মলকুমার রায় (১০৯২)

১৮৯৩ সাল। ব্রেজিলে বিপ্লব দেখা দিয়েছে, নৌসেনারা বিদ্রোহ করেছে। সাধারণতন্ত্রের সেনারা বিদ্রোহীদের দমন করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল। তুমুল যুদ্ধ সুরু হল, বিদ্রোহীরা রাজধানী দখল করতে না পেরে একটা ছোট শহর দখল করবার জন্য কামান ছুঁড়তে লাগল। নগর রক্ষীরা কিছুতেই এই আক্রমণ প্রতিহত করতে পারল না। বিদ্রোহীরা তাদের চেয়ে সংখ্যায় দ্বিগুণ, অস্ত্রসস্ত্রেও তাহারা সুসজ্জিত, সুতরাং নগর রক্ষা করা অসম্ভব দেখে রক্ষীদলের সেনাপতি শেষ চেষ্টা করবার জন্য চীৎকার করে বলে উঠলেন, "এখানে এমন কেউ কি আছে যে মাত্র পঞ্চাশজন সৈন্য নিয়ে বিদ্রোহীদের আক্রমণ করতে পারে?" এর উত্তরে এগিয়ে এল শুধু একজন অপরিচিত সৈনিক, মাত্র পঞ্চাশ জন সৈন্য নিয়ে সে বিদ্রোহীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তাদের মধ্যে কেউ হল আহত, কেউ হল নিহত। কিন্তু অবশেষে তারা বিদ্রোহীদের কামান অধিকার করে ফেলল। যুদ্ধের মোড় সে ঘুরিয়ে দিল। কিছুদিনের মধ্যেই বিদ্রোহ দমন করা হল। এই অপরিচিত সাহসী সৈনিকটি কে জান? —বঙ্গের বীর সন্তান কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাস।

নতুন প্রতিযোগিতা

এবারে তোমাদের সম্পূর্ণ নতুন ধরণের প্রতিযোগিতা দেওয়ার কথা ছিলো। কিন্তু কোনো অনিবার্য্য কারণ বশতঃ এবারে দিতে পারলুম না বলে যেন তোমরা আমায় ওপর রাগ করো না। আসছে বারে প্রতিযোগিতা নিশ্চয়ই যাবে।

খেলার মাঠে

শ্রীউমেশ মল্লিক বি, এ

সংবাদে প্রকাশ যে ইণ্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়েশনের এক অধিবেশনে এ বৎসরের ফুটবল লীগের "রিটার্ণ" ম্যাচগুলি অনুষ্ঠিত না হওয়া সম্পর্কে এক আলোচনা হয়েছে। এ বিষয়ে এখনও কোন চূড়ান্ত মীমাংসা না হলেও পরের অধিবেশনে বিশেষভাবে আলোচনা হওয়ার সম্ভাবনা আছে। কলিকাতা ফুটবল লীগের খেলায় "রিটার্ণ" গেমগুলি বাদ দিলে উত্তেজনা এবং উৎকণ্ঠার অভাব যে কলিকাতার ফুটবল খেলার মাঠে অনুভূত হবে তা বলাই বাহুল্য। এ বৎসরের ফুটবল খেলায় কাষ্টমস দল প্রতিযোগিতা করবে না বলে বিশেষ সুত্রে প্রকাশ। কাষ্টমসের পরিবর্ত্তে গত বৎসর যে সামরিক দলটি পাওয়ার লীগে শীর্ষস্থান অধিকার করেছিল সেই দলটিপ্রথম বিভাগীয় দলে প্রতিযোগিতা করবে। কয়েক বৎসর থেকে সামরিক দলের উন্নত স্তরের খেলার অভাবে কলিকাতা ফুটবল লীগে যথেষ্ট প্রতিযোগিতা-মূলক খেলার অভাব দেখা যাচ্ছিল। এই সামরিক দলটি পাওয়ার লীগে যে সাফল্যের পরিচয় দেয় তাতে এ বৎসরের খেলায় প্রথম বিভাগে যে তুলনামূলক খেলা দেখা যাবে সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই।

*   *   *

গত শনিবারের হকি খেলায় পোর্ট কমিশনার দল রেঞ্জার্স দলকে ৩—৬ গোলে পরাজিত করায় তাদের নির্দ্ধারিত খেলাগুলি শেষ করেছে। পোর্ট দল এবৎসরও প্রথম বিভাগীয় লীগে শীর্ষস্থান অধিকার করেছে। ইষ্ট বেঙ্গল দলের সঙ্গে মহামেডান দলের খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হওয়ায় পোর্ট কমিশনার থেকে ই, বি, দলের এক পয়েন্ট কম হল। যদি মহামেডান দলের সঙ্গে জিততে পারত তবে গোল সংখ্যার অনুপাতে ই, বি, দলই লীগ বিজেতা হ'ত।

প্রথম বিভাগীয় লীগ টেব্‌ল্

	খেলা	জ	ড্র	পরা	স্ব	বি	প
পোর্ট কমিঃ	১৬	১৩	৩	০	৪৯	৮	২৯
ইঃ বিঃ	১৬	১২	৪	০	২২	১	২৮
রেঞ্জারস্	১৬	১১	২	৩	৩২	১৭	২৪
মহঃ স্পোর্টিং	১৬	৮	৭	১	২৯	১১	২৩
বি-জি-প্রেস	১৫	৮	৩	৪	২২	১৫	১৯
মিলিঃ মেডিঃ	১৬	৭	৫	৪	২০	১৩	১৯
মোহনবাগান	১৬	৭	৫	৪	২৩	১৭	১৯
পুলিশ	১৬	৭	৫	৪	২৮	২১	১৯
গ্রীয়ার	১৬	৫	৪	৭	১৭	১৯	১৪

ইত্যাদি

বহু প্রশংসিত বাইটন কাপের খেলা এ বৎসরে গত শুক্রবার থেকে আরম্ভ হয়েছে। এ বৎসরে প্রতিযোগীর সংখ্যা মাত্র ২৭ জন। আলীগড় প্যান্থারস শেষ মুহূর্ত্তে প্রতিযোগিতা থেকে বিরত হওয়ায় তার পরিবর্ত্তে জামালপুর দলকে যোগদান করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

গত শুক্রবার স্থানীয় গ্রীয়ার দল তাল-তলাকে ৪—১ গোলে এবং বি এন আর পাঞ্জাব স্পোর্টস্‌কে ৫—০ গোলে পরাজিত করেছে।

শনিবার মহমেডান স্পোঃ ক্যালকাটা দলকে ৫—১ গোলে পরাভূত করেছে। সোমবার রেঞ্জার্স দল ভবানীপুরকে ৩—০, মিলিটারী মেডিক্যাল লিলুয়াকে ২—০ গোলে পরাজিত করে। এদিনের খেলায় আর্ম্মেনিয়ান্‌স এবং খড়্গপুরের খেলাটি গোলশূন্য অমীমাংসিত ভাবে সমাপ্ত হয়।

*

মহমেডান স্পোঃ ক্লাবের শিরাজীর অশিষ্ট আচরণের জন্য পোর্ট কমিশনার বনাম মহমেডান স্পোঃ খেলায় রেফারী এই খেলোয়াড়টিকে মাঠ থেকে বহিষ্কৃত করে দেন। প্রকাশ যে উক্ত খেলোয়াড়টি রেফারী স্কটকে অযথা গালি বর্ষণ করে। প্রাদেশিক প্রতিষ্ঠান এবং স্কটের নিকট ব্যক্তিগত ভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করায় শিরাজীকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে।

নানাকথা

নববর্ষ সম্ভাষণ

সহস্র সুখদুঃখের স্মৃতি বিজড়িত ১৩৫০ সাল কালের অনন্ত প্রবাহে সামান্য বুদ্বুদের মতই লীন হইয়া গেল। আবার আসিল নূতন বৎসর, আমরা তাঁহাকে অভিনন্দন জানাই। এই নববর্ষের শুভ সম্ভাষণ জানাইয়া যাঁহারা আমাদের স্মরণ করিয়াছেন তাঁহাদের আমরা আন্তরিক প্রত্যাভিবাদন জানাই। বিশেষ করিয়া শ্রীসুহৃদকুমার রুদ্র (কমার্শিয়াল টাইপ ফাউণ্ড্রী), রূপালয়, (মাণিকতলা বাজার), ননীগোপাল দাঁ এণ্ড ব্রাদার্স (চীনাবাজার), নীলফামারী টাউন ক্লাব (নীলফামারী) এর নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। ইঁহাদিগকেও আমরা আন্তরিক শুভ সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিতেছি।

রবীন্দ্র পরিষদ (চুঁচুড়া)

গত ৩১শে চৈত্র (১৩ই এপ্রিল) অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় রবীন্দ্র পরিষদ কর্ত্তৃক সুকবি শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পৌরহিত্যে বর্ষশেষ উপলক্ষ্যে বহু শিল্পীগণ কর্ত্তৃক কণ্ঠ-সংগীত, নৃত্য ও বাদ্য, রবীন্দ্র সঙ্গীতে 'ঋতু বন্দনা' এবং গোপী রায় রচিত "অধিকার" নামক নাটক অভিনীত হয়।

বাঁটরা পারিজাত সমাজ (হাওড়া)

গত ৩রা বৈশাখ রবিবার, কানাইলাল পাচালের আহ্বানে ৪৮ কালি প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় লেনস্থ শ্রীভূতনাথ পাচালের গৃহে উক্ত সমাজের নববর্ষ মিলন বৈঠক সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত জ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করেন। প্রথমে 'আনন্দবাজার' সম্পাদক প্রফুল্লকুমার সরকারের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হয়। তৎপরে নববর্ষ সম্বন্ধে বক্তৃতাদি হয়। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দাস, নরেন্দ্র নাথ বসু, শৈলকুমার মুখোপাধ্যায়, সুকবি বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ও সভাপতি মহাশয় বক্তৃতা করেন। তারপর কয়েকটি গান ও ৺সত্যেন্দ্র দত্তের "আমরা" এবং বসন্ত কুমারের "কর্ণ" নামক কবিতা দুটি আবৃত্তি করা হয়।

"মীরাবাঈ" গীতাভিনয়

গত ২রা বৈশাখ শনিবার সন্ধ্যায় শ্যামপুকুর ক্লাব কর্ত্তৃক সরস্বতী বিদ্যালয়ে কলিকাতা কর্পোরেশনের পৌর প্রতিনিধিদের অভিনন্দন উপলক্ষে শ্রীগুরু বালিকাসঙ্ঘ কর্ত্তৃক "মীরাবাঈ" গীতাভিনয় হয়। রাণাকুম্ভ, মীরা, লালবাঈ, পূজারী ও শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকায় যথাক্রমে গীতা শীল, অঞ্জলী সেন, নমিতা রায়, ছবি সেন উচ্চাঙ্গের সঙ্গীতে ও সংযত অভিনয়ে সকলকে মুগ্ধ করেন। ভানু সিংহ, ও নাগরিকের স্ত্রীর ভূমিকায় যথাক্রমে বাসন্তী শীল ও পূরবী করের অভিনয় প্রশংসনীয়। বাদাম ও পেস্তা স্বভাবসুলভ সাঁওতালি নৃত্যে সাধারণের নিকট যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করেন। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক বালিকাদের রৌপ্য-পদক এবং সঙ্ঘকে একটি রৌপ্যকাপ উপহার দেওয়া হয়। শ্রীযুক্ত আদিত্য নারায়ণ সিংহ সঙ্ঘ সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দেন। মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত রূপেন্দ্রকুমার মিত্র মহাশয় এবং পৌর সভার প্রতিনিধিগণ নাটকের শেষ পর্য্যন্ত উপস্থিত ছিলেন।

"সংগ্রাম ও শান্তি" নাট্যাভিনয়

গত ৮ই এপ্রিল শরশুনা (বেহালা) বাণী নাট্য-পীঠ কর্ত্তৃক শ্রী শচীন সেনের বিখ্যাত নাটক "সংগ্রাম ও শান্তি" সাফল্যের সহিত অভিনীত হইয়া গিয়াছে।

নাটমণ্ডপ

শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্সের বহু প্রতীক্ষিত বাণী-চিত্র "মাটির ঘর" আগামী ২৯শে এপ্রিল উত্তরায় মুক্তিলাভ করিবে বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। রসঘন করুণ এই নাটকখানি পরিচালনা করিয়াছেন হরিচরণ ভঞ্জ এবং ইহার সঙ্গীত পরিচালনা করিয়াছেন শচীন দেব বর্ম্মণ। অভিনেতৃদের মধ্যে সকলেই প্রথিতযশা—যথা অহীন্দ্র চৌধুরী, ছবি বিশ্বাস, মলিনা, পদ্মা, জ্যোৎস্না গুপ্তা, জহর গাঙ্গুলী, রতীন বন্দ্যো, তুলসী লাহিড়ী, রণজিৎ রায়, ইন্দু মুখোঃ, সুশীল রায় প্রভৃতি। এম্পায়ার টকী ডিষ্ট্রিবিউটার্স ইহার পরিবেশক।

* * * *

নিউ সেঞ্চুরী প্রোডাকশানের "প্রতিকারে"র শূটিং ছবি বিশ্বাসের পরিচালনায় দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। ইহাতে অভিনয় করিতেছেন বিশ্বাস মহাশয় নিজে, জীবেন বসু, শৈলেন চৌধুরী, শ্যাম লাহা, রেণুকা রায়, বন্দনা দেবী, ফণী বর্ম্মা, রেবা বসু প্রভৃতি। কুমার শচীন দেব বর্ম্মন সঙ্গীত পরিচালনা করিতেছেন।

* * * *

বেঙ্গল ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স নামে আর একটি চিত্র পরিবেশক প্রতিষ্ঠান জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ইহাদের কার্য্যালয় ৭২ ক্যানিং ষ্ট্রীট। ইহারা সানরাইজ পিকচার্সের "মা-বাপ" এবং সিলভার ফিল্মসের "বড়ে নবাব সাহেব" বাংলাদেশের জন্য পরিবেশন স্বত্ব পাইয়াছেন। আমরা ইহাদের সর্ব্বাঙ্গীন শুভ কামনা করি।

* * * *

গত সোমবার ১৭ই এপ্রিল সকাল সাড়ে দশটায় এলিট সিনেমায় ইউনাইটেড আর্টিষ্টস কর্পোরেশানের রজত-জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে একটি প্রীতি সম্মিলনীর আয়োজন করা হয়। এলিট সিনেমার ম্যানেজার মিঃ ভুরি এই অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন। তৎপরে "দীপালী"র প্রধান সম্পাদক সুকবি শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ইউনাইটেড আর্টিষ্টের ক্রমবিকাশের ইতিহাস স্বল্প কথায় বিবৃত করিয়া একটি সুন্দর বক্তৃতা দেন। তৎপরে ইংরাজী দীপালীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর, মিঃ হার্টলি (ইউনাইটেড আর্টিষ্টের কলিকাতার ম্যানেজার) বক্তৃতা করেন। তারপরে সকলকে জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়।

এই অনুষ্ঠানের পর ইউনাইটেড আর্টিষ্টেরই ছবি "Hello Beautiful" দেখানো হয়। ইহাতে জর্জ্জ মারফি, অ্যান শার্লি, ক্যারল ল্যান্ডিস অভিনয় করেন। ছবিখানি আগামী কল্য হইতে এলিট সিনেমায় যথারীতি প্রদর্শিত হইবে।

১৯৪৩ সালে ভারতীয় ও অ-ভারতীয় ছবির জনপ্রিয়তা

ভারতীয় চিত্র-সাংবাদিক সংঘের সভাবৃন্দ ১৯৪৩ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত যাবতীয় ভারতীয় ও অ-ভারতীয় ছবির জনপ্রিয়তা নির্দ্ধারণে যে ভোট দিয়াছিলেন তাহার ফলাফল নিম্নে প্রদত্ত হইল :

দশটি শ্রেষ্ঠ ছবি (ভারতীয়)

(১) কাশীনাথ (নিউ থিয়েটার্স)
(২) পৃথ্বিবল্লভ (মিনার্ভা)
(৩) কিসমৎ (বম্বে টকীজ)
(৪) প্রিয় বান্ধবী (নিউ থিয়েটার্স)
(৫) নাজমা (মেহবুব)
(৬) রাজা (পূর্ণিমা)
(৭) রাম-রাজ্য (প্রকাশ)
(৮) সহধর্ম্মিনী (রূপশ্রী)
(৯) শহর থেকে দূরে (ইষ্টার্ণ টকীজ)
(১০) দিকশূল (নিউ থিয়েটার্স)

দশটি শ্রেষ্ঠ ছবি (ইংরেজী)

(১) Random Harvest (Metro)
(২) Mrs. Miniver (do)
(৩) Bambi (RKO)
(৪) Talk of the Town (Columbia)
(৫) Arabian Nights (Universal)
(৬) Casablanca (Warner)
(৭) This Above All (20th Fox)
(৮) Tortilla Flat (Metro)
(৯) It Which We Serve (Br.)
(১০) Major and the Minor (Paramount)

শ্রেষ্ঠ মৌলিক চিত্রনাট্য :
দাবী—প্রেমেন্দ্র মিত্র :
রাজা—কিশোর সাহু

শ্রেষ্ঠ পরিচালনা :
নীতিন বসু (কাশীনাথ) :
মেহবুব (নাজমা)

শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত পরিচালনা :
পঙ্কজ মল্লিক (কাশীনাথ) এবং কমল দাসগুপ্ত (যোগাযোগ) :
অনিল বিশ্বাস (কিসমৎ)

শ্রেষ্ঠ ফটোগ্রাফী :
নীতিন বসু (কাশীনাথ) :
ফারেদুন ইরাণী (নাজমা)

শ্রেষ্ঠ শব্দ-নিয়ন্ত্রণ :
মুকুল বসু (কাশীনাথ) :
এস, বি, বাচা (কিসমৎ)

শ্রেষ্ঠ কারুশিল্প :
সৌরেন সেন (কাশীনাথ) :
কানু দেশাই (রাম রাজ্য)

শ্রেষ্ঠ অভিনয়
৺দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (প্রিয় বান্ধবী)
অশোককুমার (কিসমৎ) :
সুনন্দা দেবী (দম্পতি) : রমলা (মন্-চলি)

শ্রেষ্ঠ সহ অভিনয় :
ফণী রায় (শহর থেকে দূরে) এবং ছবি বিশ্বাস (দাবী) : শাহ নওয়াজ (কিসমৎ)
মণিকা গাঙ্গুলী (দাবী) :
সিতারা (নাজমা) এবং যমুনা (জবাব)

শ্রেষ্ঠ গান :
প্রেমেন্দ্র মিত্র (সমাধান) :
প্রদীপ (কিসমৎ)

শ্রেষ্ঠ সংলাপ :
প্রবোধ সান্ন্যাল (প্রিয় বান্ধবী :
পণ্ডিত সুদর্শন (পৃথ্বিবল্লভ)

বৎসরের শ্রেষ্ঠ চিত্র :
ইংরাজী—Random Harvest
বাংলা—কাশীনাথ
হিন্দী—পৃথ্বিবল্লভ

দীপালীর স্বত্বাধিকারী শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত, ১২৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, দীপালী প্রেসে মুদ্রিত ও দীপালী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

প্রধান সম্পাদক—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় :: সহঃ সম্পাদক—শ্রীধীরেন্দ্রমোহন মজুমদার বি. এল.

১৬শ বর্ষ VOL. XVI. } ১৪ই বৈশাখ ১৩৫১ :: April 27, 1944 { ১৭শ সংখ্যা No. 17

যে অগ্নিমূল্যে আজ আমরা আহার্য্য সংগ্রহ করি!

বর্তমানে চাল, ডাল, তেল, নুন হইতে আরম্ভ করিয়া কাঁচা তরিতরকারী মাছ প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য কলিকাতায় যে মূল্যে বিকাইতেছে তাহা কলিকাতার বাসিন্দারা বিলক্ষণ অনুভব করিতেছেন। ইহাকে শুধু "অগ্নিমূল্য বলিলেও বেশী বলা হয় না। সম্প্রতি ২০শে এপ্রিল তারিখের "Statesman" পত্রিকায় এই মূল্যবৃদ্ধি কতখানি হইয়াছে তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখান হইয়াছে। পত্রিকার বিবরণে ১৯৪১ সালকে ভিত্তি করিয়া দ্রব্য-মূল্যের শতকরা হার দেখান হইয়াছে। Statesman পত্রিকার এই বিবরণ ত্রুটিহীন না হইলেও দ্রব্যমূল্যের পরিস্থিতি বুঝিতে ইহা অনেকখানি সাহায্য করিবে। আমরা "দীপালী"র পাঠক ও পাঠিকাগণের জন্য প্রয়োজনীয় অংশগুলি উদ্ধৃত করিয়াছি মাত্র।

কলিকাতায় দৈনিক প্রয়োজনের জিনিষ কিনিতে বর্তমানে আমাদিগকে ১৯৪১ সাল অপেক্ষা গড়ে শতকরা ২৫০% বর্দ্ধিত মূল্য দিতে হইতেছে। গত ১৯৪১ সালের এপ্রিলে—অর্থাৎ যুদ্ধের দ্বিতীয় বৎসরের শেষার্দ্ধে যে মূল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষগুলি পাওয়া যাইত তাহার সহিত বর্তমান মূল্যের গড়পড়তা হিসাব করিলে আজ আমরা অবস্থার গুরুত্ব অনুভব করিব।

এই হিসাবে যুদ্ধ পূর্ব্ববর্ত্তী দ্রব্যমূল্যের বিষয় বিবেচনা করা হয় নাই। ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৪১ সালের এপ্রিল পর্য্যন্ত ক্রমবর্দ্ধমান মূল্যস্ফীতির বিষয়ও এই হিসাব হইতে বাদ পড়িয়াছে। বস্ত্র ও পোষাক পরিচ্ছদ ব্যতীত মোটামুটি দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় প্রায় সমস্ত দ্রব্যের বৃদ্ধিহার বিশ্লেষণ করা হইয়াছে।

এইরূপ প্রায় ৭০টি জিনিষের মধ্যে ৫টিকে রেশনভুক্ত করা হইয়াছে এবং কয়েকটির কণ্ট্রোল দর বাঁধিয়া সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করা হইয়াছে। রেশন দ্রব্যগুলি বর্তমানে পাওয়া যাইতেছে। অপর যে কয়েকটি দ্রব্য কণ্ট্রোল হইয়াছে তাহা দুষ্প্রাপ্য।

১৯৪৩ সাল—বাংলার দুর্ভিক্ষের বৎসর—এই দুর্ব্বৎসরে চাউলের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য খাদ্য দ্রব্যগুলিও চড়িতে আরম্ভ করে। যদিও বর্তমানে চাউল ৪০৲ টাকা (গত বৎসরের আগষ্ট—সেপ্টেম্বরে কলিকাতায় চাউল ৪০৲ টাকা এবং তদূর্দ্ধেও বিকাইয়াছে) হইতে ১৬৷০ মণ দর ধার্য্য হইয়াছে তথাপি ১৯৪১ সাল হইতে ইহার হার ২৫%। মাছ কাঁচা তরিতরকারী ও শাকসব্জীর মূল্য আজ কলিকাতার মধ্যবিত্ত ও দরিদ্রের সম্মুখে অসহনীয় অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে।

১৯৪১ সালের সহিত তুলনা করিলে দেখা যায় যে এমন কি রেশনদ্রব্যগুলিরও বৃদ্ধিহার গড়ে

শতকরা ১২৬%। চাউল—২২৫%; ময়দা—১৪০; আটা—১০০; চিনি—৭৫; রুটি—১০০, ডাল—বাঙ্গালীর চাউলের মতই অপরিহার্য্য; অথচ ইহাকে কণ্ট্রোল বা রেশনভুক্ত করা হয় নাই। যদিও বাংলা সরকার রেশন দোকান-গুলিতে ।।০ সের দরে ডাল বিক্রয় করিবার ঘোষণা করিয়াছেন তথাপি এ পর্য্যন্ত যাহা দেওয়া হইয়াছে তাহা অব্যবহার্য্য বলিলে মিথ্যা বলা হয় না। ডালের বর্ত্তমান মূল্য-বৃদ্ধি ১৯৪১ সাল অপেক্ষা গড়ে শতকরা ৩১৫%। ভাল ডাল বাজারে পাওয়া যায় না বলিলেই চলে।

খাদ্যদ্রব্যের অন্য যেগুলিকে কণ্ট্রোল বা রেশনভুক্ত করা হয় নাই তাহার মধ্যে মাংস ২৮৬% চড়িয়াছে, ফাউল—৩০০%; ডিম—৩৫৭%। বর্ত্তমানে হাঁসের ডিম ১৯৪১ সালের হিসাবে চারগুণ দামে বিকাইতেছে।

বর্ত্তমানে দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত পরিবারের পক্ষে মাছ সংগ্রহ করা দুরূহ ব্যাপার। গড়ে মাছের মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে শতকরা ২৩২%; ভেটকি—৩০০; রোহিত—২৭০, ও অন্যান্য মাছ—১৫০%

তরিতরকারীর দাম ১৯৪১ সালের তুলনায় গড়ে ২৩৬% বৃদ্ধি হইয়াছে। আলু—২৩৩, বেগুন—১৫০, কুমড়া—১০০, টোমাটো ৪০০, বীট—২০০, ঢেঁড়স—৪৩৩, বাঁধাকপি—১০০, আদা—২৩৩, পেঁয়াজ—৩০০, কাঁচা লঙ্কা—১০০%। এক মাস আগে তরি-তরকারির যে দর ছিল তাহার চেয়ে বর্ত্তমানে কোন কোন জিনিসের দাম কমিয়াছে। গত বৎসর আলু যে দরে বিকাইয়াছে তাহা হইতে মূল্য বর্ত্তমানে কম। কিন্তু চড়িবার আশঙ্কা রহিয়াছে। আলুর আমদানী কমিবার সঙ্গে সঙ্গে আষাঢ় শ্রাবণ মাসে গত বৎসরের মত অবস্থা হওয়া বিচিত্র নয়। গত বৎসর ১।।০ সের দরে আলু কিনিতে হইয়াছে।

ইহার পর কলিকাতার ফলের বাজার। ইহার দাম আজ নাগালের বাহিরে। দুই মুঠা অন্ন সংগ্রহ করাই আজ যাহাদের সমস্যা তাহাদের ফলের বিলাসিতা ত্যাগ করিতে হইবে। হিসাব করিলে দেখা যায় সাধারণ ভাবে ফলের দাম গড়ে শতকরা ২৪২% বাড়িয়াছে। কমলালেবু ১৬৬, কলা ২৫০; পেপে ২০০; আপেল ১৭৫; আঙ্গুর ২৫০, পাতিলেবু ৪০০; নারিকেল ৩৫০%। শশা, শাঁকআলু ও পানিফল কিছু কম দরে পাওয়া যায় মাত্র।

পান খাইবার অভ্যাস বাঙ্গালীর দীর্ঘকালের। ইহার জন্য যে সুপারি ব্যবহার হয় তাহার দর বর্ত্তমানে ১৯৪১ সাল হইতে ৪৩৩% বাড়িয়াছে।

কলিকাতায় বর্ত্তমানে বার আনা সের দাম দিয়াও ভাল দুধ পাওয়া যায় না। দুধের দরবৃদ্ধি—১৬৭%। বাজারে ভেজাল চলিতেছে প্রচুর। ঘৃত নামে বাজারে যে বস্তু চলে তাহাও সাড়ে চারটাকা সের দরে বিকাইতেছে; মূল্যবৃদ্ধি ২০০%।

রন্ধন ও ব্যবহারের জন্য সরিষা ও নারিকেল তেল আজ দুষ্প্রাপ্য ও বহুমূল্য। গড়ে এই দুইটি জিনিসের দর ৩১৮% বাড়িয়াছে। নারিকেল তেল বাজারে পাওয়া দুষ্কর, ভাগ্যক্রমে পাওয়া গেলে ২ টাকা সেরের কম পাওয়া যাইবে না। গড়ে ইহার মূল্যবৃদ্ধি ৪৩৩%।

কেরোসীন দরিদ্রের পক্ষে অপরিহার্য্য। বিজলী বাতির সুবিধা তাহাদের নাই। বর্ত্তমানে কণ্ট্রোলের দোকান ছাড়া এ বস্তু পাওয়া যায় না। সেখানেও সরবরাহ নিয়মিত নয়। লাইনবন্দী হইয়া দাঁড়াইয়া তাহা সংগ্রহ করিতে হয়। আউন্সখানেক সংগ্রহ করা রীতিমত ভাগ্যের কথা। অবশ্য অবাধ চোরাবাজারের কৃপায় কিছু কিছু পাওয়া যায়, নচেৎ সহরের দুর্ভাগাদের চলিত কি করিয়া?

কয়লা ও নুনের অবস্থাও চমৎকার। কাহাকে রাখিয়া কাহার কথা বলিব। কম্বলের লোম বাছিবার প্রচেষ্টা মিথ্যা। বর্ত্তমানে কয়লার কণ্ট্রোল দাম ১।।০ মণ। তিন বছর আগে ইহার যে দাম ছিল তাহার তিনগুণ বাড়িয়াছে। কলিকাতার কয়েকটি ডিপোতে নামমাত্র কয়লা আমদানী হয়। কয়েক সের কয়লা সংগ্রহের জন্য আবালবৃদ্ধবণিতাকে সারি দিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে হয়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা প্রতীক্ষা করিয়া কাহারও যদি কিছু মেলে তো সে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করে। অবস্থা আজ এতদূরে পৌছিয়াছে। অথচ করিবার কি আমাদের কিছুই ছিল না?

নুনের দর ১৯৪১ সালের তুলনায় ৮৩% বাড়িয়াছে। এই দামেও সব দোকানে পাওয়া যায় না। বাংলা সরকার এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহ হইতে রেশন দোকান মারফৎ নুন সরবরাহ করিবেন বলিয়াছেন। তাহাদের তথাকথিত ঘোষণার ফলে বাজারে নুন দুষ্প্রাপ্য তো হইয়াছেই—রেশন দোকানেও পাওয়া যাইতেছে না।

খাদ্যবস্তু ছাড়াও দৈনিক প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মধ্যে সাবান, কামাইবার ক্ষুর, ব্লেড ও দাঁতের মাজনের দাম গড়ে ২৫২% বাড়িয়াছে। সাবান ১৩৮, ব্লেড ১৩৭, দাঁতের মাজন ২১০%। সেফটি পিন ও ষ্টীল হেয়ার পিন-এর ঊর্দ্ধগতি কাণ্ডকর। এই দুইটি বস্তুর মূল্যবৃদ্ধির হার যথাক্রমে ১২২৩ ও ৫০০%।

গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মূল্য নিয়ন্ত্রণের ফলে মনোহারী ও প্রসাধন শ্রেণীর বহু জিনিষ চোরা বাজারে লুকাইয়াছে। ফুলস্কেপ কাগজের বৃদ্ধি হার ১০০%; তাহাও বহু চেষ্টা করিয়া সংগ্রহ করিতে হয়। পেন্সিল-এর মূল্যবৃদ্ধি সকলকে হার মানাইয়াছে। ইহার বৃদ্ধিহার ১৫০০%।

উপরের মোটামুটি হিসাব হইতে কলিকাতায় জনসাধারণের দুর্গতির পরিচয় পাওয়া যাইবে। যুদ্ধ-সংক্রান্ত ব্যবসায়ে লোকের হাতে টাকা আমদানী হইতেছে সত্য। ফলে চাকুরীজীবীর মাহিনাও বাড়িয়াছে। কিন্তু যে হারে দ্রব্যমূল্য বাড়িয়াছে তাহার সহিত তাল রাখিয়া লোকের আয় বাড়ে নাই, সামান্য আয় যাহা বৃদ্ধি হইয়াছে তাহার সহিত বর্ত্তমান মূল্যের হার তুলনা করিলে দেখা যাইবে অবস্থা কোথায় পৌছিয়াছে। আজ প্রয়োজনীয় বহু জিনিষ ছাটিয়া ফেলিয়া কোন প্রকারে বাঁচিবার চেষ্টায়ই মানুষ প্রাণান্ত হইতেছে।

অসমাপ্ত

(গল্প)

—শামসুজ্জোহা চৌধুরী

হাওড়া ষ্টেশনে ওদের দেখা হয়।

কিন্তু এই অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে প্লাটফরমের উপর যে দেখা, হবে একথা কেউ ভাবতেই পারে নি। দুজনেই দুজনকে নীরবে অভিনন্দন জানায়। দু'জনের ভিতরটা নাড়া দেয় এক অব্যক্ত পুলক শিহরণে!

প্রাথমিক সম্ভাষণ ও অন্যান্য কুশল প্রশ্নের পর অরুণা বললে: তারপর, কোথা যাওয়া হচ্ছে শুনি এই রাত্তির বেলায়, কোন মন্দ উদ্দেশ্যে নয়তো?

প্রশান্ত হাসলে। বললে: উদ্দেশ্যই সব সময় ঠিক থাকে না তো আবার ভাল আর মন্দ, আপাততঃ আসানসোল, এটা বিশ্বাস করতে পার। একটু থেমে তারপর বললে: আর তুমি?—অভিসারে বুঝি?

ওদেরকে আর এগুবার সুযোগ না দিয়ে বেজে ওঠে গার্ডের হুইশল্। দুজনের চমক ভাঙ্গে। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে।...

ট্রেণ ছেড়ে দেয়।

জানলার ধারে দুজন বসল। কারুর মুখে কথা নেই, এক অব্যক্ত মৌনতা দুজনের ভিতরটা ঘিরে তোলে।

আঁধারের মাঝে ছুটে চলে এই মোগলসরাই প্যাসেঞ্জার, সুপ্ত পৃথিবীর নিদ্রা ভঙ্গ করে। উপরে উপুড় করা পেয়ালার মত আকাশ, তাতে এক রাশ তারা। আর নীচে সুদূর-প্রসারি থমথমে কালো রাত। দূরের গাছগুলো ঝুপ সি মেরে বসে আছে প্রভাতের অপেক্ষায়।

অরুণা বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে। বাতাস কয়েকটা চুল নিয়ে এলোমেলো ভাবে খেলা করে ওর গালের উপর। সেই অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে ওরা ছুটে চলে' অতীতে সেই ফেলে-আসা দিনগুলোর পানে!

অতীতের তীর হতে ভেসে আসে ওদের টুকরো টুকরো চঞ্চল ক্ষণগুলি, যা তারা পেয়েছিল সত্যের মাঝ দিয়ে, যা আজও সঞ্চয়ের থলিতে জমা আছে। কলেজীয় দিনের এমনি রঙিন ঘটনা অন্তরের অন্তরীক্ষটাকে রাঙিয়ে তোলে। দুজনেই তার আভাস পায়। সে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করলে প্রশান্ত। ঘাড় ফিরিয়ে বললে: কোথায় চলেছ, আমাদের নীহারের কাছে নয়তো?

ঠোঁটের কোণে এক টুকরো হাসি টেনে নিয়ে অরুণা বললে: সত্যি, সে দিনের কথা আজও মনে পড়ে। সে দিনের সেই লজ্জাকর ব্যাপারটা আজও লজ্জা দেয়। কেমন করে যে ওটা হল তাই ভাবচি। নীহারকে সেদিন চেয়েছিলাম সত্যিকার পাওয়ার দাবী নিয়েই, কিন্তু তার প্রত্যাখ্যানে না পাওয়ার ব্যথায় তো সারা জীবন ব্যথিয়ে উঠল না?

: তার মানে কী জান অরুণা?—সোজা হয়ে বসে প্রশান্ত বলতে আরম্ভ করে: ওটা একটা নেশা। আমিই কি ছাই তখন অত বুঝতাম, সেদিন ওই 'প্রেম' শব্দটা শুনলে সম্ভ্রমে মাথা নুয়ে পড়ত। কিন্তু আজ ওটা নিছক শব্দের মতই ধরা দেয়। উন্মত্ত নেশা নিয়ে এক দুর্দমনীয় প্রবৃত্তির তাড়নায় সৃষ্টির পথে ছুটে চলাই হচ্ছে প্রেম। যত মাহাত্ম্যই প্রচার কর না কেন, চুল চিরে বিচার করলে দেখতে পাবে সেই সনাতন পাশবিক ইঙ্গিতটাই লুকিয়ে আছে। একটু থেমে তারপর বললে: তাই মনে হয়, ভালবাসা টালবাসা সব ভুল। ভাল লাগাটাই সব। স্থান বিশেষে যে যার চোখে ঠেকে।

অরুণা বুঝতে পারে ওর কথাটা, পারে না শুধু অতগুলো কথার অন্তরালে যে পৃষ্ঠভূমিটা। তাকিয়ে থাকে ওর মুখের পানে।

মধ্যম শ্রেণীর গাড়ী। যাত্রীর সংখ্যা কম। তবু দু'একজন ওদেরকে লক্ষ্য করে। প্রশান্ত অবিচলিতভাবে বলে চলে: অবশ্য ওর-ও কারণ হচ্ছে আকর্ষণ। রূপ-গুণের কথা ছেড়েই দিই, ওগুলো এখন গৌণের মধ্যে পড়েছে। বর্তমানে তরুণীদের আকর্ষণের প্রথম কারণ হচ্ছে ধন। ধনীর একমাত্র পুত্র, নিজের টু-সীটার, অভাবে মেট্রো, ক্যাসানোভা ঢোকবার সামর্থ থাকলে সে অনেক তরুণীর কাম্য, তার আর কোন গুণ থাকুক বা না থাকুক। ফরাসী তরুণীরা এতে সবচেয়ে অগ্রণী—তারা হয়ত ভাবে দাম্পত্য জীবনে সুখী না হলেও ভোগের তো আরও বিচিত্র দিক আছে অর্থই যার একমাত্র বাহন। তবে এতেও তোমাদের দোষ দিই নে।—

: এ তোমার অনুযোগ—প্রতিবাদ তুলে অরুণা বললে।

: হতে পারে। কিন্তু তোমাদের অনেকে কলেজে আসে এমনি মনোবৃত্তি নিয়ে, পিতামাতাকে দায় উদ্ধারের একটা আশা দিয়ে।

অরুণা ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলে। স্পষ্ট গলায় বললে: ভদ্র মহিলাদের সম্বন্ধে এমনি হীন মনোভাব তুমি পোষণ কর? মেয়ে

মানুষকে তোমরা ওই বিশেষ দৃষ্টিতেই দেখ, আর কিছু ভাবতেই পার না।

: দেহধর্মে সম-বয়স্কাকে আর কি ভাবতে পারে বল? আধুনিক ছেলেদের কোন দোষ নেই, দোষ ওদের ওই বয়সটার। সেটাকে তো আর ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। যে সমস্ত অভিভাবকরা আজকালকার ছেলেদের দোষ দেয়, তারা ভুল করে বড়। মনে হয় সৃষ্টির আদি হতে ঠিক এমনি চলে আসচে, কারণ মেয়ে পুরুষে পরস্পরে যে অদৃশ্য ইসারা তাকে রোধ করবে কে?

ট্রেণ থামল। মুখ বাড়িয়ে ষ্টেশনের ক্ষীণ আলোকে দেখে শক্তিগড়। দূরে আঁধারের মাঝে সুপ্ত, নাম-না-জানা ক'টা গাঁ। এ পাশে একটা ধান কলের চিমনি শীর্ণ দৈত্যের মত মাথা তুলে তাকিয়ে আছে ষ্টেশনের পানে।

পূর্বের চেয়ে কামরায় লোক বেশী। অকস্মাৎ রঙিন সাড়ী পরা আধ হাত ঘোমটা টানা একজন বধূর ওপর ওদের চোখ পড়ে। অরুণার পাশে ও সামনে অনেকটা জায়গা খালি ছিল, কেউ বসতে সাহস করেনি। অরুণা বধূটিকে কাছে ডেকে নেয়। সঙ্গের ভদ্রলোকটি বলে ওঠেন: যা, ওঁর কাছে বোস্‌গে।

মেয়েটি ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে একতাল কাদার মত অরুণার পাশে বসে পড়ে। অরুণা দেখে মেয়েটির চোখে জল! একটা রুদ্ধ ক্রন্দন সব কিছুকে ঠেলে বেরিয়ে আসবার চেষ্টা করছে। জিজ্ঞেস করে অরুণা জেনে নেয় অনেক কিছু। ওর বাপের বাড়ী শক্তিগড়েই, অল্পদিন বে' হয়েছে, স্বামী পানাগড়ে কাজ করে,—কঠিন অসুখ, তাই দেখতে যাচ্ছে। সঙ্গে দূর সম্পর্কের দাদা···।

অরুণা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। তারপর মুখ টিপে একটু হাসলে। প্রশান্তর চোখ এড়ায় না, বললে: হাসলে যে।

আবার শোনা গেল বাঁশীর শব্দ! গার্ডের নীল আলো দেখার সাথে সাথে ছেড়ে দিল ট্রেণ। ছোট্ট ষ্টেশনের কলকলানির পরেই এল বিজনতা, চার ধারে আবার ঘনিয়ে এল রাতের নিঃশব্দ ছায়া। আবার শুরু হল সেই একঘেয়ে শব্দ, চলার খট্‌খটানি। জীবনে যাদের গতি আছে, আর সেই দুর্নিবার গতি নিয়ে যারা ছুটে যেতে পারে তারাই পায় বৈচিত্র্যের সন্ধান, না-পাওয়ার স্বাদ! আর যারা তা পারে না, ভোরের যাত্রী-দের মত অর্দ্ধজাগ্রত, নিস্পৃহ অবস্থায় গা এলিয়ে প্যাসেঞ্জার ট্রেণের মত ধুঁকতে ধুঁকতে এগিয়ে চলে, তারা যত না চলে থামে তত বেশী। তাই এগুতে পারে না। পিছনের অন্ধকার আবর্তের মাঝেই শোনা যায় তাদের আর্তনাদ।

বর্ধমানের পর ভীড় যথেষ্ট বাড়ে। অনেককে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। ট্রেণ চলার সাথে সাথে চলে কথাবার্ত্তা, শব্দের সাথে মিশে যায় ওদের গুঞ্জন। প্রশান্ত লক্ষ্য করে যে সকলে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে অরুণা ও বধূটির পানে। যুবক বৃদ্ধ কেউ বাদ পড়েনি। একটু সরে এসে বললে: সকলে তোমাদের কেমন গিলচে দেখচো?

অরুণা ঘাড়টা ফিরিয়ে বললে: তোমার মত তো ওরা আমায় দেখবার সুযোগ পায়নি। তাই তো পুরুষকে যে কোন রকমে যে কোন অবস্থায় বিশ্বাস করা যায় না। মৃত্যুর আগে পর্য্যন্ত ওরা ওই প্রবৃত্তির বোঝা বয়েই মরে।

: দোষ তো তোমাদেরই, তোমরাই যে তাকাতে বাধ্য করাও। নিজেদের বেশ ভূষা, চাল-চলনের মাঝে এমনি আহ্বানী ইঙ্গিতই যে ফুটে ওঠে। আজকাল আধুনিকা দের—অনেকের চলাফেরার মধ্যে তাদের সংযত আব্রুর মধ্যে সে অসংযত লীলায়িত দেহ-ভঙ্গিমা প্রকাশ পায় তা ঠিক এমনি মনোভাব নিয়েই।

কথাটা এড়িয়ে অরুণা বলে ওঠে: আচ্ছা, ওদের অনেকে আমাদের কি ভাবচে বলতো? রাতের পশ্চিমগামী ট্রেণ! ভাবটা কদর্থ নয় তো?

: আর যদি সেই সনাতন সম্বন্ধটাই ভেবে নেয়—প্রশান্ত হেসে বললে।
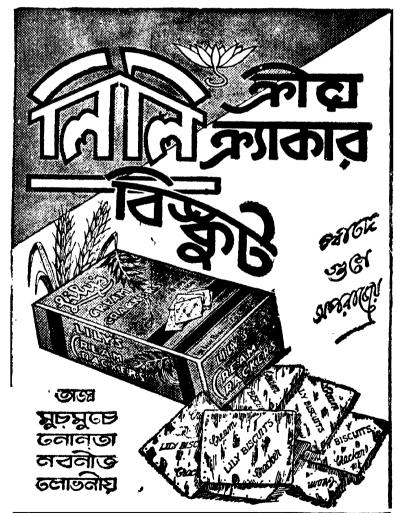
কি একটা লজ্জায় অরুণা মুখ ফিরিয়ে নেয়।

পানাগড় ষ্টেশনে বধূ ও সেই ভদ্রলোক নেমে যান। অরুণা বললে: মার্কেটে সেদিন মালতীদির সাথে দেখা—

: কোন মালতী ?—বললে প্রশান্ত।

: সে তুমি চেন না—বলে অরুণা আবার বলতে আরম্ভ করে: আমাদের গ্রামের মালতী। এখন বিজলী নাম নিয়ে কলকাতায় আছে ওদের ওই বিশেষ পল্লীতে! বৌটির সাথে ওর দূর সম্পর্কের দাদাকে দেখে ওর কথাই মনে পড়ে গেল। ওই দূরসম্পর্কের দাদাদেরকে আমার বড্ড ভয়। মালতীর স্বামী কাজ করত শ্রীরামপুরে। তারপর একদিন স্বামীর অসুখের টেলিগ্রাম পায়। যাত্রা করলে তার দূর সম্পর্কের দাদাকে নিয়ে অমনি কাঁদতে কাঁদতে। দাদা কিন্তু পূবে না গিয়ে গেলেন পশ্চিমে! খুব বেশী দূর নয়, মধুপুর। সেখানে দাদার সম্পর্ক ভুলে এক পাশবিক মূর্তি ধরে দাঁড়ালেন বোনের সম্মুখে! আরও জানালেন যে অসুখ টসুখ সব ভুল, টেলিগ্রামের মধ্যে তারই ষড়যন্ত্র আছে। মালতী চিরকাল গ্রামে বাস করেছে, প্রথমে বুঝে উঠতে পারে নি। তারপর বাধা দেয়। কিন্তু সে কতটুকু? তারপর গ্রামে রটে গেল সেই বার্তা। স্বামী নিতে অস্বীকার করলে। করাই স্বাভাবিক। কিছুদিন পর দাদাও ঘরে ফিরলেন। ভাবলেন, ভয় কি, আমি পুরুষ মানুষ। আর মালতী ?—নিজের মধ্যে আর একটা জীবনকে বহন করে নিয়ে বেড়ালে দ্বারে দ্বারে, ভিক্ষে করলে, তারপর কি করে এক শেঠজীর পাল্লায় পড়ে এল কলকাতায়। পাপ যখন একবার চলবার সুযোগ পায়, শেষে তার গতি এত বেশী বেড়ে যায় যে কল্পনা করাই কঠিন। আরম্ভ করলে ওই জঘন্য ব্যবসা—!

প্রশান্ত কথাটা হেসে উড়িয়ে দেয়। তারপর বললে: এক তরফা শুনানিতে রায় দেওয়া শুধু অবিচার নয়, নিজেকেই ঠকতে হয়। যারা দুর্বল, যাদের সর্বস্ব নির্ভর করে পরের ওপর, নিজেকে ধরে রাখবার যাদের ক্ষমতা নেই, তারা যে এমনি ঠকবে এতো সত্য কথা। আর এই সব মামলায় দেখি আসামীকেই শুধু শাস্তি ভোগ করতে হয়। তারা জানে না যে এর মধ্যে রয়েছে বাদিনীর কত বড় দুর্বলতা, আর একটা অজানা, অনিচ্ছাকৃত সম্মতি।

পেরিয়ে গেল ওয়ারিয়া। এরপর অণ্ডাল। অরুণা নেমে যাবে, যাবে সিউরী।

বিদ্যুতের আলো ক্ষীণ হয়ে আসে প্রভাতী আলো ফুটে ওঠার সাথে সাথে। সেই আলো-ছায়ার মাঝে প্রশান্ত তাকিয়ে থাকে অরুণার পানে! সারা মুখে আছে গত রাত্রের অনিদ্রার ছাপ। চোখ দুটোয় লেগে আছে তন্দ্রার জড়িমা। রাত্রের খোঁপা গেছে বিস্রস্ত হয়ে। কয়েক গাছা চুল খোঁপা হতে খুলে মুখের উপর ছড়িয়ে পড়তে থাকে। অরুণা বিরক্তিভরে সরিয়ে নেয়। প্রশান্ত তাকিয়ে থাকে অনিমেষ নেত্রে;—অরুণার এ রূপ কখনও সে দেখে নি।

অরুণা একবার আড়চোখে চেয়ে দেখে প্রশান্তকে। দুজনের দৃষ্টি-বিনিময় ঘটে!

চোখ নামিয়ে নেয় অরুণা। নিজেকে সংযত করে বললে: বড় অসময়ে এলে বন্ধু। আজ তো সেই বাসন্তী রঙের রং-করা রঙিন পাপড়ি নেই, ঝরে গেছে কোন্ দিন!

: এই তো সময় অরু, ফুল শুকিয়ে গেছে, ফলের আশা নিয়েই। আজ তো দুজনে নেশায় ডুবে থাকব না, থাকব প্রকৃত অবস্থায়। কাজেই পরস্পর পরস্পরের ফাঁকিটা তো সহজে ধরতে পারব!

অরুণা বললে: ফাঁকি যে থাকবে না এমন কোন কথা নেই, কিন্তু সেদিনটা ?

: সেদিনের কথা ভেবে আজকের এই উপবাসী মনকে আরও অনড় অসাড় করে তুলি কেন ?

ট্রেণ থামল, পাশে লাল কাঁকুরে প্ল্যাটফরম্। অরুণা নামে, সঙ্গে প্রশান্তও—বিদায় দেবে বলে। ব্যাগটা প্রশান্তর হাত থেকে তুলে নিয়ে অরুণা বললে: সময়ের ব্যবধানে স্মৃতির পটে যে মূর্তি অস্পষ্ট হয়েছিল, তাতে কি আবার নতুন করে রং দিলে ?

প্রশান্ত যেন কি হয়েছে। বললে: যাচ্ছ, যাও, যেদিন ডাকবে সেদিন সাড়া পাবে। পুরোণোর সাথে নতুনের তার জুড়ে সেদিন যাত্রা করব এই অসমাপ্ত জীবনটাকে নিয়ে অনাগত অনাস্বাদিতের পানে!

অরুণা চলে যায়। প্রশান্ত তাকিয়ে থাকে ওর চলে-যাওয়া পথের পানে!

দিনের সূর্য্য এখন তার যাত্রা সুরু করেছে। তার কিরণ ওদের গায়ে ঝরে পড়ে। জানিনে সেদিন ওই ব্যবধানের মাঝে ওদের আশীর্বাদ করল কি না!

কমরেড লেনিন

—শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কিন্তু পয়সা না থাকলে, দেহের ক্ষুধা মেটে না, উদর-শান্তি না হলে মনের শান্তি থাকে না। অন্নহীন অনটনের মধ্যে কার্লই বা শান্তি পাবেন কি করে?

কোনদিকে কোন কূল কিনারা নেই। যেদিকে পা বাড়ান সেই পথই রুদ্ধ হয়ে যায়। যে পত্রিকাখানির উপর আশা রাখেন সেই কাগজখানিই বন্ধ হয়ে যায়। অর্থাভাবে ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলিকে অনেক সময় অনাহারে থাকতে হয়। অনাহারের পিছনে আবার একদিন মৃত্যু এসে দাঁড়াল ঘরের দ্বারে—ন'বছরের ছেলেটি মারা গেল।

এবার কার্লের দৃঢ়তা ভেঙে পড়লো, আর তিনি চুপ করে থাকতে পারলেন না যে, চাকরীকে সারা জীবন ঘৃণা করে এসেছেন সেই চাকরী একটা পাবার জন্যই উন্মুখ হয়ে উঠলেন।

দরখাস্ত পাঠালেন।

রেলের চাকরী। ওপরওয়ালারা দরখাস্ত দেখে বললে—যার হাতের লেখা এতো খারাপ তাকে চাকরী দেওয়া চলে না!

ডক্‌টর মার্কসের চাকরী হোল না।

এদিকে জুতো জামার অভাবে বড় দুটি মেয়ের ইস্কুল যাওয়া বন্ধ হোল, পাওনাদারদের সংখ্যাও বেড়ে চললো দিনের পর দিন। তার উপর জেনিও অসুখে পড়লো। দুশ্চিন্তায় কার্লেরও স্বাস্থ্য ভাঙলো।

অসুখের মাঝেই মার্কস্ ভবিষ্যতের খসড়া করে ফেললেন: পাওনাদারদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য প্রথমেই দেউলের খাতায় নাম লেখাতে হবে। তারপর অল্প খরচে বস্তির মাঝে একখানি ঘর ভাড়া করবেন নিজেদের জন্য, আর বড় দুটি মেয়েকে কোন এক বড় লোকের বাড়ীতে ভর্তি করে দেবেন আয়ার কাজে। খরচ অনেক কমে যাবে।

হয়তো এমনি একটা কিছু করেও ফেলতেন যদি না এংগেলসের মত বন্ধু থাকতো। ওই একটি মানুষ মার্কসের মনস্বিতা উপলব্ধি করেছিল, এই দুর্যোগের খবর শুনেই তাড়াতাড়ি কোন রকমে একশো পাউণ্ড যোগাড় করে বন্ধুর কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

কিন্তু সামান্য একশো পাউণ্ডে সেই সর্বগ্রাসী দারিদ্র্যকে ক'দিন আর ঠেকিয়ে রাখা যায়।

আবার দুর্যোগের ঘনঘটা পুঞ্জীভূত হচ্ছে এমন সময় আর এক বন্ধুর সাহায্য এসে পৌছালো। উইলহেল্‌ম্ উল্‌ফ্ মরবার সময় মার্কসের নামে দিয়ে গেলেন যা কিছু সঞ্চয় ছিল। সেই আট ন'শো পাউণ্ড সেই দুঃসময়ে এতো প্রয়োজনে লেগেছিল যে মার্কস সেই বন্ধুটিকে চির স্মরণীয় করে রাখলেন তাঁর বিশ্ববিশ্রুত বই 'দাস-ক্যাপিটালে'। বইখানি এই বন্ধুটির নামেই তিনি উৎসর্গ করেন।

তখন তিনি এই বইখানিই লিখছিলেন। অমন নিরবচ্ছিন্ন দারিদ্র্যের মাঝে বসে তিনি লিখছিলেন অর্থের কথা, কি করে এক একটি লোকের হাতে লাখ লাখ টাকা জমে উঠে তারই বৈজ্ঞানিক ক্রমঃ বিকাশ: পুঁজীপতিরা কলকারখানা করে, শ্রমিকেরা সেখানে কাজ করে। যা কিছু সেখানে তৈরী হয় তার মূল্য ধরা হয় শ্রমিকের শ্রমের বিচার করে। কিন্তু জিনিষ বিক্রীর পর শ্রমিকেরা তার ন্যায্য পাওনা পায় না। একটা মোটা অংশ মালিকেরা রেখে দেয় লাভ বলে। শ্রমিকেরা তাইতে রাজী না হলে, তার চাকরী যায়, নতুন লোক সেখানে নেওয়া হয়। বেকার লোক সব সময়েই হাতের কাছে মজুত থাকে। কলকারখানা হবার ফলে, ছোট ছোট কুটীর-শিল্পগুলি ধ্বংস হয়ে যায়, কলের সঙ্গে দামের তাল রেখে তারা এগুতে পারে না। তারা বেকার হয়ে প্রতীক্ষা করতে থাকে কোথাও কোনরকমে কিছু অন্নের সংস্থান করতে পারে কি না। কোন রকমে চাট্টি খেয়ে বেঁচে থাকার আশায় তারা যে-কোন বেতনে কলকারখানায় চাকরী নেয়। কিন্তু তাদের আয়ের তুলনায় ব্যয় হয় বেশী, দারিদ্র্য বেড়েই চলে উত্তরোত্তর। যখনই তারা পুঁজিপতির কাছে অভিযোগ জানায়, তখনই মালিক তাদের বরখাস্ত করে আরেক দলকে কারখানায় ভর্তি করেন আরো কম মাইনেতে। এইভাবে ধনিকেরা ক্রমশঃ বড়লোক হতে থাকে। আর শ্রমিকের দৈন্য এসে পৌছায়, গাছতলা আর ছেঁড়া কাঁথায়। মালিকের মটর গাড়ীর পানে তাকিয়ে তখন তাদের মাথায় খুন চড়ে, তারা তখন সবাই মিলে বিদ্রোহ করে মালিকের বিরুদ্ধে। শ্রমিকেরা সংখ্যায় বেশী, একদিন মালিকের কারখানা তারা কেড়ে নেয়, তখন আর কারখানার উপস্বত্ব কারুর একার থাকে না, সমবেত সকলের হয়, সমবায় প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে, কারুরই আর দারিদ্র্য থাকে না।

মার্কস বলেন, এখনকার ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার ওই হোল চরম পরিণতি।

বিরাট বই, সুস্থচিত্তে বসে লেখা সম্ভব হোত না যদি অর্থ-চিন্তা জেগে থাকতো মাথার মধ্যে।

কিন্তু এংগেলসের জন্য সে দুশ্চিন্তা থেকে কার্ল রেহাই পেলেন। অতো বড় প্রতিভা সামান্য অন্নচিন্তায় সাধারণ মানুষের পর্য্যায়ে নেমে আসুক, বন্ধু তা চাইতেন না। সেই জন্য ভালোভাবে সাহায্য করার ইচ্ছায় এংগেলস্ তাঁর কারবার বিক্রী করে দিলেন, আর মার্কসকে জানালেন—বছরে বছরে সাড়ে তিনশো পাউণ্ড করে তুমি পাবে, সংসারের খরচের জন্য তোমাকে আর কোনদিন ভাবতে হবে না। তুমি নিশ্চিন্ত মনে তোমার পড়াশুনা করতে থাকো। (ক্রমশঃ)

প্রত্যাখ্যান

(উপন্যাস)

শ্রীসুধাংশু কুমার হালদার, আই. সি. এস্

(২)
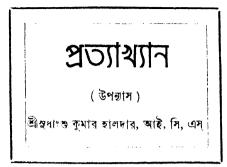
সম্পূর্ণ আধুনিক ধরণে সুসজ্জিত আলোকোজ্জ্বল আলাপন কক্ষ। ক্রোমিয়াম-প্লেটেড্ ফ্রেমের মধ্যে আঁটা সুদৃশ্য সুকোমল সুখাসনগুলি। কার্পেটটি পুরু আর নরম। ভেনীসীয় তুষার-শুভ্র মার্বেলে রচিত বরফের পাহাড়ের গায়ে প্রস্তরময় পোলার ভাল্লুক দুই পা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। পাহাড়ের মধ্যস্থিত অদৃশ্য বাতির আলোয় সমস্তটা ভাস্বর, সত্যি বরফের পাহাড় যেন! দেয়ালের কোণায় কোণায় কাচের নলের মধ্যে নিওন্ বাতি ঝিকমিকিয়ে জ্বলছে। সামনে মোনালিসার রঙীন অনুকৃতি, রহস্যময় হাসিটি, তির্য্যক ভঙ্গীতে হাতটি রাখা, হাতের আঙুলগুলির কি সৌন্দর্য্য! আর এক দিকে সোনালী ফ্রেমে আঁটা সান্তাত্রিনিতা সেতুর ছবি, সেতুর পাশে বুকে হাত রেখে দাঁড়িয়ে মহাকবি দান্তে, বিয়াত্রিচের পানে একদৃষ্টে চেয়ে। অদৃশ্য রেডিও থেকে মৃদু পিয়ানোর আওয়াজ আসচে গ্রামোফোন্ পিক্ আপ্ বেয়ে। মস্ত বড় কাশ্মিরী কাজ করা ওয়াইন্ হোল্ড্, তার মাথায় রাখা নানা বিচিত্র আকারের পানপাত্র, পানীয় সরঞ্জাম। ওমর খৈয়াম দেখলে বোধ হয় এঘর ছেড়ে যেতে চাইতেন না কখনো। ছোট ছোট বাঁকা বাঁকা পায়ার কারুকার্য্য খচিত পেগ্-টেবলে কাশ্মিরী কাজকরা আখরোট কাঠের বাক্সয় সিগারেট রাখা। ঘরের একপাশে প্রকাণ্ড এক ঝাড় শ্বেত ও রক্তপদ্ম চুণকাম করা নক্সা-আঁকা জালার জলে লতাপাতা দিয়ে সাজানো। তারই মৃদু সৌরভে সমস্ত ঘর পূর্ণ। মাথার ওপর খড়ি দিয়ে মাজা পঙ্খের কাজ করা ধবধবে সিলিং, তার চারপাশে নানা রঙের আঁকা পাড়। উড়ে যাওয়া ঝলাকার পাতি চিত্রিত করা রয়েছে ছাদে। দেয়ালে মুর‍্যাল পেন্টিং কলা বন, কচু বন, পলাশগাছের বন, তারি মধ্যে হরিণেরা ঘুরছে, গাছের আলবালে জলসেচন করছে বেণী উঁচু ক'রে বাঁধা মেয়ে। ছাদ থেকে ঝোলানো লাঠি-ডাণ্ডা-ওয়ালা টিনের পাতের বিজলীপাখা নেই,—এসব সেকেলে সরঞ্জাম বিশ্রী ব'লে পরিত্যক্ত। তার বদলে ঘরের নানা কোণ থেকে অদৃশ্য ফুটো দিয়ে বাতাসের স্রোত আসছে কক্ষে, অদৃশ্য মোটর-টারবাইনের সাহায্যে শীতল করা হাওয়া এসে বেনারসী সিল্কের পরদা নৌকার পালের মতো ফুলিয়ে দিচ্ছে।

ব্যারিষ্টার মিষ্টার চৌধুরী তাঁর অতিথিদের আপ্যায়ন করতে করতে নিজেই পান করছেন একটু বেশী, ব্যাখ্যা করছেন 'স্লো জিন্' আর 'টাইগার্স্ মিল্ক' ককটেলের মস্তিষ্কের ওপর প্রভাবের তারতম্য। বিদেশের 'সিল্ভার স্লিপার্স' নাইট ক্লাবের বাট্লারের কাছ থেকে শিখে এসেছিলেন যে ককটেলের ফর্মুলা,—সেটা পরোখ্ করতে চান তাঁর অভ্যাগতদের ওপর। প্রকাণ্ড একটা কাচপাত্রে রয়েছে সেই সমাদৃত পানীয়টি, চাকা চাকা কাটা আনারস আর পীচ আর ষ্ট্রবেরির সঙ্গে বরফের কিউব ভাসচে তার ওপর। এক গোছা কালো আঙুর ঝোলানো রয়েছে একটা চকচকে রূপার আঙুর ঝোলানি থেকে। একটা নাতিবৃহৎ রূপার বাল্তীতে রাখা বরফের মধ্যে ডুবানো শ্যাম্পেনের বোতল,—যাকে আমাদের দেশের কোনো রসিক কবি নাম দিয়েছেন 'চম্পাগ্নি'। সাদা দস্তানায় তার কালো কালো হাত ঢেকে একটা বেয়ারা রূপার চিমটা করে বরফ পরিবেশন করছে অভ্যাগতদের পানীয়ের মধ্যে।

আজ একটু বিশেষ উপলক্ষ্য করেই এই মজলিস। মিসেস্ চৌধুরী ছেলে মেয়েদের নিয়ে চেঞ্জে গেছলেন হাজারিবাগ অঞ্চলে। গ্রীষ্মাধিক্যের জন্যে তাঁরা ফিরে আসছেন আজ। একটা মাস এখানে কাটিয়ে তারপর যাবেন দার্জ্জিলিং। তাঁর গৃহাগমনের সম্বৰ্দ্ধনার জন্যেই আজকের আয়োজন। মিষ্টার চৌধুরী ঘনঘন কব্জির ঘড়ী দেখছেন। আটটা প্রায় বাজে, মিসেস্ চৌধুরীর মোটার এখনো এসে পৌছল না কেন তার জন্যে একটু চিন্তিত। কি জানি, পথে যদি কলকব্জা বিগড়ে যেয়ে থাকে! তবে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান্ ড্রাইভার সিম্‌সনটা আছে, সেই চালিয়ে আনছে গাড়ী। যন্তর তন্তর সম্বন্ধে সে পাকা লোক। হয়তো লিলুয়ায় কিম্বা রিষড়ায় কলের ছুটি হয়েছে, বিষম আঁকা বাঁকা পথ, কাতারে কাতারে লোক চলেছে, তাই মোটারের দেরি হচ্ছে।

ব্যারিষ্টার এসেছেন জন কয়েক, একজন পুলিস সাহেব ও তাঁর পত্নী মিসেস্ ঘোষ, মিসেস্ নন্দী, মিস্ নমিতা ঘোষ,—এমনি জন পনেরো এসেছেন মিসেস্ চৌধুরীর সম্বৰ্দ্ধনা করতে। বিমল বোস একটু ভারিক্কি গোছের মানুষ, তিনি পীত রঙের একটা পানীয় নিয়ে সিগার সহযোগে সেটা সেবন করছেন ও তাঁরই জুনিয়ার হরিশ নিয়োগীর সঙ্গে সেদিনকার একটা মকরদমার কথা আলোচনা করছেন যেটাতে তিনি হেরে গেছেন। কথাপ্রসঙ্গে তিনি এইটেই বোঝাতে চেষ্টা করছেন যে আজকাল যে-সব জজ আসছেন, বুদ্ধিতে কিম্বা জ্ঞানে তাঁরা তাঁদের পূর্ব্ববর্ত্তীদের সমকক্ষই ন'ন। তা নইলে এমন মাম্‌লাটা কি বিমল বোস মহাশয় হারেন! পাশেই মিসেস্ নন্দী ছোট্ট একটি ভার্মুথ নিয়ে পেলব অঙ্গুলি দিয়ে একটি কালো আঙুর মুখের কাছে ধরে আছেন। তিনি জানেন, তাঁর এই পোজ্‌টির তাঁর এক স্তাবক ভক্ত একদিন অত্যন্ত প্রশংসা করেছিল, কোন্ এক ইতালীয় আর্টিষ্টের আঁকা কোন্ এক সুবিখ্যাত ছবির কথা নাকি তার মনে পড়ে গিয়েছিল। তাই মিসেস্ নন্দী প্রয়োজনের অতিরিক্ত কাল ধ'রে আঙুরটি তাঁর মুখের সামনে রাখলেন। তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে শোভন চ্যাটার্জ্জি ক্রমাগত তাঁকে একটা গান গাইবার অনুরোধ করছে এবং হাসছে অকারণে। বোধ হয় 'বাঘের দুধ' তার মনের মধ্যে সবিশেষ ক্রিয়াশীল হ'য়ে উঠেছে। পুলিস সাহেব মিষ্টার সোম চৌধুরী সাহেব প্রদত্ত ককটেলটি ছ'তিন গ্লাস পান

করেছেন, এবং পুলিস সাহেবী জীবনে আগের মতন সুখ এবং আরাম যে এখন একেবারেই নেই সে কথা মিসেস্ দত্তকে খুব উচ্ছাসের সঙ্গে শোনাচ্ছেন। মিসেস সোম এসেছেন টেনিস্ ক্ষেত্র থেকে সটান্। পাশে রেখেছেন স্ল্যাজেঞ্জারের টেনিস্ র‍্যাকেট্। পরে আছেন ফ্লেনেলের আধাপাতলুন, নিরাবরণ পদদ্বয়ের প্রান্তদেশে গুটিয়ে আছে টেনিস্-মোজা, রবার-তলা সাদা জুতাটির কণ্ঠবেষ্টন ক'রে। কিউটেক্স বিজ্ঞাপনীর প্রতিকৃতিটার অনুকরণে তাঁর নখাগ্রগুলি সুতীক্ষ্ণ বর্শাফলকের মতো। সোনা-বাঁধানো অ্যাম্বারের তৈরি সিগারেট-হোঁকায় ধৃত সিগারেট টানছেন একটি চোখ ঈষৎ বন্ধ ক'রে। পাশে বসে আছেন মোহন সেন, টেনিস মহলে যার প্রচণ্ড সুনাম। মোহন বলছেন, "উইম্বল্‌ডনে আমার যদি ডাক পড়ে মিসেস সোম, আপনাকে ছাড়া আর কাকেও আমি পার্টনার নেব না কিন্তু।" একটি চোখ ঈষৎ মুদ্রিত করে মিসেস সোম বলছেন—"রিয়্যালি !"

একটা লক্ষ্যণীয় বিষয় হ'ল এই যে যদিও অভ্যাগতেরা সবাই এলেন গম্ভীর মূর্ত্তি হ'য়ে, কিন্তু দু'একপাত্র সেবন করেই তাঁরা গাম্ভীর্যের মুখোস খুলে ফেলে দিলেন এবং পরস্পারের পয়েন্ট-অব ভিউ বোঝাবার জন্য বেশ একটু জোরের সঙ্গে কথাবার্ত্তা সুরু করে দিলেন। দুঃখের বিষয় এই যে বক্তার সংখ্যা যত, শ্রোতার সংখ্যা তার চেয়ে অনেক কম।

এঁদের সবার থেকে একটু দূরে বসে আছেন মিসেস ঘোষ ও তাঁর মেয়ে নমিতা। এঁরা একটু জড় সড়, একটু যেন সঙ্কুচিত। গৃহস্বামী মিষ্টার চৌধুরী এঁদেরই দিকে একটু বিশেষ মনোযোগ দিচ্ছেন সেই জন্যে। পান এঁরা কিছুই করছেন না বলে তিনি বারংবার অনুযোগ জানিয়ে এঁদের প্লেট আঙুরে আর আখরোটে, ছোট ছোট সসেজে আর তোষ্টে চড়ানো সামন্ মাছে ভরে দিচ্ছেন। মিসেস ঘোষের ধনের খ্যাতি সহরময় পরিব্যাপ্ত, তাঁর এই অবিবাহিতা কন্যাটি যাঁর গলায় মালা দেবেন তিনি একজন ভাগ্যবান পুরুষ, একথা যুবকমহলে অনেকখানি চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। মিসেস ঘোষ হলেন চৌধুরী সাহেবের একজন অত্যন্ত শাঁসালো মক্কেল, কয়লার খনি এবং চা-বাগানের মামলা মকদ্দমা তাঁর লেগেই আছে। এর আগে মিসেস্ ঘোষ চৌধুরী সাহেবের বাড়ীতে কোনোদিন আসেন নি, আজ এই বিশেষ অনুষ্ঠানে অনুরোধ না এড়াতে পেরে এসেছেন।

মিসেস ঘোষের বয়েস হলেও বেশের পারিপাট্য একটু অস্বাভাবিক রকমের সমুজ্জ্বল। কপালের এককোণে বাঁকা সিঁথিতে সূক্ষ্ম একটু সিঁদুরের রেখা। সাদা জর্জেটে সোনার চুমকি বসানো। পায়ে অত্যুগ্র হাইহিল জুতো। গায়ে হীরাখচিত গয়না। তাঁর কন্যা নমিতাকে যথার্থ সুন্দরী বলা চলে। সব প্রথমে চোখে পড়ে তাঁর চোখ দুটি। স্বপ্নের আবেশ মাখানো চোখ। কণ্ঠের স্বর কানে যেন সঙ্গীতের মতো বাজে। পাতলা ঠোঁট দুটি যেন মোম দিয়ে তৈরী। তনুদেহটি ঘিরে একটি অনুপম মাধুর্য্য যেন উপ্‌চে পড়ছে। দেখে মনে হয় এ মেয়ের মধ্যে তেজ নেই, আছে মধুরতা, এ আত্মদৃপ্ত নয়, স্বভাবতই নির্ভরশীল।

চৌধুরী সাহেব বলছিলেন এঁদের তাঁর ভাগ্নের কথা। এমন এক গুঁয়ে স্বভাবের ছেলে আর নাকি দেখা যায় না। যা মুখে আসে তাই বলে, কিছু রেখে ঢেকে বলতে জানে না। এই তো সেদিন তাঁকেই বলছিল, "মামা, তোমার ভাগ্যে-ভাগ্য অসম্ভব রকমের ভাল, নইলে তোমার বুদ্ধির দৌড় দেখে আমি যে তোমার ভাগনে একথা কেউ ধারণাও করতে পারবে না।" তার কথাগুলো শুনলে অসম্ভব 'চিকি' মনে হয়, কিন্তু সে যখন নিজে তার কথাগুলো উচ্চারণ করে, তখন তাতে জ্বালার সৃষ্টি করে না, এমনি তার বলার কায়দা। সে নাকি কি এক খেয়ালের বশে তার বাড়ীঘর দোর বিক্রী করে কোন এক মেসে অজ্ঞাত-বাস করেছিল, হঠাৎ একদিন রাস্তায় তাকে দেখতে পেয়ে চৌধুরী তাকে ধরে এনেছেন। কিন্তু কেবলি সে পালাই-পালাই করছে।

মিসেস ঘোষ বললেন, "তা তাকে এ পার্টিতে দেখছিনে যে! সে কি বেরিয়েছে কোথাও?"

চৌধুরী বললেন, "না, এই একটু আগেও তো তাকে দেখছিলুম বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাকে আসতে বলেছিলুম। সে বললে, "না মামা, তোমার ও সব হাইসোসাইটি আমার হজম হবে না। দেখি, সে গেল কোথায়!"—এই বলে দ্বারদেশে গিয়ে ডাক দিলেন—"অসীম, অসীম—একবার এদিকে এসতো।"

প্রত্যুত্তরে অসীম এসে ঘরে ঢুকল। এ কয় সপ্তাহে তার চেহারার একটু তারতম্য ঘটেছে। মাথার চুলগুলি খুব ছোট ছোট, সম্প্রতি মাথা ন্যাড়া করেছিল বলে। মালকোঁচা মারা ধুতির প্রান্ত পায়জামার ঢঙে

পদপ্রান্তে লুটিয়ে পড়েছে, পাঞ্জাবীর বোতাম তির্য্যকভাবে বাম কাঁধ থেকে নেমে এসেছে বুক পর্য্যন্ত। সুদীর্ঘ দেহ চৌধুরী সাহেবের টাক-ওয়ালা মাথা ছাড়িয়ে হাতখানেক উর্দ্ধে উঠেছে।

চৌধুরী সাহেব পরিচয় করিয়ে দিলেন সকলের সাথে, "এটি আমার ভাগ্নে। এর মা আমার দূর সম্পর্কের বোন হলেও নিজের বোনের চেয়ে কোন অংশে কম ছিলেন না।"

অসীম সকলকে নমস্কার করে দাঁড়াল।

মিষ্টার সোম প্রশংসমান দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে বললেন, "What a fine figure! তুমি পুলিশে আসবে?"

অসীম বলল, "মাফ করবেন। মানুষের মধ্যে পুলিশ আর মাছের মধ্যে ইলিস—ও দুয়েই সমান কাঁটা।"

মিসেস নন্দী খিল খিল করে হেসে বললেন, "ঠিক হয়েছে! মিষ্টার সোম তাঁর মুখের মতন জবাব পেয়েছেন!"

মিসেস সোম একটু ভ্রূকুঞ্চিত করে তাঁর র‍্যাকেটখানি ঘোরাতে ঘোরাতে বললেন, "তবে আপনার জীবনের উদ্দেশ্য কি?"

অসীম বলল, "আমার জীবনের উদ্দেশ্য আপনার ঐ টেনিস্ র‍্যাকেট্ খানির মতো,—পৃথিবীটাকে কেবল খুব জোরে ধাক্কা দিয়ে চলা।"

"কিন্তু তাতে কি লাভ হবে? ধাক্কা তো ফিরে আসতে পারে!"

"সেই তো থ্রিল্!" অসীম বললে, "টেনিস যখন খেলেন তখন একথা নিশ্চয়ই বুঝবেন।"

মিসেস সোম এ কথার কোনো জবাব না দিয়ে বললেন, "আপনি এখানে আছেন তো কিছুদিন?"

অসীম বলল, "না, কোনখানে পাছে আটকে থাকতে হয় বলেই দেশের বাড়ী ঘর সব বেচে দিয়েছি।"

"কেন, আটকে থাকতে আপনার আপত্তিটা কিসের?"

"আটকে থাকা মানে থেমে যাওয়া, আর থেমে যাওয়াও যা মরাও তাই। তাই আপত্তি।"

"অমন কথা গর্ব্বের মতো শোনায়, অসীমবাবু। কোনোদিন কি আটকে পড়ে যাবেন না কারো কাছে, এই কথা বলতে চান?"

অসীম বলল, "না, একথা বলতে চাই না। তবে আমাকে আটকাতে পারবেন তিনিই যাঁর কাছে এমন কিছু পাবো যা মরণের চেয়েও বড়। জীবনের চেয়েও বড়। কিন্তু এমন কেউ আছেন বলে তো বোধ হয় না।"

"উঃ, আপনি তো দেখছি ভয়ানক অহঙ্কারী।"

"আমার মত অসাধারণ লোক আমি আর একটিও দেখিনি মিসেস সোম।"

"আপনার সঙ্গে পারবার জো নেই" বলে মিসেস সোম হেসে উঠলেন। তারপর অসীম এসে দাঁড়াল মিসেস ঘোষের কাছে। মিসেস ঘোষ বললেন, "বস না বাবা, এইখানে বস।" মিসেস ঘোষ ও নমিতার মাঝে একটা চেয়ার দখল করে অসীম বসল।

মিসেস ঘোষ বললেন, "বাবা, তোমার কথাবার্ত্তা শুনে মনে হল, তুমি কেবল ঝোঁকের মাথায় চলো। এটা কি ঠিক?"

অসীম বলল, "দেখুন মিসেস ঘোষ, ঝোঁকের মাথায় চলাই হল আসল চলা, আর সব চলা খোঁড়ামি।" তারপর নমিতার দিকে ফিরে বলল, "কি বলেন, নমিতা দেবী?"

নমিতার মুখ লাল হয়ে উঠল। ঝোঁকের মাথায় যে-চলা সেই তো আসল চলা—একথাটি যে সত্যি তা তার অন্তর স্বীকার করে নিল, কিন্তু মায়ের সামনে সে কথা স্বীকার করতে যে লজ্জা করে! বিশেষতঃ এই লোকটির কণ্ঠে এ কথা যেমন শোনায়, তার লজ্জানিরুদ্ধ কণ্ঠে কি তেমনি মধুর হয়ে বাজবে!

অসীম ততক্ষণ বলে চলেছে, "আপনি বলবেন, না, একথা ঠিক নয়। কিন্তু ভেবে দেখুন একবার, জগতে যা কিছু বড় জিনিষ সৃষ্টি হয়েছে, সবই কি ঝোঁকের মাথায় হয় নি? মহাকবি যখন মহাকাব্য লিখেছেন, তখন কি তিনি হিসেব করে ধীরে সুস্থে সময় মেপে মেপে লিখেছেন? এই মোনালিসার ছবিটি—এর হাসিটি কি শিল্পী দম-দেওয়া কলের মতন যন্ত্রের হাতে তুলি দিয়ে এঁকেছেন? কোন এক শুভ মুহূর্ত্তে কোন্ এক উন্মাদ প্রেরণায় ঝোঁকের মাথায় তাঁর তুলি দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন এই হাসি।"

নমিতা মনে মনে সায় দিয়ে বললেন, ঠিকই তো। নইলে এই জগৎ সংসারে ভাল লাগে বলে কোনো বালাই থাকত না। সবই হ'ত আবশ্যক কিংবা অনাবশ্যক! মনকে আর চোখ কানকে কখন যে কে পেয়ে বসে তার তো ঠিক ঠিকানা কিছুই নেই। অসীম বাবু বলছেন, এ হল ঝোঁক। হয়তো তাই, হয়তো বা আর কিছু। কিন্তু এটা ঠিক যে আবশ্যক-অনাবশ্যকের পরিমিত গণ্ডী দিয়ে একে মাপজোপ করা চলে না।

হঠাৎ বিমল বোস তাঁর ঘড়ির দিকে চেয়ে বললেন, "বাই জোভ্, ন'টা বাজে। আমাকে তো এবার যেতে হচ্ছে, চাউড্রি,—আমার একটা এনগেজমেণ্ট্ আছে। মিসেস চাউড্রির সঙ্গে দেখা করতে পারলুম না, অফুলি সরি, তুমি আমার হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করো।"—এই বলে তিনি উঠলেন। ঈষৎ টলিত পদে গাড়ী বারান্দার দিকে অগ্রসর হলেন।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সোমেরা উঠলেন, মিসেস নন্দী উঠলেন, মিসেস ঘোষ, নমিতা প্রভৃতি সকলেই উঠলেন, কেবল দু'একটি ছোকরা ব্যারিষ্টার যেমন সোফায় গড়াচ্ছিলেন, তেমনি গড়াতেই থাকলেন। তাঁদের তখন তুরীয় অবস্থা।

চৌধুরী সাহেব সকলকে এক এক পাত্র পানীয় পরিবেশন করতে করতে জড়িত কণ্ঠে বললেন, "যাবার আগে এই path-finder, পথ-প্রদর্শকটি পান করে যাও।" বলা বাহুল্য তিনি নিজে যে মাত্রায় পান করলেন, তাকে path-finder না বলে globe-trotter বললেই ঠিক হয়!

ধন্যবাদ বর্ষণ কিছুক্ষণ প্রায় মুষলধারায় চলল, যতক্ষণ না গাড়ীগুলো সব ভোঁ ভোঁ শব্দে ফটক পার হয়ে চলে গেল।

চৌধুরী সাহেব জড়িত কণ্ঠে বললেন, "ওর ফিরতে এত দেরী হচ্ছে কেন? কোন অ্যাক্সি—অ্যাক্সি—অ্যাক্সিডেন্ট হল নাকি!"

মিসেস ঘোষ ও নমিতাকে তাদের গাড়ীতে তুলতে গিয়েছিল অসীম। পিছন পিছন আসছেন মিষ্টার চৌধুরী। তাঁর পদক্ষেপ একটু অসংযত, গাড়ীবারান্দার হ্যাটর‍্যাক, টেবিল প্রভৃতি যা সুবিধা পাচ্ছেন, সেটাকেই অবলম্বন করতে করতে সাবধানে অগ্রসর হচ্ছেন। কিন্তু সিঁড়ির ওপর বিছানো প্রকাণ্ড পাপোসটা পর্য্যন্ত পৌছে আর অগ্রসর হতে সক্ষম হলেন না। পাপোসটার উপর লেখা "ওয়েল্‌কাম্" শব্দটার আকর্ষণেই হোক, কিংবা আর কোন কারণেই হোক তার উপরেই শুয়ে পড়লেন। তাঁর হাতে ছিল একটি পদ্মফুল, সেটি তাঁর পতনের বেগে তাঁর ধোপদস্ত ডিনার সার্টে চেপ্টে গেল।

কবিগুরুর একটি গান আছে,

> "আমারে পড়িবে মনে কখন সে লাগি
> প্রহরে প্রহরে আমি গান গেয়ে জাগি।"

গৃহিনীর সাদর অভ্যর্থনার জন্যে উৎকণ্ঠিত চৌধুরী সাহেব একেবারে দ্বারপ্রান্তে শয্যাবিস্তার করে পড়েই থাকলেন, পাছে অভ্যর্থনার কোনো ত্রুটি হয়।

দু'জন বেয়ারা শশব্যস্তে এসে তাঁকে ওঠাতে লাগল। অসীম সেদিকে চেয়ে হেসে বলল, "মামা আমার দেহলীদত্তপুষ্প হয়ে শুয়ে আছেন, কালিদাস এ দৃশ্যটি দেখলে মুগ্ধ হতেন।"

গাড়ীতে উঠতে উঠতে নমিতা একথা শুনে হেসে উঠলেন। মিসেস ঘোষ তাঁর ব্যাগ থেকে একটা কার্ড বার করে অসীমের হাতে দিয়ে বললেন, "তুমি একবার আমাদের ওখানে এসো বাবা। বল আসবে তো?"

"আপনার ওখানে মামার মুখে শুনেছি অনেক খ্যাতনামা লোকের সমাগম হয়। কেউ বা প্রসিদ্ধ লেখক, কেউ বা প্রসিদ্ধ আর কিছু। এ সব সিংহ ব্যাঘ্রের মধ্যে আমার স্থান কোথায় মিসেস ঘোষ?"

"না না, ওসব ওজোর আপত্তি শুনব না, তোমায় আসতেই হবে বাবা।"

"কই, আপনি তো একবারও আমায় ডাকলেন না, নমিতা দেবী?" অসীম জিজ্ঞেস করল।

নমিতার মুখ আবার ক্ষণকালের জন্য লাল হয়ে উঠল। "আসবেন আপনি অসীমবাবু, নিশ্চয় আসবেন।"—অতিকষ্টে সে বলল। যে-কথাটি বলবার জন্যে সমস্ত প্রাণ উৎসুক হয়ে আছে, লজ্জা এসে এমনি করে তাকে বাধা দেয় কেন?

"আচ্ছা যাবো"—অসীম বলল, "মিসেস ঘোষের সিংহ ব্যাঘ্র না হতে পারি, নমিতা দেবীর খঞ্জহংস—lame duck তো হতে পারব? তাতে আপনাদের জু-অ-লজিক্যাল উদ্যানের শোভা বাড়বে, কি বলেন নমিতা দেবী?"

নমিতার উত্তর আর শোনা গেল না। গাড়ী চলতে লাগল। নমিতার কানে কেবলি বাজতে লাগল, 'নমিতা দেবী' 'নমিতা দেবী'—'তব কণ্ঠে মম নাম ডাকা'—ওর কণ্ঠে এই নমিতা নাম কত যে মিষ্টি শোনায়!—পুষ্পধনুর একটি অতি ক্ষুদ্র টঙ্কার নমিতার কানে এসে বাজল, একটি অতিক্ষুদ্র ফুলশর তাঁর হৃদয় ভেদ করে চলে গেল।

(ক্রমশঃ)

আমেরিকায় ভবিষ্যত জননীর তত্বাবধান

—কুমারী শ্রীবাণী গুপ্তা এম, এ, বি, টি

আমেরিকায় সন্তানজন্ম কোনও অসুস্থতা বলে বিবেচিত হয় না—এটাকে একটা স্বাভাবিক ব্যাপার বলেই মনে করা হয়ে থাকে। যদি ভাল ভাবে জননীর তত্ত্বাবধান করা হয়, যদি ভবিষ্যৎ জননী স্বাস্থ্যতত্ত্বের নির্দেশগুলি মেনে চলেন, তবে আমেরিকায় এটা অবধারিত বলেই মেনে নেওয়া হয় যে তিনি দেশকে একটি সুন্দর স্বাস্থ্যবান সন্তান নির্বিঘ্নে উপহার দেবেন। এটার মধ্যে কোনও ভয়ের ব্যাপার আছে বলে তারা মনে করে না। আমেরিকার জননীকে উপদেশ দেওয়া হয়ে থাকে যে নিজের প্রতি তিনি যথেষ্ট সতর্ক হবেন ও যত্ন নেবেন বটে কিন্তু নিজেকে যেন তিনি রোগিনী বলে মনে না করেন। তিনি সাধারণ ভাবে সুস্থ ও সহজ স্বাস্থ্যপূর্ণ জীবন যাপন করবেন।

ধাত্রীবিদ্যাবিশারদ চিকিৎসকেরা ভবিষ্যৎ জননীদের পরীক্ষা করে থাকেন—এবং সন্তানজন্ম ব্যাপারে সাহায্য করেন, এইসব চিকিৎসকেরা মায়েদের প্রথম আটমাসে ২।৩ সপ্তাহ অন্তর দেখে থাকেন, শেষের দিকে আরও বেশী ঘন ঘন দেখেন। তারপর তিনি বাড়ীতে অথবা সন্তানজন্মের জন্য নির্দিষ্ট হাসপাতালে সন্তান প্রসব করিয়ে থাকেন। চিকিৎসক যতদিন প্রয়োজন মনে করেন ততদিন শিশু ও জননীর তত্ত্বাবধান করেন। সাধারণতঃ মা ও সন্তান দুই সপ্তাহ হাঁসপাতালে থাকেন এবং তারপরে বাড়ীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। মা যদি অনভিজ্ঞা হন তবে হাঁসপাতাল থেকে নার্স তাঁর সঙ্গে বাড়ীতে যায় এবং কয়েকদিন ধরে শিশুর স্নান করানো প্রভৃতি কাজে হাতে কলমে মাকে শিক্ষা দিয়ে থাকে। প্রায় আরও একমাস শিশু ও মা ধাত্রীবিদ্যাবিশারদের চিকিৎসাধীনে থাকেন এবং তার পরে চিকিৎসক উভয়ের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সন্তুষ্ট হলে তাঁরা চিকিৎসকের হাত থেকে রেহাই পেয়ে থাকেন। এই দশ মাসের চিকিৎসা কাযের জন্য ডাক্তারকে বেশ কিছু পারিশ্রমিক দেওয়া রীতি—তবে এর পরিমাণটা পারিবারিক অবস্থা ও মায়ের ডাক্তারের সাহায্য গ্রহণের পরিমাণের উপরে নির্ভর করে।

আমেরিকায় অনেক জননীই তাঁদের শিশুদের যত্ন প্রভৃতির জন্য বিশেষজ্ঞের পরামর্শ গ্রহণ করে থাকেন এবং সন্তানকে ধাত্রীবিদ্যাবিশারদের তত্ত্বাবধানে রেখে দেন। এই সব চিকিৎসকেরা শিশুদের চিকিৎসা করা ছাড়া মাকে নানাপ্রকার উপদেশ দিয়ে থাকেন। কি ভাবে শিশুকে আহার করানো উচিত, কি ভাবে তাদের নিয়মের অনুবর্ত্তী করা যায়, তাদের দৈহিক ও মানসিক উন্নতি কি ভাবে সম্ভবপর—এ সব বিষয়েই তাঁরা অভিজ্ঞতাপূর্ণ উপদেশ জননীকে দিয়ে থাকেন। আমেরিকার জননীরা শিশুদের প্রথম এক বৎসরের আহার-প্রণালীকে বিশেষ প্রয়োজনীয় জিনিষ বলে মনে করেন। শিশুর আহার-প্রণালী সম্বন্ধে গত পঁচিশ বৎসরে আমেরিকায় যথেষ্ট গবেষণা ও উন্নতি হয়েছে।

গর্ভাবস্থায় জননীদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ২।১টি কথা এখানে বলা যেতে পারে :—

দৈহিক ব্যায়াম :—প্রত্যহ ব্যায়াম করা বিশেষ প্রয়োজনীয়। প্রাত্যহিক গৃহকাজ যথারীতি করা যেতে পারে যদি সেই সঙ্গে যথেষ্ট মুক্তবাতাস গ্রহণের ব্যবস্থা থাকে। নির্দিষ্ট মাত্রায় হাঁটা ভাল, কিন্তু টেনিস খেলা প্রভৃতি বেশী পরিশ্রমযুক্ত ব্যায়াম একেবারেই নিষিদ্ধ।

পরিচ্ছদ :—পরিচ্ছদ বেশ ঢিলা হওয়া প্রয়োজন। কোনও প্রকার কোমর বন্ধনী অহিতকর। চার মাসের পর জননী বিশেষ ভাবে নির্মিত একপ্রকার কোমরবন্ধনী পরতে পারেন, এতে পৃষ্ঠদেশের বেদনা কমে এবং তলপেটের স্ফীতি কমে। পায়ের জুতা আরামপ্রদ হওয়া প্রয়োজন, উচ্চ গোড়ালীযুক্ত জুতা পরা নিষিদ্ধ।

স্নান :—নাতিশীতোষ্ণ জলে প্রত্যহ স্নান স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল।

দাঁতের যত্ন :—সন্তান মায়ের দেহের সঞ্চিত চূণের (lime) উপরে বিশেষ নির্ভর করে, সেজন্য মায়ের দাঁতের যত্ন লওয়া বিশেষ আবশ্যক। প্রথম ৬।৭ মাসে জননীর পক্ষে দন্তবিশেষজ্ঞের পরামর্শ গ্রহণ করা উচিৎ। প্রতিবার আহারের পরে এবং রাত্রে দাঁত পরিস্কার করা ভাল।

পুষ্টিকর খাদ্যতালিকা :—

ভবিষ্যত জননীর পক্ষে পুষ্টিকর খাদ্য সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন। জননীর ভাইটামিন ও ধাতব পদার্থযুক্ত খাদ্য—বেশী পরিমাণে গ্রহণ করা দরকার। প্রোটিন যুক্ত খাদ্যও উপকারী। অতিরিক্ত আহার করা স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর। আমেরিকার ডাক্তারেরা গর্ভাবস্থায় জননীর দেহের ওজনের প্রতি লক্ষ্য রাখেন। ওজন যদি অত্যধিক বৃদ্ধি পায় তবে তাঁহার আহারের প্রতি বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করেন।

ননী, চর্বি, মাংসের জুস প্রভৃতি না খাওয়াই ভাল, স্যালাড খাওয়া খুব উপকারী, কিন্তু তাতে ভিনিগার বা চর্বির তৈল দেওয়া নিষিদ্ধ।

মাছ ও মুরগীর মাংস খাওয়া চলতে পারে, ভাজা খাওয়া অপকারী।

প্রত্যহ ১টি অথবা ২টি ডিম, পনীর, প্রভৃতি খাওয়া ভাল।

বেশী পরিমাণে সবুজ ও টাট্‌কা শাক শবজী খাওয়া প্রয়োজন। শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য যথা আলু, মটরশুঁটী, ভূট্টা, প্রভৃতি বেশী না খাওয়াই ভাল।

স্বল্প চিনি দিয়ে সব রকম ফল খাওয়া চলতে পারে। সামান্য পরিমাণে মাখন খাওয়া ভাল। চা, কফি পরিমাণমত খাওয়া চলতে পারে। কোন প্রকার উত্তেজক মাদক দ্রব্য ব্যবহার নিষিদ্ধ।

মাঝে মাঝে মৃদু জোলাপ ব্যবহার করা ভাল, তবে উত্তেজক জোলাপ ব্যবহার করা কখনও যুক্তিসঙ্গত নয়।

প্রয়োজনীয় ভ্রমণ ছাড়া অন্যগুলি বাদ দেওয়া উচিত। খারাপ রাস্তায় যাতায়াত না করাই ভাল।

সামাজিক কর্মজীবনে অতিরিক্ত পরিশ্রম না করে যে সব কাজ করা যেতে পারে তাই করা উচিত। রাত্রে অন্ততঃ ৮ ঘণ্টা নিদ্রা প্রয়োজন। দুপুরে এক ঘণ্টা বিশ্রাম করা

ভাল। কোনও প্রকার পেটেণ্ট ঔষধ ডাক্তারের পরামর্শ না নিয়ে ব্যবহার করা উচিৎ নয়।

উপরে লিখিত নির্দেশগুলি যে কোন দেশের জননীর পক্ষেই অতি সহজে পালন করা সম্ভবপর। আমেরিকা সব সময়েই সুস্থ সবল স্বাভাবিক শিশুর জন্মলাভে এবং জননীর দ্রুত স্বাস্থ্যোন্নতির বিষয়ে যথেষ্ট মনোযোগ দিয়ে থাকে, সেই জন্যই জাতি হিসেবে তারা পৃথিবীতে অন্যতম শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করেছে। (—ইংরাজী হইতে।)

প্রশ্নোত্তর

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক, চ, কটক : স্বামী স্বাস্থ্যবান ও সচ্চরিত্র হওয়া চাই।

ব, না, সান্তাহার : সুশিক্ষিত ও ধনবান স্বামী কাম্য।

লি, গো, খড়্গপুর : স্বামীর সব গুণ থাকা চাই। সঙ্গীতে বিশেষ দখল থাকলে ভাল হয়।

প, হা, রায়পুর, সি পি : অর্থ থাকুক বা না থাকুক, স্বামী শিক্ষিত ও চরিত্রবান হওয়া বিশেষ দরকার।

বি, ব, দিল্লী : শুধু বড় চাকরী করিলেই ভাল স্বামী হয় না, সাংসারিক অবস্থাও ভাল চাই।

ম, মি, শ্যামবাজার, কলি : স্ত্রীর ক্ষমতা থাকিলে খারাপ স্বামীকে ভাল করিতে পারে।

সু, চ, ঝরিয়া : দেশের যে আইন, তাহাতে স্বামীর উপর স্ত্রীর কর্তৃত্ব করিবার অধিকার কৈ? কাজেই স্বামীরা বিবাহ করিয়া যদি স্ত্রীকে অবহেলা করে?

চ, খ, হুগলি : এ সব বিষয়ে মতামতে কুমারী মেয়েদের স্বাধীনতা কোথায়? তবে হোক বা না হোক, একটা আশা করতে দোষ কি?

শ্যা, চ, বাগবাজার, কলি : মনের মত স্বামী যখন পাওয়া যায় না তখন ভাল কল্পনা করে—খারাপ পেয়ে—কেন মিছেমিছি মন খারাপ করা?

মহুয়া, ভাগলপুর : চমৎকার স্বাস্থ্য—ভন জুয়ান না হলেও শক্তিতে সামর্থে পরিপূর্ণ পৌরুষ ভাব। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণের মাঝে দীঘল দেহটি জ্ঞানে গরিমায় তেজস্বিতায় ব্যক্তিত্বপূর্ণ ভাবে ব্যক্ত। সে হবে বিদ্বৎ—বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কা দিয়ে নয়—প্রকৃত জ্ঞান দিয়ে।

২নং প্রশ্নের উত্তর

মহুয়া, ভাগলপুর : চিরকালই মেয়েরা সংসার ও স্বামী চায়।

সু, চ, ঝরিয়া : ডিভোর্স আইন না হইলে বিবাহ করা উচিত নয়।

ম, না, চন্দননগর : বিবাহ করা বিশেষ প্রয়োজনীয়।

ক, শ, বগুরা : বিবাহ না করিলে যদি চলে, তবে না করাই উচিত।

ফু, সে, খুলনা : স্বাধীন থাকিতে হইলে, সেইরূপ শিক্ষায় তৈরি হইতে হইবে।

চ, ক, জামসেদপুর : বিবাহ না করিলে, কোনও কাজ চাই। কাজ না করিয়া অলস-ভাবে থাকিব বিবাহ করিব না—তাহা হয় না।

ভদ্রা, ঢাকা : বিবাহের গণ্ডী একটু বড় হইলে ভাল হয়।

মোতী, নোয়াখালি : বিবাহে যদি আমার মত নেওয়া হয়, তবে আমি বিবাহ করিব।

গী, গু, কলি : বিবাহ করা উচিত।

লা, ব, রংপুর : ঐ

ম, ধ, বৌবাজার, কলি : বিবাহ করা উচিত তিরিশ বছরের বেশী বয়সে।

পরলোকে কুমারী তৃপ্তিকণা
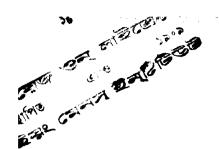
শ্রীরামপুর টকীজের (শ্রীরামপুর, হুগলী) স্বত্বাধিকারী শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠা কন্যা, শ্রীমতী তৃপ্তিকণা দেবী (ইভু) গত ১২ই ভাদ্র ১৩৫০ রবিবার (২৯-৮-৪৩) রাত্রি ৯৷০টায় ২১ দিন টাইফয়েড জ্বর ভোগ করিয়া অকালে সকলকে কাঁদাইয়া অমরধামে চলিয়া গিয়াছে। মৃত্যুকালে তাহার বয়স হইয়াছিল মাত্র ১১ বছর তিন মাস।

তৃপ্তি ছিল ষষ্ঠ মানের ছাত্রী ও অত্যন্ত মেধাবী। খেয়াল, ভজন, আধুনিক সঙ্গীতে সে ছিল বিশেষ পারদর্শিনী। নাচ, সেতার হাস্যকৌতুক (কমিক্) ও অল্প স্বল্প তবলায় সে বিশেষ সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিল। দবীর খাঁর ছাত্র শ্রীসুকুমার চক্রবর্ত্তীর কাছে সে সেতার শিখিত।

খেলাধূলায় বিশেষতঃ মোহনবাগান ক্লাবের খেলায় সে খুব উৎসাহী ছিল। সে বহুবার স্পোর্টস, সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে।

তাহার কয়েকটি পুরস্কার :

১। শ্রীরামপুর বার্ষিক স্পোর্টস—৫০ গজ গণিত রেস—দ্বিতীয় পুরস্কার (পদক)

২। খেলাঘর বার্ষিক স্পোর্টস—(কলিকাতা) ৫০ গজ স্কিপিং রেস—৩য় পুরস্কার (পদক)।

৩। শ্রীরামপুর সঙ্গীত প্রতিযোগিতা—বাংলা গানে (১৯৪১)—২য় পুরস্কার (পদক ও Certificate of Merit)।

৪। নিখিলবঙ্গ সঙ্গীত প্রতিযোগিতা—(চন্দননগর) ভজন গানে (১৯৪১) ২য় পুরস্কার (কাপ)।

৫। চন্দননগর স্পোর্টিং ক্লাব—এক মাইল সাইকেল রেস—২য় পুরস্কার (কাপ)

৬। বাণী ইউনিয়ন ক্লাব (কলিকাতা)—৭৫ গজ ফ্ল্যাট রেস—২য় পুরস্কার (পদক)।

৭। রবীন্দ্র-জয়ন্তী (২৫শে বৈশাখ ১৩৫০) উৎসবে 'ভীল' নৃত্যে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার (কাপ)

উহা আশুতোষ কলেজের অধ্যাপক পঞ্চানন সিংহের ভাগিনেয় শিশির ঘোষ কর্ত্তৃক প্রদত্ত হয়।

সে সাঁতার কাটা, গাছে উঠা, সাইকেল চালান, অল্প স্বল্প মোটর চালান, কিত্‌কিত্, গাদী, ব্যাডমিন্টন প্রভৃতি খেলায় এবং ঘুড়ি ওড়ানয় বিশেষ পারদর্শিনী ছিল। সে ছিল আনন্দবাজার—আনন্দমেলার সভ্যা (সভ্যা নং ৩০৮)।

পিতামহের একমাত্র পুত্রের দুইটি কন্যার মধ্যে সে ছিল কনিষ্ঠা। কিন্তু গর্বিত বা উদ্ধত থাকা দূরে থাকুক তাহার মুখে মিষ্ট হাসি সর্ব্বদাই লাগিয়া থাকিত। দুঃস্থকে সাহায্য করায় তাহার পরম তৃপ্তি ছিল। ১লা বৈশাখ ও গৃহের দুর্গোৎসবে নিজের দরিদ্র বন্ধুদের সে জামা, কাপড়, ইজের প্রভৃতি দিত। মেদিনীপুরের গত প্লাবনের সাহায্যকল্পে সে তাহার মনীষা নামে এক বন্ধুর সহিত বাড়ী-বাড়ী ঘুরিয়া "ডাক্তার" ছবির টিকিট বিক্রয় করে প্রায় ৫০০ টাকার।

ধনী অপেক্ষা দরিদ্র ছেলেমেয়েদের সে বেশী পছন্দ করিত ও তাহাদের সহিত খেলিতে সে খুবই ভালবাসিত। সে দরিদ্র বন্ধুদের বই শ্লেট প্রভৃতি কিনিয়া দিত এবং তাহাদের অল্প স্বল্প পড়াইত।

গত রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসবে তাহার বন্ধুদের লইয়া সে একটি নৃত্যগীতাভিনয় করে। উহাতে, সে নিজের গীত, অভিনয় ও সর্ব্বাপেক্ষা নিজ চেষ্টায় শেখা ভীল ও ঝুমুর নৃত্যে সকলকে মোহিত করে। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, ঐ অভিনয়ে রচনা ও প্রযোজনা তৃপ্তি নিজেই করিয়াছিল।

কুকুর, গরু, পায়রা প্রভৃতি পশুপক্ষী সে বড় ভালবাসিত। গৃহস্থালীর কাজ রান্না প্রভৃতি, শিল্পকর্ম—রুমাল ব্লাউজ ও উহাতে এমব্রয়ডারী, দড়ির পাপোষ, মাথার জাল প্রভৃতি সব সে তৈরী করিতে জানিত। ছোট মেয়েদের সকল ব্রত সে পালন করিয়াছিল।

উচ্চতায় সে ছিল ৫ ফুট ১ ইঞ্চি। তাহার কোমল সুঠাম গঠন, ভাসা ভাসা চোখ, কুঞ্চিত কেশ একবার দেখিলে জীবনে ভোলা যায় না।

মনে হয়, সে ছিল স্বর্গের কোন শাপ-ভ্রষ্টা দেবী। কারণ এই অল্প বয়সে এত গুণময়ী হওয়া মানবীর পক্ষে প্রায় অসম্ভব। কোন দোষ তাহার ছিল না, কেবল অশেষ গুণ। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা এই, যেন সে আবার আমাদের মাঝে ফিরিয়া আসে, আবার তাহার মিষ্ট মধুর স্বভাব দিয়া সকলকে মুগ্ধ করে, শান্তি দেয়।

বিজনদা'র চিঠি

আমার আদুরে ভাই-বোনেরা,

তোমাদের কাছে থেকে নববর্ষ উপলক্ষে বহু চিঠি পেয়ে আমি খুব খুসী হয়েছি। কিন্তু তোমাদের সবার মধ্যে যার চিঠি আমায় খুসী করেছে সব চেয়ে বেশী সেটা হচ্ছে আমাদের আসরের এক ভাই শ্রীমান নৃপেন সেনগুপ্তের লেখা। নৃপেন ও চিঠিখানা শুধু আমাকেই লেখে'নি, তোমাদেরও একসঙ্গে দিয়েছে, তাই ঐ চিঠিখানা এই আসর মারফৎ তোমাদের কাছে পৌছে দিলাম।

প্রতিযোগিতা: বহু ভাইবোনের (বিশেষ করে আসরের ছোট ছোট ভাই বোনেদের) অনুরোধ এই যে, গতানুগতিক প্রবন্ধ আর গল্প লেখা ছাড়া নতুন ধরণের কিছু প্রতিযোগিতা দেবার জন্যে ব্যবস্থা করা দরকার। যাতে করে আসরের ছোট ছোট ভাইবোনেরা সে প্রতিযোগিতায় যোগদান করে জয়ী হতে পারে। ঐ সব ভাই-বোনেদের অনুরোধে পড়ে নতুন ধরণের প্রতিযোগিতা দিলাম এবারে। অবশ্য আসরের বয়স্ক সভ্যদের কাছে বিষয়গুলি সহজই লাগবে কিন্তু তাই বলে তাদের যোগদান করার যে অধিকার নেই একথা আমি বলবো না। সবার অধিকারই এতে থাকলো…এই প্রতিযোগিতাটি আহ্বান করছে আমাদের আসরের এক বোন শ্রীঅর্চ্চনা পাল (৩৪৩) তার এক প্রিয় বান্ধবী ও খেলার সাথী এবং আমাদেরই আসরের এক পরলোকগতা বোন করুণা ভট্টাচার্য্যের স্মৃতির উদ্দেশ্যে। আজ বোন অর্চ্চনার বন্ধুপ্রীতি দেখে সত্যিই আমি মুগ্ধ হয়েছি। বর্ত্তমানে প্রকৃত-বন্ধু পাওয়ার সৌভাগ্য সবার হয় না। আমি আশা করি বোনটীর মত বন্ধুপ্রীতি তোমাদের মধ্যেও যেন দেখতে পাই। এবারের প্রতিযোগিতার পুরস্কার স্বরূপ প্রথমকে রৌপ্য কাপ এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয়কে রৌপ্যপদক দেওয়া হবে। প্রতিযোগিতায় যোগদান করার শেষ তারিখ হচ্ছে ৮ই মে।

উপন্যাস: তোমাদের লেখা ধারাবাহিক উপন্যাসের জন্য ভালো লেখা এখনও পাই নি? তাই এবারে তা গেল না। তাড়াতাড়ি ওটা তোমরা পাঠিও।…স্নেহ নিও, আজ আসি কেমন? তোমাদের: বিজনদা

রাণু আর তা'র দাদা

(২)

—রূপকুমার

বোনটী রাণু,

তোর চিঠি পড়ে হেসেছি খুব, আর সেই সঙ্গে দুঃখুও হয়েছে তোর অবস্থাটা কল্পনা করে। মাকে তুই যে জন্যে দোষী করেছিস সেটা মায়ের দোষ ঠিক নয়। ছেলেবেলায় আমাদের বাবা মারা গিয়েছেন। কাকাবাবুর কাছেই আমরা মানুষ হচ্ছি। আমি স্কুলের পড়া শেষ করে এই যে সহরে পড়বার সুযোগ পেয়েছি—সে কেবল কাকাবাবুরই দয়ায়।…তাই মার ধারণা…গরীব মানুষ আমরা…এই সংসারের কাজকর্ম্ম সব ভালো করে করতে পারলে তোর বিয়ের দিকে যেমন সুবিধে হবে, তেমনি সেখান থেকে সুখ্যাতিটা তুই পেতে পারবি।…দেখেছিস্ তো তোর জন্যে কতবার মার সঙ্গে আমি ঝগড়া পর্য্যন্ত করেছি। যাই হোক মার মনে আর কষ্ট দিস্ নি। তোর মনে যা প্রশ্ন উঠবে তুই আমাকেই তা' জিজ্ঞাসা করিস, আমি সে প্রশ্নের উত্তর যতদুর পারি সংগ্রহ করে দেবার চেষ্টা করবো এই চিঠি মারফৎ।…তোর এবারের প্রশ্নের উত্তর পাবার আগে তোকে বুঝতে হবে "সৌর-জগৎ"টা কি? তারপর আসা যাবে তোর ঐ প্রশ্নের উত্তরে। তাই এখন শোন সৌরজগতটার পরিচয়…

আকাশের দিকে চেয়ে দেখলে আমরা দেখতে পাই হাজার হাজার নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য্য আর উপগ্রহকে। আমাদের এই পৃথিবীর স্থান হচ্ছে ঐ অনন্ত আকাশে। তবুও তো আমরা সব কিছু আমাদের এই চামড়ার চোখের সাহায্যে দেখতে পাই না। দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে বা আকাশের ফটো তুললে দেখতে পাওয়া যায় কোটী কোটী নক্ষত্র, কিন্তু ওতেও সব নক্ষত্রগুলো ধরা পড়লো না, ও ছাড়া আরো অনেক

আছে।…আমরা দেখতে পাই যে নক্ষত্রগুলো যেন গায়ে গা মিলিয়ে বসে (এক ইঞ্চি তফাতে) গল্প করছে, কিন্তু তা নয়। এক একটা নক্ষত্রের মধ্যে দূরত্ব অনেক। এই যেমন ধরো না সূর্য্য, ওকে দেখলে মনে হয় ও যেন আমাদের পৃথিবীর কত কাছে। মাইল দু-চার গেলেই যেন এর নাগাল পাবো; কিন্তু জানিস কি যে, ঐ সূর্য্য পৃথিবী থেকে ন'কোটী ত্রিশ লক্ষ মাইল দূরে চুপটী করে বসে আছে!

আবার ঐ নক্ষত্রদের মধ্যেও জাতি-ভেদ আছে। যাদের নিজেদের আলো দেবার শক্তি আছে, আর সব সময়ই পরস্পরের মধ্যে সমান ব্যবধান থাকে বলে মনে হয় তাদের বলা হয় স্থির (ফিকস্‌ড্) নক্ষত্র। আর যাদের নিজেদের আলো দেবার শক্তি নেই, পরের (অর্থাৎ সূর্য্যের) আলোতে বেঁচে তারই চারিদিকে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে তাদের বলা হয় ভ্রমণশীল (প্ল্যানেট্‌স্) নক্ষত্র। তা'বলে একথা ভাবলে ভুল হবে যে যারা স্থির নক্ষত্র তারা বুঝি যুগ যুগ ধরে ওমনি করে একজায়গাতেই দাঁড়িয়ে থাকে, কিন্তু তা' নয়। ওরাও এক সময় ওদের দাঁড়িয়ে থাকার স্থান মাঝে মাঝে পরিবর্ত্তন করে, তবে সেটা দু-চারদিন পরে নয়, সেটা 'মাঝে-মাঝে' মানে বহু শতাব্দী পরে আর কি!

…পৃথিবীকে নিয়ে যে ক'টী বড় ভ্রমণ-শালী নক্ষত্র বা গ্রহ সূর্য্যকে কেন্দ্র করে কোটী কোটী মাইল দূরে দূরে আলাদা ভাবে বৃত্তাকারে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তার মোট সংখ্যা হচ্ছে আটটী। সূর্য্য থেকে আরম্ভ করে তাদের নাম হচ্ছে; বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনস্ আর নেপচুন্। আবার ঐ সব গ্রহের চারদিকে যারা বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে তাদের বলা হয় উপগ্রহ, যেমন চন্দ্র হচ্ছে পৃথিবীর উপগ্রহ।… এখন বুঝলি তো যে সৌরজগৎ বলতে সূর্য্য, উপগ্রহ সমেত ঐ আটটী গ্রহ, আর ছোটখাটো জ্যোতিষ্ক সূর্য্যের চারদিকে যারা ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদের নিয়ে বোঝায়। ……এর পরে আবার চন্দ্র, সূর্য্য আর পৃথিবীর সম্বন্ধে বলবো।…লক্ষ্মী হয়ে থাকিস্ বোন। তোর **দাদা**

মনে রেখো

"যাঁহারা এ পৃথিবীতে
হয়ে গেছেন চির ধন্য।
নিজের জন্য ভাবেন নিকো
ভেবেছিলেন পরের জন্য॥"
—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

নববর্ষের চিঠি

—নৃপেন সেনগুপ্ত (৩৮৯)

বিজনদা ও ভাইবোনরা:

প্রথমেই তোমায় নববর্ষের প্রণাম এবং ভাইবোনদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।…

আজকে নতুন বছরের প্রথম দিন। 'নতুন' কথাটা কানে আসতেই মনটা কেমন যেন হয়ে ওঠে। আজ থেকে পুরণো সব কিছুকেই যেন বিদায় দিয়েছি—দেহে মনে প্রাণে কাজকর্মে আমরা যেন হয়ে উঠেছি নতুন যুগের নতুন মানুষ, পুরণোর সংগে সকল সম্পর্ক যেন চুকে গেছে আমাদের। পয়লা বোশেখের এই যে নতুন অনুভূতিটা, এটাতেই আমাদের দেহ-মন চাঙ্গা হয়ে উঠতে চায়—এই অনুভূতিই আমাদের দেয় নতুন প্রেরণা—নতুন সঞ্জীবতা।… কিন্তু পুরণো যে বছরটি চলে গেল তার কি কোনও অস্তিত্বই আজ আর নেই—তার প্রভাব আজকের এই নতুন বছরটার ওপর কি একটুও ছায়াপাত করে নি?… নতুন আমরা কাকে বলবো! ভবিষ্যতের প্রতিটি মুহূর্তই তো আমাদের কাছে নতুন—অজানিত। আমরা এগিয়ে চলেছি অনির্দেশের পথে কালের আহ্বানে। প্রতিটি পদক্ষেপেই আমরা নতুনকে পাই—তার পরের পদক্ষেপেই সেই নতুন আবার পুরণো হয়ে পড়ে থাকে আমাদের পেছনে—এগিয়ে চলি আমরা! কিন্তু যে পদক্ষেপটা পেছনে পড়ে রইল সেটাই তো আমাদের পৌঁছিয়ে দেয় নতুনে—সেটাকে বাদ দিয়ে তো নতুনকে আমরা পেতে পারি না! আজও তেমনি পুরনো বছরটি আমাদেরকে পৌঁছিয়ে দিল নতুন বছরের সীমানায়—তাই পুরণোর অস্তিত্ব আমরা অস্বীকার করতে পারিনা কিছুতেই। পুরণোকে পাথেয় করেই আমরা প্রবেশ করি নতুনে—পুরনোর অভিজ্ঞতাই আমাদের নতুন পথের খোরাক যোগায়। পুরনো আমাদের কাছ থেকে প্রতি মূহূর্তে সরে যাচ্ছে দূরে—বহুদূরে; আর নতুন ঘনিয়ে আসছে আমাদের কাছে—এসে এসে মিলিয়ে যাচ্ছে পুরণোর সংগে আমরা চলেছি এগিয়ে—পেছনে পড়ে আছে বিরাট অতীত, আর সামনে অনন্ত, অজানিত, অপরিচিত ভবিষ্যৎ!…

কালের দুর্বার গতির ওপর দাগ কেটে যে-বিশেষ-বছরটিকে আমরা পেছনে ফেলে এলাম, একে কি ভুলতে পারবো? আমরা হয়তো পারবো—কিন্তু পারবে না আমাদের জাতির ইতিহাস—বাংগালীর ইতিহাসের অমর পাতায় বাংলার এই চলে-যাওয়া বছরটি চিরদিনের জন্যে আঁকা থাকবে—সোণার অক্ষরে নয়, বুভুক্ষু বাংগালীর দুঃখ, বেদনা আর মরণের কালো কালিতে। বাংগালীর এ চোখের জল কোনওদিন শুকোবে না ইতিহাসের পাতা থেকে। বাংলার এই বছরটীর ওপর কোনও দিন রাঙা সূর্য্য হাসবে না—কোনওদিন পূর্ণিমার চাঁদ দেখা দেবে না; এই চলে যাওয়া-বছরটি ঘোর অমানিশার কালো আঁধারে হয়ে থাকবে চির কলংকিত!…একশো বছরের ভাবী বাংগালী ইতিহাসে পড়বে এই ত গত বছরটির করুণ কাহিনী—পড়বে বাংগালীর ঘোর দুর্দিনের কথা—পড়বে বিংশ শতাব্দীতে বাংগালীজাতি পশুর সংগে একপাত্রে আহার করেছিল—পরিত্যক্ত, পচা ডাষ্টবিনের খাবা-রের জন্যে পশুর সংগে লড়াই করেছিল, কিন্তু পারেনি— হীন পশুও সেদিন বাংগালীর চেয়ে শক্তিশালী হয়ে পড়েছিল; সভ্যতা-গর্বিত বিংশ শতাব্দীর বাংগালী হয়েছিল শেয়াল-কুকুরের প্রিয় খাবার! বাংগালীর মাংস খেয়েছে শেয়াল—বাংগালীর মাংস খেয়েছে কুকুর—বাংগালীর মাংস খেয়েছে শকুনী—গৃধিনী!!! …কিন্তু একবিংশ শতাব্দীর বাংগালী ইতিহাসের পাতায় পড়ে বাংলার এই সত্যি-কারের মূর্তিটি কি দেখতে পাবে? গেল বছরটিতে যে-দৃশ্য বাংলার সর্বত্র দেখা গিয়েছিল চোখে না দেখে কেউ কি সেটা বিশ্বাস করতে পারবে? এ-দৃশ্যের হুবহু রূপ বর্ণনা করবার মতো ক্ষমতা কি ভাষার আছে?…

আজ এই নতুন বছরে আমাদের প্রতিজ্ঞা হবে গেল বছরের ঝড়কে বাংগালীর জীবনের ওপর দিয়ে আবার নতুন করে বইতে দোব না আমরা। জাতির সমবেত শক্তি নিয়ে দাঁড়াতে হবে এই সর্বনাশা ঝড়ের গতিরোধ করতে! বাংলাকে বাংগালীকে বাঁচাতে হলে আজ আমাদের নিজেদের ছোট খাটো স্বার্থ দ্বন্দ্ব ভুলে সারাদেশ, সারা জাতির স্বার্থের সঙ্গে এক করে নিতে হবে। বাংলার এই দুর্দিনে বাংগালীকেই এগিয়ে আসতে হবে বাংগালীর প্রাণ বাঁচাতে—পরের মুখের দিকে চেয়ে বসে থাকলে আজ আর চলবে না আমাদের।…

এসো ভাইবোনেরা, আজ এই শুভ নতুন বছরের প্রথম দিনে গলা মিলিয়ে আমরা প্রতিজ্ঞা করি—বাংলাকে বাঁচাতে হবে, বাংগালীকে বাঁচাতে হবে।…

নতুন প্রতিযোগিতা

গতবারে বলেছিলাম যে তোমাদের এবার সম্পূর্ণ নতুন ধরণের প্রতিযোগিতার বন্দোবস্ত করব। দেখ দিকি কি রকম হ'ল।

১। মনে কর এই গুলি সব দেশলাইয়ের কাঠি। এর মধ্যে ২৭টা দেশলাইয়ের কাঠি আছে, এমন ভাবে এগুলোকে সাজান হয়েছে যে দশটি ঘরে পরিণত হয়েছে। এখন তোমাদের করতে হবে কি জানো? এর মধ্যে থেকে ১৩টি কাঠি সরিয়ে নড়িয়ে এমন ভাবে সাজাও যাতে করে ৫টি স্কোয়ার ও মধ্যে ৯ পাওয়া যাবে।

২। এমন একটা সংখ্যাকে ৮ বার এমন ভাবে সাজিয়ে যোগ কর যার ফলাফল হবে ৫০০।

৩। এই অসাধারণ বংশ-পরিচয়টি লক্ষ্য কর।

রায়বাহাদুর করুণা সেন
- খগেন
  - সুমিত্রা বিয়ে করেছে সমরেশকে
- নীলা বিয়ে করেছে সুজিৎ গুপ্তকে
  - সুষমা বিয়ে করেছে অমরেশকে
- নগেন

উপরে যে সব নামগুলি দেখছ তার মধ্যে থেকে একজন একজনকে বলছে: "You are my brother's son-in-law, my son's brother-in-law and also my brother-in-law's son." (ভদ্রলোক বহুকাল ধরে বিলেতে আছেন। বাংলা ভাষায় কথা বলতে গেলে আটকে যান, সেই জন্যে সকলের সঙ্গেই তিনি ইংরাজী বলেন)। এখন বলো তো কে কার সঙ্গে কথা বলছে?

৪। তোমাদের মধ্যে অনেকেই টেনিস খেলো, আর না খেললেও দেখেছ নিশ্চয়ই। বল যখন সার্ভ করা হয় তখন বল যদি জালে লাগে তাকে "Let" বলা হয় কেন? এই কথাটার উৎপত্তি সম্বন্ধে জানাও।

ছুটির ঘণ্টা ২৮নং প্রতিযোগিতা কুপন।

নাম ....

বয়স: ....

ঠিকানা: ....

যুদ্ধকালে বিজ্ঞানের উন্নতি

১৯৪৩ সালে নিম্নলিখিত ১০টি বিষয়ে বিজ্ঞানের উন্নতি সাধিত হইয়াছে:—

(১) প্রচুর পরিমাণে পেনিসিলিন (Penicillin) তৈরির উপায় উদ্ভাবন।

(২) সম্মিলিত মিত্রশক্তির সেনা ও নৌবাহিনীর মেডিক্যাল কোর এখন শতকরা ৯৭ হইতে ৯৯ জন আহতকে পূর্ণ কার্য্যক্ষম করিবার উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। ইহার ফলে শতকরা ৪১ হইতে ৪৩ জন আহত ব্যক্তি নিরাময় হইয়া পুনরায় যুদ্ধে ফিরিয়া যাইতেছে।

(৩) উন্নত ধরণের বিমান ও বাজুকা (Bazooka—anti-aircraft gun) এবং অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র ভাল ভাল রকম ডিজাইন তৈরি হইয়াছে।

(৪) দন্ত চিকিৎসায় একটি নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রমাণ হইয়াছে যে মুখের থুতু সকল রকম বীজাণুর আক্রমণ হইতে দাঁতকে রক্ষা করে। অথচ ল্যাকটিক এ্যাসিডে যাহা কিছু খাদ্যের চিনি ও শ্বেতসার (strach) প্রভৃতি পচিয়া তৈরি হয়, তাহার কাছে থুতুর শক্তি পরাজিত।

(৫) মনস্তত্ত্বেরও একটি দিক উদ্ঘাটিত হইয়াছে। যুদ্ধের দরুণ স্নায়বিক দুর্ব্বলতার পরীক্ষা হইতেই উক্ত তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে।

(৬) পেট্রোলিয়মের দ্বারা যুদ্ধে ব্যবহৃত অত্যাবশ্যকীয় বহু যন্ত্রপাতি মেরামৎ।

(৭) বকসাইট (Bauxite) হইতে শতকরা ৭০ হইতে ৯০ ভাগ এলুমিনিয়াম নিষ্কাশন পদ্ধতির নূতন রীতি।

(৮) মৃতদেহের স্নায়ু দ্বারা জীবিত ব্যক্তির আহত স্নায়ু মেরামৎ।

(৯) meteorology বিজ্ঞানে অর্থাৎ জলবায়ুর অবস্থা ও সম্ভাবনা বিষয়েও অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে।

(১০) মাংস ও সমজাতীয় খাদ্যের মধ্যে যে পরিমাণ yeast পাওয়া যায় তদনুরূপ yeastযুক্ত অন্য খাদ্য আবিষ্কার। নবাবিষ্কৃত এই খাদ্যও স্বাদে ও শক্তিতে মাংসাদি খাদ্যেরই সমান।—

—Burma Shell N. S.

খেলার মাঠে

শ্রীউমেশ মল্লিক বি, এ

একপদবিশিষ্ট জনৈক ছাত্রের ৫ ফিঃ ৭ ইঃ হাইজাম্প করার মধ্যে যে অভিনবত্ব আছে তা সর্ব্ব সাধারণ্যে স্বীকার্য্য। "ক্রাচ" সহ দ্রুতগতিতে দৌড়ে এসে উচ্চ লম্ফের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে "ক্রাচ" ফেলে লাফ দিয়ে উপরোক্ত হাইডেলবার্গ কলেজের ছাত্রটি প্রিটোরিয়ার ইণ্টারন্যাশনাল খেলাধূলায় উচ্চ লম্ফে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। এর নাম ভাইল রস। এই ছাত্রটির অপূর্ব্ব কৃতিত্বে ক্রীড়ামোদীমাত্রই বিস্ময়াবিষ্ট হবেন সন্দেহ নেই।

* * *

আগামী ২রা মে থেকে প্রথম বিভাগীয় ফুটবল লীগ ও অন্যান্য বিভাগের ফুটবল খেলা কলকাতায় আরম্ভ হবে। বাঙ্গালা দেশে ফুটবল খেলার মত জনপ্রিয় খেলা আর নেই। ফলে উত্তেজনা ও চাঞ্চল্যের অভাব হয় না। "রিটার্ণ" গেমগুলি এ বৎসরের লীগ প্রতিযোগিতা থেকে বাদ দেওয়ার কথা এখনো বিচারাধীনে আছে। এ গেমগুলিকে বাদ দেওয়ার তাৎপর্য্য এই কি যে আই, এফ্, এ শীল্ডের অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বীতার সমাপ্তিতে বিশেষ দেরী হয়ে যায়?

* * *

আসানসোলের বুধাডাঙ্গা এথেলেটিক ক্লাবের পঞ্চদশ বাৎসরিক অনুষ্ঠান মহা সমারোহে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানের অল্পবয়স্ক বালক-বালিকারা ব্যায়াম ক্রীড়া প্রদর্শনে উপস্থিত জনতাকে মুগ্ধ করেন। তন্মধ্যে কানন, সিতু, পুনু, দেবু, শম্ভু, শ্যামল প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। পরিশেষে এই প্রতিষ্ঠানের মিঃ পাল (যিনি নিঃ ভাঃ অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় ভার উত্তোলনে স্বীয় রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করেন) ভার উত্তোলন প্রদর্শন করেন। ব্যায়াম-শিক্ষক মহাশয়ের বক্তৃতাটি মনোজ্ঞ হয়ে উঠে।

* * *

বাইটন কাপের খেলা—

এপ্রিল ১৯শে—বুধবার

বি এন্ আর ৪—রেঞ্জার্স—০
মিঃ মেডিঃ ২—ডালহৌসী—১

এপ্রিল ২০শে—বৃহস্পতিবার

মোহনবাগান ৭—ইউ স্পোঃ—১
ইঃ বিঃ ০—ডেভিলস্—০
বি জি প্রেস ১—পুলিশ—০

এপ্রিল ২১শে—শুক্রবার

ইঃ বি ১—ডেভিলস্—০
পোর্ট কমিঃ ২—খড়্গপুর—১

এপ্রিল ২২শে—শনিবার

কাষ্টমস ১—মোঃ বাঃ—০
বি জি প্রেস ৩—মহঃ স্পোঃ—০

এপ্রিল ২৪শে—সোমবার

জিয়াজী ক্লাব ২—মেমারার্স—১
ইঃ বি ২—জামালপুর—১
কাষ্টমস ৩—গ্রীয়ার—১

এপ্রিল ২৫শে—মঙ্গলবার

ইঃ বিঃ ০—বি এন্ আর—১
পোর্ট কমিঃ ১—বিঃ জি প্রেস—০
মিঃ মেডি ১—জিয়াজী ক্লাব—৩

* * *

গত মঙ্গলবারের প্রতিযোগিতায় বাইটন কাপের বিশিষ্ট প্রতিযোগীদের মধ্যে অনেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে বিদায় নিয়েছে। মোহনবাগানকে পরাজিত করার পর কাষ্টমস আর একটি প্রতিবন্ধক গ্রীয়ারকে ৩—১ গোলে পরাজিত করেছে। কাষ্টমসের পূর্ব্ববর্ত্তী প্রখ্যাতনামা খেলোয়াড়রা যোগদান করায় কাষ্টমস দলটি শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। বি, জি, প্রেস মহমেডানদের পরাজিত করে পোর্ট কমিশনারের কাছে ১—০ পরাজিত হয়েছে।

অনিবার্য্য কারণে (গমনাগমনের অসুবিধা) ভগবন্ত ক্লাব এই প্রতিযোগিতা থেকে বিরত হয়েছে।

* * *

আন্তঃকলেজীয় লীগে কারমাইকেল কলেজ পোষ্ট গ্র্যাজুয়েটকে ৪—২ গোলে পরাজিত করে শীর্ষ স্থান অধিকার করেছে।

প্রশ্নোত্তর

শ্রীযুক্ত দীপালী সম্পাদক সমীপে

মহাশয়—

আপনারা মেয়েদের জন্য প্রশ্নোত্তরের ব্যবস্থা করেছেন, কিন্তু একটা জাতির মেয়েরাই সব নয়। আপনাদের ছেলেদের বিভাগও আছে, নাই কেবল পুরুদের জন্যে কিছু। আমি তাই প্রস্তাব করচি যে পুরুষদের জন্যে একটা প্রশ্নোত্তর বিভাগ খুললে কেমন হয়? যদি আপনি রাজী থাকেন, তাহলে আমার এই প্রশ্নটি ছাপবেন এবং দীপালীর পাঠক পাঠিকাগণকে আমি এর উত্তর দেবার জন্যে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করচি।

প্রশ্নর সঙ্গে আমার নাম যেন ছাপবেন না, কারণ বুঝতেই পারচেন। তবে পত্র-মধ্যে আমার নাম ও পুরো ঠিকানা আমি দিয়ে দিলাম। ইতি

কানাই,—ঢাকা

প্রশ্ন

অভিনেত্রীদিগকে বিবাহ করা উচিত কি না? যদি অনুচিত হয়, তবে কেন?

[উত্তরদাতা সংক্ষেপে উত্তর দিবেন এবং যে নামে তাহা প্রকাশিত হইবে সেটি উত্তরের নীচে লিখিবেন। সঃ দীঃ]

ছোটদের আনন্দ পরিবেশন

আমাদের দেশে ছোটদের জন্য এ পর্য্যন্ত কোন আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা হয় নাই বা স্থায়ী কোনো ব্যবস্থাই নাই। সেজন্যে তারা বড়দের থিয়েটার, বড়দের সিনেমা দেখিয়াই আনন্দ লাভের চেষ্টা করে। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে আগামী ২রা মে সন্ধ্যা ৬ টায় শ্রীরঙ্গমে নাচ, গান, অভিনয় প্রভৃতি এক বিচিত্রার আয়োজন করা হইয়াছে। বাংলা দেশের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের এই অনুষ্ঠানে যোগ দিবার জন্য আহ্বান জানাইয়াছেন শ্রীইন্দিরা দেবী। এই আয়োজনের প্রধান বিশেষত্ব এই যে ছোটদের অনুষ্ঠান ছোটদের দ্বারাই অনুষ্ঠিত হইবে তবে তাহাদের আনন্দের জন্য দুই একজন বড় গুণীকেও দেখা যাইবে।

আমরা এই অনুষ্ঠানটির সাফল্য কামনা করি।

রবি-বাসর

গত রবিবার ১০ই বৈশাখ অপরাহ্ন ৬ ঘটিকার সময় রবি-বাসরের সর্বাধ্যক্ষ রায় বাহাদুর শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের ৬নং বালিগঞ্জ প্লেসস্থ ভবনে রবি-বাসরের পঞ্চদশ বর্ষের প্রথম অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। উক্ত দিন শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার মহাশয়ের অকাল মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হয়। প্রফুল্লকুমার সম্বন্ধে যাঁহারা বক্তৃতা করেন তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, নরেন্দ্র দেব, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতিষ ঘোষ, শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, নরেন্দ্রনাথ বসু উল্লেখযোগ্য।

সাহিত্য-বাসর

গত ২১শে এপ্রিল, শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয় ঘটিকার সময় কলিকাতা ২৫৭-বি, বৌবাজার ষ্ট্রীটের তেতলায় সাহিত্য-বাসরের এক সাধারণ অধিবেশনে 'আনন্দবাজার' পত্রিকার সম্পাদক প্রফুল্লকুমার সরকার মহাশয়ের অকালপ্রয়াণে শোক প্রকাশ করা হয়। 'অমৃতবাজার' পত্রিকার শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি বসু মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

অল বেঙ্গল কালচারাল এসোসিয়েশন

গত ১লা বৈশাখ দিবসে কালিঘাটের শ্রীযুক্ত গুরুপদ হালদার মহাশয়ের 'দর্শনাগার' ভবনে অধ্যাপক অমলকুমার রায় চৌধুরীর সভাপতিত্বে 'এ, বি সি, এ'র উদ্যোগে 'নববর্ষ' উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন।

অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে শ্রীযুক্ত পঙ্কজ মল্লিকের পরিচালনায় অশোকা, নমিতা, বাণী হালদার এবং রমা, ধীরেন, মীরা ও সোমেন ব্যানার্জ্জির কণ্ঠে 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীত শ্রুতিমধুর হয়। পণ্ডিত অশোকনাথ শাস্ত্রীর 'রস' সম্বন্ধে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনাটি সকলের উপভোগ্য হইয়াছিল, বাণীকুমারের 'নববর্ষ' সকলকে আনন্দ দান করিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত অজিত চট্টোপাধ্যায়ের হাস্যরস পরিবেশনে এবং পঙ্কজবাবু, সুখেন্দু গোস্বামী ও বিমলভূষণের সঙ্গীত ও প্রসিদ্ধ হারমোনিয়ম বাদক মণ্টু ব্যানার্জ্জির হারমোনিয়াম এবং রঘুনাথ মহাদেওর সেতার সমবেত ভদ্রমণ্ডলীকে যথেষ্ট আনন্দদান করিয়াছিল। তবলা সঙ্গত করেন কেরামৎ উল্লা খাঁ ও রথীন ঘোষ।

পরলোকে সত্য প্রসাদ দত্ত

গত ৫ই বৈশাখ মঙ্গলবার ১১নং ফকির চাঁদ মিত্র ষ্ট্রীট-নিবাসী সত্যপ্রসাদ দত্ত মহাশয় মাত্র দুই দিনের রোগে ৫৬ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। ইনি রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের দৌহিত্র ছিলেন। প্রথম জীবনে কলিকাতা জেনারেল পোষ্ট আফিসে সামান্য ১৫ টাকা বেতনে কার্য্য আরম্ভ করিয়া সততা ও অধ্যবসায়ের গুণে বিভাগীয় ম্যানেজারের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। তাঁহার অমায়িক ব্যবহারে প্রতিবেশী ও সহকর্মীগণ মুগ্ধ ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি বিধবা পত্নী, ছয় পুত্র, তিন কন্যা ও নাতি নাতনী রাখিয়া গিয়াছেন। মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা জানাইয়া পোষ্ট আফিসের কয়েকটি বিভাগ সেদিন বন্ধ হইয়াছিল।

"চণ্ডীদাস" গীতাভিনয়

গত ১৬ই এপ্রিল হাওড়া ব্যাঁটরা পরিষদ ও পূরবী অর্কেষ্ট্রার উদ্যোগে এবং ডাঃ গৌরীশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে পরিষদ-প্রাঙ্গনে এক দুঃস্থ ভদ্র পরিবারের সাহায্যার্থে ভবানীপুর সমাজ কর্তৃক "চণ্ডীদাস" গীতাভিনয়টি সাফল্যের সহিত অভিনীত হইয়া গিয়াছে।

পলাশীতে সাহায্য-রজনী

গত ২রা বৈশাখ নদীয়া জেলার পলাশী গ্রামের উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের সাহায্য কল্পে একটি সাহায্য-রজনীর অনুষ্ঠান হয়। মুষ্টিযোদ্ধা রবীন সরকার তাঁহার সম্প্রদায়ের

কতকগুলি বিশিষ্ট শিল্পীদিগের দ্বারা নানাবিধ নৃত্যগীত প্রদর্শনী পরিচালনা করেন। সঙ্গীতে পূর্ণেন্দু মুখার্জি ও সুহৃৎ মিত্র, তবলা সঙ্গীতে প্রবোধ ভট্টাচার্য্য, বেহালা বাদ্যে অজিত চক্রবর্ত্তী, নৃত্যে অমিতা বসু ও রবীন সরকার, মুষ্টিযুদ্ধে রবীন ভট্টাচার্য্য ও শৈলেন সরকার, রোলার ব্যালান্স তারক ভড়, স্বরোদ বাদ্যে শান্তি চ্যাটার্জ্জী, বাঁশীতে হেম চক্রবর্ত্তী, হাস্যকৌতুকে রবীন ভট্টাচার্য্য ও শৈলেন সরকার দর্শকদের আনন্দ দান করিয়া প্রশংসা অর্জন করেন।

খঞ্জনপুর সংবাদ (বগুড়া)

গত ১লা বৈশাখ শুক্রবার দিন সন্ধ্যা ৭টার সময়ে খঞ্জনপুর ক্লাবে চতুর্থ বার্ষিকী উৎসব মাননীয় হাকিম মৌলভী হোসেন আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।

কুমারী রেণুকা, সবিতা, হাসি ও রাণী 'জাগ্রত ভগবান' উদ্বোধন সঙ্গীত গাহিবার পর উৎসবের প্রধান উদ্যোক্তা শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ উৎসবের প্রয়োজনীয়তা ও ছেলেমেয়েদের সংশিক্ষার বিষয় উল্লেখ করেন। ইহার পর শ্রীনিমাই ও অনুপম ঘোষ কবিতা পাঠ, কুমারী অপরাজিতা ঘোষ আবৃত্তি ও সবিতা, হাসি, কল্যাণী প্রভৃতি গান করে। স্থানীয় হাইস্কুলের প্রবীন হেড মাষ্টার শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রকুমার বাগচি, শ্রীবীরেন্দ্র নাথ ঘোষ বক্তৃতা করিবার পর সভাপতি মহাশয় পুরস্কার বিতরণ করেন। কুমারী সবিতা গানে প্রথম পুরস্কার লাভ করে। সবশেষে সভাপতি মহাশয় অভিভাষণ পাঠ করেন ও জনসাধারণের প্রতি প্রীতি শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। কিশোরদের দ্বারা সমাপ্তি সংঙ্গীত গাহিবার পর সভা ভঙ্গ হয়।

সাহায্য রজনী

আগামী ৩রা জুন শনিবার মহেশতলায় মহেশতলা ক্লাব এণ্ড লাইব্রেরী কর্ত্তৃক পাঠাগার বিভাগের সাহায্যকল্পে একটি জলসা হইবে। পরে ক্লাব কর্ত্তৃক "কেদার রায়" অভিনীত হইবে। জনসাধারণের সাহায্য প্রার্থনীয়।

নাটমণ্ডপ

এ সপ্তাহের আকর্ষণ

এ সপ্তাহে চারিখানি ছবি মুক্তিলাভ করিবে। তার মধ্যে তিনখানি হিন্দী ও একখানি বাংলা।

'উত্তরা'য় "মাটির ঘর" ২৯শে এপ্রিল হইতে প্রথমারম্ভ। ছবিখানি অভিনেতৃ সমাবেশের দিক দিয়া এবং নাট্যবস্তুর দিক দিয়া অনবদ্য। অহীন্দ্র চৌধুরী, ছবি বিশ্বাস, জহর গাঙ্গুলী, রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, তুলসী লাহিড়ী, মলিনা, পদ্মা, জ্যোৎস্না গুপ্তা প্রভৃতি অভিনেতৃবৃন্দ "মাটির ঘরের" বিভিন্ন চরিত্রে রূপ দিয়াছেন। গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালনা করিয়াছেন।

নিউ থিয়েটার্সের "ওয়াপস্" একটি উল্লেখযোগ্য অবদান। বোম্বাই, লাহোর প্রভৃতি স্থানের চিত্ররসিকরা "ওয়াপস্"-কে যে বিপুল সম্বর্দ্ধনা জানাইয়াছেন তাহা বিস্ময়কর। ইহাতে ভারতী, অসিতবরণ, নবাব, ধীরাজ ভট্টাচার্য্য, দেববালা, ইন্দু মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি অভিনয় করিয়াছেন এবং সঙ্গীত পরিচালনা করিয়াছেন রাইচাঁদ বড়াল। আগামী কল্য হইতে চিত্রা, নিউ সিনেমা ও রূপালীতে ছবিখানি মুক্তিলাভ করিবে।

প্যারামাউন্ট সিনেমায় কমলরায় পিকচার্সের "শাহানশা আকবর" এ সপ্তাহের আর একখানি উল্লেখযোগ্য চিত্রমুক্তি। ছবিখানিতে বিগত দিনের মোগল-গৌরব-গাথা যে রূপ পাইয়াছে তাহা স্মরণীয়। ইহাতে বনমালা, কুমার, হুসন বানু, কে, এন, সিং, আজুরী, বিক্রম কাপুর প্রভৃতি অভিনয় করিয়াছেন।

চতুর্থ ছবিখানি হইল নবযুগ চিত্রপটের "নয়া তারাণা"। এখানি প্রভাত টকীজে মুক্তিলাভ করিবে। ইহাতে স্নেহপ্রভা প্রধান, জয়রাজ, ডেভিড প্রভৃতি খ্যাতনামা অভিনেতৃবৃন্দ অভিনয় করিয়াছেন।

* * *

এম, পি, প্রোডাকশানের "বিদেশিনী"র সামান্য দুই একটা দৃশ্য ছাড়া অন্যান্য চিত্রগ্রহণ সমাপ্ত হইয়াছে। কমল দাশগুপ্তের সুর-সংযোজনা "বিদেশিনীর" অন্যতম সম্পদ বলিয়া পরিগণিত হইবে।

* * *

পরিচালক সুকুমার দাশগুপ্ত সম্প্রতি বেনারস গিয়াছিলেন রূপশ্রী লিমিটেডের "নন্দিতা" ছবির কয়েকটি বহির্দৃশ্য গ্রহণের জন্য। এখন বেনারস হইতে ফিরিয়া পূর্ণোদ্যমে শুটিং আরম্ভ করিয়াছেন। শ্রীমতী মলিনা নাম ভূমিকায় চিত্রাবতরণ করিতেছেন। ইহাতেও কমল দাশগুপ্ত সুর-সংযোজনা করিতেছেন।

* * *

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় কালী ফিল্মসের "অভিনয় নয়" ছবিখানির যথারীতি শুটিং চলিতেছে।

বর্দ্ধমান নাট্য-সমাজ

"প্রাণের দাবী" "বিশবছর আগে" ও "মারাঠা মোগল" প্রভৃতি নাটকগুলি বর্দ্ধমান, আসানসোল, জামুরিয়া, কাটোয়া কালনা প্রভৃতি স্থানে শীঘ্রই মঞ্চস্থ করিয়া অভিনয়ের সংগৃহীত অর্থ জেলা ষ্টুডেন্ট রিলিফ বোর্ডে দান করিবেন বলিয়া মনস্থ করিয়াছেন। নাটকগুলির পরিচালনা এবং বিশিষ্ট ভূমিকায় অবতীর্ণ হইবেন শ্রীযুক্ত তারাগতি চক্রবর্ত্তী এবং সুর-সংযোজনা করিবেন শ্রীযুক্ত প্রাণগোবিন্দ চট্টোপাধ্যায়। নিম্নলিখিত ভদ্র মহোদয়গণ বিভিন্ন অংশ গ্রহণ করিবেন—শ্রীবিমল চাঁদ কপূর, শ্রীউমা মুখার্জ্জী, শ্রীশঙ্কর মুখার্জ্জী, শ্রীকৃষ্ণ হালদার, শ্রীবিভূতি ভূষণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীপ্রফুল্ল চৌধুরী, শ্রীকমল রায়, শ্রীঅভয় সরকার পূর্ণঘোষ, মধু শীল, সুধাংশু পাল, ও নবীন হক্।

বেঙ্গল ফিল্ম ডিষ্ট্রীবিউটর্স

উক্ত প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন অনুষ্ঠান গত ২৪শে এপ্রিল সোমবার শ্রীযুক্ত নির্ম্মল ঘোষের সভাপতিত্বে সুসম্পন্ন হয়। সভায় বহু সাংবাদিক ও ভদ্রমহোদয় উপস্থিত ছিলেন। কোম্পানীর অন্যতম অংশীদার মিঃ হাসান সকলকে ভূরিভোজে পরিতৃপ্ত করেন। আমরা এই নবজাত প্রতিষ্ঠানের সাফল্য কামনা করি।

দীপালীর স্বত্বাধিকারী শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত, ১২৩৷১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, দীপালী প্রেসে মুদ্রিত ও দীপালী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত

প্রধান সম্পাদক—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় :: সহঃ সম্পাদক—শ্রীধীরেন্দ্রমোহন মজুমদার বি. এল.

১৬শ বর্ষ VOL. XVI. } ২১শে বৈশাখ ১৩৫১ :: May 4, 1944 { ১৮শ সংখ্যা No. 18

আলোচনী

জাতীয় জীবনে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির মৃত্যু শোকাবহ সন্দেহ নাই। মৃত ব্যক্তি জীবিতকালে সাংবাদিক, সাহিত্যিক বা রাষ্ট্রনীতিক হিসাবে সুনাম ও জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিতে পারেন। এই জনপ্রিয়তা সব ক্ষেত্রে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে না। তাহা সম্ভবও নয়। প্রতিষ্ঠাবান রাষ্ট্রনীতিক দলের সহিত যুক্ত থাকিলে এবং কিছু কূটনীতিক জ্ঞান আয়ত্ত করিতে পারিলে বাংলা দেশে সুনাম অর্জ্জন করা যায়। শুধু বাংলা দেশে কেন সর্ব্বত্রই এইরূপ হইয়া থাকে। তাহার উপর নিজস্ব বা দলীয় সংবাদপত্র থাকিলে তো কথাই নাই। মৃত ব্যক্তির উপর সম্ভব ও অসম্ভব সর্ব্বপ্রকার গুণ আরোপ করিতে পারিলেই যে বেশী শ্রদ্ধা দেখান হইল তাহা আমরা মনে করি না, অথচ বর্ত্তমানে বাংলা সংবাদপত্রের ইহাই রীতি হইয়া উঠিয়াছে। মৃত ব্যক্তি প্রতিবাদ করিতে পারেন না; পারিলে অতি-প্রশস্তির এই বাগাড়ম্বরে তিনি লজ্জিত হইতেন। সংবাদপত্র হাতে থাকিলেই যে দলীয় ব্যক্তির তিরোধানে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ব্যয় করিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। এতদ্বারা এই কাগজের দুর্ম্মূল্যের দিনে সংবাদপাঠকবর্গের প্রতিও অবিচার করা হয়। মাত্রাজ্ঞানের কথা নাই তুলিলাম। অবশ্য মৃত্যুকে উপলক্ষ করিয়াও যে রীতিমত ব্যবসায় বুদ্ধির পরিচয় দেওয়া যায় ইহা আমরা স্বীকার করি।

* * *

বেনারসের খ্যাতনামা নেতা শিবপ্রসাদ গুপ্তের মৃত্যুর সহিত সে যুগের একজন জাতীয়তাবাদী নেতাকে আমরা হারাইয়াছি। মাত্র সেদিন বিজয়রাঘব আচারিয়ার তিরোধান ঘটিয়াছে, তাহার পরই এই দুঃসংবাদ। ইহা আমাদের জাতীয় দুর্ভাগ্যেরই সূচনা করিতেছে। ইঁহারা প্রত্যেকেই স্বাদেশিকতার কতবড় দৃষ্টান্তস্থল হইয়া বর্ত্তমান ছিলেন আজ আমরা তাহা অনুভব করিতেছি। দীর্ঘদিন সংঘর্ষের পর রণক্লান্ত হইয়া ইঁহারা রাজনীতিক পাদপ্রদীপের অন্তরালে অবস্থান করিতেছিলেন সত্য, তথাপি তাঁহাদের আদর্শবাদী মন এযুগের অন্তরেও প্রেরণা ও শক্তি সঞ্চার করিয়াছিল। ইঁহারা ছিলেন অতিকায় যুগের মানুষ—যে যুগ আজ গত হইয়া সাধারণ মাপের মানুষ সৃষ্টি করিতেছে। শিবপ্রসাদ গোখেল, অ্যানি বেসান্ট, লাজপত, চিত্তরঞ্জন প্রভৃতি রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে অন্তরঙ্গ সহকর্ম্মী ছিলেন। বেনারসের হিন্দি দৈনিক "আজ" শিবপ্রসাদ গুপ্তের কৃতিত্বের অন্যতম পরিচয়। জাতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নতির জন্যও তিনি ১৫ লক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। উত্তর ভারতের ইতিহাসে শিবপ্রসাদের নাম স্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

* * *

১৯৪৪—৪৫-এর বৃটিশ বাজেট প্রকাশিত হইয়াছে। বাজেট বক্তৃতার একস্থানে স্যার জন এ্যাণ্ডারসন বৃটেনের মূল্য-বৃদ্ধির হার বিশ্লেষণ করিয়াছেন। বৃটেনে গড়ে মূল্য

বৃদ্ধি হইয়াছে শতকরা ২৮%। দীপালীর গত সংখ্যায় আমরা কলিকাতায় মূল্যবৃদ্ধির হার লইয়া বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। এই মূল্যবৃদ্ধির পরিমাণ ২৫০%। অবস্থার তারতম্য ইহা হইতে বুঝা যাইবে। কলিকাতা বৃটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় মহানগরী অথচ এখানে বৎসরাধিক কাল ধরিয়া দ্রব্যমূল্যের ব্যাপারে অবর্ণনীয় অরাজকতা চলিতেছে। বৃটেনকে সারা পৃথিবী হইতে খাদ্য আহরণ করিতে হয়। যুদ্ধ বলিয়া নয়, স্বাভাবিক সময়েও খাদ্যের জন্য—আমদানীর উপর নির্ভর করা ছাড়া তাহার গত্যন্তর নাই। ইহার উপর চলিতেছে পৃথিবীব্যাপী সংঘর্ষ—সে সংঘর্ষের প্রাণকেন্দ্র আজ এই ক্ষুদ্র দ্বীপটিকে আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। ...এই বিরাট প্লাবনের মধ্যস্থলে থাকিয়াও সেদেশের কল্যাণবোধ জনসাধারণের মুখ চাহিয়া কর্ম্মরত রহিয়াছে। আজ ভারতের পূর্ব্ব প্রান্তেও যুদ্ধের আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে সত্য কিন্তু বৎসরাধিক কাল ধরিয়া যে বীভৎসতা ও নীতিহীনতা সারা জাতিকে মুমূর্ষু করিয়া তুলিল তাহার যুক্তি কোথায়? কোটি কোটি অর্থব্যয় করিয়া যে শাসনের ইমারৎ এখানেও গড়িয়া উঠিয়াছে মানুষের দুষ্প্রবৃত্তি দমন করিতে তাহা ব্যর্থ হইল কেন?

* * *

শিক্ষাকেন্দ্রেও সাম্প্রদায়িকতার বিষাক্ত মনোবৃত্তি ছড়াইয়া পড়িতেছে। এই উদ্দেশ্যে একশ্রেণীর মুসলমান আজ উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকুরী গুলিতে মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য কতগুলি পদ বাঁধা বরাদ্দ থাকিবে এইরূপ একটি প্রস্তাব সম্প্রতি সিনেট সভায় আনা হইয়াছিল। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম, বিশ্ববিদ্যালয় এই প্রস্তাব বাতিল করিয়াছেন।

* * *

একটি সংবাদে প্রকাশ গত বার মাসে কাপড়ের জন্য ভারতের জনসাধারণ যে টাকা ব্যয় করিয়াছেন তাহা ইহার পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ১৪০,০০,০০০ টাকা কম। অর্থাৎ কাপড়ের মূল্যহ্রাসের দরুণ গত বার মাসে জনসাধারণের এই টাকাটা বাঁচিয়াছে। তাহা হইলেও স্মরণ রাখিতে হইবে কাপড়ের যুদ্ধ-পূর্ব্ববর্ত্তী মূল্যের সহিত তুলনায় আজ ৩০০% দাম চড়িয়াছে এবং এই হাস্যকর মূল্যস্ফীতির যেটুকু ইতর-বিশেষ হইয়াছে তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়।

* * *

গত শনিবার দিল্লী প্রেস কন্‌ফারেন্সে বাংলার গবর্ণর বাহাদুর এই প্রদেশের খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, বর্ত্তমান বৎসরের প্রথম তিন মাস অপেক্ষা এপ্রিলে বাংলা গবর্ণমেণ্টের শস্য ক্রয় ব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। তাহা ছাড়া একশ্রেণীর প্রচারকারী কৃষককে মজুদ শস্য বিক্রয় না করিবার যে প্ররোচনা দিতেছিলেন আজ তাহা শান্ত হইয়াছে। ফলে কৃষকদের মধ্যে ধীরে ধীরে আস্থা ফিরিয়া আসিতেছে। খাদ্য সমস্যাকে লইয়া রাষ্ট্রনীতিক জুয়াখেলা কতখানি বিপজ্জনক তাহা গত বৎসরের ইতিহাস সাক্ষ্য দিবে। ১৯৪৩ সালের দুর্গতির কারণ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে রাষ্ট্র-নীতিক দুর্ব্বুদ্ধি ইহাতে কতখানি সাহায্য করিয়াছিল। বাঁচিয়া থাকিবার সম্পদ লইয়া এই মারাত্মক প্রচারকার্য্য কতখানি নীতি-হীনতার পরিচয় তাহা এই শ্রেণীর নেতারা বুঝিবেন কিনা জানি না। কিন্তু এই দায়িত্বহীনতার জন্য সর্ব্বাপেক্ষা মূল্য দিতে হইয়াছিল লক্ষ লক্ষ জনসাধারণকে।

* * *

গত ৩০শে এপ্রিল বাংলাদেশের সর্ব্বত্র নবপ্রস্তাবিত মাধ্যমিক শিক্ষা বিল-এর (Secondary Education Bill) বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপনের জন্য বঙ্গীয় শিক্ষা পরিষদের সভাপতিরূপে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র আবেদন প্রচার করিয়াছিলেন। ইতি-মধ্যেই কলিকাতার বহু সভাসমিতিতে প্রস্তাবিত বিলের অনিষ্টকারিতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা হইয়াছে। গত ৩০শে এপ্রিল তারিখে সমগ্র বাংলা দেশ সমস্বরে এই সাম্প্রদায়িক বিলের প্রত্যাহার জ্ঞাপন করিয়াছে। প্রকাশ, বিলটির আলোচনার জন্য বিরোধীদলের কয়েকজনকে লইয়া একটি আলোচনা বৈঠক আহ্বান করা হইয়াছে। এই বৈঠকের ফলাফল কি হইবে তাহা পূর্ব্ব হইতে অনুমান করা অনুচিত। এই বিলটি পাশ করাইয়া লইবার জন্য ভিতরে ভিতরে যে 'কূটনীতিক চাল' চলিতেছে আমরা তাহাই শুধু লক্ষ্য করিতেছি। শিক্ষা-ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতা প্রবর্ত্তনের পক্ষে মন্ত্রিমণ্ডলীর কেহ কেহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া থাকেন। বর্ত্তমান সাম্প্রদায়িক ব্যবস্থার দ্বারা ঢাকার ছাত্রজীবনে যে বিষ প্রবেশ করান হইয়াছে তাহার উলঙ্গ মূর্ত্তি মাঝে মাঝে আমাদের বিচলিত করিয়া তোলে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্য দিয়া যদি ব্যাপকভাবে এই সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি প্রচার করা হয় তাহা হইলে এই দেশের জাতীয় জীবন কোথায় গিয়া পৌঁছিবে তাহা বিলের ধুরন্ধর সমর্থকগণ চিন্তা করিয়াছেন কি?

তাসের ঘর

(গল্প)
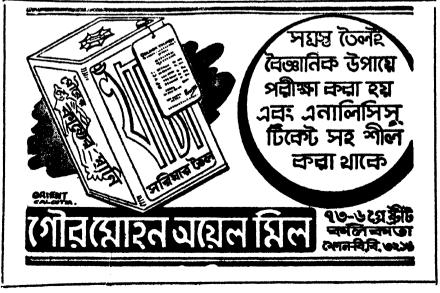
—শ্রীটুনু ঘোষাল

পশ্চিমাকাশে অগ্নিরঙ্গে রাঙ্গিয়ে বাঁকা চাঁদখানি পদ্মার অতলবুকে অস্ত গেল।

বাসর ঘরে নববধূ গীতা ঘুমিয়ে আছে তার প্রিয়তমের বুকে! মানুষের তৈরী সমাজের সীমা পার হয়ে আজ পৌঁছেচে সে তার চির প্রিয়তমের কাছে, গীতা জানে তার জীবনের সকল সমস্যার সমাধান আজ শেষ হ'ল। এই পরম আশ্রয়েই তার বাকী জীবনটুকু কেটে যাবে, এই তার দৃঢ় বিশ্বাস।

ভাই, বোন, বাপ, মার সঙ্গে এই তার প্রথম বিচ্ছেদ, তাই কাল সারা সন্ধ্যেটাই গীতা কেঁদে কাটিয়েছে—এখনও চোখের পাতাগুলি ফুলে রয়েছে।

সারারাত প্রণবের ঘুম হয়নি, মিলনের আনন্দে সে দিশাহারা, এযে সত্যি অঘটন! অনেক দ্বন্দ্বের পর যে গীতাকে চিরতরে কাছে পেয়েছে, সে কি ঘুমুতে পারে? গীতার মা, বাবা সন্তানের সুখের জন্য সমাজের দেওয়া চিরদিনের দণ্ড মাথা পেতে নিয়েছেন, সে আর কেউ না জানুক প্রণব জানে। বরবধূ বিদায়ের পূর্ব্বে তিনি প্রণবের হাত দু'খানি ধরে—মিনতির সুরে বলেছিলেন,—দেখ বাবা, গীতা গরীবের মেয়ে হলেও বড় আদরে প্রতিপালিতা হয়েছে, ও আমার বড় অভিমানী মেয়ে, ভুল বুঝে কখনও কষ্ট দিও না। ভগবান তোমাদের মঙ্গল করুন! প্রণব দীর্ঘশ্বাস ফেলে মনে প্রাণে ভগবানকে বললে, আমাদের বন্ধন শান্তিময় করো।

পূব আকাশে ভোরের তারা জেগে হাসে, বৈশাখী পাগল হাওয়া নতুন জাগা ফুলের গন্ধ ভরে ঘরে ঢোকে, প্রণব ডাকলে, —রাণী, গীতারাণী ওঠো! বাহুবন্ধন আরো একটু দৃঢ় করে গীতা বল্লে, হুঁ!

তন্দ্রাবিজড়িত চোখদুটি তুলে আবার বললে, তুমি না বলেছিলে তোমার কাছ থেকে কেউ আর আমায় কেড়ে নিতে পারবে না!

—না-না-না, বলে প্রণব দু'হাত তুলে মুখখানি চুম্বনে অস্থির করে তুললে বললে: গীতা সত্যি সুন্দর তুমি!

আজ গীতাকে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছিল—গৈরিক বেনারসীটি তার শ্যামলা রঙ্গে অপূর্ব্ব আভা ফুটিয়ে তুলেছিল। সুন্দর চোখ দুটির ওপর সরু ভ্রু দু'টি ভারী সুন্দর। বাসী মালা ছড়াটি এখনও বেণীতে জড়িয়ে আছে।

প্রণব বললে, জানো, তোমার পাশে আমায় মোটেই মানায় না। গীতা সরম মধুর হাসি হেসে বুকে মুখ লুকালো, মিষ্টি করে বললে, তুমি ভারী 'দুষ্টু'।

প্রণব ও গীতার মধুর মিলনের দিনগুলির পানে তাকিয়ে অনেকের হিংসায় ভ্রু কুঁচকে উঠতো।

সুখের দিনগুলি দ্রুত চলে যায়, দুঃখের রাত্রি আসে ধীরে! আলোর পরেই আঁধার আসে ঘিরে। চার বছর পরে।

আজ গীতার সুখের দিনগুলি দুঃখের ছায়া ঘিরে আসছে। প্রণবের সেই উদ্দাম প্রেমের গতি শান্ত হয়ে গেছে। গীতা কিন্তু বোঝে না—কেন এমন হলো। প্রণবের এই ক্লান্তিকে

সে কিছুতেই সহ্য করতে পারে না। অভিমানে সে দূরে দূরে থাকে। প্রণবের যে তাতে বিশেষ চোখে ঠেকে বলে মনে হয় না, প্রণবের সাময়িক উচ্ছাসটাই বেশী, অনুভূতি কম। কখনও কাছে এলেও খেয়াল থাকে না, যদিও ইচ্ছাকৃত নয়, তবু এ তাচ্ছিল্য গীতাকে দংশন করে।

প্রণবের বন্ধুবান্ধবের আর শেষ নেই, তাদের আসর প্রণবের না হলেই চলে না। আজকাল বেশ রাত্তির করেই প্রণব বাড়ী ফেরে, কোনদিন না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়ে, শরীরের দিকেও কেমন একটা পরিবর্ত্তন গীতা লক্ষ্য করে। ক্রমশঃ প্রণবের উচ্ছৃঙ্খলতার গতি—বাড়তে থাকে। বন্ধুবান্ধব তাদের মস্তো শীকার এখন নিজেদের আয়ত্বে এনেছে—গীতার সংস্পর্শ হতে প্রণবকে তারা সর্ব্বনাশের পথে নিয়ে চলেছে।

গীতা তা বেশ অনুভব করে। কিন্তু প্রণবকে কিছু বলবার ক্ষমতা কুলোয় না, সে নিজেকেই অপরাধী মনে করে। আপন মনে কাঁদে, অভিমানে খায় না কতদিন—কে তার খবর রাখে দাসদাসী ছাড়া? কখনও প্রণবের কাছে ধরা পড়ে, প্রণব বলে, দুঃখ কি তোমার বলো? আমি কি কিছু অন্যায় করেছি? গীতা মাথা নীচু করে থাকে, বলবার কিছু নাই, সে যে গরীবের মেয়ে!

ফাল্গুনের শেষ, বারান্দার টবে বেল-ফুলের কুঁড়িগুলি নতুন পাপড়ী মেলেছে; গীতার ইচ্ছে হয় শিশুর মত ছুটে যায় তাদের পাশে! কিন্তু গীতা আর শিশু নয়, শিশুর জননী। সুন্দর একটী শিশু তার কোলে ঘুমুচ্ছে।

প্রণব আজ অনেকদিন হল অন্যত্র গেছে—তার কোন সংবাদ আজ অবধি পায়নি। গীতা কেমন হতবাক্ হয়ে গেছে। ভাবে এই কি জীবনের আরম্ভ? গীতা মনকে শক্ত করে নেয়, ভাবে এবারে সে জীবনের গতিকে অন্য দিকে ফিরিয়ে দেবে যেমন করে তার প্রিয় গেছে তাকে ফেলে। গীতা বিদুষী নয়, সামান্য তার বিদ্যার পুঁজি, তবু সে সবার চোখে মহিয়সী মহিলা—এমন গুণ নাই যা তাকে ভগবান দেননি। সংসারে সকল কর্ত্তব্যের শেষে গীতা আবার সেগুলির সাধনা আরম্ভ করলে। সঙ্গীতে, শিল্পে, ভাবে ভাষায় তার বিরহের দিনগুলি কোনমতে ভুলিয়ে রাখে আজকাল।

কিন্তু হায়! নিঃসঙ্গতাই তার সকল সম্বল নিষ্ফল করে দেয়, গীতার মন আবার ব্যাকুল হয়ে ওঠে। ভাবে ঘর ছেড়ে ছুটে বেরিয়ে যায়—যেখানে তার প্রিয়তম আছে। কেমন করে এ সম্ভব হলো, কে তাকে এমন করলে ভগবান! আমার এ দুঃখের দিন আজ যে কাটতে চায় না, ওগো তোমার প্রেমের অন্তরালে এতখানি নিষ্ঠুরতা লুকান ছিল! তুমি আমায় নিঃস্ব করে আজ পথে বসিয়ে দিলে, আমি কি অপরাধ করেছি, আমি যে আর পারি না। ওগো, আমায় তোমার আশ্রয়ে বাচতে দাও। আবার আমায় তোমার মনের মত করে গড়ে নাও।

রাতের আড়ালে গীতা প্রাণ খুলে কাঁদে, দিনের আলোতে আবার লোকচক্ষে নিখুঁত অভিনয় করে চলে, কিন্তু আজ—দৈর্য্যের বাঁধ ভেঙ্গেছে। বারান্দার একপাশে আঁচলখানি বিছিয়ে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে, ঘরে খোকা কেঁদে উঠলো, মা! মা! চমকে ওঠে গীতা—ছুটে যায়—চেয়ে দেখে ঘড়ির পানে, রাত্রি দুই প্রহর পার হয়ে গেছে।

নিস্তব্ধ চারিদিক, শূন্যঘরে মূল্যবান আসবাবগুলি উজ্জ্বল আলোকে গৃহ-স্বামীকে সম্মানিত করছে। সমস্ত আলোগুলি নিবিয়ে গীতা পথের ধারে জানলায় এসে দাঁড়ায়—, আবছা চাঁদের আলোয় দেখা যায় একখানি মোষের গাড়ী চলেছে রাজপথের আবর্জ্জনা পূর্ণ করে। সামনে চালক, পাশে তার স্ত্রী, মৃদু গুঞ্জনে স্বর্গ রচনা করে চলেছে তারা দুজন, সভ্য জগতের ছোঁয়াচ তাদের স্পর্শ করতে পারেনি—তারা অস্পৃশ্য, কিন্তু তাদের নাহলে চলে না একদিন।

গীতা ভাবে যেখানে প্রয়োজন নাই সেখানে আয়োজন বেশী—তাই গীতার এ সংসারে প্রাণ নাই। অর্থহীন একঘেয়ে জীবনধারা গীতা যেন আর বইতে পারে না, অপলক নেত্রে সীমাহীন পথের দিকে তাকিয়ে থাকে। নিস্তব্ধ রাজপথে কুকুরগুলো গোল মাল করে ওঠে, খোকা আবার কাঁদে, মা, মা! রাগে দুঃখে গীতার মাথায় কেমন একটা যন্ত্রনা হতে থাকে। বিরক্তি ভ'রে এগিয়ে যায় বিছানার ধারে। মায়ের সাড়া পেয়ে খোকনমণি এগিয়ে আসে হামা দিয়ে, গীতা সজোরে ঝাঁকুনি দিয়ে খোকাকে আবার শুইয়ে দেয়, খোকা আর্তনাদ করে ওঠে। গীতার বাৎসল্য, মমতা সব যেন এক মুহূর্তে মুছে যায়। সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে অগ্নির ঝলক বেরিয়ে আসে, তার মাথায় খুন চেপেছে আজ, নিষ্ঠুর হাসিতে ভ্রু কুঁচকে ওঠে, চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসে—ভাবে আজ এই মুহূর্তে সব শেষ করে পথে বেরিয়ে পড়ে—তার-রূপ গুণ সবই আছে, যার কাছে যাবে সেই আদর করে যায়গা দেবে তবু এ প্রবঞ্চকের সংসারে আর থাকবে না, সে কি শুধু অবহেলারই যোগ্য, গীতার প্রেমের বিনিময়ে প্রণবের এই কি যোগ্য প্রতিদান? না সে আর ভাবতে পারে না, বালিসে শুয়ে ফুলে ফুলে কাঁদে। রাত্রি শেষ হয়ে আসে। গীতার চোখের জল শুকিয়ে যায়, ক্লান্তিতে নিস্পন্দ অসাড়ের মত পড়ে আছে। অন্তরের অতি গোপন প্রান্ত হতে দীর্ঘশ্বাস আসে, যাকে সে ঘৃণা করতে চায়, ভুলে যেতে চায়, সেই মহাশত্রুর মুখখানি ভেসে ওঠে বারে বারে। গীতার সব অভিমান সকল সংকল্পকে চূরমার করে দেয়, গীতা আবার অস্থির হয়ে ওঠে।—না গো না, আমি তোমায় ছেড়ে কোথাও যেতে পারবোনা, তোমার ছায়ায় আমায় বাঁচতে দাও। আজকে শুধু আমি নয় আমার খোকনও তোমার কাছে একটু মমতা ভিক্ষা চায়, ও স্বর্গের দেবশিশু, আজ তাকে স্নেহমমতা হতে বঞ্চিত করলে কেন গো। অযোগ্য পিতামাতার এ অপরাধের যে ক্ষমা নেই, যে জন্মদাতার সন্তান-স্নেহ নাই, বাৎসল্য নাই, তারা পিতামাতা হতে চায় কোন সাহসে? খোকা একদিন বড় হবে, পিতামাতার পরিচয়ের কলঙ্কেই তার জীবনের পথ কণ্টকময় হবে।

গীতা ঘুমন্ত খোকাকে বুকে চেপে ধরে বলে, না-না, তোকে মানুষ করে যাবো, উত্তেজনায় সজোরে নিজের ঠোঁট দুটো কামড়ে ধরে, নিষ্ফল ক্রোধে বুকটা ফেটে যায়, অস্ফুট স্বরে বলে, ভগবান একি করলে!

নয় বৎসর পর আবার সেই বৈশাখী প্রভাত। প্রণব এসে মশারি তুলে নিঃসঙ্কোচে ডাকে, গীতা। বিদ্যুতের গতির মত গীতা পাশ ফিরে শোয়—তার মনের পিশাচ চিৎকার করে বলে, গীতার সন্ধানে আর প্রয়োজন নাই তোমার, গীতা মরে গেছে।

প্রণব খোকাকে তুলে নিতে চায়, গীতা তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে কর্কশ স্বরে বলে, তুমি বড়লোকের ছেলে, তোমাদের স্নেহ ভালবাসা ক্ষণিক বিলাস মাত্র। তোমাদের প্রাচুর্য্য নিয়ে তুমি বিলাস করো, আমি গরীবের সন্তান, স্নেহ মমতা দিয়ে তোমার অভাব পূর্ণ করে দোব।

প্রণব বুঝতে পারে না তার অন্যায়ের মাত্রা কতদুর। অন্যমনস্কভাবে গীতার পানে চেয়ে সিগারেট ধরায়, ভাবে গীতার এ অভিমান কিছুদিন পরেই কমে যাবে, মেয়ে-মানুষের অভিমান বৈত' নয়।

দিনের পর দিন চলে যায়, প্রণব-গীতার ব্যবধান ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। বাইরের ক্লান্তি নিয়ে এসে প্রণব আর গীতার প্রেমের ছায়া পায় না। প্রণব ভাবে কেন এমন হল! চেষ্টা করে গীতাকে ফিরে পেতে। কিন্তু এখন গীতা প্রণবের নাগালের বাইরে।

গীতার প্রেমকে জয়যুক্ত ক'রে মরণের মুহূর্ত্তটির ডাক এসে পৌছয় গীতার অন্তরে, সবশেষে শুধু একটি মুহূর্তের প্রতীক্ষায় গীতা রাত জেগে দেখে পদ্মার গভীর বুকে চন্দ্র অস্ত যায়। মাথার কাছে প্রণবের নিশ্চল চোখদুটো থেকে জল গড়িয়ে পড়ে গীতার কপালের ওপর।

কমরেড লেনিন

—শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সেই থেকে কার্লকে আর অর্থের জন্য কষ্ট পেতে হয় নি, যখনই প্রয়োজন পড়েছে তখনই পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন এংগেলস্। বন্ধুর প্রতি বন্ধুর এতো বড়ো নিষ্ঠা পৃথিবীর ইতিহাসে দৈবাৎ চোখে পড়ে।

এতদিনে মার্কস্ আবার আত্মস্থ হলেন। বই লেখেন আর অবসর মত কাজ করেন আন্তর্জাতিক শ্রমিক-সঙ্ঘের।

সঙ্ঘ-প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে জনগণ নতুন ধারায় চিন্তা করতে শিখলো, বিপ্লব এলো ফ্রান্সে আর জার্মাণীতে। কিন্তু যতটা আশা করা হয়েছিল তেমন ভাবে জনগণ শাসনতন্ত্রকে ধরে রাখতে পারলো না, সাম্যবাদীরা কোথাও কার্য্যকরী কিছু করে উঠতে পারলো না। তার উপর ডুরিং, বাকুনিন প্রমুখ নেতারা মতভেদ স্বরু করলেন—দলে ভাঙন ধরলো। দলাদলি কাজের গতিকে শ্লথ করে দিল। মার্কস ক্ষুব্ধ হলেন, কিন্তু হতাশ হলেন না। তিনি জানতেন নতুন প্রভাত আসছে, নতুন সূর্য্যের আলোয় নতুন জগৎ গড়ে উঠবেই একদিন। সত্য কখনও স্থায়ীভাবে অন্ধকারে লীন হতে পারে না।

পড়াশুনা চলে, লেখাও চলে।

'দাস ক্যাপিটালে'র একটির পর একটি খণ্ড শেষ হতে থাকে।

বয়সের পরিণতি মাথার চুলে শাদা রঙের ছোপ লাগায়, শাদা দাড়ির পাশে পাশে চোখের রেখায় টোল খায়, গালের মাংস লোল হয়ে ওঠে। লণ্ডনের ছোট্ট ঘরখানির মধ্যে বসে বসে কার্লের কলম চলে খস্ খস্ করে, বইয়ের শেষ পরিচ্ছেদগুলি তিনি লিখে যান। চুরুটের ধোঁয়ায় ঘরখানি আচ্ছন্ন হয়ে ওঠে। সেই ধূমেলতার মধ্যে মন স্বচ্ছ হয়, কলম থামে না।

লিখতে লিখতে কোন এক-সময় ক্লান্তি আসে, চুরুট খেতেও আর ভালো লাগে না, চেয়ার ছেড়ে মার্কস উঠে দাঁড়ান ঘরের মধ্যে, পদচারণা করেন এদিক থেকে ও-দিক পর্য্যন্ত। মেঝের উপর বিস্তৃত ফরাসের উপর স্থায়ী পদরেখা অঙ্কিত হতে থাকে।

কখন-বা চেয়ার ছেড়ে উঠতে ইচ্ছা করে না, চুরুট খেতে অবসাদ আসে, লিখতে গেলেও মনে হয় লেখা ঠিক হচ্ছে না, তখন মার্কস স্বরু করেন হাল্কা পড়াশুনা—যত নাটক, কবিতা, উপন্যাস।

আবার কখনও বা তাও সহে না, ধীর পদক্ষেপে বাড়ীর বাইরে এসে পাড়ার ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলা আর গল্পে মেতে ওঠেন। অপরিচিত কোন লোক তখন দেখলে বিশ্বাসই করবে না যে ইনি জগদবিখ্যাত বিপ্লবী 'রেড টেররিষ্ট ডক্টর কার্ল মার্কস্ !'

তখন কোন বিপ্লবী-মুখ চোখে পড়লে কার্লের মুখের সহজ সরল রেখাগুলো কঠিন হয়ে ওঠে, খেলা ধূলার স্বচ্ছ সারল্য থেকে মন নিয়ে আসেন সমাজ-বিজ্ঞানের কুটিল ক্রমঃবিকাশের মাঝে।

পৃথিবীর নানা দেশ থেকে কত বিপ্লবী আসেন, বিভিন্ন কণ্ঠের তর্ক বিচার আলোচনা ও উচ্চ হাসিতে সেই ছোট্ট ঘরখানি জম্‌জম্ করে ওঠে।

'ক্যাপিট্যাল' সম্পর্কে মার্কস বলেন— টাকা পয়সার এতো বড়ো অভাব নিয়ে, টাকা পয়সা সম্পর্কে কোন বই আর কেউ লিখেছেন কিনা আমার জানা নেই।

বইখানি কেমন চললো জিজ্ঞেস করলে হাসতে হাসতে বলেন—'ক্যাপিট্যাল' লেখার সময় যত সিগার খেয়েছি বইখানির প্রথম খণ্ড ছেপে সে খরচ উঠলো না।

কিন্তু পয়সা না পেলেও খ্যাতি পেতে বাধল না। নানা দেশে নানা ভাষায় রূপান্তরিত হয়ে কার্লের বাণী জগতের জনগণের মনের তারে ঝঙ্কার তুললো। নামের সঙ্গে কাজও বেড়ে চললো প্রতিদিন।

কিন্তু কাজের জন্য স্বাস্থ্য ও শক্তি অপেক্ষা করে না। 'ক্যাপিট্যালে'র দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড সম্পূর্ণ হবার আগেই মার্কসের হোল প্লুরিসি।

ইতিমধ্যে একটি মেয়ের মৃত্যু ঘটলো।

জেনী কয়েক মাস ধরে ক্যানসারে ভুগছিলেন, তিনিও মারা গেলেন।

মার্কসও আর ভালো করে সুস্থ হতে পারলেন না। শোক আর আঘাত তাঁর তেষট্টি বছরের শ্রান্তিময় মনকে সরীসৃপের মত জড়িয়ে ধরলো, ফুসফুসের দুর্বলতাও আর সারলো না।

স্বাস্থ্যের সন্ধানে কয়েক জায়গা তিনি ঘুরলেন।

দুর্বলতা ও অক্ষমতার জন্য পড়া ও লেখা দুই বন্ধ হয়ে গেল। বারান্দায় নিঃসঙ্গ ইজিচেয়ারটির উপর আধ-শোয়া অবস্থায় সুনীল আকাশের পানে তাকিয়ে কর্মমান পথের পানে তাকিয়ে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কাটতে লাগলো। মনে পড়তে লাগলো অতীতের দিনগুলির কথা, কি সঞ্চয় হোল আর কি গেল হারিয়ে, জীবনের কাছ থেকে কতটুকুই বা পেল আর কি-ই বা দিয়ে গেল জগৎকে। শৈশব থেকে গতদিন পর্য্যন্ত জীবনের পদরেখা গুণে যায় একে একে, মনের মণিকোঠায় হিসাব চলে।

সেই পদরেখার হিসাব ধরেই একদিন মহাকালের আমন্ত্রণ আসে চুপিসারে। এক গোধূলি লগনে ইজিচেয়ারে বসে বসেই কখন তিনি চিরকালের মত ঘুমিয়ে পড়লেন।

পৃথিবীর ইতিহাসে সেদিনটি চিরস্মরণীয়—আঠারোশো তিরাশী সালের ১৪ই মার্চ।

সুদূর রুশিয়ায় এক সহরে বছর তেরোর একটি ছোট ছেলে তখন মায়ের পাশে বসে পিয়ানো শুনছে, তখন কেউ স্বপ্নেও ভাবেনি এই শান্ত ছেলেটি পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ বছরের মধ্যে রুশিয়ায় জনগণের মধ্যে এক নতুন বিপ্লব নিয়ে আসবে, মার্কসের নীতি হবে যার ভিত্তি। সেই কথাই এরপর বলব।

এই কাহিনী তার ভূমিকা মাত্র। (ক্রমশঃ)

ছবিখানির প্রদর্শন সুরু হওয়ার আগে কত লোকের মুখে কত বিভিন্ন ধরণের মন্তব্যই না শোনা গিয়েছিল। এখন—ছবিখানির প্রদর্শন আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে—

সকলের মুখেই এক কথাঃ

এ-বৎসরের শ্রেষ্ঠ ছবি

মাটির ঘর

'রোমাণ্টিক বাংলা ছবি'

●

উত্তরা-য়   ফোনঃ বি, বি, ২২০২

প্রত্যহঃ ৩, ৬, ৯টা

চলিতেছে

(নৈরাশ্যের হাত থেকে বাঁচতে হ'লে ৭ দিন আগে থেকে টিকিট কাটুন)

(৩)
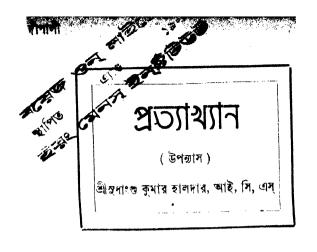
বাড়ী ফিরে এসে সে রাতে নমিতার ভাল করে ঘুম হ'ল না। অসীমের সেই কথাগুলো এঁর মনের দুয়ারে বারংবার আঘাত ক'রে ফিরছিল,—থেমে থাকা মানেই বন্ধন, বন্ধন মানেই মৃত্যু। সত্যিই তো। এ মানুষের জাতই যে স্বতন্ত্র। সংসার একে অবাধ ছাড়পত্র দিয়ে রেখেছে, সমস্ত চলাই এর ঝোঁকের মাথায় চলা। পৃথিবীতে যে-সব মানুষ সুবিধা আর অসুবিধার তারতম্য বুঝে ঘড়ীধরা রুটিন মেনে চলে, ভাতের হাঁড়ীর প্রতি চালটিকে টিপে টিপে দেখে, পিঠে পেটে চাপড়ে চাপড়ে তেল মেখে স্নান করে, খেয়ে সাড়ে ন'টার গাড়ীতে নথীপত্র নিয়ে সদরে মামলা করতে যায়, হার হ'লে মুখ গোঁজ করে সাতদিন কথা কয় না, জিত হ'লে ঢাকঢোল সহযোগে সিদ্ধেশ্বরীর পুজো দিয়ে আসে,—এ মানুষ তেমন মানুষ নয়। এরা স্পৃহাহীন, এরা উদাসীন, এমন কি এরা উচ্ছৃঙ্খল। আপন মনে বিকশিত হয়ে ওঠা ফুলের মতোই এদের ঝরে পড়বার দিকে লক্ষ্য, কোন কিছুতেই বোধ হয় এদের ধরে রাখা যায় না, খুব শক্ত করে নারেট সেবা দিয়ে ঘিরে রাখলে তবেই না রক্ষা !

নমিতার জীবন কেটেছে নিঃসঙ্গ, স্কুলের লেখাপড়ার শেষে বাড়ীতে খুসী আর খেয়াল মাফিক কিছু বা কাব্য পড়ে, কিছু বা ছবি এঁকে। পোষ্যের সংখ্যা তাঁর অগণিত, তাদের সেবায় কেটেছে অনেকটা সময়। কুকুরের ঠাণ্ডা লেগেছে বলে অদ্ধরাত পর্য্যন্ত তার সেঁকতাপে, পালিতা হরিণীর পরিচর্য্যায় তিনি সমস্ত প্রাণ ঢেলে দিয়ে করেছেন সেবা। বাপের সঙ্গে তার কোনো পরিচয়ই ছিল না, বরাবরই শুনেছেন তিনি থাকেন বিদেশে। বাইরেটা তাঁর বাইরেই থেকে গেছে, লোকসমাজে মেলামেশায় হয়ত তাঁর মায়ের ছিল সঙ্কোচ। বাড়ীতে মাঝে মাঝে যে-সব লোকের আগমন হয়, তাঁরা নামজাদাই বটে, অসীমের ভাষায় 'সিংহ এবং ব্যাঘ্র'—কিন্তু মিসেস ঘোষ কোনোদিনই নমিতাকে এঁদের সঙ্গে মিশতে দেন নি। হয়তো এ বিষয়ে তাঁর মতামত ছিল মধ্যযুগের, হয়তো বা আর কোনো কারণ ছিল।

বাপের কিংবা ভায়ের কিংবা বোনের কোনো সাহচর্য্যই নেই, মায়ের সঙ্গে সম্পর্ক,—সেও খুব ঘনিষ্ঠ নয়। এমনি অবস্থার অনিবার্য্য পরিণামে নমিতা অনেকটা আত্মসমাহিত, অত্যন্ত চাপা মেয়ে। চিত্তবৃত্তির একটা দিক যেমন ধীরে ধীরে শুকিয়ে উঠেছে, আর একটা দিক তেমনি যেন বুভুক্ষিত হয়ে আছে। যে উর্বর মাটি অনেকদিনের অনাবৃষ্টিতে রুক্ষ হয়ে উঠেছে সে যেমন যে-কোনো একটা নামগোত্রহীন গাছকে আঁকড়ে ধ'রে ভবিষ্যৎ ফসল ফলাবার স্বপ্ন দেখে, তেমনি করে নমিতাও একটা অস্পষ্ট আইডিয়াকে আঁকড়ে ধরে ভবিষ্যতের সোনার স্বপ্ন রচনা করতেন,—সেই আইডিয়া হল স্বামী-আইডিয়া। একদিন সব রুক্ষতা ধারাবর্ষণে সরস হয়ে যাবে। যে-সেবা, যে-দাক্ষিণ্য পিতা ও ভ্রাতার সাহচর্য্যে স্ফূর্ত্ত হয়নি জীবনে, সে একদিন স্বামীকে ঘিরে সার্থক হয়ে উঠবে। ক্ষীণতোয়া পার্বত্য নদী তার বালুময় কঙ্কর শয়ন হতে দুই তটের দারিদ্র্য দেখে যেমন অন্তরে অন্তরে কাঁদে, একদা অবিশ্রান্ত ধারাবর্ষণের দিনে ফেনায়িত তরঙ্গভঙ্গে তাদের সমস্ত দৈন্য, সমস্ত দুঃখ ধুইয়ে মুছিয়ে সেখানে প্রাচুর্য্যের ফসল ফলাবার জন্যে যেমন আকুল হয়ে কাল গোণে, তেমনি করে অফুরন্ত আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে এ মেয়েটি বসেছিলেন, একদিন কল্যাণের ধারায় তাঁর পথের ধারের দুইটি পাশের সব দুঃখ ঘুচিয়ে দিতে। ইনি যেন দুঃখিনী তাপসকন্যা, কোন রাজপ্রাসাদের অগণিত পরিজনের সুখবিধানের জন্য যেন মৌনতপস্যায় রত। কবে আসবে সেই আকাঙ্ক্ষিত রাজপুত্র, অফুরন্ত যার নেওয়ার গরজ, অতৃপ্ত যার তাগিদ। সেই রাজ-ভিখারীর সকল ঝুলি পূর্ণ ক'রে ভ'রে দিতে দিতে, সেবায় সেবায় তার সকল অভাব সকল অসুবিধা নিশ্চিহ্ন করে মুছিয়ে দিতে দিতে কবে কাটবে এঁর বিশ্রামহীন দিনগুলি ?

অসীমকে দেখেই তাঁর মনে হল, ঠিক তো, এই তো সেই ঘরছাড়া রাজপুত্র, কোনোদিকেই যার দৃষ্টি নেই, যার ঔদাসীন্য সব থেকে বেশী কেবল নিজের লাভ ক্ষতির বেলাই, যাকে দেখবার শোনবার জন্যে সকল সময় চাই একজনের তীক্ষ্ণ সজাগ দৃষ্টি।

হয়তো বা ভুল করেছিলেন নমিতা, হয়তো তাঁর আগ্রহের আতিশয্যে এ ভুল তাঁর চোখেই পড়ে নি। অসীম বলেছিল, বাঁধা পড়ব সেইখানেই যেখানে পাবো এমন জিনিষ যা জীবনের চেয়েও বড়ো মরণের চেয়েও যা বড়ো। সে কি শুধু সেবা? সে কি শুধু দক্ষিণ হাতের দাক্ষিণ্য? বর্ষা ঋতুও তো অজস্র দাক্ষিণ্য দিয়ে ভরা, কিন্তু সে যে আর সবই পারে, পারে না শুধু ফুল ফোটাতে। বসন্ত ঋতু বেহিসাবী, বেপরোয়া, তাকে নিয়ে ঘর করা চলে না,—কিন্তু সে না হলে যে ফুলই ফোটে না।

এ গৃহে অসীমের যাতায়াত মিসেস্ ঘোষ সম্পূর্ণ অনুমোদন করেছিলেন, ধীরে ধীরে তাঁরও মনে মনে নমিতার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা সঙ্কল্প গড়ে উঠেছিল। অসীমের বাপ-মার বালাই ছিল না, বাড়ীঘরেরও বালাই ছিল না। সমাজের কোনো অনুশাসনকেই সে গ্রাহ্য করে না, সাংসারিক অবস্থাও তার যৎপরোনাস্তি খারাপ। অথচ সে এম-এ পাশ করেছে, দেখতে কান্তিমান, ব্যারিষ্টার চৌধুরী সাহেবের ভাগ্নে। এ আশা অসঙ্গত নয় যে মিসেস্ ঘোষের ধনের খ্যাতি তাঁর ভবিষ্যৎ জামাতার মনে প্রচণ্ড আকর্ষণের সৃষ্টি করবে।

মাস দুই অপেক্ষার পর যখন বুঝলেন জমি অনেকটা তৈরী হয়েছে, তখন একদিন অসীমের ডাক পড়ল তাঁর নিভৃত শোবার ঘরে। মেয়ের মনের ভাব তিনি আগে থেকেই জানতেন, কিন্তু খট্‌কা ছিল তাঁর অসীমের তরফ থেকে। সে যে ধরা ছোঁয়ার মধ্যেই যায় না, কেবল ধোঁয়াটে কথার ব্যূহে আত্মরক্ষা করে ফেরে।

যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত করে তিনি অসীমকে তাঁর সঙ্কল্পের কথা জানালেন, এবং তার মতামত কি জিজ্ঞাসা করলেন।

অসীম তাঁর চেয়েও সংক্ষেপে উত্তর দিল,—'না'।

এর জন্য মিসেস ঘোষ মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। এত বড় ঔদ্ধত্য এই নিঃসম্বল যুবার! হঠাৎ তাঁর মনের কোণে একটা তিক্ত সন্দেহ জেগে উঠল, এর প্রত্যাখ্যানের কারণ কি তিনি নিজে? কিন্তু কি শুনেছে সে তাঁর সম্বন্ধে? জিগেস করলেন, "কেন তোমার আপত্তি?"

অসীম বলল, "সে কথা নাই বললুম।"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মিসেস্ ঘোষ অত্যন্ত দ্বিধার সঙ্গে জিগেস করলেন, "আমিই কি তার কারণ?"

অসীম শান্ত কণ্ঠে বলল, "না, আপনি নন।"

মিসেস ঘোষ গভীর উৎকণ্ঠায় মৌন হয়ে রইলেন। কি জানে এ, কতটা শুনেছে? যে-কথা ইনি তাঁর মেয়ের কাছেও গোপন করে এসেছেন চিরকাল, সম্পূর্ণ বাইরের লোক হয়েও এ তার সন্ধান পেলে কেমন করে? জিগেস করলেন, "আমার বিষয়ে কি জান তুমি?"

অসীম অত্যন্ত কুণ্ঠিত হয়ে বলল, "সে কথা কি আপনার শোনাই চাই?"

মিসেস্ ঘোষ বললেন, "আর আমাকে দ্বিধায় রেখ না। বল, কি শুনেছ তুমি।"

অসীম বলল, "শুনেছি নয়, জানি। কিন্তু আমার আপত্তির কারণ তা তো নয়।"

"বল, কি জান তুমি।"

"জানি, আপনি এক মাড়োয়ারীর রক্ষিতা, মিসেস্ ঘোষ আপনার ছদ্মনাম। কিন্তু আপনি বিশ্বাস করুন আমাকে, সে আমার আপত্তির কারণ নয়।"

কিছুক্ষণ সমস্তই চুপচাপ। খালি শোবার ঘরের ছোট্ট টাইমপিস্ ঘড়িটার টিক টিক্ শব্দ শোনা যায়।

হঠাৎ ক্রন্দনরুদ্ধ কণ্ঠে মিসেস ঘোষ বললেন, "কিন্তু আমার মেয়ে, তার কোন অপরাধ নেই। সে যখন চার বছরের তখন আমি বিধবা হয়ে তাকে নিয়ে সংসার-সমুদ্রে ভাসি। আমাদের রক্ষা করতে তখন কেউ ক্ষীণ অঙ্গুলিও তোলে নি। যার কাছেই গেছি, সেই আপদ ভেবে তাড়িয়ে দিয়েছে। আমি কি পারতুম ওকে বাঁচাতে, যদি এ পথে না যেতুম। আর যে সেদিন কোনো পথই খোলা ছিল না। হয়তো দাসীবৃত্তি, কিংবা পাচিকাবৃত্তি জোটাতে পারতুম। কিন্তু—তাহলে কোথায় থাকতো এসব আরামের প্রাচুর্য্য, কেমন করে হোত তার পড়াশোনা! সামান্য দাসীর মেয়ে হয়ে বেঁচে থাকতে হত তাকে, বাসন মাজতে মাজতে আর বাটনা বাটতে বাটতে বাখারির মতো শুকনো

হয়ে যেত তার হাত !··· আমি যত নীচই হই না কেন, আমার পাপ তো নমিতাকে স্পর্শ করে নি। সে তো পবিত্র, নিষ্পাপ, সে তো এ সবের কিছুই জানে না।·· তুমি এতো নিষ্ঠুর হয়ো না অসীম। সে তোমাকে ভালবাসে। তার জীবনকে এমন করে ব্যর্থ, নিষ্ফল করে দিও না। দয়া করো তুমি, দয়া করো।"

অসীম ঘাড় হেঁট করে বসে রইল।

সহসা মিসেস্ ঘোষ ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠলেন, "ও বুঝেছি তোমার আপত্তি কোথায়? তুমি ভেবেছ মা ও মেয়েতে ষড়যন্ত্র করে তোমায় ভুলিয়ে এনে জোর করে বিয়ে দিতে চায়, না? একথা তুমি মনেও ভেব না অসীম। আমার আর যে-কোন জোর না থাক টাকার জোর আছে। সংসারে এ জোরটা বড় কম নয়।"

অসীম অত্যন্ত সংযত কণ্ঠে উত্তর দিল, "আমি সবই জানি। মায়ের মুখে সবই শুনেছি। আপনাকে সমালোচনা করবার আমার কোনো অধিকারই নেই; আমাদের সমাজেরও আছে কি না সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। যে-সমাজ পালনে অক্ষম তার তাড়নও অসঙ্গত। আপনি ভাল করেছেন কি মন্দ করেছেন সে বিচার তাঁরই হাতে থাক যিনি সকল ভালমন্দের অতীত। আপনি বৃথা মনে কষ্ট পাবেন না, আমাকেও অপরাধী করবেন না। আপত্তি আমার অন্যত্র। সে আপত্তি যদি না থাকত, নিজেই এসে পায়ে ধরে প্রার্থনা জানাতুম, মিসেস্ ঘোষ" অসীমের চোখ থেকে দু'ফোঁটা জল ঝরে পড়ল।

মিসেস ঘোষ সস্নেহে অসীমের মাথায় হাত বুলিয়ে তার চোখের জল আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিয়ে বললেন, "বাবা, তুমি আমায় যে সম্মান দিলে আজ, সে সম্মান আমাকে আর কেউ দেয় নি। আমার পাপকে আমি লঘু করতে চাই না। অনন্ত নরক ভোগের জন্যে আমি প্রতি মুহূর্ত্তেই তৈরী হয়ে নিচ্ছি, শুধু এইটুকুই আমার সান্ত্বনা থাকবে। শান্তিদাতা যে মেয়েকে আমার কোলে পাঠিয়ে দিয়েছেন তাকে মানুষের মতো মানুষ করতে আমার সর্বস্ব ধনও ত্যাগ করেছি।··আজ তোমার উদার মনের পরিচয় পেলুম। ভরসা হচ্ছে আমার ঈশ্বরের চোখেও সেই উদারতা দেখতে পাবো। বাবা, আজ আর কোনো সঙ্কোচই রইল না"—বলতে বলতে তিনি কেঁদে ফেললেন। ভাবের আবেগে রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, "আমার নগ্নতার বীভৎস লজ্জা শুধু তাদেরই কাছে, দৃষ্টি যাদের কলুষিত। তোমার দৃষ্টি দেবতার দৃষ্টি যে বাবা।" তারপর খানিক থেমে বললেন, "কিন্তু আমায় বলতেই হবে তোমার আপত্তি কিসের?"

অসীম মাটির দিকে চোখ নামিয়ে বলল, "নমিতার মধ্যে আমি আমার মাকে দেখেছি, যে-বোন আমার জন্মায়নি সেই বোনকে দেখেছি, যে-মেয়ে আমার একদিন হয়ত জন্মাতে পারে, আমার সেই মেয়েকে দেখেছি। আমায় স্বামীরূপে পেলে সে কখনও সুখী হবে না। সে আমায় ঠিক বুঝতে পারে নি বলেই ভালবেসেছে। অন্তর আমার রুক্ষ হয়ে গেছে, কোনোকিছু দান সে সহ্য করতে পারে না। আমি বোধ হয় কোনোদিনই সংসারী হতে পারবো না মিসেস ঘোষ। আমার কুষ্ঠীতে পত্নীস্থানে আছে মস্ত একটা দুষ্টগ্রহ। এ দুষ্টগ্রহটার দুষ্টামি কতখানি সেটা জানি না, কিন্তু এটা ঠিক জানি যে আর পাঁচ-জনের মতো পত্নীর হাতের সেবাযত্নে লালিত পালিত হওয়া আমার ধাতে সইবে না। ছেলেবেলা থেকে সব কিছু ত্যাগ করতে করতে আমার মন বিবাগী হয়ে গেছে। ভগবান আমাকে পিতৃহীন করেছেন, মাতৃহীন করেছেন, যথাসর্বস্বহীন করে এই পৃথিবীর পথের ধূলায় পরিত্যাগ করে বসে আছেন। আমার সাধ্য কি সেই রুক্ষ মনকে সংসারের সরসতার মধ্যে ফিরিয়ে আনি! এক রকম গাছ আছে যা শুধু মরুভূমির বালিতেই জন্মায়, সরস মাটিতে রোপণ করলেই মরে যায়। আমি সেই গাছ।"

মিসেস্ ঘোষ খানিকক্ষণ অবাক হয়ে অসীমের মুখের দিকে চেয়ে থেকে বললেন, "আমি ভাল বুঝতে পারছি নে বাবা তুমি কি চাইছ। কোনো রকমেই কি তোমাকে ঘরের মধ্যে আনা যাবে না? চিরদিনই কি তুমি বাইরে বাইরে ঘুরবে?"

"তা তো বলতে পারি না। তবে এটুকু বলতে পারি যদি কোনো-সংসার আমাকে রক্তাক্ত দেহে ফেলে দেয়, যদি কোনদিন কারো হাতের একটুখানি সেবার জন্যে মন লালায়িত হয়ে ওঠে,—তখন আমার বুঝে নিতে দেরী হবে না কোন্‌খানে যেতে হবে, কোনখানে আমার জন্যে সমস্ত মধু সঞ্চিত হয়ে আছে।"

ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে নত মুখে অসীম বেরিয়ে চলে গেল। আর সে হয়তো ফিরবে না এখানে কোনোদিন। কে জানে! নমিতার

কথা ভেবে মিসেস ঘোষের চোখদুটি অশ্রুতে ভরে উঠল। হায়রে অভাগিনী মেয়ে! খাইয়ে পরিয়ে লেখাপড়া শিখিয়ে প্রাচুর্য্য আর আরামের মধ্যে মানুষ করলেই কি সব হল? সুখ দুঃখ যে বিধাতার হাতে। এখানে কোনো বাপ-মা বুকের রক্ত ঢেলেও তো কিছু করতে পারে না।...মিসেস ঘোষ মনে মনে বললেন, কিছু বলা হবে না নমিতাকে। হয়তো কোনোদিন অসীমের মত্ বদলাতেও তো পারে! কিছুকাল না হয় অপেক্ষা করেই থাকা যাক না! ভেবে দেখলে অসীমের দোষও দেওয়া যায় না। আর পাঁচজনের সঙ্গে তার কত প্রভেদ। এতখানি প্রলোভন সে অবলীলায় জয় করে চলে গেল, শুধু তার মন এখনও প্রস্তুত হয় নি বলে। নমিতার দিক থেকে সে যা পেতে পারত তা যে কত অপর্য্যাপ্ত সে বিষয়ে তার কোনো সন্দেহই ছিল না, সন্দেহ শুধু বিনিময়ে সে কি দিতে পারবে নমিতাকে। এইখানে তার যে সংশয় সেই তাকে সংযত করেছে, সেই তাকে প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য করেছে। এই যে পরের কথা আগে ভাবা, এই তো তার যথার্থ ভদ্র পরিচয়। মিসেস ঘোষ আবার নতুন করে চোখের জল মুছে ফেললেন। তবু এরি মধ্যে মন কাঁদে কেন? মেয়ের হয়ে তিনি বুঝতে পারলেন, কত সুগভীর এর আকর্ষণ। এ সংসারের এই নিয়ম। যে লোভাতুর স্বার্থপর ভিখারীর মতো, কাঙালের মতো কামনার দাবী তারস্বরে ঘোষণা করতে করতে তার রিক্ত ভিক্ষাপাত্র বাজাতে বাজাতে চলে, না পেলে যার ক্রোধ আর ক্ষোভের সীমা থাকে না—তার সেবার মতো ঘৃণিত বৃত্তি আর নেই। কিন্তু যে উদাসীন কিছুই চায় না, যে আগে হতেই সব ত্যাগ করে বসে আছে প্রাণ গেলেও যে মুখ ফুটে চাইবে না কিছু,—সেই ছন্নছাড়া পাগলটার জন্যেই যত কিছু দেবার ইচ্ছা অমৃতের মতো সঞ্চিত হয়ে ওঠে বুকে,—না দিতে পারলে তারি ব্যথায় সারা বুক যে টন্ টন্ করে ওঠে। (ক্রমশঃ)

বিজনদা'র চিঠি

আমার আদুরে ভাই-বোনেরা,

কবিগুরুর জন্মোৎসব উপলক্ষে কয়েক জন ভাই-বোনের অনুরোধে একটা নাটিকা লিখতে বাধ্য হয়েছি। আগামী পঁচিশে বোশেখের উৎসব অনুষ্ঠানে যাতে তোমরা সকলে অভিনয় করতে পারো সেইজন্যে সেটা আমি ছাপালাম। এই নাটিকাটা যারা অভিনয় করবে তাদের কয়েকটা কথা বলার আছে। ধরো যদি কোন ভায়ের দল ওটা অভিনয় করো তা'হলে স্ত্রী-ভূমিকাটিকে পুরুষ-ভূমিকা 'করে নিতে পারো, আর যেখানে "বোন" কথাটা ব্যবহার করেছি সেখানে "ভাই" কথাটা ব্যবহার করবে। আবার যদি কোন বোনের দল ওটা অভিনয় করো তা' হলে সবগুলিই স্ত্রী-ভূমিকা করে নিয়ে "ভাই" কথাটার জায়গায় "বোন" কথাটা ব্যবহার করলে ওটার কোন অঙ্গহানি হবে না।···আর শেষের আবৃত্তি ও গান তোমাদের কাছে কবিগুরুর লেখা যে দুটো ভাল লাগে তা আবৃত্তি করতে ও গাইতে পারো। ওতে আমার কোন আপত্তি নেই।

মৃত্যু যাঁদের নেই: এটা একটা নতুন বিভাগ খোলা হ'লো। মৃত্যু যাঁদের নেই, যাঁরা অমর—তাঁদেরই জীবনী এ বিভাগে প্রকাশিত হবে।···

···এবারে উপন্যাস এবং "রাণু আর তার দাদা" গেল না। আসছে বারে এগুলো নিশ্চয়ই যাবে। প্রতিযোগিতা নতুন ধরণের হয়েছে দেখে সবাই যে খুশী হয়েছ তা' চিঠির মারফৎ জানতে পারলাম। কিন্তু কার কতো বুদ্ধির দৌড় তা দেখার আশায় রইলুম।···আজ আসি। স্নেহ নিও।

তোমাদের : বিজনদা

মৃত্যু যাদের নেই

—শ্রীকিষণচাঁদ বর্মন (৫৩)

"মৃত্যু-ভয়ে ভীত যারা, তারা কেবল পশুপক্ষী পতঙ্গের মতো মরে, শুকনো কঙ্কাল পৃথিবীর ধূলি-বালির মধ্যে ফেলে রেখে আহার নিদ্রার শেষ ঋণ শোধ করে চ'লে যায়। কেউ তাদের খোঁজ করে না। জীবন-মৃত্যুর প্রবাহে কোটি কোটি মানুষ ভেসে চলেছে খ্যাতিহীন পরিণামের দিকে। কে তাদের ঠিকানা রাখে? কিন্তু এই বিশ্বব্যাপী মৃত্যুর প্রবাহ থেকে কোনো কোনো মানুষ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে বলে, আমি মরবো না, মৃত্যুকে আমি ভয় করিনে। স্বীকার করিনে,—আমি জয় করতে চাই মৃত্যুকে।······আজ ঐ রকম একজন মানুষের গল্প তোমাদের শোনাবো······

মনে রেখো

"ছোট জায়গা থেকে বড়ো জায়গায় যাবার রাস্তা খোড়ো রাস্তা।"

—রবীন্দ্রনাথ

বাংলা দেশের কোলকাতা সহরে জোড়াসাঁকোর রাজবাড়ীতে ১২৬৮ সালের ২৫শে বোশেখ রাত দুটোর পর ঐ রকম একটী মানুষ পৃথিবীতে আসেন।

—সে তো আজ ৮৩ বছর পূর্বের কথা···

—হ্যাঁ, এর বাবা আর মার নাম যথাক্রমে মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর এবং সারদা দেবী। শুনলে আশ্চর্য হবে যে যিনি ভবিষ্যতে একদিন জগতের জ্ঞানীদের অগ্রগণ্য হয়েছিলেন তিনি কিন্তু ছেলেবেলা থেকে স্কুল বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদীক্ষার বাঁধাধরার মধ্যে মোটেই যান নি, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন তোয়াক্কা না রেখেও যে মানুষ বড় হতে পারে এর চরম দৃষ্টান্ত ইনি রেখে গেছেন। তের বছর সাত মাস বয়সে ১২৮১ সালের অঘ্রাণ মাসে 'তত্ত্ববোধিনী' নামে তখনকার এক পত্রিকায় এঁর লেখা প্রথম কবিতা 'অভিলাষ' প্রকাশিত হয়।···১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে ২০শে সেপ্টেম্বর ইনি সর্বপ্রথম সমুদ্রযাত্রা করেন ইংলণ্ডের উদ্দেশ্যে। পৃথিবীর এমন কোন সভ্য দেশ নাই যেখানকার লোকেরা তাঁকে নিমন্ত্রণ করে প্রচণ্ড সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেনি। এরপরেও তিনি বহুবার য়ুরোপ ভ্রমণ করেন। আমেরিকা, রাশিয়া, চীন, জাপান এবং পারস্যেও তাঁকে বিপুল সম্বর্দ্ধনা জানানো হয়। ১২৯০ সালের ২৪শে অঘ্রাণ খুলনা জেলার দক্ষিণ ডিহির বেণীমাধব রায়-চৌধুরীর কন্যা মৃণালিনী দেবীর সংগে এঁর বিবাহ হয়—কিন্তু তাঁর পত্নী স্বামীর গৌরবের চরম পরিণতি দেখে যেতে পারেন নি। ১৩০৯-এর ৭ই অঘ্রাণ মৃণালিনী দেবীর মৃত্যু হয়। সন্তান এঁদের পাঁচটি:—মাধুরী-লতা, রথীন্দ্রনাথ, রেণুকাদেবী, মীরা দেবী এবং শমীন্দ্রনাথ।

—আচ্ছা, তুমি কি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা বলছো?

—এতক্ষণে বুঝি তোমার খেয়াল হোল?···তারপর শোন। ১৯১২ সালের ১৬ই জুন লণ্ডনে পৌঁছুলেন ইনি অর্শের একটি অস্ত্রোপচারের জন্য। সেখানে রোদেনষ্টিনের বাড়ীতে একদিন তাঁর লেখা 'গীতাঞ্জলি'র পাণ্ডুলিপি রোদেনষ্টিনের হাতে দিলেন। সেখানে ইংলণ্ডের অনেক বিখ্যাত মনীষী তখন উপস্থিত ছিলেন। এর পরেই ১৯১৩ সালের ১৩ই নভেম্বর সুইডিশ একাডেমী থেকে ঘোষিত হোল যে 'গীতাঞ্জলি' কাব্য-গীতিকার জন্য তাঁকে জগতের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার 'নোবেল প্রাইজ' দেওয়া হবে।

—রবীন্দ্রনাথই শুনেছি ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বপ্রথম এই সম্মান লাভ করেন?

—হ্যাঁ। তারপর ১৯৪০ সালের ৭ই আগষ্ট অক্সফোর্ড য়ুনিভার্সিটির পক্ষ হতে স্যর মরিস্ গয়ার শান্তিনিকেতনে এসে তাঁকে ডি, লিট্ উপাধিতে ভূষিত করেন।

—এ তো মস্ত সম্মান! উনি সম্ভবতঃ নিজে অক্সফোর্ডে গিয়ে উপাধি আনতে পারেন নি, তাই বুঝি য়ুনিভার্সিটির প্রতিনিধি নিজে এসে ওঁকে ওই উপাধি দিয়ে গেল।

—হ্যাঁ তাই। শান্তিনিকেতন নামে বাংলা দেশের বোলপুরের কাছে যে স্থানটি, সেটি রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব কল্পনারই পার্থিব রূপ। সমস্ত জাতির ছেলেমেয়েরা এখানে পড়ে, এখানে কবির নিজস্ব বাসভবনও আছে।

কাছেই তো, একদিন দেখে আসতে পারো তোমরা…

—আজ বুঝতে পারলাম যে রবীন্দ্রনাথ কত বড় ছিলেন।

—ভুল কথা। যা বললাম এই কি রবীন্দ্র-প্রতিভার চরম পরিচয় হোল? বিরাট সূর্য্যের মতই যাঁর প্রতিভা ভাস্বর তাকে বর্ণনা করবে কে? রবীন্দ্রনাথের জীবনীও অতি বৃহৎ—তাঁর জীবনে বহু বৈচিত্র্যময় ঘটনার সমাবেশ ঘটেছিল।

—কিসে ওঁর জীবনের অবসান হোল?

—শান্তি নিকেতনেই ছিলেন। একটা অস্ত্রোপচার করতে ওঁকে কোলকাতায় আনা হয়। এখানেই ওঁর জীবনের প্রদীপ নিভে গেছে। একটা মজা দেখ—যে বাড়ীতে উনি জন্মেছেন সেখানেই উনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। ১৩৪৮ সালের ২২শে শ্রাবণ, বেলা বারটা তেরো মিনিটে।

—বড় বড় মহাত্মার জীবনের এ একটা বিশিষ্টতা।

—আজ এই থাক। বাংলা দেশ বড় ভাগ্যবান ছিল একদিন। বাংলার ভাগ্যাকাশে বহু উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক ফুটেছিল কিন্তু একে একে সব নিভে যাচ্ছে।

—বাংলার পক্ষে সত্যিই এটা অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয়। তাহলে পচিশে বোশেখে বাংলা যে রত্নকে পেয়েছিল বাইশে শ্রাবণ তাকে আজ কেড়ে নিল।

—ভুল কথা—রবীন্দ্রনাথকে কেড়ে নেবার ক্ষমতা মহাকালের নেই—রবীন্দ্রনাথকে বাংলাদেশের নরনারীরা লুকিয়ে রেখেছে তাদের অন্তরের অতলদেশে, তাদের মজ্জায়… মহাকালের সাধ্য কি যে রবীন্দ্রনাথকে বশ করে!! যুগে যুগে বাঙ্গালীর বংশ-পরম্পরায় রবীন্দ্রনাথের নাম জেগে থাকবে, তার জ্যোতিঃ কোন দিনও ম্লান হবে না।

পঁচিশে বৈশাখ

—শ্রীবিজন কুমার গঙ্গোপাধ্যায়

[দৃশ্যটী হচ্ছে চলার পথ। এই পথে পায়ে চলার পথিকদের মধ্যে বহু ছেলে মেয়েকে যাতায়াত করতে দেখা গেল। তার মধ্যে বিশেষ করে একটা ছেলে আমাদের নজরে পড়লো, হাতে তার কলাপাতার মোড়ক। ছেলেটী নিজের মনে বল্‌তে বল্‌তে চলছে]

ছেলে: তা'হলে আর কিনতে বাকী রইলো চাঁপা ফুল। ওঃ কি সুন্দর বেল ফুলের গোড়েটা দিয়েছে হরি মালি। নাঃ, এবারের পূজোয় ওকে একখানা কাপড় বখ্‌শিস দিতেই হবে। গুরুদেবের জন্য দিনে এতো সুন্দর মালা আর কেউ আজ যোগাড় করতে পারে নি।

[এমন সময় একজন সাহেবী পোষাক পরা বিদেশী ভদ্রলোক এই পথ দিয়ে যেতে যেতে ছেলেটির কাছে এসে থেমে গিয়ে তাকে প্রশ্ন করলেন]

সাহেব: আচ্ছা ভাই, আজ তোমাদের এত উৎসব কিসের বলতো?

ছেলে: কেন আপনি জানেন না! কোন্ দেশের লোক আপনি?

সাহেব: আমি বিদেশী, ভারতের বাইরে সাত-সমুদ্দুর তেরো নদীর পারে আমার জন্মস্থান। কোন একটা জরুরী কাজ নিয়ে আমি কিছুদিনের জন্যে সেখান থেকে তোমাদের দেশে এসেছি।

ছেলে: বাঃ, আপনি তো বেশ বাংলা কথা বলতে পারেন দেখছি! ইংরেজ বলে আপনাকে বোঝাই যায় না। এমন সুন্দর বাংলা কথা বলতে আপনি শিখলেন কোথায়?

সাহেব: বিলেতে আমার অনেক বাঙ্গালী বন্ধু আছেন। তাদের সঙ্গে আমি দিনের মধ্যে বেশীর ভাগ সময় কাটাই। তাঁরাই শিখিয়েছেন আমায় বাংলায় কথা বলতে।

ছেলে: তাই নাকি!…হ্যাঁ, কি জিজ্ঞেস করছিলেন…আজকের উৎসবটা আমাদের কিসের, তাই নয়?

সাহেব: হ্যাঁ।

ছেলে: আজ যে পচিশে বোশেখ!

সাহেব: আজ যে পচিশে বোশেখ সে কথা তো সবার কাছেই শুনলুম। কিন্তু তাতে কি? কি এমন দিনটা আজকের?

ছেলে: বারো শো আটষট্টি সালের আজকের দিনে আমাদের এই দেশে একটা ছেলে জন্মেছিল!

সাহেব: (হাসিয়া) এবারে তোমার কথা শুনে সত্যিই না হেসে পারছি না।

ছেলে: কেন?

সাহেব: বাঃ হাসির কথা বল্লে হাসবো না?…

ছেলে: কেন, হাসির কথা কিসে হ'লো?

সাহেব: হাসির কথা নয়তো কি? বাংলায় কি সেদিন কেবলমাত্র একটা ছেলেই জন্মেছিল?

ছেলে: হ্যাঁ, কেবলমাত্র একটা ছেলেই সেদিন জন্মেছিল।

সাহেব: (হাসিয়া) প্রত্যেক দিনে কত ছেলেমেয়ে জন্মায় আর কত লোক মরে তা জানো?

ছেলে: ওর হিসেবটা আমার ঠিক জানা নেই বটে, তবে ওর সংখ্যাটা যে একের অধিক সেটা আমার বেশ জানা আছে।

সাহেব: তবে তুমি ঐ দিনে যে একটা ছেলে জন্মেছিল তা কেমন করে বলো?

ছেলে: মানুষ হয়ে জন্মায় তো রোজ অনেকেই, কিন্তু সত্যিকারের মানুষ বলে পরিচয় দেবার যোগ্যতা আছে এমন লোক রোজ ক'জন জন্মায় বলুন তো?

সাহেব: তা বটে!

ছেলে: সেই জন্যেই আমি ঐ কথা বলছি যে, সে বছরের এই আজকের তারিখে বাংলায় ঐ একটি ছেলে জন্মেছিল; আজ হচ্ছে তারই জন্মদিন উপলক্ষে আমাদের এতো উৎসব।

সাহেব : কে তিনি ?

ছেলে : আমাদের কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ।

সাহেব : তিনি তো শুনেছি বহুদিন হ'লো মারা গেছেন।

ছেলে : কোথা থেকে শুনলেন ও কথা ?

সাহেব : কেন আমাদের দেশের খবরের কাগজ ঐ সংবাদ আমাদের শুনিয়েছে।

ছেলে : আপনাদের দেশের 'খবরের কাগজগুলো মিথ্যে সংবাদ প্রচার করে দেখছি! এর ফলে আমি বুঝতে পারলুম যে আপনাদের দেশের খবরের কাগজের মালিক আর সম্পাদকেরা তাদের পাঠকদের দিব্যি বোকা বানিয়ে রেখেছে মিথ্যে খবর প্রচার করে।

সাহেব : (রাগিয়া) খবরদার, তুমি আমাদের দেশের ও জাতির অপমান করো না। ভালো হবে না বলে দিচ্ছি।

ছেলে : আহা চোটছেন কেন ? আপনি বিদেশী লোক, আমাদের দেশের অতিথি। আপনাকে আমাদের ঘরে পেয়ে আমরা অপমান করবো এমন অভদ্র আমাদের জাত নয়। যা সত্যি আমি কেবল আপনাকে তাই বলেছি।

সাহেব : (রাগিয়া) বেশ, তাহলে তিনি যে আজও বেঁচে আছেন তার প্রমাণ দেখাও।

ছেলে : কি প্রমাণ আপনি চান বলুন ?

সাহেব : পথের যে কোন লোককে ডেকে জিজ্ঞেস করবো ?

[ঠিক এই সময় একটী মেয়ে পথ দিয়ে যাচ্ছে]

ছেলে : হ্যাঁ, সে তো বেশ ভালো কথাই। এইতো আমাদের দেশের এক বোন সামনে দিয়ে যাচ্ছে, ওকেই ডেকে জিজ্ঞেস করুন না যে আমার কথাটা সত্যি কিনা!

সাহেব : সেই ভালো কথা।...শোন তো বোনটি একবার এদিকে।

মেয়ে : আমায় ডাকছেন ?

সাহেব : হ্যাঁ!

মেয়ে : কি জন্যে ?

সাহেব : একটা কথা তোমায় জিজ্ঞেস করবো। তার উত্তরে সত্যি কথা বলবে তো তুমি ?

মেয়ে : মিথ্যে আমি বলি না। তা' ছাড়া আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে যে আপনি আমাদের দেশীয় লোক নন। এক বিদেশী ভাই!

সাহেব : ঠিক ধরেছ বোন! হ্যাঁ, আমি তোমাদের এক বিদেশী ভাই।... এখন যে কথা জিজ্ঞেস করছিলুম সেটা করি।...

মেয়ে : বেশ বলুন।

সাহেব : আচ্ছা, রবীন্দ্রনাথ কি আজও বেঁচে আছেন ?

মেয়ে : বালাই-ষাট,...ওরকম অলুক্ষণে কথা আপনি মুখ দিয়ে বার করবেন না। তাঁর মৃত্যু হয়েছে এ খবর আপনাকে দিল কে ?...যিনি অমরত্ব বর লাভ করে স্বর্গ থেকে ধরায় এলেন তিনি কখনও কি মরতে পারেন ?

সাহেব : তাই নাকি ? তাঁর মৃত্যু তা' হলে হয়নি ? কিন্তু এখন তিনি বেঁচে বাস করছেন কোথায় ?

মেয়ে : কেন সর্ব্বত্র !

সাহেব : এখানে বাস করেন ?

মেয়ে : করেন কি, ক-র-ছে-ন!

সাহেব : কোথায় ?

মেয়ে : কেন আমাদের মনে!

সাহেব : ও, এতক্ষণে তোমাদের কথার অর্থ বুঝলুম বোন! এবারে আমায় তোমরা ভাইবোনে মিলে "বিদেশী ভাই" বলে নয় অতিথি বলে ক্ষমা করো।

প্রকাশ পিকচার্স (বম্বে)
কর্ত্তৃক
১৯৪৪-৪৫ সালের আগামী
চিত্রাবলি সম্বন্ধে স্মরণীয় ঘোষণা
!
= পুলিশ =
এক পুলিশ কর্ম্মচারীর ভাবাবেগময় জীবনের চিত্তাকর্ষক অধ্যায়—
সঙ্গীতে মুখর ! নৃত্যে চঞ্চল !!
সঙ্গীত: পান্নালাল ঘোষ
পরিচালনা: শান্তি কুমার
ভূমিকায়: রত্নমালা, জীবন, রন্‌জনা, বদ্রীপ্রসাদ, প্রেম আদিব, সাকির, শাহ নওয়াজ
বোম্বায়ের বিক্রম দ্বিসহস্রবর্ষ উৎসব কমিটির বিক্রমাদিত্য স্মারণী-সঙ্ঘের
অনুরোধে প্রকাশ পিকচার্সের গৌরবময় অবদান
= সম্রাট বিক্রমাদিত্য =
প্রত্যহ লক্ষ লক্ষ নরনারী যাঁহার নাম সশ্রদ্ধ-চিত্তে স্মরণ করে
পরিচালনা: বিজয় ভাট
কারুশিল্প: কানু দেশাই
বর্ত্তমানে নির্ম্মাণাধীন:
= কবিতা =
পরিচালনা: কে, জে, পারমার ও মহেশচন্দ্র
-এর খ্যাতনামা পরিচালকদ্বয়
ভূমিকায়: উমাকান্ত, রত্নমালা, জীবন ও কান্তাকুমারী
পরিচালক বিজয় ভাটের বিরাট চিত্রনৈবেদ্য
= ভগবান বুদ্ধ =
(যুবরাজ সিদ্ধার্থ)
কারুশিল্প—কানু দেশাই
আপনার সহরে 'রাম-রাজ্য' দেখিতে ভুলিবেন না।
প্রধান এজেন্ট:
এভারগ্রীণ পিকচার্স
নিউ কুইন্‌স রোড, বম্বে
বাংলার এজেন্ট:
এভারগ্রীণ পিকচার্স কর্পোরেশান
১১ এসপ্ল্যানেড রো, কলিকাতা।
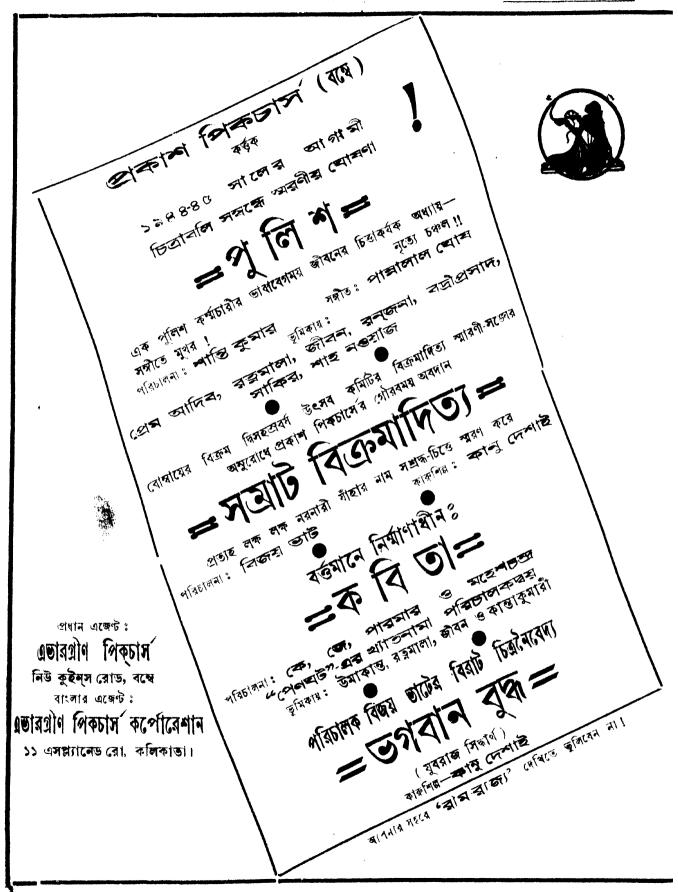
মেয়ে: (হাসিয়া) ক্ষমা যদি করতেই হয় তো "বিদেশী ভাই" বলেই ক্ষমা করবো, 'অতিথি' বলে নয়।

ছেলে: হ্যাঁ, বোনটি ঠিকই বলেছে। আমরা আমাদের বিদেশী ভাইকে ক্ষমা করতে পারি এক সর্ত্তে···

সাহেব: সেটা কি সর্ত্ত ভাই?...যে কোন সর্ত্ত আমায় করতে বলবে আমি তাই করতে রাজি আছি।

ছেলে: সর্ত্তটা হচ্ছে এই যে, আপনি আপনার দেশে ফিরে গিয়ে আপনাদের দেশের যে সব খবরের কাগজগুলো কবিগুরুর মৃত্যু-সংবাদ রটনা করেছিল তাদের যে সে সংবাদ মিথ্যে তা প্রচার করবেন সেই সব কাগজ মারফতই।

সাহেব: নিশ্চয়ই, ও কাজটা আমি গিয়েই করবো। আর তা' ছাড়া আমি সেখানকার পথে-ঘাটে বলে বেড়াবো যে রবীন্দ্রনাথ শুধু যে আজ বেঁচে আছেন তাই নয়, তাঁর মৃত্যু কোন দিনই নেই। তিনি অমর।

ছেলে: হ্যাঁ ঠিক তাই···সূর্য্যের যেমন মৃত্যু নেই, তেমনি আমাদের কবিগুরুরও মৃত্যু নেই।

সাহেব: আচ্ছা, ভাই, আচ্ছা বোন, আজ তোমাদের সঙ্গে দেখা হয়ে যা আমি পেলাম তার মূল্য দেওয়া যায় না।··· আজকের মত বিদায় নিই ভাই···গুড বাই।

[সাহেব ছেলে ও মেয়েটির সঙ্গে করমর্দ্দন করে প্রস্থান করলেন]

ছেলে: আচ্ছা বোন, আমিও তবে আসি। আমাদের সঙ্গে কবিগুরুর জন্মোৎসব রয়েছে, সেখানে সকলে আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। তা'হলে আসি বোন···!

মেয়ে: আমিও আসি ভাই, আমারও স্কুলেতে কবিগুরুর জন্মোৎসব রয়েছে।

ছেলে: আচ্ছা!

[ছেলেটী কবিগুরুর লেখা একটি প্রিয় কবিতা আবৃত্তি করতে করতে প্রস্থান করলো আর মেয়েটি ছেলেটির বিপরীত দিকে একটি রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইতে গাইতে চলে গেল]

খেলার মাঠে

শ্রীউমেশ মল্লিক বি, এ

মাননীয় গভর্ণর বাহাদুরের পত্নী মিসেস কেসীর সভাপতিত্বে বঙ্গীয় মহিলা স্পোর্টস এসোসিয়েশনের আগামী বৎসরের কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি গঠিত হয়েছে। বর্ত্তমানে স্ত্রী-স্বাধীনতার যুগে ১১ জন পুরুষের এই সমিতিতে প্রবেশাধিকার দেখে আশ্চর্য্যান্বিত হতে হয়। বাঙ্গলাদেশে যোগ্য মহিলার কি এতই অভাব?

এই অধিবেশনে নিখিল ভারত স্পোর্টস এসোসিয়েশন গঠনের প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করা হয়।

এ প্রকার কল্যাণকর যত প্রতিষ্ঠান ভারতের সর্ব্বত্র গড়ে ওঠে ততই জাতীর মঙ্গল।

* * *

আন্তঃ কলেজীয় মাংসপেশী সঞ্চালন প্রতিযোগিতা ইউনিভারসিটি ইনষ্টিট্যুটে মিঃ ডব্লিউ, সি, ওয়ার্ডসওয়ার্থের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ প্রকার অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবার জন্য বাঙ্গলাদেশে ব্যায়াম বিশেষজ্ঞদের কি যোগ্যতা নেই। যোগ্য ব্যক্তিকে যোগ্য অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করতে দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত।

* * *

বাইটন কাপের প্রতিযোগিতার পরিসমাপ্তি ঘটেছে। গত বৎসরের এই অনুষ্ঠানের শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগী বি, এন, আর দল এ বৎসরেও শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিয়েছে। বিজিত জিয়াজী দল শেষার্দ্ধে মাত্র সর্ট কর্ণারের ফলে ১—০ গোলে পরাজিত হয়েছে! জয়-নির্দেশক গোলটার জন্য কৃতিত্ব ট্যাপ-সেলের। ফাইনালের এই অনুষ্ঠানটিকে "চ্যারিটি" বলে ধার্য্য করা হয়। বিক্রয়লব্ধ অর্থ ৩৭৮০ টাকা। বস্তুতঃ জিয়াজী ক্লাবের গোলরক্ষকের গাফিলতির জন্য এ দলটি পরাজয় বরণ করে। জিয়াজী দলের খেলা আশানুরূপ হয়নি পরন্তু এরা "সর্ট পাশে" খেলার জন্য পরাজিত হয়। বিজয়ী দলের মিড্, কার, ম্রেকনের খেলা চিত্তাকর্ষক হয়। বিজিতদলের কৈলাস ও সাফেত খাঁর খেলা বিশেষ উল্লেখযোগ্য হয়। এই দলে রূপ সিং খেলেন। কিন্তু তাঁর খেলা তাঁর সুনামের পরিচয় দেয় নি। কেবল মাঝে মাঝে তাঁর খেলা দর্শকদের আনন্দ দেয়। বাইটন কাপের খেলার সঙ্গে সঙ্গে এ বৎসরের হকি খেলারও অবসান হল।

কাইডান কাপের ফাইনালে কলীজিয়ান্স ৪—০ গোলে গান এণ্ড শেল দলকে পরাজিত করেছে।

মাসলহোয়াইট কাপের ফাইনালে কিলবার্ণ ৩—১ গোলে ন্যাশানাল কার্ব্বন দলকে দ্বিতীয় অতিরিক্ত সময়ে পরাজিত করে জয়ী হয়েছে।

লক্ষ্মীবিলাস কাপের ফাইন্যালে মহমেডান্স ১—০ গোলে মোহনবাগানকে পরাজিত করেছে।

ডি এন্ গুই কাপের ফাইনালে পোর্ট কমিঃ ২—০ গোলে কাষ্টমসকে পরাভূত করেছে (বলা বাহুল্য প্রতিদ্বন্দ্বী দল ২টি বাইটন কাপের সেমি-ফাইনালের পরাজিত দল)।

বঙ্গীয় হকি প্রতিষ্ঠানের নির্ব্বাচিত একাদশ দল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দলকে ৩—০ গোলে পরাজিত করে।

এ বৎসরে হকি খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড অতি নিম্নস্তরের হয়েছে। প্রাদেশিক প্রতিষ্ঠানের এ বিষয়ে লক্ষ্য রেখে খেলার উন্নতির দিকে দৃষ্টি দিতে অনুরোধ করছি।

* * *

বোম্বাই-এ সৈন্যদের বিভিন্ন তহবিলের সাহায্য-কল্পে একটি আকর্ষণীয় ফুটবল প্রদর্শনীয় প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হয়েছে। বিদেশীয় প্রথম শ্রেণীর আর্ম্মী বিভাগের পেশাদার খেলোয়াড় এবং রাজকীয় বিমান বাহিনীর একাদশ পেশাদার খেলায় খেলাটিতে যথেষ্ট উত্তেজনার সৃষ্টি হবে। উদ্যোক্তা পশ্চিম ভারত ফুটবল প্রতিষ্ঠান।

নাটমণ্ডপ

সুবোধ মিত্রের পরিচালনায় নিউ থিয়েটার্সের "দুই পুরুষের" কাজ প্রায় শেষ হইয়া আসিল। যে রকম গতিতে কাজ চলিতেছে এ রকম চলিলে এই মাসের শেষাশেষি "দুই পুরুষের" চিত্রগ্রহণ সমাপ্ত হইয়া যাইবে।

* * *

হেমচন্দ্র পরিচালিত "My Sister"এর কাজ পূর্ণোদ্যমে চলিতেছে। সায়গল, চন্দ্রাবতী, সুমিত্রা, আখতার জীহান প্রভৃতি অভিনয় করিতেছেন।

* * *

বিমল রায় পরিচালিত "উদয়ের পথের"ও আর সামান্যই বাকী।

* * *

বোম্বাইতে সম্প্রতি যে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে ইনফরমেশন ফিল্মস অফ ইণ্ডিয়া তাহার একটি খণ্ড-চিত্র গ্রহণ করিয়াছেন এবং গত শনিবার হইতে তাহা বোম্বায়ের সব চিত্রগৃহগুলিতে দেখানো হইতেছে। ভারতের অন্যান্য চিত্রগৃহেও শীঘ্রই তাহা দেখানো হইবে।

* * *

প্রেমেন্দ্র মিত্রের পরিচালনায় "বিদেশিনীর" চিত্রগ্রহণ সমাপ্ত হইয়াছে। এই মাসের শেষাশেষি সম্ভবতঃ শ্রী, পূরবী ও পূর্ণতে মুক্তিলাভ করিবে। কানন দেবী ও ধীরাজ ভট্টাচার্য্য নায়িকা ও নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছেন।

* * *

শৈলজানন্দের কাহিনী অবলম্বনে সুকুমার দাশগুপ্ত রূপশ্রী লিমিটেডের "নন্দিতা"র শুটিং জোর চালাইতেছেন, নাম ভূমিকায় আছেন শ্রীমতী মলিনা।

* * *

শ্রীমতী রাজলক্ষ্মীকে আমরা এতদিন হয় দুঃখিনী মাতা, নয় গায়িকা, নয় প্রতিবেশী —এই সব ভূমিকাতেই দেখিয়াছি, কিন্তু অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশনের নির্ম্মীয়মান ছবি "সন্ধ্যা"তে তাঁহাকে একটি নূতন ধরণের ভূমিকায় দেখা যাইবে। মহিলা তস্করের ভূমিকায় তাঁহাকে রূপ দিতে দেখা যাইবে। তাঁহার সহিত অন্যান্য ভূমিকায় জহর গাঙ্গুলী, বিজয়া দাস বি-এ, অহীন্দ্র চৌধুরী, মীরা দত্ত, শ্যাম লাহা, পূর্ণিমা, নৃপতি চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি অভিনয় করিতেছেন।

* * *

নিউ থিয়েটার্সের ১নং ষ্টুডিওটি যে স্থানে অবস্থিত সেই জায়গাটি এতদিন কর্ত্তৃপক্ষ লীজ লইয়াছিলেন। বর্ত্তমানে উক্ত জায়গাটির মালিকদের নিকট হইতে নিউ থিয়েটার্স কর্ত্তৃপক্ষ দুই লক্ষ টাকা মূল্যে ক্রয় করিয়া লইয়াছেন। সুখবর, সন্দেহ নাই।

* * *

মেট্রো গোল্ডউইনের কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের "Good Earth" ছবি হইতে কয়েকটি দৃশ্য হুবহু গ্রহণ করার জন্য জয়ন্ত দেশাই প্রোডাকশানের বিরুদ্ধে আদালতের আশ্রয় লইতে মনস্থ করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। জয়ন্ত দেশাই-এর "ভক্তরাজ" চিত্রেই নাকি এই দৃশ্যগুলি সন্নিবেশিত হইয়াছে।

* * *

সম্প্রতি আর একটি খবরে প্রকাশ যে সুপ্রসিদ্ধা চিত্রনটী রমলা একজন আমেরিকান বৈমানিককে বিবাহ করিয়াছেন। কিছুদিন আগে শ্রীমতী স্নেহপ্রভাও একজন আমেরিকান বৈমানিককে বিবাহ করিয়াছেন। নব দম্পতিদের দীর্ঘায়ু কামনা করি।

'দোটানা' চিত্রের উপর ইনজাংশন

উমানাথ গাঙ্গুলী, তাঁহার এজেণ্ট বা কর্ম্মচারিগণ যাহাতে 'যাবার বেলায় পিছু ডাকে,' (বর্ত্তমানে 'দোটানা' নামে পরিচিত) নামক ফিল্মের চিত্রগ্রহণ করিতে কিম্বা উক্ত ফিল্মের জন্য লিখিত গল্প চিত্রকাহিনী সংলাপ ও গীতসমূহ ব্যবহার করিতে না পারেন তজ্জন্য ইনজাংশন জারী প্রার্থনা করিয়া মণি বর্দ্ধণ কলিকাতা হাইকোর্টে বিচারপতি দাসের এজলাসে এক দরখাস্ত করেন।

মাননীয় বিচারপতি প্রতিবাদীর উপর নির্দ্দেশ দিয়াছেন যে মামলাটীর চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত উক্ত চিত্র সম্পূর্ণ হইবার পরেও তিনি দেখাইতে পারিবেন না। মামলাটীর যাহাতে দ্রুত শুনানী শেষ হয় তিনি সেইরূপ কতকগুলি নির্দ্দেশ দিয়াছেন

ভ্রম-সংশোধন

গত সংখ্যায় 'নাটমণ্ডপ' বিভাগে ও ছবির পৃষ্ঠায় "মাটির ঘরের" পরিচালকের নাম অনবধানতা বশতঃ গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়া মুদ্রিত হইয়াছে। আসলে "মাটির ঘরের" পরিচালক হরি ভঞ্জ। আমরা এই অনবধানতার জন্য বিশেষ দুঃখিত।

নানাকথা

রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসব

আগামী ৮ই মে সোমবার নৈহাটি বোকে হলে অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের জয়ন্তী উৎসব হইবে। বঙ্গ সাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক ও দীপালীর প্রধান সম্পাদক সুকবি শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন। সর্ব্বসাধারণের উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়।

মায়ামঞ্চ

দুঃস্থজনগণের সাহায্যার্থে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সভ্য ও সভ্যাগণ শীঘ্রই "কেদার রায়" নাটকটী মঞ্চস্থ করিবেন। আমরা ইঁহাদের সাফল্য কামনা করি।

"চন্দ্রগুপ্ত" নাটকাভিনয়

দুর্গাদাস ইনষ্টিটিউটের দ্বিতীয় অবদান "চন্দ্রগুপ্ত" নাটক রঙমহল রঙ্গমঞ্চে গত ১৭ই এপ্রিল অভিনীত হয়, অভিনয়ের পূর্ব্বে মুষ্টিযোদ্ধা রবীন সরকারের পরিচালনায় শৈল নন্দী ও বিশ্বনাথ মিত্রের মুষ্টিযুদ্ধ, সুহৃৎ মিত্রের ভজন গান, শৈলেন সরকারের হাস্যরস বিতরণ,' কুমারী মিনু চ্যাটার্জির রূপকথা নৃত্য ও কুমারী বেলা দাসের মালিনী নৃত্য বিশেষ উপভোগ্য হয়।

"চন্দ্রগুপ্ত" নাটকের নাম ভূমিকায় অমল বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই, 'এন্টিগোনাসের অংশে রবীন মিত্র সুন্দর। কাত্যায়ণের ভূমিকায় সাধন সরকার ও বাচালের ভূমিকায় বৈদ্যনাথ গাঙ্গুলী আমাদের যথেষ্ট আনন্দ প্রদান করিয়াছেন। হেলেনের অংশে শম্ভু ভট্টাচার্য্যকে মন দিয়া অভিনয় করিতে দেখিতে পাইলাম না। ছায়ার সাজসজ্জা দৃশ্যকটু, অভিনয় ভাল। চাণক্যের ভূমিকায় জনপ্রিয় ছাত্র-অভিনেতা সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্য্য যেরূপ দক্ষতা ও চাতুর্য্য প্রকাশ করেন তাহা দর্শকের মনে রেখাপাত না করিয়া থাকিতে পারে নাই। তিনিই নাটকের পরিচালক।

দীপালীর স্বত্বাধিকারী শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত, ১২৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, দীপালী প্রেসে মুদ্রিত ও দীপালী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

• স্থাপিত-১৯২৭ •

দীপালী
DIPALI

প্রধান সম্পাদক—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ঃ সহঃ সম্পাদক—শ্রীধীরেন্দ্রমোহন মজুমদার বি. এল.

১৬শ বর্ষ VOL. XVI. | ২৮শে বৈশাখ ১৩৫১ ঃঃ May 11, 1944 | ১৯শ সংখ্যা No. 19

আলোচনী

এ সপ্তাহের উল্লেখযোগ্য সংবাদ আগা খাঁ প্রাসাদ-কারা হইতে মহাত্মাজীর মুক্তিলাভ। মিস মেডেলিন স্লেড, ডাঃ গিল্ডার, মিঃ প্যারেলাল এবং মিস নীরা বেনও মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

* * *

রুগ্ন, ক্লান্ত মহাত্মার এই প্রত্যাবর্ত্তন উপলক্ষে কোন কোন মহলে আশা ও ভরসার গুঞ্জন শোনা যাইতেছে। এতদসত্ত্বেও ইহার মধ্যে রহিয়াছে একটা গভীর বিষাদের সুর যাহা ভারতের অধ্যাত্মবাদী মনকে আন্দোলিত করিতেছে। বার্দ্ধক্যের ভারে পীড়িত, রোগজীর্ণ মহাত্মার প্রত্যাবর্ত্তনে অগণিত জনগণের মনে একটি মিশ্রিত আনন্দ বেদনার সৃষ্টি হইবে। জাতীয়তার প্রথম অরুণোদয়ের দিনে ন্যায় ও সত্যনিষ্ঠার পুরোহিতরূপে আমরা তাঁহাকে পাইয়াছিলাম। তাহার পর তাঁহার নীতিবাদী মন ধীরে ধীরে দেশের রাষ্ট্রনৈতিক আলো বাতাসে সংগঠনের সহস্রদল মেলিয়া ঊর্দ্ধমুখী হইয়া রহিল। কেহ তাঁহাকে চিনিল, কেহ চিনিল না। রাজরোষের ক্ষমাহীন আঘাত তাঁহার মস্তকে অবিশ্রান্ত ধারায় বর্ষিত হইল। স্বাধীনতার এই দুর্দ্ধর্ষ সৈনিক পথভ্রান্ত হইলেন না। দীর্ঘদিন ধরিয়া দেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে চলিল ঘন ঘন পটপরিবর্ত্তন। দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহ আন্দোলন হইতে অসহযোগ আন্দোলন, চৌরাচৌরী ও ডাণ্ডী অভিযান পর্য্যন্ত তাঁহার আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক মতবাদ ধীরে ধীরে বিকসিত হইয়া একটি নূতন আদর্শবাদের রূপ গ্রহণ করিতেছিল। কোন্ রহস্যময় তীর্থযাত্রায় তাঁহার আধ্যাত্মিক মন অগ্রসর হইতেছিল, তাহার সঠিক উত্তর আমরা পাই নাই। বাহিরের কার্য্য ও লক্ষণ ধরিয়া চলিয়াছে তাঁহার সমালোচনা। সময়ে সময়ে তাহা রূঢ় হইয়াছে। ইহাতে বিচলিত হইতে তাঁহাকে কেহ দেখে নাই। বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের প্রারম্ভ হইতেই তাঁহার অধ্যাত্মবাদ যেন নূতন পথ ধরিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। 'হরিজন'-এর পৃষ্ঠায় তাঁহার নবলব্ধ "New Light"-এর বিস্তৃত পরিচয় সে সময় বাহির হইতেছিল। ইহা ছিল ব্যবহারিক রাজনীতি ও কূটনীতির বহু ঊর্দ্ধের কথা। পরিবর্ত্তিত আবহাওয়ায় ভারতের মন যেন ইহা গ্রহণ করিতে পারিতেছিল না। ক্রীপস্ মিশনের ভারতে আগমনের সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীজীর আধ্যাত্মিক রাষ্ট্রনীতি যেন একটা বস্তুগত রূপ পাইতে আরম্ভ করিল। ১৯৪২ সালের গোড়া হইতে আগষ্ট পর্য্যন্ত গান্ধীজীর বহু বিবৃতি ১৯৪০ সালের তুলনায় অধিকতর স্পষ্ট। সে দিন তাঁহার ব্যক্তিত্বের স্পর্শে সারা ভারত অস্ফুট কলরবে আন্দোলিত হইয়া উঠিল—তাহার পর আসিল চরম সংঘর্ষের সন্ধিক্ষণ। গান্ধীজীর জীবনের ইতিহাস আধুনিক ভারতীয় রাষ্ট্রনীতির ইতিহাস সন্দেহ নাই। এতখানি স্থান জুড়িয়া আর কেহ নাই ইহাও সত্য। তথাপি মহাত্মা

এতদূরে রহিয়াছেন যেখানে শুধু আমাদের অবিমিশ্র বিস্ময় ও শ্রদ্ধার অর্ঘ্যটুকুই হয়তো পৌঁছিতে পারে।

* * *

বহুকাল ধরিয়া কলিকাতার পথে জঞ্জাল ও নোংরামীর চূড়ান্ত চলিতেছে। কলিকাতা কর্পোরেশন কোনদিন জনসাধারণের আবেদনে কর্ণপাত করেন নাই। যুদ্ধপূর্ব্ববর্ত্তীকালে লরি বা পেট্রলের অভাব ছিল না। সে দিনও দেখিয়াছি, দুর্গন্ধময় আবর্জ্জনার স্তূপ গৃহস্থের বাড়ীর পাশে, হোটেল ও খাবারের দোকানের সম্মুখে পচিতেছে। মানুষ নির্ব্বিকার ভাবে এ ব্যবস্থাকে তাহাদের সাধারণ দৈনিক আর দশটা অসুবিধার মত মানিয়া লইয়া দিন কাটাইতেছে। যুদ্ধের পূর্ব্বেও অজুহাতের অভাব হয় নাই। আজ তো কথাই নাই। পেট্রল ও লরীর অভাব আছে—আরও কত কি অসুবিধা আছে, ইঁহারাই বলিতে পারেন। সম্প্রতি "ষ্টেটশম্যান" পত্রিকা এ সম্বন্ধে যে আলোচনা করিতেছেন তাহার ফল ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে। সেদিন বাংলার গবর্ণর কলিকাতার পথের আবর্জ্জনা স্তূপ পরিদর্শন করিয়াছেন। কর্পোরেশনের কর্ত্তারাও হাই তুলিয়া আড়া-মোড়া ভাঙ্গিয়া অগ্রসর হইতেছেন বলিয়া মনে হইতেছে। কলিকাতার দীর্ঘকালের কদভ্যাস এতদিনে যদি দূর হয় তাহা হইলে সত্যই একটি কাজ হইবে।

* * *

ডাঃ এ, এল, মুডালিয়ার মাদ্রাজের একজন খ্যাতনামা ডাক্তার ও শিক্ষাব্রতী। তিনি সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়া সহরের হাসপাতাল ও সংক্রামক রোগের প্রতিষেধক ব্যবস্থা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, কলিকাতার জনসাধারণ জনকল্যাণের জন্য কোন চিন্তাই করেন না। সহরের দরিদ্র ও দুস্থদের জন্য কোন ব্যবস্থাই এখানে নাই। তিনি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছেন, কলিকাতা কর্পোরেশনের সংক্রামক রোগের কোন হাসপাতাল নাই। সহরের মধ্যস্থলে সাধারণ হাসপাতালেই সংক্রামক রোগীর চিকিৎসা হইয়া থাকে। কলেরা ও বসন্ত রোগের চিকিৎসা-ব্যবস্থার কোন উন্নতি তিনি লক্ষ্য করেন নাই। সনাতন ব্যবস্থাই আজও চলিতেছে। একটি হাসপাতালে তিনি দেখিয়াছেন, যেখানে ৩০জন রোগীর স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে সেখানে একশত জনকে রাখা হইয়াছে! কি ভাবে এই অসাধ্য সাধন করা হইল তাহা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে অনেকে বলিতে পারিবেন।

* * *

সম্প্রতি পাঞ্জাবের পাবলিক ওয়ার্কস বিভাগের মন্ত্রী মিঃ সৌকত হায়াৎ খাঁ গবর্ণর কর্ত্তৃক বরখাস্ত হইয়াছেন। এই ব্যাপারে মিঃ জিন্না একটা রাজনীতি প্রচার কার্য্যের সুযোগ পাইয়াছেন সন্দেহ নাই। মিঃ সৌকত হায়াৎ খাঁর বরখাস্তের সঠিক কারণ এখনও প্রকাশিত হয় নাই। হইলে পাঞ্জাবের দলগত রাজনীতি তথা স্বায়ত্তশাসনের স্বরূপ সম্বন্ধে রূঢ় আলোকপাত হইত বলিয়া আমাদের ধারণা। সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে, লাহোর কর্পোরেশনের পরিচালনাধীন বালিকা বিদ্যালয় সমূহের লেডি সুপারিনটেণ্ডেণ্টকে পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট পুনরায় কার্য্যে বাহাল করিয়াছেন। সংবাদ পত্রে ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছিল, এই মহিলাকে বরখাস্ত করার ব্যাপারেই নাকি মিঃ সৌকত হায়াৎ খাঁ পদচ্যুত হইয়াছেন। ব্যাপারটা হয়তো এতখানি সরল নয়। তথাপি গবর্ণমেণ্ট অবিচারের প্রতিকার করিয়া জনসাধারণের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

ঘরে-বাইরে

—কুলুক ভট্ট

ফ্যাশিষ্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পীগণের কথা বলবো বলেছিলুম। বলি :

প্রথমে ধূর্জটীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কথা। ধূর্জটীপ্রসাদ দারুণ পণ্ডিত—তিনি যখনই পত্র পত্রিকাদিতে লেখেন, তখনি সে লেখার ভূমিকায় ইনি বলেন—তোমাদের কথায় লিখছি—এই ধরণের কথা। এবং সে কথার মধ্যে বেশ সদম্ভেই তিনি প্রচার করেন, তিনি একজন ওস্তাদ ভাবুক, ওস্তাদ লিখিয়ে! এখানেও তিনি সে কথা জাহির করতে ছাড়েন নি! লিখেছেন, "শ' দুই তিন বই ঘেঁটে এবং তাদের উল্লেখ দিয়ে বই লিখলাম। এবং লিখে পৃথিবীর জন দশেক মাথাওয়ালা লোকের কাছে পাঠালাম। তাঁদের চিঠিতে আত্মবিশ্বাস এলো।" এই যে উক্তি—পৃথিবীর দশজন মাথাওয়ালার চিঠিতে তাঁর মনে আত্মবিশ্বাস এলো। এর অর্থ, হ্যাঁ, তিনি একজন ভাবুক এবং লিখিয়ে বটে! আমরা অর্থাৎ তাঁর ধামা যারা ধরি না, কিম্বা তিনিও vice versa যাদের ধামা ধরবার আবশ্যকতা—mutual adorationএর সম্ভাবনা নেই বলে—উপলব্ধি করেন না—তাঁর লেখা পড়ে মর্ম না বুঝে অবাক হয়ে ভাবি, ভদ্রলোক কি বলতে চান?—আমাদের ঐ একটি লাইন লিখে কি কৌশলে তিনি down করে দিলেন, বলুন তো! তবে বিনয় প্রকাশ ছলে তিনি যে কথাটি বলেছেন যে "টাকার তাগিদে তিনি যা লিখেছেন তার মধ্যে অধিকাংশই বাজে"—একথায় বোঝায়, টাকা নিয়ে তিনি ভেজাল বেচেছেন! ঘী-তেল ভেজাল বেচলে রাজদ্বারে দণ্ডনীয় হতে হয়, বাঙলা লেখা সত্যিই তো ঘী তেল নয়, তাই আইনের নখটুকু তাকে আঘাত দিতে পারে নি!

অন্নদাশঙ্কর রায় লিখেছেন, তিনি লেখেন "মুক্তির জন্যে!" এর উপরে টিপ্পনী চলে না!

জীবনানন্দ দাস যা লিখেছেন, তা একেবারে উপনিষদ—সে লেখার ব্যাখ্যা করতে পণ্ডিতের দরকার। কারণ তিনি যা লেখেন তা দুর্বোধ্য এবং সে লেখা লেখেন তিনি তাঁর দলের জন্য।

শচীন সেনগুপ্ত লিখেছেন—"জন সংযোগে সাফল্য লাভের উদ্দেশ্যে!" "জন সংযোগ" কথার অর্থ বুঝবো কি বাঙলা থিয়েটারের গ্যালারি! মুখে তিনি যতই বলুন—প্রচার কার্য্যের জন্য লেখেন; আমরা জানি, তিনি লেখেন একক্লাশ অডিয়েন্সের জন্য—তাও বিলিতী বইয়ের অক্ষম তর্জমা করে। যে সব নাকি তিনি লেখেন, আমরা তা দেখে আসছি, সে সব নাটকের পাত্র-পাত্রীরা ধুতি শাড়ীপরা বিদেশী—তাদের আচার বা মনোভাবের সঙ্গে এদেশের নরনারীর আচার এবং মনোভাব মোটেই মেলে না—এক কথায় ওসব নাটকের সঙ্গে দেশের নাড়ীর এতটুকু যোগ নেই!

অমিয় চক্রবর্ত্তী মশায় লিখেছেন,—"সজ্ঞানে কি জানি, কি লিখি?" চমৎকার সত্য কথা! জ্ঞান থাকলে তিনি কখনো লিখতেন না—এ সম্বন্ধে তাঁর কথায় আমাদের অখণ্ড বিশ্বাস। এর উপর তিনপাতা ধরে তিনি আর যে সব কথা লিখেছেন, স্পষ্ট স্বীকার করছি, ছেলে বেলায় চারুপাঠ তৃতীয় ভাগ পড়ে তাঁর প্রত্যেকটি লাইনের অর্থও বুঝতে পারতুম কিন্তু চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের লেখা ঐ তিন পাতা—বাপ্‌রে, দন্তস্ফুট করার সামর্থ হলো না! "সৃজনধর্ম্মী" "মনোনায়ক" "মানসিক কারখানা" এমনি বড় বড় অনেক কথা এলেখায় আছে—কথা দেখে যাঁরা লেখার আদর করেন, তাঁরা বলবেন লেখা বটে! প্রেমেন্দ্র মিত্রও একটি সত্য কথা বলেছেন, "নিজেদের ঢাক পেটাতে লেখকদের জুরি নেই!" বুঝ লোক, যে জান সন্ধান।

বিষ্ণু দে মশায় লিখেছেন, লেখা তাঁর বদ অভ্যাস। তারপর লিখেছেন পাঠক সমাজের সঙ্গে তাঁর "যোগ ক্ষীণ অথচ জটিল।" সে জটিলতাকে তিনি এ কৈফিয়তেও ছাড়েন নি—"বদ অভ্যাস" কি না! লিখেছেন "এই মানব সম্বন্ধ এর কাজ চৈতন্যে ও অবচেতনে, আশু ও সময় সাপেক্ষ, বিকাশ, আরোপ নয়।" লিখেছেন "শ্রম যেখানে সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ নয়, সততা অল্পবিস্তর অপচয়।" লিখেছেন, "যে লেখক নিষ্ক্রিয়, নিছক agent মাত্র তাঁর লেখা জনপ্রিয় হলেও দুর্গত।" এ-সব ছত্রে কি বলতে চান, বিষ্ণু দে তার grasp পেয়েছেন? শেষের ছত্রে "জনপ্রিয়" কথাটার পিছনে যে শ্লেষ করেছেন, সে সম্বন্ধে বলতে চাই, "ক্ষীণ এবং জটিল" লেখা লিখে তিনি দলের প্রীতি লাভ করে জনপ্রিয় হন যদি, তো "জনপ্রিয়" লোক কি এমন মহাপাপ করেছেন যে তাঁর সম্বন্ধে শ্লেষের এ কুটুস্ কামড়!

এই সব বিষ্ণু দে যদি ভেবে থাকেন, তাঁরা যা লিখেছেন—আগাগোড়া বিদেশী উদ্গারে—সাহিত্য বলে সেই সব লেখা বরণীয় হবে, তাহলে বলবো ভুল—ভুল করছেন মশাই! দুর্ভিক্ষের মর্ম্মান্তিক দুঃখে বিচলিত হয়ে দু'ছত্র জটিল মিলহীন কবিতায় আর্ত্তনাদ তোলায় বিলাস-সুখ হয়তো ভোগ করা যায়, জাতীয় সাহিত্যে তার এতটুকু ছায়া পড়ে না। "জনপ্রিয়" বলে, এত যে শ্লেষ স্বীকার করেন মশায়, বঙ্কিমচন্দ্রের মহাকাব্য "আনন্দ মঠ" অল্প জনপ্রীতি লাভ করেনি। "আনন্দ মঠ" পড়ে আমরা বুঝতে পারি, কিন্তু "জনপ্রিয়" তাঁদের লেখা, সে লেখার সঙ্গে রহস্য-লহরীর তফাৎ কোথায়, সেইটুকু বহু প্রয়াসেও বুঝতে পারলুম না!

তাঁদের "জনপ্রিয়" লেখক-সঙ্ঘের লেখায় ভরা একখানি সদ্য প্রকাশিত মাসিকপত্র হাতে পেয়েছি। ভাষা এবং ভাবের তরঙ্গে যে ঝঙ্কার ছত্রে ছত্রে যে বিরাট অহঙ্কার চীৎকার করছে, তার পরিচয় দেবো আসছে বারে।

প্রফুল্ল কুমার সরকার

—শ্রীযোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত

আজ একটি পুরাণো কথা মনে পড়িতেছে। সেকালের সাহিত্য পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গত রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী রজনীকান্ত গুপ্তের স্মৃতিসভায় বলিয়াছিলেন—'আমি যখনই সাহিত্যপরিষৎ মন্দিরে আসিতাম তখনই আপনারা সকলে জিজ্ঞাসা করিতেন, আপনি এলেন, রজনীবাবু কোথায়? কিন্তু আজ আর সেকথা কেহত' জিজ্ঞাসা করেন না, কেন না জানেন যে রজনীবাবু আর নাই।' তেমনি আজ আমাদের রবিবাসরের অধিবেশনে আসিয়া কেহত' জিজ্ঞাসা করেন না, প্রফুল্ল বাবু যে এখনো এলেন না। সে প্রশ্ন করিবার কারণ আর নাই। যে রবিবাসরের প্রাণ ছিলেন প্রফুল্লকুমার, যিনি চুরুটের ধূম উদ্গীরণ করিতে করিতে সভাস্থলকে ধুমায়িত করিয়া হাস্যকৌতুকের সঙ্গে সকলকেই সমানভাবে অভিনন্দিত করিতেন। আজত' তিনি আর নাই। তাই একটা বেদনা মনকে বিষণ্ণ ও শোকাতুর করিয়া তুলিয়াছে। রবিবাসরের এমন সভা অতি কমই হইয়াছে যে সভায় প্রফুল্লবাবু অনুপস্থিত থাকিতেন। আজ প্রফুল্ল বাবু এ সভায় নাই এ যেন একটা আশ্চর্য্য ঘটনা—কিন্তু ইহাই হইতেছে মানবজীবনের সর্ব্বাপেক্ষা নিষ্ঠুর ও নিগূঢ় সত্য। জীবন মৃত্যুর খেলা দিবা রাত্রি সমান ভাবে চলিয়াছে। রবিবাসরের সংক্ষিপ্ত কয়েক বৎসরের ইতিহাসের মধ্যেই আমরা জলধর দাদা হইতে আরম্ভ করিয়া একে একে কতজনকে হারাইলাম। শরৎচন্দ্র গেলেন, হেমেন্দ্র লাল রায় গেলেন, সেদিন ব্রজগোপাল দাসও চলিয়া গেলেন। এই ভাঙ্গাগড়া লইয়াই আমাদের জীবন।

প্রফুল্ল কুমার যখন যুবক সেই সময়ে আমার সঙ্গে আলাপ হইবার সুযোগ হইয়াছিল। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার, ডাক্তার রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এবং আরও অনেক তরুণদের সহযোগীরূপে সেখানে প্রফুল্লবাবুর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হইয়াছিল। বিখ্যাত ডন সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ও প্রবর্ত্তক সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় তরুণদের প্রাণে এক নবীন উৎসাহ ও প্রেরণা জাগাইয়াছিলেন। সে সময়ে পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করিয়া হিন্দুধর্ম্মে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন এবং পূর্ব্ব পুরুষের প্রেরণা-বলে তিনিও অদ্বৈত বংশের বংশধরের উপযুক্ত গৌরব লইয়া বৈষ্ণব হইলেন—তাঁহার প্রথম যুগের শিষ্যদের মধ্যে অনেকেই বাঁচিয়া নাই,—বাঁচিয়া আছেন আমার মাতুল অশীতিপর বৃদ্ধ রেবতীমোহন সেন প্রভৃতি দুই একজন মাত্র। ডন সোসাইটির সতীশবাবুও বিজয়কৃষ্ণের মন্ত্র শিষ্য ছিলেন, তিনি প্রায়ই অখিল মিস্ত্রীর লেনে যে বাড়ীতে মনোরঞ্জন গুহ এবং রেবতীবাবু প্রভৃতি থাকিতেন সেখানে আসিতেন। আমি দুই একবার ঢাকা হইতে আসিয়া তাঁহাদের সেই সম্মিলন দেখিয়াছি। সেই মিলন-ক্ষেত্রে সতীশবাবুর সঙ্গে আলাপ আলোচনা করিয়াছি নির্ভীক ভাবে। তিনি আমাদের কাছে গ্রামের কথা

শুনিতেন, দেশের কথা জানিতে চাহিতেন অতি খুঁটিনাটি ভাবে। "Dawn" কাগজের তখন ঘরে ঘরে সমাদর।

কেহ কেহ এমন প্রকৃতির লোক আছেন যাঁহারা অতি সহজেই মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন। সতীশবাবু সেই শ্রেণীর লোক ছিলেন—তিনি কল্পনাপ্রবণ ছিলেন না, ছিলেন কর্মনিষ্ঠ এবং প্রত্যেকটী জিনিষ চাহিতেন দর কষাকষি করিয়া বুঝিয়া লইতে। অতিরঞ্জন জিনিষ বা অবাস্তব কাল্পনিক উচ্ছ্বাসকে তিনি পছন্দ করিতেন না। আর সেকালে শিক্ষিত সমাজে Dawn পত্রিকার প্রকাশ ছিল খুবই বেশী।

সতীশবাবুর ন্যায় দেশপ্রাণ কর্মী ব্যক্তির কাছে প্রফুল্লকুমারের হাতেখড়ি এবং তিনি সেখানে বন্ধু পাইয়াছিলেন বিনয়কুমার, রাধাকুমুদ প্রভৃতির ন্যায় বর্ত্তমান যুগের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণকে। আমি যখনই কলিকাতা আসিতাম তখনই ইঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতাম।

বঙ্গভঙ্গের সময় আমাদের দেশে স্বদেশী যুগের যে প্রবল দেশহিতৈষণার বন্যা আসিয়াছিল সে বন্যার মধ্য দিয়া আমরা যেমন জাতীয় সঙ্গীত, কবিতা, চরকা প্রভৃতি পাইয়াছিলাম, তেমনি পাইয়াছিলাম মায়ের আহবান।

আয়রে আমরা মায়ের নামে
এই প্রতিজ্ঞা করবো ভাই ;
পরের জিনিষ কিনবো না
যদি মায়ের ঘরের জিনিষ পাই।

সে আহ্বানে ডন সোসাইটির পরিচালক সতীশবাবুও যেমন বিচলিত হইয়াছিলেন তেমনি তাঁহার সহযোগীরা ও শিষ্যবৃন্দ উদ্যোগী ছিলেন—দেশী জিনিষের প্রচারে দেশী জিনিষের দোকান করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন তরুণ দেশবাসীকে। প্রফুল্লকুমার ছিলেন সামাজিক ইতিহাস অনুসন্ধিৎসু। সমাজকথা ছিল তাঁহার প্রিয় গবেষণার বস্তু। দেশের দুর্ভিক্ষের ইতিহাস, দেশের অন্নকষ্ট, জনসংখ্যা, ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনায় তিনি সতীশবাবুর নির্দ্দেশক্রমে আত্মনিয়োগ করেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার ছিল ধৈর্য্য ও অভিনিবেশ এবং প্রাচীন কাগজপত্র আলোচনা করিতে অখণ্ড মনোযোগ।

হিন্দুজাতির সংখ্যা হ্রাস সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া যাঁহারা তৎকালে আলোচনা করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে Lt Colonel U N. Mukherji ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে "Dying Race" নামে বই লেখেন। আর লিখিয়াছিলেন শ্রীযুক্ত কিশোরী লাল সরকার এম, এ, বি, এল A Dying Race—How Dying। আমার মনে পড়ে সেই তথ্যবহুল বইখানি ১৯১১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রফুল্লবাবু বাঙ্গালার অবস্থা বিশেষ করিয়া বাঙ্গালী হিন্দুদের অবস্থা বুঝিবার জন্য সেকালে অনেক প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার একটি প্রবন্ধ "আদমসুমারীতে বাঙ্গালার অবস্থা" ১৩২০ সালের মাঘ মাসের 'সাহিত্যে' প্রকাশিত হইয়াছিল। ত্রিশ বৎসর আগে প্রফুল্লকুমার লিখিয়াছিলেন :

১৯০১—১৯১১ এই দশ বৎসরে হিন্দুদের অপেক্ষা মুসলমানদের বৃদ্ধির হার ৩ গুণ বেশী হইয়াছে। সুতরাং বুঝা কঠিন নহে যে বঙ্গীয় হিন্দু জাতি ক্রমশঃই ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইতেছে—জীবনযুদ্ধে মুসলমানদের দ্বারা তাহারা ক্রমেই পরাস্ত হইয়া পড়িতেছে! কিন্তু আমরা মোহমুগ্ধ মুমূর্ষ বিকল। পৃথিবী হইতে অনেক জাতি লোপ পাইয়াছে, আমরাও হয়ত পাইব। কিন্তু কাপুরুষের ন্যায় নিশ্চলভাবে মরার অপেক্ষা কি জীবনের জন্য একবার চেষ্টা করিয়া দেখা উচিত নয়? একই দেশে বাস করিয়া মুসলমান ও হিন্দুর জীবনীশক্তির এই প্রভেদ কেন হয়, তাহা বাস্তবিকই অনুসন্ধানের বিষয়। সুধী ও মনস্বীগণের এ বিষয়ে বিশেষরূপে চিন্তা করিবার সময় আসিয়াছে।

সেই ত্রিশ বৎসর আগে হিন্দু জাতির যে সমস্যা লইয়া তিনি আলোচনা আরম্ভ করেন সে বিষয়টী লইয়া সমান ভাবে শক্ত করিয়া ধরিয়াছিলেন—তাহারই মাঝে 'ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু' নামক গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইয়াছে। আমি মৎ প্রণীত "বিক্রমপুরের ইতিহাসের" দ্বিতীয় সংস্করণে—পূর্ব্ববঙ্গে মুসলমানের সংখ্যা অধিক কেন তদ্বিষয়ে আলোচনা করিয়া যে সকল কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছিলাম তিনি তাঁহার কিয়দংশ তদীয় ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু নামক গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়া আমাকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। তাঁহার অনুরোধে আমি সমাজতত্ত্ব এবং নানা জেলার হিন্দু ও মুসলমানের লোকসংখ্যার বৃদ্ধি ও হ্রাসের অনেক তথ্য সরকারী প্রাচীন কাগজপত্র হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলাম, তিনি বলিয়াছিলেন যে সে সমুদয় 'ক্ষয়িষ্ণু হিন্দুর' পরবর্ত্তী সংস্করণে সন্নিবেশিত করিবেন।

প্রফুল্লকুমার সমাজের কথা অতি গভীরভাবে আলোচনা করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে তিনি ছিলেন একজন সাহসী সংস্কারপন্থী। সমাজ মানুষের সৃষ্টি। সমাজ অর্থে পরস্পরের মিলন, মিলন-জনিত শক্তিবৃদ্ধি। নিজের মধ্যে কোন মানুষই সম্পূর্ণ নহে—সে সম্পূর্ণ হয় মিলনে—সে মিলনের অন্তরায়ে ফুটিয়া উঠে ব্যক্তিগত আত্মম্ভরিতা—সেই আত্মম্ভরিতার জন্যই সমাজ ধ্বংস হয়। বিপ্লবী প্রফুল্লকুমার

চাহিয়াছিলেন—বৃহত্তর হিন্দু সমাজকে ধনবলে জনবলে জীবন সংগ্রামের উপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিতে এবং তাহার কারণও নির্দ্দেশ করিতে পরাঙ্মুখ হন নাই—সেজন্য তিনি হিন্দু সমাজে অসবর্ণ বিবাহ, বিধবা বিবাহ প্রভৃতি প্রচলন করিবার পক্ষপাতী ছিলেন এবং নানা যুক্তিতর্ক ও বিবরণী দ্বারা তাহা বুঝাইয়া দিয়াছেন, যদি বাঁচিতে হয় তবে এখনও সমাজের সংঘের মধ্য দিয়াই আমাদের পূর্ণ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র জাগিতে পারে। প্রফুল্লবাবু সমাজের দিক দিয়া মানুষকে বুঝাইবার জন্য কয়েকখানি উপন্যাস লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার 'ভ্রষ্ট লগ্ন', 'লোকারণ্য', 'বালির বাঁধ' প্রভৃতি উপন্যাসগুলি তাঁহার জীবনের অভিজ্ঞতার কথাই কথাসাহিত্যের মধ্য দিয়া প্রচার করিয়াছেন। তাহাতে চিন্তাশীলতা আছে, ভবিষ্যত দৃষ্টি আছে। চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই তাহা পড়িয়া এক নূতন অভিজ্ঞতা লাভ করিবেন এবং দেখিতে পাইবেন ভবিষ্যতদর্শী প্রফুল্লকুমার কি ভাবে সমাজের কথা চিন্তা করিতেন।

সংবাদ পত্র হইতেছে জাতীয় জীবনের উন্নতির মূলে শ্রেষ্ঠ সম্পদ। আমরা বাল্যকালে দেখিতাম বঙ্গবাসী পত্রিকা কি ভাবে গ্রামের লোকেরা গ্রহণ করিত। সপ্তাহের সেই বিশেষ দিনটিতে ডাকঘরে ভিড় জমিত। বৃদ্ধ, তরুণ ও বালক বালিকারা সংবাদ জানিবার জন্য ব্যাকুল হইত। তখন দৈনিক ছিল না বলিলেই হয়—বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে দৈনিক চন্দ্রিকা নামে একখানি দৈনিক পত্রিকা বাহির হইত বটে তবে তাহার মফঃস্বলে প্রচলন ছিল না। স্বদেশী যুগ হইতেই আমাদের দেশে বাঙ্গলায় দৈনিক পত্রিকার প্রচার হইতে থাকে—তাহার মধ্যে দৈনিক 'সন্ধ্যার' প্রচার ছিল খুবই বেশী। সে সময়ে প্রফুল্লকুমার ছিলেন যুবক।

১৯২১ সালে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' প্রচার হইতে থাকে। আনন্দবাজার প্রতিষ্ঠাতাদলের মধ্যে প্রফুল্লকুমার ছিলেন সেই সৃষ্টির আদিযুগ হইতে আনন্দবাজারের একজন কর্ণধার। ১৯২২ সালের দোল পূর্ণিমা দিবসে তাঁহার সম্পাদনায় আনন্দবাজার পত্রিকা প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। কিছুকাল পরে সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় আনন্দবাজার পত্রিকা সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন, সত্যেন্দ্রনাথ ১৯৪২ সালের জানুয়ারী পর্য্যন্ত উক্ত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইহার পর প্রফুল্লকুমার আবার আনন্দবাজার পত্রিকার ভার গ্রহণ করেন এবং মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তিনিই ছিলেন উহার সম্পাদক।

মনে পড়ে কতদিন দেখিয়াছি প্রফুল্লকুমারকে আনন্দবাজার পত্রিকার ত্রিতলের একটি কক্ষে গড়-গড়া টানিতে টানিতে আনন্দবাজারপত্রিকার কপি লিখিতেছেন। অক্লান্তকর্ম্মী প্রফুল্লকুমার হাসিমুখে সারাদিন ও রাত্রির দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত কাজ করিতেন, কখনও ক্লান্তি বা শ্রান্তি তাঁহার দেখি নাই।

প্রফুল্লকুমার সুবক্তা ছিলেন। তিনি ধীরে ধীরে নানাযুক্তিপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা করিতেন। বাদ-প্রতিবাদে বিচলিত হইতেন না—কর্কশ ভাষা কাহারও প্রতি কোনদিন ব্যবহার করেন নাই, তাঁহাকে কেহ ক্রুদ্ধ হইতে দেখেন নাই।

আমি ঢাকায় থাকিতে নিয়মিত 'আনন্দবাজারে' সংবাদ পাঠাইতাম। রবীন্দ্রনাথ যখন ঢাকা যান তখন তাঁহার বক্তৃতা ও ফোটোগ্রাফ আমি সঙ্গে সঙ্গেই আনন্দবাজারে পাঠাইতাম, সে বিষয়ে প্রফুল্লবাবু আমাকে বলিতেন—আপনার উচিত ছিল সংবাদপত্র অফিসে আসা, তাহা হইলে নানা সংবাদ অতি দ্রুত ভাবে প্রকাশ করিতে পারিতেন।

বৈষ্ণব ধর্ম্মে যেমন ছিল তাঁহার আস্থা তেমনি বৈষ্ণব ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধে এবং পদাবলী সাহিত্য সম্পর্কে তাঁহার গভীর জ্ঞান ছিল। ভক্ত প্রফুল্ল কুমার বৈষ্ণবোচিত গুণগ্রামের অধিকারী ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুসংবাদ যেদিন সংবাদ পত্রে পড়িলাম—আনন্দ বাজারের বেয়ারা কাগজখানি হাতে দিয়া বলিল, বড় খারাপ খবর বাবু, আমাদের বড় বাবু নাই - পরফুল্লবাবু মর গিয়া। একটা কড়া কথা তিনি কোন দিন কাহাকেও বলেন নাই। এমনি ছিলেন মানুষ প্রফুল্ল কুমার।

সামাজিক হিসাবে প্রফুল্ল কুমারের মত লোক বিরল, যে-কেহ তাঁহাকে কোনও কার্য্যোপলক্ষে নিমন্ত্রণ করিয়াছে সেখানেই তিনি উপস্থিত হইয়াছেন। একবার রবিবাসরের সভাশেষে সন্ধ্যার পর—আমাকে বলিলেন— চলুন, আপনাদের পাড়ায় আমার একটি বিবাহের নিমন্ত্রণ আছে, এক সাথে যাই। সে বাড়ীতে আমারও নিমন্ত্রণ ছিল। দুইজনে অন্ধকারে বাড়ী চিনিতে না পারিয়া পাশের অন্য এক বিবাহ-বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম, বাড়ীর কর্ত্তা আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন,—কিন্তু আমরা দেখিলাম যে এ বাড়ী আমাদের বন্ধুর বাড়ী নয়, এদিকে গৃহস্বামী আমাদিগকে বিনীত ভাবে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন। পরক্ষণে আমরা বলিলাম যে, আমাদের ক্ষমা করিবেন, আমরা ভুল করিয়াছি। গৃহস্বামী করজোড়ে বলিলেন—'আমাকে আপনারা না চিনিলেও আমি আপনাদের চিনি—আপনি আনন্দবাজারের প্রফুল্ল বাবু, আর ইনি যোগেন বাবু—আপনারা একটু জলযোগ না করিয়া গেলে দুঃখিত হইব। তারপরে আপনাদের বন্ধুর বাড়ী পৌঁছাইয়া দিতেছি।' প্রফুল্ল বাবু হাসি মুখে বসিয়া গেলেন এবং আমরা জলযোগ করিয়া বন্ধুর বাড়ী গিয়া এ গল্প

প্রশ্নোত্তর

অভিনেত্রীকে বিবাহ করা উচিত কিনা?

শ্রীযুক্ত দীপালী সম্পাদক সমীপেষু—
মহাশয়,

দীপালীর ১৭শ সংখ্যায় ঢাকা থেকে একজন ভদ্রলোক জানতে চেয়েছেন 'অভিনেত্রীকে বিবাহ করা উচিত কি না।' আমি ছায়া-চিত্রজগতের একজন নগণ্য অভিনেত্রী। এ জগত সম্বন্ধে ব্যক্তিগত পরিচয় হয়তো আমার কিছু আছে। এ প্রসঙ্গে আমার সামান্য বক্তব্য আপনার পত্রিকায় প্রকাশ করে বাধিত করবেন।

বর্ত্তমান ছায়াছবির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এদেশের দর্শকের সংখ্যাও বেড়েচে। ছবির আবেদন বিভিন্ন লোকের মনে বিভিন্নভাবে পড়ছে। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি—একশ্রেণীর দর্শক ছবি দেখতে যান শুধু অভিনেত্রীদের glamour-এর আকর্ষণে। সব দেশেই এটা ঘটে থাকে। এই glamour এর আকর্ষণে আজ একশ্রেণীর পুরুষ অভিনেত্রীকে বিবাহ করে সমাজ সংস্কারের পথ প্রদর্শন করছেন। সাময়িক ভাবে বাহবাও পাচ্ছেন। কিন্তু সত্যই তাঁরা এ প্রশংসা পাবার অধিকারী কি না তা নির্দ্ধারণ করবার সময় এসেচে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই সব বিবাহ স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে স্থায়ী শান্তির সৃষ্টি করতে পারে নি এ আমি দেখেছি। দুঃখের সঙ্গে একথা বলতে হচ্ছে যে আমাদের অভিনেত্রীদের জীবন এদেশে একটা বিশেষ আবহাওয়ায় গড়ে ওঠে। সামাজিকতার প্রত্যন্তসীমায় পাদচারণ করে আমাদের জীবন ও দৃষ্টিভঙ্গী হয়ে ওঠে একমুখী। বধু-জীবন যাপনের সম্পদ হারিয়ে পর্দ্দার অভিনয়ের ধারাবাহিকতা চলে তথাকথিত বিবাহিত জীবনে। ব্যতিক্রম থাকতে পারে, কিন্তু তাতে করে কিছু প্রমাণ হয় না। তাছাড়া এদেশের পুরুষের মধ্যে অভিনেত্রী বিবাহের যে উৎসাহ আজ দেখা যাচ্ছে তার পেছনে সমাজ সংস্কারের তাগিদ নেই, আছে বঞ্চনা। চিন্তাহীনতা ও ভাসাভাসা ভাবে সব কিছু দেখা এদের রেওয়াজ হয়ে পড়েছে। এই সব পুরুষের উৎসাহের হয়তো অভাব নেই, সেই উৎসাহকে প্রশ্রয় দেবার মত অভিনেত্রীর সন্ধানও এঁরা পাবেন। কিন্তু এ্যাডভেঞ্চারের মোহ কাটলে দু'দিন পরে অনুতপ্ত হতেও সময় লাগে না।

সম্পাদক মহাশয়, পত্র দীর্ঘ হয়ে পড়েছে। অনেক কিছু বলা যেতে পারতো। আমার অনুরোধ, এ সম্বন্ধে যাতে সত্যকারের আলোচনা হয় আপনি তার ব্যবস্থা করবেন। আমি ছদ্মনামেই আলোচনা করলুম। কারণ আমাদের পক্ষে স্বনামে লেখার বিপদ কতখানি তা আপনি বিশেষ ভাবেই জানেন। নমস্কার গ্রহণ করবেন। ইতি—

"ছায়াচিত্রাভিনেত্রী"

[পত্রলেখিকা চিত্রজগতের সুপরিচিতা। তাঁহার পত্রের ব্যক্তিগত অংশগুলি বাদ দেওয়া হইয়াছে। এ সম্বন্ধে আমাদের পাঠকপাঠিকাগণের বক্তব্য যদি কিছু থাকে আমরা তাহা প্রকাশ করিতে পারি। আলোচনা সংক্ষিপ্ত ও ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ বর্জ্জিত হওয়া উচিত—দীঃ সঃ]

বলায় অনেকেরই কৌতুকের রসদ যোগাইয়াছিলাম।

সংবাদপত্রসেবী কংগ্রেস সেবক, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ এবং বন্ধুজনপ্রিয় প্রফুল্লকুমারকে হারাইয়া আমরা রবি-বাসরের সদস্য মাত্রেই স্বজন-বিয়োগ ব্যথা অনুভব করিতেছি। আমাদের মনে হয় এই বুঝি বর্ম্মা চুরুট হস্তে প্রফুল্লকুমার আসিয়া উপস্থিত হইবেন।

আমরা তাঁহার উদ্দেশ্যে আজ আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রীতি জ্ঞাপন করিতেছি। তিনি সাধনোচিত ধামে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার আত্মার কল্যাণ করুন বিধাতার নিকট এই আমাদের একমাত্র নিবেদন। রবি-বাসরের পক্ষ হইতে আমরা কি ভাবে তাঁহার স্মৃতি রক্ষা করিতে পারি আমাদের সেদিক দিয়াও বিচার করিতে হইবে।

তাঁহার সম্বন্ধে অনেকেই অনেক কথা জানেন, আমিও সংক্ষেপে দুই একটি কথা বলিলাম। আমাদের অজাতশত্রু হাস্যময় প্রফুল্লকুমার হৃদয়মধ্যে যে প্রীতির ছবি আঁকিয়া গিয়াছেন তাহা আমাদের জীবনান্তকাল পর্য্যন্ত অম্লান রহিয়া থাকিবে।

কালীদাসের নারী চরিত্র

—শ্রীবাণী গুপ্তা এম, এ, বি, টি

উমার বিবাহ

উমার সুদুঃসহ তপস্যা শেষ হয়েছে। মঞ্জুভাষিণী উমা আজ 'অপর্ণা' অর্থাৎ তপস্যা কালে পর্ণ পর্যন্ত পরিত্যাগকারিণী এই গৌরবময়ী আখ্যায় ভূষিতা। বহু-তপস্যা-লব্ধ চন্দ্রশেখর উমার পাণি প্রার্থনা করে নগরাজ হিমালয়ের কাছে জ্যোতির্ময় সপ্তর্ষিকে প্রেরণ করেছেন। সপ্তর্ষিবৃন্দ দেবাদিদেবের জন্য হিমালয়ের কাছে তাঁর কন্যাকে প্রার্থনা করলেন। ত্রিলোকবন্দ্য চন্দ্রশেখরের এই প্রার্থনায় হিমালয় ও তদীয় পত্নী আপনাদের কৃতার্থ জ্ঞান করে সম্মতি জ্ঞাপন করলেন। শুভ পরিণয় দিন স্থির হ'ল। সপ্তর্ষি বিদায় নিলেন।

উমার বিবাহের আয়োজন সুরু হল। উমা পিতামাতার আদরিণী কন্যা। তাঁর পরিণয়ের উৎসবে হিমালয়ের সঞ্চিত অমূল্য রত্নভাণ্ডার উন্মুক্ত হল। রাজপথে পথে পুষ্পসম্ভার আস্তীর্ণ হল। সুদৃশ্য বিজয়পতাকায় নগর তোরণ হল সুশোভিত। উমা কেবলমাত্র তাঁর পিতামাতার প্রিয়তমা কন্যা নহেন, পুরবাসিনীরা সকলেই উমার স্বভাব-মাধুর্যে মুগ্ধা; সেই উমার বিবাহ প্রত্যাসন্ন। হিমালয়ের প্রতিগৃহে সেই বিবাহের মাঙ্গলিক দ্রব্য সম্পাদনে পড়েছে আনন্দের সাড়া। আলিম্পন, মঙ্গলঘট, বরাসন প্রভৃতি নির্মাণে তাঁরা আপন চারু অঙ্গুলীর পরিচয় দিতে ব্যগ্র।

অবশেষে বিবাহের দিন এলো। বিবাহের পূর্বে উমার গাত্রহরিদ্রা। স্বামী পুত্র সৌভাগ্যশালিনী রমণীরাই এই আনন্দময় শুভকার্য সম্পাদনের অধিকারিণী। শুভলগ্নে তাঁরা উমার গাত্রহরিদ্রার আয়োজন করলেন। স্নানের পূর্বে উমা কৌশেয় বসন পরিধান করলেন। শ্বেতসর্ষপ ও নবীন দূর্বাঙ্কুরে গ্রথিত চারু মাঙ্গলিকে তাঁর সিঁথি হল সজ্জিত। নানা মণিমুক্তা খচিত স্নানাগারে স্বর্ণবেদীতে উপবিষ্টা উমাকে পুরবাসিনীরা হেমকুম্ভের পবিত্র বারিবর্ষণে স্নান করালেন। মঙ্গল স্নানের পর বিবাহের উপযোগী মনোহর শাড়ী ও কাঁচুলীতে পার্বতীর দেহ শোভন হয়ে উঠল। তারপর উমার প্রসাধন। ধূপের ধোঁয়ায় তাঁর দেহের আর্দ্রতা শুষ্ক হল; পরে শ্বেত অগুরু-পঙ্ক মিশ্রিত গোরোচনায় অঙ্কিত শিল্পনিপুণ পত্রলেখায় তাঁর সুকোমল দেহ অপরূপ শ্রী লাভ করল। দীর্ঘ ঘনকৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশদাম হরিৎ দূর্বাদল ও কুসুমে হল খচিত। লোধ্রপরাগে শুভ্র কপোলে অঙ্কিত হল মাঙ্গলিক পত্রলেখা। কর্ণে নব যবাঙ্কুরের শোভন সুন্দর ভূষণ। মধু, কুঙ্কুম ও মোমে রচিত প্রলেপে সূক্ষ্ম বঙ্কিম ওষ্ঠাধর হল রক্তিম। প্রসাধননিপুণা প্রিয় সখীর সাহায্যে চরণ-কমলে ফুটল অলক্তক রেখা। নীলোৎপল আঁখিযুগল ঘনকৃষ্ণ অঞ্জনে হল প্রসারিত। নানা অলঙ্কার ও পুষ্পমাল্যে শোভান্বিত হল তাঁর কমনীয় দেহ। উমাজননী মেনকা তর্জনীর দ্বারা মাঙ্গলিক তিলক কন্যার ললাটে অঙ্কিত করলেন, কন্যার হস্তে মঙ্গল সূত্র বন্ধন করলেন। উমার বিবাহের মাঙ্গলিক কার্য সুসম্পন্ন হ'ল। কুলদেবতা ও বন্দনীয় গুরুজনদের চরণবন্দনার পর বধূ-বেশিনী উমা নবদর্পণসহ বিবাহের আসনে নতমুখে উপবেশন করলেন।

অপরদিকে কৈলাসপর্বতে মাতৃকামণ্ডলী বিশ্বনাথের বিবাহ-সজ্জা ও মাঙ্গলিক দ্রব্য সজ্জিত করে আনলেন। দেবাদিদেব আপন বিষধর সর্পভূষণকেই স্বর্ণমণিময় অলঙ্কার ও শিরোভূষণ চন্দ্রকেই ললাটতিলক রূপে পরিবর্তিত করে বিবাহযোগ্য বেশভূষা সমাধান করলেন। পরিধেয় গজাজিন সুপবিত্র ক্ষৌম বসনে পরিণত হল। শুভ-যাত্রার সময় উপস্থিত—চন্দ্রশেখর তাঁর প্রিয় বৃষভরাজের পৃষ্ঠে আরোহণ করে যাত্রা করলেন। ত্রিলোকবাসী দেব, ঋষি, প্রমথ-গণ, হেমকান্তি সপ্তমাতৃকা, ঘোরকৃষ্ণবর্ণা মহাকালী আপন আপন পুষ্পকাদি রথে তাঁর অনুগমন করলেন। ত্রিজগৎবাসীকে বিস্মিত ও চকিত করে সেই অপরূপ বিবাহ-যাত্রা ক্রমে হিমালয় ভবনে উপস্থিত হ'ল। বিবাহের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে সকলে সমবেত হলেন। বরাসনে উপবিষ্ট শঙ্করের সম্মুখে হিমালয় নিবেদন করলেন পবিত্র বারি, অর্ঘ্য, রত্ন, মধুপর্কীয় মাঙ্গলিক দ্রব্য ও ক্ষৌমবস্ত্র। সুপবিত্র মন্ত্রোচ্চারণের পর চন্দ্রশেখর তাদের গ্রহণ করলেন।

অবশেষে কন্যা সম্প্রদানের শুভক্ষণ সমাগত হল। উমার নবকিশলয় তুল্য কোমল করপল্লব নগপতি হিমালয় অষ্টমূর্তি মহাদেবের হাতে সমর্পণ করলেন। নব-দম্পতি সুপবিত্র অগ্নি প্রদক্ষিণ করার পর হিমালয়ের কুলপুরোহিতের নির্দেশে বধূ উমা অগ্নিতে লাজ-অঞ্জলী প্রদান করলেন এবং সেই বিবাহ যজ্ঞাগ্নির আচার ধূমে উমার কোমল আনন ঈষৎ ম্লান হয়ে উঠল।

বধূ উমা ত্রিলোকবাসীর উপস্থিতিতে শিবের সর্বধর্মচারিণী 'শিবানী' আখ্যায় ভূষিতা হলেন। প্রিয়দর্শন ও শাশ্বত স্বামী শঙ্কর উমাকে লক্ষ্য করে বল্লেন "আকাশের ঐ ধ্রুব নক্ষত্র দর্শন কর।"

নবপরিণয় লজ্জাভূষিতা গৌরী নত আনন ঈষৎ উন্নমিত করে মৃদুস্বরে বল্লেন—"দেখেছি।"

বিবাহ সুসম্পন্ন হল। পদ্মালয়া লক্ষ্মী নবদম্পতির মস্তকে ছত্র ধারণ করলেন। বাগেদবী সংস্কৃত ও প্রাকৃতে স্তোত্র রচনা করে তাঁদের সম্মাননা জানালেন।

শিবের প্রসন্ন নয়নের অমৃত বর্ষণে পঞ্চশর জীবন লাভ করলেন। উমা মহেশ্বর মিলন সুসম্পন্ন হ'ল। জীবনের প্রারম্ভে রূপ ও সৌন্দর্যের সাধনায় যাঁকে জয় করতে গিয়ে উমা উপেক্ষিতা হয়েছিলেন—বিলাসী কন্দর্প রুদ্র বহ্নিতে ভস্মে পরিণত হয়েছিল, আপন অন্তর-মাধুর্যে অপূর্ব শুচি তাপসী মূর্তিতে তাঁকে তিনি লাভ করেছেন। পঞ্চশর-বিজয়িনী উমার বিবাহে তাই কন্দর্পের জীবন লাভ।

কমরেড লেনিন

—শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর
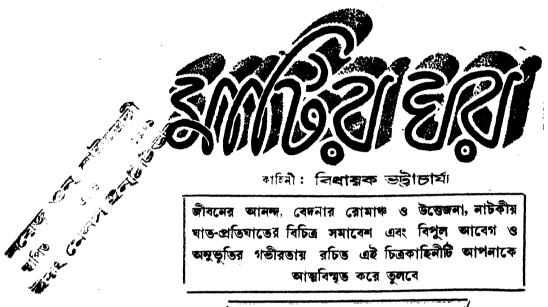
(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ছোট শহরটীর বুকে ছোট একটি ইস্কুল।

রাশিয়ান ইস্কুল।

ক্লাশে গমগম করছে মাষ্টার মশাইয়ের স্বর, ছাত্রের দল বসে আছে চুপ করে, এমন সময় বাইরে থেকে একটি স্লিপ এলো। মাষ্টার মশাই পড়লেন—ভ্লাডিমির ইলিচ উলিয়ানভ, বাইরে ডাকছে।

ছাত্রদের একজন বাইরে বেরিয়ে এল।

বাইরে একটি মেয়ে অপেক্ষা করছিল, বললে—তোমারই নাম ভলোডিয়া? তোমার একখানি চিঠি আছে...

ইস্কুলের ক্লাশের মাঝে, এমন সময় কে তাকে চিঠি লিখবে! উৎসুক মনে ভলোডিয়া তখনই খাম খুলে চিঠিখানি পড়তে সুরু করলে।

চিঠি পড়তে পড়তে ভলোডিয়ার মুখ কালো হয়ে উঠলো, থর থর করে হাত কাঁপতে লাগলো। মেয়েটী তা লক্ষ্য করলো, মৃদু কণ্ঠে বললে—সাহসী হও। ধীরভাবে যে আঘাত সইতে পারে সেই সত্যিকারের বীর।

ভলোডিয়া বারেক মেয়েটীর মুখের পানে তাকালো, দৃষ্টি কঠিন হয়ে এলো, কি যেন ভেবে নিল, তারপর দৃঢ় স্বরে বললে—আচ্ছা, মাকে বলব।

তারপর চিঠিখানা পকেটে ভরে ক্লাসে গিয়ে ঢুকলো।

যতক্ষণ ক্লাশ চললো ছেলেটীর চোখে মুখে কোন চাঞ্চল্য প্রকাশ পেলে না। ইস্কুল ভাঙলে বাড়ী ফিরে মাকে ডাকলো, বললে—মা জান? শশাকে পুলিশ ধরেছে!

মা জিজ্ঞেস করলেন, এণা?

—এনাকেও।

মার মুখ কালো হয়ে উঠলো, উঃ—বলে অসহ্য বেদনায় তিনি দু'হাতে বুক চেপে ধরলেন।

কিন্তু মুহ্যমান হয়ে বসে থাকার মত অবসর নেই। সম্রাটের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার অপরাধে ছেলে মেয়ে ধরা পড়েছে, তাড়াতাড়ি কোন প্রতিবিধান না করলে কি দুর্যোগ যে ঘনিয়ে আসবে কিছুই বলা যায় না। ছেলেমেয়ের অমঙ্গল আশঙ্কায় মায়ের বুক দুর দুর করে ওঠে, তখনই মন ঠিক করে ফেললেন, বললেন—আমি যাব পিটার্সবার্গে।

পিতা মারা গেছেন, এখন কিছু করতে হলে মাকেই করতে হবে — মা রাজধানীতে চলে গেলেন! ভ্লাডিমির চুপ করে এসে বসলো ঘরের মধ্যে, বড় ভাই বোনের মুখদুখানি ভেসে উঠলো তার চোখের সামনে, দাদার কথাগুলো তার কানে বেজে উঠলো: মর্ম্মভেদী দারিদ্র্যের মাঝে মানুষগুলো ক্ষেপে উঠছে. কখন যে কি হয় কিছুই বলা যায় না।...

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলার শব্দে চমকে উঠলো ভলোডিয়া, সামনে দাঁড়িয়ে আছে ছোট মেরিয়া আর মিটিয়া, ছোট ভাইবোনদুটির চোখে জল। তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে বললে—আয় সবাই মিলে খানিক খেলা যাক—

ভাইবোন দুটিকে তখনকার মত সে ভুলিয়ে দিলে বটে, কিন্তু সে নিজে কিছুতেই নিশ্চিন্ত হতে পারলো না। কিছু খেতে পারলো না, সারারাত চোখে তন্দ্রা এলো না এতটুকু। ঝড় বইতে লাগলো মনে।

রাত্রির অন্ধকার ধীরে ধীরে প্রভাতী আলোয় উচ্ছসিত হয়ে উঠলো।

মা একদিন ফিরে এলেন। চোখের কোনে কালি পড়েছে, মুখের রেখায় রেখায় পুঞ্জীভূত হয়েছে ক্লান্তি।

ভলোডিয়ার বুক দুর দুর করে উঠলো, উৎসুক চোখে মায়ের মুখের পানে তাকাতেই তিনি বললেন—শশা নেই, তার ফাঁসী হয়ে গেছে।

চমকে ভলোডিয়া দু'পা পিছিয়ে এলো, কথাটা ভালো করে যেন সে বুঝতে পারলো না, আপন মনেই সে আরেকবার পুণরাবৃত্তি করলো—শশা নেই! ওঃ!

তখনও ভাই বোন দুটি ঘুম থেকে ওঠে নি, মায়ের পাশে ভলোডিয়া এসে দাঁড়ালো ভল্গার ধারে। দুজনেরই মন চলে গেছে অনেক দূরে, আকাশ যেখানে মাটিকে ছুঁয়েছে, তার সীমা ছাড়িয়ে দৃষ্টিকে পৌছে দেবার জন্য অনিমেষ চোখে তাকিয়ে আছে। যেন দেখতে পাচ্ছে দিগ্বলয়ের ওধারে সেন্ট পিটার্সবার্গ সহরের কারাগার, তার বিরাট কঠিন পাষাণ প্রাচীরের আড়ালে ফাঁসীর দড়ি শশার গলায় চেপে বসছে! ভলোডিয়ার সারা দেহ থর থর করে কেঁপে উঠলো। মায়ের মুখের পানে তাকালো, : চোখের জল চিবুক বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা গড়িয়ে পড়ছে মাটিতে।

ভলোডিয়ার চোখে কিন্তু জল এলো না। মনে ধূমায়িত হচ্ছিল বিদ্বেষের বহ্নি। শশা তো তারই মত মানুষ ছিল, দুজনে একসঙ্গে পড়েছে, খেলেছে, বেড়িয়েছে আর এই ক'মাস সহরে পড়তে গিয়ে সে এমন কি অমানুষ হ'য়ে পড়লো, এতো কি অন্যায় করে ফেললো যে এই পৃথিবীতে তার স্থান হোল না, জারের আইন এই ধরণীর বুক থেকে তার সব প্রয়োজন শেষ করে দিল। যারা খেতে পায় না তাদের খেতে চাওয়া কি অপরাধ? প্রজার কাজ কি শুধুই রাজাকে সেলামী দেওয়া? খাজনা আদায় করলেই কি জমিদারের কর্ত্তব্য শেষ হয়ে গেল? প্রজার অন্নবস্ত্রের সংস্থান করাও কি রাজ-নীতি নয়? নানা প্রশ্ন ভীড় করে আসে ভলোডিয়ার মনে, এই সব প্রশ্নের শেষ সমাধান করা যায় কি না সে ভাবে।

কোন এক সময় প্রশ্ন করলো—মা, এনার কথা তো কিছু বললে না?

এনাকেও তারা ফাঁসী দিতে চেয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত আমি লড়েছি বলে পারেনি। এনার নির্বাসন হবে।

ভলোডিয়া আর কিছু জিজ্ঞাসা করে না, বললোও না কিছু, চুপ করে শুধু তাকিয়ে রইল উষার প্রথম অরুণালোকের পানে। (ক্রমশঃ)

প্রত্যাখ্যান

(উপন্যাস)

শ্রীসুধাংশু কুমার হালদার, আই, সি, এস্

(৪)

গ্রামের নাম পলাশবনী, সাঁওতাল পরগণার কোন এক ছোট্ট সহর থেকে মাইল চারেকের মধ্যেই। সহরটার নাম অজানাই থাক, নইলে হয়ত বাংলাদেশের অজীর্ণ রোগীরা দল বেঁধে সেখানে ছুটবেন। কাঠচালানির ব্যবসা ফেঁদে অসীম এসে বাসা বেঁধেছে পলাশবনীতে। দিনকতক ধরে সে কলকাতা থেকে পালাই-পালাই ডাক ছাড়ছিল। সুযোগ এবং সুবিধাও জুটে গেল। তার মামার এক মক্কেলকে ধরে হাজার পাঁচেক টাকার একটা কনট্রাক্ট আদায় করে চলে এল এই বিজন বনবাসে। সে শুনেছিল যত রকমের ব্যবসা আছে এটাই হল তাদের মধ্যে সব থেকে সোজা, আর লোকসানের ভয়ও সব থেকে কম। পচে যাবার, ভেঙ্গে যাবার, ডুবে যাবার ভয় নেই, ভাঙ্গা চোরারও ভয় নেই। যথেষ্ট পরিশ্রম করলে মুনাফার অঙ্কটা মোটাই হয়। ইতিমধ্যেই অসীমের আর্থিক অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে, তাকে স্বচ্ছল বলাই চলে। সাফল্যের সঙ্গে সে একটা কনট্রাক্ট সুসম্পন্ন ক'রে আরো পাঁচ সাতটা জোগাড় করতে পেরেছে।

ছোট্ট একটা পাহাড়ে নদী প্রচুর বালি আর কাঁকরের কন্টকশয্যার ক্ষীণ একটি পাশ দিয়ে ঝির ঝিরিয়ে ব'য়ে যায়, তারি উচ্চতটে উলুখড়ে ছাওয়া বাংলোয় অসীম বাসা বেঁধেছে। সংলগ্ন প্রান্তরে স্তূপাকারে রাখা কাটের গুঁড়ি। তিনজন প্রৌঢ় বাঙালী কর্ম্মচারী নাকের ডগায় চশমা পরে কাঠের হিসেব খাতায় টুকে রাখে, খড়ি দিয়ে নম্বর দেয়, গোরুর গাড়ী, মহিষের গাড়ীতে করে কাঠ চালান দেয়। চটের মতো পুরু খাকীর আধাপাৎলুন, প্রায় ইঞ্চিখানেক মোটা শুকতালায় লোহার পেরেক বসানো জুতো আর মস্তবড় সোলার টুপি পরে অসীম জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়। দিনের শেষে বাড়ী ফিরলে তেওয়ারী তাকে চা দেয়; চা খেয়ে মোটা নিরেট বাঁশের লাঠি হাতে ক'রে আবার সে বেরিয়ে পড়ে নদীর কুলে কুলে। বেশ লাগে তার সহর থেকে দূরে এই নিরালায় শান্তিময় দিনগুলি।

অদূরে সারি সারি সাঁওতাল বস্তী। একটি করে ঘর, তাতে না আছে জানালার বাহুল্য, না আছে একটির বেশী দরোজা। সাঁওতাল গৃহ তো বাসের জন্যে নয়, জিনিষপত্র রাখবার জন্যেই প্রধানতঃ। বসবাস চলে বাইরের উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে। আর জিনিষ পত্রও খুব! চাল থেকে পাকানো ঘাসের দড়ির শিকেয় ঝুলছে কতকগুলা মাটির হাঁড়ি। তার মধ্যে মেলে শুধু কতককুগুলা শুকনা পাতা আর শিকড়, কতকগুলা সাদা সাদা বাখরের গুলি, যা দিয়ে ভাত গাঁজিয়ে পচাই তৈরী হয়। একপাশে হেঁসেল। সেখানে সাঁওতাল-গিন্নী রেঁধে রাখেন বুক্‌ড়ি চালের ভাত, আর বুনো চুবড়ি আলুসিদ্ধ। সঞ্চয়ের মধ্যে কতকগুলা পাকা পাকা ভুট্টা, কতকগুলা কাঁকনী বা ঐ জাতীয় বুনো ফসল, কিছু বুক্‌ড়ি চাল। বস্ত্রের বালাই নেই, অলঙ্কারের বালাই নেই। টাকা পয়সা সমস্ত ঘরখানা খুঁজলে দু' একটা মেলে কিনা সন্দেহ। শয়ন হয় বাইরের খোলা হাওয়ার প্রাঙ্গনে, ঘাস পাতার বিছানায়। চালের বাতা থেকে ঝোলে তীর ধনুক, দু' একটা মাদল, দু একটা বাঁশের বাঁশী। বস্তীর মাঝখানে মহানীমগাছের গোড়াটি বেশ তকতকে করে নিকানো। সেখানেই প্রতি সন্ধ্যায় মজলিস বসে। বস্তীর চারিধারে স্থানে স্থানে উঁচু উঁচু বাঁশ পোঁতা, তাতে নানাবিধ রঙীন কাপড়ের টুকরো জড়ানো। এসব হ'ল তুক্‌তাক্। এই দিয়ে ভূত প্রেতদের দৌরাত্ম্য থেকে গ্রামখানিকে রক্ষা করা হয়।

ভূতপ্রেতও অসংখ্য,—যেমন বিচিত্র তাঁদের নাম, তেমনি বিচিত্র তাঁদের কার্য্যাবলী। ঠিক দুপুর বেলা যে-উপদেবতাটি সুযোগ পেলেই বৃক্ষারোহী মানুষকে ঠেলে ফেলে দেন, তাঁর নাম জিলুয়া। যে-মহুয়া গাছে মৌমাছিরা চাক বাঁধে, সেটিই হ'ল জিলুয়ার আশ্রয়, এ বিষয়ে সাঁওতাল মনে মতদ্বৈধ নেই। যে সাঁওতাল স্বভাবতই দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন, কিম্বা পাচুই সেবন ক'রে যাঁর দিব্যদৃষ্টিলাভ হয়েছে এমন অনেক সাঁওতালই সভয়ে দেখেছেন চিমটের আকারের দুই বৃক্ষশাখায় দুই পা রেখে বিকটদর্শন জিলুয়া নৃত্যতৎপর। আর এক শ্রেণীর উপদেবতা আছেন, তাঁদের সাধারণ নাম ফলুই। এঁরা বেজায় মারাত্মক। যার ওপর এঁদের কৃপা হয়, মৃত্যু তার অবশ্যম্ভাবী। মানে, ত্রিভুবনে যারাই মরে, সবাই ফলুইএর কৃপাতেই মরে। তাই অসুখ করলেই ফলুই ভূতের পূজা দেওয়া চাই। মুরগী এবং শুয়োর এঁদের ভারি প্রিয়। এবং অন্য সব রকমের রান্নার চেয়ে পুড়িয়ে খাওয়াই এঁরা পছন্দ করেন বেশী। এসব পূজা উপচার যথেষ্ট খাওয়া স্বত্বেত্ত যদি এঁদের রাগ না কমল, তখন নিশ্চয়ই বুঝতে হ'বে কোনো ডাইনী বুড়ীর কারসাজি আছে এর মধ্যে। শোনা গেছে ডাইনী ব'লে সন্দেহ হওয়ায় অনেক সাঁওতাল বৃদ্ধার প্রাণ গেছে। তবে আজকাল পিনালকোড্‌শাসিত বৃটিশ রাজত্বে এরকম ঘটনা খুবই বিরল।

সব উপদেবতাই যে উপদ্রব করেন তা নয়। দু'একটি ভালও আছেন, তবে তাঁরা সংখ্যায় কম। ইহলোকেও যেমন, পরলোকেও তেমনি, দুষ্টের সংখ্যাই বেশী, শিষ্টের সংখ্যা কম। এই মুষ্টিমেয় শান্তশিষ্ট ভূতগুলি কেউ দয়া করে বনের বাঘ মেরে দেন, কেউ বা আক্রমণোদ্যত ভালুকের গায়ে জ্বর পাঠিয়ে আক্রান্তের প্রাণ বাঁচান। ভালুকের হাতে পড়াও যা, সাক্ষাৎ ফলুইএর হাতে পড়াও তাই, যদি না দৈবাৎ ভালুকের জ্বর আসে। মনে করো চরুং মাঝিকে ভালুকে তাড়া করেছে। মুখনাক থেকে থুতু বৃষ্টি করতে করতে ভালুক তার পিছু পিছু ছুটেছে, এই এক্ষুনি তাকে চিরে ফেল্লে বুঝি নখ দিয়ে! হঠাৎ এই উত্তেজনার ফলে ভালুকের জ্বর এসে গেল। জ্বর এলেই সে থরহরি কাঁপতে থাকবে, এবং সেই যা পলায়নের সুযোগ। দুর্ভাগ্যক্রমে ভালুকজ্বর আবার অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী।

অসীম ভাবছিল আজকের সুসভ্য মানুষ কতই না হাসবে এই জংলী মানুষদের কুসংস্কারের কাহিনী শুনে! কিন্তু হাঁচি টিকটিকি যাঁরা মানেন, অগস্ত্য যাত্রা, বারবেলা, কালবেলা, অশ্লেষা আর মঘা যাঁরা মানেন, তাঁরা কি সুসভ্য নন?

কী মায়া আছে এই শাল সেগুন মহুয়া পলাশের রাজ্যে! অসীমের দিনগুলি যেন স্বপ্নের মতো কেটে যাচ্ছে। পিয়াল গাছের অমসৃণ বাঁকা বাঁকা ডালপালার ফাঁক দিয়ে চাঁদ উঠে আসে, রঞ্জন তার ঋজুদেহ নিয়ে থাকে দাঁড়িয়ে, তৃণশূন্য পরিচ্ছন্ন অরণ্যতলে আলোছায়ার মাতন সুরু হয়। সেদিন পলাশফুলে যেন আগুনের ঢেউ খেলে চলেছে। বাংলাদেশের সমতল সুকোমল মাটি এ নয়, সমুদ্রের তরঙ্গের মতো দুলে দুলে ফুলে ফুলে উঠেছে, তারি থাকে থাকে ক্রমবিরল গাছপালা। মহুয়া ফুলের উগ্রমধুর সৌরভে যেন নেশা লাগে, বাতাস মন্থর হয়ে আছে তারি গন্ধে। দূরে দিক্‌-চক্রবালে অভ্রকণা আর সাদা পাথরের ধূলায় ধূসর রাজপথ তৃণলেশহীন বিরাট প্রান্তর ভেদ ক'রে সহরের দিকে চলে গেছে। আরো দূরে ঘননীল পাহাড় সারি দেখা যায়। মহিষের দল ঘাসের অভাবে বোধহয় পাথর কামড়ে খায়, সাঁওতাল ছেলে উঁচু বাঁধে-ঘেরা স্বল্পতোয়া জলাশয়ের ধারে বসে বাঁশী বাজায়।

সেদিন কি একটা সাঁওতাল পরবে কাজ বন্ধ ছিল। অসীম তার বারান্দায় ইজি চেয়ারে বসে সপ্তাহখানেকের পুরাতন সব খবরের কাগজ পড়ছিল। হিট্‌লার সুদেতেনল্যাণ্ড্ কেড়ে নিয়েছেন, চেকোশ্লোভাকিয়া চেয়ে বসেছেন, নেভিল চেম্বারলেন তাঁকে কোনক্রমেই থামাতে পারছেন না। জার্মানী যে আবার যুদ্ধে নামতে পারে একথা তাঁর বিশ্বাসই হচ্ছে না, গত যুদ্ধের ইতিহাস কি এরি মধ্যে সে ভুলে গেল? কে জানে কি হবে!... এমন সময় দেখল তার পরিচিত এক সাঁওতাল এক শূকর শাবক স্কন্ধে ক'রে বাড়ী চলেছে। অসীমের গল্প করবার ইচ্ছা হ'ল। তাকে ডেকে জিগেস করল, "কি রে, ব্যাপার কি?"

সাঁওতাল বললে, "ই-টা পাঠ্‌ঠা বটে। জামাইবাড়ী থেনে আন্‌লি।"

অসীম বললে, "বটে? তোর জামাইভাগ্য ভাল। তা এই বুঝি তোর পাঁঠা?"

"হঁ। লিবি তুই?" সাঁওতাল জিগেস করল।

"না, না, তুই কষ্ট করে ওটা কাঁধে চাপিয়ে ব'য়ে এনেছিস, তুইই নিয়ে যা"—অসীম তামাসা ক'রে বললে, "আমায় আর একদিন দিস্।" তারপর একটু থেমে জিগেস করলে, "তোর জামাইবাড়ী কোথায়?"

"বাঘডুংরি।"

"বাঘডুংরি? সে আবার কোথা? এখান থেকে কতদূর?"

দূরত্বের কথা কেমন ক'রে বোঝাবে সাঁওতাল? সে কি মাইল-ক্রোশের খবর রাখে? সে তার অনবদ্য ভাষায় বললে, "দূর লয়, কাছেই বটে। হাই ঝেখানে তুর প্যাটটি আছেক্ সেখানে হামার পলাশবনী আছে, আর ঝেখানে তুর পাটি আছেক্ সেথাকে বাঘডুংরি আছে বটে।"—অর্থাৎ অসীমের উদর এবং পদদ্বয় যেমন কাছাকাছি, পলাশবনী আর বাঘডুংরিও তেমনি কাছাকাছি।

সাঁওতাল চলে গেল। অসীম তার ভৌগোলিক জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে হাসতে লাগল।...পরের দিনে ভোরে একটা বিকট চীৎকারে অসীমের ঘুম ভেঙে গেল। বেরিয়ে এসে দেখে প্রকাণ্ড এক শূকরকে দড়ি বেঁধে টানতে টানতে সেই সাঁওতাল এসে হাজির।

একগাল হাসি হেসে বললে, "লেঃ, হেই তুর পাঠ্‌ঠাটি লেঃ।"

অসীম যতই তাকে বোঝাতে চেষ্টা করে এ হেন পাঁঠায় তার কোনই প্রয়োজন নেই, সে কেবল তামাসা করেছিল, সাঁওতাল ততই অবাক হয়। "পাঠ্‌ঠাটি লিয়ে তাম্‌সা"—এ কেমন ধারা তামাসা! "খাবি না যদি তো কেনে লিয়া আসতে বল্‌লি"—এই কথাই বারংবার আবৃত্তি করতে করতে সে চলে গেল।... (ক্রমশঃ)

বিজনদা'র চিঠি

আমার আদুরে ভাই-বোনেরা—

আজ আমাদের আসরে আবার ফিরে এসে দাঁড়িয়েছে আমাদের সেই এক ভাই শ্রীমান হিরণ্ময় ভট্টাচার্য্য (৭৬৪) এই বলে যে, তার অন্যায়কে ক্ষমা করে যেন তাকে আবার আমাদের আসরে স্থান দিই।...আজ আমার আনন্দের আর সীমা নেই। কেন জানতে চাও নিশ্চয়ই...কারণটা যদিও খুব সামান্য কিন্তু আনন্দটা অসামান্য। আনন্দ হবে না তো কি? কর্ত্তব্যের খাতিরে সেদিন প্রিয়জনকে তার অন্যায় কাজের জন্য তাড়াতে বাধ্য হয়েছিলুম বটে, কিন্তু সেদিন মনে যে দুঃখ পেয়েছিলাম আজকের সে আনন্দের চাপে তা সব মন থেকে মুছে গিয়েছে। আমার সেই দুষ্টু ভাই আজ ফিরে এসেছে, নিজের দোষ বুঝতে পেরে—সে আজ ক্ষমা চাইতে এসেছে।...আজ আর কোন প্রশ্ন মনে ওঠে না। মনে ওঠে না সেদিনকার দোষের পরিমাণটা। আজকে আমার কর্ত্তব্য হচ্ছে তাকে সানন্দে অভ্যর্থনা জানান, কারণ যে নিজের দোষ বুঝে দোষ স্বীকার করে ক্ষমা চায় সে মহৎ। তাই আজ আমাদের এই ভাইটিকে বলি: সবার মত তোমার অধিকার এ আসরে আবার হলো।

রাণু আর তার দাদা: ঐ ধারাবাহিক রচনাটি এবার গেল না। আসছে বারে ওটা যাবেই।

প্রতিযোগিতা: প্রতিযোগিতার সময় বাড়িয়ে দিলাম। আগামী ১৯শে পর্য্যন্ত সময় রইলো এতে যোগদান করবার। আসরের যে সব ভাই-বোন এতে যোগদান করো'নি তা'রা আর দেরী করোনা। স্নেহ নিও। আজ আসি, কেমন?

তোমাদের: বিজনদা

এর শেষ কোথায়.....

(আসরের ভাই-বোনেদের লেখা ধারাবাহিক বারোয়ারী উপন্যাস)

(১৬)

শ্রীছন্দা দেবী (১০৯৯)

আজ আমি ডাক্তার। জীবনের প্রথম থেকে একটা আদর্শ ছিল মনে—যে জীবনে যা কিছু যটুক মানুষের সেবার মাঝে নিজেকে বিলিয়ে দিতে হবে। বহু ঘাত-প্রতিঘাত এসেছে জীবনে আর তাদের মাঝে এগিয়ে চলেছি আদর্শের দিকে। ভেবে হয়ত ভুল পথই বেছে নিতে বসেছিলাম। কিন্তু জগতে ত' শুধু আঘাতই মেলে না—মেলে অনাবিল ভালবাসার পরশ, মেলে স্নেহ আর অনুরাগের বহু উপকরণ। তারা ভুল দেয় ভেঙ্গে, তারা কেবল প্রাণ দিয়ে ভালবাসে আর অন্তরে অন্তরে মঙ্গল কামনা করেই ক্ষান্ত হয় না, প্রয়োজন হলে স্নেহের শাসনও মেলে তাদের কাছ থেকে। তারা দেখিয়ে দেয় পথ—তাদের সেদিনের উপদেশ আদেশেরই রূপ গ্রহণ করে। সেই আদেশ, সেই স্নেহের দান, সেই আন্তরিকতায় ভরা অনুরোধ জীবনের সমস্ত জটিলতা দূর করে আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসে সহজ সরল জীবন পথে। মনের কুয়াশা কেটে যায়, আবার জ্বলে ওঠে আলো, খুঁজে পায় পথের সন্ধান। আজ অতীত জীবনের সমস্ত ঘটনা ভেসে ওঠে বীরুর চোখের সামনে—ওঁদেরই অনুপ্রেরণায় ওর জীবন হয়েছে সার্থক।

সবার আগে মনে পড়ে মায়ের কথা। বড় আশা নিয়ে মানুষ করে গড়ে তুলেছিল আমায়—মাঝপথে ফেলে বিদায় নিলে তুমি—দুঃখে সেদিন সত্যি নিজেকে ভুলে গিয়েছিলাম—ভুলে গিয়েছিলাম তোমার আপ্রাণ বাসনার কথা, তাই ভুল পথকেই আঁকড়ে ধরতে চেয়েছিলাম—মিথ্যে গর্ব্বের মোহে তাকেই পাথেয় করে এগোতে গিয়েছিলাম, কিন্তু তুমি যে আমার মা, তোমার আশীর্ব্বাদ কি বিফল হয়! আজকে যেখানেই থাক না কেন তুমি নিশ্চয়ই আনন্দে দু'ফোঁটা চোখের জল ফেলবেই ফেলবে। বড় দুর্ভাগ্য আমার তোমার সেই আনন্দময়ী গরীয়সী মাতৃমূর্ত্তি দেখার সৌভাগ্য আমার হল না। তোমার আদর্শের পথকে যে, আমি সফলতার আসন দিতে চলেছি তাই মনে হয় আর যাই হই তোমার কুপুত্র আমি নই। আমি যে আজ সফল হয়েছি এর কৃতিত্ব কিন্তু আমার তরফ থেকে বেশী করতে পারি না, এর মূলে রয়েছে দাশুর মার স্নেহ—রাণুর শুভেচ্ছা আর কাকাবাবুর অসীম আগ্রহ। আর সবার ওপর অমন মায়ের আশীর্ব্বাদ যে পেয়েছে তার জীবন কি বিফল হয়! আচ্ছা তোমায় হারিয়ে আমি কি মা-হারা হয়েছি? না, বাংলা দেশে মায়ের অভাব হয় না। এ দেশের সব নারীই চায় মায়ের স্নেহ উজাড় করে বিলিয়ে দিতে। তোমাকে হারিয়ে মায়ের স্নেহ পেলাম দাশুর মায়ের কাছে। তারপর জীবনের পটে এসে দাঁড়ালেন কল্যাণী দেবী। তিনি যেন কল্যাণের প্রতিমূর্ত্তি। তিনি শুধু আমাকেই স্নেহ ভালবাসা দিয়ে ডুবিয়ে রাখতে চান না, তিনি সমগ্র দেশকে চান ভালবাসতে, দেশের সমস্ত দুঃখ দুর্দ্দশা যেন মুছে ফেলতে চান। তিনি কি বলেন জান? "বীরু তুই আমায় নিজের মা বলে মনে করিসনে।" সত্যি তখন কি মনে হয় জান মা? বুক চিরে দেখিয়ে দিই তোমার শূন্য আসন তিনি কেমন ভাবে পূরণ করে আছেন। আর তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা আপনি এসে পড়ে, কারণ তিনি আমার মত ছেলেকেই স্নেহের প্রলেপ দিয়ে সুস্থ করতে চান না—বাংলার ঘরে ঘরে কাঙ্গালী খুঁজে তাদের স্নেহ দিয়ে তাদেরকে মানুষ করে তুলতে চান। হ্যাঁ, আরও একটা কথা। আমি অসহায় কপর্দ্দকশূন্য হয়ে চেয়েছিলাম মুমূর্ষু জাতির সেবা করে তার ক্ষতস্থানকে সারিয়ে তুলব। এই আশায় নামলাম অবশ্য কাজে, প্রাণ দিয়ে করলাম মানুষের সেবা, কিন্তু কতটুকুই বা সফল হত আমার জীবনের ব্রত! ভগবানের আশীর্ব্বাদের মত জীবনে নেমে এলেন কল্যাণী দেবী—মা আমার। তিনি তাঁর শেষ কপর্দ্দক পর্য্যন্ত দিয়ে দিলেন আমার দেশের সেবায়। তাইত তোমার নির্দ্দিষ্ট পথকে এত সহজ করে নিতে পেরেছি—কাকাবাবুর আদর্শকে দিতে

পেয়েছি সফলতার আসন। ছোট্ট সেবা প্রতিষ্ঠান প্রায় বিরাট হাসপাতালে পরিণত হতে চলেছে। ছোট্ট স্কুলটার রূপ প্রায় বদলে গেছে। একদিন প্রদীপ ছিল যাকে আলোকিত করতে আজ সূর্য্যদেব স্বয়ং সে স্থান উদ্ভাসিত করে তুলেছে। রাণুর আহ্বানে এই গেঁয়ো মেয়েরাও নেমেছে দেশ সেবার কাজে—রাণু তাদের শিক্ষা দিয়ে উপযুক্ত করে তুলেছে। সেদিন মানুষ থাকত বেঁচে কিন্তু তার মধ্যে থাকত না প্রাণ। প্রাণ থাকত না বললে ভুল হয়, প্রাণ ছিল, কিন্তু নিতান্ত শুষ্ক অবস্থায়, হয়ত বা হয়েছিল ঝরে পড়বার জোগাড়। আর আজ?—আজ তাদের প্রাণে জেগেছে সাড়া, অনুভব করছে হৃদয়ের স্পন্দন, আজ তারা যেন নতুন মানুষ···

"বীরুদা···বীরুদা···ও বীরুদা···"

"কিরে?"

"বড় নয় ডাক্তার হয়ে পড়েছ তাই বলে দশবার না ডাকলে উত্তর দিতে নেই নাকি?"

—"নেইত? অহঙ্কার যাবে কোথায়? সেদিনের মেয়ে আবার কথার বহর দেখ না? বল কি দরকার?"

—"মুখ এখনও যে পোড়েনি তাই আমার সৌভাগ্য, নাও তোমার একখানা চিঠি এসেছে।"

—"কৈ দেখি", বলে বীরু রাণুর হাত থেকে চিঠিখানা নিয়ে পড়তে পড়তে তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল! সে বললে, "কে লিখেছে জানিস?—শ্যামশঙ্করবাবু, সেই কলেজের অধ্যক্ষ। শোন চিঠিটা···স্নেহের বীরু, তুমি চলে যাওয়ার পর মনে ভেবেছিলাম হয়ত তুমি ফিরে আসবে। সস্নেহে তোমায় বুকে জড়িয়ে ধরব। কিন্তু সে সৌভাগ্য আমার হয়নি। রাগের মাথায় বলেছিলাম বটে, দয়া করে আমার নিজের কাছে রেখেছি তোমায়—সব খরচ বহন করেছি, তুমি গরীবের ছেলে বলে কিন্তু তোমার কাছে তার এ প্রতিদান আমি আশা করিনি। তুমি আহত হলে, রাগ করে চলে গেলে। কিন্তু বুঝলে না যে আমাকে আঘাত দিলে কতটা? তোমায় দিয়ে আশা ছিল কলেজের গৌরব বাড়াব—স্বার্থও ছিল—কিন্তু তার থেকেও বেশী ছিল তোমার ওপর আমার স্নেহের পরিমাণটা। তোমাকে তাড়িয়ে দেবার পর সেটা আরও বুঝলাম মর্ম্মে মর্ম্মে। কাগজে দেখলাম তোমার দেশসেবার কর্ম্মতালিকা। তোমার সাধু প্রচেষ্টার জন্যে পাঁচ হাজার টাকা পাঠালাম। গ্রহণ করো। আর আজ তোমাকে আশীর্ব্বাদ করি, তোমার আদর্শ—তোমার ব্রত সফল হোক। একটা লোকের দুঃখ দূর করবার জন্যে নিজের জীবনকে বিপন্ন করেছিলে একদিন—আসন্ন পরীক্ষার কথা ভুলে গিয়েছিলে। আশ্রয় অনায়াসে ত্যাগ করে গেছ। তুমিই পারবে দেশের সেবা করতে। ভগবান তোমার সহায় হবেন।···"

"সত্যিই শ্যামশঙ্কর বাবু কি মহান, কি উদার" রাণু বলে।

"জানিস রাণু একদিন ভেবেছিলাম স্বার্থপরতার-কদর্য্যতায় পঙ্কিল ওদের জীবন। তখন বড় দুঃখ হয়েছিল—মনে হয়েছিল এই কি তার সত্য রূপ—এত বড় শিক্ষিত লোকের মনোবৃত্তি কি এতো নীচ হতে পারে?

"এই দেখ, তোমায় যে কথা বলবার জন্যে আমি এখানে এলাম সেই আসল কথাটাই বলা হল না।"

"কি করে আমাকে জব্দ করা যায় সেই কথা ভাবতে ভাবতেই তোর দিন কেটে যায়, তা মনের আর দোষ কি?"

"দাদাগিরি আর ফলিওনা, থাক। শোন—স্কুলের দিকে দুদিন গিয়ে একটু দেখাশুনা করে এসো—ওপাড়ার রুগীগুলোর ভার আমিই স্বচ্ছন্দে নিতে পারব। হাঁসপাতাল খুলতে কতদিন আর লাগবে, আমার দল তো প্রায় প্রস্তুত হয়ে রয়েছে—নার্সিং করবার প্রাথমিক শিক্ষা এরই মধ্যে তারা ভাল ভাবেই আয়ত্ব করে ফেলেছে।"

বীরু আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বলে: "তাই নাকি?"

তারপর কিছুক্ষণ সে থেমে আরম্ভ করে: মনে আছে রাণু, একদিন তুই বলেছিলি তোমার পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আমায় কাজ করবার অধিকার দাও। আমায় তোমার সব কাজের সহকর্ম্মী করে নাও। আমার যদি যোগ্যতা না থাকে সে অর্জন করে নেব। সেদিন আমি তার উত্তরে বলেছিলাম, যোগ্যতা আছে, কিন্তু প্রয়োজন নেই। আজকে আমার সে সংস্কার দূরে চলে গেছে। আজ মনে হচ্ছে সত্যিই তোর প্রয়োজন আছে অনেকখানি। তুই যদি আমার পাশে না দাঁড়িয়ে থেকে আমাকে উৎসাহিত না করতিস, আমাকে সাহস না দিতিস, আমায় সর্বভাবে সহায়তা না করতিস, তাহলে আজ আমি থাকতাম অনেক পেছিয়ে।"

খেলার মাঠে

শ্রীউমেশ মল্লিক বি, এ

মহাসমারোহে কলকাতায় গত ২রা মে থেকে ফুটবল লীগ আরম্ভ হয়েছে। প্রথম দিনের খেলায় গত বৎসরের লীগবিজয়ী মোহনবাগান দল এ বৎসরে লীগে নবাগত এন্টিলোপদিগকে ২—০ গোলে পরাজিত করে। সেন্টার ফরওয়ার্ড হিসাবে গত বৎসরের স্পোর্টিং ইউঃ-এর খেলোয়াড় বি, বোস যোগদান করেন। বলা বাহুল্য এ দিনের গোল ২টির জন্য তার কৃতিত্ব অবশ্য স্বীকার্য্য। তবে এ ক্ষেত্রে বলতে বাধ্য এই যে এ দিনে তিনিও অন্ততঃ কম পক্ষে তিনটি গোলের সুযোগের অপব্যবহার করেন। এ দিনে ডালহৌসী দল এরিয়ান্স দলকে ২—০ গোলে পরাজিত করে। সংবাদে প্রকাশ, ডালহৌসী দলে বিলাতের কয়েকজন খ্যাতনামা খেলোয়াড় যোগদান করেছে। ডালহৌসী মনে হয় ভবিষ্যতে তীব্র প্রতিযোগিতা করবে। ক্যালকাটা দল এ দিন স্পোর্টিং ইউঃকে প্রথম খেলাতেই পরাজিত করেছে। স্পোর্টিং ইউঃ-এর খেলা অতি নৈরাশ্যজনক হয়। এমন কয়েকজনকে দেখা গেল যাঁরা প্রথম বিভাগে খেলার যোগ্য নন।

৩রা মে কলকাতার মাত্র একটি খেলা ছিল—বি এণ্ড এ আর বনাম কালীঘাট। কালীঘাট ক্লাবের খেলোয়াড় সংগ্রহ দেখে তারা দুর্ব্বল মনে হয়েছিল, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে খেলায় তারা দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছে। খেলার শেষ সময়ের মাত্র তিন মিনিট পূর্ব্বে বি, করের ফ্ল্যাগ কিকে কালীঘাট দল ১—০ গোলে পরাজিত হয়েছে। এ গোলের জন্য গোলরক্ষককে বিশেষ দায়ী করা যায় না। নিধু মজুমদার তাঁকে ধাক্কা দেন, সেই মুহূর্ত্তে প্রবল বাতাসের গতির জন্য বলটি গোলমধ্যে প্রবিষ্ট হয়।

৪ঠা মে স্পোর্টিং ইউঃ দল এরিয়ান্স দলের বিরুদ্ধে অমীমাংসিত ভাবে খেলা শেষ করে।

এ দিন ইষ্টবেঙ্গল দল রেঞ্জার্স দলকে ১—০ গোলে পরাজিত করে। ইঃ বিঃ দলের এ দিনই প্রথম প্রতিযোগিতা। এস দেব রায় ইঃ বিঃ দলের পক্ষে খেললেও তার খেলা ভাল হয়নি। পাগ্‌সলি প্রয়োজনীয় গোলটি দেন। সুনীল ঘোষ পাগ্‌সলী এবং টি, করের খেলা উল্লেখযোগ্য হয়। ইঃ বিঃ দলের খেলা তাদের ষ্টাণ্ডার্ড অনুযায়ী হয়নি।

৫ই মে বি এণ্ড এ আর দল পুলিশকে ৪—০ গোলে পরাজিত করেছে। পুলিশ দলের খেলায় নিরাশ হতে হয়। তাদের মধ্যে অধিকাংশই তারুণ্যের সীমা অতিক্রম করেছে এবং খেলার গতির সঙ্গে অনেকেরই সমতা থাকে না। এ দিনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা বি, করের নিজস্ব তিনটি গোল দেওয়া।

৬ই মে শনিবার মোহনবাগান কালীঘাট দলকে ১—০ গোলে পরাজিত করেছে। লীগে মোহনবাগানের এই দ্বিতীয় দিনের খেলায় উপর্য্যুপরি দ্বিতীয় জয়লাভ। খেলার শেষার্দ্ধে মাত্র তিন মিনিট পূর্ব্বে বি, বোস জয়নির্দ্দেশ গোলটি দেন। মাঠের মধ্যভাগে মোহনবাগান বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিলেও "স্কোরিং"-এ তাদের অকৃতকার্য্যতা চিরকালই প্রকটিত হয়। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। কালীঘাটের কয়েকটি খেলোয়াড় বিশেষ উন্নতি দেখান।

স্পোঃ ইউঃ দলের বিরুদ্ধে ডালহৌসী ২—০ গোলে পরাজিত হয়েছে। এন, সেন ও এস, ভট্টাচার্য্য প্রয়োজনীয় গোল ২টি দেন। ডালহৌসীর লিঙ্ক অব্যর্থ গোলগুলির সুযোগ অপব্যয় না করলে বোধ হয় খেলার ফলাফল অন্যরূপ হত।

৮ই মে সোমবার রেঞ্জার্স দল এন্টিলোপের কাছে ২—১ গোলে পরাজিত হয়েছে।

এদিন ইঃ বিঃ দল পুলিশ দলকে ৪—১ গোলে পরাজিত করেছে। ইঃ বিঃ দলের পক্ষে সুনীল ঘোষ ২টি, এফ, সিং ১, স্বরাজ ঘোষ ১টি গোল দেন। স্বরাজ ঘোষ কয়েকটি গোলের সদ্ব্যবহার করতে পারেন নি। পুলিশ দলের কতকগুলি খেলোয়াড় পরিবর্ত্তন হওয়ায় দলটির খেলা উন্নত স্তরের হয়। উইদার্স, ফলস, টেম্পলটন তাঁদের সুনাম অনুযায়ী দলটিকে সাহায্য করেন।

এমন সময় কল্যাণী দেবী এসে ঘরে ঢুকলেন, বললেন—"কিরে ভাইবোনে মিলে ঝগড়া মারামারি করছিস নাকি?"

রাণু এমনি সময় বলে ওঠে—"দেখনা মা, আমার দলের মেয়েরা প্রায় নার্সিং শিখে ফেলল তাই আমার ওপর কি হিংসে! বোধ হয় ফন্দি আঁটছে কি করে ওটা বন্ধ করা যায়।"

বীরু উত্তর দেয়—"সত্যিই ত!" মা তখন দুজনকে বুকের মাঝে জড়িয়ে ধরে সস্নেহে বলেন—"যেমন দুষ্টু আমার ছেলেটা—তেমনি পাজি আমার এই মেয়েটা!...

(তারপর?)

নাটমণ্ডপ

এ সপ্তাহের আকর্ষণ

এ সপ্তাহে তিনখানি হিন্দী ছবি মুক্তিলাভ করিবে। প্রথমখানি হইল বহু বিজ্ঞাপিত ভাস্বানী আর্টের "সাহারা"। সিটী সিনেমা, শ্রী ও পার্ক শো হাউসে আগামী কল্য একসঙ্গে মুক্তিলাভ করিবে। ইহার বিভিন্ন অংশে অভিনয় করিয়াছেন রেণুকা দেবী, নারাং, প্রাণ, শারদা, শাহজাদী, রামলাল প্রভৃতি। সঙ্গীত পরিচালনায় গোবিন্দরাম বিশেষ কৃতিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন।

মিনার্ভা মুভীটোনের "ভক্ত রায়দাস" শনিবার মিনার্ভা সিনেমায় মুক্তিলাভ করিবে। রায়দাস ছিলেন জাতিতে মুচি। মানুষের সমতা দাবী করিয়া তিনি যে সত্যের পতাকা তুলিয়া ধরিয়াছিলেন তাহার জন্য তাঁহাকে বহু লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইয়াছিল। ইনিই বাংলায় রোহিদাস নামে খ্যাত। নাম ভূমিকায় পরেশ ব্যানার্জ্জী, এবং অন্যান্য ভূমিকায় ললিতা পাওয়ার, অনন্ত মারাঠে, শীলা অভিনয় করিয়াছেন। শ্রীমতী সরস্বতী দেবী সঙ্গীত পরিচালনা করিয়াছেন।

নিউ থিয়েটার্সের "ওয়াপস্" চিত্রা, রূপালী ও নিউ সিনেমায় ৭ম সপ্তাহে পড়িল। অসিতবরণ ও ভারতীর অনবদ্য অভিনয় ও সঙ্গীত চিত্রপ্রিয়দের চিত্ত জয় করিয়াছে।

জ্যোতিতে রণজিৎ মুভীটোনের "বাঁশরী" এ সপ্তাহের অন্যতম উল্লেখযোগ্য আকর্ষণ। ইহাতে চার্লি, শামিম, ঈশ্বরলাল, উর্মিলা প্রভৃতি নামজাদা অভিনেতৃবৃন্দ অভিনয় করিয়াছেন।

প্যারামাউণ্ট সিনেমায় "শাহানশা আকবর" তৃতীয় সপ্তাহে পড়িল।

উত্তরায় "মাটির ঘর" তৃতীয় সপ্তাহে পড়িল এবং প্রত্যেক দর্শকই ইহার প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

* * *

আগামী ১৯শে মে শ্রী'তে এম পি, প্রোডাকশানের "বিদেশিনী" মুক্তিলাভ করিবে। ইহাতে কানন দেবী ও ধীরাজ ভট্টাচার্য্য নায়িকা ও নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছেন। সুর সংযোজনা করিয়াছেন কমল দাসগুপ্ত।

* * *

শৈলজানন্দ লিখিত ও পরিচালিত কালী ফিল্মসের "অভিনয় নয়" চিত্রের ভূমিকালিপি নির্ব্বাচিত হইয়াছে এইরূপ: অহীন্দ্র চৌধুরী,

নৈহাটিতে রবীন্দ্র জন্মতিথি উৎসব—

গত ২৫শে বৈশাখ, সোমবার অপরাহ্নে, বালক-সমিতির উদ্যোগে নৈহাটিস্থ সুবৃহৎ বোকে হলে, সুকবি শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে রবীন্দ্র জন্মতিথি উৎসব অতি সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। কলিকাতা হইতে আগত বহু সুধী, সাহিত্যিক, স্থানীয় বহু ভদ্রলোক ও মহিলা এবং বালক-বালিকাবৃন্দ এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

কুমারী গীতা চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক "বন্দেমাতরম্" গানের পর সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। সভার উদ্বোধন করিতে উঠিয়া শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ সান্যাল (আনন্দ বাজার পত্রিকা) রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ প্রতিভা, সাহিত্যসৃষ্টি, দেশপ্রাণতা ও কর্ম্মশক্তির বিষয় বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেন। রবি-বাসরের সম্পাদক শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বসু তাঁহার বক্তৃতায় শিশু-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের অতুলনীয় দানের কথা সবিস্তারে বর্ণনা করেন। পণ্ডিত ভবতোষ ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ মহাশয় বলেন যে, রবীন্দ্রনাথ যেমন উচ্চাঙ্গের সাহিত্যসৃষ্টি করিয়াছেন তেমনি লঘুসাহিত্য ও শিশু সাহিত্যেও তাঁহার দান কম নহে। প্রধান অতিথিরূপে "ভারতবর্ষ" সম্পাদক শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় রবীন্দ্র জন্মতিথি উপলক্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়া কবিগুরু রচিত "জন্মদিনে" পুস্তক হইতে কয়েকটি কবিতা পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত দেবকুমার গুপ্ত, শ্রীযুক্ত অমূল্য কুমার দে, শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি বক্তৃতা এবং বালকেরা রবীন্দ্র-রচনা হইতে আবৃত্তি করিয়া বিশ্বকবির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে বলেন—"রবীন্দ্রনাথ যে সংস্কৃতিশীল পরিবেশে জন্মগ্রহণ করিয়া বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন সেই ভারতীয় সংস্কৃতি, সভ্যতা, জ্ঞান ও কৃষ্টিকে সমগ্র বিশ্বে প্রচার করিয়া স্বজাতী, স্বদেশ ও মাতৃভাষার অশেষ গৌরব সাধন করিয়াছেন। তিনি আমরণ সাহিত্যের মধ্য দিয়া যে বাণী সমগ্র বিশ্ববাসীকে শুনাইয়াছেন, তাহার দ্বারাই আমাদের দেশ ও মাতৃভাষা জগৎ সভায় সম্মানের আসন লাভ করিয়াছে। তাঁহার জন্মদিনের এই উৎসব জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে আমাদের জাতীয় উৎসবে পরিণত হওয়া উচিত। সমবেত কণ্ঠে 'জনগণ মন অধিনায়ক' গানের পর সভার কার্য্য শেষ হয়।

হেমচন্দ্র পরিচালিত
নিউ থিয়েটার্সের
হিন্দি নিবেদন

"ওয়াপস্"

চিত্রা
নিউসিনেমা
রূপালীতে

৯ম সপ্তাহে চলিতেছে।

শৈলেন চৌধুরী ইন্দু মুখার্জ্জী, দেবী মুখার্জ্জী, মলিনা, রেণুকা রায়, অমল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি।

* * *

গত শনিবার মিনার্ভা সিনেমায় সকাল দশটায় ইনফরমেশন ফিল্মস অফ ইণ্ডিয়ার কয়েকটি খণ্ড-চিত্র স্থানীয় সাংবাদিকদের দেখানো হয়। ঐদিন অপরাহ্নে গ্রাণ্ড হোটেলে পাবলিক রিলেশন অফিসার মিঃ হাসুম ফিল্ম সাংবাদিকদের একটি টী-পার্টিতে আপ্যায়িত করেন।

নীলফামারীতে "চিকিৎসা-সঙ্কট"

টাউন ক্লাবের সদস্যগণ কর্তৃক পরশুরাম রচিত "চিকিৎসা-সঙ্কট" নাটকখানি নববর্ষ উপলক্ষে অভিনীত হইয়াছে। গুপির ভূমিকায় ডাঃ প্রফুল্ল বসুর সু-অভিনয় নাটকখানিকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে যথেষ্টভাবে সাহায্য করিয়াছে। "রঘু"র ভূমিকায় অনিল ভট্টাচার্য্য নির্ব্বাচিত বিচারকগণ কর্তৃক শ্রেষ্ঠ অভিনেতা মনোনীত হইয়া একখানি রৌপ্যপদক উপহার পাইলেও প্রফুল্লবাবু-ই তাঁহার সুললিত অভিনয় দ্বারা অধিক সংখ্যক দর্শককে মুগ্ধ করিয়াছেন। ভিখারীর ভূমিকায় সুহাসবাবুর "একখান্ পয়সা দাও" গানখানি অত্যন্ত সুন্দর হইয়াছিল। নিধুর ভূমিকায় রমাবাবুর অভিনয়ে মাঝে মাঝে অতি-অভিনয় ভাব লক্ষিত হইতেছিল। স্ত্রী-ভূমিকায় একমাত্র মিস্ বিপুলার অংশে বীরেন গুহ নিয়োগী চমৎকার অভিনয় করেন।

পাঠশালা প্রাঙ্গণে

গত ২৪শে বৈশাখ অপরাহ্ণ ৫টায় ইহারা কুমার সিং হল, ৪৬ ইণ্ডিয়ান মিরর ষ্ট্রীটে বিশ্বকবির জন্মতিথি উৎসব করেন, সভাপতিত্ব করেন শ্রীপ্রভাত কিরণ বসু।

রবীন্দ্রনাথের রচনা হইতে আবৃত্তি, অভিনয়, সংগীত ইত্যাদি উৎসবের প্রধান অঙ্গ ছিল।
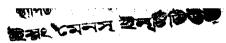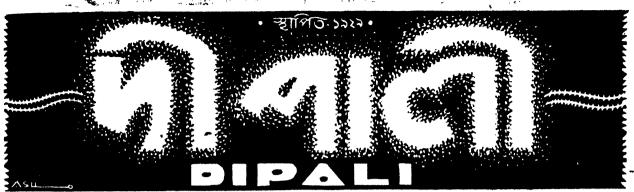
বেহালা ক্লাব

গত ২৫শে বৈশাখ, সোমবার, সন্ধ্যা ৭॥০ টায় বেহালা "রাজেন্দ্র-হলে" শ্রীযুক্ত দেবীদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পৌরহিত্যে বিশ্বকবির জন্মদিনের উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। আবৃত্তি, সঙ্গীত, রচনা-পাঠ এই উৎসবটিকে সাফল্য মণ্ডিত করে।

দীপালীর স্বত্বাধিকারী শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত, ১২৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, দীপালী প্রেসে মুদ্রিত

প্রধান সম্পাদক—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় :: সহঃ সম্পাদক—শ্রীধীরেন্দ্রমোহন মজুমদার বি. এল.

১৬শ বর্ষ VOL. XVI. } ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ ১৩৫১ :: May 18, 1944 { ২০শ সংখ্যা No. 20

দীপালীর কলেবর ও মূল্য বৃদ্ধি হইল

সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ আইনের নির্দ্দেশ অনুযায়ী দীপালীর কলেবর বৃদ্ধি হইল—এবং মূল্যও হইল :

প্রতি সংখ্যা	...	চার আনা
ডাকে	...	সাড়ে চার আনা
বার্ষিক চাঁদা	...	১২৷০
ষান্মাষিক „	...	৬৷০
ত্রৈমাসিক „	...	৩৷০

যাঁহারা ৬৲ টাকা কিংবা ৩৷০ টাকা দিয়া বার্ষিক কিংবা ষান্মাসিক গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন তাঁহারা যেন দয়া করিয়া অবিলম্বে বাকী টাকাটা পাঠাইয়া দিয়া আমাদিগকে যেমন এই দীর্ঘকাল অনুগৃহীত করিয়া আসিতেছেন, তেমনি সাহায্য করিয়া বাধিত করিবেন।

দীপালী কার্য্যালয়

১২৩/১ আপার সার্কুলার রোড

কলিকাতা

ফোন : বড়বাজার ৩২৫৩

টেলিগ্রাম : DIPALI

আলোচনী

কেবলমাত্র স্বাস্থ্যের অবস্থা বিবেচনা করিয়াই মহাত্মাজীকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে সরকারী ইস্তাহারের ইহাই মর্ম্ম। গত ৫ই মে তারিখে নয়া দিল্লী হইতে এই ইস্তাহার বাহির হইয়াছিল। এই ঘোষণার পূর্ব্বদিন মিঃ আমেরীকে কমন্স সভায় প্রশ্ন করা হইয়াছিল, কারারুদ্ধ ও কারামুক্ত নেতৃবৃন্দের মধ্যে কথাবার্ত্তা বলার সুযোগ দেওয়া হইবে কি না? মিঃ আমেরী স্বীকৃত হন নাই। সম্প্রতি আসাম ও যুক্তপ্রদেশের মুক্ত কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ জাপানী প্রতিরোধ সম্পর্কে যে বিবৃতি দিয়াছিলেন কমন্স সভায় তাহার উল্লেখ করা হইলে আমেরী নেতৃবৃন্দের এই পরিবর্ত্তিত মনোভাবের জন্য সন্তোষ প্রকাশ করেন। কংগ্রেসের এই মনোভাবকে কাজে লাগাইয়া এ দেশের শাসনতান্ত্রিক আবহাওয়ার উন্নতি কতখানি করা যাইতে পারে সে সম্পর্কে মিঃ আমেরী সম্পূর্ণ নীরব ছিলেন। অর্থাৎ মহাত্মা গান্ধীর মুক্তিলাভের ২৪ ঘণ্টা পূর্ব্বেও মিঃ আমেরীকে প্রশ্ন করিয়া কিছু জানা যায় নাই। কূটনীতির দিক দিয়া এই নীরবতার হয়তো একটা অর্থ করা যায়। কিন্তু এই ব্যাপারে রাজনৈতিক সন্ধানীদের মন সহস্র অনুমান ও বিচারের জাল রচনা করিবে।

* * *

২৪ ঘণ্টার মধ্যে দিল্লী ও লণ্ডনের মধ্যে যে রাজনৈতিক দরকষাকষি হইয়া গিয়াছে ইহা অনেকে অনুমান করিতেছেন। গান্ধীজীকে মুক্তি দেওয়ার ব্যাপারে লর্ড ওয়াভেলকে হয়তো তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও অভিজ্ঞতার সম্পূর্ণ প্রভাব প্রয়োগ করিতে হইয়াছিল। ইহা মোটেই বিচিত্র নয়। চার্চ্চিল-আমেরী উদ্ভাবিত ভারতীয় নীতি কতখানি বাস্তবতাবর্জ্জিত ইহা হইতে বুঝা যাইবে। লণ্ডনের সাম্রাজ্যবাদী নীতিবাগীশের দল ভারতের অন্তঃসলিলা ভারতবর্ষের সহিত সম্পর্কশূন্য। ব্যক্তিত্বহীন শাসকের পক্ষে ইহাদের প্রভাবমুক্ত হইয়া নীতি নির্দ্ধারণ করা বহুক্ষেত্রে অসম্ভব হইয়া পড়ে। লর্ড লিনলিথগোর শাসনকাল প্রত্যক্ষ-ভাবে ইহারাই সাক্ষ্য দিতেছে। গান্ধীজির মুক্তি সম্পর্কে এখনও নির্দ্দিষ্ট করিয়া কিছু বলা কঠিন। স্বাস্থ্যের প্রয়োজন অগ্রগণ্য হইলেও ইহারই সূত্র ধরিয়া বর্ত্তমান অচল অবস্থার অবসান ঘটাইবার একটা প্রচেষ্টা হইতে পারে। সদ্যমুক্ত কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের কয়েকটি বিবৃতি হইতে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা যায়। মহাত্মাজীর কারামুক্তির ফলে কংগ্রেসের একটা নূতন রূপায়ণের চেষ্টা হইতে পারে। সম্প্রতি একটি মার্কিণ পত্রিকায় বর্ত্তমান ভারতীয় অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে—"battle for face rather than battle for realities." চার্চ্চিলীয় ধুরন্ধরগণ একটা জিদের বশবর্ত্তী হইয়া চলিতেছিলেন। যে কোন প্রকারে হউক সাম্রাজ্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হইবে। হয়তো সাম্রাজ্যের মর্য্যাদা রক্ষা হইয়াছে। কিন্তু ইহার জন্য কি মূল্য দিতে হইয়াছে তাহা ইহারা কল্পনাও করিতে পারেন না। কংগ্রেসের উপর চরম আঘাত হানিয়াও জনগণের মন হইতে শ্রদ্ধার মূলোচ্ছেদ করা

সম্ভব হয় নাই। দেশের টাকা খরচ করিয়া প্রচার কার্য্য করা হইয়াছে। হত্যা লুণ্ঠন ও অপরাধের বিচিত্র অভিযোগ আরোপ করিয়াও দেখা গেল একটা নৈতিক শক্তির অনুপ্রেরণা কংগ্রেসের মেরুদণ্ডকে সবল করিয়া রাখিয়াছে। লর্ড ওয়াভেল বাস্তববাদী বলিয়া সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহার অভিজ্ঞতা যদি দূর ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি মেলিয়া অগ্রসর হয় তাহা হইলে লণ্ডনের স্বপ্নবাদী কূটনীতিক দলের সহিত সঙ্ঘর্ষ বাধিবেই। সেই সঙ্ঘর্ষের শক্তি পরীক্ষায় হইবে এ দেশের ইতিহাস রচনা।

* * *

কলিকাতায় মাছ দুষ্প্রাপ্য। যাহা পাওয়া যায় তাহাও অগ্নিমূল্যে বিক্রয় হইতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে বাংলা সরকার কলিকাতার কাঁচা বাজারের দর বাঁধিয়া দিবেন বলিয়া একটি বিজ্ঞপ্তি বাহির হইয়াছিল। শীঘ্রই যাহাতে একটা ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায় তাহার চেষ্টা হইতেছে শুনিয়াছিলাম। ইতিমধ্যেই বাজার-দর ক্রমশঃ চড়িতেছে। বাংলার নদী-নালায় পূর্ব্বে প্রচুর মাছ জন্মিত। নানা কারণে খাল বিল আজ মাছ শূন্য হইয়া পড়িতেছে। সম্প্রতি বাঙ্গলা ব্যবস্থা পরিষদে মাছের চাষ যাহাতে বৃদ্ধি পায় সে সম্পর্কে একটি বিল উত্থাপন করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে সহরের কথা দূরে থাকুক পল্লীগ্রামে মাছ পাওয়া যাইতেছে না। বাংলা দেশের প্রধান খাদ্য হিসাবে গবর্ণমেণ্ট এ ব্যাপারে নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারেন না ইহা বলা হইয়াছে। এই নূতন আইনের খসড়া সিলেক্ট কমিটির বিবেচনাধীন রহিয়াছে।

* * *

কলিকাতার পথে জনস্রোত বাড়িয়াছে, ফলে প্রায়ই দুর্ঘটনার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। সম্প্রতি এ্যাসেম্বলিতে যে তথ্য প্রকাশ পাইয়াছে তাহা হইতে অবস্থার গুরুত্বের পরিচয় পাওয়া যাইবে। মিলিটারী লরীচালকদের বে-পরওয়া কার্য্যের ফলে অধিকতর দুর্ঘটনা ঘটিতেছে বলিয়া জনসাধারণের ধারণা এবং এ ধারণা যে ভিত্তিহীন নয় তাহা পরিষদের প্রশ্নোত্তর হইতে জানা যায়। সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ কড়া সতর্কতার ব্যবস্থা করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। ইহার ফলে দুর্ঘটনায় মৃত্যুর সংখ্যা কতখানি কমিয়াছে তাহা জনসাধারণ জানিতে পারিলে সুখী হইত।

* * *

কলিকাতায় পৃথিবীর বহুজাতির পদচিহ্ন পড়িতেছে। ইহার লোক-সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণিত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। নানা ভাবে এই সহরের জীবনযাত্রায় জটিলতা আসিয়াছে। পথ চলার সমস্যা ইহার অন্যতম। প্রভাত হইতে প্রায় মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত এই সহরের যান বাহনগুলি যেন ক্ষিপ্ত হইয়া ফেরে। ট্রাম ও বাসের সর্ব্বত্র মানুষ বাদুড়ের মত ঝুলিয়া চলিতেছে। ট্রামে বাসে চড়া আজ কতখানি স্বস্তিকর ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন, বলিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। তথাপি কতকগুলি ব্যাপার ঘটে যাহাতে আমাদের লজ্জা হওয়া উচিত। ট্রামে ওঠা ও নামার সময় আমরা যে ব্যস্ততা ও শরীরের কসরৎ দেখাই ইহার কি প্রয়োজন থাকিতে পারে বুঝিতে পারি না। সুশৃঙ্খল ভাবে কার্য্য করা যেন আমাদের অভ্যাসের বাহিরে। এই লোকারণ্যে দুর্ঘটনা যে বাড়িবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? ইহার জন্ম নিজেদের আংশিক দায়িত্ব আজ উড়াইয়া দিলে চলিবে না। সেদিন দেখিলাম শিয়ালদহ হ্যারিসন রোডের মোড়ে ট্রাম হইতে একটি মহিলা নামিতে চেষ্টা করিতেছেন। তিনি কোন প্রকারে নামিয়াছেন কিন্তু তাঁহার শাড়ীর একপ্রান্ত ব্যস্ত লোকারণ্যের পদলগ্ন রহিয়াছে দেখিলাম। ইহার জন্য কাহারও উৎকণ্ঠা ও দুশ্চিন্তা দেখিলাম না। অথচ মহিলাটির অবস্থা হইয়াছে শোচনীয়। ইহা মাত্র একটি দৃষ্টান্ত। কতশত দৃষ্টান্ত প্রত্যহ নজরে পড়ে যাহা উল্লেখ করিতেও প্রবৃত্তি হয় না।

প্রত্যাখ্যান

(উপন্যাস)

শ্রীসুধাংশু কুমার হালদার, আই, সি, এস্

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(৪)
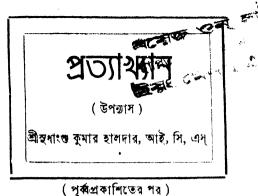
কয়েকদিন ধরে সাঁওতাল বস্তীতে পাচুই খাওয়ার ধুম পড়ে গেছে, হানীম গাছের তলায় রোজই সন্ধ্যায় মস্ত বড় পঞ্চায়েত বসছে। বোঝা গল শুধু পরব উপলক্ষ্যে নয়, নিশ্চয় শান্ত সাঁওতাল জীবনে কোনো কটা সমস্যা দেখা দিয়েছে। সেদিন সন্ধ্যার কিছু আগে অসীম বড়াতে বেরুচ্ছে এমন সময় পলাশবনীর একজন মাতব্বর সাঁওতাল সে তার সামনে সটান শুয়ে পড়ল। এই হ'ল তার অভিবাদন। র সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে মহুয়ার মদের গন্ধ বেরুচ্ছে। মাতব্বর হ'লে কি হয় রিধানে মাত্র একহস্তপরিমিত কৌপীন, অঙ্গে আর কোনো বস্ত্রের াহুল্য নেই। অনেক ঘটা ক'রে অভিবাদন সাঙ্গ ক'রে মাতব্বর যেটুকু ললেন তার সারমর্ম এই যে যদিচ তাদের সাঁওতাল জীবনে সমস্যা চরাচর আসে না; তথাপি এই ক'দিন ধ'রে এক সঙীন সমস্যা উপস্থিত য়েছে। মংরু মাঝি সাঁওতালই বটে, এবং এই গ্রামেই তার বাপ-দাদার আমল থেকে বাস। কিন্তু অর্থের সন্ধানে সে মজুর খাটতে বর্দ্ধমান গিয়ে এমন বদলে গেছে যে সাঁওতাল ব'লে আর তাকে চেনাই যায় না। মাথায় এখন তার বিরাট টেরি। সত্যিকার বাবুদের টেরির সঙ্গে তুলনা ক'রে মাতব্বর বললেন, "কুথাকে লাগে তুদের টেরি, হঁ! উয়াঁর টেরি মাথ্যা থেকে পা তক্ লুটাইছে বটে!" এ হেন মংরু গ্রামে তার বিবাহিতা স্ত্রীকে একলা ফেলে রেখে চলে যায় খোরপোষের কোনো বন্দোবস্তই না ক'রে। লোক-পরম্পরায় শোনা যাচ্ছে বর্দ্ধমান অঞ্চলে মংরু একটি আলোকপ্রাপ্তা সাঁওতালনীর পাণিগ্রহণ করেছে। এখন এই স্ত্রীটির কি গতি হবে সেটা একটা চিন্তানীয় বিষয়। অনেক কষ্টে মংরু মাঝিকে এই পরবের অজুহাতে পলাশবনীতে ধরে আনতে পারা গেছে, কিন্তু পাপিষ্ঠকে কিছুতেই সায়েস্তা করা যাচ্ছে না। সেইজন্যেই বাবুকে একবার পায়ের ধুলো দিতে হবে।

কাজেই অসীমকে যেতে হ'ল। সেই প্রকাণ্ড মহানীম গাছটার তলায় বিরাট সাঁওতাল সভা বসেছে। সভাসদগণ অধিকাংশই অতিরিক্ত পানীয় সেবনে সভাস্থলে চিৎ। দু'একজন বিচারের গুরুভার আপাততঃ স্থগিত রেখে গান ধরেছেন. গানের বিষয় হ'ল যে নব-বাবুত্ব প্রাপ্ত হ'য়ে মংরু সাঁওতাল আজকাল দাদ্‌খানি চালও আর হজম করতে পারে না, 'কাড়া' অর্থাৎ মহিষের মতো উদ্‌গার করে,—যে মংরু একদা বুক্‌ড়ি চাল আর কাঁকর চিবিয়ে হজম করেছে। আর একজন মাতব্বর ক্রমাগত হাত নেড়ে বোঝাতে চাইছে এই যে সাঁওতালদের "মিটিং" অর্থাৎ সভা, কোনোক্রমেই একে "মিটিং" বলা চলে না, কেননা এতে সাহেব নেই। সাঁওতালদের দৃঢ় ধারণা যে সাহেব নইলে মিটিং একেবারে অচল। অসীমকে দেখেই সে লাফ দিয়ে উঠে বললে, "লেঃ, হেই তুদের সাহেব এল!"

তখন যে-সব সাঁওতাল মংরু মাঝিকে উদ্দেশ করে গান গাইছিল—

"দাদ্‌খানি চাল খায় রে
দাদ্‌খানি চাল খায়—
আর কাড়ার মতো ঢেকুর তোলে রে—"

তারা তাদের গান থামিয়ে একটু দূরে সরে বসল।

অসীম দেখল একটী চব্বিশ-পচিশ বৎসরের টেরিকাটা পিরান্ পরা সাঁওতাল যুবক একপাশে চুপটি ক'রে বসে আছে। বুঝল, এই হ'ল আসামী মংরু মাঝি। আর এক পাশে এতগুলা পুরুষ মানুষের মাঝে জড়সড় হ'য়ে বসে আছে নিমি মেঝিয়ান, এই মামলার ফরিয়াদি। দৃশ্যটি যেমনি করুণ তেমনি হাস্যকর।

উভয় পক্ষকে অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গেল ফরিয়াদি পক্ষ খানিকটা সত্য গোপন করেছে। মংরু যে তার পরিবারকে একেবারে নিঃসম্বল অবস্থায় রেখে গিয়েছিল তা নয়, তার জিম্মায় একটা গোরু রেখে গিয়েছিল। ফরিয়াদিপক্ষ ঐ গোরুর কথাটা চাপতে চেষ্টা করল, কিন্তু জেরায় সবটাই প্রকাশ হ'য়ে পড়ল।

অসীম বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে বলল, মংরু হয় তার দ্বিতীয় স্ত্রীকে তালাক দিয়ে এই স্ত্রী নিয়ে ঘর করুক, নয়তো এই স্ত্রীকে তালাক দিক এবং ক্ষতিপূরণ স্বরূপ গোরুটাও তাকে দিয়ে দিক। অবিশ্যি এ বিষয়ে নিমি মেঝিয়ানের সিদ্ধান্তই চরম। সে এই দুই প্রস্তাবের মধ্যে যেটা বেছে নেবে, মংরুকে তা মানতেই হবে।

মাতব্বরেরা অসীমের এই বিচারে বেজায় খুসী হ'য়ে ধেই ধেই ক'রে নাচ শুরু করল। আনন্দের উল্লাসে দমাদম মাদল বেজে উঠল। তারপর প্রধান মাতব্বর নিমিকে জিগেস করল, "হেই মেঝিয়ান, তুই গোরুটি লিবি, না খসমটি লিবি?"

মেঝিয়ানের মতিস্থির করতে বিশেষ দেরী হ'ল না। তিনি উত্তর দিলেন—"মুই গোরুটি লিবি, খসমটি না লিবি।"

বাস্, হাঙ্গামা চুকে গেল। মেঝিয়ান ঠাকুরাণী যে অত্যন্ত বুদ্ধিমতী সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কে না জানে, স্বামী মাত্রেরই ল্যাঠার আর অন্ত নেই। তার জন্যে ভাত রাঁধতে হয়, তার কাপড় কাচতে হয়, ফাইফরমাস খাটতে হয়, তার ওপর সময় অসময় নেই, তার মেজাজ আছে, তম্বি আছে, রাগ আর অভিমান কলহ আছে। গোরুর এসব বালাই নেই, উপরন্তু গোরু আবার প্রত্যহ দুধ দেয়! সুতরাং আশা করা যায় স্বামীর চেয়ে গোরুর দাম যে ঢের বেশী এ বিষয়ে কোনো মেয়েরই মতদ্বৈধ ঘটবে না।

তারপর একটা মহুয়া পাতা পেড়ে আনা হ'ল। মংরু ধরল তার

একপ্রান্ত, আর নিমি ধরল আর একপ্রান্ত। তারা দু'জনে মিলে পাতাটার দুদিক থেকে টান দিলে, পাতাটা দু'টুকরো হ'য়ে ছিঁড়ে গেল। বাস্, তাদের বিবাহ-বন্ধনও ছিন্ন হ'য়ে গেল। এমন সুসাধ্য বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রথা থাকতে কেন যে মানুষ অত আইন আদালত ক'রে মরে!

সন্ধ্যার অন্ধকারে বাড়ী ফিরতে ফিরতে কত কথাই অসীমের মনে হ'তে লাগল। সেই নমিতাদের বাড়ীর দিনগুলি,—তারপর প্রায় একরকম পালিয়েই এখানে চলে আসা! নমিতা কি তার প্রত্যাখ্যানের কথা জেনেছেন? তাঁর মা কি তাঁকে সব ব'লেছেন? নমিতা তো কোনো অংশেই তার অযোগ্য নন, তবু কেন সে তাঁকে ভালবাসতে পারল না প্রিয়া ব'লে প্রিয়তমা ব'লে? সভ্য মনের একী অদ্ভুত দ্বন্দ্ব, একী অদ্ভুত গতি! বেশ আছে এই সাঁওতালরা। এদের স্ত্রীপুরুষের মিলনে কোনো মানসিক বাধা তো কোনোদিন আসে না! আবার বিবাহ-বিচ্ছেদ হ'য়ে গেলেও অতীতের স্মৃতি তো এমন ক'রে পোড়ায় না, সভ্যমানুষকে যেমন ক'রে পোড়ায়। ঐ সদ্যবিচ্ছিন্ন সাঁওতাল দম্পতীর কথাই ধরা যাক্। হ'ত যদি সভ্যসমাজ,—কাগজে কাগজে কত চাপা ইঙ্গিত, ঘরে ঘরে ক্লাবে ক্লাবে কত বক্রহাসি, কত বিদ্রূপ,—আদালতে কত তর্জন গর্জন, অন্ধকারের অন্তরালে কত পুঞ্জীভূত অশ্রুজল। তারপর সমাজের সে কি সুচারু নির্বিকারত্বের অভিনয়! সেই মূক উৎপীড়নের ভয়ে অবশেষে স্বেচ্ছাকৃত নির্বাসন। এক একবার তার মনে হয় সভ্যতার সমস্ত অভিমান বিসর্জন দিয়ে সাঁওতালদের মাঝেই সাঁওতাল হ'য়ে যায়! সে তো বেশ হবে! থাকবে না ভাবনা চিন্তা, থাকবে না বিপ্লব চাঞ্চল্য, জীবননদী ঝিরঝিরিয়ে ব'য়ে যাবে এই সব মহুয়া গাছের তলা দিয়ে ঐ ক্ষীণ নদীটির মতো। তারপর হয় তো একদিন আকৃষ্ট হবে কোন সাঁওতাল নারী, আসবে বনফুল খোঁপায় গুঁজে, মনোহরণ ক'রে নেবে তার। সে তো বেশ হবে!···কিন্তু এই কি যথার্থ ভালো! এই কি যথার্থ কাম্য?···অরণ্যছায়ায় পর্বতে প্রান্তরে এই সাঁওতালরাও বাস করে, আর আমাদের প্রপিতামহগণও বাস করতেন। হয়তো একদা তাঁরা পাশাপাশি একই অরণ্যে বাস করে এসেছেন। তবে এই সাঁওতালদের সঙ্গে তাঁদের,—আমাদের,—তফাৎ ছিল কোথায়?—এরা আত্মবিস্মৃত, আহার নিদ্রা ও সংসার, এই হলেই হ'ল, বাস্, আর কিছুর প্রয়োজন নেই জীবনে। জড় না হ'য়েও এরা অচেতন, জেগে থেকেও এরা সুপ্ত। আর তাঁরা চেয়েছিলেন পরমতমকে, যিনি এই যা কিছু সবকে অতিক্রম ক'রে জেগে আছেন, যাঁকে পেলে আর কিছুকে পাবার প্রয়োজন থাকে না। এই যে অদ্ধবন্যদের বাঁচা, এই কি বাঁচার মতো বাঁচা? দুঃখ নেই এইটেই যে সবচেয়ে বড় দুঃখ। পশুরও তো দুঃখ নেই। মানুষের সভ্যতা,—সে যে বড় দুঃখের ধন, দুঃখের ওপরই যে তার প্রতিষ্ঠা। মানুষের মনুষ্যত্ব,—সে যে দুঃখের দ্বারাই দুর্লভ, চোখের জলেই সিক্ত, যে চোখের জল কোনোদিনই থামবার নয়, সেই যে তাকে শৌর্য্য দিয়েছে, বীর্য্য দিয়েছে, তাকে অপরূপ সৌন্দর্য্যে বিভূষিত করেছে। এ দুঃখ তার খাওয়া-পরার দুঃখ নয়, এ দুঃখ তার আর্থিক ক্ষতির, তার সামাজিক অপমানের দুঃখ নয়, এ দুঃখ তার চারিদিকে স্থৌল্যে গড়া নাগপাশ হ'তে মুক্তি পাবার দুঃখ, তার মোহনিদ্রাচূর্ণ করার দুঃখ, যে দুঃখের ব্যথায় নীল হ'য়ে ওঠেন জননী, জন্ম দেন নতুন প্রাণের,—এই সেই চিরনবজন্মের দুঃখ। বিধাতা যে তাঁর জয়ের টীকা মানুষের ললাটে ছুঁইয়ে দিয়ে বলেছেন,—'দুঃখ পেও তুমি, হে বীর, দুঃখ পেও তুমি। জয় হবে তোমার'। এই বিরাট দুঃখ যে মানুষের বুকে আর ধরে না। এই দুঃখানুভূতিই সিদ্ধার্থকে সোনার মুকুট মাথায় পরিয়ে দিয়ে বলেছে, 'আজ হ'তে তুমি বুদ্ধ',—এই দুঃখকে বারংবার বরণ ক'রে ক'রে, এই দুঃখের মরণে বারংবার ম'রে ম'রে মানুষ প্রমাণ করেছে যে তার মৃত্যু নেই, সে অমৃতের পুত্র। (ক্রমশঃ)

কমরেড লেনিন

—শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

প্রবেশিকা পাশ করে সেই বছরেই ভলোডিয়া এলো কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে।

আইন-পড়া।

কিন্তু তার সমগ্র মনের পর্দায় তখনও শোকের কালোছায়া ছড়িয়ে আছে। ভাই আর বোন যে কাজ করতে পারলো না, সেই কাজ সম্পন্ন করবার জন্য মনে মনে সে শক্তি সঞ্চয় করতে লাগলো, ভাইয়ের কথাগুলি বিদ্যুতের ঝিলিক্ দিতে লাগলো—জার সব চেয়ে বড় ধনী, সেইজন্যই মিলের মালিক আর জমিদারের সঙ্গেই তার সহানুভূতি বেশী, তাদের সাহায্য করতে সব সময়েই জার প্রস্তুত। কারখানার মজুরেরা বেশী মাইনে চাইলে জারের পুলিশ তাকে জেলে পাঠায়, চাষারা কিছু সুবিধা চাইলে জারের সৈন্যরা তাদের উপর চাবুক চালায়। ওই মূলে আঘাত দিলেই শাখা-প্রশাখা সহজেই বিনষ্ট হবে, জারেরই শেষ করতে হবে।

ভলোডিয়া দল গড়তে সুরু করলো। সহপাঠীদের নিয়ে চললো গোপন আলোচনা: কি করে অন্যায়ের প্রতিকার হয়, জারের অত্যাচার শেষ করা সত্যই সম্ভব কি না!

গুপ্তচর ছিল, কথাটা পুলিশের কানে পৌঁছে দিল। তখনই আদেশ জারী হয়ে গেল—ছাত্রদের ক্লাব, সভাসমিতি সবই বে-আইনী!

ছাত্ররা বুঝতে পারলো গবর্নমেণ্ট তাদের ভয় করে, তারা দমলো না, শাসকবর্গের সেই চ্যালেঞ্জকে তারা গ্রহণ করলো। মুখ বুঁজে ঘরের মধ্যে এসে ঢুকলো না, এক বিরাট শোভাযাত্রা বের করলো, ছাত্রদের দাবী জানিয়ে।

পুলিশ অনেককেই ধরলো, ভলোডিয়াও বাদ গেল না।

ছাত্রনেতাদের বিচার হোল। বিচারক জারের মাইনে-করা লোক, ভলোডিয়াকে সে বললে—ওহে ছোকরা, বড় যে বাড়াবাড়ি সুরু করেছ দেখছি! রাজদ্রোহীদের কি ভাবে সাজা দেওয়া হয় দেখনি বুঝি? জেলখানার বিরাট পাথরের পাঁচীল দেখেছ?

ভলোডিয়া বললে—দেখেছি; সে পাঁচীলে আজ ঘুণ ধরেছে, সাহস করে ধাক্কা দিতে পারলেই তা ভেঙে পড়বে।

—বটে—বিচারকের মুখ কালো হয়ে উঠলো, বললে—ওই পাঁচীলে কেমন ঘুণ ধরেছে তোমাকে দেখাচ্ছি, ওই পাঁচীলের আড়ালেই তোমার জায়গা করে দিচ্ছি।

জেলেই যেতে হোত, কিন্তু মা এসে দাঁড়ালেন বিচারকের সামনে, বললেন—আমার এক ছেলের ফাঁসী দিয়েছ, এক মেয়েকে করেছ নির্ব্বাসিত, একেও জেলে পাঠাতে চাইছ! ছেলেমানুষ ভুল করেছে, শুধরে নেবার সময় দাও, আমি আমার ছেলের দায়িত্ব নিচ্ছি।

বিধবা অধ্যাপক-পত্নীর এই অনুরোধ বিচারক একেবারে উপেক্ষা করতে পারলো না, ভলোডিয়ার জেল না হয়ে হোল নির্বাসন।

ছোট গ্রামে ঠাকুরদার বাড়ীতে এসে উঠলো ভলোডিয়া। এখানে তার বোন এনারও হয়েছিল নির্বাসন। অনেকদিন পরে ভাইবোনে দেখা হোল।

এখানে কতদিন থাকতে হবে জানা নেই। ছোট গ্রামের পথ আর মাঠ, দিগ্বলয় থেকে নদীর কিনারা পর্য্যন্ত ক'দিনের মধ্যেই মুখস্থ হয়ে গেল, প্রতিটি গৃহ ও প্রতিটি মানুষের বৈচিত্র্যও চেনা-জানা হয়ে গেল মনের চোখে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশুনাও বন্ধ। এম্‌নি অকর্মণ্য দিনগুলি ভলোডিয়ার মত যুবকের পক্ষে কাটানো বড়ই কঠিন। কোনরকমে খানকয়েক মনোমত বই যে জোগাড় করলো, আর জোগাড় করলো একখানি অভিধান; রীতিমত পড়াশুনা শুরু করলো সকাল থেকে মাঝ-রাত পর্য্যন্ত।

এইখানেই কার্ল-মার্ক্সের অর্থনীতির সঙ্গে ভলোডিয়া পরিচিত হোল।

মার্ক্সের মতে অর্থই সব। বড় বড় সাম্রাজ্যের উত্থান পতন থেকে সুরু করে অতি সাধারণ মানুষের তুচ্ছ দৈনন্দিন ঘটনাগুলিও অর্থকেই কেন্দ্র করে চলে। অর্থ মানুষের সম্মান যাচাই করে, অর্থের জন্যই ধনী গরীবের পার্থক্য ধরা পড়ে। অর্থ সঞ্চয়ের জন্য মানুষ মানুষকে উৎপীড়ন করে, অর্থ নিয়েই জাতিতে জাতিতে বাধে সংঘাত। এই অর্থের বৈষম্য দূর করতে না পারলে মানুষ কোনদিনই শান্তি পাবে না। মজুর আর চাষারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যে অর্থ উৎপাদন করে তাতে আর কারুরই ভাগ থাকতে পারে না। ক্ষেত আর কারখানা কারুরই ব্যক্তিগত সম্পত্তি হতে পারে না। অর্থ পেতে হলে সকলকেই সমভাবে খাটতে হবে, এবং উৎপাদিত অর্থের উপর সকলেরই থাকবে সম-অধিকার।

এবং কিভাবে সমাজ এই আর্থিক সাম্যে এসে পৌঁছাবে তারও বিবরণ মার্ক্স লিখেছেন তাঁর বইয়ে: মালিকেরা কোনদিনই মজুরকে তার প্রাপ্য দেয় না, কিছু কম দেয়। আর লাভ বলে সেইটা জমা করে নিজের হিসাবে। শ্রমিকেরা যদি এই ব্যবস্থায় আপত্তি জানায় ও বেশী মাইনে চায় তাহলে তাদের চাকরী যায়, এবং নতুন লোককে সেখানে ভর্ত্তি করা হয় পূর্ব্বের চেয়ে কম মাইনেতে। এইভাবে ধনিকের লাভ ক্রমশঃই বেড়ে চলে এবং শ্রমিকের দল ক্রমশঃই দরিদ্র থেকে সর্ব্বহারার পর্য্যায়ে নেমে আসে। তখন আর শ্রমিকেরা চুপ করে থাকে না, মালিকদের হাত থেকে কলকারখানা কেড়ে নেয়। ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে আর কিছু থাকে না, যারা কারখানায় কাজ করে সকলেই কারখানার উপস্বত্ব ভোগ ক'রে, জনগণের দুঃখ ঘুচে যায়।

(ক্রমশঃ)

অন্তর্হিত অন্তস্তল

(গল্প)

—শ্রীপ্রতিমা দেবী

সহরটির মধ্যে বেশ সাড়া পড়ে গেল। তা' পড়বার কথাই। ঝিমিয়ে-পড়া সহরটির ভেতর যেন প্রাণের সাড়া এলো বিশেষ করে মহিলা মজলিসে। সেদিন দুপুরে এই মজলিশটি বসেছিল স্থানীয় উকীল রমেশ মুখুয্যের বাড়ী। উকীল-গৃহিনীকে বেষ্টন করে বসেছিলেন তাঁর সমবয়স্কা কয়েকটি মহিলা ও অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্কা কয়েকটি তরুণী। উকীল গৃহিনী তরুবালা একটি তরুণীকে লক্ষ্য করে বলছিলেন—

"তোমরা আমায় ধরে টেনো না বাছা। ওসব তোমাদের ছেলেমানুষের সাজে। আমার কি এসব মানায় এই বয়সে? পাড়ার পাঁচজন বল্‌বে, দেখ সিং ভেঙ্গে বাছুরের দলে ঢুকেছে।" যে তরুণীটি তীব্র স্বরে প্রতিবাদ করে উঠলো সে হচ্ছে হেল্‌থ অফিসারের স্ত্রী "সাধনা"। এখানে নবাগতা, তা হলেও এই কয়েক মাসের মধ্যেই দশ-জনের মাঝে নিজের স্থানটুকু বেশ কায়েমী করে নিয়েছে। বেশ-ভূষার পারিপাট্য চেয়ে দেখবার মতো। যাকে বলে আলট্রা মডার্ণ। তবে চেহারাখানা খুব বেশী সুবিধার নয় এবং রংটাও তত বেশী ফর্শা নয়। তবু ক্ষীণ দেহলতাখানিকে জড়িয়ে শাড়ী পড়বার ধরণখানি এমনই সুন্দর যে দু'দণ্ড চেয়ে থাকতেই হয়। তার কিউটেক্স রঞ্জিত আঙুল, গাঢ় রক্তিম ওষ্ঠাধর, স্বহস্ত অঙ্কিত ভ্রূযুগল দেখে সমবেত মহিলাবৃন্দ যে মুখ বাঁকাননি তা নয়, তবে সাধনা সে সব হেসে উপেক্ষা করেছে। যাই বল, অতি আধুনিক নামে খ্যাতিলাভ করলেও মেয়েটার কিন্তু দেমাক্ মোটে নেই। সেধে সেধে সে স্থানীয় বাসিন্দাদের বাড়ী, উকীল, মোক্তার নাজির প্রত্যেকের ওখানেই একাধিকবার উঁকি দিয়েছে। আর একটি গুণের জন্যও সে প্রায় প্রত্যেকেরই প্রশংসা অর্জ্জন করেছিল—সেটি তার সুমধুর কণ্ঠ।

সাধনা তরুবালার কথার তীব্র প্রতিবাদ করে বল্লো, "কী যে বলেন আপনি মাসীমা, আপনি না থাকলে এটা আমাদের জমবেই না। আর তো কিছুই না—খাবারগুলো শুধু আগলে বসে থাকবেন, আর যে আসবে তার সামনে এক প্লেটে চার পাঁচখানা লুচি আর এক প্লেটে দেড় হাতা মাংস ধরে দেবেন। খাওয়া হলে পয়সা নিয়ে একটা কৌটোর মধ্যে রেখে দেবেন——বাস্, এই তো আপনার কাজ।" তরুবালা খিলখিল করে হেসে বল্লেন, "হাসাসনি বাপু। ওসব কাজ জন্মে কখনো করিনি। পার্ব্বোনা।"

সাধনা কিন্তু নাছোড়বান্দা। বল্লো, "আপনাকে পারতেই হবে।" আসল ব্যাপার হচ্ছে, আগামী চৈত্র সংক্রান্তির দিন এখানে একটা ফ্যান্সি ফেয়ার হবে উপরওলাদের তত্ত্বাবধানে। এই উপলক্ষ্যে সাধনার উর্ব্বর মস্তিষ্কে এক বিচিত্র প্ল্যানের আবির্ভাব হলো। তারা কি শুধু ফ্যান্সী ফেয়ার দেখেই বেড়াবে? তা হতে পারেনা। এই মেলায় তারাও এক একটা ষ্টল খুলে বসবে। যথা তরুবালাকে দিয়ে লুচিমাংসের ষ্টল, সার্কেল অফিসারের স্ত্রীর চায়ের ষ্টল, স্পেশাল অফিসারের স্ত্রীর শরবৎ-এর ষ্টল ইত্যাদি। এইসব আলোকপ্রাপ্তা মহিলারা রাজী হয়েছেন বটে কিন্তু স্থানীয় অধিবাসীরা এক বাক্যে অস্বীকার করে বসলেন। "তোমাদের কি বাপু? দু'দিন পর অন্য জায়গায় চলে যাবে, আমাদের তো আর তা নয়। নিন্দেয় যে কান পাতা যাবে না।" অবশ্য এ কথাগুলো বর্ষীয়সীদের। তাঁদের মেয়েরা সাধনাদির কথায় নেচে উঠেছিল, কিন্তু মায়েদের চোখে চোখ পড়তেই একেবারে চুপ।

যা হোক, সাধনায় কথায় তরুবালা নিমরাজী গোছের হওয়াতে সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেল্লো। বাড়ী বাড়ী ঘুরে সাধ্য সাধনা করতে তার বড়ো কম পরিশ্রম হয়নি। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে বল্লো, "বেশ, এবার তাহলে আমি যাই মাসীমা।" তরুবালা বল্লেন, "বসোনা বাছা। এই দুপুরে রোদ কমলে পরে যেয়ো।" সাধনা যেতে যেতেই বল্লো, "আমার কি আর এখন বসবার উপায় আছে? মাঝে সাতদিন মাত্র বাকী। এর মধ্যে সব আয়োজন শেষ করতে হবে।" সে বেরিয়ে যাওয়া মাত্র নাজিরের স্ত্রী মন্তব্য করলেন, "এমন অদ্ভুত কথাও জীবনে কখনো শুনিনি। মেয়ে বৌঝিরা গিয়ে দোকান খুলে বসবে!" কথাটা তরুবালায় মনঃপুত হলো না। বল্লেন, "তার আর কি কর্বে ভাই? একালের মেয়েদের সঙ্গে কি আর আমাদের মেলে?" কথাটা নাজির গৃহিনী সুরবালাকে আঘাত করলো। দ্বিগুণ বেগে তিনি আবার তা ফিরিয়ে দিলেন, "তাই বলে আমাদেরও ওদের সঙ্গে মিশে হৈ হৈ করাটা ঠিক নয়।" তরুবালা ক্ষুণ্ণ হয়ে বল্লেন, "কি কর্বো? আমি তো নাই করেছিলাম—কিন্তু এমন করে ধরলে মেয়েটা!" তরুবালা হচ্ছেন সবল প্রকৃতির মানুষ। উপযুক্ত কয়েকটি সন্তান হারিয়ে একান্ত পরনির্ভরশীলা হয়ে উঠেছিলেন। যে যা বলে তাতেই সায় দিয়ে যান—নিজস্ব মত বলে কিছু নেই।

তাদের কথার মাঝখানে আম্ মোক্তারের স্ত্রী স্নেহলতা বলে উঠলো "ওগো ওসব একালের মেয়ে সেকালের মেয়েতে করেনা, এক জাতের মেয়েই আছে ওরকম হুজুগে। ঘরে ওরা টিকতে পার্বে কেন? এই দেখুন না আমাদের শোভা, ডাক্তারের বউ সাধনার চেয়ে বয়সে ছোট বই বড় হবে না—দেখেছেন ওর কেউ কোনদিন কোন রকম বেচাল?" আত্ম-প্রশংসায় লজ্জিত হয়ে সাব-রেজিষ্ট্রারের স্ত্রী শোভাময়ী মুখ নীচু করলো। কিছুক্ষণ পর শোভাময়ী মুখ তুলে বল্লো, "ঘরের মানুষ যদি কড়া হয় তা হ'লে কি আর এসব ব্যাপার ঘটে? হেল্থ অফিসারকে একেবারে ভাড়া বানিয়ে রেখেছে।" স্নেহলতা বল্লো, "তা যা বলেছ মা, আমাদের উনি একদিন আমাকে বল্লেন, রাস্তায় দেখলাম ডাক্তারের স্ত্রীকে—একেবারে যেন ফিলিমষ্টার।" তারা যুগপৎ হেসে উঠলেন। পরক্ষণেই হাসি থামিয়ে স্নেহলতা বল্লো, "দেখুন দিদি শোভাকে আমাদের। ঠোঁটে মুখে রং দিয়ে কোন দিনই সং সাজেনা। তাতে কি ওকে ডাক্তারের বউ-এর চেয়ে খারাপ দেখায়?" শোভাময়ী আবার মাথা নীচু করলো। তরুবালার এসব কথা মোটেই ভালো লাগছিল না। হাই তুলে বল্লেন, "চারটে বাজে। ওঁর কাছারী থেকে ফিরবার সময় হ'লো। জলখাবারগুলো ঠিক আছে কিনা দেখে আসি।" স্নেহলতা উঠে দাঁড়ালেন, "ওমা খেয়ালই নেই যে চারটে বাজে। আমাদের উনিরও যে আসবার সময় হলো।" সেদিনকার সভা এইখানেই ভঙ্গ হলো। রাস্তায় দাঁড়িয়ে শোভাময়ীকে শুনিয়ে স্নেহলতা তরুবালার প্রতি এমন একটি বিশেষণ প্রয়োগ করলেন—যে সেটা আর যাই হোক শ্রুতিমধুর নয়।

* * *

ফ্যান্সী ফেয়ার অর্থাৎ সৌখীন মেলা যে রকম হবে আশা করা গিয়েছিল, কার্য্যক্ষেত্রে দেখা গেল আশাতিরিক্ত। বিস্তীর্ণ ফুটবল গ্রাউণ্ডে এক একটি ছাউনীর নীচে বিচিত্র দৃশ্যপটের অবতারণা হয়েছে। চাকচিক্যে, ঔজ্জ্বল্যে সব দিক দিয়েই নয়নাভিরাম হয়ে উঠেছে। সব ক'টি ছাউনীর ভেতর

বড়ো বড়ো চীনে ফানুস ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ময়মনসিংহের বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী সলিলকুমার এসেছেন উদয়শঙ্করের 'স্নেক-চার্মার' নাচ দেখিয়ে জনমণ্ডলীকে বিমোহিত করবেন। সাব-অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সার্জনের মেয়ে আরতিও নাচ দেখাবে। অবিশ্যি পর্দার পিছন থেকে "শরৎ তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলী" গাইবে তার ছোট বোন্। এই নাচটি তার বিখ্যাত। যত সদরালা বদলী হয়ে আসেন তাঁদের আগমন-সম্বর্দ্ধনা ও বিদায় অভিনন্দনে আরতির এই নৃত্যের সঙ্গেই প্রচ্ছদপট উন্মুক্ত হয়। রবীন্দ্র-সঙ্গীত হবে, আবৃত্তি হবে, ইত্যাদি ইত্যাদি—। ওধারে বসেছেন সার্কেল অফিসারের স্ত্রী। খুলে বসেছেন চায়ের ষ্টল, স্পেশ্যাল অফিসারের স্ত্রী এক টেবিলের ওপর কতগুলো লিমনেডের বোতল সাজিয়ে বসেছেন—সামনে কতগুলো কাচের গ্লাস আর কতগুলো পেতলের। কাঁচের গ্লাস ও পেতলের গ্লাস কাদের জন্য ব্যবহৃত হবে এ আশা করি আপনাদের বুঝিয়ে দিতে হবে না। সব জায়গাতেই তাই। যথা চায়ের ষ্টলে অর্দ্ধেক কাপ চীনেমাটির আর অর্দ্ধেক কলাই-করা। তরুবালার ষ্টলেও অর্দ্ধেক চীনেমাটির প্লেট আর অর্দ্ধেক মাটির। সাব-অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সার্জনের স্ত্রী অর্থাৎ আরতির মার ষ্টলে পান। ইন্‌স্পেক্টর বাবুর স্ত্রী মস্ত দুই পরাতে সাজিয়ে বসেছেন চীনে-বাদাম আর ডালমুট ভাজা। সর্ব্বোপরি সাধনা সাজিয়ে বসেছিল এক দোকান! খালি পাউডারের কৌটোয় কয়লা খুব মিহি করে গুঁড়ো করে ভরে তার গায়ে লেবেল আটকেছে "অলৌকিক দাঁতের মাজন"। খড়ির গুঁড়ো আর সিঁদুর একত্র মিশিয়ে ছোট্ট এক টিনে ভরে নাম দিয়েছে "রক্তিমাভা কুঙ্ক"। নারকোল ও গুড় সহযোগে টিপির ন্যায় এক দ্রব্যের সৃষ্টি করেছে, নাম—দেশীয় সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যকর প্লাম্ কেক্। বড় বড় বীচে কলা—এক বৃহৎ থালায় সাজানো। তার উপর প্ল্যাকার্ড মারা—মাদ্রাজের সুবৃহৎ মিষ্ট কদলী। আমি সংক্ষেপে সারলাম—এই রকম আরো বহু দ্রব্যের সমাবেশ ছিল। সহরের সমস্ত গণ্য-মান্য ব্যক্তিরা এই ফ্যান্সী ফেয়ার পরিদর্শন করতে আসবেন। প্রথম দফায় এলেন স্থানীয় বাসিন্দারা—তাঁদের অধিকাংশই অবিশ্যি আগে থাকতেই এসে হাজিরা দিয়ে-ছিলেন। তারপর একে একে আসতে লাগলেন গগনারোহী ব্যক্তিবৃন্দ সস্ত্রীক। এখানে গগনারোহী শব্দটা কাদের প্রতি নিয়োগ করেছি আপনারা নিশ্চয়ই বুঝেছেন, অন্য অর্থ বুঝে আবার আমাকে দোষ দেবেন না।...এদিকে দূর থেকে তরুবালার অবস্থা দেখে সাধনা একটু ভয়ই পেয়ে গেল। মাটির বাসনগুলোর কাজ যতক্ষণ চলছিল ততক্ষণ তিনি বেশ ভালই ছিলেন, মানে বেশ হাসি খুশীই ছিলেন—কিন্তু এইবার চীনে মাটির বাসন ব্যবহার করতে হবে, সামনের দিকে দু' একটি 'শ্বেত বয়ান' উঁকি মারছে। এই দেখেই তো তরুবালা হকচকিয়ে গেলেন। অসহায় ভাবে চারিদিকে চাইতে লাগ্‌লেন। সাধনা আর স্থির থাকতে পারলো না। তরুবালার ষ্টলের দিকে এগিয়ে গেল। সাধনাকে দেখে তিনি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। বল্লেন—"ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি। আমার দ্বারা এসব কাজ হবে না বাপু, অন্য কাউকে দাও।" সাধনা
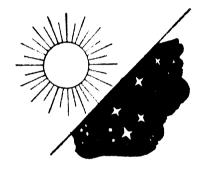
বল্লো—"কিছু ভয় নেই মাসীমা, আমি এই আপনার কাছেই রইলাম।" কথাটা শেষ হওয়ার সঙ্গেই সাধনার চোখ পড়লো চীনে বাদামের ষ্টলের দিকে। স্বল্প পরিচিত এক ভদ্রলোক সস্ত্রীক দাঁড়িয়েছিলেন। অবিশ্যি সাধনা তাঁদের পেছন দিকটাই দেখতে পাচ্ছিল। ভদ্রমহিলার টিস্যু শাড়ীর প্রখর রংটা তার চোখ ধাঁধিয়ে দিলে, তা' ছাড়া তাঁর দীর্ঘ শরীরের গড়নখানি সাধনাকে কৌতূহলী করে তুল্লো। এমন ফিগার বাঙ্গালী মেয়েদের মধ্যে সচরাচর দেখা যায় না। সেই দিকে তরুবালার দৃষ্টি আকর্ষণ করে সাধনা বল্লো, "দেখছেন মাসীমা কেমন লম্বা মেয়েটি? নিশ্চয় বাঙ্গালী নয়।" ততক্ষণে তাঁরা ঘুরে দাঁড়িয়েছেন। তরুবালা মেয়েটির দিকে চেয়ে বল্লেন—"ওমা, রাজরাণীর মতো চেহারা বটে—।" সাধনাও চেয়ে দেখলো। বাস্তবিকই ইন্দ্রাণীর মতো চেহারা। আর একবার ভালো করে চেয়ে দেখে সাধনা ছুটে গিয়ে প্রায় ভদ্র মহিলাকে জড়িয়ে ধরে বল্লো, "মিন্টু—"? ভদ্রমহিলা বিস্মিত হয়ে তার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন—পরে দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে বল্লেন, "আপনি...তুমি সাধনা—"সাধনা প্রায় চীৎকার করে বল্লো "হ্যাঁ গো হ্যাঁ, আমি সাধনা। কি আশ্চর্য্য ভাই, এতদিন পরে এখানে যে দেখা হবে—কে জানতো?" সাধনার আনন্দের ছোঁয়াচ—মিন্টু ওরফে মৈত্রেয়ীর গায়েও লাগলো। উল্লসিত কণ্ঠে বল্লো, "সত্যি ভাই, এতদিন পর কেমন অদ্ভুত ভাবে দেখা হ'লো বলতো।" বহু কথা তাদের মনে তখন ভীড় করে এসে দাঁড়িয়েছে, কোনটা আগে কোনটা পরে বলবে ঠিক করতে না পেরে মৈত্রেয়ী শুধু স্বল্প-পরিচিত ভদ্রলোককে দেখিয়ে বল্লো—"আয় তোদের পরিচয় করিয়ে দিই—ইনি হচ্ছেন আমার--বুঝতেই পারছিস্। আর ইনি হচ্ছেন আমার বাল্যবন্ধু সাধনা। একই সঙ্গে আমরা ম্যাট্রিক পাশ করেছিলাম—তারপর আর দেখা শোনা হয়নি—ওঁর বাবা বদলী হয়ে চলে গেলেন।" দুজনে নমস্কার বিনিময় করলেন। মৈত্রেয়ী সাধনাকে জিজ্ঞেস করলো "তোর কর্ত্তাটি কোথায়?" সাধনা বল্লো—"কে জানে? কোথায় ঘোরাঘুরি করছে?" এটা সাধনার মিথ্যা কথা। হেল্‌থ অফিসার বহু পূর্ব্বেই এখানে এসে জুটেছেন। সাধনার ষ্টলে গিয়ে তার অপূর্ব্ব দ্রব্যসম্ভারের প্রতি দু' একটি মন্তব্য করতেও ছাড়েননি—পরক্ষণেই অবিশ্যি তাড়া খেয়ে পালিয়েছেন। কাছাকাছিই ছিলেন, দু পা এগুতেই দেখা গেল ইন্‌সপেক্টর বাবুর সঙ্গে মহা উৎসাহের সঙ্গে কিসের গল্প জুড়ে বসেছেন। দেখতে

মানুষটি নিরীহ হলেও ভেতরে রসের অভাব ছিল না। স্ত্রীর ইঙ্গিতে তাদের কাছে এসে দাঁড়ালেন। সাধনা পরিচয় করিয়ে দিল—"আমার বাল্যবন্ধু মৈত্রেয়ী ও ইনি তাঁর স্বামী……" হেসে হেল্‌থ অফিসার তাকে থামিয়ে দিয়ে বল্লেন—"আমার সঙ্গে ওঁর পরিচয় আছে।" সহাস্যে দুই ভদ্রলোক নমস্কার বিনিময় করলেন। সাধনা একটু বিস্মিত হয়েই বল্লো "তোমার সঙ্গে কোথায় এঁর আলাপ হলো?" মন্মথবাবু (হেল্‌থ-অফিসার) বল্লেন "এইখানেই, ক্লাবে—বোধ হয় দিন দশেক আগে। এখানে ওঁরা আমাদের চেয়েও নবাগত, বোধহয় দিন কুড়ী হবে এসেছেন।" দুই সখীর মনের মধ্যে একই প্রশ্ন তোলপাড় করছিল—বহুকষ্টে মুখ বুঁজে আছে। মন্মথবাবু রসিক মানুষ, ধরে ফেল্লেন। আর এক দফা পরিচয় করিয়ে দিলেন—"ইনি হচ্ছেন এখানকার মুন্সেফ প্রবোধ চন্দ্র সেন—" সঙ্গে সঙ্গে ঐ তরফ থেকেও শোনা গেল—"আর ইনি হচ্ছেন এখানকার হেল্‌থ অফিসার মন্মথকুমার সান্যাল।" দুই সখী হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো।

বহুদিন পরে দুই বাল্যবন্ধুর দেখা হওয়াতে যা স্বাভাবিক তাই ঘট্‌লো। হাসি, গল্পে চটুলবাক্যালাপে তারা সর্ব্বদাই মুখরিত। এমন একদিন বাদ যায়না যেদিন তাদের দেখা না হয়। হয় সাধনা যাবে মৈত্রেয়ীর বাড়ী, না হয় মৈত্রেয়ী আসবে সাধনার বাড়ী। দুই সখীর গল্পের স্রোত অফুরন্ত ধারায় প্রবাহিত হ'তে থাকে। সেদিন মন্মথবাবু স্ত্রীকে বলছিলেন "কি গো আমরা একেবারে অপাংক্তেয় হয়ে গেলাম নাকি?" ইমিটেশন ভ্রূ লতা কুঞ্চিত করে সাধনা বল্‌লো "কি রকম?" থতমত খেয়ে মন্মথবাবু বল্‌লেন "এই আজকাল আঁখির প্রসাদ থেকে একেবারে বঞ্চিত হয়েছি কিনা তাই বল্‌ছি।" স্ত্রীর ভ্রূকু কোঁচকানোকে তিনি বড়ো ভয় করতেন। মন্মথবাবুর কথার উত্তরে "যত সব ঢং" বলে মুখ ঘুরিয়ে সাধনা চলে গেল।

……সেদিন মৈত্রেয়ী ও প্রবোধবাবুকে সাধনা রাত্রে খাওয়ার নিমন্ত্রণ করেছিল। খাওয়া দাওয়া হ'তে বেশ একটু রাত হ'লো। চারজনে গিয়ে তাঁরা বসলেন বারান্দায়। সুন্দর চাঁদনী রাত ছিল। খানিকটা সময় গল্পগুজব করে কাটাবার পর প্রবোধবাবু বল্‌লেন—"মিসেস্ সান্যাল চমৎকার গান করেন শুনেছি, আমরা কি দু'একটা শুনতে পারিনা?" মৈত্রেয়ীও বল্‌লো—"সত্যি সাধনা একটা গান শোনা। সেই তখন কেমন চমৎকার গান করতিস এখন সব ছেড়ে দিয়েছিস্ নাকি? জানো?" স্বামীকে উদ্দেশ করে মৈত্রেয়ী বললো "সাধনার অনেক কাপ, মেডেল প্রাইজ আছে। যে কোন গানের প্রতিযোগিতায় ও বরাবর প্রাইজ পেয়ে এসেছে।" "বটে?" প্রবোধবাবু বল্‌লেন, "তবে আজকে একখানা গান না শুনে উঠছি না।" গানের জন্য সাধনাকে কোনকালেই পীড়াপীড়ি করতে হয় না, এ ক্ষেত্রেও করতে হ'লো না। কোন বিনয় বচন অথবা দ্বিতীয় বাক্য ব্যয় না করে সে গান ধরলো। সাধনার কণ্ঠস্বর বাস্তবিকই ভালো—চাঁদের কুয়াশা ও সঙ্গীত মাধুর্য্যে এক অপূর্ব্ব মায়াজাল সৃষ্টি করলো।…তিনজন শ্রোতাই বিমুগ্ধ হয়ে গান শুনছিলেন। মিনিট পনেরো পর থাম্‌তেই প্রবোধবাবু চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে বল্‌লেন—"স্‌প্লেনডিড।" উপবিষ্ট আর দু'জন শ্রোতার মধ্যে একজনের মুখে একটু আঁধার ঘনিয়ে এলো যেন……না আমাদেরই চোখের ভুল হবে হয়তো। প্রবোধবাবু বলছিলেন "এমন চমৎকার গলা আপনার—বড় একটা শোনা যায় না…।" মন্মথবাবু বল্‌লেন "এবার মিসেস সেনের পালা।" উচ্চকণ্ঠে তাকে থামিয়ে দিয়ে প্রবোধবাবু বললেন—"ও রসে বঞ্চিত দাস গোবিন্দ।" সাধনা বল্‌লো, "কেন মিস্ তো
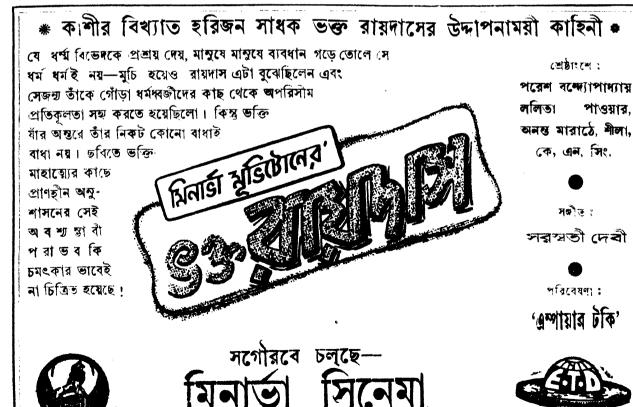
আগে গান গাইতিস এখন গাসনা ?" "সর্ব্বনাশ" প্রবোধবাবু উত্তর দিলেন "বউভাতের দিন একখানা গান করেছিলেন বটে, শুনে আমি ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়বো কিনা ভাবছিলুম।

তাঁর কথা বলবার ভঙ্গী দেখে সাধনা খিল্ খিল্ করে হেসে উঠলো। মৈত্রেয়ীও নাকের মধ্যে দিয়ে অস্পষ্ট ভাবে একটা হাঁসির আওয়াজ বের করলো। সহসা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক ভাবে মন্মথবাবু বল্লেন, "মিসেস্ সেনকে দেখে প্রথমটা আমি বাঙ্গালী বলে চিন্‌তেই পারিনি। এমন সুন্দর টল্ ফিগার আর অমন চমৎকার ফর্শা রং বাঙ্গালীদের মধ্যে দেখাই যায় না।" মৈত্রেয়ী আন্তরিক সৌজন্যের হাসি হাসলো। প্রবোধবাবু বল্লেন "এরকম ফিগার আর এ রকম রং দেখেই তো বিয়ে করে নিয়ে এলাম—"হো হো করে হেসে উঠলেন তিনি। মৈত্রেয়ীর মনের মেঘ অনেকটা কেটে গেল। কিন্তু সহসা সাধনার কপালের শিরা দুটো দপদপ্ করে উঠলো। কিছুক্ষণ থেকেই মাথাটা ধরে আছে বটে।......সেদিন তাঁদের গল্প গুজব আর ভালো করে জমলো না। অল্পক্ষণ পরে মুস্তেফবাবু সস্ত্রীক তাঁদের বহু ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিলেন।......হেঁটেই তাঁরা বাড়ী ফিরছিলেন। সারাটা রাস্তা মুখরা হাস্যোচ্ছলা মৈত্রেয়ী গম্ভীর হয়ে নিঃশব্দেই কাটালো। প্রবোধবাবু দু'একবার কথা বল্‌তে চেষ্টা করেছিলেন বটে কিন্তু প্রত্যুত্তর গুলো বিশেষ সুবিধাজনক মনে হচ্ছিল না। অতএব চুপ করে গেলেন। বাড়ী ফিরে কি একটা জিজ্ঞেস করে মৈত্রেয়ীর কাছে এমন এক অস্তগূঢ় বাক্য শুনলেন যে দ্বিতীয় বাক্য উচ্চারণ না করে তাড়াতাড়ি সুবোধ বালকের মতো জামা কাপড় বদলে একেবারে বিছানায় গিয়ে আশ্রয় নিলেন। (ক্রমশঃ)

দারোগার দপ্তর

(কলিকাতার মাননীয় পুলিশ কমিশনার মহোদয় কর্ত্তৃক প্রচারিত)

১৯৪৪ সালের মার্চ্চ মাসের চুরির তালিকা।

৫৬টী পকেটমারের মধ্যে ৩০টী ধৃত হইয়াছে, পূর্ব্ববর্ত্তী মাসের পকেটমারের সংখ্যা ছিল ৫৬টী। দিনমানে ৬৪টী ও রাত্রিতে ২৫০টী তালা ভাঙ্গিয়া চুরির মধ্যে ৫৪টী ধরা পড়িয়াছে। গতমাসের তালা ভাঙ্গিয়া চুরির সংখ্যা ছিল দিনে ৪৪টী ও রাত্রিতে ২৬৯টী। ইহাদের মধ্যে ১৫টী কেশ মোটর গ্যারেজ ভাঙ্গিয়া মোটর পার্টস্ এবং ১৫টী ইলেকট্রিক বাল্‌ব্ চুরি। বহু অপহৃত মোটর পার্টস্ ও বাল্ব চোর গ্রেপ্তার হয়। সবগুলিই বিচারাধীনে আছে। চাকরের দ্বারা চুরি ১১৫টীর মধ্যে ৫০টী ধৃত হইয়াছে। গত মাসে চুরির সংখ্যা ছিল ১১১। সাইকেল চুরির সংখ্যা বাড়িয়া ৪১টী হইয়াছে। গতমাসের চুরির সংখ্যা ছিল ১৮টী।

গুণ্ডা আটকের সংখ্যা সর্ব্বসমেত ৬,৬০০। ১৯৪৪ সালের মার্চ্চমাসে ৪৪টী শিশু সন্তান হারাইয়াছে। ৭টী উপেক্ষিত সন্তান রাস্তায় কুড়াইয়া পাওয়া গিয়াছে এবং থানায় জমা দেওয়া হইয়াছে। পরে ভারতীয় শিশু সন্তান সংরক্ষণ সমিতিতে তাহাদিগকে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

এক নূতন উপায়ে চুরির পন্থা আমাদের কানে আসিয়াছে। মিউনিসিপ্যালিটি এবং ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের জাল ফর্ম্মে কোনও ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম্মের নিকট কোনও ভাঙ্গা দ্রব্যের মেরামতের অর্ডার দিয়া তাহাদিগকে জানান হয় যে রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে জিনিষগুলি ডেলিভারী লইতে হইবে। তাহার পরই এক একখানি ঐরূপ জাল ফর্ম্মে চিঠি আসে যে রেলওয়ে রসিদসহ প্রেরিত লোককে রেলের ভাড়া দিলে সহজে [illegible] ডেলিভারি লইবার সুবন্দোবস্ত করিবে। পরে জাল রেলওয়ে রসিদ লইয়া এক ব্যক্তি আসিয়া ভাড়ার টাকা লইয়া উধাও হয়। অনুসন্ধানে জানা গেল এ [illegible] জাল। কোন ফার্ম্ম এইরূপ অর্ডার [illegible] তৎক্ষণাৎ ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের [illegible]গোচর করিবেন।

মাঝারী উচ্চতাবিশিষ্ট, কালো, মোটা, গোঁফ এবং দাড়ি কামানঃ খাকির হাফ্ প্যান্ট ও সার্ট পরিহিত ৩০ বৎসর বয়স্ক এক ব্যক্তি কর্পোরেশনের মিস্ত্রি বলিয়া পরিচয় দিয়া গৃহস্থের বাড়ীর জলের ট্যাঙ্ক পরীক্ষা করিবার অজুহাতে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া মূল্যবান দ্রব্য যাহা নিকটে পায় তাহা লইয়া পলায়ন করিয়া কতকগুলি নতুন ধরণের চুরি করিয়াছে। গৃহস্বামী তাঁহাদের চাকরদের বিশেষ ভাবে আদেশ দেন যেন কোন অপরিচিত ব্যক্তিকে গৃহে প্রবেশ করিতে না দেয় এবং এইরূপ সন্দেহ হইলে সেই ব্যক্তিকে আটকাইয়া নিকটস্থ থানায় খবর দেয়।

রূপচর্য্যা

সহজ ইঙ্গিত

—শ্রীশ্যাম বসাক

(১)

অঙ্গরাগের সাহায্য নিয়ে দেহের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যকে কতকটা বাড়ানো যায় একথা যেমন অস্বীকার করা চলে না—তেমনই এও স্বীকার করে নিতে হয় যে যতদূর সম্ভব কম অঙ্গরাগ ব্যবহার করেও কতকগুলো খুব সহজ নিয়ম পালনের দ্বারা দেহের স্বাভাবিক লাবণ্যকে অনেকটা বাড়ানো এবং অম্লান রাখা যায়।

ক্রীম, পাউডার, রুজ প্রভৃতির সাহায্য নেওয়াটাই রূপচর্য্যায় সাফল্যলাভের একমাত্র পথ নয়। আনুসঙ্গিক আরও নানা ব্যাপার আছে। সেগুলিও অবহেলার নয় বরং রূপচর্য্যার সহায়ক। রূপচর্য্যার অন্তর্নিহিত এই মর্ম্ম অনেক স্থলেই অবজ্ঞাত অবস্থায় থেকে যায়। তার ফলে অন্যান্য প্রয়াসও বহু ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হয়।

রূপচর্য্যার প্রয়োজন ও আবেদনের যে কয়টী দিক রয়েছে সেগুলির প্রত্যেকটাই হচ্ছে উদ্দেশ্যমূলক। এই উদ্দেশ্যগুলিকে যদি যথাযথ ভাবে বিচার করা যায়, তবে দেখা যাবে যে সেগুলি কোন না কোন প্রকারে কল্যাণেরই সূচনা করে। এজন্য প্রয়োজন সময়, শ্রম ও শিক্ষার। অল্প আয়াসে সৌন্দর্য্য লাভ করার প্রচেষ্টা কোন ক্রমেই আশানুরূপ হয় না। সচেতন মন নিয়ে যদি প্রত্যহ রূপচর্য্যার সহায়ক কয়েকটী সহজ নিয়ম একাগ্রতার সঙ্গে ঠিকমত পালন করা যায় তবে সৌন্দর্য্য সাধনায় আশানুরূপ ফল লাভের পথ অনেকটা সরল হয়ে ওঠে এবং সময় ও শ্রম ব্যয় করার জন্য আর আক্ষেপেরও তেমন কারণ থাকে না। এইভাবে রূপচর্য্যার গোড়া পত্তন করে সেই সঙ্গে আবশ্যকানুযায়ী রূপবর্দ্ধক দ্রব্যাদির সাহায্য নিলে দেহের স্বাভাবিক লাবণ্য যথেষ্ট পরিমাণে মাধুর্য্যময় হয়ে ওঠে।

রূপবর্দ্ধক দ্রব্যাদির ব্যবহার প্রসঙ্গে প্রধানতঃ সেই সকল জিনিষের নাম করা হবে যেগুলি তেমন ব্যয়-বহুল নয় এবং প্রায় প্রত্যেকটাই হাতের কাছে পাওয়া যায়, সংগ্রহ করার জন্য বাড়ীর বাইরে যেতে হয় না। এই সমস্ত উপকরণ দামের দিক দিয়ে যথেষ্ট সুলভ হলেও উপকারিতায় অনেক দামী এবং নামী অঙ্গরাগেরই সমান—এ প্রমাণ নিয়মিত কিছুদিন ব্যবহার করার পর বেশ বোঝা যায়। কথাটা শুনলে প্রথমে বিশ্বাস না হবারই কথা। নানারকমের ভাল ভাল অঙ্গরাগ ব্যবহার করা সত্ত্বেও আশানুরূপ ফল না পাওয়ার পর যদি বলা যায় যে সামান্য জিনিষ ব্যবহারের দ্বারা অসামান্য ফল পাওয়া সম্ভব—তবে সত্যিই তা বিশ্বাস হয় না, কিন্তু বিষয়টী উপেক্ষারও নয়। যেমন দুধ, মধু, শশা, গাজর প্রভৃতি আরও অনেক জিনিসের নাম করা যেতে পারে যেগুলি প্রকৃত পক্ষেই রূপচর্য্যায় সাফল্য লাভের সহায়ক। এসব ছাড়া জল, হাওয়া, রোদও যথেষ্ট সাহায্য করে।

যে সব সহজ নিয়ম পালনের কথা বলা হবে সেগুলি সাধারণভাবে সকলের পক্ষেই উপযোগী, কিন্তু এটা ব্যক্তিগত ব্যাপার। প্রত্যেক বিষয়ে নিজেই মনোযোগী হতে হবে। বিরক্তি বা অনিচ্ছা এ পথে বিঘ্নের সৃষ্টি করবে। খুসী মনে ফলপ্রাপ্তির আশা নিয়ে ধৈর্য্যের সঙ্গে চললে যে নিরাশ হতে হবে না একথা জোর করে বলা যায়।

এবার যে সব বিষয়ের অবতারণা করব সেগুলি নতুন নয়, বহুদিনের পুরানো এই জানা কথা কেবলমাত্র তাঁদেরকেই জানাচ্ছি যারা জানেন না, যাঁরা জানেন তাঁদেরকে নয়।

বিজনদা'র চিঠি

আমার আদুরে ভাই বোনেরা,

তোমরা জানতে চেয়েছ যে তোমাদের লেখা উপন্যাসটার শেষাংশ কে লিখছেন… ওর উত্তরে আমি কেবল এইটুকুই আজ তোমাদের জানাবো যে, ওটা লিখছেন তোমাদেরই একজন প্রিয় লেখক। নামটা জানতে পারবে পরে যখন ঐ অংশটা ছাপা হবে।…কবিতার কোন বিভাগ নেই বলে অনেকে ঐ বিভাগটা খুলতে বলেছ দেখলাম। কবিতার বিভাগ খোলবার ইচ্ছে আমারও আছে তবে ভাল কবিতা পাইনা বলেই তা' ছাপিনা। তা' পেলে যথাসময়ে ছাপাবো। আমার কবিতার দপ্তরে তোমাদের লেখা যে সব কবিতা আছে তা একটাও ছাপার উপযুক্ত নয়।…প্রতিযোগিতায় সকলে যোগদান করছো তো?…আজ আসি। স্নেহ নিও। তোমাদের বিজনদা

রাণু আর তার দাদা

(৩)

রূপকুমার

দাদা,

তোমার চিঠি পেয়ে কি যে আনন্দ হ'লো তা' তোমায় লিখে জানাবার মত ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না।…বেশ, মা'র কথার অবাধ্য আর হবো না। কাকাবাবুকেও আর বিরক্ত করবো না যদি তোমার কাছ থেকে প্রত্যেকবার এমনি চিঠি পাই। পৃথিবীর সম্বন্ধে জানবার আগে তুমি "সৌরজগৎ" সম্বন্ধে যা বলেছ তা শুনে সে সম্বন্ধেই কতকগুলো প্রশ্ন মনে উঠেছে। আগে সেগুলোর উত্তর দিয়ে তারপর পৃথিবীর সম্বন্ধে বলো। সূর্য্যের চারিদিকে যে সব গ্রহ ঘুরছে তারা সকলেই কি সূর্য্য থেকে সমান দূরে আছে?… ঐ গ্রহগুলোর কতদিন সময় লাগে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করতে?…আচ্ছা দাদা, এই যে গ্রহগুলো নিয়ে সৌরজগতের সৃষ্টি হয়েছে এরা কি সবাই সমান আকারের? যদি তা' না হয় তা'হলে কোন গ্রহটা এর মধ্যে সবচেয়ে বড় আর কোনটা সবচেয়ে ছোট?… ভালো কথা মনে পড়েছে, সৌরজগতের গ্রহগুলো যে ঘুরছে এ সত্য আবিস্কার করলেন কে?…আজ এই পর্য্যন্ত থাক, এর পরের বারে সূর্য্য সম্বন্ধে আমার মনে যে সব প্রশ্ন জেগে উঠেছে তা জিজ্ঞেস করবো।… আশা করি কুশলে আছো। এখানকার খবর সব ভাল। প্রণাম নিও।

তোমার বোন: রাণু

মনে রেখো

"চাই বিদ্যা, চাই জ্ঞান, নিষ্কলঙ্ক মন,
উদার মহৎ প্রাণ, চরিত্র শোভন;
মিথ্যা ছলাহিংসা দ্বেষ ক্ষুদ্রতা সংশয়
সেবা-প্রেমে সবে যেন করি মোরা জয়!
মানবের ক্ষুদ্র আয়ু, প্রেম অফুরাণ—
বর্ষে নয়, ভালবেসে করি পরিমাণ।

—বসন্তকুমার।

—শ্রীঅচিন্ত্য কুমার মিত্র (৯৫২)

পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট আকারের বইয়ের সন্ধান পাওয়া যায়, পোল্যাণ্ডের ওয়ার্সতে। এখানা [illegible] ইঞ্চি ও [illegible] ইঞ্চি চওড়া। এতে ১২০ খানা পাতা ও কয়েকটা ছবিও আছে।

* * *

ইংল্যাণ্ডের রাণী এলিজাবেথের সময় যারা দাড়ি রাখতো তাদের ৩ শিলিং, ৪পেন্স (২।৴০) করে ট্যাক্স দিতে হতো ঠিক ১৫ দিন অন্তর।

* * *

ভিক্টর ক্লিস নামক এক ইংরাজ একটানা চার বছর ঘুমিয়ে কাটিয়েছিলেন।

হঠাৎ ?

—শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন দেব (৭৮৬)

আমেরিকার রেম্‌সেন্‌ নামে এক বৈজ্ঞানিক আলকাতরা নিয়ে পরীক্ষা করতেন। একদিন কাজ করার পর তিনি বাড়ী গিয়ে খেতে বসলেন। তাড়াতাড়িতে সেদিন তিনি কাঁটা চামচ না নিয়ে হাত দিয়েই খাচ্ছিলেন। খেতে বসে দেখেন যে জিনিষই তিনি খান সেটাই খেতে মিষ্টি লাগছে। তখন তিনি তো রেগে গেলেন। ক্ষিদের সময় ঠিকমত খেতে না পারলে কার না রাগ হয়? তখন রাঁধুনিকে খুব বকুনি দিয়ে তিনি না খেয়ে হাত মুখ ধুয়ে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ তাঁর হাতটা মুখে লাগল। তিনি অবাক হয়ে গেলেন। কি আশ্চর্য্য! হাতটা আবার মিষ্টি লাগছে। হাত ধুয়ে আবার মুখে দিলেন, আবার সেই মিষ্টিই লাগল। হঠাৎ তাঁর মনে সন্দেহ হ'ল। তিনি তাড়াতাড়ি তাঁর লেবরেটারিতে গিয়ে সব জিনিষগুলো এক এক করে পরীক্ষা করতে লাগলেন। শেষে তিনি দেখলেন যে একটা পাত্রে অদ্ভুত রকম মিষ্টি একটা জিনিষ পড়ে রয়েছে। বুঝলেন সেজন্যই তার হাত মিষ্টি লেগেছিল। এই মিষ্টি জিনিষটাই বর্ত্তমানকালে 'স্যাকারিন্‌' নামে সবার কাছে পরিচিত হয়।

টুকে রাখো

(১) পৃথিবীতে যত অভ্র (mica) ব্যবহৃত হয়, তাহার শতকরা প্রায় ৮০% ভারতীয় অভ্র।

(২) ভারতীয় রেলওয়েতে শতকরা ৪৬% Ton mileage এক কয়লার গাড়ীতেই অধিকার করিয়া রহিয়াছে।

(৩) গত তিনমাসে বাংলার দুর্ভিক্ষে সৈন্য বিভাগ দশলক্ষ মণের উপর খাদ্যশস্য চালাচালি করিয়াছেন। এই কাজে প্রায় ৩ লক্ষ ৭০ হাজার মাইল চলাচল করিতে হইয়াছে।

(৪) গত মহাযুদ্ধ অপেক্ষা বর্ত্তমান যুদ্ধে gasoline-এর খরচ প্রায় ৮০ গুণ বাড়িয়াছে।

(৫) বর্ত্তমান ভারতে ১৩৫০০ মোটর গাড়ী গ্যাসে চলিতেছে: ৮৫০০ বাস, ৩৫০০ লরি, ১৫০০ মোটর গাড়ী ইত্যাদি। ইহার দ্বারা ২০ লক্ষ গ্যালন পেট্রোলের আমদানি কমিয়াছে।

(৬) ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতীয় রেলওয়েতে আধ মিলিয়ান টনেরও কম সামরিক ট্র্যাফিক ছিল। ১৯৪২-৪৩ সালে ইহা বাড়িয়া ১২.৯ মিলিয়ান টনে উঠিয়াছে।

—B. S. N. S.

নতুন বই

অভিযান সিরিজ—(১) প্রকাশক শ্রীসত্য কুমার রায়, অভিযান পাবলিশার্স, কলিকাতা। দাম আট আনা।

আজকের বাজারে বই বারকরা যে কত শক্ত কাজ তা' তোমরা সবাই জানো। কিন্তু আশ্চর্য্য করেছেন এই অভিযান সিরিজের প্রকাশক। তোমাদের জন্যে প্রতিমাসে এই সিরিজের একখানা করে বই উপহার দেবার ব্যবস্থা করেছেন।

এই সিরিজের এটি প্রথম বই। এ বইখানি "নিশি-পট" নামে একটা সম্পূর্ণ নতুন ধরণের উপন্যাস। এখানির লেখক হচ্ছেন তোমাদেরই একজন প্রিয় লেখক শ্রীযুক্ত অখিল নিয়োগী। তোমাদের এই লেখকের লেখা আর সব বই যেমন খুসী করেছে, এখানা তার থেকে তোমাদের বেশী খুসী করতে পারবে বলে আমি আশা করি।

ছাপা, কাগজ ও রঙীন প্রচ্ছদপট সুন্দর হয়েছে। —শ্রীবি

খেলার মাঠে

শ্রীউমেশ-মল্লিক বি, এ

মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব একটি বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান। অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে প্রথম ডিভিসনের খেলায় এ দলটি যে রেকর্ডের সৃষ্টি করেছে বাঙ্গলা দেশের ফুটবল খেলার সুদীর্ঘ ইতিহাসে তার তুলনা পাওয়া যায় না। এ দলটি এ বৎসরে এখন পর্য্যন্ত লীগে কোন প্রতিযোগিতা করেনি। শুনা যায় মহমেডান দলের খেলোয়াড়ের অভাব। মহমেডান স্পোঃ ক্লাবের মত এত বড় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১১ জন খেলোয়াড় সংগ্রহ করা যায় না এটা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয়। স্থানীয় খেলোয়াড়দের পরিবর্ত্তে এঁরা ইতিপূর্ব্বে ভারতবর্ষের নানা স্থানের খেলোয়াড় সংগ্রহ করে ফুটবল জগতে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিল। স্থানীয় খেলোয়াড়-দের সুযোগ না দেওয়ার জন্য এই যে সমস্যার উদ্ভব হয়েছে এ দিকে ক্লাব কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য ছিল। ইতিপূর্ব্বে লীগ পরিচালকমণ্ডলীর আশ্বাসে গত ১২ই মে পর্য্যন্ত এ দলের যোগদানের দিন স্থগিত রাখা হয়েছিল। কিন্তু মহমেডান স্পোঃ ক্লাবের বিশেষ অনুরোধে ইণ্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়েশন গত ১৩ই মে পর্য্যন্ত তাদের খেলোয়াড় সংগ্রহের সুযোগ দিয়েছেন বলে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। মহমেডান দলের যোগ-দানে এ বৎসরের বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বীতাগুলি যে প্রতিযোগিতামূলক হয়ে উঠবে তা বলাই বাহুল্য। গতকল্য মহমেডানদলের প্রথম খেলা হয়ে গেছে ই, বি, দলের বিপক্ষে।

লীগ চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান দলের অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে ডালহৌসী দল। গত শনিবারের এই খেলাটিতে মোহনবাগান দল ১-১ গোলে অমীমাংসিত ভাবে খেলা শেষ করে একটি মূল্যবান পয়েণ্ট নষ্ট করেছে। এর জন্য আক্রমণ বিভাগই দোষী। যে প্রকার সুযোগের অপব্যবহার করেছে মোহনবাগান দল অনুরূপ সুযোগ প্রতিপক্ষ দল পেলে তাদের পক্ষে জয়লাভ সহজসাধ্য হ'ত। বি, বসুর খেলা প্রথম দিন ভাল হলেও সুযোগের অসদ্‌ব্যবহারের জন্য পরের খেলাগুলি দেখে মনে হয় যে, সেণ্টার ফরওয়ার্ডের সমস্যা মোহনবাগানের এখনও সমাধান হল না। আক্রমণ বিভাগে কে, রায় ব্যতীত সকলেই নিম্নস্তরের খেলা দেখান। ভৌমিকের খেলা চোখে লাগেনি। এন্, বোস বড় স্বার্থ-পর ভাবে খেলেন। প্রয়োজনীয় গোলটির জন্য অবশ্য এন, বোসের কৃতিত্ব স্বীকার্য্য। ডালহৌসী দলের সুচতুর বল আদান প্রদানের পদ্ধতিতে এ দিনের খেলাটি তাদের ভালই হয়। লিঞ্চ নামক খেলোয়াড়টি দ্বিতীয়ার্দ্ধের ৫ম মিনিটে বেণীপ্রসাদের দোষে-ফ্ল্যাগ-কিক থেকে গোল দেয়।

গত মঙ্গলবার মোহনবাগান দল স্পোর্টিং ইউঃ দলের বিরুদ্ধে বিপক্ষতা করে টি, আও প্রদত্ত এক গোলে কোনক্রমে জয়ী হয়।

গত শুক্রবার ইষ্টবেঙ্গল দল কালীঘাটকে ১—০ গোলে পরাজিত করেছে। এ বৎসরের খেলায় ইঃ বিঃ দলের এই চতুর্থ জয়লাভ। তবে এ কথা অবশ্য স্বীকার করতে হবে যে কালীঘাট যে ভাবে এ দিন প্রতিযোগিতা করেছে তাতে তাদের প্রশংসা করা উচিত। ইঃ বিঃ দলের অবশ্য ২টি গোল পরিচালক অগ্রাহ্য করেন। বিচারকের বিচার সম্বন্ধে অনেকের সন্দেহ থাকলেও স্বরাজ ঘোষের শেষ সময়ের গোলটি সম্বন্ধে সন্দিহান হবার কারণ নেই। কালীঘাট দলের সেণ্টার হাফ্ ডি,চন্দ্র এক কথায় চমৎকার। রক্ষণভাগ এবং আক্রমণ বিভাগে বল সরবরাহের আপ্রাণ প্রচেষ্টা প্রশংসার্হ। ব্যাকে এন, ঘোষের খেলাও উল্লেখযোগ্য। এ গাঙ্গুলী, এ কর, বি দাসগুপ্তের খেলাও ভাল হয়: আই, এফ, এর অনুমতি না পাওয়ায় বোধ হয় মোহিনী ব্যানার্জ্জী পুনরায় এ দলেই যোগদান করবে।

সোমবার ইঃ বিঃ দল এরিয়ান্স দলকে ১—০ গোলে পরাজিত করেছে। ইঃ বিঃ দলের কয়েকজন নিয়মিত খেলোয়াড় যোগদান না করলেও এ দলের বিশেষ প্রাধান্য প্রকাশ পায়। বহু সুযোগ উভয় দলই নষ্ট করে।

প্রয়োজনীয় গোলটি স্বরাজ ঘোষ দেয়।

ভবানীপুর দল সোমবার কালীঘাটের তরুণ খেলোয়াড়বৃন্দ কর্ত্তৃক ১—০ গোলে পরাজিত হয়। ভবানীপুরের কাছে যে রকম প্রতিদ্বন্দ্বীতা আশা করেছিলাম কার্য্যক্ষেত্রে তা পরিলক্ষিত হয় নি। ভবানীপুর দলের রবি দাস বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। সোমানা ও আপ্পারাও এখনো এ দলের হয়ে একদিনও খেলেন নি।

৩—১ গোলে রেঞ্জার্সকে পরাজিত করে এরিয়ান্স দল সোমবার এ বৎসরে প্রথম জয়লাভ করে।

গত সপ্তাহের প্রথম বিভাগীয় লীগের ফলাফল :—

বুধবার ১০ই মে—

কালীঘাট—১ রেঞ্জার্স—০

বৃহস্পতিবার ১১ই মে—

বি এণ্ড এ আর—২ স্পো: ইউ:—১

এরিয়ান্স—০ এণ্টিলোপ—০

শুক্রবার ১২ই মে—

ই: বি—১ কালীঘাট—০

রেঞ্জার্স—০ পুলিস—০

শনিবার ১৩ই মে—

মোহনবাগান—১ ডালহৌসী—১

ভবানীপুর—২ বি এণ্ড এ আর—২

সোমবার ১৫ই মে—

ই: বি—১ এণ্টিলোপ—০

কালীঘাট—১ ভবানীপুর—০

এরিয়ান্স—৩ রেঞ্জার্স—১

মঙ্গলবার ১৬ই মে—

ডালহৌসী—২ বি এণ্ড এ আর—৩

ক্যালকাটা—১ পুলিস—০

মোহনবাগান—১ স্পো: ইউ:—০

আই, এফ, এর মিটিং-এ সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হয় যে আন্তঃপ্রাদেশিক ফুটবল প্রতিযোগিতা এ বৎসরেও অনুষ্ঠিত হবে। পরিচালকমণ্ডলীদের নিকট এই অনুষ্ঠানের ফাইনাল এবং সেমি-ফাইনাল খেলাগুলি কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হওয়া সম্পর্কে এ প্রতিষ্ঠান পত্র প্রেরণ করেছে।

নানাকথা

পারিজাত সমাজ (হাওড়া)

বিগত ৩১শে বৈশাখ রবিবার (১৪ই মে, ১৯৪৪) সায়াহ্ন ৭ ঘটিকায় সাহিত্য ও পাঠাগার সংসদের সম্পাদক, বিমলানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের আহ্বানে হাওড়া রিপন কলিজিয়েট স্কুল হলে "সংক্রান্তি-মিলনের" ২৬৫ সংখ্যক বৈঠক উপলক্ষে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ৮৪তম জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। 'দীপালী'র প্রধান সম্পাদক সুকবি শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সুরশিল্পী শ্রীযুক্ত অনিল বন্দোপাধ্যায় কর্ত্তৃক রবীন্দ্রনাথের "হে নবীন অতিথি..." গানটি গীত হইবার পর সমাজের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা "সংক্রান্তি মিলনের" বিগত বৈঠক ও রবীন্দ্র জন্মোৎসবের বিবরণী প্রদান করেন। বক্তৃতা, প্রবন্ধ, কবিতা, আবৃত্তি ও সঙ্গীতাদি দ্বারা কবিগুরুর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন যথাক্রমে শ্রীযুক্ত সুকুমার মুখোপাধ্যায়, রাধহরি চট্টোপাধ্যায়, কর্ম্মবীর আলামোহন দাশ, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সন্তোষ কুমার দাস, সুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নিকুঞ্জবিহারী পত্রী, শ্রীমতী মিনতি মুখোপাধ্যায়, শ্রীমান্ অধীর বন্দোপাধ্যায়, চঞ্চল কুমার দেউটা, সুরশিল্পী তারাপদ দাস, গণেশ দাস ও শ্রীমতী দীপালী মুখোপাধ্যায়।

অনন্তর সভাপতি মহাশয় তাঁহার সুচিন্তিত ও হৃদয়গ্রাহী ভাষণে কবিপূজায় তাঁহাকে অঞ্জলি দিবার জন্য সমাজের কর্ত্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং রবীন্দ্র ভাবধারার সহিত প্রত্যেককে সুপরিচিত হইতে ও "শ্রীরামনবমী," জন্মাষ্টমী" "রাখী-পূর্ণিমা" প্রভৃতি স্মরণীয় তিথিপূজার মত রবীন্দ্র জন্মদিবসকেও হিন্দুর জাতীয় উৎসব রূপে প্রতিপালন করিতে বিশেষ অনুরোধ জানান।

শিলচরে রবীন্দ্র-জন্মোৎসব

গত ২৫শে বৈশাখ শিলচর কলাবতী টকি গৃহে কাছাড়ের ডেপুটি কমিশনার শ্রীযুক্ত শঙ্কর নাথ মৈত্র, আই, সি, এস মহোদয়ের পৌরহিত্যে শিলচর ছাত্র ফেডারেশনের উদ্যোগে এক মহতী সভার অনুষ্ঠান হয়। সভায় শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র চন্দ্র শ্যাম, সারদাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ সহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ রবীন্দ্র-প্রতিভার সমাজ রাষ্ট্র ও সাহিত্যে বহুমুখী দান এবং রবীন্দ্র ভাবধারা ও সাহিত্যের বিশ্বজনীনতা সম্পর্কে বক্তৃতাদি করেন। কুমারী সাগরিকা শ্যাম রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা সুন্দর আবৃত্তি করেন। কুমারী অভ্ররেণু দাস, পরিমল দাস সঙ্গীত করেন এবং শ্রীযুক্ত কিশোন পাটোয়া যন্ত্র সঙ্গীত দ্বারা সকলকে পরিতৃপ্ত করেন। পরিশেষে সভাপতি মৈত্র মহাশয়ের অভিভাষণ বিশেষ চিত্তাকর্ষক হয়।

রবীন্দ্র জন্ম-দিবস

শ্রীমতী তমাললতা বসুর উদ্যোগে বহু পটীয়সী হাসি দেবীর কৃতিত্বে শ্রীগিরিজাকুমার বসুর সভাপতিত্বে বিগত ২৫-এ বৈশাখ সন্ধ্যায় ৫টা বাজে শিবপুর রোডে রবীন্দ্র জন্মোৎসব হইয়া গিয়াছে। অনুষ্ঠানের আগে নির্ম্মলা দেবী রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। হাসি দেবী সকলকে গান শিখাইয়া ছিলেন, প্রতি নৃত্যের আনুষঙ্গিক গান গাহিয়াছিলেন, প্রত্যেক গানের সঙ্গে সঙ্গীত যন্ত্র বাজাইয়াছিলেন, একক গানও গাহিয়াছিলেন। অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন নৃত্যে অন্নপূর্ণা, গীতা, জয়ী, সুলেখা; আবৃত্তিতে তমাললতা, নমিতা, সুলেখা; সঙ্গীতে—হাসি, মিনতি, বিমলা, অমলা, গীতা, নমিতা। সমবেত কণ্ঠে যথাক্রমে 'বসন্ত জাগ্রত দ্বারে' ও 'জনগণমন অধিনায়ক' সঙ্গীতের দ্বারা উৎসবের আরম্ভ ও সমাপ্তি হয়।

রায় বাহাদুর নিবারণচন্দ্র ঘোষের সম্বর্দ্ধনা

গত ১০ই মে সোমবার শ্রীরঙ্গম মঞ্চে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার রায় বাহাদুর নিবারণ চন্দ্র ঘোষ ও. বি. ই. মহাশয়ের সম্বর্দ্ধনা উপলক্ষে হাইকোর্টের বিচারপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বিশ্বাসের সভাপতিত্বে এক মহতী সভার আয়োজন হইয়াছিল। সহরের বহু বিশিষ্ট গণ্যমান্য ব্যক্তি এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। শ্রীঅশোক শাস্ত্রীর মঙ্গলাচরণের পর মাননীয় বিচারপতি শ্রীচারুচন্দ্র বিশ্বাস নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দেন। তারপর রায় বাহাদুর নিবারণচন্দ্রের প্রতিভাষণটি খুব হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। অবশেষে শ্রীরঙ্গম নাট্য-সম্প্রদায় কর্ত্তৃক "ভিখারীর মেয়ে" নাটকাভিনয় হয়।

কলা-মঞ্চ

শ্রীবিদ্যাধর মল্লিকের প্রযোজনায় ও শ্রীঅনিলকুমার ঘোষের পরিচালনায় উপরোক্ত সঙ্ঘ কর্ত্তৃক মানকুণ্ড মেণ্টাল হস্‌পিটালের সাহায্যার্থে শ্রীবরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্তের "মিশর কুমারী" মঞ্চস্থ হইবে। সকলের সহানুভূতি প্রার্থনীয়।

রবি বাসর

গত ৩১শে বৈশাখ রবিবার অপরাহ্নে, বালিগঞ্জ মনোহরপুকুর রোডে, শ্রীযুক্ত জ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি এল মহাশয়ের আবাসে রবি-বাসরের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

কুমারী সাধনা ও মনীষা মজুমদার কর্ত্তৃক উদ্বোধন সঙ্গীতের পর সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। এই অধিবেশনে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব "আমাদের জীবন ও সাহিত্য" শীর্ষক একটি নানা তথ্যপূর্ণ সুদীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠের পর যে আলোচনা হয় তাহাতে শ্রীযুক্ত মন্মথ নাথ ঘোষ, শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, বিভাস রায় চৌধুরী ও নরেন্দ্র নাথ বসু প্রভৃতি বিশেষ ভাবে যোগদান করেন। সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে জীবনের সহিত সাহিত্যের সম্বন্ধ লইয়া অতি মনোজ্ঞ আলোচনা করিয়াছিলেন। সভার শেষভাগে ঢাকুরিয়া বালিকা সঙ্ঘ কর্ত্তৃক সঙ্গীতাদির বিশেষ আয়োজন করা হইয়াছিল। কুমারী মনীষা মজুমদারের আবৃত্তি ও নৃত্য বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছিল।

নাটমণ্ডপ

সহরের সিনেমায়

এ সপ্তাহের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য আকর্ষণ হইতেছে এম, পি, প্রোডাকশনের "বিদেশিনী" শ্রী পূরবী ও পূর্ণ চিত্রগৃহত্রয়ে। "বিদেশিনী"র নায়িকা শ্রীমতী কানন দেবী এবং অন্যান্য ভূমিকায় আছেন ধীরাজ ভট্টাচার্য্য, শৈলেন চৌধুরী, জীবেন বসু, প্রভা, রবি রায়, নৃপতি চট্টো, কৃষ্ণধন, বেচু সিং, কানু বন্দ্যোঃ, কেশব রায় প্রভৃতি। শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র ইহার গল্পলেখক এবং পরিচালক। সুর সংযোজনা করিয়াছেন খ্যাতনামা সুরশিল্পী কমল দাসগুপ্ত।

বম্বে পিকচার্স কর্পোরেশান পরিবেশিত হিন্দ পিকচার্সের "আব্রু" এই শুক্রবার গণেশ টকী হাউস এবং প্যারামাউণ্ট সিনেমায় মুক্তিলাভ করিবে। ইহাতে অভিনয় করিয়াছেন নাজির, সিতারা, জগদীশ প্রভৃতি। পরিচালনা করিয়াছেন নাজির।

অন্যান্য চলতি ছবিগুলির মধ্যে সিটি ও পার্ক শো হাউসে "সাহারা," উত্তরায় "মাটির ঘর" (চতুর্থ সপ্তাহ) প্রভাত টকীজে "নয়া তরাণা" (চতুর্থ সপ্তাহ) রূপালী চিত্রা ও নিউ সিনেমায় "ওয়াপস" (দশম সপ্তাহ) মিনার্ভায় "ভক্ত রায়দাস" (তৃতীয় সপ্তাহ) চিত্রলেখায় "শাপমুক্তি" বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

দীপালীর স্বত্বাধিকারী শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত, ১২৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, দীপালী প্রেসে মুদ্রিত ও দীপালী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

প্রধান সম্পাদক—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় :: সহঃ সম্পাদক—শ্রীধীরেন্দ্রমোহন মজুমদার বি. এল.

১৬শ বর্ষ VOL. XVI. } ১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৫১ :: May 25, 1944 { ২১শ সংখ্যা No. 21

আলোচনী

মিঃ এডওয়ার্ড টমসন "New Statesman and Nation" পত্রিকায় লিখেছেন—"লর্ড ওয়েভেল ভারতের দারিদ্র্যের স্বরূপ উপলব্ধি করেছেন। এই অবস্থা দূর করবার জন্য তিনি ব্যাপক ও গভীর পরিবর্ত্তনের পক্ষপাতী।"

বিলাতি কাগজে এই ধরণের সদিচ্ছা মাঝে মাঝে ঘটা করে প্রকাশ করা হয়। খবর হিসেবে এগুলি মুখরোচক। কর্ত্তৃপক্ষ মহল এই সব সংবাদের কিছু দাম দিয়ে থাকেন। প্রচার কার্য্যের দিক থেকে এই শ্রেণীর সংবাদের মূল্য অস্বীকার করা চলে না। বর্ত্তমানে মার্কিণ ও ইংলণ্ড থেকে অজস্র সংবাদ এদেশে প্রচারিত হচ্ছে। ভারতীয় মন যাতে বিভিন্ন দিক থেকে আন্দোলিত হয়, লক্ষ্য শুধু এই। নানা রকমের feeler প্রয়োগ করা এর উদ্দেশ্য। এদেশের public opinion বলে কোন বস্তু আছে একথা একশ্রেণীর বৃটিশ কূটনীতিক বিশ্বাস করেন না। প্রমাণ হাতের কাছেই আছে। ১৯শে মে তারিখের একটি সংবাদ বিলেত থেকে প্রচারিত হয়েছে। লর্ড সেলবোর্ণের বক্তৃতা। তিনি বলেছেন—The empire will continue to flourish because the great dominions, the colonies and ourselves want it to flourish". এখানে "ourselves want to flourish", এইটেই বড় কথা। আমরা চাই, আর কারও চাওয়া বা পাওয়ার প্রশ্ন শ্রদ্ধেয় নয়।

* * *

কাজেই টমসন সাহেব যতই বলুন বা মহামান্য বড়লাট বাহাদুরের উপলব্ধি যতই গভীর হোক না কেন ভারতীয় রাজনীতির খোল নলচে বদলে ফেলা সম্ভব হবে না। মনে রাখতে হবে, লর্ড সেলবোর্ণ প্রভৃতি কূটনীতিকের সাম্রাজ্যের যে আদর্শবাদ খাড়া রয়েছে তার সঙ্গে ভারতীয় স্বাধীনতার কোন সম্পর্ক নেই। চার্চ্চিল, অ্যাটস্, আমেরী, ক্রানবোর্ণ—বৃটিশের সাম্রাজ্যনীতি তো এদের হাতেই বিধৃত রয়েছে। গ্লাডষ্টোন—ডিসরেলী যুগের স্বপ্নবাদী এঁরা। আজও ধ্বংসের সর্ব্বব্যাপী পৃথিবীর স্বাভাবিক দুর্ঘটনা বলে মেনে নিয়ে এঁরা পরিকল্পনা চালাচ্ছেন।

* * *

বাস্তবতার দিক থেকে আমরা খানিকটা এগিয়েছি। এদেশের জনগণের মন বর্ত্তমান অসামঞ্জস্য ও সহায়হীনতা সম্বন্ধে অনেকখানি সচেতন হয়েছে। এইরকম ধারণা ইংলণ্ড ও মার্কিণের কেউ কেউ দয়া করে পোষণ করে থাকেন। এদের লেখা প্রবন্ধের প্রচার সীমাবদ্ধ। আসলে ওদেশের জনসাধারণের মধ্যে আমাদের দুর্গতি ও ব্যর্থতার—সত্য ইতিহাস আজও পৌঁছয় নি। লুই ফিসারের লেখা প্রবন্ধ আমেরিকা ও ভারতবর্ষে বেশ আন্দোলনের সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু এক অদৃশ্য অঙ্গুলি হেলনে এদেশে সে সব তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধের প্রচার বন্ধ হয়ে গেল। হয়তো বৃটিশ অনুপ্রাণিত "Fifty facts"-এর প্রচার আজও মার্কিনে অবাধে

প্রসার লাভ করেছে। এই সব "facts" থেকেই ও দেশের মানুষ আমাদের অবস্থা সম্বন্ধে ধারণা গড়ে তুলবে। আমরা এখানে অসহায়। লর্ড হ্যালিফ্যাক্সের মতো কূট-নীতিক মার্কিণে বৃটিশ প্রচার কার্য্যের হাল ধরে আছেন। আপনারা বলবেন স্যার গিরিজাশঙ্করকেও তো ভারতের এজেণ্ট হিসেবে পাঠান হয়েছে। তুলনা হাস্যকর। ওদেশে ভারতের এজেণ্ট জেনারেল-এর উক্তি হিসাবে যা কিছু প্রচারিত হবে নিঃসন্দেহে তা ভারতের উক্তি বলেই চলে যাবে। এই শ্রেণীর Double-barrelled প্রচারকার্য্যের মুখে আমাদের শক্তি ও সংগঠন কতটুকু ও তা কত তুচ্ছ! ভারতের সংকুল অবস্থা, এদেশের জনসাধারণের সীমাহীন দারিদ্র্যের সংবাদ বৃটিশ প্রচার-প্রতিষ্ঠানের বেড়াজাল ভেদ করে বৈদেশিক মনকে আলোকিত করে তুলবে এ আশা আজ যেন দুরাশার মতই মনে হয়।

*　　*　　*

গত বছর দুর্ভিক্ষে ও প্লাবনে সারা দেশ ডুবে গেল। মৃত্যুর এতবড় রাজকীয় শোভা-যাত্রা শতাব্দীতেও সম্ভব হয় না। অথচ এর উপরও কত নিষ্ঠুর টিকাটিপ্পনী আমরা সহজে হজম করেছি। নিঃশব্দে মরে আমরা over-dramatisation বা অতি অভিনয়ের গ্লানি থেকে মুক্তিলাভ করেছি সন্দেহ নেই। কিন্তু একটা প্রশ্ন নিয়ে বেশী আলোচনা হয় নি। দুর্ভিক্ষের স্পর্শমাত্রই এদেশের সিভিলি-য়ান চালিত govt. অচল হয়ে পড়ল কেন? কোথায় তার ঘুণ ধরেছে তা আজও গোপন রেখে জোড়াতালি দেবার চেষ্টা চলছে।

*　　*　　*

জনাব জিন্না সাহেব পাঞ্জাবের ব্যর্থতার পর কাশ্মীরের শৈত্য উপভোগ করছেন! পাকিস্থান ক্যাম্পের কেউ কেউ বলছেন জিন্না সাহেব এত সহজে ব্যর্থতা মেনে নেবেন না। কাশ্মীরের বিরাম-কুঞ্জে কূটনীতির ভিয়েন চড়ান হয়েছে। হয়তো খুব শীঘ্র একটা Concoction কিছু তৈয়ের হবে। পাঞ্জাবের নেতা খিজির হায়াৎ খাঁর সামনে এখনও বহু দুর্দিন রয়েছে। গত ১২ই মে তারিখে "Hindusthan Times"-এর লাহোর সংবাদদাতা লিখেছেন—""Mr Jinnah has come and gone but has left behind a smouldering fire in the :Unionist camp" অর্থাৎ পাঞ্জাবের ব্যাপারে জিন্না সাহেবের আগমন ও নিষ্ক্রমণের—দ্রুততা দেখে আশান্বিত হবার তিনি পুচ্ছে করে যে অশান্তির আগুন ইউনিয়ন দলে ছড়িয়ে গেছেন আজও তা ধিকিধিকি করে জ্বলছে। শুধু সুবাতাসের অপেক্ষা, তার আয়োজনও চলছে।

*　　*　　*

নয়াদিল্লীতে গুজবের অন্ত নেই। একটা চমকপ্রদ খবর এই, ভারত গবর্ণমেণ্ট শীঘ্র হিন্দু-মুসলমান মিলনের জন্য সারাদেশব্যাপী প্রচারকার্য্য চালাবেন। বর্ত্তমান "National war front"-এর মারফৎ প্রচারের ব্যবস্থা হবে এই রকম গুজব। শোনা যাচ্ছে, স্যার সুলতান আমেদের মস্তিষ্ক থেকে এই পরিকল্পনা রূপ পেয়েছে। দেখা যাচ্ছে একশ্রেণীর ভারত-হিতৈষী মুসলমান এই সংবাদে একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন। এঁদের কেউ কেউ বলছেন, স্যার সুলতানের সাধ্য নয় এই ধরণের দুর্নীতিপূর্ণ কাজে নামা। হিন্দু মুসলমান মিলনের প্রচেষ্টা একটা questionable enterprise, এতে করে সমস্ত মুসলমান জাত ক্ষেপে যাবে। এই ব্যাপারে যে সব বৃহৎ যুক্তির অবতারণা করা হয়েছে তার দু'একটি তুলে দেওয়া মন্দ নয়। দুরভিসন্ধি ও দুর্ব্বুদ্ধি কতদূর পৌঁছতে পারে এইসব দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যাবে। বলা হয়েছে, এই প্রচারকার্য্যের জন্য ভারত সরকারের জনসাধারণের অর্থ অপব্যয় করবার কোন অধিকার নেই। এতে হিন্দুদেরই উপকার করা হবে। পাকিস্থান ও অখণ্ড হিন্দুস্থান-এর মাঝামাঝি কোন মধ্যপন্থা নেই ইত্যাদি। শেষ পর্য্যন্ত ভারত সরকারের প্রচার বিভাগের কাজ নিয়ে স্যার সুলতানের যে মাথা খারাপ হবে যায় নি সে ভরসা করা হয়েছে। তা ছাড়া সেদিন পর্যন্তও তিনি লীগের সংস্পর্শে ছিলেন। সম্প্রতি চাকরী করলেও দলের অকল্যাণকে তিনি কিছুতেই মেনে নিতে পারেন না। শেষ পর্য্যন্ত ভয় দেখান হয়েছে। যদি স্বার্থবাদীদের কুযুক্তিতে পড়ে স্যার সুলতান এই কার্য্য করেন তা হলে সেটা হবে "stabbing in the back"—ভারতের মুসলমান তা ক্ষমা করবে না।

*　　*　　*

বর্ত্তমান যুদ্ধে বহু অসম্ভবও অত্যন্ত সাধারণ ঘটনার পর্য্যায়ে এসে যাচ্ছে। সম্প্রতি কাগজে দেখা গেল, WAC (I) অর্থাৎ ভারতীয় নারীবাহিনী চমৎকার ভাবে একটা কুচকাওয়াজ পর্ব্ব সম্পন্ন করেছেন। এতে করে পুরুষদের চেয়ে তাদের বাস্তবদৃষ্টি-ভঙ্গী নাকি বেশী করে প্রকাশ পেয়েছে। এঁদের পরিবর্তিত ঘটনার সঙ্গে পা ফেলে চলবারও অদ্ভুত অভ্যাস আছে এই রকম অজস্র প্রশংসা শোনা রিপোর্টে প্রকাশ এই যুদ্ধাভিনয়ের পরে নারী-জনোচিত touch-এরও অভাব হয়নি। রণক্লান্ত দেহের সৌষ্ঠব বজায় রাখবার জন্য এঁদের Cosmetics-ব্যবহার করতে দেখা গিয়েছিল। Gun ও cosmetics-এর ব্যবহার একসঙ্গে কি করে সম্ভব যারা এ প্রশ্ন তোলেন তাদের দৃষ্টিভঙ্গী খুব স্বচ্ছ নয় এ নিঃসন্দেহে বলা যায়। একদা বন্ধনশালাকেই যারা নারী জাতির স্বাভাবিক গণ্ডী বলে নির্দ্ধারণ করে ছিলেন তাদের দিন বিগত হয়েছে। যুদ্ধান্তে নরনারীর সম্পর্কের কি বিরাট পরিবর্ত্তন হবে তার প্রশংসনীয় আভাস পাওয়া যাচ্ছে। রণক্লান্ত ভারতের উন্মুক্ত সামাজিকতার মাঝখানে ভবিষ্যতের কত মহাকাব্য রচিত হবে কে জানে? দুঃখের বিষয় আমাদের অনেকেই সেদিন বেঁচে থাকবেন না।

অন্তর্হিত অন্তস্তল

(গল্প)

—শ্রীপ্রতিমা দেবী

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

…………এর কিছুদিন পরের কথা বল্‌ছি। কয়েকদিন থেকে দুই সখীর মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ হয়নি। সেদিন সন্ধ্যায় মৈত্রেয়ী এলো সাধনার বাড়ী। বল্‌লো: "কি রে, ক'দিন থেকে যাচ্ছিস না যে আমাদের ওখানে?" উত্তর এলো "ক'দিন থেকে শরীরটা ভালো যাচ্ছে না। এসো ভাই ঘরের ভিতরে।" ভিতরে এসে মৈত্রেয়ী জিজ্ঞেস করলো "কর্ত্তা কোথায়?" উদাসীন ভাবে সাধনা উত্তর দিল "ট্যুরে গেছে।"

"কবে?" "পরশু।" "ফিরবেন কবে?" "তিন চার দিনের মধ্যেই ফিরবার কথা।" মৈত্রেয়ী পুনরায় জিজ্ঞেস করলো, "উনি যখন ট্যুরে যান খাওয়া দাওয়া করেন কোথায়?" উত্তর এলো "ডাক বাংলোয়।" "খুব কষ্ট হয় নিশ্চয়?" "কি জানি ভাই অতশত জানিনা" সাধনার কণ্ঠস্বরে প্রচ্ছন্ন বিরক্তির রেশ বেজে উঠলো।

সেটুকু গায়ে না মেখেই মৈত্রেয়ী বল্‌লো "বাঃ রে মেয়ে, এটাও জানিসনা? পতিপরায়ণা দেখছি একেবারে।" সাধনা বল্‌লো "না ভাই, এ জন্মে ওটা আর আমাকে দিয়ে হলোনা! তুমিই প্রাণ ভরে পতি সেবা করগে।"……নাঃ কোথায় যেন তাল কেটে গেছে। এমন ভাবে আর বেশী দূর আলাপ এগুলো না। মৈত্রেয়ী বিদায় নিয়ে চলে এলো।……সন্ধ্যার পর আর এক দফা চা খেতে বসে প্রবোধবাবু স্ত্রীকে বল্‌লেন "কোথাও বেড়িয়েছিলে নাকি?" উত্তর এলো—"কেন বলতো?"

"পরণে জলতরঙ্গ শাড়ী দেখছি।"

"বুদ্ধি খুলছে দিন দিন" তীব্র কণ্ঠে মৈত্রেয়ী উত্তর দিল "ক্রেপ বেনারসীকে বানিয়ে দিলে জলতরঙ্গ শাড়ী, যেন মান্ধাতার যুগ এখনো চল্‌ছে।" নির্ব্বিকার ভাবে প্রবোধবাবু বল্‌লেন "কি জানি, অত সব শাড়ীর নাম কি মনে থাকে? তা গিয়েছিলে কোথায়?" "সাধনার ওখানে।" "সর্ব্বনাশ"—প্রবোধবাবু বল্‌লেন "বান্ধবীর ওখানে গিয়েছিলে বেনারসী শাড়ী, মুক্তোর কলার আর হীরের আংটি পড়ে? অহঙ্কারী ভাববে যে?" "ভাবলো তো আমার বয়েই গেল" ঠোঁট উল্‌টিয়ে মৈত্রেয়ী উত্তর দিল, "ওর এসব নেই বলে কি আমার পড়তেও বারণ?" মুন্সেফবাবু একটু আশ্চর্য্য হয়ে বল্‌লেন—"নেই? জান্‌লে কি করে?" "থাকবে কোথা থেকে? ওর বাবা তো চিরটা কাল পোষ্টমাষ্টারি করেই কাটালে।" সাধনার এই উক্তি সরল মুন্সেফবাবুর কানে কেমন বেখাপ্পা শোনালো। কথাটা অন্য প্রসঙ্গে এনে বল্‌লেন, "যাই বল বান্ধবী তোমার গায় ভালো। আজকাল আধুনিকারা যেমন সব গান করেন—মনে হয় শেষ হলে বাঁচি। কিন্তু এমন নিখুঁত উঁচুদরের ক্লাসিক্যাল গান এঁর কাছেই প্রথম শুনলাম।" মৈত্রেয়ীর চোখ মুখ জ্বালা করে উঠলো। বল্‌লো, "গান যদি এতই ভালোবাসতে তবে সেই রকম সঙ্গীতজ্ঞা একটি মেয়ে বিয়ে করলেই পারতে?" "কপালে আর জুটলো কই?"

বলে সরল প্রবোধবাবু হো হো করে হেসে উঠলেন।

চেয়ার থেকে সশব্দে উঠে দাঁড়িয়ে কাঁপা গলায় মৈত্রেয়ী বল্লো "ভেবেছ আমি বুঝি কিছু টের পাই না। আমি সব জানি, সব বুঝি—তোমার মনের ভাব বুঝতে আমার আর বাকী নেই। আমি জানি তুমি……" শেষের কথাগুলো তার কান্নায় ঢাকা পড়লো, তীব্র গতিতে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। প্রবোধ বাবু অবাক হয়ে ভাবলেন: ব্যাপার খানা কি? শরীরটা ওর আজ নিশ্চয়ই ভালো নেই।

আরো কিছুদিন পরের কথা। মন্মথবাবু ট্যুর থেকে ফিরে এসেছেন। রাত্রে খাওয়ার টেবিলে বসে নানা কথার পর সাধনা তাঁকে লক্ষ্য করে বল্লো "সেদিন মৈত্রেয়ী এসেছিল।" বলেই অকারণে একবার তাঁর মুখের দিকে চাইলো। প্রবোধ বাবু বল্লেন, "এটাতো আর নতুন খবর নয়।" মনে বেশ খুশী হয়ে সাধনা বল্লো "তোমার কথা অনেকক্ষণ ধরে জিজ্ঞেস করলো।" প্রবোধ বাবু বল্লেন "বল কি? তা' আমার কপাল ভালো। সুন্দরীদের কৃপালাভে আজও বঞ্চিত হইনি দেখছি।"

সে দিনের মতো কি জানি কেন সাধনার কপালের পাশের শিরা দুটো দপ্ দপ্ করে উঠলো। নীরস কঠিন স্বরে বল্লো "তুমি যে ওর মধ্যে সুন্দরের কি দেখতে পাও তুমিই জানো। ঐ তো বিদ্‌ঘুটে লম্বা, মেয়েদের মধ্যে যা একেবারে বেমানান—ওর চেয়ে প্রবোধবাবুর চেহারা অনেক ভালো!" বন্যার জলোচ্ছ্বাসের মত সাধনার মুখ দিয়ে কথা বেরোতে লাগলো, "বাপ জমিদার—এক কাঁড়ি টাকা দিয়ে মেয়েকে পার করেছে… নইলে হুঁঃ…" উপযুক্ত কোন বক্তব্য আপাততঃ খুঁজে না পেয়ে সাধনা চুপ করলো। আগেই বলেছি মন্মথবাবু পরিহাসপ্রিয় রসিক ব্যক্তি। স্ত্রীর মনের ভাব বুঝতে বাকী রইলো না, পরিহাসপ্রিয়তা মাথা চাড়া দিয়ে জেগে উঠলো, বল্লেন "তা হ'লে দেখছি ভদ্রলোকের কপাল ভালো। এক কাঁড়ি টাকাও পেলেন আবার সুন্দরী স্ত্রীও পেলেন। যাকে বলে—এক ঢিলে দু' পাখী মারা।"

তাঁর কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সাধনা চিবিয়ে চিবিয়ে বল্লো—"সেজন্য এখন আর আফশোষ করে কি হবে বল? সেটা বিয়ের আগে ভাবা উচিত ছিল। সুন্দরী স্ত্রী আর টাকার সাধ তো এ জন্মে মিটবে না—আর নিজের চেহারাখানাও তো মাঝে মাঝে আয়নায় দেখ…" সাধনার তূণীরে যে কয়টি

তীক্ষ্ণ বাক্যবাণ ছিল নিঃশেষে মন্মথবাবুর প্রতি নিক্ষেপ করে অর্দ্ধ সমাপ্ত খাওয়া ফেলে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সেই দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে মৃদু হেসে হেল্‌থ অফিসার আপনার মনেই বল্লেন "ফ্রেইলটি দাই নেম ইজ ওম্যান।"

* * *

এর পরের ঘটনাটা হলো অসাধারণ। মুন্সেফ বাবু, হেলথ অফিসার দু' জনেই জীবনে একেবারে বীতস্পৃহ হয়ে উঠলেন। উভয়েরই সন্ধ্যার পর একবার করে ক্লাবে চক্কর না দিলে পেটের ভাত হজম হয় না। কিন্তু তাতেও প্রতিবন্ধক ঘটলো। ক্লাবে বেরোবার সময় এক দফা প্রশ্ন হয় "কোথায় যাওয়া হচ্ছে?" ক্ষীণ কণ্ঠে উত্তর আসে "ক্লাবে।" যতক্ষণ না ফেরেন উভয়ের গৃহেই দু' জন সতর্ক প্রহরী উদগ্রীব নয়নে সদর দরজার দিকে চেয়ে বসে থাকে, একজনের চোখ বিষণ্ণ, মলিন—আর এক জনের চোখে ক্রোধের আগ্নেয়গিরি। কোন কারণে যদি একটু রাত হ'লো—বাস্, আর রক্ষা নেই—এক দিকে খালি গর্জ্জন আর অন্যদিকে খালি বর্ষণ। দুই সখীর মুখ দেখাদেখি বন্ধ। কালে ভদ্রে কচিৎ কোথাও দেখা হলে উভয় পক্ষেই এমন সমস্ত চিমটি-কাটা বাক্যের অবতারণা হয় যার জ্বালা অত্যন্ত প্রখর ও গাত্রদাহকর। অথচ মূল কারণ খতিয়ে দেখলে কোন সন্তোষজনক হদিস্ মেলেনা! অতএব মন্মথ বাবুর মত "ফ্রেইলটি দাই নেম্ ইজ ওম্যান" বলে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করা ছাড়া আর গত্যন্তর দেখি না।

ডিষ্ট্রিক্ট জজ্ বদলী হয়ে যাচ্ছেন। সেই উপলক্ষ্যে সরকারী উকীল প্রফুল্ল বাবু নিজের বাড়ীতে তাঁর বিদায় অভিনন্দনের আয়োজন করেছেন। স্থানীয় গণ্যমান্য বাসিন্দারা এবং সমস্ত গভর্ণমেণ্ট অফিসার প্রত্যেকেই এই অভিনন্দনে যোগদান কর্ব্বেন। প্রফুল্ল বাবু নিজে সকলের বাড়ী গিয়ে নিমন্ত্রণ করে এসেছেন...রবিবার বিকেল চারটের সময়। এই বিদায় অভিনন্দনের প্রধান উদ্যোক্তা হচ্ছে সাধনা। তাঁর সুললিত কণ্ঠসঙ্গীতে এই অভিনন্দন পূর্ণতা লাভ কর্ব্বে এবং তাঁরই শিক্ষা দানে সাব অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সার্জনের মেয়ে কুমারী আরতি পুরাতন নৃত্যটির বদলে আর দুটি নতুন নৃত্যের অবতারণা কর্ব্বেন।

...রবিবার বেলা দেড়টা থেকে মৈত্রেয়ী প্রসাধন আরম্ভ করেছে, অবিশ্যি আগের দিনই চুলটা 'শ্যাম্পু' করে রেখেছিল।...চারটে বেজে যখন দশ মিনিট তখন পরিপাটি রূপে প্রসাধন শেষ করে মৈত্রেয়ী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেল্লো। আয়নার কাছে দাঁড়িয়ে লিপষ্টিকটা হাল্কা ভাবে আর দু' একবার ঠোঁটের উপর বুলিয়ে নিয়ে আপন মনেই বল্লো, সাধনা ঠোঁটে যে 'ক্যাটকেটে' লাল রং মাখে, মাগো মনে হয় যেন 'টাকেয় আগুন।' মুখে তার একটু আত্মপ্রসাদের হাসি ফুটে উঠলো। বাইরে থেকে প্রবোধ বাবু অসহিষ্ণু ভাবে তাগাদা দিচ্ছিলেন। মৈত্রেয়ী বাইরে বেরোবামাত্র দু' চোখ কপালে তুলে তিনি বল্লেন "সর্ব্বনাশ, এ করেছ কি?" ভুরু কুঁচকে মৈত্রেয়ী উত্তর দিল, "কেন অন্যায়টা কি করেছি শুনি?" প্রবোধ বাবু বল্লেন "আঃ তা' নয় আমার মনে হচ্ছে বাইশে চৈত্র আমাদের বিয়ের দিনটি কি আবার ফিরে এলো নাকি?" কণ্ঠস্বরে যথাসম্ভব বিষ ঢেলে মৈত্রেয়ী বল্লো—"উঃ, স্মৃতিশক্তি দেখছি খুব প্রখর। কোথায় পনেরোই শ্রাবণ আর কোথায় বাইশে চৈত্র! হিন্দুর বিয়ে কবে থেকে যে চৈত্রমাসে হয় তাত জানিনা।" "হে" "হে" করে অপ্রস্তুতের হাসি হেসে মুন্সেফ বাবু বল্লেন "তাওতো বটে। নানা কাজে ব্যস্ত থাকি কিনা...তাই"...

যুগলে তারা যখন প্রফুল্ল বাবুর বাড়ী উপস্থিত হলেন তখন শ্রীমতী সাধনার সঙ্গীত আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। গানের মাঝখানেই সে একবার তির্য্যক চাহনিতে মৈত্রেয়ীর আপাদমস্তক দেখে নিল। ইস্, হীরের নেক্লেসটা লোককে দেখাবার জন্য কেমন 'আন্‌সিভিলাইসড' এর মতো শাড়ীর আঁচলটা এদিকে সরিয়ে

দিয়েছে। হুঁ, শুধু পড়লেই হয় না—পড়তে জানা চাই।···দেখা গেল সব কাজের মধ্যেই সাধনা হচ্ছে অগ্রণী। পেছন থেকে নাচের মহড়া দেওয়া, সবাইকে আদর আপ্যায়ন করা, হাল্‌কা হাসি, চটুল বাক্যালাপ ইত্যাদি সমস্ত বিষয়েই তার অসাধারণ কৃতিত্ব দেখা গেল।···মৈত্রেয়ীর মাথাটা বড় ধরে উঠেছিল ...চলে আসবে কিনা ভাবছে···

সে যাক্‌—অভিনন্দনের সমস্ত কার্য্য সুসম্পন্ন হয়ে গেল। এবার চা খাওয়ার পালা। প্রফুল্ল বাবু এসে সকলের তদারক করে যাচ্ছেন। তাঁর অর্দ্ধাঙ্গিনী এখনো জজ সাহেবের পাশে বিরাজ করছেন। জজ সাহেব মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গে দু' একটি কথা বলছিলেন। ভদ্র মহিলা তার তো উত্তর দিচ্ছিলেনই, আর অকারণে অপরিমিত হাসছিলেন—এমন কি নীরব থাকার সময়ও মুখে সূক্ষ্ম হাসি প্রকট করে রেখেছিলেন, প্রশংসনীয় অধ্যবসায়। ভালো কথা, জজ সাহেব অবিশ্যি বাঙ্গালী। দূর থেকে প্রফুল্ল বাবু দেখে ভাবছিলেন যে প্রীতিকণা এমন হাসতে পারেন, তা' এই দীর্ঘ তেরো বৎসরের মধ্যে তো কোনদিন বুঝতে পারেননি।

মৈত্রেয়ীর সামনে এসে দাঁড়ালেন তিনি। বল্লেন "ওকি মিসেস সেন, আপনি যে কিছু খাচ্ছেন না?" মৃদু হেসে মৈত্রেয়ী উত্তর দিল, "শরীরটা বড়ো বেশী ভালো নেই···চা তো খাচ্ছি।" "তা হ'লেও একটু কিছু মুখে দিন।" "মাপ কর্‌বেন, শরীরটা অত্যন্ত খারাপ।" "আচ্ছা থাক তবে, অসুস্থ শরীরে খাওয়ার জন্য পেড়াপীড়ি কর্‌বোনা, তবে বড় দুঃখিত হলাম।" প্রফুল্ল বাবু অন্য দিকে চলে গেলেন।···চায়ের কাপে হাল্‌কা চুমুক দিতে দিতে মৈত্রেয়ী মাঝে মাঝে শাড়ী ঠিক কর্‌বার ভান করে পেছন দিকে চাইছিল, সেখানে সাধনা প্লেটে একরাশ স্যাণ্ডউইচ নিয়ে পার্শ্ববর্ত্তিনী মহিলার (প্রফুল্ল বাবুর বোন) সঙ্গে তীব্র উৎসাহে গল্প জুড়ে দিয়েছে। সাধনার মত মৈত্রেয়ী অতটা মিশুক প্রকৃতির নয়, তাই দু' একটি লৌকিক কথা ছাড়া ভালো করে কারুর সঙ্গে আলাপ জমাতে পারছিল না।···সহসা তড়িৎ গতিতে চেয়ার সরাবার শব্দ শুনে মৈত্রেয়ী পেছন ফিরে চেয়ে দেখলো সাধনা উঠে দাঁড়িয়েছে, মুখে চোখে দারুণ অস্বাচ্ছন্দ্যের ভাব, সামনের প্লেটে অর্দ্ধ-সমাপ্ত স্যাণ্ডউইচ। কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করবার অবকাশ না দিয়েই সাধনা প্রায় ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সমগ্র জনমণ্ডলীর বিস্মিত দৃষ্টি সেখানে সন্নিবদ্ধ হয়ে রইলো। এক কোন্ থেকে হেল্‌থ অফিসার চেয়ার থেকে সশব্দে উঠে দাঁড়ালেন। সাধনার পার্শ্ববর্ত্তিনী মহিলা (প্রফুল্ল বাবুর বোন) তাঁকে বল্লেন, "আপনি বসুন। আমি দেখে আসছি।"···কিছুক্ষণ পরেই তিনি ফিরে এলেন, বল্লেন "বিশেষ কিছুই না। হঠাৎ মিসেস সান্যাল কেমন অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, বৌদির বিছানায় শুইয়ে রেখে এসেছি। এখুনি সুস্থ হয়ে উঠবেন।" সবাই নিশ্চিন্ত হলো। কিন্তু মৈত্রেয়ী উস্‌খুস করতে আরম্ভ করলো। নারীসুলভ অনুসন্ধিৎসা যাবে কোথায়? আস্তে আস্তে এক সময় সে চেয়ার থেকে উঠে পড়লো। প্রফুল্ল বাবুর বোনের কাছে গিয়ে নীচু গলায় বল্‌লো "শোওয়ার ঘরটা কোথায়? আমি একবার যেতে পারি সেখানে সাধনাকে দেখতে?" আঙ্গুল দিয়ে উপর তলার একটা ঘর নির্দ্দেশ করে মহিলাটি বল্লেন "নিশ্চয়। চলুন আপনাকে নিয়ে যাই সঙ্গে করে।" মৈত্রেয়ী বল্‌লো "না না, আমি একাই যেতে পার্‌বো, আপনাকে কষ্ট করতে হবে না।"···উপর তলায় শোয়ার ঘরে গিয়ে মৈত্রেয়ী দেখলো সাধনা আলুথালু ভাবে বিছানায় শুয়ে আছে। কোথায় গেছে রক্তিম ওষ্ঠাধর, কোথায় গেছে ইমিটেশন ভ্রূযুগল আর কোথায় বা গেছে সযত্নে 'হবল' করে শাড়ী পরা। মৈত্রেয়ীর পায়ের শব্দ শুনে সে তাকিয়ে দেখলো। আজ আর তাকে দেখে মুখ ঘুরিয়ে নিলনা। বরঞ্চ বল্‌লো "কে মিত্থু? আয় বোস্।" মৈত্রেয়ী তার কাছে বসে পড়ে বল্‌লো "কি হয়েছিল রে সাধন? অমন ভাবে ছুটে চলে এলি কেন?" ফ্যাকাশে মুখে ফিক্ করে হেসে ফেলে সাধনা অস্ফুট স্বরে বল্‌লো "বমি করতে।" মৈত্রেয়ী সাধনার মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলো—পরে তার কানের কাছে মুখ এনে ফিস ফিস করে কি জিজ্ঞেস করলো। সাধনা সেই রকম হেসে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লো। মৈত্রেয়ী সাধনাকে দু' হাতে জড়িয়ে সলজ্জ স্বরে বল্লে "আমারো যে রে!" শারীরিক অসুস্থতা ভুলে সাধনা একেবারে সোজা হয়ে উঠে বসলো। খুশী ভরা গলায় জিজ্ঞেস করলো "তাই নাকি?" মৈত্রেয়ী বল্‌লো "দেখলিনা সে জন্যেই তো কিছু খেলাম না, আমি আবার তোর চেয়েও এককাঠি ওপরে, ডিম, মাছ মাংসের গন্ধ নাকে গেলেই আর রক্ষা নেই, বলে আবার সে সাধনার কানে কানে কি বল্‌লো। সাধনা মৈত্রেয়ীর গলা জড়িয়ে বল্‌লো "বলিস্ কি? একই টাইম যে রে?"

"সত্যি?"

"সত্যি।"

দুই সখী পরস্পরের কণ্ঠলগ্ন হয়ে হেসে একেবারে বিছানার উপর গড়িয়ে পড়লো···।

ADDITIONAL ATTRACTION !!!
Short films have played a vital role in the industrial, economic and cultural progress of America, Britain and other great western nations, in the last few decades.
To-day India, too, is producing her own short films... They reflect the myriad facets of her national life, her war effort, and the rapid strides forward she is making in almost every sphere.
This is what makes them a new and progressive feature of cinema entertainment. . . . . . Films that inform, instruct and inspire.
AT YOUR FAVOURITE THEATRE EVERY WEEK

রবীন্দ্র-প্রশস্তি*
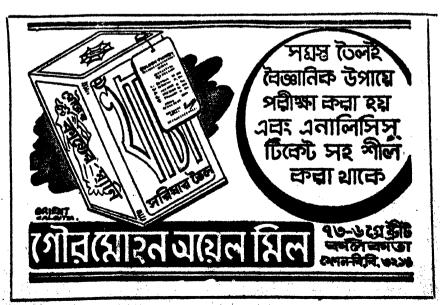
—রায় বাহাদুর শ্রীনিবারণচন্দ্র ঘোষ, ও-বি-ই
(ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার)

আমাদের পরম গৌরবের বিশ্বকবির বহুমুখী প্রতিভা, অগাধ পাণ্ডিত্য, জগতে অতুলনীয় সাহিত্য, কাব্য আর সঙ্গীতসম্ভার, তাঁর ঋষিকল্প ব্যক্তিত্ব, আর সর্ব্বোচ্চে তাঁর মহামানবত্ব, কোনটীর বিষয়ই আলোচনা সহজসাধ্য নয়—বিষয়ের ব্যাপকতা আর বিশালতাই তার কারণ। তবে সেই মহাপুরুষ বিশ্বকবির সান্নিধ্য লাভের সুযোগ কয়েকবার আমার ভাগ্যে ঘটেছিল—সেই সম্বন্ধে দুএকটি কথা, আর তাঁরই বাণীর যৎসামান্য আলোচনা করে গঙ্গাজলে গঙ্গা-পূজার মত আর কিছু না হোক নিজেকেই কৃতার্থ মনে করব।

প্রথম দেখি তাঁকে ১৯০৫ সালে বাগবাজারে পশুপতি বোসের বিরাট প্রাঙ্গনে—বঙ্গব্যবচ্ছেদ আর স্বদেশী আন্দোলনের যুগে। বিজয়া সম্মেলনের স্মৃতি-সভার উদ্বোধন হ'ল তাঁর কণ্ঠের অমর সঙ্গীতে। আর সভার কার্য্যশেষ হ'ল তাঁর অভিভাষণে আর রাখীবন্ধনের প্রবর্ত্তনে—বাংলা দেশের সে একটা চিরস্মরণীয় দিন। এ ত গেল দূর থেকে দেখা—১৯২২ সালে বিশ্বকবির সঙ্গে প্রথম পরিচয় লাভ ঘটে। যে বৎসর প্রতীচ্য ভ্রমণে যাই—আমাদের দেশের গৌরব কবিকে আর তাঁর সৃষ্ট শান্তি নিকেতন না দেখে যেতে মন সরলো না। সেদিনকার স্মৃতি আমার জীবনে একটী পরম পুণ্যস্মৃতি হয়ে রয়েছে। তখন সঙ্গীতাচার্য্য দীনেন ঠাকুর জীবিত—প্রাতে শান্তিনিকেতনে পৌঁছে আহারাদির পর তাঁরই বাসায় জমায়েত হওয়া গেল, গানের মজলিস প্রায় সারাদিন চলল—কবির গানের সে কি অভিব্যক্তি! কবির গান অনেকের কণ্ঠেই শুনেচি কিন্তু তেমনটী আর শুনিনি। বেলা চারটের পর কবির কাছে যাওয়া হ'ল। তাঁকে দর্শন করলে, তাঁর সামনে দাঁড়ালে মাথা আপনি নত হয়ে যায়—কেবলই মনে হতে লাগল কত ভাগ্যে এই মহামানবের সান্নিধ্য লাভের সুযোগ ঘটল—কি অপূর্ব্ব প্রতিভার শ্রী, কি প্রাণস্পর্শী তীক্ষ্ণ অথচ সৌম্য দৃষ্টি। তাঁর বয়স তখন ৬০ ছাড়িয়েছে কিন্তু শ্বেতশ্মশ্রু আর শ্বেত কেশ ছাড়া বার্দ্ধক্যের আর কোন লক্ষণই তাঁর ছিল না—শরীর বলিষ্ঠ, বীর্য্যবান, কথাও সেই রকমই ভাবগম্ভীর আর তেজোদ্দীপ্ত। তখন দেশের রাজনৈতিক গগন তমসাচ্ছন্ন—দেশের কথাই হল, কি সে কথা! প্রতি কথায়, প্রতি শব্দে তাঁর গভীর স্বদেশপ্রেম, আর দেশের দুঃখে নিদারুণ অন্তরবেদনা ফুটে উঠেছিল। একটা কথা আমার বেশ স্পষ্ট মনে রয়েচে—তাঁর কথা দেশ সম্যক্ ভাবে উপলব্ধি করলে না, তাঁর সেই প্রত্যাদিষ্ট উপদেশ তখন দেশ নিতে পারলে না ব'লে একটা দারুণ বেদনা তাঁর মনে লেগেছিল—সে উপদেশ নিতে পারলে হয়ত দেশের রাজনৈতিক ধারা অন্য পথে চালিত হ'ত।

সে সময় সিলভান লেভি শান্তিনিকেতনে রয়েচেন। তখন সন্ধ্যার পর কলাভবনে নিয়মিত কবির কাব্য পাঠ হয়। কলা-ভবনের সুবৃহৎ হলে খাঁটী বাংলা আসর পাতা হয়েচে—ধপ্ ধপে সাদা চাদর—পশ্চিমদিকের মধ্যস্থলে একখানি মাত্র আসন আর তার সামনে পুস্তক সন্নিবেশের জন্যে একটা ছোট্ট সাদা রং করা চৌকী। একটা স্বচ্ছ শুচি, পবিত্র ভাব। বিজাতীয় অনুকরণের কোন আসবাব পত্রের কোন লেশমাত্র কোথাও দৃষ্ট হয় না। যথাসময়ে কবি এসে পূর্ব্বাস্য হয়ে বসলেন। বামপার্শ্বে ফরাসী জাতীয় গৌরব মহামতি পণ্ডিতপ্রবর লেভি একখানি বই নিয়ে গুরু-সকাশে শিষ্যের মত অতি বিনয় সহকারে কবির বসার পর সকলের সঙ্গে উপবিষ্ট হলেন। সে দিন "বলাকা" পাঠ হল। কবির পাঠভঙ্গী আর ব্যাখ্যা—সে এক অপূর্ব্ব অনুভূতির বিষয়। তাঁর কাব্যের অতুলনীয় ভাষা আর ভাবসম্পদ তাঁর কণ্ঠে আরও ফুটে উঠে মূর্ত্ত হয়ে উঠতে লাগল।

আবার দেখা হল শান্তিনিকেতনে কবির সপ্ততিতম জন্মতিথি পূজার অনুষ্ঠানে। আশ্রমে প্রত্যূষে সামগান, কবির সঙ্গীত গীতি, তারপর আমবাগানে বেদীতে তাঁর প্রতি আশ্রমিক আশ্রমিকাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন, তাঁর অভিভাষণ—এমন প্রাণস্পর্শী আর হৃদয়গ্রাহী অনুষ্ঠান আর কখনও দেখি নি—সে যেন আমাদের এই জরামরণক্লিষ্ট সংসারের নয়—কোন দেবলোকের অনুষ্ঠান। সান্ধ্য-উৎসব হবার কথা ছিল মুক্ত আকাশের তলে আমবাগানে, কিন্তু দারুণ ঝড় বৃষ্টি হওয়ায় তা হল না। রাত্রে উত্তরায়ণের বারান্দায় উৎসব হল। কবির নিজের পরিচালনায় নৃত্যগীতাভিনয়—সে এক অদৃষ্টপূর্ব্ব অনুষ্ঠান—গীতি আর নাট্যকলার চরম অভিব্যক্তি।

শান্তিনিকেতনে আরও কয়েকবার দেখা হয়েচে। যখনই তাঁর দর্শন লাভের সুযোগ ঘটেচে তখনই একটী অপূর্ব্ব অনুভূতি প্রাণস্পর্শ করেছে। একবার আমার কন্যার autograph বই নিয়ে গেছলেম তাঁর সই নিতে—কত যত্ন করে বল্লেন, 'রেখে যাও কিছু লিখে দেব।' কয়েকদিন বাদে এই দুটী ছত্র কবিতা লিখে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

"দিনের প্রহরগুলি হয়ে গেল পার
বহি কর্ম্মভার,
দিনান্তে ভরিছে তারি রঙিন মায়ায়
আলোর ছায়ায়।"

১৯৪০ সালের মে মাসে কালিমপঙে দেখা—ছুটির ক'টা দিন কত আনন্দেই কেটেচে—তাঁর প্রসঙ্গ নিয়ে মজলিস বসত প্রতি সন্ধ্যায়—দুদিন বৈকালে কবির সঙ্গে দেখা হয়েছিল—কত কথা, কত হাস্যরস, নামকরণ নিয়ে কত গল্প—সব কথাতেই একটা অপরূপ মানবত্ব human touch যা সহজে লোকে ভাবতে পারে না যে অতবড় একজন জগদ্বিখ্যাত মহামানবের কাছে পাওয়া যায়। তিনি বহু উচ্চে হলেও যখনই যাদের সঙ্গে তিনি কথা কয়েছেন তাঁরা তাঁকে একান্ত নিকটের এই অনুভূতি নিয়ে সকলেই তাঁর কাছ থেকে ফিরেচেন, আমার এই মনে হয়।

শেষ দেখা হল ২৫শে জুলাই ১৯৪১ মহাপ্রস্থানের মাত্র ১২টী দিন পূর্ব্বে। অস্ত্রোপচার করা স্থির হওয়ায় তাঁকে বোলপুর থেকে কলকাতায় আনতে হবে। কবিকে যতদূর সম্ভব আরামে নিয়ে আসবার জন্যে Saloon নিয়ে ২৪শে বোলপুর যাই ও ২৫শে তাঁকে নিয়ে প্রাতে ৮টার সময় রওনা হয়ে বেলা ২॥০ নাগাদ হাওড়ায় পৌঁছাই।

* গত ২১শে মে ১৯৪৪ রবিবাসরে রবীন্দ্র-স্মৃতিতর্পণ দিবসে পঠিত।

রোগক্লিষ্ট দেহে কবির তখন চলবার শক্তি নেই—bus-এতে Stretcherএ করে এনে তাঁকে Saloonএ তোলা হল। গাড়ীতে উঠে বসতে চাইলেন—জানলার পাশে আরাম কেদারায় বসে অনেকটা পথ এলেন। অজয় নদী দেখে বৃদ্ধের মুখমণ্ডল দীপ্ত হ'য়ে উঠল—বোধ করি বিশ্বকবি মনে মনে জেনেছিলেন এই বুঝি শেষ দেখা। বর্দ্ধমানের কাছাকাছি এসে শুইয়ে দেওয়া হল—শোবার পর গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "কেমন লাগছে, কোন কষ্ট নেই ত?" বললেন, "বেশ আরামেই ত চলেছি মুণ্ড খেতে খেতে।" মুণ্ড অর্থে চিঁড়ের মণ্ড, তখনও হাস্যরস।

বর্দ্ধমান ছাড়বার পর কবির খাবার বিষয় এক সমস্যা উপস্থিত হ'ল। সঙ্গে যা খাদ্যাদি ছিল তা খেতে চাইলেন না, বল্লেন 'এক রকম বিস্কুট আছে যা নোন্তাও নয় মিষ্টিও নয় অথচ কুড়কুড়ে। সেই বিস্কুট দুধ দিয়ে খেতে ইচ্ছে করচে। Cream-cracker বিস্কুট। কখন কি প্রয়োজন হয় বলে অতি সাবধানতার সঙ্গে নানান জিনিষ নিয়েই কবির সেবক সেবিকারা বেরিয়েছিলেন তবে cream cracker বিস্কুট যে প্রয়োজন হ'তে পারে তা কেউ আর ভেবে উঠতে পারেন নি। এদিকে কবির ইচ্ছানুরূপ খাবার না দিতে পারার মত দুরদৃষ্ট একেবারে অভাবনীয়। কবির ঘর থেকে ডাক্তার এসে দারুণ উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার কাছে ক্রীম ক্র্যাকার বিস্কুট আছে কি না। সাধারণতঃ এই বিস্কুট চা-সহযোগে পথে খাবার জন্যে আমার বেহারা এনে থাকে। সৌভাগ্যক্রমে টিন্ কাগজে মোড়া খান কয়েক বিস্কুট পাওয়া গেল। দেড়খানি বিস্কুট কবি দুধের সঙ্গে অত্যন্ত তৃপ্তির সঙ্গে খেলেন। শুনে আমার প্রাণটা আত্মপ্রসাদে ভরে উঠল—সামান্য জিনিষ, কিন্তু ঐটা না পাওয়া গেলে সকলেরই ক্ষোভের আর সীমা থাকত না। তাঁর দৈহিক শক্তি ক্ষীণ হলেও ভাবতে পারি নি যে তাঁর মহাপ্রস্থানের সময় এত সন্নিকট—বস্তুত আমি আশা করেছিলাম যে একটু সেরে উঠলে আবার তাঁকে তাঁর শান্তির নিলয়—তাঁর আদরের শান্তিনিকেতনে পৌঁছে দেব। সে আশা আর ফলবতী হ'ল না—তবে তাঁকে নিয়ে আসবার এই অতি সামান্য সেবার সৌভাগ্যটুকু পেয়ে নিজেকে ধন্য জ্ঞান করচি।

আমাদের দেশের চিন্তাধারার চরম অভিব্যক্তি উপনিষদ—দেশে ও বিদেশে একথা বহুদিন ধরে স্বীকৃত হয়ে এসেছে। আমাদের বিশ্বকবি সেই উপনিষদের অর্থাৎ ঋষিদেরই অন্যতম। বিশ্বের মাধুর্য্যের মধ্যে তিনি বিশ্বপতির লীলা অহরহ দেখেছেন আর তাঁর অতুলনীয় ভাষায় তাঁর অনুভূতি লিপিবদ্ধ করে রেখে গেছেন—জগতের জন্যে বিশেষ করে আমাদের এই বঙ্গবাসীদের জন্যে। তাঁর গানে ছন্দে সেই আদ্য ঋষিদেরই চিন্তাধারা মূর্ত্ত হ'য়ে উঠেছে :—

"তপোবন তরুচ্ছায়ে মেঘমন্দ্র স্বর—
ঘোষণা করিয়াছিল সবার উপরে
অগ্নিতে জলেতে এই বিশ্ব চরাচরে
বনস্পতি ওষধিতে এক দেবতার
অনন্ত অক্ষয় ঐক্য। সে
বাক্য উদার এই ভারতেরি।"

সেই ঋষিদেরই মত বিশ্বের ছবি এঁকেচেন :—

"তাঁহারা দেখিয়াছেন বিশ্ব চরাচর
ঝরিছে আনন্দ হতে আনন্দ নির্ঝর,
অগ্নিতে প্রত্যেক শিখা ভয়ে তব কাঁপে,
বায়ুর প্রত্যেক শ্বাস তোমারি প্রতাপে,
তোমার আদেশ বহি মৃত্যু দিবারাত
চরাচর মর্ম্মরিয়া করে যাতায়াত,
গিরি উঠিয়াছে ঊর্দ্ধে তোমার ইঙ্গিতে,
নদী ধায় দিকে দিকে তোমার সঙ্গীতে ;
শূন্যে শূন্যে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা যত
অনন্ত প্রাণের মাঝে কাঁপে নিয়ত।"

আবার গেয়েছেন—

"আমি জেনেছি তাঁহারে
মহান্ত পুরুষ যিনি আঁধারের পারে—
জ্যোতির্ম্ময়, তাঁরে জেনে, তাঁর পানে চাহি
মৃত্যুরে লঙ্ঘিতে পার, অন্য পথ নাহি।"

'গীতাঞ্জলী'র একটি গানে পরমাত্মলীলার কি অপরূপ ছবিই তুলে ধরেছেন :

"কথা ছিল এক তরীতে কেবল তুমি আমি,
যাব অকারণে ভেসে কেবল ভেসে ;
ত্রিভুবনে জানবে না কেউ আমরা তীর্থগামী
কোথায় যেতেছি কোন দেশে সে
কোন্ দেশে
কূলহারা সেই সমুদ্র মাঝখানে
শোনাব গান একলা তোমার কানে
ঢেউএর মতন ভাষা বাঁধনহারা
আমার সেই রাগিনী শুনবে নীরব হেসে।"

তাঁর গভীর দেশপ্রেম আবার ফুটে উঠল বিশ্বদেবের মূর্ত্তিতে—স্বদেশেও দেখলেন তিনি সেই বিশ্বপতির বিশ্বরূপ—এর আর তুলনা হয় না'।

"হে বিশ্বদেব, মোর কাছে তুমি
দেখা দিলে আজ কি বেশে ?
দেখিনু তোমারে পূর্ব্ব গগনে
দেখিনু তোমারে স্বদেশে।
ললাট তোমার নীল নভতল
বিমল আলোকে চির উজ্জ্বল
নীরব আশীষ সম হিমাচল
তব বরাভয় কর :—
সাগর তোমার পরশি চরণ
পদধূলি সদা করিছে হরণ ;
জাহ্নবী তব হার আভরণ
দলিছে বক্ষপর।"

বিশ্বের পূজক কবি আবার মহামানবের সাগরতীরে সকলকে আহ্বান করেছেন—সব ভেদাভেদের অতীত সে আহ্বান—

"এস ব্রাহ্মণ শুচি করি মন
ধরো হাত সবাকার
এস হে পতিত, হোক অপনীত
সব অপমান ভার।"

বিশ্বকবির তুলনা কাব্যজগতে নাই বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। কোন কবি সারা জগৎ এমন করে জয় করতে পারেন নি! কবির প্রশস্তি ত সকলেই অনেক শুনেছেন—১৯২৬ সালে ইটালীতে Prof. Pavolini সংস্কৃত ভাষায় যে কবিপ্রশস্তি জ্ঞাপন করেছিলেন তা হয়ত অনেকের জানা না থাকতে পারে। Pavolini এই সংস্কৃত শ্লোকটী—কবিকে উপহার দিয়েছিলেন :

"পুষ্পপুরমিতি খ্যাতং শ্রুত্বা বাক্যামৃতং গুরোঃ
এযাত্যভিনবাং সংজ্ঞাং ফলপুরমতঃ পরম্।"

'হে গুরু, এই পুষ্পময় নগর তোমার অমৃত বাক্য শ্রবণের পর নব সংজ্ঞা লাভ করে ফলময় পুরে পরিণত হ'ল।'

বাঙ্গালীর জাতীয় উৎসব বৎসরের পর বৎসর শরৎকালে অনুষ্ঠিত হয়ে আসচে—শারদোৎসবের বিজয়া সম্মেলনের দিন বাঙালী মাত্রেরই প্রাণে একটা নবচেতনার সারা পড়ে, সে সাড়া স্থায়ী হয় না এই আমাদের দুর্ভাগ্য। এক স্মরণীয় বিজয়া সম্মেলনে কবির প্রার্থনার কথা কবির ভাষাতেই স্মরণ করে দিয়ে এ প্রসঙ্গ শেষ করি। কবি বলেছিলেন :—

"হে বন্ধুগণ, আজ আমাদের বিজয়া সম্মিলনের দিনে হৃদয়কে একবার আমাদের এই বাংলাদেশের সর্ব্বত্র প্রেরণ ক'রো। হিমাচলের পাদমূল হইতে দক্ষিণে তরঙ্গমুখর সমুদ্রকূল পর্য্যন্ত ; নদীজাল জড়িত পূর্ব্ব সীমান্ত হইতে শৈলমালা বন্ধুর পশ্চিম প্রান্ত

(শেষাংশ ২২শ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

কমরেড লেনিন

—শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

লেনিন

তিনবছর পরে ভলোডিয়া নিষ্কৃতি পেল, নির্বাসন থেকে ফিরে এল পিটার্সবার্গে।

আবার সুরু হোল আইন-পড়া। দু'বছরের মধ্যে আইন পরীক্ষায় পাশ করে তিনি ওকালতি সুরু করলেন।

কিন্তু ভালো আইনজীবি হওয়ার চেয়ে ভালো বিদ্রোহী হওয়ার দিকেই তাঁর আগ্রহ ছিল বেশী। সেই জন্যই তিনি সহরের কুলিমজুরদের মাঝে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন, তাদের মুখ থেকে শুনতে লাগলেন তাদের দুঃখ-কাহিনী।

ভলোডিয়া জানতেন এই সব কুলিমজুরেরাই জাতির প্রাণ, এদেরই প্রাপ্য অর্থ শোষণ করে ধনীরা বেঁচে আছে, এদেরকেই সকলের আগে সচেতন করতে হবে। বস্তীর যে সব ঘরে আলো ঢোকে না, দরজার পাশে আবর্জনার স্তূপ জমা হয়, নর্দমার দুর্গন্ধ ভেসে আসে বাড়ীর ভিতর থেকে, সেইখানেই বসে ভলোডিয়ার আলোচনার বৈঠক। কি করে আসবে মুক্তি তারই কর্ম-পদ্ধতি স্থির হয় একে একে।

ব্যাপারটা চাপা রইল না, পুলিশের জুলুম সুরু হোল পুরোমাত্রায়। বিপ্লবীরাও পুলিশের দৃষ্টিকে ফাঁকী দেবার জন্য সুরু করলো নানা ছল চাতুরী। ভ্লাডিমির ইলিচ্ উলিয়ানভের নাম বদলে হোল নিকোলাই লেনিন।

লেনিন বললে—মালিকের বিরুদ্ধে লড়তে হবে। খাটুনির সময় কমাতে হবে, মজুরী বাড়াতে হবে, স্বাস্থ্যকর বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে, ভালো চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু ধনী মালিকেরা তা করতে চাইবে না, তাতে তাদের লাভ কমে যাবে। সেজন্য সংগ্রাম করতে হবে।

শ্রমিক সঙ্ঘ গড়ে উঠলো।

একটি বাড়ীর মাটির নীচে এক চোরা কুঠরীতে বসলো এক ছাপাখানা: ইস্তাহার আর ছোটছোট পুস্তিকা ছাপা হয়ে বেরুতে লাগলো সেখান থেকে। মেয়েরা খাবারের ঝুড়ীর মধ্যে সেই সব কাগজপত্র নিয়ে গিয়ে গোপনে বিলি করে আসতো কারখানার ভিতরে। মজুরদের মধ্যে যারা পড়তে জানতো তারা সেগুলো পড়তো, আর যারা পড়তে জানেনা তারা শুনতো। নানা প্রশ্নের আলোচনা হোত, বস্তির ঘরের মধ্যে বৈঠক বসতো, নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে তারা ক্রমশঃ সজাগ হয়ে উঠলো। কি চাই, কি না পেলে চলবে না, সেই সব পাবার আকাঙ্ক্ষায় তাঁদের মন ক্রমশঃ দুর্বার হয়ে উঠলো। শেষে সব মজুরেরা একদিন ধর্মঘট করে বসলো আঠারোশো-পঁচানব্বুই সালে।

ইস্তাহারের পর ইস্তাহার বেরুতে লাগলো, যে সব কারখানায় সেই ইস্তাহার পৌছালো সেখানকার লোকেরাও হাত গুটিয়ে বসে রইল। সমগ্র রাজধানীতে ব্যাপক ভাবে ধর্মঘট ছড়িয়ে পড়লো। কারখানার হাজার হাজার চাকা থেমে গেল একই সঙ্গে।

লোকসানের আশঙ্কায় মালিকেরা ক্ষেপে উঠলো। পুলিশ এগিয়ে এলো তাদেরকে সাহায্য করতে। কত লোককে ধরে যে পুলিশ মার দিল, এতটুকু সন্দেহ হলেই জেলে পুরলো, মজুরদের বাড়ী বাড়ী চললো খানা-তল্লাসী।

শেষে বেরুলো কয়েকখানি পুস্তিকা। বইগুলি লিখেছেন লেনিন নামে একজন লোক। লোকটীকে খুঁজে পেতে বেশী দেরী হোল না। পুলিশ লেনিনকে ধরে আদালতে হাজির করলো, বিচারে চার বছর কারাবাসের আদেশ হোল তাঁর উপর।

কিন্তু জেলে পাঠিয়ে লেনিনের কাজকর্মশক্তি এতটুকু ক্ষুণ্ণ করা গেল না। যে কাজে নেবেছেন সেজন্য একদিন যে জেলে যেতে হবে একথা তিনি জানতেন, সেইজন্য আগে থেকেই দল গড়ে কর্মপদ্ধতি ঠিক করে রেখেছিলেন, সেনসরের চোখকে ফাঁকী দেবার জন্য অদৃশ্য কালি তৈরী করেছিলেন যা দলের লোক ছাড়া কেউ জানতো না, সাংকেতিক কথার সৃষ্টি করেছিলেন যা দলের লোক ছাড়া বুঝবে না। জেলের মধ্যে যে সব বই আসতো পড়ার জন্য তারই পাতার 'মার্জিনে' দুধ দিয়ে ইস্তাহার লিখে বাইরে পাঠিয়ে দিতেন। শাদা পাতাগুলি আগুনের উপর ধরলেই শব্দগুলো ভেসে উঠতো চোখের সামনে, তাই থেকেই হাজার হাজার ইস্তাহার ছেপে প্রচার হোত কারখানায় কারখানায়। দলের কাজ আটকে রইল না একদিনের জন্যও।

কর্ত্তৃপক্ষ ব্যাপারটা ঠিক বুঝলো না, তবে এটুকু বুঝলো যে এই লোকটীকে এখান থেকে সরিয়ে দেওয়াই ভালো, আদেশ দিলে—সাইবেরিয়ায় যেতে হবে!

(ক্রমশঃ)

প্রত্যাখ্যান

(উপন্যাস)

শ্রীসুধাংশু কুমার হালদার, আই, সি, এস্

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(৩)

আগেকার দিনের রাজারাজড়ারা যখন তাঁদের প্রাসাদের একঘর থেকে আর একঘরে যেতেন, তাঁদের পথ দেখাবার লোক থাকত সঙ্গে। এটাই ছিল সেকালের রাজকীয় বড়মানষী। দশবিশজন তাঁবেদার দশদিকে ধেয়ে যাবে, নইলে আবার রাজা কিসের! এখনো চাপরাশি পরিবৃত হাকিমকে দেখলে সেই সাবেকি বড়মানষীর কথাই মনে পড়ে। সেকালের সঙ্গে একালের তফাৎ অনেক ঘটেছে। এখন অনুচরবর্গের বাহুল্য হয়েছে একটা লজ্জার বিষয়। একালের ছেলেমেয়েরা নিঃসঙ্গ এমণকে বলিষ্ঠমনের পরিচয় বলে ভাবে।

প্রকাণ্ড সিডান-বপু মোটর প্রচণ্ডবেগে অজস্র ধুলা উড়িয়ে চলেছে, রাস্তার দুপাশের লোক এবং গোরুর গাড়ী ফেলে দিয়ে গাড়োয়ানের দল সভয়ে পথ থেকে নেমে পড়ছে। ষ্টিয়ারিংচক্রে হাতদুটি মেলে বসে আছেন মল্লিকা বোস, ডাক নাম যাঁর মিলি। ঈষৎ নিমিলিত আঁখির দৃষ্টি রয়েছে সামনের দিকে আবদ্ধ, চুলগুলা কপালে কপোলে উড়ে উড়ে এসে পড়েছে, মাথার নিকষকৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশ কটা দেখাচ্ছে। দক্ষিণ পদাগ্র অ্যাক্‌সিলারেটারের ওপর গতিবেগের তালে তালে কাঁপছে। কবি তাঁর অনুপম ভাষায় বলেছেন, "পদতাণ্ডবে জীবনের দোলা, অঙ্গে মরণভস্ম।" আট সিলিণ্ডারের গাড়ীখানায় মল্লিকার পদতাণ্ডবে জীবনের দোলা লেগেছে যেন, গর্জ্জন ক'রে উড়ে চলেছে যন্ত্রদানব। এই তো চলার আনন্দ, দ্রুত, দ্রুত, আরো—আরো দ্রুত। পঁচিশ মাইল, ত্রিশ মাইল, চল্লিশ, পঞ্চাশ, পঞ্চান্ন—স্পীডোমিটারের কাঁটাটা অসহ্য পুলকে গতিবেগের উচ্চচূড়ায় কাঁপছে থরথরিয়ে। কিন্তু দুঃখের বিষয় গতির আবার নিবৃত্তি আছে, নৃত্যের দোলার অঙ্গেই যে মরণের ভস্ম মাখানো। হঠাৎ একটা কড়্ কড়্ ঝন্ ঝন্ শব্দ ক'রে গাড়ীটা কেঁপে উঠল। অগত্যা গতিবেগ হ্রাস ক'রে গাড়ীখানা থামিয়ে দরোজা খুলে নেমে এলেন মল্লিকা। পিছনের চাকাটা থেকে টায়ার টিউব দুটোই কোন সুযোগে একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেছে,—সংসার খরচের চাপে যেমন টাকাগুলো বাক্‌স থেকে কি রকম ক'রে অদৃশ্য হয়ে যায়। শুধু এদিককার লৌহচক্রটি অবলম্বন ক'রে গাড়ীখানা দাঁড়িয়ে আছে। অবাধগতির বিরুদ্ধে এই চক্রের চক্রান্তই হয়েছে জয়ী। আপাততঃ এইটুকুই বোঝা গেল। কিন্তু এই সমস্ত ঘটনাপরম্পরা যে কোন্ অদৃশ্য চক্রীর চক্রান্ত সেটা বোঝা গেল না।

বৃদ্ধ বেহারা বিষণ সিং পিছনের গদীতে বসে নিশ্চিন্ত আরামে একটু ঘুমিয়ে নিচ্ছিল। কুঠীতে ফিরে গিয়ে তাজা গমের রুটির সঙ্গে অড়হর-দালের সংযোগ ঘটবে, এজন্য তার মনও ছিল বেশ প্রফুল্ল। হঠাৎ চমক লেগে তার ঘুমটা গেল ভেঙে।

"টায়ার টিউব বেরিয়ে গেল, আর তুমি দিব্যি ঘুমুচ্ছ বিষণ"—মল্লিকা বললেন।

"তাইতো দিদিমণি, তাই তো!" ব'লে বিষণ সিং তার পাগড়ীটা মাথায় পরে নীচে নেমে এল।

"তাইতোই-বটে! কতক্ষণ আগে লিক্ হয়েছে, চাকা ব'সে গেছে, ঘড়্ ঘড়্ শব্দ নিশ্চয়ই হ'য়েছে, অথচ সেই চাকাটার ওপর বসেও তুমি কিছু টের পাওনি! তাইতোর কথাই তো বিষণ!"

এখন উপায়! আছে বটে দুটো স্টেপনী, কিন্তু চাকা খোলা, চাকা পরানো, হাওয়া দেওয়া—এ সকলের মধ্যে যে গলদঘর্ম্মকর ঝঞ্ঝাট আছে সে তো সহজ নয়, এবং এসব কাজ মল্লিকা করেনও নি কোনদিন। তাঁর মা ড্রাইভারকে সঙ্গে নিতে বলায় তিনি বলেছিলেন, তার চেয়ে একটা চাকরদের ব্যাটেলিয়ান্ সঙ্গে দাও না মা, তারা কুচ্‌কাওয়াজ করতে করতে আগে আগে চলুক।" এখন দেখা যাচ্ছে মা'র কথাটা শুনলে নেহাৎ মন্দ হ'ত না।

"বিষণ, সহর এখান থেকে কতদূর হবে?"

"বহুৎ দূর দিদিমণি, তিনক্রোশের কম নয়!"

"পারবে না তুমি হেঁটে চলে যেতে? বাড়ীতে খবর দিতে?"

"আ—মি দিদিমণি?" ব'লে বিষণ বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে তাকাল।

আসল কথা হচ্ছে যে আজ বিশ বছর ধরে সে একপাও না হেঁটে হেঁটে হাঁটবার অভ্যাসই হারিয়েছে। জমিদার বাড়ীর বেয়ারা যে পায়ে হেঁটেছে এমন অপবাদ কোনো মারাত্মক শত্রুতেও দিতে পারবে না। তার ওপর বুড়ো চাকর ব'লে তার সাতখুন মাপ। সুতরাং এহেন বিষণকে ছ'মাইল হেঁটে যেতে বলাও যা আর পঙ্গুকে গিরিলঙ্ঘন করতে বলাও তা।

এদিক ওদিক তাকিয়ে মল্লিকাদেবী বললেন, "দূরে একটা বস্তীর মতন দেখা যাচ্ছে, বোধ হয় কারো কাঠের গুদাম। যাও তো বিষণ, চট্ ক'রে ওখান থেকে কাকেও ডেকে নিয়ে এসো।"

বিষণ বললে, "আমি যাবো দিদিমণি, তোমাকে একলা ফেলে রেখে! তাহলে মেম সাহেব ভীষণ গোসা হবেন যে!"

"তবে তুমি গাড়ীতে ব'সে আরাম করো, আমিই যেয়ে কাকেও ডেকে আনি। তবে একটু সাবধানে থেকো, রাত্তিরে এখানে বাঘের ভয় আছে।"

আলস্যের অপবাদে লজ্জা পাওয়াতেই হোক্ আর বাঘের ভয়েই হোক বিষণ আর দ্বিরুক্তি না ক'রে লোক ডেকে আনতে গেল।

মল্লিকা মোটরে উঠে রুমাল দিয়ে মুখ চোখ চুলের ধুলা ঝেড়ে ভ্যানিটি কেস্ থেকে পাউডার পাফ্, লিপষ্টিক্, চিরুণী বার ক'রে আয়নার সাহায্যে প্রসাধন সেরে নিলেন।

(ক্রমশঃ)

বিজনদা'র চিঠি

আমার আদুরে ভাই বোনেরা,

এবারে তোমরা মহাখুসী হয়ে উঠেছো নিশ্চয়ই যে তোমাদের লেখা উপন্যাসের শেষাংশ তোমাদেরই একজন প্রিয় লেখক লিখেছেন বলে। এই উপন্যাসের প্রসঙ্গে একটা মজার চিঠি তোমাদের ঐ প্রিয় লেখকের কাছ থেকে আমি পেয়েছি। সেটা তোমাদের পড়ে শোনাই (ওর সম্বন্ধে কেউ কিছু বল্লে তোমাদের শোনান দরকার বলে মনে করি, কারণ উপন্যাসটা যে তোমাদেরই লেখা)...

ছুটির ঘণ্টার পরিচালক—

শ্রীমান বিজনকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

কল্যাণীয়েষু,

ভাই বিজন,

তুই একটা শেষ-করা গল্প শেষ করতে আমায় পাঠিয়েছিস কেন? তোর 'ছুটির ঘণ্টা'র বাচ্চা ছেলেদের সাচ্চা কথা যা ছিল সে তো তারা অনেক আগেই বলে শেষ করেছে! তুই যে ভাবে আরম্ভ করেছিলি, তার ইঙ্গিত এরা ধরতে পারেনি, ফলে ছাত্রদের উপন্যাসে কেবল মাষ্টার আর ছাত্রের উপদ্রব ছাড়া আর কিছুই নেই।

যাই হোক মৃত্যুভীত 'বীরু' আর দাদা-প্রিয় রাণুর যে অংশটুকু বলতে বাকী ছিল, কেবলমাত্র সেইটুকুই লিখলাম। ভবিষ্যতে যদি উপন্যাসের আয়োজন করিস, তবে গল্পের প্রথম দিকে আমাকে একটা chance দিস্।

স্নেহাশীর্ব্বাদ—

তোর বিধায়কদা'

* * *

প্রতিযোগিতা: প্রতিযোগিতার ফলাফল আসছে বারে জানাবো..."রাণু আর দাদা"কে আসছে বারে নিশ্চয়ই দেখতে পাবে।

ছুটির ঘণ্টার ব্যাজ: বর্ত্তমানে ছুটির ঘণ্টার ব্যাজ তৈরী করান সম্ভব নয়, তাই তা উপহার দেওয়া বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছি। তা'ছাড়া অনেকে মূল্য দিয়ে ছুটির ঘণ্টার ব্যাজ নিতে চেয়েছে দেখলাম, কিন্তু ওতে আমার মত নেই, কারণ এ বাজারে অযথা পয়সা নষ্ট করা উচিত নয় বলে।...স্নেহ নিও।... তোমাদের বিজনদা।

এর শেষ কোথায়......

(আসরের ভাই-বোনেদের লেখা ধারাবাহিক বারোয়ারী উপন্যাস)

—শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য্য

(শেষ পরিচ্ছেদ)

বীরু, রাণু, সমীর, রেবা ও কল্যাণীদেবী চলেছেন ট্রেণে চেপে সোনার গাঁয়ে, কারণ আজ 'কল্যাণী সেবাশ্রমের' উদ্বোধন। ট্রেণ যেন আজ বড় আস্তে যাচ্ছে। মানুষের যে কেন ভগবান পাখা দেননি এই কথাটাই বীরু বুঝতে পারে না।...বর্ত্তমান যুগে মানুষের একমাত্র মোহ—'স্পীডে'র মোহ। সে মর্য্যাদা ট্রেণ দিতে পারে না, তাই ট্রেণের চেয়ে আজ এরোপ্লেনের চাহিদা বেশী।...কত কথাই যে আজ মনে পড়ছে বীরুর...!

"হুহু করে চলে যায় সবে, পূর্ণ করে বিশ্বতট অতি কলরবে"।

জীবন থেকে খসে গেল কত লোক, কত ঘটনা...। গেল বাবা, গেল মা, গেল গ্রামের আরও কত লোক...ছায়াছবির মত মনের পটে তারা ফুটে উঠেই মিলিয়ে যায়, রেখে যায় না তাদের কোন অস্তিত্ব...শুধু থাকে কথা, শুধু থাকে গান, শুধু থাকে স্মৃতি...

ট্রেণ এসে থামে সোনার-গাঁয়ে...বাবলা গাছের সারি মাথা দুলিয়ে জানায় স্বাগত অভিনন্দন...বলে, "এস এস গ্রামের ছেলে, গ্রামে ফিরে এস...মুখোস পরা সভ্যতার জগত থেকে ফিরে এস নিরহঙ্কার অনাড়ম্বর গ্রাম্য জীবন-যাত্রায়...ফিরে এস কালোর জগত থেকে সবুজের জগতে...আকাশ এখানে অনন্ত, বাতাস এখানে অবারিত... বীরু মনে মনে জানায় তাদের প্রণাম...

* * *

উৎসব শেষে ফিরে এল সকলে রাণুদের বাড়ীতে। নিরাড়ম্বর উৎসবের স্মৃতি ফুলের মৃদু সুগন্ধের মত সকলেরই মনে বিরাজ করতে লাগলো। স্থির হ'ল, এখানে দু'চার দিন থেকে কল্যাণীদেবী, সমীর আর রেবা ফিরে যাবে কোলকাতায়, এবং বীরু রাণু থাকবে তাদের গ্রামে। যে জন্য এত আয়োজন, এত স্বপ্ন, তাকে সার্থক করতে তারা দুই ভাই বোনে থাকবে এখানে। শ্যামশঙ্করবাবু যে টাকা পাঠিয়েছেন, সেটা সেবাশ্রম ফণ্ডে রাখা হয়েছে, আরও একজন ডাক্তার নিযুক্ত হয়েছেন। নার্সের কাজে থাকবে রাণু।

কল্যাণীদেবী বললেন—চমৎকার হয়েছে কিন্তু সেবাশ্রমের বাড়ীটা। পল্লীগ্রামে এমন সুন্দর ছোট্ট-খাট্টো হাসপাতাল বড় একটা দেখা যায় না। তোর বাহাদুরী আছে বীরু!

—বাহাদুরী আমার না মা তোমার? বীরু বললে।

—ও! ও ব্যাপারটা বুঝি আমার ঘাড়েই তুই ফেলতে চাস?

—ঘাড়টা যে তোমার একটু শক্ত মা-মণি! রাণু বললে।

সকলে হেসে উঠলো।

* * *

একদিন পরেই দুর্য্যোগের কালো মেঘ ঘনিয়ে উঠলো এদের সকলের জীবনের দিগন্তে। অকস্মাৎ ঘণ্টা কয়েকের এসিয়াটিক কলেরায় কল্যাণীদেবী মারা গেলেন। সকলের সমবেত চেষ্টা ও আকুল ক্রন্দন কিছুই তাঁকে বিচলিত করতে পারলো না। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবার আগে তিনি বীরুকে ডেকে বললেন—ওরা রইলোরে, ওদের দেখিস।

* * *

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়ে উঠলো সোনার গাঁয়ের সোনার গায়ে। একটু আগেই চলে গেছে সদ্য মাতৃহারা সমীর আর রেবা। বীরু চুপ করে বসে আছে সেবাশ্রমের দোতালার বারান্দায়। মনটা তার আচ্ছন্ন হয়ে আছে কল্যাণীদেবীর শোকে। পরশু দিনও এই সেবাশ্রমে তিনি ছিলেন, মুখরিত হয়েছিল এর প্রতিটি কক্ষ তাঁর সুমধুর হাস্য কলোচ্ছ্বাসে। আজ তিনি নেই, আছে তাঁর কাজ, আছে তাঁর প্রেরণা, আছে তাঁর রেখে যাওয়া গ্রামের কল্যাণের জন্য শত সহস্র উপদেশ···

কিসের একটা পচা গন্ধ আসছে নাকে?···ও! রাণুর সেই পুটলিতে বেঁধে দেওয়া অব্যবহার্য্য লুচি তরকারীর গন্ধ··· কে যেন কাঁদছে দূরে···! অনেকটা দাশুর মায়ের মত গলাটা না? সেই যে মৃত দাশুর বুকের ওপর পড়ে দাশুরে' দাশুরে' বলে কেঁদেছিল সেইরকম। ···শ্যামশঙ্করবাবু বলছেন—" অন্যদিকে মন দেবার সময় এটা নয়; পরের প্রাণ বাঁচাবার সময় এটা নয়"··· মাথাটার মধ্যে কী রকম যেন ঝিম্ ঝিম্ করছে···কার প্রাণ কে বাঁচাবে? তার প্রাণই বা কে বাঁচাবে?···

মাটি থেকে একটা ভ্যাপসা গন্ধ উঠছে। যত লোককে আজ পর্য্যন্ত সোনার গাঁয়ে কবর দেওয়া হয়েছে, তাদেরই সম্মিলিত শবের গন্ধ নাকি?···মৃত্যু, সেতো আসবেই একদিন, তবে আর ভয় কিসের?

অনেক দূর থেকে, সমুদ্রপার থেকে বাতাস আসছে···তারই আরামের জন্য। বাঁশবনের মধ্য দিয়ে তার আওয়াজ শোনাচ্ছে

পোষাক পরিচ্ছদ

ইংরেজী বর্ণমালা প্যাটার্ণ

—শ্রীমতী বীণাপাণি দেবী

H

(১৩ ঘরে উঠিবে)

১ম কাঁটা—২ ঘর সাদা, ২ ঘর কাল, ৪ ঘর সাদা, ৪ ঘর কাল, ১ ঘর সাদা।

২য় কাঁটা—১ ঘর কাল, ৪ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ২ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ২ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ১ ঘর সাদা।

৩য় কাঁটা—৪ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ১ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ২ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ৩ ঘর সাদা।

৪র্থ কাঁটা—৪ ঘর সাদা, ৭ ঘর কাল, ২ ঘর সাদা।

৫ম কাঁটা—১ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ১ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ২ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ৩ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ২ ঘর সাদা।

৬ষ্ঠ কাঁটা—১ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ৩ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ১ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ২ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ১ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল।

৭ম কাঁটা—২ ঘর কাল, ২ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ৩ ঘর সাদা, ৩ ঘর কাল, ২ ঘর সাদা।

অনেকটা অনেকগুলি বিকৃত-মস্তিষ্ক লোকের অর্থহীন উচ্ছহাসির মতো।

—কে? মৃদুকণ্ঠে অস্পষ্ট ভাষায় উচ্চারণ ক'রে বীরু অজ্ঞান হয়ে পড়লো।

* * *

—বিজন?

—কে?

—আমি?···

—আবার কেন এসেছ?

—উপন্যাসের গল্পটা কেমন লাগলো?

—যাচ্ছেতাই!

এর উত্তরে শুধু একটু মৃদু হাসির শব্দ শোনা গেল।...

—কেবলমাত্র সত্য ঘটনা দিয়ে উপন্যাস হয় না দেবী, তাতে চাই কিছু মিথ্যার মোহ।

আবার একটু হাসির শব্দ···হাসি নাও হতে পারে···বাঁশবনের মধ্য দিয়ে হাওয়া বইছে, তার শব্দও হতে পারে···

—বিজন! বিজন! বিজনদা!

বিজনও কি অজ্ঞান হয়ে গেল নাকি?

—শেষ—

রান্নাঘর

কাঁচা আমের পানা

গরমেতে এই আমের পানা বড়ই উপকারী। ইহা রুচিকর, বলবর্দ্ধক, ইন্দ্রিয় সমূহের তৃপ্তিজনক ও দাহনাশক। প্রথমে কাঁচা আম লইয়া পোড়াইবেন। পরে জলে গুলিয়া খুব পাতলা করিয়া তাহার কাথ বাহির করিবেন। এই বারে উহাতে চিনি মিশ্রিত করিয়া পাতলা কাপড়ে ছাঁকিবেন, পরে ছোট এলাচির গুঁড়া দিবেন। চিনি অভাবে সন্ধব লবণ দ্বারাও চলিতে পারে।

বাদামের সরবৎ

বাদাম একসের, চিনি দুই সের। প্রথমে বাদাম ভিজাইয়া তাহার খোসা পরিষ্কার করিয়া মিহি করিয়া বাটিয়া রাখুন। এইবারে রস জ্বালে চড়াইয়া উহাতে বাদাম বাঁটা দিয়া নাড়িতে থাকুন, ফেনা উঠিলে কাটিয়া ফেলুন, বেশ ঘন ঘন হইলে নামাইয়া ঠাণ্ডা করুন। পরে বোতলে পুরিয়া মুখ বন্ধ করিয়া রাখুন। পান করিবার সময় এক গ্লাস জলে এক চাপ বরফ, গোলাপজল এবং বাদামের সরবত দিয়া পান করিতে দিবেন।

ফলসার সরবৎ

ফলসা এক সের, চিনি দুইসের। ফলসা মিহি করিয়া বাঁটিয়া পরিষ্কার পাতলা কাপড়ে ছাঁকিয়া রাখিবেন। পরে রস জ্বালে চড়াইয়া ফুটিয়া উঠিলে ফলসার রস উহাতে ছাড়িয়া দিবেন। এবং বেশ গাঢ় হইলে নামাইবেন। ঠাণ্ডা হইলে বোতলে পুরিয়া মুখ বন্ধ করিয়া রাখিবেন।

মিস্ পুষ্পরাণী দেবী
প্রভাকর বি, এ অনার্স,
নাগপুর।

খেলার মাঠে

শ্রীউমেশ মল্লিক বি, এ

মহমেডান স্পোঃ দুর্দ্ধর্ষ। কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও এ দলটিকে পরাজিত করা ছিল অভাবনীয় ব্যাপার। কিন্তু বর্ত্তমানে সর্ব্ব ভারতের বাছাই খেলোয়াড় নিয়েও মহমেডান দলের দৃঢ়তায় ভাঙ্গন ধরেছে। তাই তাদের পূর্ব্বের মত নিশ্চিত জয়লাভ সম্বন্ধে সংশয় জাগে। প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে ২।১ জন নূতন ব্যতীত পূর্ব্বের সেই নূর-মহম্মদ, জুম্মা খাঁ, সিরাজউদ্দিন, মাসুম, তাহের, তাজ মহম্মদ প্রভৃতিকেই দেখা গেল। এদলে নবাগত আমীন ও ইসমাইল। গত বুধবার ১৭ই মে এরা প্রথম ইষ্টবেঙ্গল দলের বিরুদ্ধে বিরোধিতা করে। প্রথম দিনের খেলায় তাদের উৎকর্ষের পরিচয় পাওয়া যায়। ফলে শীল্ড বিজয়ী ইঃ বিঃ দল ২ গোলে পরাজিত হয়। এ দলের জুম্মা খাঁ, সিরাজউদ্দিন এরূপ নিখুঁত ভাবে রক্ষণ বিভাগে দৃঢ়তার পরিচয় দেয় যে প্রতিপক্ষ দলের ফরওয়ার্ডদের মুহুর্মুহু আক্রমণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। নূর মহম্মদ এদলে চমৎকারিত্বের পরিচয় দেয়। মহমেডান দলের পক্ষে ইষ্টবেঙ্গলের ভূতপূর্ব্ব খেলোয়াড় আমিন ও নূর মহম্মদ গোল দেয়।

২০শে মে মোহনবাগানের কাছে ১ গোলে মহমেডান দল পরাজিত হয়। তৎপর ২২শে সোমবার মহমেডান দলের এরিয়ান্সের কাছে ২—১ গোলে পরাজয় সত্যই বিস্ময়কর, তবে এ দিনে মহমেডান দলের নিয়মিত খেলোয়াড় অনেকে যোগদান করে নি। ইষ্ট বেঙ্গল দলের মহমেডান স্পোঃ-এর নিকট পরাজয় অভাবিত। এ দলের পাগসলী যে নিশ্চিত গোলটি "মিস্" করেছেন তা তাঁর পক্ষে মোটেই প্রশংসনীয় নয়। হাফ্-ব্যাকদের খেলা মোটেই প্রীতিপদ হয় নি। ব্যাকে পি, চক্রবর্ত্তীর খেলা উল্লেখযোগ্য। শেষ মুহূর্ত্তে মহমেডান দল প্রদত্ত দ্বিতীয় গোলটি কে, দত্তের বাঁচান উচিত ছিল।

গত ১৯শে মে ইঃ বিঃ দল মহমেডানের নিকট পরাজয়ের পর স্পোঃ ইউঃ-এর বিপক্ষে খেলে ২—০ গোলে জয়লাভ করে। এদিন পাগসলীর পরিবর্ত্তে পি, মুখার্জী নামীয় ঢাকার এক নূতন খেলোয়াড় যোগদান করেন এবং দলের একটি প্রয়োজনীয় গোল দেন। প্রথম দিন হিসাবে এঁর খেলা মন্দ হয় নি। স্পোর্টিং দল খুবই ভাল খেলে, গোলেরও সুযোগ পায়, কিন্তু কে, দত্ত কয়েকটি সুন্দর

বল রক্ষা করেন যা কেবল তাঁরই পক্ষে সম্ভব।

গত ২২শে মে সোমবার ই: বি: দল বি, এ, রেল দলকে ৪—০ গোলে পরাজিত করে। এদিন সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট খেলা হয় নীলু-মুখার্জ্জীর। এ দু'দলের প্রতিযোগিতা যে বিশেষ আকর্ষনীয় হবে বলে আশা করা গিয়েছিল তা মোটেই সেরূপ হয় নি। সুশীল চ্যাটার্জী এদিন ই: বি: দলের পক্ষে খেলেন এবং কৃতিত্বের নিদর্শন স্বরূপ ১টি গোল দেন। এদিন রেল দলের বি, কর ও নিধু যোগদান করেনি।

ই: বি: দলকে পরাজিত করার পর মোহনবাগানের বিরুদ্ধে মহমেডান দল যে তীব্র প্রতিযোগিতা করবে এ আশা সবাই করেছিলেন। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে মহমেডান দল বিশেষ উচ্চ স্তরের খেলা দেখাতে পারে নি, ফলে মোহনবাগানের নিকট ১—০ গোলে পরাজিত হয়েছে। এদিন সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য খেলা হয় মোহনবাগান দলের রক্ষণ ভাগের। লীগ চ্যাম্পিয়ন দলের আক্রমণ ভাগের খেলাও অন্যান্য দিন অপেক্ষা ভাল হয়। আক্রমণ বিভাগে একমাত্র সেন্টার ফরওয়ার্ড বিজন বোসের খেলা নিকৃষ্টস্তরের হয়। অনিল দে'র খেলাও এদিন সুবিধাজনক হয় নি। এন, বোসের খেলা এদিন ভাল হয় এবং এন, বোসই দলের জয়নির্দ্দেশক গোলটি দেন। টি আও, শরৎ দাস, মান্না, দ্বিপেন সেন ও এন চ্যাটার্জী সুন্দর খেলেন। নির্ম্মল চ্যাটার্জী এদিন মোহনবাগানের পক্ষে প্রথম যোগদান করেন এবং একটি গোলও নিজে "স্কোর" করেন। কিন্তু "অফ্ সাইডের" অজুহাতে গোলটি অগ্রাহ্য হয়। বিচারকের সিদ্ধান্ত ভাল মনে হল না। বি, বসু এদিন ৩টি অব্যর্থ গোল করার সুযোগের অপব্যবহার করেন।

গত ১৮ই মে মোহনবাগান দল পুলিশকে কোনক্রমে ১—০ গোলে পরাজিত করে। কে রায় প্রয়োজনীয় গোলটি দেন। অনিল দে মান্না, এস দাস, দীপেনের খেলা ভাল হয়। পুলিশ দলের "পেনাল্টি কিক্"টি রাম ভট্টাঃ কৃতিত্বের সঙ্গে রক্ষা করেন। এরিয়ান্সের সঙ্গে খেলাতেও মোহনবাগান কোন ক্রমে ১—০ গোলে জয়লাভ করে। এরিয়ান্স প্রথমে ১টি গোল দেয় কিন্তু সেটি "অফ সাইড" বলে অগ্রাহ্য হয়।

নানাকথা

কবি-বাসরে রবীন্দ্র জন্মতিথি-উৎসব

গত ৭ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার অপরাহ্নে, বালিগঞ্জ পদ্মপুকুর রোডে, শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের আবাসে, রবি-বাসরের অনুষ্ঠিত "রবীন্দ্র জন্মতিথি উৎসব" সুসম্পন্ন হইয়াছে। সভায় সদস্যগণ ব্যতীত অন্যান্য বহু সুধী ব্যক্তি ও মহিলা যোগদান করিয়াছিলেন। রায় বাহাদুর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র সর্ব্বাধ্যক্ষ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

উৎসবে প্রধানত: রবীন্দ্র-সঙ্গীত এবং রবীন্দ্র-রচনা পাঠেরই ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। শ্রীমতী মমতা ঘোষ, সুকবি শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্র কৃষ্ণ লাহা যথাক্রমে "মুক্তি" "উর্ব্বশী" ও "হৃদয় যমুনা" কবিতা আবৃত্তি করিয়া সকলকে আনন্দ দান করেন। কুমারী শান্তা রায় চৌধুরী, রমা ঘোষ, অর্চ্চনা ঘোষ, শ্রীমতী আরতি দত্ত এবং শ্রীযুক্ত এ, আহাদের রবীন্দ্র-সঙ্গীতগুলি অতি সুন্দর হইয়াছিল। সভায় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত স্বরচিত একটি কবিতা এবং রায়বাহাদুর নিবারণ চন্দ্র ঘোষ (ই, আই, রেলের জেনারেল ম্যানেজার) একটী প্রবন্ধ পাঠ করিয়া কবির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ সেনগুপ্ত (ভারতীয় সাংবাদিক সঙ্ঘের সভাপতি), ডক্টর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী এবং সভাপতি মহাশয় সময়োপযোগী বক্তৃতা দ্বারা শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন।

গিরিশ-সঙ্ঘ

গত ৮ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার সন্ধ্যায় ৫ নং বাগবাজার ষ্ট্রীট ভবনে, শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের সভাপতিত্বে উক্ত সঙ্ঘের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ইহাতে স্থির হয় যে, আগামী গিরিশ-শত-বার্ষিকী উৎসব কালে গিরিশচন্দ্রের বহুমুখী প্রতিভার বিভিন্নদিক আলোচনা করিয়া একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করা হইবে। এই গ্রন্থে শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ, অধ্যাপক মন্মথ মোহন বসু, যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, কুমুদবন্ধু সেন, কিরণচন্দ্র দত্ত, কেশবচন্দ্র গুপ্ত, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, কালিদাস রায়, হেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, হেমেন্দ্র কুমার রায়, নরেন্দ্রনাথ বসু ও ভূতনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বিশিষ্ট সাহিত্যিকগণ লিখিবেন।

নাটমণ্ডপ

গত শনিবার, ২০শে মে, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান হলে (১৮ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীটে) বঙ্গীয় চিত্র সাংবাদিক সঙ্ঘের বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। নিম্নোক্তরূপ কর্ম্মী ও কার্য্যকরী সমিতির সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছে—

সভাপতি—শ্রীতুষার কান্তি ঘোষ
সহ সভাপতি—শ্রীনির্ম্মল কুমার ঘোষ
সম্পাদক—শ্রীশঙ্কর মুরলীধর বাগড়ে
সহ সম্পাদক—শ্রীসুখেন্দু বিকাশ সেনগুপ্ত
কোষাধ্যক্ষ—চন্দ্রশেখর
কার্য্যকরী সমিতি—শ্রীকৃষ্ণেন্দু নারায়ণ ভৌমিক সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সত্যনারায়ণ মজুমদার,

মিতালী সঙ্ঘ

আগামী শনিবার ২৭শে মে সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় ১৪ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে ক্লাব-ভবনে সুকবি শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের "সুন্দরী" উপন্যাসের নাট্যরূপ "স্বামীর ভিটা" সুষ্ঠুরূপে অভিনয়ার্থ প্রস্তুত হইবার জন্য কর্ম্ম সূচী ও কর্ম্মপদ্ধতি রচনার্থ রায় সাহেব ধীরেন্দ্র নাথ গুপ্ত, ডাঃ ইন্দুভূষণ রায়, সত্যেন্দ্রনাথ সেন, প্রফুল্ল কুমার মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি মহোদয়গণের উপস্থিতিতে উক্ত সঙ্ঘের অধিবেশন হইবে। ডাঃ শ্রীবটকৃষ্ণ রায় এই অধিবেশনের পৌরহিত্য করিবেন।

সুকবি শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আধুনিক সৌখিন সম্প্রদায়ের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অভিনয়ের ত্রুটী বিচ্যুতি সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবেন।

শান্তিমণি ফার্ম্মেসী

গত ৮ই মে, ১৮২এ, আপার সারকুলার রোডে "শান্তিমণি ফার্ম্মেসী"র শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হইয়াছে। ডাঃ অপাংশু শেখর চট্টোপাধ্যায় পৌরহিত্য করেন। সভায় বহু গণমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

শুভ-বিবাহ

গত ১৮ই মে প্যারাডাইস সিনেমার ম্যানেজার শ্রীযুক্ত বিজয়কুমারের সহিত কুমারী পুষ্পবতীর শুভবিবাহ হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষে গত ২১শে মে রবিবার ২৩ চিত্তরঞ্জন এভেনিউতে একটি প্রীতি সম্মিলনীর আয়োজন ছিল। আমরা নব-দম্পতির দীর্ঘ মধুময় জীবন কামনা করি।

কালীশ মুখোপাধ্যায়, সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায় জগদীশ হিমকার, ও পঙ্কজ দত্ত।

ইহার পর সম্প্রতি অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় চিত্র সংবাদিকগণ কর্ত্তৃক ভোটে নির্দ্ধারিত শ্রেষ্ঠ সার্থক ভারতীয় অভিনেতা অভিনেত্রী, লেখক সংলাপ-রচয়িতা, গীতিকার, ক্যামেরাম্যান, কারুশিল্পী, পরিচালক, সুরশিল্পী, সহ-অভিনেতা, অভিনেত্রী, শব্দধর এবং বিদেশীয় চিত্র, অভিনেতা, অভিনেত্রী ও পরিচালককে সম্মানপত্র দেওয়া হয়। 'সিনেমা টাইমস' প্রদত্ত স্বর্ণ পদক এ বৎসরের শ্রেষ্ঠ চিত্র "কাশীনাথ" নির্ম্মাতা নিউ থিয়েটার্সকে দেওয়া হয়।

যে সব শিল্পী অধিবেশনে উপস্থিত থাকিয়া মান-পত্র গ্রহণ করেন তাঁহাদের মধ্যে শ্রীমতী সুনন্দা দেবী, পঙ্কজ মল্লিক, কমল দাশগুপ্ত, ফণী রায়, সৌরেন সেন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহারা ছাড়া চিত্রশিল্প-সংশ্লিষ্ট আর যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ সরকার (এন, টি), মুরলীধর চট্টোপাধ্যায়, (এম, পি, প্রোডাকশান) নরেশ চন্দ্র ঘোষ (এ্যাসোসিয়েটেড) মনোরঞ্জন ঘোষ, (রূপবাণী) মাধব ঘোষাল (চিত্ররূপা), দেবকী কুমার বসু, গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায় যতীন্দ্রনাথ মিত্র, (ছোটাইবাবু), মিঃ এস আলী (মেট্রো), মিঃ আয়ার (ইউনিটি), হরিপ্রিয় পাল (মিনার), ডাঃ এস সিংহ (আলেয়া) সুবোধ মিত্র, বিনয় চট্টোপাধ্যায়, কল্যাণ গুপ্ত (এ্যালায়েড ফিল্ম), বিকাশ সান্যাল (ইনফরমেশন ফিল্ম) কবি শৈলেন রায়, এন, বুলচন্দানি প্রভৃতি।

ক্যামেরাম্যান বিমল মিত্র কর্ত্তৃক ইণ্ডিয়ান নিউজ প্যারেড-এর তরফ হইতে আলোক-চিত্র গৃহীত হয়। সবশেষে প্রচুর জলযোগের ব্যবস্থা ছিল।

"নয়া তারানা"

নবযুগ চিত্রপটের ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন নাজাম নকবি। শ্রেষ্ঠাংশে স্নেহপ্রভা, জয়রাজ, ডেভিড, চন্দ্রিকা, প্রভৃতি। বর্ত্তমানে প্রভাত সিনেমায় চলিতেছে।

পিতা জমিদার, প্রজাদের উপর অত্যাচার করা তাঁহার মজ্জাগত। পুত্র আনন্দ শিক্ষিত এবং আধুনিক ভাবধারায় শিক্ষিত—পিতার এই অত্যাচারের প্রতিরোধ করিতে গিয়া তাহাকে পিতার আশ্রয় ত্যাগ করিতে হইল। সে [illegible] সহরে চাকরী অন্বেষণে, কিন্তু চাকরী যোটেই মিলিল না। ইতিমধ্যে তাহার একখানি কবিতার বই ("নয়া তারানা") প্রকাশিত হইল।

"নয়া তারানা" রায় সাহেব শেঠ লক্ষ্মী দালের কন্যা কলাবতীকে অদ্ভুত ভাবে অনুপ্রাণিত করিল। কবি আনন্দের প্রতি তাঁহার আন্তরিক শ্রদ্ধা জন্মিল। কিন্তু কলেজে অন্যান্য ছাত্রীদের সহিত "নয়া তারাণা"র গান গাহিবার ফলে কলাবতীকে কলেজ ছাড়িতে হইল।

অদ্ভুত ভাবে কলাবতী ও আনন্দের আলাপ হইল কিন্তু তাহা ক্রমে গভীর প্রেমে পরিণত হইল। এদিকে আনন্দের পিতা দেহত্যাগ করায় আনন্দকে দেশে যাইতে হইল। সেখানে পর পর দুই বৎসর অজন্মায় দেশের লোকের দুর্দ্দশা চরমে পৌঁছিয়াছে। শেষে আনন্দ ও কলাবতী কিভাবে গোপন মজুতদারদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইয়া দেশের ও দশের কল্যান সাধন করিল তাহা পর্দ্দায় দ্রষ্টব্য।

নয়া তরাণা'র কাহিনী রচনা করিয়াছেন কে, এ, আব্বাস। কাহিনীর মধ্যে অভিনবত্ব আছে, তবে চিত্রনাট্য রচনার মধ্যে দুই এক স্থান ছাড়া উচ্চ কলাজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় না, অবশ্য সেজন্য গল্পটি বুঝিতে কোথাও বাধে না।

অভিনয়ের মধ্যে স্নেহপ্রভা গানে ও অভিনয়ে দর্শকদের মুগ্ধ করিয়াছেন। জয়রাজও সুঅভিনয় করিয়াছেন। চক্রী মণিরামের আসল রূপটি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন ডেভিড। শ্রীমতী চন্দ্রিকার 'নৈনো মে মদিরা লায়ে—' গান ও তৎসঙ্গে নাচটি এক শ্রেণীর দর্শকদের মধ্যে যথেষ্ট পুলকের সঞ্চার করিবে।

ছবির প্রথম দিকে শব্দানুলেখনে কিঞ্চিৎ ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে।

মোটের উপর "নয়া তারানা" আমাদের ভালই লাগিয়াছে এবং বিশ্বাস সকলেরই ভাল লাগিবে।

রঙমহলে নৃত্যানুষ্ঠান

আগামী জুন মাসের মাঝামাঝি বঙ্গীয় বন্যা নিবারণী সমিতির সাহায্যকল্পে রঙমহল রঙ্গমঞ্চে একটি নৃত্যানুষ্ঠানের আয়োজন করা হইয়াছে। এই নৃত্যানুষ্ঠানে সুপ্রসিদ্ধা নৃত্যশিল্পী শ্রীমতী মঞ্জুলিকা ভাদুড়ী প্রধান নায়িকারূপে মঞ্চাবতরণ করিবেন। স্বনামধন্য সুরশিল্পী রবি রায় চৌধুরী সঙ্গীত পরিচালনা করিবেন। আগামী সংখ্যায় এ সম্বন্ধে আরও বিশদ পরিচয় দিতে পারিব।

রবীন্দ্র-প্রশস্তি

(১১ পৃষ্ঠার পর)

করিয়া এতক্ষণ ঘরে ফিরিয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ করো—যে রাখাল ধেনুদলকে গোষ্ঠ-গৃহে এতক্ষণ ফিরাইয়া আনিয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ ক'রো—শঙ্খমুখরিত দেবালয়ে যে পূজার্থী আগত হইয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ ক'রো; অস্ত সূর্য্যের দিকে মুখ ফিরাইয়া যে মুসলমান নমাজ পড়িয়া উঠিয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ ক'রো। আজ সায়াহ্নে গঙ্গার শাখা প্রশাখা ব্রহ্মপুত্রের কূল উপকূল দিয়া "একবার বাংলাদেশের পূর্ব্বে পশ্চিমে আপন অন্তরের আলিঙ্গন বিস্তার করিয়া দাও, আজ বাংলা দেশের সমস্ত ছায়াতরুনিবিড় গ্রামগুলির উপরে এতক্ষণে যে শারদ আকাশে একাদশীর চন্দ্রমা জ্যোৎস্নাধারা অজস্র ঢালিয়া দিয়াছে সেই নিস্তব্ধ শুচি রুচির সন্ধ্যাকাশে তোমাদের সম্মিলিত হৃদয়ের বন্দেমাতরম্ গীতধ্বনি একপ্রান্ত হইতে আর একপ্রান্ত পরিব্যাপ্ত হইয়া যাক—একবার করযোড় করিয়া নতশিরে বিশ্বভুবনেশ্বরের প্রার্থনা ক'রো :—

"বাংলার মাটী, বাংলার জল,
বাংলার বায়ু, বাংলার ফল,
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক,
পুণ্য হউক হে ভগবান।

বাংলার ঘর, বাংলার হাট,
বাংলার বন, বাংলার মাঠ,
পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক
পূর্ণ হউক হে ভগবান॥

বাঙালীর পণ, বাঙালীর আশা
বাঙালীর কাজ, বাঙালীর ভাষা
সত্য হউক, সত্য হউক
সত্য হউক হে ভগবান।

বাঙালীর প্রাণ, বাঙালীর মন,
বাঙালীর ঘরে যত ভাই বোন,
এক হউক, এক হউক
এক হউক হে ভগবান॥"

সহরের সিনেমায়

চিত্রা, নিউ সিনেমা ও রূপালীতে "ওয়াপস্" ১৩শ সপ্তাহে পড়িল। শ্রী, পূরবী ও পূর্ণতে "বিদেশিনী ৪র্থ সপ্তাহে পড়িল। সিটি সিনেমায় "সাহারা" ৯ম সপ্তাহে পড়িল। অন্যান্য ছবির মধ্যে উত্তরায় "মাটির ঘর" (৫ম সপ্তাহ), মিনার্ভা সিনেমায় "ভক্ত রায়দাস" (৫ম সপ্তাহ) উল্লেখযোগ্য।

দীপালীর স্বত্বাধিকারী শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত, ১২৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, দীপালী প্রেসে মুদ্রিত ও দীপালী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

প্রধান সম্পাদক—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় :: সহঃ সম্পাদক—শ্রীধীরেন্দ্রমোহন মজুমদার বি. এল.

১৬শ বর্ষ VOL. XVI. | ১৮ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৫১ :: June 1, 1944 | ২২শ সংখ্যা No. 22

আলোচনী

ভবিষ্যৎ পৃথিবীর গঠন কি রকম হবে তা নিয়ে মিত্রদলের দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। বিরাট পরিকল্পনার জাল বোনা হচ্ছে, যা ধারণা করবার মত সাধ্য বা পুঁজি আমাদের কোথায়? নিষ্ঠুর বর্ত্তমান একটা অতলস্পর্শ গহ্বরের মত বিভীষিকাময় হয়ে উঠেছে। মানুষ স্বস্তি শান্তি ও আশার রামধনুপথে যাত্রা করবে এ যুগে তা স্বপ্ন মাত্র।

* * *

গত মহাযুদ্ধ শেষ হবার কিছু পূর্ব্ব থেকেই বিরাট আদর্শবাদের বাণী পৃথিবীর মানুষকে শোনান হচ্ছিল। রণশ্রান্ত পৃথিবীর কানে সে বাণী অত্যন্ত মধুর স্বপ্নাবেশ বয়ে এনেছিল। তখন কারও চিন্তা করবার অবসর ছিল না। বিরাট ধ্বংসের পর তখনও পৃথিবীর বুকে যন্ত্রণা ও ক্ষতের শিহরণ দেখা যাচ্ছে। বিরাট প্লাবন ও ঝড়ের পরবর্ত্তী অবস্থা তখন। কত প্রিয় জনকে আমরা হারিয়েছি, সভ্যতার ইতিহাসজড়িত কত বস্তু চিরকালের মত নিশ্চিহ্ন হয়েছে। কে চিন্তা করবে, শক্তি কোথায়? পৃথিবীর মর্ম্মকোষ তখন নিস্পন্দ। একটা সর্ব্বগ্রাসী অবসাদ ও তন্দ্রা যেন মানব সমাজের বুকে পাষাণের মত চেপে বসেছে। প্রেসিডেণ্ট উইলসনের রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শবাদ ঘোষিত হল। ইঙ্গ-ফরাসী মার্কিণ কূটনৈতিক-বৃন্দের গোপন মিতালীর রুদ্ধ গৃহে হল এর রূপায়ণ। ছিন্ন ভিন্ন সমাজদেহে উইলসনের মৃত সঞ্জীবনী প্রয়োগ করা হল। দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর ধরে এর ক্রিয়া পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রে কি ভাবে আত্মপ্রকাশ করল তার ইতিহাস আজও অজ্ঞাত। হঠাৎ নিদ্রাবিজড়িত চক্ষে ভারতীয় আমরা দেখলুম, আবার একটা মহাপ্লাবনের বিরাট সংঘাত আমাদের গৃহকোণ ও অস্তিত্বের তলদেশে এসে আঘাত করছে। আমরা বিমূঢ়ের মত তাকিয়ে রইলুম।

* * *

ইঙ্গ-মার্কিন কূটনীতির প্রেরণায় আবার লীগের নবকলেবর সৃষ্টির কথা শোনা যাচ্ছে। ইতিমধ্যেই তার স্বরূপ কি হবে সে সম্বন্ধে তিক্ত আলোচনার সৃষ্টি হয়েছে। নিউ ইয়র্কের "World Telegram" পত্রিকায় মিঃ চার্চ্চিলের এই নব পরিকল্পনাকে উদ্দেশ্য করে নিষ্ঠুর সমালোচনার আঘাত করা হয়েছে। মার্কিণের জনসাধারণের মনে এ সন্দেহ জেগেছে, লীগের নবরূপ হবে Power politics-এর রকম-ফের মাত্র। ছোট ছোট জাতির স্বাধীনতার চিতাশয্যা রচনা হবে যুদ্ধের পর। লীগের বনিয়াদ পাকাপোক্ত করে তুলতে এ নিষ্ঠুরতাটুকুর প্রয়োজন হবে। পত্রিকা বলেছেন—"The U. S. A. will never join the phoney and puppet League of Nations proposed by the British Govt in defiance of Allied pledges."

* * *

সেদিন বাংলা পরিষদের হট্টোগোলের ইতিহাসে নূতন অধ্যায়ের যোজনা হল। যে কংগ্রেসী ভদ্রলোক উত্তেজনার আতিশয্যে speaker মহোদয়ের টেবিল থেকে Mace

অপহরণ করেছিলেন ইতিহাসে তাঁর নাম অক্ষয় হয়ে থাকবে এ আশা হয়তো তিনি করেন। ওলিভার ক্রমওয়েলের সম্মান তিনি না পেতে পারেন। অন্ততঃ এটুকু বলা যেতে পারে যে পরিষদের তপ্ত কলহমুখর আবহাওয়ায় ক্ষণকালের জন্যও নাটকীয় রস জমে উঠেছিল। এবং সেটুকুর জন্যও অবিমিশ্র ধন্যবাদ ভদ্রলোকের প্রাপ্য। ঘটনাটি অপ্রত্যাশিত তো বটেই, কাজেই নীরস প্রাত্যহিকতার মাঝখানে যেটুকু রোমাঞ্চের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল তার জন্য বাংলার সাংবাদিক কার্টুনিষ্টদল এই কংগ্রেসী সদস্যের নিকট কৃতজ্ঞ থাকবেন। মাননীয় মিঃ গোস্বামী ও স্পীকার মহোদয়ের অসহায় অবস্থার প্রতি আমরা সমবেদনা জ্ঞাপন করি। হয়তো সমবেদনারও প্রয়োজন নেই। দীর্ঘকাল পরিষদের বনিয়াদী আবহাওয়ায় এঁদের অভ্যাস ও নীতিজ্ঞান গড়ে উঠেছে। এখানে রুচিবাগীশ হলে চলে না, এই অমূল্য ধারণা এতদিনে তাঁরা নিশ্চয়ই অর্জন করেছেন।

* * *

ময়মনসিংহের মহারাজা শশিকান্ত আচার্য্য চৌধুরী লোকান্তরিত হয়েছেন। দেশের মুষ্টিমেয় সম্মানিত ভূম্যধিকারীগণের মধ্যে তিনি ছিলেন অগ্রণী। যে হৃদয়বত্তা ও দৃষ্টিভঙ্গীর ঔদার্য্য সত্যকারের আভিজাত্যের পরিচয় দেয় তা প্রচুরভাবে তাঁর চরিত্রের মধ্যে মিশেছিল। গত দুর্ভিক্ষের সময় দুর্গত প্রজাদের খাজনা মকুব করে তিনি প্রজারঞ্জক জমিদারের খ্যাতি লাভ করেছিলেন। দুর্গতদের সেবাকার্য্যেও তাঁর দানের পরিমাণ প্রায় ২৫ হাজার টাকা। তিনি তাঁর জীবনের শেষ কয়েকবৎসর হিন্দু মহাসভার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। রাষ্ট্রনীতির এই বিশেষ ক্ষেত্রেও তাঁর চরিত্রের বিশেষত্ব আমরা লক্ষ্য করেছি। বর্ত্তমান যুগে রাষ্ট্রীয় মঞ্চ জমিদারগণের বহু নিন্দাবাদে মুখরিত হয়েছে। একটা যে বিলীয়মান গৌরব ও সংস্কৃতির বাহন এঁরা ছিলেন, ব্যতিক্রম মেনে নিলেও, একথা আজ অস্বীকার করা চলে না। আচার্য্য শশিকান্তের মৃত্যু বাঙালীর কাছে সেই দিক দিয়ে শোকাবহ সন্দেহ নেই।

* * *

ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ পত্রিকা 'News Chronicle' এর কর্তৃপক্ষ বর্ত্তমান ভারতীয় পরিস্থিতি সম্বন্ধে গান্ধীজীর মতামত প্রার্থনা করে—মহাত্মার সেক্রেটারী মিঃ পিয়ারী-লালের নিকট তার করেছিলেন। সেন্সার কর্তৃপক্ষ গান্ধীজীর বিবৃতি অবিকৃতভাবে পাঠাবার অনুমতি দিলে তিনি পত্রিকার এই অনুরোধ রক্ষা করবেন জানিয়েছিলেন। বলার প্রয়োজন নেই, ভারত সরকার এইরকম প্রতিশ্রুতি দিতে রাজী হন নি। ভারতের আধুনিক অবস্থার কথা বিবেচনা করলে গান্ধীজীর এই প্রত্যাশিত বিবৃতির মূল্য ছিল অনেক বেশী। অবস্থার জটিলতা দূর করতে মহাত্মাজীর এই বিবৃতি কতখানি সাহায্য করত কর্তৃপক্ষ সে চিন্তা করবার প্রয়োজন মনে করেননি। ভারতীয় সমস্যা সমাধানের জন্য আমাদের রাষ্ট্রীয় বিধাতারা কতখানি আগ্রহশীল এই সামান্য ঘটনা থেকে তা বোঝা যাবে।
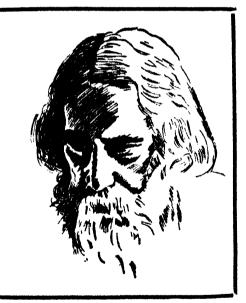
কথাকলি নৃত্য

—ললিত কুমার

ভারতীয় নৃত্যকলার শ্রেষ্ঠ অঙ্গ 'কথাকলি' নৃত্যের জন্মভূমি আরব সাগর ও পশ্চিমঘাট পর্ব্বতমালার মধ্যবর্ত্তী দক্ষিণ ভারতের ক্ষুদ্র মালাবার প্রদেশ। বাহিরের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ঝঞ্ঝাবাত এই ক্ষুদ্র প্রদেশটিকে কখনও বিক্ষুব্ধ করিতে পারে নাই তাই বহুযুগ ধরিয়া মালাবারবাসীর শান্ত ও সহজ জীবনধারার সহিত একটি সম্পূর্ণ নিজস্ব ও অভিনব সংস্কৃতি গঠিত হইয়া উঠিয়াছিল, অবশ্য দ্রাবিড় সভ্যতার দান ইহাতে অল্প নয়। ভারতীয় সাংস্কৃতিক ইতিহাসে মালাবারের দান যথেষ্ট তবে 'কথাকলি' নৃত্যকলা তাহার শ্রেষ্ঠতম দান। অতি আশ্চর্য্যের বিষয় যে এতবড় নৃত্যশিল্প এতদিন লোকচক্ষুর অন্তরালে লুপ্ত ছিল; সম্প্রতি সুবিখ্যাত নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্করের সার্থক চেষ্টায় আজ ইহা প্রাচ্য, প্রতীচ্য সর্ব্বত্র অশেষ সম্মান লাভে সমর্থ হইয়াছে।

কথাকলি নৃত্যকলা নাটকের মূক অনুকরণ। রামায়ণ, মহাভারত এই দুইটি জাতীয় মহাকাব্য এবং নটরাজ শিবের জীবন কাহিনী এই বিশিষ্ট নৃত্যের উৎস। ইহাতে দুইটি বস্তুর উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে—একটি বিষয়বস্তু ও দ্বিতীয়টি রস। হস্ত ও মুখভঙ্গিমা দ্বারা ইহাদিগকে প্রকাশ করা হয়। "তাণ্ডব" অথবা শৌর্যবীর্য্যপূর্ণ নৃত্যে হস্ত ও মুখভঙ্গিমা ব্যতীত দেহছন্দেরও প্রয়োজন; এইরূপে হস্তাভিনয়, মুখভঙ্গিমা এবং তৎসহ নৃত্য এই তিনটির সমাবেশে 'কথাকলি' নৃত্য এমন একটি বিশিষ্ট রূপ গ্রহণ করিয়াছে যে মনে হয় কেবল বাক্যদ্বারা যাহা প্রকাশ করা যায় তাহা অপেক্ষাও ইহা অধিক হৃদয়গ্রাহী হইতে পারিয়াছে।

এই নৃত্যকলার গঠন-কৌশল এত বিস্তৃত, এত ব্যাপক, এত জটিল এবং সর্ব্বোপরি এত সম্পূর্ণ যে কোন ভাব, কোন ভঙ্গিমা, কোন রস ইহাতে নূতন করিয়া সংযোগ করা অসম্ভব। বাস্তবিক রামায়ণ মহাভারতের ন্যায় এত বিরাট দুইটি মহাকাব্য কেবলমাত্র এই মূক নৃত্যাভিনয়ের মধ্য দিয়া মহাকালের নিঃসীমতা হইতে জাগিয়া অপরূপ রূপে চক্ষুর সম্মুখে বাস্তব হইয়া উঠে। নৃত্যের সহযোগী বাদ্য অত্যন্ত সহজ ও সরল—কেবলমাত্র দুইটি কাঁসর ও করতাল বাজে। নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে বিষয়বস্তু গীত হয় এবং একটি মাত্র বাঁশী সেই সুরের মাধুর্য্য রক্ষা করিয়া চলে।

এখন 'কথাকলি' নৃত্য কিরূপে প্রদর্শিত হয় তাহা বলা হইতেছে। এই নৃত্য সারারাত্র অনুষ্ঠিত হয় এবং ইহার পশ্চাতে দৃশ্যাবলীর কোন আড়ম্বর থাকে না। সাধারণতঃ সময়ের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া নৃত্য চলে, যেমন বিয়োগান্ত দৃশ্য রাত্রি অবসানে প্রদর্শিত হয়। কেবলমাত্র দেহছন্দ ও ভাবের সাহায্যে এক একটি দৃশ্য কখনও বিস্মৃত কোন অতীতের কত দুঃখ বেদনার ম্লানিমা, কখনও উচ্ছল আনন্দের উজ্জ্বলতা লইয়া পরিপূর্ণ রূপে জাগিয়া উঠিবে, ইহা কত বিরাট প্রতিভা ও সৃষ্টি-কৌশলের উপর নির্ভর করে তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। একটি মাত্র পিতলের প্রদীপ নারিকেল তৈলের আলোকদ্বারা নৃত্যমঞ্চকে আলোকিত করিয়া রাখে। নৃত্যশিল্পী কোন মুখোস ব্যবহার করেন না, কিন্তু তাহাদের মুখের সাজসজ্জার গুরুত্ব খুব বেশী এবং ইহা সম্পাদন করিতেও বহু সময়ের প্রয়োজন হয়। সবুজ, লাল অথবা
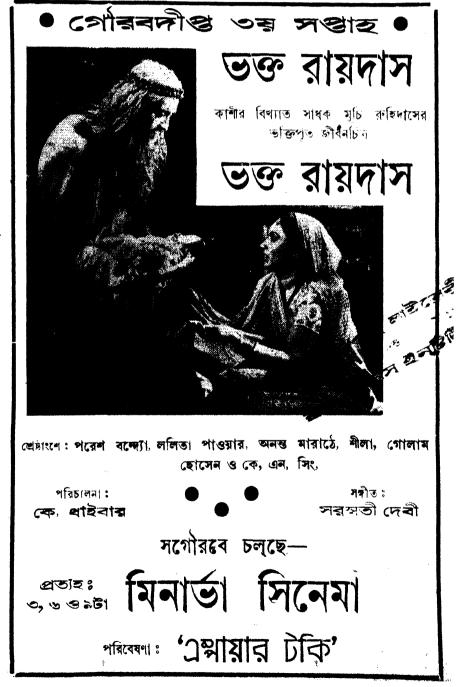
কালো রঙের উপর সাদা রেখা গণ্ডস্থল হইতে কান পর্য্যন্ত আঁকিয়া দেওয়া হয়। যদি কোন মহৎ চরিত্রের অভিনয় করিতে হয় তাহা হইলে সবুজ রঙ, দানব বা শয়তানের ভূমিকায় কালো রঙ এবং রাবণের ন্যায় দৈত্যের অংশ অভিনয়ে লাল এবং কালো উভয়প্রকার রঙই ব্যবহৃত হয়। সূর্য্যাস্তের সময় ঢাকের বাদ্য দ্বারা নৃত্যানুষ্ঠান ঘোষণা করা হয়, তবে নৃত্য সাধারণতঃ রাত্রি নয়টা দশটার পূর্ব্বে আরম্ভ হয় না। নৃত্যের আরম্ভে কয়েকটি স্তোত্র আবৃত্তি করিয়া নটরাজের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করা হয়, দুই বা ততোধিক বালক নাচে, তারপর যখন নায়ক নায়িকার অভিনয় আরম্ভ হয় তখন গায়কগণ গান আরম্ভ করেন এবং তাহাদের গানের অর্থ নৃত্যশিল্পী দেহভঙ্গিমার সাহায্যে সুস্পষ্ট করিয়া তুলিতে চাহেন।

এখন 'কথাকলি' নৃত্যকলার মূল উদ্দেশ্য, বিধি যেমন রস অথবা ভাব, মুদ্রা, চক্ষু ও মস্তকের ভঙ্গিমা ও সর্ব্বোপরি দেহছন্দ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক।

রসশাস্ত্রে নয় প্রকার রসের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, যেমন—শৃঙ্গার অথবা আদিরস, বীররস, করুণা অথবা দয়া, অদ্ভুত অথবা আশ্চর্য্য, হাস্য, ভয়ানক অথবা ভয়, বীভৎস অথবা ঘৃণা, রুদ্র অথবা রাগ এবং শান্ত রস।

নৃত্যশাস্ত্রে প্রকৃত মুদ্রা ২৪টি। অবশ্য ইহাদের সংযোগে আরো বহুমুদ্রার সৃষ্টি হইয়াছে। যেমন পতাকা—সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার উদ্দেশ্যে নিবেদিত, ভগবানের সৌন্দর্য্য ও মহত্ত্বের প্রতীক, ত্রিপতাকা—ভগবানের অবতারের প্রতীক, অর্দ্ধচন্দ্রমুদ্রা—রক্ষা ও অভয়বাণীর নিদর্শন, উৎপলপদ্ম—প্রস্ফুটিত পদ্ম, সৌরমণ্ডলীসহ বিরাট বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৌন্দর্য্যের প্রতীক, শির্প-শীর্ষ—রক্ষাকর্ত্তার প্রতীক, আরতি ও আত্মনিবেদনের নীরব অভিব্যক্তি। হংসাস্য—হংসের মুখ, ঋষির চরিত্র অথবা কোন ধর্ম্মের রূপ, সূর্য্য, নৃপ, হস্তী, যজ্ঞ, কুম্ভীর, তোরণ, গুহা, পৃথিবী, পথ, বস্ত্র, চক্র, পদ, সিংহাসন, মুক্তি, জল, শিকার, মৎস্য এবং ভ্রমর।

নবরসের সহিত নয় প্রকার চক্ষুভঙ্গিমাও ব্যবহৃত হয় এবং মস্তকের ভঙ্গিমা দ্বারাও নানারসের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করা যায়।

'কথাকলি' নৃত্যকলার সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ও বৈশিষ্ট্যময় নৃত্য হইতেছে 'শিবতাণ্ডব' নৃত্য। যে গল্পাংশের উপর এই নৃত্যকলা রচিত হইয়াছে তাহা এই যে একদা নটরাজ শিব দেবী পার্ব্বতী ও সহচরবৃন্দের সহিত কৈলাস পর্ব্বতে গভীর ধ্যানে মগ্ন ছিলেন, সহসা প্রবল ঝটিকা আরম্ভ হইল, বিশাল পর্ব্বত কম্পিত হইতে লাগিল, সমুদ্র তীব্র গর্জ্জন করিয়া উত্তাল হইয়া উঠিল, বৃক্ষশাখা হইতে পক্ষীর নীড়গুলি ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ধূলায় লুটাইয়া পড়িল, এই মহাপ্রলয় কাণ্ড দেখিয়া পার্ব্বতী ও শিবের সহচরবৃন্দের মনে হইল যে সেইদিনই বোধ হয় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অবসানের দিন! তাঁহারা ভয়ে কম্পিত হইয়া নটরাজের ধ্যান ভঙ্গের জন্য কাতর প্রার্থনা আরম্ভ করিলেন। অবশেষে মহাদেবের ধ্যানভঙ্গ হইল, তিনি সকলকে অভয় দান করিয়া, বলিলেন যে তাঁহার প্রিয়-ভক্ত গজাসুর তাঁহার পদবন্দনা করিবার জন্য আসিতেছে। অল্পক্ষণ পরে গজাসুর সেইস্থানে উপস্থিত হইল, কিন্তু পার্ব্বতীর অপরূপ রূপে মুগ্ধ হইয়া দেবতাকে ভুলিয়া সে পার্ব্বতীকে সবলে নিজ আলয়ে লইয়া যাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল। ইহাতে শিব ও গজাসুরের মধ্যে প্রবল যুদ্ধ আরম্ভ হইল, অবশেষে গজাসুরকে পরাজিত ও নিহত করিয়া নটরাজ অসুরের মৃতদেহের উপর প্রবল ক্রোধ ও বিদ্বেষে যে নৃত্য আরম্ভ করিলেন তাহাই 'তাণ্ডব' নৃত্য নামে 'কথাকলি' নৃত্যকলার একটি অপূর্ব্ব সম্পদ হইয়া রহিয়াছে।

প্রত্যাখ্যান

(উপন্যাস)

শ্রীসুধাংশু কুমার হালদার, আই, সি, এস

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(৫)
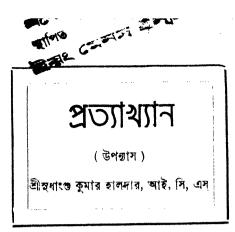
আজ দুপুরে তিনি মোটরটা নিয়ে একটু ঘুরে আসতে গিয়েছিলেন। বিশেষ কোনো দরকারই ছিল না। পচিশ মাইল দূরে একটা মস্ত বড় শহর, সেটা এর আগে দেখবার সুযোগ হয় নি। তাঁর অসুস্থ পিতাকে নিয়ে তাঁরা বায়ুপরিবর্ত্তনে এসেছেন আজ চার পাচ মাস আগে। শরীর তাঁর বেশ সেরেচে। এবার কলকাতা ফিরে যাবার কথা হচ্ছে। তাই ফিরে যাবার আগে একবার চারিদিকটা ঘুরে দেখতে গিয়েছিলেন। মল্লিকার আর ভাই বোন নেই, তাই তাঁর পিতা তাঁকে ঠিক ছেলের মতোই দেখতেন। তিনি নিজে ছিলেন একান্ত পরনির্ভর, নিজে কোনো কাজটি গুছিয়ে করতে পারতেন না। যখনি একটা কিছু করবার খেয়াল তাঁর মাথায় চাপত, যেমন পড়বার টেবিলটা ঝাড়া, কিম্বা বইয়ের আলমারিটা গুছানো, তখন লোকজন ডেকে, চেচামেচি ক'রে এমন কাণ্ডটি বাধিয়ে তুলতেন যে বাড়ীময় একটা হৈ হৈ প'ড়ে যেত। নিজের এই পরনির্ভরতার ওপর নিজেই খুব বীতশ্রদ্ধ হ'য়ে মল্লিকাকে তিনি এমন শিক্ষা দিয়েছেন যাতে তিনি সকল বিষয়ে আত্মনির্ভর হন। তাঁকে নিয়ে তিনি স্বদেশে এবং বিদেশে অনেক ঘুরেছেন, বাড়ীতে নিজে পড়িয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি মল্লিকার না থাকলেও যথার্থ পাঠানুরাগ তাঁর ছিল। তাঁর লাইব্রেরীতে এমন অনেক বই পাওয়া যেত ডিগ্রিধারী যার নামও শোনেন নি।

বিষণ গিয়ে বুদ্ধি ক'রে একেবারে অসীমের সামনে হাজির হ'ল। অসীম এইমাত্র জঙ্গল পরিদর্শন শেষ ক'রে ফিরে এসে চা খাচ্ছিল। মস্ত এক সেলাম ক'রে অতি প্রাঞ্জল ভাষায় বিষণ বুঝিয়ে বলল, জননীর পুনঃ পুনঃ নিষেধ না শোনবার অবধারিত যে-ফল তাই ফলেছে, অর্থাৎ একা দিদিমণি মোটর ভেঙে পড়ে আছেন পাকা সড়কে। এমনটা যে হবে তা বিষণ আগে থেকেই জানত, কেবল ভয়ে কিছু বলে নি, হাজার হোক সে তো 'নোকর' মাত্র। "চোট ?"—না, চোট কিছু লাগেনি বটে, তবে সেটা দিদিমণির গাড়ী চালাবার গুণে নয়, নেহাৎ ভাগ্য ভাল ব'লে। নইলে যে-জোরে দিদিমণি মোটর চালনা করেন, হাওয়া-জাহাজও অত জোরে চালানো হয় না। তবে বিষণ তো 'নোকর' মাত্র, তার এ সকল কথায় থাকবার প্রয়োজনই বা কি ! দিদিমণি তো আর শুনবেন না তার কথা ! যদিও দিদিমণির জন্মের পর থেকেই সে তাঁকে লালন পালন করেছে আজ এই বিশ বছর ধ'রে। এখন কয়েকজন লোক নিয়ে দিদিমণির সাহায্যে যাওয়ার দরকার। সন্ধ্যা হ'তে আর বেশী দেরি নেই, আর এ রাস্তায় সন্ধ্যার পর নাকি বাঘও বেরয়। কথাটা যে দুষ্ট লোকে মিথ্যা প্রচার ক'রে রেখেছে বিষণের এমন মনে হয় না।

হাঁক ডাক ক'রে জনকয়েক লোক নিয়ে অসীম রঙ্গস্থলে অবতীর্ণ হ'ল। বিষণ আর গেল না, কারণ বাবুর কোঠাটা তার খুব পছন্দ হয়ে গেছে, এবং তেওয়ারীর সঙ্গে অল্পক্ষণের আলাপে সে এই পরিচয়টুকু পেয়েছে যে সে বেশ অতিথিবৎসল ব্যক্তি, এবং দু'এক ছিলিম গাঁজাও খায়।

অসীম এসে দু'হাত কপালে তুলে মল্লিকাকে নমস্কার করল। দু'জনের সঙ্গে দুজনের দৃষ্টি বিনিময় হ'ল। অপরাহ্ণ সূর্য্যের সোনালী রশ্মি এসে তির্য্যকভাবে মল্লিকার মুখে চোখে পড়েছে। অসীম ভাবল তাঁর এই দুর্লভ রূপটি এমন অপরাহ্ণ না হ'লে ফুটত না। দেখা হ'ত যদি কোনো ড্রয়িংরুমের কুশান-কার্পেট সমাচ্ছন্ন অন্দরে, কিম্বা কোনো খানসামা-বেয়ারাদের সারি সারি সাদা পাগড়ীর কুচকাওয়াজের অন্তরালে কোন তৃণশ্যামল মাঠে চায়ের চক্রে,—এমন অভাবনীয় রূপটি কি ধরা পড়ত তাহ'লে ? মল্লিকার ভাবটা একটু সলজ্জ, একটু দ্বিধাগ্রস্ত, হয় তো কৃত কর্ম্মের অপরাধের প্রতিক্রিয়ায় একটু উদ্ধত ! কিন্তু যে-জিনিষটা অসীমের একান্তভাবে চোখে পড়ল সে হ'ল তাঁর ভয়লেশহীনতা। মনে করেছিল এক ভীতিবিহ্বল ক্রন্দনগলিত নারীকে দেখবে,—দেখল এক সম্পূর্ণ আত্মনির্ভর, অবিচলিত প্রতিমা। অত্যন্ত প্রসন্ন হ'য়ে উঠল তার মন।

মল্লিকা দেবী মনে করেছিলেন কাঠের আড়তদার হবে একজন পাকা হিসেবী মাঝবয়েসী ভদ্রলোক, হাঁটুর ওপর উঠেছে যার খাটো কাপড়, কানের কাছে গজিয়েছে একগোছা ক'রে মোটা মোটা চুল, কাঁটার মতো গোঁফ, এবং নিকষকৃষ্ণ রং। তার বদলে এল এক দীর্ঘকায় গৌরবর্ণ পাতলা ছিপছিপে লোক, চোখে মুখে যার চাপা রসিকতা উঁকি মারছে। ব্যবসায়ী এ যে নয় তা প্রথম দৃষ্টিতেই বোঝা যায়। এ কোথাও শেকড় গাড়ে নি, এ যেন সব কিছুর মাঝে থেকে সব কিছু হ'তে পৃথক। এই সুন্দর সাঁওতাল জঙ্গলে এমন লোকের অকস্মাৎ আবির্ভাব মনকে চমক লাগিয়ে দেয়।

উভয়ের সংক্ষিপ্ত আলাপ পরিচয় সারা হলে মল্লিকা জিগেস করলেন, "বিষণকে দেখছি নে যে ! সে গেল কোথায় ?"

"আপনার ওপর তার মনোভাব এখন খুব প্রসন্ন নয়। সে বোধহয় একটু বিশ্রাম করছে।"

"বিশ্রাম করছে ! কাজ না ক'রে ক'রে তার বিশ্রাম করার দৈর্ঘ্যটা খুবই বেড়ে গেছে। মা তাকে আদর দিয়ে দিয়ে মাথায় তুলেছেন। জানেন অসীমবাবু, যে দাস রাজবংশটি আমাদের বাড়ীতে রাজত্ব করেন, তাঁদের আলস্য কুতুবমিনারের চেয়েও গগনস্পর্শী।......তা যাক্ সে কথা। আপনি আমার ঐ চাকাটা পাল্টে দিতে পারেন ?"

অসীম বলল, "তাইতো !"

সাবধানে ভ্রমণ করুন

একথা অমান্য করার ফলে আপনার জীবন বিপন্ন হতে পারে

আজকাল ভীড় এত বেশি হয় যে গাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়িয়েছে! কিন্তু গাড়ীর মধ্যে স্থানাভাব হলেও পাদানিতে দাঁড়িয়ে বা ঝুলে ঝুলে যাবার চেষ্টা করবেন না। এ যে কেবল আইনবিরুদ্ধ তাই নয়, এর ফলে গুরুতর আঘাত লাগা বা মৃত্যু ঘটা আশ্চর্য নয়। গাড়ী থেকে টানেলের দেয়াল বা সিগ্‌ন্যালের থামের ব্যবধান খুবই কম। চলন্ত গাড়ীর বাইরে থাকার ফলে যদি হঠাৎ এই দেয়াল বা থামের সঙ্গে ধাক্কা লাগে তাহ'লে হয়ত আপনার রেলে চড়াও শেষ হ'য়ে যেতে পারে।

গাড়ীর মধ্যে স্থান না থাকলে স্টেশনেই অপেক্ষা করুন। অযথা প্রাণ বিপন্ন করবেন না। আর যদি কোনো গাড়ীতেই যেতে না পারেন তাহলে স্মরণ রাখবেন যে দেশের নানাস্থানে খাদ্য, পরিধেয় এবং আপানী সরবরাহের কাজেই রেল এখন অত্যন্ত ব্যস্ত।

AAA 683

"আপনিও যে তাইতো বলতে আরম্ভ করলেন !"

"দেখুন অপরাধ আমার নয়। আমার যে আর্থিক অবস্থা তাতে বড় জোর গো-শকট পর্যন্ত চলে, মোটরগাড়ী কেনা চলে না। কাজেই মোটরের যন্ত্রতন্ত্রে আমি অনভিজ্ঞ। তবে আমার সঙ্গে লোকজন আছে অনেক, একটু যদি দেখিয়ে দেন, আমরা পারব বলেই মনে হয়।"

"আমিই কি জানি ছাই কেমন ক'রে চাকা পাল্টাতে হয়! এই ভাঙা চাকাটা খুলে তার জায়গায় ঐ একটা ষ্টেপনী পরিয়ে দিতে হয় গাড়ীটাকে জ্যাকে তুলে, এই তো হ'ল ব্যাপার। কিন্তু থিওরি হ'ল এক জিনিষ, আর প্র্যাক্‌টিস্ হ'ল আর এক জিনিষ !"

অসীম ষ্টেপনী খুলতে লেগে গেল। দেখা গেল সে চাকায় হাওয়া দিতে হবে। অনভ্যস্ত হাতে পাম্প্ করতে অনেকটা সময় গেল। হাওয়া মাপতে যেয়ে ততোধিক অনভ্যস্ত হাতে মিটার বসিয়ে বসিয়ে মল্লিকাদেবী অনেকখানি হাওয়া বার ক'রে দিলেন। মংরু সাওতালের আঙুল চেপ্টে গেল, পরিশ্রমে অসীমের সর্বাঙ্গ দিয়ে ঘাম ঝরতে লাগল। নোরাং মাঝি মল্লিকাদেবীর মুখের কাছে হাত নেড়ে কিছু ঝাঁঝের সঙ্গেই বলল, "হাই তোর মটর চেয়ে কাড়ার গাড়ীটি অনেক ভালো বটে রে !"

তারপর সমস্যা হ'ল গাড়ীখানাকে জ্যাকে তোলা। জ্যাকের কায়দা-কানুন বুঝতে অসীমের খানিকটা সময় গেল, তারপর কোথায় কি একটা গণ্ডগোল বাধতে 'খটাং' করে কলটা [illegible], আর এদিকেও ঘোরে না, ওদিকেও ঘোরে না।

সূর্য্য তখন পশ্চিমে ডুবেছে।

"আপনার দ্বারা হবে না। বাথ পণ্ডশ্রম।"—মল্লিকা বললেন।

"এখন তবে উপায়?" উদ্বিগ্ন কণ্ঠে অসীম প্রশ্ন করল।

মল্লিকা কোন কথা বললেন না। গাড়ীখানা ঠেলেঠেলে রাস্তার একটি পাশে রাখা হ'ল। তারপর একটি অ্যাটাচি কেসে তার হাতব্যাগ মোটরের চাবি প্রভৃতি আবশ্যকীয় সরঞ্জাম পুরে, মোটরের কাচ তুলে দিয়ে, দরোজাগুলি বাইরে থেকে লক্ করে মল্লিকা বস্তীর পানে এগিয়ে চললেন।

পিছন থেকে অসীম ডেকে বলল, "মল্লিকা দেবী, শুনছেন, আমার ওপর আপনার রাগ হবারই কথা, এবং হয়েওছে। কিন্তু অ্যাটাচি কেস্ হাতে নিয়ে হন হন্ করে চললেন কোথায়?"

মল্লিকা ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন, "কেন, আপনার ওখানে।"

"আমার ওখানে!"

"কেন আপনার কি আপত্তি আছে তাতে? ও রকম হতভম্বের মতন দাঁড়িয়ে থাকবেন না, বলুন, যদি আপত্তি থাকে তাহলে এই রাস্তায় শুয়েই আমাকে রাতটা কাটিয়ে দিতে হবে। এবং খুব সম্ভব বাঘের পেটেই যেতে হবে। বলুন, আপনার মনোগত অভিপ্রায়।"

"না, না, রাস্তায় শুতে হবে কেন? কিন্তু আমার তো ব্যাচিলার্স ডেন,—সেখানে কোনো স্ত্রীলোক নেই। তাতে আপনার কষ্ট হতে পারে—"

"আপনি যে একপাল মেয়ে মানুষ নিয়ে ঘর করেন, ভেবেছেন এই আমার ধারণা? ছিঃ অসীম বাবু। আপনার স্বভাবচরিত্র সম্বন্ধে এমন নীচ ধারণা আমার ছিল না।"

"ধন্যবাদ, অশেষ অনন্ত ধন্যবাদ মল্লিকাদেবী। ঐ সার্টিফিকেটটি যদি একটু লিখে দিতেন, আমার কারবারে কাজে লাগত। কিন্তু সে কথা থাক। সমাজ ব'লে একটা যা হোক কিছু আছে তো, আমি তাকে না মানলেও আপনার না মেনে উপায় নেই। আর আপনার বাবা মাই বা কি মনে করবেন?"

"তুই উয়াকে সাদি ক'রে লে না বাবু, সাদি তো তুর হয় নোই বটে!"—মংরু সাওতাল বলল। সভ্যমানুষদের এই প্রচণ্ড সমস্যার অসভ্যমানুষ এমন সহজ সমাধান ক'রে দিল, তার জন্যে কৃতজ্ঞ হওয়া দূরের কথা, অসীম তাকে প্রচণ্ড ধমক দিয়ে থামিয়ে দিল।

"আপনার এই সুবিজ্ঞ উপদেষ্টার পরামর্শ যখন এমন উগ্রভাবে আপনি প্রত্যাখ্যান করলেন অসীম বাবু"—মল্লিকা হেসে বললেন,—"তখন আপনাকে আর একবার ভেবে দেখতে না ব'লে আমার নীরব থাকাই উচিত, নইলে আমাকে হয়তো নির্লজ্জ ভাববেন।"

অসীম বলল, "অন্য কেউ হ'লে এ কথায় রাগ করত, আর আপনি তামাসা করছেন। হাসি দিয়ে আপনি সব কিছু মলিনতাকেই এমনি ধুয়ে দিতে পারেন মল্লিকা দেবী?"

"মল্লিকা দেবীকে যখন আরো ভালো ক'রে জানবেন তখন এর জবাব পাবেন।"

"সে সৌভাগ্য কি আমার হবে? কিন্তু যা জিগেস করছিলুম, সমাজের বিধি নিষেধের সম্বন্ধে আপনি কি ঠিক করলেন?"

মল্লিকা বললেন, "সমাজের ভয়ের চেয়ে আমার এখন বাঘের ভয়টাই প্রবল।"

"তবে চলুন।"

"এতক্ষণ তবে ফেলে যেতে চাইছিলেন কেন?"—মল্লিকা জিগেস করলেন।

"আপনিই বলুন।"

"বাঘের তুলনায় আপনি যে কম মারাত্মক একথা স্বীকার করতে চাইছিলেন না ব'লে। নয় কি?"

"হাঁ। সামান্য একটা বাঘের তুলনায় হেরে যাবো!"

"হুঁম্। তবে শেষে হার স্বীকার করলেন যে?"

"ভেবে দেখলুম, সেটাই সোজা কাজ" অসীম বলল, "আপনার সঙ্গে তর্ক ক'রে জেতার চেয়ে হারাতেই বেশী আনন্দ।"

"দেখছি আপনারও বুদ্ধি আছে অসীম বাবু।"

"আমার এবং সবের সত্য কথা, সবাই জানে। আপনার আবিষ্কার করতে এত দেরি হল! অবিশ্যি সকলের বুদ্ধি তো আর সমান হয় না।"

হাসতে হাসতে ওরা এগিয়ে চলল।

(ক্রমশঃ)

সমালোচনা

অসংলগ্ন—শ্রীরমেন চৌধুরী প্রণীত। সরল-তীর্থ, ৮ডি নন্দরাম সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য আড়াই টাকা।

উপন্যাস। ইহার মধ্যে ঘটনার আড়ম্বর নাই, লেখকের সাবলীল রচনা ভঙ্গী পাঠককে টানিয়া লইয়া যায়। কোথাও ক্লান্তি আনে না। সাহিত্যে নবাগত লেখক সেই দিক দিয়া সার্থকতা লাভ করিয়াছেন। ইহা সত্ত্বেও বলিতে হইবে সমস্ত ঘটনা বাস্তবতা-রহিত একটা কুয়াসার মধ্যে দিয়া অগ্রসর হইয়াছে। লেখকের দৃষ্টি এখনও স্বচ্ছ হইয়া উঠে নাই। যে অভিজ্ঞতা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিভঙ্গী ও সহানুভূতি সত্যকারের সাহিত্য সৃষ্টি করে গ্রন্থে তাহার চিহ্ন নাই। ভাষায় লেখক আধুনিক। তাঁহার রচনার সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত রীতি প্রশংসার যোগ্য। স্থানে স্থানে এত সরল যে তাহা গ্রাম্যতার কাছ ঘেঁসিয়া গিয়াছে। বানান সম্বন্ধে আমরা লেখকের সহিত একমত হইতে পারিলাম না। বহু স্থানে তাহা স্বেচ্ছাচার বলিয়া মনে হইয়াছে। মোটের উপর এক চিন্তাহীন অলস মুহূর্ত্তে গ্রন্থখানির পৃষ্ঠা উলটাইতে পাঠকের ভালই লাগিবে।

নাগরিক—কৃষ্ণদাস বিরচিত, প্রকাশক শ্রীশৈলেন্দ্র বসু, পি ৫৮, ল্যান্সডাউন রোড একসটেনসান, কলিকাতা। দাম দুই টাকা।

তিন অঙ্ক নাটক। রোমক ইতিহাসের সুপ্রসিদ্ধ চরিত্র ব্রুটাসের কাহিনীর অংশবিশেষ লইয়া নাটকটি রচিত হইয়াছে, নাটকটির পরিচয় প্রসঙ্গে লেখক বলিয়াছেন—"ব্রুটাসের চরিত্রকে নানাভাবে সাজাইয়া অনেক সাহিত্য রচনা হইয়াছে। তন্মধ্যে ফরাসী কবি ভলটেয়ারের নাটকখানি প্রসিদ্ধ। ব্রুটাসের জীবনের ঘটনাগুলিও ঐতিহাসিক। ভিন্ন ভিন্ন সাহিত্যিক ঘটনাগুলিকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সাজাইয়া ব্রুটাসের চরিত্রের আদর্শকে ফুটাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। ভলটেয়ার যে ভাবে সাজাইয়াছেন এই গ্রন্থেও মোটামুটি সেইভাবে সাজানো হইয়াছে, কিন্তু যাঁহারা ভলটেয়ার পড়িয়াছেন তাঁহারা দেখিবেন ভলটেয়ারের সঙ্গে মিল অপেক্ষা গরমিল অপ্রচুর নহে।"

ইহা সত্ত্বেও বলিতে হইবে ভলটেয়ারের নাট্যরসের আস্বাদ ইহা হইতে পাওয়া যাইবে না। অমিত্রাক্ষর ছন্দে নাটকটি আগাগোড়া রচিত। রচনাভঙ্গী ছন্দের স্বাভাবিক মাধুর্য্য বজায় রাখিতে পারে নাই। রিলিফের বা বিষয়ান্তর স্থাপনের যে কৌশল নাটকের প্রধান বস্তু ইহা যেন রচয়িতার মনে ছিল না। ইহা সত্ত্বেও নাট্যপিপাসু জনসাধারণ এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া একটি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ চরিত্রের সাক্ষাৎ পাইবেন। রোমক ইতিহাসের একটি পুরাতন পৃষ্ঠা নাটকের মধ্য দিয়া বাঙ্গালী পাঠক সাধারণের সমক্ষে ধরা হইয়াছে। ভিন্ন দিক দিয়া ইহার আবেদন পাঠকের নিকট পৌছিবে বলিয়া মনে করি।

তুমি কি ঈশ্বর ?

—শ্রীনিকুঞ্জ পত্রী

তুমি কি ঈশ্বর ?
তুমি কি কোরেছ সৃষ্টি ধরণীর এই শ্যামলতা ?
তুমি বৈশ্বানর—
জ্বালায়ে পুড়ায়ে পুনঃ ধরণীরে দান শ্রীহীনতা।
মানবে কোরেছ সৃষ্টি, দানবের তুমি জন্মদাতা ?
পিতার আসনে বসি' হে স্থবির
নিষ্ঠুর বিধাতা—
এ তোমার কি রুদ্র নাচন ?
অসীমের তুমি হে বিস্ময় !
অনিমেষে চেয়ে থাকে সারা প্রাণ মন—
লোকাতীত চলে লোকক্ষয়।
শুষ্ক থাক মহাবৃদ্ধ লোলচর্ম্ম ন্যুব্জদেহ লোয়ে,
দেখায়ো না মুখ আর অশ্রুজল-ঘেরা
লোকালয়ে।
প্রাণ ত' দিয়েছ বন্ধু ;—প্রাণ নামে
কুমোরের হাঁড়ি,
ভঙ্গুর ভৃঙ্গার ভরি' আনিয়াছ আয়ু-হলাহল,
একটি আঘাতদানে সে পরাণ
নিতে চাও কাড়ি
এ দেওয়ার নাম করি নাই বা করিতে
মিছে ছল ?
রক্ষিবার শক্তি যদি নাই
অভিনয় করিও না রক্ষকের মত—
মোদের জীবনে থাক্ তীব্র ব্যর্থতাই,
তুমি সেথা আসিওনা দুষ্ট ব্রণ-ক্ষত।
তোমার সৃষ্টির মাঝে ক্লিষ্ট দানে মোরা—
গড়িব নতুন করি নব বিশ্বলোক,
সেথানে থাকিবে নিত্য দুঃখ ক্লান্তি, জরা,
অত্যাচার, অবিচার, অন্যায় দুর্যোগ।
শান্তি সেথা নাই থাক্, সেই হবে
সান্ত্বনা মোদের
রিক্ততার গড়াস্বর্গে দীনতাই ধ্রুব সত্য কথা—
অভিনয়ে এতদিন নয়ে ছয়ে ভুলায়েছ ঢের,
আমরা বুঝেছি আজ জীবনের অসীম রিক্ততা।
সেদিন মোদের পাশে ফিরে এসে দেখো,
ব্যর্থতায় ভরা প্রাণ প্রাণবন্ত হোয়েছে বিষাদে,
সেদিন নির্জনে বোসে আমাদের
রিক্ত ছবি এঁকো,
বিফল আশায় ভরা হিয়াগুলি
নাচেনা আহ্লাদে।
পরিচয় জিজ্ঞাসিলে দানিব উত্তর—
মোরা নয় স্বর্গের ঈশ্বর !
মোরা শুধু ধরণীর প্রাণী,
শুনে যেও হে স্থবির !
সর্বহারা মানুষের বাণী।

কমরেড লেনিন

—শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

রুশিয়ার উত্তর-পূর্ব প্রান্তে সাইবেরিয়া। যতদূর চোখ যায় শুধু প্রান্তর আর প্রান্তর, তুহিনের শুভ্রতা ছড়িয়ে পড়েছে দিক্‌দিগন্তে। মানুষের বসতি দৈবাৎ চোখে পড়ে, দু'চারখানি ছোট ঘর তুহিনশুভ্রতার বুকে জেগে থাকে ব্যাঙের ছাতার মত। একবার সেখানে গিয়ে পড়লে মানুষ কেমন যেন হয়ে যায়, চারিপাশের পরিবেশ তার বুকখানি চেপে ধরে যেন, অবসন্নতা মনকে আচ্ছন্ন করে, মস্তিষ্কের বিকার দেখা দেয়। বিপ্লবের স্বপ্ন মুছে যায় সাইবেরিয়ার শৈত্যে, বিপ্লবীর পৃথিবী ঢাকা পড়ে বরফের নীচে। সাইবেরিয়ার কথা শুনলে বিপ্লবীদের তাই বুক কাঁপে। লেনিনেরও বুক কেঁপেছিল কিনা জানি না, কিন্তু বাইরে কোন চাঞ্চল্য প্রকাশ পায়নি, অসাম্যের বিরুদ্ধে তিনি মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিলেন, সেইজন্য অন্যায়ের দণ্ড মাথা পেতে নেবার জন্য মনকে তিনি প্রস্তুত করে রেখেছিলেন।

সাইবেরিয়ায় এসে লেনিন এবার সত্যই দলছাড়া হয়ে পড়লেন, তবে সুবিধামত পড়াশুনা চললো, যখন যেমন বই হাতের কাছে এসে পড়ে সেইমত।

মনটা যখন নেহাৎ নিঃসঙ্গ, সাইবেরিয়ার শুভ্রতা তার মনকেও যখন ধূসর করে তুলেছে, নিস্তরঙ্গ বরফের মত মনের কোনের আর যৌবনের রং নিষ্প্রভ হয়ে আসছে, এমন দিনে মিললো এক সঙ্গিনী।

পুরাণো বান্ধবী কমরেড ক্রাপস্‌কায়া। নাদেঝ্‌দা ক্রাপসকায়া ছিলেন মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে। তাঁর বাবা যখন মারা যান তখন তাঁর বয়স সবে চৌদ্দ বছর মাত্র। তখন থেকেই ছাত্র পড়িয়ে তাঁকে অন্নের সংস্থান করতে হয়। শিক্ষকতা করার পর যে অবসরটুকু তিনি পেতেন দেশের জন্য মাথা ঘামাতেন। শুধু ঘরে বসেই মাথা ঘামাতেন না, কিছু কাজ করারও চেষ্টা করতেন। সেই সূত্রে বিপ্লবীদের সম্পর্কে এঁকে আসতে হয়েছিল। তখনকার অন্যান্য বিপ্লবীদের মত কার্ল মার্কসের লেখা ক্রাপসকায়ার মনকেও আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল, এবং সেই সম্পর্কে একটি লেখা নিয়েই প্রথম তাঁর সঙ্গে লেনিনের পরিচয় ঘটে। এই সময় একবার অনিবার্য্য গ্রেপ্তারের হাত থেকে লেনিনকে তিনি রক্ষা করেন। ফলে দুজনের হৃদ্যতা পাকা হয়।

বিপ্লবীর খাতায় একবার নাম লেখালে সকলের অদৃষ্টে যা ঘটে ক্রাপসকায়ার বেলাতেও তার ব্যতিক্রম ঘটলো না, ১৮৯৬ সালের ধর্মঘটের সঙ্গে যুক্ত থাকায় তাঁর জেল হ'ল। জেলের মধ্যে এক বন্দিনী বস্ত্রে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করে, তখন আর সব বন্দিনীকে মুক্তি দিয়ে নগরে নজরবন্দী করে রাখা হয়।

তারপর আবার তিনি গ্রেপ্তার হন এবং তিন বছরের জন্য নির্বাসিত হন সাইবেরিয়ায়। লেনিনও তখন ছিলেন সাইবেরিয়ায়। ক্রাপস্‌কায়া পুলিশকে জানালেন—আমি লেনিনের বাগদত্তা, তাঁর কাছেই আমি থাকতে চাই।

এসব ব্যাপারে পুলিশের কোন বাধা ছিল না, বরং বিপ্লবীরা বিয়ে-থা করে পুরোদস্তুর সংসারী হয়ে বিব্রত হয়ে পড়ুক তাহলেই তাদের মাথাটা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে—এই ছিল কর্তৃপক্ষের ধারণা। কাজেই অনুমতি পেতে দেরী হোল না এবং নিজের পয়সা খরচ করে ক্রাপ্‌স্‌কায়া আর তাঁর মা এসে পৌঁছলেন লেনিনদের গ্রামে।

ক্রাপস্‌কায়াকে কাছে পেয়ে লেনিনের নিঃসঙ্গ জীবন মাধুর্য্যমণ্ডিত হয়ে উঠতো—নদীর জলস্রোত কঠিন হয়ে মিলে যেত তুহিন-ঢাকা প্রান্তরের সঙ্গে। বরফের ফাঁক দিয়ে ছোট ছোট কাঁকড়া উঁকি মারতো ফাটলের ফাঁক দিয়ে লাফ মারতো ছোট্ট মাছগুলো। ক্রাপ্‌স্‌কায়ার হাত ধরে লেনিন বেরিয়ে বেড়াতেন সেই বরফের উপর দিয়ে। কখনো বা দুজনে স্কেটিং করে বেড়াতেন, কখনো বসতেন দাবা খেলতে।

মাঝে মাঝে ধারাবাহিকতার ছেদ ঘটাবার জন্য বন্দুক হাতে লেনিন বেরিয়ে পড়তেন শিকারের সন্ধানে। কখনও দেখা যেত খরগোসের

পিছনে, কখনো বা হাতের বন্দুক গর্জে উঠতো কোন পাতিহাঁসের নিশানায়।

জীবনের এমনি নিরানন্দময় দিনে সাইবেরিয়ার মরুপ্রান্তরে বন্দী লেনিনের সঙ্গে বন্দিনী ক্রাপ্‌সকায়ার বিয়ে হয়ে গেল।

মনের কথা খোলাখুলি আলোচনা করা চলে, হাতের কাছে এমন একজন সঙ্গিনী পেয়ে লেনিনের জীবন-যাত্রা সহজ হয়ে এলো, একান্তভাবে পড়াশুনার মধ্যে ডুবে যাবার সুবিধা হোল।

বাইরে ঝির ঝির করে বরফ পড়ে, শাদা কুজ্‌ঝটিকা জড়িয়ে থাকে মাঠের আকাশকে! এক একটা দমকা হাওয়ায় জানলা-দরজাগুলো খট্‌খট্ করে ওঠে, সে সব দিকে লেনিনের খেয়াল থাকে না, তিনি তন্ময় হয়ে যান বইয়ের মধ্যে। কখন হয়ত বা কোন পরিচিত কমরেড এসে দরজায় নক্ করে চমকে দেয়, তখন সুরু হয় আলোচনা।

এই সময় লেনিন ছুটি মূল্যবান প্রবন্ধ লেখেন—নিজদলের মতামত স্পষ্টভাবে অন্যান্য দলকে বুঝিয়ে দেবার জন্য। প্রবন্ধ ছুটি বিপ্লবীদলে বহুল প্রচার হয়।

এইভাবে তিনটা বছর সাইবেরিয়ায় কাটিয়ে আবার একদিন লেনিন গাড়ীতে উঠে বসলেন, উরাল পর্বতমালা পার হয়ে ফিরে এলেন রুশিয়ায়।

কর্ম-পদ্ধতি স্থির হয়ে গিয়েছিল, ফিরে এসেই লেনিন দলের বৈঠক ডাকলেন পার্টির ভবিষ্যৎ আলোচনা করার জন্য।

পুলিশের দৃষ্টিকে ফাঁকী দিয়ে পিটার্সবার্গ সহরের বাইরে দলের বৈঠক বসলো। অন্তরঙ্গ সবাই এসে সমবেত হোল। আলোচনা হোল। শেষে ঠিক হোল দেশে বসে ধারাবাহিকভাবে কাজ করে যাওয়ার অসুবিধা অনেক, পুলিশের সতর্কদৃষ্টি কোনদিনও এতটুকু নিশ্চিন্ত হতে দেবে না। সত্যিকারের কিছু করতে হলে দলের কর্ম-কর্তাদের খানিকটা নিশ্চিন্ত হওয়া প্রয়োজন, সেজন্য দলের প্রধান আড্ডা হবে রুশিয়ার বাইরে। সেখান থেকে দলের মুখপত্র বেরুবে। কিভাবে কাজ চালাতে হবে, কোন নীতি দলের লোকেরা মেনে চলবে, সেই সব নির্দেশ থাকবে সেই কাগজে। সেই কাগজ গোপন পথে আসবে রাশিয়ায়। দলের কর্মীরা তা প্রচার করবে শ্রমিকদের মধ্যে।

(ক্রমশঃ)

উমা

—শ্রীবাণী গুপ্তা, এম, এ, বি, টি

দক্ষযজ্ঞে পতিনিন্দায় দেহত্যাগিনী সতী নগরাজ হিমালয় ও তদীয় পত্নী মেনার গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। সেদিন হিমালয়ের উদার পরিবেষ্টনীতে কি অপূর্ব সমারোহ। সুমঙ্গল শঙ্খধ্বনিতে পর্বতের শিখর কন্দর প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। বিদ্যুল্লতা কন্যার দেহকান্তি নগরাজ গৃহ উজ্জল করিয়া তুলিল।

দিনে দিনে পিতামাতার আনন্দদায়িনী কন্যা শশিলেখার মত বাড়িতে লাগিলেন। পিতা আপন বংশের গৌরবদায়িনী কন্যার নাম রাখিলেন 'পার্বতী'—অর্থাৎ পর্বত দুহিতা। 'আবার' কন্যাকে তপস্যা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য মেনা তাঁহাকে কহিয়াছিলেন উ মা অর্থাৎ তপস্যা হইতে বিরত হও। তুমি এই ক্লেশ সহ্য করিতে পারিবে না। পার্বতীর অপর নাম এইজন্য উমা।

বালিকা পার্বতী সখীসহ হিমাদ্রি বিহারিণী মন্দাকিনীর বেলাভূমিতে ক্রীড়া করেন। বালিরাশিদ্বারা নির্মাণ করেন ক্ষণভঙ্গুর বালির ঘর। পুতুল লইয়া খেলা করেন সখীগণের সঙ্গে। তারপর কিশোরী গৌরীর বিদ্যার্জনের সময় হয়—মেধাবিনী গৌরী আপন প্রতিভার প্রভাবে অতি অল্প আয়াসে অর্জন করেন অসাধারণ পাণ্ডিত্য, অপূর্ব মনস্বিতা।

ক্রমে নিপুণ চিত্রকরের তুলিকায় অঙ্কিত আলেখ্যের মত গিরিদুহিতার কমনীয় তনু যৌবনশ্রীতে সুসজ্জিতা হইয়া উঠিল। পদ্ম শিরীষ চম্পক পুষ্পের সৌন্দর্য্য ও কমনীয়তায় গঠিত পার্বতীর দেহসৌন্দর্য হিমালয়ের সকল শোভাকে অতিক্রম করিল। অবশেষে পাষাণ হিমালয়ের অমৃত স্নেহনির্ঝরে বর্দ্ধিতা আদরিনী দুহিতা পার্বতীর বিবাহের বয়স আসিল। এমন সময়ে একদিন কুমারীকে পিতার পাশে দেখিতে পাইয়া দেবর্ষি নারদ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গেলেন যে তপোবলে এই কন্যা একদিন মৃত্যুঞ্জয়ের হৃদয় জয় করিবেন এবং তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গিনী হইবার সৌভাগ্য লাভ করিবেন।

দেবর্ষির এই বাণী উমার অন্তরে চন্দ্রশেখরের মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া দিল। মনে মনে তিনি তাঁহাকেই আপন পতিরূপে বরণ করিয়া লইলেন। দেবর্ষির আশ্বাসে হিমালয় কন্যার বিবাহের জন্য নিশ্চিন্ত হইলেন বটে কিন্তু কি উপায়ে এই পরিণয়-কার্য সম্পন্ন করা সম্ভবপর তাহা ভাবিয়া পাইলেন না। সতীর দেহত্যাগের পর মহাদেব সমাধিমগ্ন, ব্যাঘ্রচর্ম পরিহিত ত্রিনেত্র শিব হিমালয়ের সানুদেশে আপন তপস্যাক্ষেত্র নির্বাচন করিয়াছেন। স্থানে স্থানে তাঁহার অনুচর প্রমথগণ—নিঃশব্দে শিবের তপস্যায় শান্তিরক্ষায় নিযুক্ত।

হিমালয়ের সানুদেশে সমাধিস্থ শিবের পরিচর্যার জন্য হিমরাজ আপন কন্যাকে প্রেরণ করিলেন তাঁর সহচরীসহ। জিতেন্দ্রিয় নির্বিকার চন্দ্রশেখর পার্বতীকে আপন পরিচর্য্যার অধিকার দানে সম্মানিতা করিলেন।

দেবর্ষি নারদ-উক্ত ভাবী পতি দেবাদিদেবের পরিচর্য্যার অধিকারে পার্বতী আপনাকে পরম কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন।

শ্রদ্ধা ও ভক্তির দ্বারা অভিষিক্ত করিয়া

মহাদেবের প্রাত্যহিক পূজা উপচার সজ্জিত করিয়া দিতেন। পুষ্প চয়ন করিয়া, সমাধিরত চন্দ্রশেখরের আসনবেদী ধৌত করিয়া, পূজা ও অভিষেকের পবিত্র বারি আনিয়া উমার দিবস অতিবাহিত হয় পরম সার্থকতায়। শ্রমক্লান্তা পার্বতী ধ্যানমগ্ন মহেশের ললাট চন্দ্রকলার কৌমুদীতে আপন দেহক্লান্তি অপনয়নে গভীর সুখ লাভ করেন।

হিমালয়ের সানুদেশে ধ্যানমগ্ন মহাদেব। এদিকে স্বর্গ হইতে বিতাড়িত তারকাসুর বিড়ম্বিত দেবতাগণ আত্মত্রাণের জন্য পিতামহ ব্রহ্মার শরণাপন্ন। ব্রহ্মা তাঁহাদের জানাইলেন যে দুর্দান্ত অমর বিজয়ী তাড়কাসুরকে নিধন করিবার ক্ষমতা কেবল মাত্র দেবাদিদেবের কুমার দ্বারা সম্ভবপর। কিন্তু ধ্যানমগ্ন মহেশের কুমার কিরূপে সম্ভব? ব্রহ্মা তাহার উপায় দেবতাদের বলিয়া দিলেন। ভুবনমোহিনী নগরাজ দুহিতা উমার সৌন্দর্যের দ্বারা শম্ভুর সমাধিমগ্ন অন্তরকে জয় করিবার উপদেশ দিলেন। এই উমা-মহেশ্বরের আত্মজ কুমারই তাড়কাসুর বিজয়ী হইবেন।

মহেন্দ্র দেবাদিদেবের তপোভঙ্গের জন্য মদন ও বসন্তকে আহ্বান করিলেন। মদন দেবরাজের নিকটে আপন কর্তব্য কর্মের নির্দেশ লইয়া বসন্তের সহিত মহাদেবের যোগস্থানে আসিয়া উপনীত হইলেন। বসন্তের অকাল আবির্ভাবে মুহূর্তের মধ্যে সেই শান্ত স্নিগ্ধ তপোবন বিলাস-উদ্যানে পরিণত হইল। অশোক বৃক্ষ নবপল্লব ও পুষ্পমঞ্জরীতে শোভন হইয়া উঠিল। সহকার তরুর সর্বাঙ্গে নবপল্লব ও চূত-মুকুল। শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়ার চন্দ্রকলার মত বঙ্কিম অর্দ্ধস্ফুট পলাশ আপনার উগ্র সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিবার জন্য ব্যগ্র। বসন্তের এই অকাল আবির্ভাবে সমগ্র বনভূমি চঞ্চল হইয়া উঠিল বটে, কিন্তু জিতেন্দ্রিয় মহাদেবের অন্তরে কোনও পরিবর্তন দেখা গেল না।

শঙ্করের চিরানুরক্ত ও পরম ভক্ত কিঙ্কর নন্দী স্বর্ণবেত্র হস্তে মহাদেবের লতাগৃহের দ্বার রক্ষা করিতেছিলেন। বনস্থলীর এই আকস্মিক পরিবর্তনে চমকিত ও বিরক্ত হইয়া তিনি ওষ্ঠাধরে আপন তর্জনী স্থাপন করিয়া সমগ্র বনভূমিকে সতর্ক করিয়া দিলেন। মহাদেবের ধ্যান ভঙ্গের আশঙ্কায় মুহূর্তমধ্যে বসন্তের সকল চাঞ্চল্য তিরোহিত হইল। বনভূমি নিস্পন্দ হইয়া গেল। বসন্তের পরাভবে মদন নন্দীকে এড়াইয়া লতাকুঞ্জের মাঝে মহাদেবের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু মহাদেবের ধ্যানমগ্ন জ্যোতির্ময় মূর্তির পানে চাহিয়া তিনি আপন কার্য্যের অসম্ভাব্যতা উপলব্ধি করিলেন।

বীরাসনে উপবিষ্ট মহাদেব। দেহের উত্তমার্দ্ধ সরল ও সমুন্নত। করযুগল ঊর্দ্ধদিকে সন্নিবিষ্ট প্রফুল্ল প্রস্ফুটিত কমলের মত শোভমান। কৃষ্ণসর্পে সজ্জিত জটাজাল। কর্ণে রুদ্রাক্ষের ভূষণ, কণ্ঠদেশ পর্য্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ মৃগচর্ম আচ্ছাদিত। ব্যাঘ্রচর্মের পরে সমাসীন মহাদেব। চিত্রের ন্যায় নিস্পন্দ, স্তিমিত ত্রিনেত্র নাসাগ্রে নিবদ্ধ। ললাটনেত্রে আলোর ঝরণা প্রবাহিতা। দেবাদিদেবের জ্যোতিষ্মান দেহের পানে চাহিয়া মদন আপনাকে পরাজিত মনে করিতেছিলেন, এই সময়ে তিনি দেখিলেন গৌরী তাঁহার অনিন্দ্যরূপে চতুর্দিক আলোকিত করিয়া মহেশের সেবার্থে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বসন্ত কুসুমের আভরণে সজ্জিতা উমার পানে চাহিয়া মদনের নির্বাপিত আশা জাগিয়া উঠিল। গৌরীর দেহে অরুণ অশোকপুষ্প পদ্মরাগমণির মত জ্বলিতেছিল, কর্ণিকা কুসুমের স্বর্ণ দীপ্তি তাঁহার অঙ্গ ঘিরিয়া শোভা পাইতেছিল। মুক্তামালার পরিবর্তে শুভ্র কোমল সিন্ধুবার পুষ্পের মালা দুলিতেছিল তাঁহার কণ্ঠে। বকুল মালার চন্দ্রহারে সজ্জিতা, আরক্ত বল্কল পরিহিতা ঈষৎ নমিতা, মন্থরগমনা পার্বতীকে দেখিয়া সজ্জিতা বসন্তলক্ষ্মী বলিয়া ভ্রম হইতেছিল।

শৈলসুতা সমাধি কুটিরের দ্বারদেশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। মহাদেবও কিছুক্ষণের জন্য ধ্যান হইতে বিরত হইয়া চক্ষু উন্মীলন করিলেন। নন্দী তাঁহাকে জানাইলেন শৈলসুতা দেবাদিদেবের সেবার্থে কুটীরের দ্বারে উপস্থিত। মহাদেব তাঁহাকে প্রবেশের অনুমতি দিলেন। গিরিনন্দিনী মহাদেবের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বনদেবী সখীদ্বয় বসন্তপুষ্পপল্লব অঞ্জলি দান করিলেন তাঁহার চরণে। গৌরী চিরবাঞ্ছিত চন্দ্রশেখরকে প্রণাম নিবেদন করিলেন। প্রণামকালে তাঁহার আনতমস্তক হইতে নবীন কর্ণিকার কুসুম এবং কর্ণভূষণ নবপল্লব খসিয়া পড়িল। মহাদেব প্রণতা পার্বতীকে আশীর্বাদ করিলেন—অনন্যভাজং পতিমাপ্নু—অনন্যচিত্ত পতিপ্রাপ্ত হও।

মন্দাকিনী হইতে আপন হস্তে অবচয়িত পদ্মের বীজ রৌদ্রতাপে শুষ্ক করিয়া সেই কৃষ্ণবীজে গৌরী গাঁথিয়াছেন অতি চমৎকার জপমালা। আপন পদ্মাকার সেই মালা লইয়া আসিয়াছেন তিনি ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে শশাঙ্ক শেখরের চরণে উপহার দিবেন। সেই মালা গ্রহণের জন্য প্রসন্নমুখে দেবাদিদেব হস্ত প্রসারিত করিলেন, অমনই এই সুযোগে মদন সম্মোহন বাণ পুষ্পধনুকে সংযোজিত করিলেন। কন্দর্পের এই বাণ-সন্ধানের ফলে মহাদেবের চিত্তে চাঞ্চল্য অনুভূত হইল। শৈলসুতারও ঈষৎ ভাবান্তর দেখা গেল। নির্বিকার চিত্তে আর তিনি দেবাদিদেবের মুখের পানে চাহিতে পারিলেন না। আনত নয়নে মুখ ফিরাইয়া আলেখ্য চিত্রিতার ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। ত্রিনয়ন আপন যোগনিষ্ঠ চিত্তের এই চাঞ্চল্য সবলে দমন করিয়া এই চিত্তবিক্ষেপ কারীর জন্য চতুর্দিকে চাহিতে লাগিলেন। এবং অদূরেই বাণক্ষেপ-উদ্যোগী মদনকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার ক্রোধাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। তাঁহার ললাট-নয়ন হইতে অগ্নি ছুটিয়া গিয়া মদনকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিল। তপোনিষ্ঠ মহাদেব নারীসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া প্রমথগণ সহ অন্তর্হিত হইলেন।

পোষাক পরিচ্ছদ

ইংরেজী বর্ণমালা প্যাটার্ণ

—শ্রীমতী গায়ত্রী দেবী

(এই অক্ষরগুলি তুলিতে দুই রঙের পশম দরকার নিজের ইচ্ছামত কাঁটার যে কোন বোনায় ইহা দেওয়া যায়)

"H"

(১৩ ঘরে উঠিবে)

১ম কাঁটা—২ ঘর সাদা, ২ ঘর কাল, ৪ ঘর সাদা, ৪ ঘর কাল, ১ ঘর সাদা।

২য় কাঁটা—১ঘর কাল, ৪ঘর সাদা, ১ঘর কাল, ২ঘর সাদা, ১ঘর কাল, ২ঘর সাদা, ১ঘর কাল, ১ঘর সাদা।

৩য় কাঁটা—৪ঘর সাদা, ১ঘর কাল, ১ঘর সাদা, ১ঘর কাল, ২ঘর সাদা, ১ঘর কাল, ৩ঘর সাদা।

৪র্থ কাঁটা—৪ঘর সাদা, ৭ঘর কাল, ২ঘর সাদা।

৫ম কাঁটা—১ঘর সাদা, ১ঘর কাল, ১ঘর সাদা ১ঘর কাল, ২ঘর সাদা, ১ঘর কাল, ৩ঘর সাদা, ১ঘর কাল, ২ঘর সাদা।

৬ষ্ঠ কাঁটা—১ঘর সাদা, ১ঘর কাল, ৩ঘর সাদা, ১ঘর কাল, ১ঘর সাদা, ১ঘর কাল, ২ঘর সাদা, ১ঘর কাল, ১ঘর সাদা, ১ঘর কাল।

৭ম কাঁটা—২ঘর কাল, ২ঘর সাদা, ১ঘর কাল, ৩ঘর সাদা, ৩ঘর কাল, ২ঘর সাদা।

ছুটির ঘন্টা

পরিচালক শ্রীবিজন কুমার গঙ্গোপাধ্যায়

বিজনদা'র চিঠি

আমার আদুরে ভাই বোনেরা—

তোমাদের প্রতিযোগিতার ফলাফল এবারে প্রতিযোগিতার বিচারক মহাশয় জানালেন।…নতুন প্রতিযোগিতা আবার আসছে বারে দেবার চেষ্টা করবো।…উপন্যাসটা শেষ হয়ে যাওয়াতে তোমাদের মধ্যে অনেকে প্রশ্ন করেছ যে আবার কোন নতুন উপন্যাস তোমাদের বিভাগে যাবে কিনা! আমি তার উত্তরে জানাচ্ছি যে খুব শীঘ্রই তা যাবে এবং সেজন্যে আমিও খুব ব্যস্ত আছি, যাতে তা তোমাদের উপহার দিতে পারি।…আজ আসি, স্নেহ নিও।

তোমাদের : বিজনদা'

রাণু আর তা'র দাদা

(৪)

—রূপকুমার—

বোনটি রাণু,

ওঃ! এবারে তোর চিঠি তো চিঠি নয়—মনে হ'লো ওখানা পড়ে যেন এক ঝুড়ি প্রশ্ন।…ভয় নেই, উত্তর আমি সবগুলো প্রশ্নেরই যতটা সম্ভব সংক্ষেপে দেবার চেষ্টা করছি এই চিঠিতে। খুব মন দিয়ে শোন এবারে…সূর্য্যের চারিদিকে যে সব গ্রহ ঘুরছে তারা সবাই সমান দূরে অবস্থিত নয়। সূর্য্য থেকে "**বুধ**" : হচ্ছে তিন কোটি ষাট লক্ষ মাইল, "**শুক্র**" : ছ'কোটী সত্তর লক্ষ মাইল. "**পৃথিবী**" : ন'কোটী ত্রিশ লক্ষ মাইল, "**মঙ্গল**" : চোদ্দ কোটী কুড়ি লক্ষ মাইল, "**বৃহস্পতি**" : আটচল্লিশ কোটী ত্রিশ লক্ষ মাইল, "**শনি**" : অষ্টআশী কোটী ষাট লক্ষ মাইল, "**ইউরেনাস্**" : একশো আটাত্তর কোটী কুড়ি লক্ষ মাইল, "**নেপচুন**" : দু'শো উনোআশী কোটী কুড়ি লক্ষ মাইল, আর "**প্লুটো**" তিনশো আশী কোটী মাইল দূরে অবস্থিত।……তোর দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে যে সূর্য্যের চারিদিকে এই গ্রহগুলোর প্রদক্ষিণ করতে কার কত সময় লাগে। কেমন তাই নয়? ওর উত্তর হচ্ছে—**বুধের** লাগে সাতাশী দিন, তেইশ ঘণ্টা, পনেরো মিনিট, **শুক্রের** : দু'শো চব্বিশ দিন, ষোল ঘণ্টা, উনোপঞ্চাশ মিনিট, আট সেকেণ্ড, **পৃথিবীর** তিনশো পঁয়ষট্টি দিন, ছ'ঘণ্টা, আট মিনিট, সাড়ে সাত-চল্লিশ সেকেণ্ড, **মঙ্গলের** এক বছর, তিনশো একুশ দিন, বাইশ ঘণ্টা, **বৃহস্পতির** বারো বছর, **শনির** উনত্রিশ বছর, একশো সত্তর দিন, **ইউরেনাসের** চুরাশি বছর, কুড়ি দিন, **নেপচুনের** একশো চৌষট্টি বছর দুশো একাশী দিন, আর **প্লুটোর** প্রায় দু'শো ষাট বছর সময় লাগে।……না, ঐ গ্রহগুলো সবাই সমান আকারের নয় ওর মধ্যে সব থেকে বড় গ্রহ হচ্ছে **বৃহস্পতি**। বৃহস্পতির ব্যাস নব্বই হাজার মাইল, আর সব চেয়ে আকারে ছোট হচ্ছে বুধ। বুধের ব্যাস ত হাজার ন'শো বিরেনব্বই মাইল।…তোর এর পরের প্রশ্ন হচ্ছে এই যে সৌরজগতের গ্রহগুলো যে ঘুরছে এ সত্য কে আবিষ্কার করলো?……ও সত্য কোপারনিকাস্ আবিষ্কার করে ইউরোপে প্রচার করতে আরম্ভ করেন, কিন্তু ওর বহুকাল পূর্ব্বে আমাদের দেশে ভাস্করাচার্য্য এ তথ্য আবিষ্কার করেছিলেন।…যা জানতে চেয়েছিস গতবারের চিঠিতে মোটামুটি তা' তোকে সবই জানালাম।…আশা করি কুশলে আছিস। তোর চিঠির আশায় রইলাম।

তোর : দাদা

মনে রেখো—

"ভক্তি আপনার উন্নতির জন্য। যাহার ভক্তি নাই তাহার চরিত্রের উন্নতি নাই।"

—বঙ্কিমচন্দ্র

শোন মন দিয়ে

—সেখ সিরাজউদ্দীন (৪৭৭)

চাঁদ আকাশে দেখা দেবামাত্র আরব শান্ত শিষ্ট হয়ে ওঠে, তার প্রাঙ্গণে দিবাভাগে যুদ্ধের যে তাণ্ডব-লীলা চলছিল তা বন্ধ হয়ে যায়। ঠিক এমনি সময় সালাদিন তাঁবুতে রণক্লান্ত শরীর নিয়ে বিশ্রাম করতে গিয়ে চরমুখে শুনতে পেলেন শত্রুপক্ষের অধিনায়ক রবার্ট সুচিকিৎসার অভাবে অসুখে কাহিল হয়ে বিছানায় ছট্‌ফট্‌ করছেন। এ শুনে সালাদিন আর আরাম করতে না গিয়ে কোমরে ওষুধের থলেটা লুকিয়ে নিয়ে ঘোড়ায় চেপে রবার্ট যে দুর্গে অবস্থান করছেন সেখানে গিয়ে উপস্থিত হন। সেখানে ঘোড়াকে একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে গুপ্তপথ দিয়ে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করে একেবারে রবার্টের বিছানার পাশে গিয়ে হাজির হন। সালাদিনকে দেখে রবার্টের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে ওঠে, ভাবতে থাকেন, তার জীবন তো আজ যাবে, সঙ্গে সঙ্গে যাবে যুদ্ধ জয়ের আশা বিলুপ্ত হয়ে। রবার্টের দেহ-রক্ষীদেরও প্রাণ অজানা আশঙ্কায় শঙ্কিত হয়ে ওঠে।

সালাদিন রবার্টের বিছানার পাশে বসে মুখে হাসির দীপ্তি ফুটিয়ে বল্লেন, "ভয় নেই, তোমার অসুখের কথা শুনেই আমি এলুম।"

রবার্ট কিছু বুঝতে না পেরে ফ্যালফ্যাল করে সালাদিনের পানে চায়।

সালাদিন ওষুধের থলেটা কোমর থেকে বের করতে করতে বল্লেন, "তুমি লড়াই করতে বিলাত থেকে আমাদের দেশে এসেছ, কাজেই তুমি শত্রু হলেও আমাদের অতিথি, তাই তোমার অসুখের কথা শুনে আমাকে ছুটে আসতে হয়েছে। খাও এই ওষুধটা খাও, তা'হলে কিছুক্ষণের মধ্যে তোমার জ্বর ছেড়ে যাবে, তুমি চাঙ্গা হয়ে উঠবে।"

সালাদিন ওষুধ বের করে রবার্টকে দেন, ইতস্ততঃ করলেও সালাদিনের কথা অমান্য করতে পারেন না। ওষুধ তিনি খান, খেলে পর সালাদিন বলেন, "আচ্ছা, আমি আসি, ভগবানের ইচ্ছেয় ফের কাল তোমার সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে আবার দেখা হবে।" যে পথ দিয়ে তিনি এসেছিলেন, সেইপথ দিয়েই বেরিয়ে যান।

ওষুধ খাওয়ার পরে সত্যি সত্যিই রবার্ট সুস্থ সবল হয়ে ওঠেন, কিন্তু সালাদিনের এই মহৎ হৃদয়ের পরিচয় পেয়ে যুদ্ধ করতে তার মন চাইল না, পরাজয় বরণ করে নিয়ে তিনি সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করেন।

আগেকার লোকেরা এমনি ভাবে মহৎ হৃদয়ের গুণে শত্রুকেও নিজের বশে আনতে পারত, কিন্তু আমরা তা পারি না। তাই ভাবি, তারা সভ্য ছিল, না আমরা সভ্য?

সব সত্যি

—রবীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (৮৭৮)

...না ছেলেটির বয়স আমাদের চেয়েও কম। তখন তার বয়স মাত্র দশ বৎসর।... তার কিরূপ অদ্ভুত সাহস ছিল তা এই ঘটনা পড়লেই জানতে পারবে।...সেই সময় ব্রিটিশ রাজের "সিরাসিপ" নামে এক বৃহৎ রণতরী কলকাতায় এসেছিল। এবং আদেশপত্র নিয়ে কলকাতার বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এই রণতরী দেখতে যাচ্ছিল।... আমাদের এই বালকটিও উহা দেখতে যাবে বলে আদেশপত্র পাবার আশায় একখানা আবেদন পত্র লিখে চৌরঙ্গির অফিসে দেখাবেন বলে সেখানে গিয়ে হাজির হলেন, কিন্তু দ্বারবান বিশেষ গণ্যমান্য ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কাহাকেও ভিতরে ঢুকতে দিচ্ছে না। তখন অনতিদূরে দণ্ডায়মান হয়ে সাহেবের সহিত দেখা করবার জন্য উপায় চিন্তা করতে করতে দেখলেন, তাঁরা সকলেই ঐ অফিসের তিন তলার এক বারাণ্ডায় যাচ্ছেন।...তখন তিনি বুঝলেন যে এইখানেই সাহেব আবেদন পত্র নিয়ে অনুমতি পত্র দিচ্ছেন। ঐখানে যাবার জন্য অন্য কোন পথ আছে কি না তাহা দেখবার জন্য তিনি কিছুক্ষণ অনুসন্ধান করে দেখতে পেলেন ঐ বারাণ্ডার পিছনের ঘরে পরিচারকদের যাবার জন্য এক পার্শ্বে একটি অপ্রশস্ত লৌহময় সোপান রয়েছে। কেহ দেখতে পেলে লাঞ্ছিত হবার সম্ভাবনা বুঝেও তিনি সাহসে নির্ভর করে তাই দিয়েই তিন তলায় উঠলেন এবং সাহেবের ঘরের ভিতর দিয়ে বারাণ্ডায় প্রবেশ করে দেখলেন সাহেবের চারিদিকে আবেদনকারীগণ ভিড় করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন এবং সাহেব তার সামনের টেবিলে মাথা হেঁট করে ক্রমাগত অনুমতি-পত্র স্বাক্ষর করে যাচ্ছেন। তিনি তখন সকলের পিছনে দাঁড়িয়ে রইলেন এবং যথাসময় অনুমতি পত্র পেয়ে সাহেবকে অভিবাদন করে অন্য সকলের মত সামনের সিঁড়ি দিয়ে অফিসের বাইরে চলে এলেন। চিনতে পারছ এই সাহসী বালকটি কে?... চিনতে পারছ না? না পার তো শোন— ইনি হচ্ছেন নরেন্দ্র নাথ দত্ত, যিনি স্বামী বিবেকানন্দ নামে সবার কাছে পরিচিত হন।

টুকে রাখো

—শ্রীরবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস (৯১০)

প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির চব্বিশ ঘণ্টায়:—

১। হৃদযন্ত্র ১লক্ষ ৩ হাজার ৬ শত ৮০ বার স্পন্দিত হয়।

২। নিঃশ্বাস প্রশ্বাস পড়ে ২৩ হাজার ৪০ বার।

৩। প্রধান প্রধান ৭৬০টি পেশী সঞ্চালিত করে।

৪। নখ বাড়ে ০০০০. ৪৬ ইঞ্চি।

৫। প্রায় ২ সের খাদ্য গ্রহণ করে।

৬। ঘুমন্ত অবস্থায় পাশ ফেরে প্রায় ৩০ বার।

৭। প্রায় ৩ পাঁট জলীয় জিনিষ গ্রহণ করে।

মজার খবর

—শ্রীহরিগোপাল বসাক (৭১৭)

কোন্ সাগরে আজ পর্য্যন্ত জাহাজ চলিতে পারে নাই এবং সাঁতার না জানিলেও লোকে সহজে ডুবিয়া যায় না? (Sargosa sea) সারগোজা সাগর। এই সাগরে একপ্রকার আগাছা জন্মায়; সেগুলি জাহাজ চলিবার পক্ষে বিশেষ প্রতিবন্ধক। ঐ কারণেই এই সাগরে লোক সহজে ডুবিয়া যায় না।

প্রতিযোগিতার ফলাফল

১। এ প্রশ্নের উত্তর কারুরই ঠিক হয় নি।

এটি এই রকম হবে।

২। এর উত্তর :

৪ ৪ ৪
৪ ৪
৪
৪
৪

৫০০

এর সঠিক উত্তর দিয়েছে : চিত্তরঞ্জন সরকার (১১২৩), অরুণ কুমার পাল, নাটোর, (৯৭৮) ঝরণা দেবী, আলিগঞ্জ, (২৬৮) রিজিয়া আমেদ, মুন্সিগঞ্জ, (১১১৯)

৩। নগেন বলছে সমরেশকে।

এর সঠিক উত্তর দিয়েছে : রিজিয়া আমেদ (১১১৯), ছন্দা দেবী কলিকাতা (১০৯৯), সুহাসকুমার দাস, কলিকাতা (৯৪৯), অরুণ কুমার পাল, নাটোর (৯৭৮), নিভৃত কুমার রায় (১০৯৭), চিত্তরঞ্জন সরকার (১১২৩), বিভা রায়, বর্দ্ধমান (২০০)

৪। "Let" কথাটি খুব পুরোণো—এর উৎপত্তিস্থল দুটি, কিন্তু দুটিরই মানে একেবারে আলাদা। একটির উৎপত্তি হল Laetan কথা থেকে যার মানে হল "অনুমতি দেওয়া"। দ্বিতীয়টির উৎপত্তি হল Lettan কথা থেকে, যার মানে হল, "বাধা দেওয়া"। টেনিস খেলায় এই শেষোক্ত কথাটি থেকেই "Let" কথাটি এসেছে—যদিও সাধারণে এই কথার এই মানে বর্ত্তমানে একেবারে চলতি নেই। কিন্তু টেনিস খেলাটিও তো খুব পুরোণো, সেইজন্যে বল 'সার্ভ' করার সময় জালে বল লাগলে বলকে বাধা দেওয়া হল, এবং তাকে এখন পর্য্যন্ত 'Let'ই বলে আসছে।

এ প্রশ্নটির সন্তোষজনকভাবে উত্তর দিতে বিশেষ কেউ পারেনি, তবে মোটামুটি যারা মানেটা বুঝিয়েছে তারা উৎপত্তির বিষয় কিছু জানাতে পারেনি। তবে এরই মধ্যে খানিকটা ঠিক বলেছে আমাদের ভাই অরুণ কুমার পাল (৯৭৮)।

আমাদের প্রথম পুরস্কার পেল :
অরুণ কুমার পাল, নাটোর (৯৭৮)
২য় পুরস্কার—রিজিয়া আমেদ (১১১৯)
৩য় পুরস্কার—চিত্তরঞ্জন সরকার (১১২৩)
(এদের দু'জনেরই দুটি করে প্রশ্ন ঠিক হয়, কিন্তু লটারীতে ফলাফল দাঁড়িয়েছে উপরোক্ত রকম।)

খেলার মাঠে

শ্রীউমেশ মল্লিক বি, এ

দুর্দ্ধর্ষ মোহনবাগান। একথার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায় গত ২৭শে মে ক্যালকাটা বনাম মোহনবাগানের খেলায়। খেলার প্রথমার্দ্ধে আত্মঘাতী গোলের পর মোহনবাগানের এন, বসু বিশ্রামের কিছু পূর্ব্বে গোলটি পরিশোধ করে। মাত্র চার মিনিট থাকতে যখন অধিকাংশ দর্শক খেলার ফলাফল অমীমাংসীত ভেবে মাঠ ত্যাগ করতে সুরু করেছে তখন সুরু হ'ল মোহনবাগানের গোল করার পালা। ভৌমিকের বল "বারে" প্রতিহত হয়ে ফিরে আসতে, ফিরতি বলে বি, বসু করলো স্কোর। তার পর মুহূর্ত্তেই এন চ্যাটার্জ্জীর প্রদত্ত বলে কে, রায় দিল তৃতীয় গোল। এন, বোস প্রতিপক্ষের রক্ষণভাগের নিকট বল সংগ্রহ করে দলের চতুর্থ গোলটি দেয়। মোহনবাগানের এ দিন গোল করার প্রচেষ্টার পশ্চাতে যে খেলোয়াড়টির বিশেষ কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে তিনি নির্ম্মল চ্যাটার্জ্জী, বস্তুত: তাঁরই আপ্রাণ চেষ্টায় মোহনবাগান দলের এদিনের আক্রমণ বিভাগের খেলা এত সুন্দর হয়ে উঠে। সর্ব্বাপেক্ষা এদিনে মোহনবাগানের হেড করার লোকের অভাব দেখা যায়। ভৌমিকের পরিবর্ত্তে নির্ম্মল মুখার্জ্জী বোধ হয় অধিকতর কার্য্যকরী হবে। আরও ১টি গোল মোহনবাগান দেয়, কিন্তু অফ সাইড বলে পরিচালক মহাশয় তা অগ্রাহ্য করেন। একথা স্বীকার করতে হবে যে ক্যালকাটার এ বৎসরের খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড উচ্চ স্তরের। গত ৩০শে মে মঙ্গলবার মোহনবাগান রেঞ্জার্সের বিরুদ্ধে রক্ষণভাগের দোষে নেমেই এক গোল খায়। তারপর বি, বসু সেটি পরিশোধ করেন। ২য়টি হয়, সেম-সাইডে। তৃতীয় গোলটি হয় পেনাল-টিতে, অনিল দে শূট করেন। ৪র্থ গোলটি করেন কে, রায়। শেষে ফলাফল দাঁড়ায়—৪-১

মহমেডান স্পো: দল এ সপ্তাহে কোন মতে কালীঘাট এবং এরিয়ান্সের নিকট ১টি মাত্র গোলে জয়লাভ করে। এরিয়ান্স দলের আত্মঘাতী গোলে মহমেডান দল ২টি মূল্যবান পয়েন্ট ভাগ্যক্রমে সংগ্রহ করে। শেষার্দ্ধের আট মিনিট পূর্ব্বে এরিয়ান্স দলের কে, মিত্র বলটিকে রক্ষা করতে গিয়ে স্বীয় গোলে চালিয়ে দেন। এরিয়ান্স দলের ব্যাকদ্বয়ের দৃঢ়তার ফলে এবং মহমেডান দলের আক্রমণ বিভাগের ব্যর্থতায় মহমেডান দল কোন গোল দিতে সক্ষম হয়নি। মহমেডান দলের খেলা অতি সাধারণ স্তরের হয়। এরিয়ান্সের গোল রক্ষক পি, দাস সত্যই কতকগুলি সুন্দর বল রক্ষা করে। কালীঘাটের দিনও মহমেডান দলের খেলা প্রাণস্পর্শী হয়ে ওঠেনি। এদিনে মহামেডানের ওয়াহেব ১২ মি: খেলার পর গোল দেন। কালীঘাট দলের খেলোয়াড়দের বুটভীতি এদিন উল্লেখযোগ্য হয়ে ওঠে। বি, দাস ২টি নিশ্চিত গোলের সুযোগ নষ্ট করে। মহমেডান দলের কারো খেলা উল্লেখযোগ্য হয়নি। এমন কি নূর-মহম্মদেরখেলাও প্রাণহীন বলে মনে হল।

ইষ্ট বেঙ্গল দল ভবানীপুরের বিরুদ্ধে ১—০ গোলে জয়লাভ করে। ভবানীপুর দলের এদিন জয়লাভ করা উচিত ছিল। যে রকম সুযোগের অসদ্‌ব্যবহার তারা করেছে তা তাদের চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। ই, বি, দলের পি, দাসগুপ্ত আর মজুমদারের খেলা নৈরাশ্যজনক হয়। দলের প্রয়োজনীয় গোলটি দেন সুনীল ঘোষ। সুশীল চ্যাটার্জ্জী ও পাগসলীর খেলা উন্নত স্তরের হয়। ভবানীপুরের আর সিংহ ও এস ঘোষের খেলা সুন্দর হয়ে উঠে।

ই: বি: দল ও এরিয়ান্সের খেলা অমীমাংসিত ভাবে খেলা হয়। অতি মূল্য-বান একটি পয়েন্ট ই: বি: দল নষ্ট করে এই ভাবে। মোহনবাগানের সঙ্গে ই: বি: দলের এ জন্য দুই পয়েন্ট ব্যবধান রইলো। ই: বি: দলের স্বরাজ ঘোষ গোলটি পরিশোধ করে। পি, দাসগুপ্ত, পি, চক্রবর্ত্তী ও সুনীল ঘোষের খেলা এদিন ভালই হয়।

এরিয়ান্স দলের খেলা বহুদিন পর চিত্তা-কর্ষক হয়ে উঠে। শিশির মুস্তাফীর দর্শনীয় সেণ্টার থেকে শম্ভু মুখার্জ্জী সুন্দর ভাবে গোলটি দেন। এরিয়ান্স সেদিন আরও বহু সুযোগ পেয়েছিল, সেগুলি কার্য্যকরী হলে ইষ্টবেঙ্গলের কাছ থেকে তারা দুটি পয়েন্টই অনায়াসে ছিনিয়ে নিতে পারত।

লীগে কাহার কিরূপ স্থান :

(রবিবার পর্য্যন্ত)

ইষ্টবেঙ্গল	৯	৮	০	১	১৪	৩	১৬
মোহনবাগান	৮	৭	১	০	১২	২	১৫
বি এণ্ড এ আর	৮	৫	২	১	১৪	১০	১২
ক্যালকাটা	৮	৪	১	৩	৮	১১	৯
এণ্টিলোপ	৮	৩	২	৪	১২	১১	৮
ডালহৌসী	৯	৩	১	৪	[illegible]	৮	৭

এক মিনিটের গল্প

বড় ছোট, ভালমন্দ নিয়ে অনেক তর্ক হয়—একদিন হয়েছিল চা আর কফির মধ্যে।

অনেকদিন আগের কথা। পশ্চিমদেশে তখন এইদুটি পানীয় নতুন আমদানী হয়েছে। লোকে চা খায় আর কফি খায়, কিন্তু মন থেকে ভয় যায় না। ভাবে হয়ত এই পানীয়ের সঙ্গে তারা বিষ উদরস্থ করছে।

একটি দেশের কথা বলছি। সেখানকার মসনদে তখন রাজত্ব করতেন এক ন্যায়বান রাজা। লোকের এই সন্দেহ তাঁর কানে পৌছুল।

বৈজ্ঞানিকদের ডাক পড়লো—চা আর কফি দুটী পানীয় নিয়ে গবেষণা করে দেখতে হবে কোনটি ভাল—এই হল রাজার নির্দ্দেশ। কিছুদিন পরে বৈজ্ঞানিকেরা এসে জানালো তারা বিশেষ কোন হদিস পায় নি। অগত্যা তাদের হাল ছাড়তে হল।

তখন রাজা বল্লেন—আমি নিজেই বিচারের ভার নিচ্ছি।

ঠিক এই সময়ে দুটি যমজ ভাই নর-হত্যার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয় এবং প্রাণদণ্ডের আদেশ পায়।

ব্যাপারটা এমন কিছু নয়—কিন্তু রাজার মস্তিষ্ক তখন আরও সূক্ষ্ম বিচারের সূত্র খুঁজছিল। তাই তিনি অভাবনীয় সমাধানের আশায় পুলকিত হয়ে উঠলেন।

যমজ ছোকরা দুটি রাজসভায় আনীত হতেই তাদের প্রাণদণ্ডের কথা ভেবে সবাই শিউরে উঠলো।

অনুল্লেখযোগ্য অন্যান্য খেলা—

বুধবার ২৪শে মে—

ভবানীপুর—৩ ডালহৌসী—০

এন্টিলাপ—০ পুলিশ—০

বৃহস্পতিবার ২৫শে মে—

এরিয়ান্স—০ বি এণ্ড এ রেল—০

রেঞ্জার্স—১ স্পো: ইউ:—১

শুক্রবার ২৬শে মে—

এন্টীলোপ—২ ডালহৌসী—০

শনিবার ২৭শে মে—

স্পো: ইউ:—২ পুলিশ—০

সোমবার ২৮শে মে—

ভবানীপুর—১ পুলিশ—০

মঙ্গলবার ২৯শে মে—

ক্যালকাটা—০ বি এণ্ড এ আর—১

রাজা উদাত্ত স্বরে বল্লেন—এদের প্রাণদণ্ড আমি বহাল রাখলাম, কিন্তু মুণ্ডচ্ছেদের পদ্ধতিটা বদলে আমি অন্য ব্যবস্থা করতে চাই—

সকলেই উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে।—

রাজা বল্লেন,—একজনকে চা খাওয়ান হোক আর একজনকে কফি দেওয়া হোক। পরিমাণে কিছু বেশী করেই খেতে হবে ওদের। বুঝতেই পারছেন সকলে, রাজা আরও বল্লেন, আমি ওদের প্রাণের বিনিময়ে দেশের ও প্রজাদের কল্যাণই করতে চাই।

সকলে ধন্য ধন্য করে উঠলো।

তারপর প্রতিদিনই দুজনে বেশ নিয়মিত চা আর কফি খেয়ে চলে। অবশ্য একটু বড় ডোজেই খায় আর বিষ বলেই গলাধঃকরণ করে। কিন্তু বাহাল তবিয়তে সুখস্বচ্ছন্দেই দিন কাটে তাদের, এবং বছরের পর বছর কেটেও গেল এইভাবে। তাদের মৃত্যু দেখতে যারা তৈরী হয়েছিল তাদের অনেকেই মারা গেল ইতিমধ্যে।

অবশেষে বার্দ্ধক্যের চরম সীমায় ৯৬ বছর বয়সে কফি-সেবী ভদ্রলোক মারা যান। চা-খোর ভদ্রলোক তখনও জীবিত।

লোকে তখন চায়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলো। দেশে মহাসমারোহে চা-সত্র খোলা হয়ে গেল আর সবাই নির্বিচারে চা খেতে লাগলো।

এটা শুধু গল্প নয়, আজও লোকের এ ধারণা বদলায় নি। শুধু কফির চেয়েই যে চা বড় তা নয়, অনেক পানীয়ের চেয়েই চা ভাল, তবে সবরকম চা'কে এত প্রশংসা করা যায় না। কোন কোন চা যেমন টসের চায়ের কাছে আর কোন চা লাগে না।

নানাকথা

দি নিউ রিডিং ক্লাব, (হুগলী)

গত ১৪ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার (ইং ২৮ শে মে) অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকায় নিউ রিডিং ক্লাবের রজত-জয়ন্তী উৎসবের অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। দেশবরেণ্য ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি-এল, ব্যার্-এট্-ল, ডি লিট্, এম্ এল্, এ, এই সভায় পৌরহিত্য করেন।

ব্যাঁটরা পারিজাত সমাজের উদ্যোগে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা

বিষয়—বাংলা সাহিত্যে সুকবি বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের দান।

পুরস্কার—(১ম)—২৫৲, (২য়)—১৫৲ ও (৩য়) ১০৲ টাকা।

প্রবন্ধ পাঠাইবার শেষ দিন—৩১শে আষাঢ়, ১৩৫১ সাল।

প্রবন্ধ ফুলস্কেপ কাগজের ছয় হইতে আট পৃষ্ঠার মধ্যে হওয়া চাই। ছাত্রছাত্রী এবং সাধারণ পাঠক পাঠিকা সকলেই প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে পারিবেন। সমাজের সভাপতি শ্রীযুক্ত জ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল্ মহাশয় ও কয়েকজন বিশিষ্ট সাহিত্যিককে লইয়া গঠিত এক কমিটি প্রবন্ধ বিচারের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। নিম্নলিখিত ঠিকানায় রেজিষ্টার্ড পোষ্টে প্রবন্ধ পাঠাইতে হইবে।

শ্রীব্যোমকেশ অধিকারী

প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা, পারিজাত সমাজ।

৯নং নরসিংহ দত্ত রোড, হাওড়া।

সাহায্য রজনী

আগামী ৩রা জুন শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার সময় মহেশতলা ক্লাব এণ্ড লাইব্রেরী কর্ত্তৃক একটী জলসার আয়োজন করা হইয়াছে এবং তৎসঙ্গে "কেদার রায়" নাটকটী অভিনীত হইবে, রূপায়নে অমর গোস্বামী, সন্তোন মুখোপাধ্যায় সুশান্ত ব্যানার্জ্জী প্রভৃতিকে দেখা যাইবে।

পুষ্প-স্মৃতি-বার্ষিকী

আগামী ৪ঠা জুন, রবিবার, ত্রয়োদশ পুষ্প-স্মৃতি-বার্ষিকীর প্রভাতী উৎসব উপলক্ষে হ্যারিসন রোডস্থিত 'দীপক' সিনেমায় সকাল ৯ ঘটিকায় উৎসবানুষ্ঠান হইবে। ডাঃ শ্রীযুক্ত রাধাবিনোদ পাল মহাশয় এই উৎসবে পৌরহিত্য করিবেন।

রঙমহলে সাহায্যানুষ্ঠান

গত মঙ্গলবার ৩০শে মে রঙমহল রঙ্গমঞ্চে যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালের সাহায্যকল্পে ইণ্টার ক্যালকাটা ষ্টুডেণ্টস রিক্রিয়েশান কর্ত্তৃক এক বিচিত্র অনুষ্ঠান ও নাট্যাভিনয় হইয়া গিয়াছে। সভাপতির আসন গ্রহণ করেন সুকবি শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ও প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন রায় সাহেব শ্রীপুলিন কুমার চট্টোপাধ্যায়। অসিত বরণ প্রমুখ বহু খ্যাতনামা গায়কের গান, নাচ ও "আজ ও কাল" নাটকাভিনয় ছিল।

ছোটদের নববর্ষ আনন্দ উৎসব

ছোটদের আনন্দ পরিবেশনের জন্য ছোটদের বন্ধু লেখিকা ইন্দিরা দেবী গত ২রা মে মঙ্গলবার শ্রীরঙ্গম নাট্যমঞ্চে একটি নাচ গান অভিনয় ও বিচিত্রার আয়োজন করিয়াছিলেন। এই অনুষ্ঠানের বিশেষত্ব ছিল ছোটদের জন্য ছোটদের দিয়া আনন্দ পরিবেশনের ব্যবস্থা। মাতৃ-বন্দনায় বাংলার ছেলেমেয়েদের বন্দনা সঙ্গীত ও পরিকল্পনাটি সুন্দর ও অভিনব। আবৃত্তিতে অলক ও অরুণ চক্রবর্ত্তী শিশু ও কিশোরদের মুগ্ধ করিয়াছিল। ইংরাজী ও বাংলা নাটকাভিনয়ে শিশু ও কিশোর নটদের মধ্যে ইংরাজী নাটিকায় শ্রীমান অলক চক্রবর্ত্তী, ছোট্ট মেয়ে মঞ্জুশ্রী সেন ও কুমারা গঙ্গোপাধ্যায় ও বাংলা নাটিকাভিনয়ে বাণী ভট্টাচার্য্য আমাদের চমৎকৃত করিয়াছে। স্মরণ রাখিতে হইবে এই সব শিশু ও কিশোরদের ইহাই প্রথম সাধারণ রঙ্গমঞ্চে আত্মপ্রকাশ। একটি রূপকথাকে নৃত্যে ও সঙ্গীতে রূপদান করিয়াছিলেন নীলিমা ও মীনাক্ষী গঙ্গোপাধ্যায় ও বিমান ঘোষ। নৃত্যে মাতৃবন্দনায় জয়শ্রী সেনের নাম উল্লেখযোগ্য। ছোটদের আনন্দ দানের জন্য বিখ্যাত গায়ক শ্রীপঙ্কজকুমার মল্লিক এবং শ্রীহেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায় ও কৌতুক অভিনেতা শ্রীঅজিত চট্টোপাধ্যায়ের গান ও কৌতুক-অভিনয় ছোটদের ও ছোটদের অভিভাবকদেরও অভিনব আনন্দ দান করিয়াছেন। এখানে একটি কথা উল্লেখযোগ্য: স্বনামধন্য সকল শিল্পীই ছোটদের উপযোগী

গান গাহিয়াছেন ও কৌতুকাভিনয় করিয়াছেন।

ছোটদের এই আনন্দ পরিবেশনে শ্রীইন্দিরা দেবীকে সাধুবাদ জ্ঞাপন করি। অনুষ্ঠানে যে ত্রুটি ছিল না এমন কথা বলা চলে না কিন্তু সব দিক দিয়া বিচার করিলে আনন্দ-অনুষ্ঠানটি হইয়াছিল সর্ব্বাঙ্গসুন্দর।

ভ্রাতৃ-সম্মিলনী

২ বি. নবীন কুণ্ডু লেনে গত ২৫শে বৈশাখ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেবের সভাপতিত্বে সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় 'রবীন্দ্র-জয়ন্তী' উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষে ভ্রাতৃ সম্মিলনীর সভ্যবৃন্দ কর্ত্তৃক "শিশুরবি" ও "হাজার বছর পরে আমাদের কবি" নাটক অভিনীত হয়।

নওগাঁতে রবীন্দ্র-জন্মতিথি

গত ২৫শে বৈশাখ স্থানীয় বাঙ্গালী হাইস্কুলে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ৮৪তম জন্মোৎসব সুসম্পন্ন হয়। ইহাতে স্থানীয় বেঙ্গলী ক্লাবের যুবকবৃন্দের উদ্যোগে বিশ্ব-কবির "বিসর্জ্জন" নাটকটির একটি দৃশ্য সাফল্যের সহিত অভিনীত হয়। উপস্থিত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। বালক বালিকা কর্ত্তৃক নাচ, গান আবৃত্তি ইত্যাদি হয়। সহরের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

রবিচক্র, চুঁচুড়া

গত ৩০এ বৈশাখ, শনিবার, রবিচক্রের পক্ষ হইতে রবীন্দ্রনাথের চুরাশীতম জন্ম-অনুষ্ঠান পালিত হয়। এতদুপলক্ষে বিশ্ব-ভারতী রবীন্দ্র-ভবনের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত প্রবোধ চন্দ্র সেন, এম, এ, মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক সাহিত্য-সভার অধিবেশন হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রতুল চন্দ্র গুপ্ত, এম, এ, পি, এচ, ডি উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন।

দুঃস্থদের সাহায্য

গোয়াবাগান শিক্ষক ও ছাত্র সম্মিলিত রিলিফ কমিটির উদ্যোগে প্রত্যহ ১৫০ জন দুঃস্থ শিশুকে দুগ্ধ বিতরণ করা হয় এবং ১৫ দিন অন্তর ধুতি, সাড়ী, কম্বল প্রভৃতি বিতরণ করা হয়। সাহায্যপ্রার্থী দুঃস্থ মধ্যবিত্ত ভদ্র পরিবার ও বস্তি অঞ্চলের নরনারীদিগকে রিলিফ কমিটির (সুপারভাইজার) তত্ত্বাবধায়ক শ্রীযুত সুধাংশু কুমার বিশ্বাসের সহিত ৯।৭বি, প্যারী মোহন সুর লেনে (বিশ্বাস-ভবন) সাক্ষাৎ করিতে হইবে।

রেনবো ক্লাব

গত ৩০শে বৈশাখ শনিবার (১৩ই মে) সন্ধ্যা ৬৷৷০টায় শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের ভবনে (২৬২নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ) ক্লাবের বার্ষিক বুদ্ধোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই পবিত্র উৎসবে পৌরোহিত্য করেন বৌদ্ধ শাস্ত্রজ্ঞ ভিক্ষু শীলভদ্র।

রবীন্দ্র জন্মোৎসব

গত ২৪শে বৈশাখ, রবিবার, রবীন্দ্র পরিষদের উদ্যোগে চুঁচুড়া ট্রেনিং একাডেমিতে শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন মুখোপাধ্যায়ের পৌরহিত্যে রবীন্দ্র জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হইয়াছে। চারুলাল মুখোপাধ্যায়, ধ্রুব মুখার্জ্জি, রাধারমণ দে, হরি শর্মা ও গোপী রায় বক্তৃতা, আবৃত্তি ও কণ্ঠ-সংগীতে সকলকে পরিতৃপ্ত করেন। সভাপতি মহাশয় "মানুষ রবীন্দ্রনাথ" সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

রেলওয়ে কোয়ার্টারে রবীন্দ্র জন্মোৎসব

গত ২৫শে বৈশাখ দক্ষিণেশ্বর রেলওয়ে কোয়ার্টারে ওয়াচ এণ্ড ওয়ার্ডের ইনস্পেক্টর শ্রীক্ষিতীন্দ্র মোহন মিত্রের গৃহে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। অনুষ্ঠানের সভাপতি শ্রীরাধিকা ব্যানার্জ্জি সরল ভাষায় 'রবীন্দ্রনাথ' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তৎপর শ্রীনৃপেন্দ্র নাথ দাস রবীন্দ্রনাথের "দেবতার গ্রাস" আবৃত্তি করিয়া সকলকে প্রীত করেন। কুমারী মীরা মিত্রের "শাজাহান" আবৃত্তির পর কুমারী ভারতী মিত্র ও কুমারী মীরা মিত্র "জন-গণ-মন" সঙ্গীতটী গাহিয়া অনুষ্ঠানটী শেষ করে।

বাণী সঙ্গীত বিদ্যালয়

শ্রীযুক্ত আনন্দীলাল পোদ্দার (মেয়র) এবং মিঃ মহম্মদ রফিককে (ডেপুটি মেয়র) সম্বর্দ্ধনা জানাইতে ১৩ই মে উক্ত বিদ্যালয় কর্ত্তৃক সেন্ট পল্ মিশন স্কুল হলে একটি জলসা হয়। নৃত্যে কুমারী চিত্রা সেনের কথক ও 'নির্ঝরের স্বপ্ন-ভঙ্গ' নৃত্য এবং গায়ত্রী বসুর সাপুড়ে নৃত্য সুন্দর হইয়াছিল। কুমারী অলকা সরকারের মণিপুরী শ্রীকৃষ্ণ নৃত্য উল্লেখযোগ্য। পঞ্চম বর্ষীয়া বালিকা রমা সরকারের (বাবুলাল) "সাঁওতালী মেয়ে" নাচটী অতীব সুন্দর হইয়াছিল। শ্রীমতীদ্বয় উভয়েই ডেপুটী পুলিশ কমিশনার মিঃ এইচ, এন, সরকারের কন্যা। অন্যান্য মিলিত নৃত্যগুলিও মন্দ হয় নাই। সঙ্গীতে লীলা, স্নেহ, ও আরতির নাম উল্লেখযোগ্য। নৃত্য পরিচালনা করেন নৃত্য-শিক্ষক শ্রীপ্রহ্লাদ দাসের ছাত্রী, শ্রীমতী নীলিমা নস্কর।

শুভবিবাহ

খ্যাতনামা লেখক ও সাংবাদিক বন্ধুবর শ্রীগোপাল ভৌমিকের সহিত রাজসাহীর ৺মুকুন্দলাল ঘোষের কন্যা শ্রীমতী অরুণার সম্প্রতি বিবাহ হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষ্যে গতপূর্ব্ব শনিবার ১।৩ কাঁকুলিয়া রোডে একটি প্রীতি সম্মিলনীর আয়োজন হয়। আমরা নবদম্পতির মধুময় জীবন কামনা করি।

* * *

গত ১লা জ্যৈষ্ঠ বালীগঞ্জ নিবাসী শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র দাসশর্ম্মা মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত পৃথ্বীশচন্দ্রের সহিত সুসাহিত্যিক ডাঃ বটকৃষ্ণ রায়ের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী রেবার শুভ পরিণয় হইয়া গিয়াছে। আমরা নব দম্পতির দীর্ঘজীবন কামনা করি।

নাটমণ্ডপ

নিউ থিয়েটার্স

বিমল রায় পরিচালিত "উদয়ের পথে" চিত্রায় মুক্তি-প্রতীক্ষায়। হেমচন্দ্র পরিচালিত হিন্দী ছবি "My Sister"-এ তিনটি নবাগতা চিত্রাভিনেত্রীকে দেখা যাইবে যথা—সুমিত্রা দেবী, আখতার জাহান ও শুক্তিধারা নায়কের ভূমিকায় তো সায়গল আছেনই। "দুই পুরুষের" সম্পাদনা চলিতেছে।

কালী ফিল্মস্

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় লিখিত ও পরিচালিত "অভিনয় নয়" শুটিংএর প্রায় অর্দ্ধেক শেষ হইয়াছে। ভূমিকালিপি শেষ পর্যন্ত এইরূপ দাঁড়াইয়াছে—অহীন্দ্র চৌধুরী, শৈলেন চৌধুরী, অমল বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দু মুখোপাধ্যায়, দেবী মুখোপাধ্যায়, মলিনা, রেণুকা রায়, সুপ্রভা মুখোপাধ্যায়, পূর্ণিমা প্রভৃতি। সঙ্গীত পরিচালনা করিতেছেন গিরীন চক্রবর্তী।

রঙমহলে সাহায্য রজনী

আগামী ১২ই ও ১৩ই জুন যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালের সাহায্যকল্পে রঙমহলে এক নৃত্যগীতের মনোরম আয়োজন হইয়াছে। প্রধান ভূমিকায় খ্যাতনাম্নী নৃত্যশিল্পী মঞ্জুলিকা ভাদুড়ী মঞ্চাবতরণ করিবেন। প্রত্যেকটি নৃত্যের পরিকল্পনা ও পরিচালনা করিয়াছেন তিনি নিজে। তাঁহার সহিত ললিতা ভাদুড়ী, আভা কুণ্ডু, মায়া ভাদুড়ী, পুষ্প কুণ্ডু, মায়া ঘোষ, বিদ্যুৎ কুণ্ডু, গীতা ঘোষ, অর্চ্চনা দে চৌধুরী প্রভৃতি নৃত্যকলা প্রদর্শন করিবেন। রবি রায় চৌধুরীর পরিচালিত সঙ্গীত এই নৃত্যোৎসবের অন্যতম আকর্ষণ হইবে।

ভক্ত রায়দাস

মিনার্ভা মুভিটোনের ছবি, মিনার্ভা সিনেমায় প্রদর্শিত হইতেছে। পরিচালক ধাইবার।

অস্পৃশ্য মুচি রুইদাস তার ভগবদ্‌ভক্তির গুণে কেমন করিয়া জগৎবরেণ্য হইয়া ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্বকেও হীন করিয়াছিল, তাহারই অপরূপ আলেখ্য "ভক্ত রায়দাস।" পিতার নির্য্যাতন, সমাজের শাসনও তাহাকে তাহার প্রেমের পথ হইতে চ্যুত করিতে পারে নাই। ছবিখানির সুনিপুণ পরিচালনা বিশেষতঃ প্রথমাংশ খুবই সুন্দর, দ্বিতীয়াংশ বাচনবহুল হওয়ায় একটু ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটায়। শব্দানুলেখন, চিত্রগ্রহণ এবং দৃশ্যসজ্জা ভালই। সঙ্গীতগুলিও সুখশ্রাব্য। অভিনয়ে যথাক্রমে শিশু রায়দাস, রায়দাস, রায়দাসের পিতা, মাতা, রামানন্দের শিষ্য পান্নার ভূমিকায় অনন্ত মারাঠে, পরেশ ব্যানার্জ্জি, কে, এন সিংহ, ললিতা পাওয়ার তারাপোরে ও শীলার অভিনয় ভালই হইয়াছে। এই ভক্তিমূলক চিত্রখানি দর্শকদের মনে রেখাপাত করিবে বলিয়া মনে হয়।

দীপালীর স্বত্বাধিকারী শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত, ১২৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, দীপালী প্রেসে মুদ্রিত ও দীপালী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

প্রধান সম্পাদক—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় :: সহঃ সম্পাদক—শ্রীধীরেন্দ্রমোহন মজুমদার বি. এল.

১৬শ বর্ষ VOL. XVI. } ২৫শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৫১ :: June 8, 1944 { ২৩শ সংখ্যা No. 23

আলোচনী

Secondary Education Bill বা তথাকথিত মাধ্যমিক শিক্ষা বিলের বিরুদ্ধে পরিষদের ভিতরে ও বাইরে প্রবল আন্দোলন চলছে। এ সম্পর্কে বাংলা পরিষদের চিফ গবর্ণমেণ্ট হুইপ মিঃ ফজলুর রহমান যে বিবৃতি দিয়েছেন তা উল্লেখযোগ্য মনে করি। তাঁর বিবৃতির মর্ম্ম এই—বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতির জন্য বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডল যে মহান পরিকল্পনা করেছেন তা এই দুর্ভাগা দেশ বুঝতে পারছে না। অবশ্য কয়েকজন মতলববাজ রাজনীতিক নেতা এ সম্বন্ধে বাধার সৃষ্টি করছেন। হিন্দু-বিরোধী আইন বলে যে চীৎকার চলছে—গবর্ণমেণ্ট হুইপ মহোদয়ের মতে তা নাকি একেবারে নির্জ্জলা মিথ্যা। গত কয়েক বছর ধরে পরিষদে যে সব আইন পাশ হয়েছে তা থেকে হিন্দুরাই বেশী উপকার পেয়েছে মুসলমানরা নয়। নাজিমুদ্দিন সাহেব পরিচালিত বাংলার মন্ত্রিমণ্ডলের এই হিন্দুপ্রীতি একটা সংবাদের মত সংবাদ সন্দেহ নেই। আমরা এই ধরণের বিবৃতির মনস্তত্ত্ব বুঝতে পারি। দায়িত্বহীন উক্তির সৎ দৃষ্টান্ত খুঁজতে হলে লীগ দলের যে কোন মহারথের যে কোন বিবৃতিতেই তা পাওয়া যাবে। বর্ত্তমান ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। লজ্জাহীন মূর্খতা কতদূর অগ্রসর হতে পারে এ তার অন্যতম দৃষ্টান্ত। বাংলাদেশের রাজনীতিক শিক্ষা খুব অল্পদিনের নয়, এই সব পেশাদারী বাক্যবীরদের বোঝা উচিত। অর্থহীন প্রলাপ শোনবার মত ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা বাংলার এযুগের শিক্ষিত মানুষ বহুদিন হারিয়ে ফেলেছে। এই হুইপ মহোদয়ের বক্তব্যের সবচেয়ে দরকারী কথাটা আমরা এখনও বলিনি। সেটা এই, anti-demonstration-এর ভয় দেখিয়ে দেশের স্বতঃস্ফূর্ত্ত মতামতকে দাবিয়ে রাখবার হুমকী। অর্থাৎ যুক্তি ও বিচারবুদ্ধির দরবারে ঠাঁই না পেলেও গরজের তাগিদে গুণ্ডামীর প্ররোচনা দিতে হবে।

* * *

কোনও বিশেষ অবস্থায় হিন্দু বিবাহ অসিদ্ধ ও নাকচ হতে পারে কিনা সে সম্বন্ধে কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি মিঃ এজলী একটি গুরুত্বপূর্ণ রায় দিয়েছেন। মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও বিচারপতির রায়ের প্রয়োজনীয় অংশ অন্যত্র উদ্ধৃত করা হ'ল। এই রায়ের ফলে এদেশের রক্ষণশীল মনে হয়তো নানা বিভীষিকার উদয় হবে। হিন্দুর বিবাহ প্রতিষ্ঠান দীর্ঘযুগ আচরিত ধর্ম্মের উপর গড়ে উঠেছে। হিন্দুর আদর্শবাদ সমষ্টিকে নিয়ে, ব্যক্তিকে নিয়ে তার সমাজ কোনদিন মাথা ঘামায় নি। হয়তো এতদিন তার প্রয়োজনও ছিল না। বিবাহিত জীবনে ব্যক্তিগত সমস্যা, অভাব ও অভিযোগ সমাজের বৃহত্তর কাঠামোর পরিবর্ত্তন করতে পারেনি। বৃহত্তের জন্য, বহুর কল্যাণের জন্য ব্যক্তিকে বিসর্জ্জিত হতে হয়েছে। আজ নানা চিন্তা ও জটিলতা আমাদের মনে ও সমাজদেহে আত্মপ্রকাশ করছে। এ যুগের মন অধিকতর Realist ও যুক্তিবাদী। ব্যক্তিত্ববাদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে, ফলে পরিবর্ত্তন ও সংস্কারের গুঞ্জন ও দাবী সর্ব্বত্র শোনা যাচ্ছে।

নারীসমাজও এ বিষয়ে এগিয়েছেন।' হিন্দু আইনকে একটা Rationalistic দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখবার প্রয়োজন যেন ক্রমশঃ স্বীকৃত হচ্ছে। কয়েকটি আইনের ক্ষমতা রাষ্ট্রের বিবেচনাধীন রয়েছে। যুদ্ধান্তে বহুদিক-প্রসারী পরিবর্ত্তন হিন্দু আইনে বিধিবদ্ধ হবে এরকম সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। কলিকাতা হাইকোর্টের উপরোক্ত রায়ে যে সংস্কারের সূচনা করা হ'ল তাতে করে অবিচ্ছেদ্য হিন্দু বিবাহ প্রতিষ্ঠানের গৌরব ও মর্য্যাদার এতটুকু হানি হবে এ আশঙ্কা আমরা করিনা। এদেশের অতি সাবধানী সংস্কারবিরোধীদেরও হতাশ হবার কোন কারণ নেই।

* * *

সংবাদপত্রের একটি বিবৃতিতে অধ্যাপক আবদুল মজিদ খাঁ বলেছেন—

Thanks to the sagacity, resourcefulness and tact of the Punjab Unionists, the Muslim League has gone 'phut' in the land of the Five Rivers. Jinnaism is on its last legs and Pakisthan is nothing more than an ugly dream. অর্থাৎ পাঞ্জাব ইউনিয়নিষ্ট দলের কর্ম্মতৎপরতা ও রাষ্ট্রনীতিক বুদ্ধির জন্য পাঞ্জাবে মুসলীম লীগ দল অকৃতকার্য্য হয়েছেন। জিন্নাবাদের শেষ দিন ঘনিয়ে আসছে। পাকিস্থান একটা দুঃস্বপ্ন ছাড়া কিছু নয়। বিবৃতি দেবার সময় মজিদ সাহেবের বাঙলার কথা নিশ্চয়ই মনে ছিলনা। বর্ত্তমান খাজা-মন্ত্রিমণ্ডলীর উৎসাহে এখানে পাকিস্থানী নরক ক্রমশঃ গুলজার হয়ে উঠছে। পাঞ্জাবের ব্যর্থতার শোধ বাংলার উপর দিয়ে নিতে পারলে হয়তো খানিকটা স্বস্তি পাওয়া যায়।

* * *

বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজের সভাপতিত্বে বরিশালে যে হিন্দু সম্মেলন হবার প্রস্তাব হয়েছিল বর্ত্তমান জিন্নাবাদী মন্ত্রিদলের অপচেষ্টায় তা বন্ধ করে দেবার সরকারী আদেশ জারী হয়েছে। এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলে যে অরাজকতার সৃষ্টি হোত তা থেকে বাংলা দেশকে বাঁচাবার সদিচ্ছায় গবর্ণমেণ্টকে এই পথ বেছে নিতে হয়েছে। জানা গেল দিনাজপুরে পাকিস্তান সম্মেলনের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। স্যার নাজিমুদ্দিন ও সুরাবর্দ্দির উপস্থিতির ফলে সেখানে যদি সাম্প্রদায়িক অশান্তির সৃষ্টির সম্ভাবনা না থাকে তাহলে বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজের উপস্থিতিতে সেই দুর্ঘটনা কেন ঘটবে, বোঝা গেল না।

* * *

সেদিন পরিষদে মাধ্যমিক শিক্ষা বিল (Secondary Education Bill)-এর সমর্থনে বাংলার লীগ মন্ত্রি-পরিষদের অন্যতম হিন্দু সদস্য, মিঃ তুলসী চরণ গোস্বামী যখন বক্তৃতা দিতে উঠেন তখন নানা কটুক্তি ও বাছা বাছা বিশেষণ তাঁর প্রতি নিক্ষিপ্ত হয়েছিল, যথা Traitor, Paid agent of the Muslim League, Get out ইত্যাদি। স্বরাজ্য দলের প্রথম যুগে দেশবন্ধুর সহকর্ম্মী ইনি ছিলেন। বাংলা পরিষদের সেই বিজয় গৌরবের দিনের কথা আজ মনে পড়ছে। মিঃ গোস্বামী সেদিন দেশবন্ধুর পতাকাবাহী ছিলেন। আর আজ…!

* * *

সাহিত্যিক ও শিক্ষাব্রতী অধ্যক্ষ সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র মহাশয় পরলোক গমন করেছেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন বৈজ্ঞানিক। নিষ্ঠার সহিত অধ্যাপনা করে তিনি খ্যাতনামা শিক্ষকের গৌরব লাভ করেছিলেন। এ দিক তাঁর প্রতিভার এক দিক। বিজ্ঞান ও শিক্ষাক্ষেত্রের বাইরে তাঁর সাহিত্যানুরাগ ও কাব্যপ্রীতি বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর জন্য একটি বিশিষ্ট স্থান সংগ্রহ করবে। ব্যক্তিগতভাবে এই সুপণ্ডিত অমায়িক সাহিত্যব্রতীর তিরোধান সংবাদ তাঁর অগণিত বন্ধুবান্ধব গভীর পরিতাপের সঙ্গে গ্রহণ করবে।

প্রত্যাখ্যান

(উপন্যাস)

শ্রীসুধাংশু কুমার হালদার, আই, সি, এস্

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(৬)
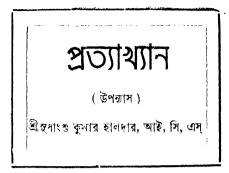
ওরা যখন অসীমের খড়ের বাংলোয় এসে পৌছাল তখন রাত্রি হয়ে গেছে। চাঁদের আলোয় নদীর ক্ষীণ জলধারা তরল রূপার মতো জ্বলছে, অদূরে শাল জঙ্গলের কচি সবুজ পাতাগুলি ঝিরঝিরিয়ে হাওয়ায় কাঁপছে। বড়ো ঘরটায় ভৃত্যরা একটা কেরোসিনের ল্যাম্প জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে। চাঁদের আলো এসে বারান্দায় পড়েছে।

অসীম গিয়ে তেওয়ারীকে উপদেশ দিল তাড়াতাড়ি চা আর কিছু জলখাবার তৈরি করে দিতে। রাত্রের আহার যাতে ভাল হয় সে সম্বন্ধে সহস্রবার সতর্ক করে দিল। এমন ভাগ্য আর তার কখনো হয়নি, এমন পরীক্ষার দিনও বুঝি এর আগে কখনো আসেনি।

মল্লিকা ইতিমধ্যে ঘুরে ঘুরে অসীমের ঘর দুয়ার সমস্ত দেখে এলেন। গোসলখানায় ঢুকে পরম আরামে স্নান সেরে নিলেন। সমস্ত দিনের ধুলা আর ক্লান্তি দূর হয়ে গেল। ইতিমধ্যে বারান্দায় অসীম দু'খানা আরাম চেয়ার এনে রেখেছে। তেওয়ারী চা দিয়ে গেল। মল্লিকার ব্যবহারে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ নেই, জড়তা নেই। বিষণকে ডেকে বললেন, তুমি গিয়ে বাবা মাকে খবর দাও, নইলে তাঁরা ভাববেন। আজ রাতের জন্যে চিন্তা নেই, কাল ভোরে এসে ড্রাইভার যেন গাড়ীটা ঠিক করে দেয়। বুঝেছ?"

"কিন্তু এতটা পথ পায়ে হেঁটে দিদিমণি,—বুড়ো মানুষ—" বিষণ মাথা চুলকে বলল।

অসীম তার জন্যে একটা গরুর গাড়ী ঠিক করে দিল, সঙ্গে দুজন লোকও ছিল। গো-যানে আরোহণ ক'রে বিষণ সিং রওনা হ'য়ে গেল।

মল্লিকা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অসীমের সমস্ত কথা জেনে নিলেন। অসীম বলে গেল তার মায়ের কথা, তার দেশের কথা, তার গৃহপরিত্যাগের কথা, দত্ত গিন্নীর স্নেহের কথা, তার মামার কথা, কাঠের ব্যবসার কথা। বলল না শুধু নমিতার কথা। নমিতার সংক্ষিপ্ত ইতিহাসটুকুর দ্বার উদ্ঘাটন করতে তার প্রবৃত্তি হ'ল না। যে ছোট্ট একটুখানি কথা নমিতার ব্যর্থ অশ্রুজলের ব্যথায় রঙীন হ'য়ে আছে সে-কথা একান্ত গোপনে নমিতারই থাক। তাছাড়া তাকে না ভালবাসতে পারার বেদনা অসীমের মনে এক মস্ত অপরাধের সৃষ্টি করেছিল। সে স্মৃতি আজ

অসীমের মামার কথা শুনে মল্লিকা বললেন, "ও, মিষ্টার চৌধুরী? তাঁদের আমরা খুব ভাল করেই চিনি। গত বছর আমরা একসঙ্গে দার্জ্জিলিং ছিলুম পূজার সময়।"

মল্লিকা দেখলেন কলকাতার কথা বলতে অসীমের মন নারাজ, বুঝলেন নিশ্চয়ই কোন প্রচ্ছন্ন ব্যথা আছে। তিনি আর সে বিষয় উল্লেখ না করে নিজেদের প্রসঙ্গ তুললেন। বললেন, "আমার মা হলেন ভারতবর্ষ। অনেক সংঘবদ্ধ এবং পরস্পর-বিরোধী ধর্মবিশ্বাস নিয়ে তিনি বাস করেন, কোনোটাকেই অবহেলা করেন না। প্রতি বৃহস্পতিবারে লক্ষ্মীপূজাও করেন, আবার প্রতিমাসে সত্যনারায়ণের পূজাও বাদ দেন না। অথচ প্রত্যহ সকালে নিষ্কাম কর্মযোগ অভ্যাসের জন্যে গীতাও পড়েন। উদয়াস্ত তাঁর একটি মাত্র চিন্তা, প্রতিপাল্যদের ভুরীভোজনের চিন্তা। এ বিষয়ে তাঁর দাক্ষিণ্য ঠিক মুষলধারাতেই বর্ষিত হয়।"

অসীম বলল, "আমাদের সব মায়েরাই ভারতবর্ষ। তাইতো মা চলে গেলেও মনে হয় মায়ের মধ্যেই বাস করছি।"

মল্লিকা বললেন, "আর আমার বাবা হলেন বৃটিশ গভর্নমেণ্ট। মায়ের সকল ধর্মবিশ্বাসকেই তিনি সহ্য করেন কিন্তু শ্রদ্ধা করেন না।"

অসীমের ব্যবসায়ের সম্বন্ধে অনেক কথা হল। মল্লিকা জিগেস করলেন, "আপনি কি বরাবর এইখানেই পড়ে থাকবেন অসীম বাবু?"

অসীম বলল, "না, কোনো কিছুতে আটকে থাকা আমার কুষ্ঠিতে লেখে নি। জীবন আমার কাছে অনন্ত রহস্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমি কেবল ওধারে ওধারে উঁকি মেরে দেখছি কোনখানে আমার পথ।"

"পথ কি পেয়েছেন দেখতে?"

"এক একবার মনে হয় যেন পেয়েছি, আবার মনে হয় পাইনি।"

"বিয়ে করেন নি কেন?"

"এখন সেইটেই আশ্চর্য্য মনে হয়, কিন্তু জবাব মেলে না। আশা করি একদিন যখন বিয়ে করব, তখন অবিবাহিত ছিলুম কেন যে এতদিন তার উপযুক্ত কৈফিয়ৎ দিতে পারব।"

"ও, মনের মানুষ মেলে নি বুঝি?"

"না, তাইতো এই জঙ্গলে বসে মনের মানুষের জন্যে তপস্যা করছি।"

"তপস্যাই বটে।" মল্লিকা হেসে বললেন, "এমন পাড়াগাঁয়ের মধ্যে বসে থাকলে যদি তপস্যা করা হয়, তেমন তপস্যা আমিও করতে প্রস্তুত।"

"আপনার আবার তপস্যার দরকার কি? ভাগ্যলক্ষ্মী আপনাকে আকাঙ্ক্ষা মাত্রেই বরদান করবেন।"

"কই ভাগ্যলক্ষ্মীটিকে আজ পর্য্যন্ত তো দেখতেই পেলুম না। বলুন না, আপনার যদি ঠিকানা জানা থাকে। এ দিকে মা আমাকে প্রায়ই বলেন, তুই রাঁধতে শিখলি না, তোর কপালে দুঃখু আছে।"

"সে কি, আপনি রাঁধতে জানেন না?"

"কিছুমাত্র মুস্কিল নয়। সেই ভাগ্যবান এমন অনেক কিছু পাবে যা দিয়ে তার এ ক্ষোভ মিটবে।"

"ধন্যবাদ, করুণহৃদয় বিচারক, ধন্যবাদ। কিন্তু বিচার পক্ষপাত দোষে দুষ্ট। বাংলাদেশের রসানুভূতি, সে যে প্রধানতঃ উদর দিয়ে।"

"কখখনো নয়।"

"নিশ্চয়। তার প্রমাণ দেখুন, অন্যান্য প্রাদেশিক উদরের চেয়ে বঙ্গীয় উদর সমধিক স্ফীত। 'দৈর্ঘ্যে ছোট প্রস্থে বড় বাঙ্গালী সন্তান।"

"নিজের জাতের নিন্দে করা ভারি অন্যায়, তা জানেন!" অসীম বলল।

"আমার ছাগল আমি যে দিকে খুশী কাটব। পৃথিবীর সব জাতির চেয়ে বাঙালীকে বেশী ভালবাসি, তাইতো তার দোষ দেখলে ব্যথা পাই। কিন্তু এ সব কথা যাক। যা বলতে চাইছিলুম তাই বলি। আমি বাঁধি না বটে, কিন্তু লিখি। লিখুক দিকি আপনার তেওয়ারী আমার মতো কবিতা!"

"কী আশ্চর্য্য! আপনি কবিতা লেখেন! চমৎকার!"

"না শুনেই বলছেন চমৎকার! রোজ আপনি কতটা ক'রে মিষ্টি খান অসীম বাবু?"

"তার মানে?"

"যার কথা এমন মিষ্টি তাকে রোজ অনেকখানি ক'রে চিনি খেতে হয় নিশ্চয়।"

"না, মিষ্টত্ব আমার প্রকৃতির মধ্যেই, আমাকে আর কৃত্রিম মিষ্টির শরণাপন্ন হ'তে হয় না। কিন্তু আপনার কবিতার কথা বলুন।"

"ওরে বাস্‌রে, আপনার সাহস আছে দেখছি!"

"কেন?"

"আপনি আমার কবিতা শুনতে চান? জানেন, কবি ব'লে কুখ্যাতি রটলে আর কেউ তার কাছে ঘেঁসে না! অনেকটা আমার বাবার মতন। তাঁর মুখে শুনেছি তিনি যখন প্রথম বিলেত থেকে ফিরে এলেন তখন তাঁর বিলেতের গল্পে তিতিবিরক্ত হ'য়ে সবাই পালালো, বাড়ী আমাদের একেবারে নির্বান্ধব হ'য়ে গেল, এমন কি টিকটিকি গিরগিটি পর্য্যন্ত পালিয়ে গেল।"

"আপনার সে ভয় নেই। নামও যেমন আমার অসীম, ধৈর্য্যও তেমনি।"

"আচ্ছা তবে শুনুন। কোথা থেকে আরম্ভ করব?"

"একেবারে গোড়া থেকে আরম্ভ করুন।"

"বেশ। আমার ভবিষ্যৎ জীবনী লেখকের পক্ষে এটা জানা বিশেষ দরকার যে কাব্য-সরস্বতী যখন আমার স্কন্ধে আরোহণ করেন তখন আমার বয়েস মাত্র আট বছর।"

"মাত্র?"

"হ্যাঁ। বয়সের দিক দিয়ে এটা তত বড় কথা নয়, কিন্তু অনুপ্রেরণার দিক থেকে এ একেবারে অত্যাশ্চর্য্য। রবীন্দ্রনাথের প্রেরণা এসেছিল প্রথম "জল পড়ে পাতা নড়ে" শুনে। বর্ষার বারিপতন আর পত্রের আন্দোলনে এমন আশ্চর্য্যের জিনিষ কিই বা আছে? [illegible] করেছিল এক মহাশ্চর্য্য জিনিষ, চামচিকে।"

"চাম্‌চিকে?"

"হ্যাঁ চাম্‌চিকে। পুরীর মন্দিরের চাম্‌চিকে। দরোজায় হাজার হাজার চাম্‌চিকে। সেদিন আমার মধ্যে যে আদি কবি প্রসুপ্ত ছিল সে জেগে উঠে বলেছিল—

দেখিনু যখন চাম্‌চিকে দরোজায়
হাজার হাজার চাম্‌চিকে গরজায়,
ঢুকিতে হ'ল না ভরসা।

কেমন লাগল অসীম বাবু?"

"অনবদ্য, একেবারে অনবদ্য।"

"ঠাট্টা করবেন না, এ ইতিহাস। এর ধাতুগত অর্থ যাই থাক, তা নিয়ে হাসি ঠাট্টা আমি পছন্দ করি না। কবির দ্বিতীয় অবদান হ'ল সুন্দরবনের গোলপাতা গুঁড়ির ওপর কবিতা। গিয়েছিলুম ছোট্ট একটি লঞ্চে ক'রে বাবার সঙ্গে সুন্দরবনে বেড়াতে। দেখলুম গোলপাতার একটি গুঁড়ি জলে ভেসে আসছে। বয়েস তখন বছর নয়েক। বাস, লিখলুম—

ভেসে আসে গোলপাতা গুঁড়িটি
ঠিক যেন মৃদঙ্গ কুঁড়িটি।"

এটা সম্বন্ধে সমালোচক মশায়ের অভিমত?"

"দুর্বোধ্য।"

"মোটেই দুর্বোধ্য নয়! আপনারই বুদ্ধি কম। শুনুন এর প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা। ভাসমান গোলপাতা গাছের গুঁড়ি দেখিয়া কবির মনে

নিম্নোক্ত প্রকার ভাবোদয় হইল, মৃদঙ্গ অর্থাৎ ঢোল যদি ফুল হইত তাহা হইলে এই গোলপাতা গাছের গুঁড়ি উক্ত ঢোলরূপ ফুলের কুঁড়ির সহিত উপমিত হইতে পারিত। এখন বুঝলেন ?"

"অর্থাৎ কিনা ঢোলরূপ ফুলের কুঁড়িরূপ গুঁড়ি, এক কথায় ঢোল-কুঁড়ি। তা আপনার কাব্যচর্চা কি কোনোদিন কুঁড়ি গুঁড়িত্বকে অতিক্রম করতে পারল ?"

"আহা, অসহিষ্ণু হন কেন ? আপনার রসজ্ঞানেরও তো একটা পরীক্ষা নেওয়া দরকার। সেই পরীক্ষাই করছিলুম। রবীন্দ্রভক্তদের মধ্যে দেখবেন অনেক স্তর, সোনার তরী পর্য্যন্ত স্তর, চয়নিকার প্রথম সংস্করণ পর্য্যন্ত স্তর ইত্যাদি। এর পরের কবিতাগুলা ভক্তদের অধিকাংশের আর বোধগম্য হয়নি। আমার কাব্যেও তেমনি আপনার অনবদ্য ভাষায় ঢোল-কুঁড়ির স্তর। ভয় হয়, তার পরের যুগের কবিতা কি আপনি বুঝবেন !

"আচ্ছা একটা শুনিয়েই পরীক্ষা ক'রে দেখুন !"

এমন সময় তেওয়ারী এসে খবর দিলে, খাবার প্রস্তুত। অসীম বলল, "খাওয়া একটু পরে হবে, আপনার কবিতা শোনান।"

"কথাটা একেবারেই বে-হিসেবী হ'ল" মল্লিকা বললেন, "খাদ্যের অভাব জগতের কোনো কবিতাই মেটাতে পারে না। তাছাড়া আপনি তো চমৎকার host, ক্ষিদের জ্বালায় মরচি, অথচ বললেন কিনা খাওয়া পরে হবে। আমি যে খাই, সেটা আপনার ইচ্ছেই নয়।"

অসীম বল্লে, "ঘাট হয়েছে, মাফ চাইছি। চলুন। দেখি তেওয়ারীর রান্না আপনার গলা দিয়ে নামে কিনা !"

তেওয়ারী তার যথাসাধ্য করেছিল। তার ওপর ছিল ক্ষুধা। পরিতৃপ্ত আহার ক'রে ওরা আবার বারান্দায় এসে বসল। চাঁদের আলোয় তখন বনরাজি উদ্ভাসিত। একটা সুগন্ধি শীতল হাওয়ার স্পর্শ এসে গায়ে লাগছে। এ যেন বনানীর নিঃশ্বাস।

অসীম বলল, "এবে তব কাব্যকূজন আরম্ভ করো কবি।"

মল্লিকা বললেন, "শুনুন তবে। এ কবিতা হচ্ছে সনাতনত্বের বিরুদ্ধে আমার বিদ্রোহ ঘোষণা—

দুটি কথা করি নিবেদন
ইচ্ছা হ'য় শুনো, নয় ফিরায়ো আনন।
সনাতন ডোরে বাঁধা—বিধান রয়েছে চিরন্তন
তবু মোর রমণীর মন।
সুলভে বিকাতে দিয়ে দেবতার দান
করিব না নিজ অপমান।
যার সাথে পরিণয়, সে জীবনস্বামী
বিবাহের রাত্রি হ'তে হ'তে হবে তারি অনুগামী।
পরিচয় নাহি থাক, চোখে ভাল না যদিও লাগে
তথাপি তুষিতে হবে নাটকীয় গাঢ় অনুরাগে।
পরিণয় দিবে প্রেম, পরিচয় নহে—
এই তো শাশ্বত কথা সকলেই কহে !"

কমরেড লেনিন

—শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

তাছাড়া সমগ্র রুশিয়া জুড়ে কর্মীর জাল বুনে ফেলতে হবে, যেখানে যাই ঘটুক না কেন, কেন্দ্রীয় আফিসে যেন তার সঠিক সংবাদ এসে পৌছায়। সেজন্য নিজস্ব সাংকেতিক ভাষা সৃষ্টি করতে হবে, সেই ভাষায় খবরাখবর যাতায়াত করবে, তার এক বর্ণও পুলিশ বুঝতে পারবে না।

লেনিনই ছিলেন দলের নেতা, যা কিছু করার তাঁকেই করতে হ'বে, রুশিয়ার বাইরে যাবার জন্য তিনি সব উদ্যোগ আয়োজন করতে লাগলেন। তাঁর মত লোকের ছাড়পত্র পাওয়া মুস্কিল, কাজেই লুকিয়ে পালাতে হবে দেশ থেকে।

এদিকে পুলিশের কড়া নজর ছিল লেনিনের উপর, তাঁর গতিবিধি দেখে কেমন যেন সন্দেহ হল। লেনিন তখন পিটার্সবার্গ সহরে ছিলেন। সেখানে হঠাৎ একদিন পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে হাজতে নিয়ে গেল। থানায় জামা কাপড় তল্লাস করা হোল কিন্তু পাওয়া গেল না কিছুই, শুধু জামার পকেটে খানকয়েক সাদা স্লিপে বাজার খরচের হিসাব লেখা। পুলিশ তখন ভাবতেও পারেনি যে খরচের হিসাবগুলো বিপ্লবীদের মারাত্মক কর্মপদ্ধতির লিপি ছাড়া আর কিছুই নয়। সেদিন যদি সেই কাগজগুলোর উপর পুলিশের কিছুমাত্র সন্দেহ ঘটতো তাহলে লেনিন কোন দিনই নতুন রুশিয়ার স্রষ্টা হতে পারতেন না। কিন্তু পুলিশ সেদিন সেকথা ধারণা করতেও পারেনি। আর পারেনি বলেই সাতদিন ধরে খোঁজখবর নিয়ে সাতদিন পরে লেনিনকে তারা ছেড়ে দিলে হাজত থেকে।

তখন লেনিনের পক্ষে দেশ ছেড়ে যাবার ছাড়পত্র পাওয়ার অনেক অসুবিধা ছিল, সেইজন্যই সুযোগমত এক জাল পাসপোর্ট দেখিয়ে লেনিন দেশ ছেড়ে পালালেন।

পোল্যাণ্ড পার হয়ে এলেন জার্মাণীতে। মিউনিকে দলের কেন্দ্র হোল।

এখান থেকেই লেনিনের কাগজ বেরুলো "ফুলিঙ্গ"—ইসক্রা।

এই কাগজখানির ভিতর দিয়ে মার্কসের অর্থনীতির সহজ ও সুন্দর ভাষ্য লেনিন পৌছে দিলেন রুষ জনগণের কাছে,...চাষী আর মজুরদের শোনালেন কি করে এক হয়ে দাঁড়াতে হবে মালিক আর জমিদারের বিরুদ্ধে,...কি ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে জনগণের অধিকার...কি করে জমি আর কারখানা আসবে নিজেদের হাতে, জনগণের সমবায় প্রতিষ্ঠিত হবে ব্যক্তিগত লাভ-লোকসানের হিসাব শেষ করে,...

কাগজখানির সম্পাদনা করতেন লেনিন, আর মিউনিক থেকে রুশিয়ায় পাঠাবার ও প্রচার করবার ভার ছিল ক্রাপ্‌স্কায়ার উপর।

বিপ্লবীরা এমনভাবে নিজেদের শৃঙ্খলা গড়ে তুললো যে ইস্ক্রার প্রতিটী সংখ্যা রুশিয়ার শ্রমিকদের হাতে এসে পড়তে লাগ্‌লো যথাসময়। বস্তির আলোহীন ঘরে, কারখানার বায়ুহীন ঘরে, গাঁয়ের গাছতলায় সবাই সে কাগজ পড়তে লাগলো, আলোচনা করতে লাগলো, আর তারই সঙ্গে তাদের মনে জাগলো আত্মশক্তির উপলব্ধি। ছোট ছোট দল ভেঙ্গে গড়ে উঠতে লাগলো এক বিরাট সঙ্ঘ।

ইতিমধ্যে মিউনিকে পুলিশের এমন কড়াকড়ি সুরু হোল যে লেনিনকে চলে যেতে হোল লণ্ডনে।

লণ্ডনে পড়াশুনার সুবিধা হোল।

বৃটিশ মিউজিয়ামের বিরাট গ্রন্থাগার, প্রয়োজনমত পৃথিবীর সব রকম বইই সেখানে মেলে। লেনিনের পড়াশুনার ভারী সুবিধা হয়ে গেল। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সেখানেই কাটতে লাগলো বইয়ের পৃষ্ঠার মধ্যে। পড়তে পড়তে নবনব চিন্তার ঢেউ উঠতে লাগলো মনে, মণিকোঠায় জমা হতে লাগলো বহু তথ্য আর উপকরণ। একে একে সেগুলি রেখাপাত করতে লাগলো সাদা কাগজের বুকে কালির আঁচড়ে। এখানে লেনিন লেখার এমন সুবিধা পেলেন যা আর কোথাও পাননি; তাঁর যা কিছু বিখ্যাত বই তা এই লণ্ডনে বসেই লেখা।

পড়তে পড়তে যখন অবসাদের মেঘ জমে উঠতো মনে; বইয়ের পাতায় আর মন বসতো না, ক্রাপসকায়ার হাত ধরে লেনিন বেরিয়ে পড়তেন সহর ঘুরতে। কখন-বা বাসের দোতলায়, কখন-বা পদব্রজে, মহানগরীর পথের পর পথ পিছনে মিলিয়ে যায়। পথের দুপাশে সুদৃশ্য অট্টালিকার সারি, আলোক-উজ্জ্বল কক্ষ, জনবাহুল্যের কলরব শেষ হয় শুব্ধ নিবিড় উদ্যান-ছায়ার পাশে,...সরু সরু পথ,... সারি সারি ছোট কুলি লাইনের ঘর...ভিজে জামা কাপড়গুলি শুকাচ্ছে বাড়ীর বাইরে পথের উপর...ছোট্ট ছেলে মেয়েগুলো ছুটোছুটি করে অপরিচ্ছন্ন, ছিন্নবেশী...। নগরীর একপাশে বিত্তের বিলাস, আরেক পাশে অন্নহীনের অবসাদ! লেনিন দেখেন, দেখতে দেখতে নিজের মনেই গুণগুণ করে ওঠেন—কে বলবে এক দেশের লোক, দুটো একেবারে আলাদা জাত।

কখন-বা মহানগরী ছাড়িয়ে দুজনে আসেন 'প্রিমরোজ হিলে'। পাহাড়ের নীচেই কার্ল মার্কসের সমাধি। বারেক সমাধির সামনে এসে দাঁড়ান, স্মরণিকার পানে তাকিয়ে দারিদ্র্য-পীড়িত দার্শনিকের মুখখানি ভেসে ওঠে মনের পর্দায়, ব্যর্থতার ভিতর দিয়েই মার্কসের জীবনের উপর যবনিকা নেমে এসেছে, তাঁর ভাবধারার পরিপোষণ করতে গিয়ে লেনিনের জীবনেও হয়তো অমনি দীর্ঘশ্বাসই পুঞ্জীভূত হবে!

লেনিনের মন কুয়াসাচ্ছন্ন হয়ে ওঠে, স্ত্রীর হাত ধরে ধীরে ধীরে পাহাড়ে উঠতে সুরু করেন। উপর থেকে কুয়াসা-ঢাকা লণ্ডননগরীর সমগ্র রূপটুকু দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। লেনিন চুপ করে তাকিয়ে থাকেন আর ভাবেন। হয়তো তখন তাঁর মনে নিজের চিন্তাকে ছাপিয়ে ওঠে তাদের কথা যারা ইষ্ট-এণ্ডের শ্রমিক-পল্লীর আবর্জ্জনা ছড়ানো পরিবেশের মধ্যে আলো-হাওয়াহীন ছোট্ট ঘরগুলির বুকে সামান্য স্বাচ্ছন্দ্যের অভাবে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ধুঁকছে। (ক্রমশঃ)

সাহিত্য ও গণ-জীবন

—এস, ওয়াজেদ আলি
বি, এ (কেণ্টাব) বার-এট ল

গণ-জীবনের তাগিদেই সাহিত্য জন্ম-লাভ করেছে। সব দেশেই সাহিত্য সুরু হয়েছে গণজীবনের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্খা, ধর্ম্ম অধর্ম্ম নিয়ে। এই আদিম সাহিত্যকে এখন বলা হয় Folk literature বা গণ-সাহিত্য। রূপকথা, ছড়া, পৌরাণিক কাহিনী, গাথা প্রভৃতি গণজীবনেরই বিভিন্ন অনুভূতির অভিব্যক্তি। জাতির প্রাথমিক জীবনে উচ্চ এবং নিম্ন স্তরের লোকের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য থাকে না। সুতরাং সে যুগের সাহিত্য হয় সার্ব্বজনীন—ছোট বড় সকলেই সে সাহিত্য উপভোগ করে, ছোটবড় সকলেই সে সাহিত্য থেকে শিক্ষা এবং প্রেরণা পায়।

ক্রমে কিন্তু আর্থিক সম্পদ বিশেষ বিশেষ লোকের হাতে জমা হতে থাকে। ধনী এবং দরিদ্রের মধ্যে প্রভেদ এনে দেয়। সমাজ অভিজাত এবং অন্ত্যজ শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। জনসাধারণ তাদের সহজ, আড়ম্বরহীন জীবন নিয়েই থাকে। উচ্চশ্রেণীর লোকের জীবন হয় আড়ম্বরবহুল, কৃত্রিমতাপূর্ণ, বৈচিত্র্যময়। ধনী লোকেরা সহরে রাজধানীতে এসে বাসা বাঁধতে থাকে, গরীব পল্লীতেই পড়ে থাকে। টাকার প্রয়োজন সকলেরই, কবি এবং সাহিত্যিকেরও টাকার প্রয়োজন। পল্লীর জনসাধারণের কাছে সে প্রয়োজন পূরণ হয় না। তারা ভাগ্যান্বেষণে সহরে আসতে সুরু করে। রাজার দরবার বড়লোকদের বৈঠকখানায় যেতে সুরু করে, আর পৃষ্ঠপোষকদের তুষ্টি বিধানের জন্ত তাদের জীবন নিয়ে, তাদের সংস্কার নিয়ে, তাদের সুখদুঃখ, আশা আকাঙ্খা নিয়ে সাহিত্য রচনা করতে সুরু করে। এইভাবে Capitalistic literature বা ধনীক সাহিত্য জন্মলাভ করে।

উনবিংশ শতাব্দী ছিল বিশেষ করে পুঁজিবাদীদের যুগ। সুতরাং সে শতাব্দীর সাহিত্য বিশেষ করে ধনিকদের জীবনকে প্রতিফলিত করেছে। ধনিক জীবন সে শতাব্দীতে বিশেষভাবে স্ফূর্ত্তিলাভ করেছিল ইংলণ্ডে। সুতরাং সেদেশের সাহিত্যে আমরা ধনিক জীবনেরই ছবি দেখতে পাই, ধনিকদের সংস্কার, আশা, আকাঙ্খা প্রভৃতি নিয়েই সে সাহিত্য। Byron, Shelly, Wordsworth, Tennyson প্রভৃতি কবিরা Thackeray, Scott Dickens প্রভৃতি ঔপন্যাসিকরা Ruskin Mathew Arnold, R. L. Stevenson প্রভৃতি সাহিত্যিকেরা ধনীক জীবনের সুখঃদুঃখ, আশা আকাঙ্খা নিয়েই সাহিত্য রচনা করেছেন।

ভোগ থেকে আসে তৃপ্তি, আর তা থেকে অবসাদ। ধনীদের মতই, ধনিক সাহিত্য শেষে অবসাদগ্রস্থ হয়ে পড়েছিল, আর অবসাদ বিনোদনের বিভিন্ন অস্বাভাবিক উপায়ের সন্ধানে বেরিয়েছিল। এই শ্রেণীর ধনিক সাহিত্যকে বলা হয়—Decadent literature। ফরাসী সাহিত্যের Budelaire হচ্ছেন এই শ্রেণীর সাহিত্যের মস্ত বড় এক পাণ্ডা। রুজ (Rouge) এবং পাউডার মাখা সুন্দরী না হলে তাঁর অন্তর স্পর্শ করতে পারতেন না। জীবনের কৃত্রিমতা থেকেই তিনি আনন্দ পেতেন, পচা জিনিষই তাঁর রসনা তৃপ্তি করতো। মোপাসাঁ, আনাতোল ফ্রান্স প্রভৃতি সকলেই এই শ্রেণীর লেখক। এই অবসাদগ্রস্ত Decadent সাহিত্য ইংলণ্ডেও দেখা দিয়েছিল অস্কার ওয়াইল্ড, সুইনবার্ণ প্রভৃতির লেখায়।

একমাত্র আমেরিকান কবি Walt Whitman এর লেখায় আমরা সে যুগে গণ-মনের বিকাশ দেখতে পাই। আশায় উদ্বেল প্রাণ, বলিষ্ঠ আমেরিকান ঔপনিবেশিক সগর্ব্বে বাহুবলে প্রকৃতিকে জয় করে যাচ্ছে, আর সঙ্গে সঙ্গে মানবতার, সৌভ্রাতৃত্বের, সাম্যের গান গেয়ে যাচ্ছে। এই প্রাণবন্ত মানুষের অমর ছবি আমরা দেখতে পাই Whitman এর কবিতায়।

কম-বেশী দেড় শত বৎসর ধরে ইউরোপ ভারতবর্ষকে, বিশেষ করে বাঙলা দেশকে একান্ত ভাবে প্রভাবান্বিত করে আসছে। ইউরোপের হুজুক ইংরাজি ভাষার সাহায্যে আমরা শুনতে পাই; সে হুজুগে আমরা মেতে যাই। ইউরোপে যা ফ্যাসান হয়, আমাদের দেশেও তাই ফ্যাশান হয়। ইউরোপের চিৎকারের আমরা প্রতিধ্বনি করি।

উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙলা দেশে যে সাহিত্য গড়ে উঠেছে, তাতে ইংরাজি সাহিত্যের প্রভাব সুস্পষ্ট। Walter Scott আর বঙ্কিম, Milton আর মাইকেল, Byron আর নবীন সেন, Tennyson আর

রবীন্দ্রনাথ—এসব লেখকের তুলনামূলক সমালোচনা করলেই বুঝবেন, আমাদের দেশের সাহিত্য কিভাবে ইংরাজি সাহিত্যের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছে।

উনবিংশ শতাব্দীর ইংরাজি সাহিত্য যেমন অভিজাত শ্রেণীর এবং বুদ্ধিজীবি মধ্যবিত্ত সমাজের জীবনকে অবলম্বন করে গঠিত হয়েছিল, সে শতাব্দীর বাঙলা সাহিত্যও ঠিক সেইরূপ, এই দুই শ্রেণীর জীবনকে নিয়েই গঠিত হয়েছিল। শ্রমজীবি, কৃষক প্রভৃতি শ্রেণীর লোক তখন গণনার মধ্যেই থাকতো না; সুতরাং তাদের সুখ দুঃখ, আশা আকাঙ্ক্ষা, অভাব অভিযোগ নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করবার কোন ব্যাপক প্রচেষ্টা তখন হয়নি! উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলা সাহিত্যে গরীবের কোন স্থান নাই বললেই হয়।

ধর্ম্মমূলক দর্শন আর দার্শনিক ধর্ম—এ হচ্ছে উচ্চ শ্রেণীর লোকের বিলাসের বস্তু—থিয়েটার যাত্রায়, অপেরা দেখা, রেস (Race) খেলা প্রভৃতির মত অবসর বিনোদনের অন্যতম ভদ্রতাসম্মত উপায়। সুতরাং উনবিংশ শতাব্দীর ইংরাজ সাহিত্যিকেরা এসব বিষয় নিয়ে যথেষ্ট লেখা লেখি করেছেন, আর সে যুগের বাঙলার সাহিত্যিকেরাও তাঁদেরই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করেছেন।

গরীবের ছেলের অসুখ হলে দার্শনিক কবিতা তার অসুখ সারায় না, গরীবের অন্নের অভাব হলে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ সে অভাব দূর করে না। গরীব, জমিদার বা ধনীকের দ্বারা উৎপীড়িত হলে, রাজা মহারাজাদের কীর্ত্তিকাহিনী পড়ে তার মনের জ্বালা যায় না। গরীবের সুখ দুঃখের কথা, তার আশা আকাঙ্ক্ষার কথা, তার অভাব অভিযোগের কথা, তাদেরই আপন জন হয়ে বলতে সুরু করলেন রাশিয়ান ঔপন্যাসিক Maxim Gorky। গরীবের বাস্তব জীবনের বিভিন্ন সমস্যা তাঁর লেখায় মূর্ত্ত হয়ে উঠল অপূর্ব্ব সাহিত্য-গৌরব নিয়ে।

তারপর এল ১৯১৪ সালের মহাসমর। সে যুদ্ধ অনেক কিছু ভাঙ্গল আর অনেক কিছু গড়ল। তার সব চেয়ে বড় ফল হল রাশিয়ান সাম্রাজ্যে শ্রমিক শক্তির প্রতিষ্ঠা আর বিশ্বময় গণমনের জাগরণ। যে রাশিয়ান শ্রমিক এবং কৃষকের জীবনের একমাত্র কাজ ছিল বড় লোকদের ভোগ-বিলাসের উপকরণ সরবরাহ করা, আর ভণ্ড ধর্ম্মযাজকদের ষোড়শোপচারে পূজা করা, তারাই হঠাৎ হয়ে পড়ল ইউরোপের বৃহত্তম সাম্রাজ্যের ভাগ্যনিয়ন্তা। এখন রাশিয়ায় গণজীবন ছাড়া জীবন নাই, গণ সাহিত্য ছাড়া সাহিত্য নাই। গণজীবনের অভাব অভিযোগ Georgian ইংরাজি সাহিত্যে কিছু কিছু প্রকাশ পেয়েছিল। আমাদের দেশেও শরৎ বাবুর লেখায়, সত্যেন দত্ত এবং নজরুল ইসলামের কবিতায় গণ জীবনের সুখ দুঃখ, অভাব-অভিযোগের কাহিনী কিছু কিছু প্রকাশ পেয়েছে।

ইতিমধ্যে পৃথিবীতে এসে পড়েছে এই বর্ত্তমান প্রলয়ঙ্কর মহাযুদ্ধ। এ যুদ্ধের ফলাফল কি হবে তার স্পষ্ট কোন ধারণা এখনও আমরা করতে পারি না। তবে একথা নিশ্চিত বলেই আমার মনে হয় যে, শ্রমিক, কৃষক প্রভৃতি মজুরেরাই ভবিষ্যতের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করবে, আর তাদের সমবেত ইচ্ছামতই পৃথিবীর জীবন চলবে। যে সাহিত্যিক জীবনকে প্রভাবান্বিত করতে চাইবেন, তাঁকে গণজীবনের সুখ দুঃখ, অভাব-অভিযোগ, প্রয়োজন-অপ্রয়োজন প্রভৃতি নিয়েই সাহিত্য সৃষ্টি করতে হবে।

দু একজন honourable exception বাদ দিলে, আধুনিক বাঙলা সাহিত্য পড়ে মনে হয় না যে আমাদের লেখকেরা বর্ত্তমান পরিস্থিতির বিষয় যথোচিত ভাবে সজাগ হয়েছেন। কেউ ব্যস্ত আছেন বিত্তবান শ্রেণীর যৌনসমস্যা নিয়ে, কেউ ব্যস্ত আছেন মরা অতীতের হাড়-গোড় নিয়ে, কেউ ব্যস্ত আছেন কুহেলিকা-সমাচ্ছন্ন পরলোকের দুর্ভেদ্য রহস্য নিয়ে। সমস্যাবহুল যে বর্ত্তমান নানা উৎকট পরিস্থিতির সৃষ্টি করে আমাদের মনোযোগের দাবী করছে, তার দিকে আমাদের সাহিত্যিকদের দৃষ্টি নাই। যে ভবিষ্যতে আমাদের এবং আমাদের সন্তান সন্ততিদের থাকতে হবে, যে ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হলে আমাদের এবং আমাদের সন্তান-সন্ততিদের জীবনও অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়, যে ভবিষ্যতের চারুগঠনের উপর আমাদের মঙ্গল একান্তভাবে নির্ভর করে, যে ভবিষ্যতের বিভীষিকা আমাদের জীবনকেও বিভীষিকাময় করে তোলে, তার দিকে আদৌ আমাদের দৃষ্টি নাই। Tennyson-এর Lotus Eater-দের মত আমরাও যেন বাস্তব জীবনের বিষয় চিন্তা করবার জন্য যে পরিশ্রম এবং তৎপরতার দরকার, সে পরিশ্রম করতে, এবং সে তৎপরতা দেখাতে একান্ত বিমুখ। এমনিভাবে কতদিন চলবে? *

* [পুরী রামকৃষ্ণ মিশন লাইব্রেরীতে পঠিত]
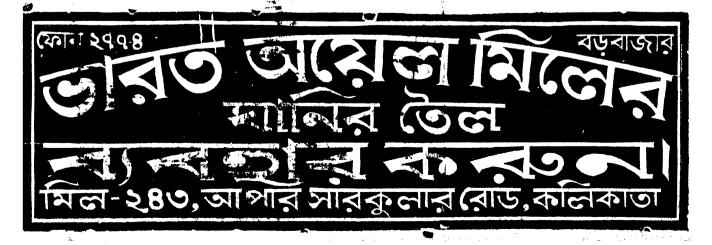
মনের খোরাক

আজকের সর্বব্যাপী যুদ্ধে চা একটা মস্ত বড়ো সহায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। একদিকে কারখানা ও আপিসে যুদ্ধের কাজে নিযুক্ত কর্মীদের চা-ই পরিপূর্ণ উদ্যম এবং একাগ্রতা নিয়ে কাজ করবার প্রেরণা দিচ্ছে, অপরদিকে অসামরিক জনসাধারণকে যুদ্ধের অশান্তি উদ্বেগ সহ্য করতেও সাহায্য করছে চা-ই। কয়েক বছর আগে বিলেতের 'ডেইলি টেলিগ্রাফ অ্যাণ্ড মর্ণিং পোস্ট' কাগজে তাদের চিকিৎসাবিদ্ মানুষের মনের উপর চায়ের প্রভাব সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। আজকের যুদ্ধোদ্যমে চা যে খুবই সাহায্য করছে এই সর্ববাদীসম্মত সত্য মনে রাখলে 'ডেইলি টেলিগ্রাফ'-এ প্রকাশিত প্রবন্ধটির মূল্য যেন আরো অনেকখানি বেড়ে যায়। এই প্রবন্ধে লেখক বলছেন:

"কতকগুলো বিশেষ বিশেষ সময়ে লোকে চা পান করে কেন? চা থেকে তারা কী পায়? এ প্রশ্নের একটি মাত্র জবাব আছে। লোকে চা খায়, কারণ নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকেই তারা জানে যে চা তাদের সঞ্জীবিত করে আর আরাম এনে দেয়।

"স্নায়বিক কেন্দ্রের উপর চা যে রসায়নের কাজ করে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। সঙ্গে সঙ্গে একাগ্রতা বাড়ে, স্মৃতিশক্তি প্রখর হয়ে ওঠে, সর্ব বিষয়ে তৎপরতা বেড়ে যায় এবং মানসিক অবসাদ কমে আসে।

"টাইপরাইটিং, হিসেব কষা, পড়া ও নম্বর দেওয়ার পরীক্ষা নিয়ে দেখা গেছে যে, সব ক্ষেত্রেই চা স্মৃতিশক্তি ও একাগ্রতাকে সতেজ করে তুলেছে—ফলে মনের কর্মক্ষমতাও বেড়ে গেছে। আরো দেখা গেছে যে, চা-পানের পরে শরীর ও মনের ওপর কোনো-রকম বিরুদ্ধ ক্রিয়া হয় না বলে' মনের সজীবতা অনেকক্ষণ পর্যন্ত বজায় থাকে।"

ভারতে যুদ্ধের প্রয়োজনীয় শিল্প-প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে চা যে বাস্তবিকই অসাধারণ সাহায্য করছে, এর এক বিশেষ সমর্থন পাওয়া গেছে একজন সংগ্রাম-সাংবাদিকের একটি সাম্প্রতিক রচনায়। ইনি লিখছেন:

"এদেশে আজ যে প্রচণ্ড শিল্পোদ্যম যুদ্ধের প্রয়োজনে গড়ে উঠেছে, ভারতের কোন এক জায়গায় তা দেখবার সৌভাগ্য সম্প্রতি আমার হয়েছে। কী বিশাল প্রচেষ্টা এবং কত বড়ো জনশক্তি যে এ-কাজে নিয়োজিত, তা স্বচক্ষে দেখলাম।

"রাত্রি দিন, পালা করে' করে' লোক নীরবে কাজ করে চলেছে. এদের কাজের দ্রুতগতি দেখলে কোনোই সন্দেহ থাকে না যে যুদ্ধ জয়ের জন্য এরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

"এই যুদ্ধোদ্যমের মধ্যে আমি লক্ষ্য করলাম চায়ে'র অদ্ভুত কার্যকারিতা। কারখানার প্রত্যেক অংশে চা বিতরণ করবার এক একটি কেন্দ্র রয়েছে। শ্রমিকেরা খুব ভোরে কাজ আরম্ভ করে বলে' বেলা দশটা এগারোটার সময় একটু ক্লান্তি আসে। তখন এক পেয়ালা চা-ই এদের মধ্যে শক্তি ও উদ্যম ফিরিয়ে এনে দেয়।" কাজের মধ্যেই এদের চা এনে দেওয়া হয়, আর যাদের ক্ষিদে পায় তারা চায়ের সঙ্গে বিস্কুট কি কেকও পেতে পারে।

"রাত্রের কাজের পালাও ঠিক এমনি ভাবেই চলে। তফাৎ এই যে রাত্রে শ্রমিকেরা আরো ঘন ঘন চা খায়, বিশেষত রাত্রি যতো গভীর হয়, এদের চা খাওয়াও ততোই বাড়তে থাকে।"

বিবাহ বন্ধন অসিদ্ধ ঘোষণা
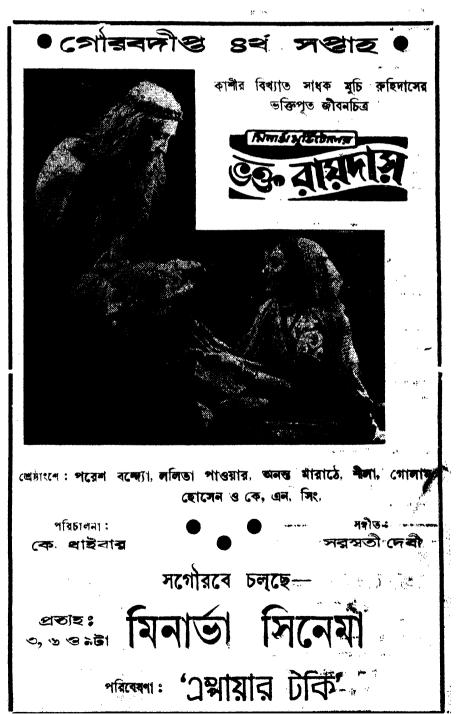
হিন্দু বিবাহ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ রায়

কোনও বিশেষ অবস্থায় হিন্দু বিবাহ অসিদ্ধ ও নাকচযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে কিনা, তৎসম্পর্কে মঙ্গলবার কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি একটী গুরুত্বপূর্ণ রায় দিয়াছেন।

রত্নমণি দেবী নামে এক হিন্দু রমণী নগেন্দ্রনারায়ণ সিংহের সহিত তাহার বিবাহ অসিদ্ধ ঘোষণার প্রার্থনা জানাইয়া হাইকোর্টে দরখাস্ত করিয়াছিলেন। তিনি প্রতিপক্ষ নগেন্দ্র সিংহের স্ত্রী নহেন আদালত হইতে এইরূপ ঘোষণা ও দাবী করিয়াছিলেন। দরখাস্তকারিণীর মতে তিনি ও প্রতিবাদী নগেন্দ্রনারায়ণ উভয়ে শিখ এবং হিন্দুধর্ম অবলম্বী এবং তাঁহারা হিন্দু অনুশাসন মানিয়া চলেন। ১৯২৮ সালের ২০শে এপ্রিল কলিকাতায় হিন্দুধর্ম অনুযায়ী তাঁহাদের বিবাহ হয়।

দরখাস্তকারিণীর পক্ষের যুক্তি এই যে বিবাহকালে এবং তৎপরে দেখা গিয়াছে যে প্রতিবাদী নগেন্দ্র সিং বিবাহ কার্য্যকরী করিবার মত শারীরিক সামর্থ্য হইতে বঞ্চিত এবং তাঁহার পুরুষত্বহীনতার দরুণ বিবাহ অসিদ্ধ।

মামলায় প্রতিপক্ষ বিরোধিতা করিতে উপস্থিত হয়েন নাই, কিন্তু এই মামলায় হিন্দু আইন সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জড়িত আছে বলিয়া আদালতের অনুরোধে স্বর্গীয় মিঃ এস, এন, ব্যানার্জি আদালতের বন্ধু হিসাবে স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া প্রতিপক্ষের মামলা পরিচালনা করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর কৌসুলী মিঃ এন, সি, চ্যাটার্জি মিঃ ব্যানার্জির এই কাজের ভার লইয়াছিলেন।

রায়দান প্রসঙ্গে বিচারপতি বলেন হিন্দু আইন অনুযায়ী হিন্দু বিবাহ চুক্তি বলিয়া গণ্য নহে, ইহা পবিত্র এবং অবিচ্ছেদ্য বন্ধন স্বরূপ। দরখাস্তকারিণীর পক্ষ হইতে কৌসুলী পূর্ব্বের কোনও মামলার এমন কোনও নজীর দেখাইতে পারেন না যে ক্ষেত্রে পুরুষত্বহীনতার দরুণ হিন্দু বিবাহ অসিদ্ধ বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে। অতঃপর এ বিষয়ে প্রাচীন ও আধুনিক হিন্দু আইন ও সংহিতাকারগণের রচনা, সমালোচনা ও বিশ্লেষণপূর্ণ মন্তব্যসমূহ বিশেষভাবে অনুধাবন করিতে হইয়াছে। মনুসংহিতায় স্বাভাবিক স্বাস্থ্যবতী রমণীর পুরুষত্বহীনের সহিত বিবাহ অসিদ্ধ বলিয়া গণ্য করা না হইলেও সন্তানোৎপাদনে অক্ষম স্বামীর স্ত্রীর পক্ষে পরপুরুষ সহবাসের বিধান রহিয়াছে। কালক্রমে এই 'নিয়োগ প্রথা' রহিত হইয়া যায় এবং হিন্দু শাস্ত্রকারগণ এই মত পোষণ করিতে থাকেন যে পুরুষত্বহীনতা বিবাহের অযোগ্যতা বলিয়া গণ্য করা উচিত। এ সম্বন্ধে বিচারপতি যাজ্ঞবল্ক ও নারদ স্মৃতির উল্লেখ করেন।

বিচারপতি বলেন, উপরোক্ত স্মৃতি ও সংহিতাকারগণের অভিমত মোটামুটিভাবে বিবেচনা করিলে আলোচ্য মামলায় দরখাস্ত-কারিণীর প্রার্থনা অনুযায়ী বিবাহ অসিদ্ধ করিলে বিধিবহির্ভূত বলিয়া মনে হয় না। প্রকৃতপক্ষে দরখাস্তকারিণী অনুকূল রায় পাইবার যোগ্য। দরখাস্তকারিণীর কুমারীত্ব লঙ্ঘন হয় নাই বলিয়া তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা অসত্য বলিয়া মনে করিবার কোনও কারণ নাই। বিবাহ অসিদ্ধ ঘোষণার প্রার্থনায় এই মামলা বহু বিলম্বে দায়ের হইয়াছে বলিয়াও আপত্তির কোনরূপ গুরুত্ব নাই। কারণ ১৯২৮ সালে দরখাস্ত-কারিণীর সহসা বিবাহ হয়, তখন তাহার বয়স ৫ বৎসর ছিল, তিনি ১৮ বৎসর বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে ১৯৪১ সালে এই মামলা দায়ের করেন।

বিচারপতি বিবাহ অসিদ্ধ ঘোষণা করিয়া দরখাস্তকারিণী প্রতিবাদীর স্ত্রী নহে বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন। মিঃ এন, বারওয়েল দরখাস্তকারিণীর পক্ষে উপস্থিত ছিলেন।

প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন

অভিনেত্রীকে বিবাহ করা উচিত কি না ?

উত্তর

কেদার, কাশি : অনুচিত। কারণ তাহাদের বিবাহিত জীবন সুখের না হওয়াই সম্ভব।

শ্রীরবি চক্রবর্ত্তী, বরিশাল : উচিত নয়। কারণ যে সুখের জন্য বিবাহ করা তাহা সফল হয় না।

আ, হো, জলপাইগুড়ি : উচিত নয়। বাংলার অধিকাংশ চিত্রাভিনেত্রী বিশেষ ভাবে শিক্ষিতা নন এবং নিজেদের বিশেষ শ্রেণী হ'তে আগত বলে দাবী করতে পারেন না। আজকের সমাজ তাদের সমাজের বাইরে রেখেছে তা কেবলমাত্র তাদের সৃষ্টি।

বাসন্তী, লাহোর ক্যান্ট : অভিনেত্রী বিবাহ করা সর্ব্বতোভাবে উচিত যদি সেখানে থাকে হৃদয়ের মিল, প্রাণের টান, প্রেমের পরশ ও নিঃস্বার্থ ভালবাসা।

শ্রীগণেশ চন্দ্র বসু, পানবাজার, গৌহাটি : অভিনেত্রীদের দিক থেকে তাদের বিয়ে না করাই উচিত। কারণ গৃহের কোন্ তাদের মনে হবে যেন নিদারুণ বিভীষিকা। • • • যার পরিণাম বিষময় ছাড়া আর কিছুই নয়।

শ্রীরঞ্জিত কুমার রায়, তেজপুর : [ইনি ধান ভানিতে শিবের গীত গাহিয়াছেন অথচ সোজা প্রশ্নের যাহা সোজা উত্তর তাহা দেন নাই। —দীঃ সঃ]

বিজনদা'র চিঠি

আমার আদুরে ভাই বোনেরা—

তোমাদের নতুন প্রতিযোগিতা এবারে দেবার কথা ছিল, কিন্তু তা দিতে পারলাম না বলে কেউ রাগ করো না। আসছে বারে নিশ্চয়ই দেখতে পাবে।

এর শেষ কোথায়: কবে বই হয়ে ছেপে বার হবে তাই জান্‌তে চেয়েছ সকলে দেখলাম। নির্দ্দিষ্ট দিন আমার পক্ষে জানান সম্ভব নয়, তবে খুব শীঘ্রই যে বার করবার চেষ্টা করছি এ কথাই কেবল তোমাদের জানাতে পারি।

আজ এই পর্য্যন্ত। এখন আসি। তোমরা আমার স্নেহ নিও।

তোমাদের : বিজনদা'

মজার খবর

শ্রীসৌরীন্দ্র মোহন দেব (৭৮৬):

১৬৬০ সালের সুইডেনের একটা মুদ্রা পাওয়া গেছে। এর দাম ১৭ শিলিং ৪ পেন্স, আর ওজন হচ্ছে ২৮৸০ পাউণ্ড অর্থাৎ আমাদের দেশে প্রায় ১৪ সের। এর মধ্যে আর একটা অদ্ভুত জিনিষ লক্ষ্য করার আছে। এই মুদ্রাটাকে খরচ করবার সময় এক একটা অংশ ভেঙ্গে খরচ করা যায়। কি মজার !!

* * *

দু' জন চাষা তাদের ক্ষেতের সীমা নিয়ে ভীষণ মারামারি করে। পুলিশ তাদের দু'জনকেই ধরে থানায় নিয়ে যায়। বিচারক দু'জনকে ছয় মাস জেল দেন আর আদেশ দেন যে এই দু'জনকে এমন ভাবে রাখবে যাতে সব সময়েই দু'জনকে পরস্পরের দিকে তাকাতে হয়। বেশ বিচার।

* * *

একটা মৌমাছি যদি ২৪ ঘণ্টা কাজ করে তবে ৫০ বৎসরে সে এক সের মধু তৈরী করতে পারে। খুব কম সময় !!

টুকে রাখো

—শ্রীশান্তি সমীরণ ব্যানার্জ্জী (১০৫৫)

একজন বৈজ্ঞানিক হিসাব করে দেখেছেন যে পৃথিবীতে প্রতি বৎসর ১৬০০০,০০০ বার বজ্রপাত হয়। অর্থাৎ প্রতিদিন ৪৪,০০০ বার। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী বজ্রপাত হয় জাভাতে।

* * *

নাইল নদীতে সব চেয়ে বেশী রকম মাছ পাওয়া যায়। এ পর্য্যন্ত ৯ হাজার রকম মাছ পাওয়া গিয়েছে।

* * *

চীনের কোনো কোনো জায়গায় নিয়ম আছে, যে যদি কেউ ঋণ শোধ করতে না পারে তা হলে যে টাকা ধার দিয়েছে, সে দরজার কপাট খুলে নিয়ে যায়। উদ্দেশ্য হচ্ছে যে কপাট না থাকলে বাড়ীতে ভূত দৈত্যরা অনায়াসে ঢুকতে পারে।
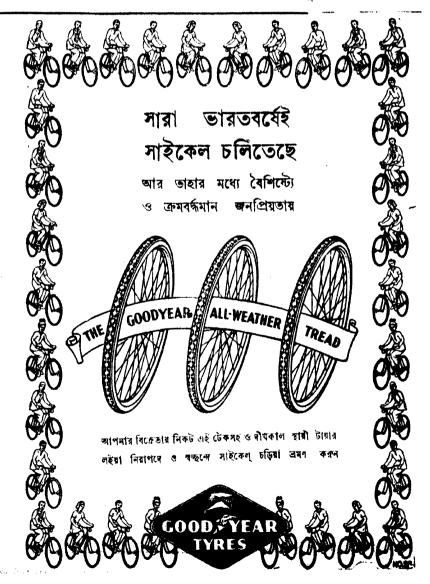
সব সত্যি

শ্রীঅশোক কুমার দে (১১১৬)

বিলাতের অ্যাভন নদীর তীরে চার্লকোট নামে এক তালুকের জমিদার স্যার টমাস্ লুসি। সেই তালুকের হরিণ চুরি করা জমিদারের আদেশে নিষেধ ছিল। তবু প্রায়ই হরিণ চুরি হতো। কিন্তু হঠাৎ একদিন জমিদারের লোকেরা একজন লোককে হরিণ চোর বলে রাজার কাছে ধরে আনলো। লোকটিও তার দোষ স্বীকার করলো। বিচারে ঠিক হলো যে প্রকাশ্য স্থানে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় এই দোষীর পিঠে ত্রিশ ঘা বেত মারা হবে। জমিদারের আদেশ প্রতিপালিত হলো। তখনকার দিনে সর্ব্বাপেক্ষা অপমানকর দণ্ড ছিল ঐ বেত্রাঘাত। সেইজন্য এই অপমানের প্রতিশোধ নেবার প্রতিজ্ঞা করলো ঐ লোকটি। সে তখন বহু চেষ্টা করে জমিদারের নামে এক অপমানকর কবিতা লিখে জমিদার বাড়ীর দরজায় তা টাঙিয়ে দিয়ে এলো। সকলেই সেই কবিতার কথা জানতে পারলো। জমিদারও সেই কবিতার রচয়িতা যে কে তা বুঝতে বাকী রইলো না। তাই তিনি তার উপর ভীষণ অত্যাচার করতে আরম্ভ করলেন। অবশেষে সেই লোকটি ঐ দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হলো।

এই হরিণ-চোর লোকটি কে জান? উনি পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি ও নাট্যকার উইলিয়ম সেক্সপীয়ার।

মনে মনে

—নৃপেন সেনগুপ্ত (৩৮৯)

চৈত্র-রাতের ঘোর আঁধার অনেকটা ফিকে হয়ে এসেছে—পূব-দিগন্তে নিবিড় বনানীর ফাঁকে ফাঁকে পাওয়া যাচ্ছে দিনের আলোর একটুখানি আভাস। একটা স্নিগ্ধ ফুরফুরে হাওয়া হিমের আমেজ নিয়ে অলস তালে বয়ে চলেছে এদিক-ওদিক।…বেশ লাগছে সময়টা! চুপটি করে বসে আছি বাঁধানো ঘাটের ভাঙা সিঁড়িটার এক পাশে। কোথায় বসে একটা কোকিল আপন মনে গাইছে—কু…উ…কু…উ…উ। ডাকটা কতো মধুর হয়েই না কানে এসে বাজছে—দেহের প্রতি রন্ধ্রে অনুভব করলাম একটা আনন্দের স্ফুরণ! প্রাণটা ভরে গেল কোমল স্নিগ্ধতায়, নিজেকে যেন হারিয়ে ফেললাম!

আপনভোলা হয়ে কান পেতে শুনছিলাম কোকিলের সুমিষ্ট রাগিনী—এমন সময় একটা কাক কর্কশ কণ্ঠে ডেকে উঠল—কা-আ…কা-আ…। দেখতে দেখতে আরো গোটা কয়েক এসে সুর মিলিয়ে ডাকলে—কা…কা…কা…! আর কানে আসছে না কোকিলের সেই মধুর সংগীত—কাকের কর্কশ কণ্ঠের আভাস পেয়ে সে হয়ে গেছে একেবারে চুপ। ভা-রি রাগ হলো কাকগুলোর ওপর—তাদের একঘেয়ে নীরস কণ্ঠস্বর ছিন্নতন্ত্রী একতারার সুরহীন কর্কশ ঝঙ্কারের মতো কান ঝালাপালা করে দিল।…উঠে দাঁড়ালাম—কাকগুলো ডেকেই চলেছে একটানে। হঠাৎ মনে হলো—আচ্ছা, কাকের ডাক শুনে কোকিলটা চুপ করলে কেন—সেও তো গেয়ে যেতে পারতো!…ভাবতে ভাবতে একটা সমাধানের শীর্ণ সূত্র বিদ্যুতের মতো ঝলকে চলে গেল আমার মগজের ফাঁক দিয়ে—বেশ বুঝতে পারলাম কোকিল কেন চুপ করেছে: যারা সত্যিকারের গুণী তারা কখনো গুণীর মুখোস-পরা গুণহীনদের নিষ্ফল আস্ফালনের সংগে পাল্লা দিয়ে নিজের বিজ্ঞতা জাহির করতে যায় না। তারা জানে তাদের গুণের আদর সর্বত্র—ভেতর যাদের ফাঁকা তারা মুখে-মুখে যতো বড়ো বিজ্ঞের বুলিই ছাড়ুক না কেন, সে-ই মিথ্যে বুলির ফাঁকে ফাঁকে তাদের অজ্ঞতাই উঁকি মারবে—প্রকৃত গুণীর সম্মান কোথাও তারা পাবে না। গুণের বিকৃত রূপ দিয়ে যেখানে নির্গুণীরা তাকে নিয়ে বৃথা ছিনিমিনি খেলে, আর সেই সংগে নিজের মিথ্যে বিজ্ঞতায় লাভ করে প্রচুর আত্মপ্রসাদ—সেখানে প্রকৃত বিজ্ঞেরা থাকে সম্পূর্ণ চুপ!—তাই কাকের ডাকের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চীৎকার করে প্রকৃত গুণের অধিকারী কোকিল নিজ কণ্ঠের মাধুর্য্য প্রমাণ করতে যায় নি। সে রইলো চুপ করে—সে জানে কাক যদি সারাদিনও চীৎকার করে, তবুও কেউ তার গানের তারিফ করবে না! যার যা গুণ সেটা চিরকালই থাকবে অটুট!…

মানব সমাজে টেনে এনে এ-সত্যটা যাচাই করলে কেমন হয়!!…

মনে রেখো—

"সংসারে কিছুই ফেলা যায় না। আবর্জ্জনাও সার হয়।"

—দ্বিজেন্দ্রলাল

মৃত্যু যাঁ'র নেই

শ্রীকিষণচাঁদ বর্ম্মন (৫৩)

চামড়া তৈরীর কারখানায় কাজ করে লোকটা। সারাদিন হাড়-ভাঙা খাটুনীর পর রাত্তিরে বাড়ী ফিরে আসে। বাড়ীতে দু' বছরের ছোট্ট এক ছেলে আর তার স্ত্রী। সারাদিন শুধু চামড়া আর চামড়া, কারখানায় এই চামড়ার গাদার মধ্যে সারাটা দিন বসে, লোকটার প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে—তাই দিনের শেষে রাতের আঁধার ঘনিয়ে আসার সংগে যখন সে বাড়ী ফেরে তখন ছেলে আর স্ত্রীকে দেখে তার মন অনেকটা শান্তি পায়।

সে নিজের কোলেতে ছেলেকে তুলে নিয়ে বসতো একটা টুলের ওপর, তারপর
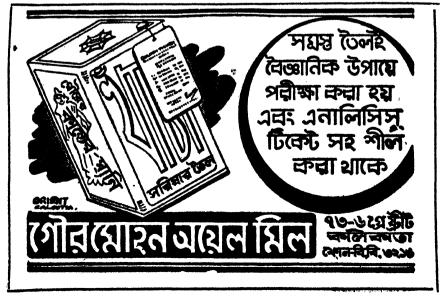
ছেলের মুখে গালে চুমো দিতে দিতে বলতো: খোকন যদি তুই বড় হয়ে কলেজের একজন প্রফেসর হোস্ তাহলে যে বাবা আমি কতো খুসী হই তা ভগবানই জানেন। এই দেখনা আমার অবস্থা!! সারাদিন কি হাড়ভাঙা খাটুনীই খাটতে হয় আমাকে এক মুঠো খাবারের জন্যে!! সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত দুর্গন্ধময় চামড়াগুলো শুধু ঘেঁটে মরি, এক এক সময় গন্ধে গা বমি দিয়ে ওঠে—তাই বলছি রে খোকা তোর জীবনটা যেন তোর বাবার মত না কাটে। শুধু কি তাই? কতদিন না খেয়ে না দেয়ে রাতের পর রাত দিনের পর দিন কাটিয়েছি সৈন্য শিবিরে। আমি জীবনে অনেক দুঃখ কষ্ট পেয়েছি···তুই লেখাপড়া শেখ্ ভাল করে, অধ্যাপক হয়ে জীবনটাকে গৌরবের সংগে উপভোগ কর, এই আমার আন্তরিক ইচ্ছে······দু' বছরের ছেলে বাপের এত কথার কিছুই বোঝে না সে!! তখন বাপের লম্বা দাড়ি নিয়ে খেলা করতে করতে ছেলেটা শুধু হাসে খিল খিল করে···শিশুর মন কি যে বোঝে তা কে বলবে? ছেলের মা পাশেই বসে সব শুনছিল। স্বামীর কথার উত্তর ছেলেটির মা দিল: নিশ্চয়ই!! আমাদের খোকন লেখাপড়া শিখবে, বড় হবে, কলেজের প্রফেসর হবে, জগতে সব্বাই একদিন ওকে বড় বলে স্বীকার করবে দেখো।······

* * *

······আরো ষাট বছর পরে যদি দিলে। ছেলেটির বাবা মা বেঁচে থাকতেন তাহলে তাঁরা দেখতে পেতেন যে, তাঁদেরই সেই বাড়ীর দরজায় এক ফলক আঁটা রয়েছে, আর তার ওপরে স্বর্ণাক্ষরে খোদাই করা রয়েছে এই ক'টা কথা—

১৮২২ সালের ২৭শে ডিসেম্বর
এইখানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন
লুই পাস্তুর!!

······লুই পাস্তুরের নামের সংগে তোমরা নিশ্চয়ই সকলে পরিচিত!! জীবাণুর অস্তিত্বের কথা তিনিই সর্বপ্রথম জগৎকে দেখিয়েছিলেন। এই অবিস্মরণীয় আবিষ্কারের জন্য আজও জগতের সমস্ত জাতির লোক ঐ ছেলেটার আত্মার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধায় মাথা নোয়ায়।

একটুখানি হাসো

—মমতা দে (১১১৭)

মা—খোকা, তুই তোর ছোট বোনটিকে অত কাঁদাচ্ছিস কেন?

খোকা—দেখ না মা, খুকী এক দোয়াত কালি খেয়েছে, সেটা বার করবার জন্যে একটু ব্লটিং পেপার খাওয়াবার চেষ্টা কোরছি···নাঃ, মেয়ে কেঁদেই ভাসিয়ে দিলে।

রাণু আর তা'র দাদা

(৫)

—রূপকুমার—

দাদা,

এবারে তোমার চিঠিতে সৌরজগৎ সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পারলাম।···এবারে আমার প্রশ্ন হচ্ছে সূর্য্য সম্বন্ধে।···ভালো কথা, তুমি আমায় জানিয়েছিলে যে, "পৃথিবী থেকে ন'কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল দূরে সূর্য্য চুপটী করে বসে আছে।" কিন্তু সে কেমন করে সম্ভব? সূর্য্যদেব একেবারে নড়ে-চড়ে না? ···সূর্য্যের আসল মূর্ত্তি কি রকম আর তা তৈরী কি দিয়ে? সূর্য্য পৃথিবীর আয়তনে বড় না ছোট? ···আচ্ছা দাদা, সূর্য্য থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে কতক্ষণ সময় লাগে? আজ এই পর্য্যন্ত থাক। পরের বারে যদি সূর্য্য সম্বন্ধে আর কোন প্রশ্ন মনে ওঠে তা হলে তা' জানাবো, তা' না'হলে চাঁদের সম্বন্ধে যে সব প্রশ্ন মনে জেগে উঠেছে তার উত্তর চাইবো।···দাদা, কি মনে হচ্ছে তোমার বলতো যে, আমি যেন তোমার "পণ্ডিত মশাই" আর তুমি আমার "ছাত্র"। তাই প্রশ্নের পর প্রশ্ন আমি করে যাচ্ছি তোমার কাছে, আর তুমি তার উত্তর দিয়ে চলেছ।···ভয় নেই, আমি তোমার প্রশ্নের সব উত্তর দেখা হ'লেই দেবো। সেদিন আমার পরীক্ষা করলে বুঝবে যে, তোমার এ পণ্ডশ্রম হয় নি।··· প্রণাম নিও। তোমার বোন: রাণু

খেলার মাঠে

শ্রীউমেশ মল্লিক বি, এ

গত সোমবারে ইষ্টবেঙ্গল ডালহৌসীকে যে ভাবে ৭—৩ গোলে পরাজিত করেছে তাতে তাদের প্রাণ খুলে প্রশংসা করতে হয়। এদিনে ইঃ বিঃ দলের আক্রমণ বিভাগের খেলা হয়ে ওঠে অপূর্ব্ব। এ দিনের সর্ব্বাপেক্ষা দর্শনীয় হয়ে ওঠে পাগসলীর ২০ গজ দূরত্ব থেকে গোল করা। এবং তিনি এদিনে নিজেই তিনটি গোল দিয়ে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দেন। ঢাকার পি, মুখোপাধ্যায় অপর দুটি দেন। এবং স্থনীল ঘোষ একটি গোল দেন। এদিনে প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত খেলায় প্রবল উত্তেজনা দেখা যায়। ইঃ বিঃ দলের পাগসলী, পি, মুখোপাধ্যায় এবং স্থনীল ঘোষের খেলা এদিনে প্রাণস্পর্শী হয়ে ওঠে। অবশ্য ডালহৌসী দলের ভাগ্য যে মন্দ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কারণ একটি গোল হয় সেম সাইডে, বাকী ৬টির মধ্যে গোলরক্ষকের অন্ততঃ ৩টি গোল রক্ষা করা উচিত ছিল।

এ সপ্তাহের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা—মহমেডান দল রেঞ্জার্সের মত লীগে সর্ব্বনিম্ন স্থান-সংগ্রহকারীর বিপক্ষে অমীমাংসিত ভাবে খেলা শেষ করা। মহমেডান দল বহু অবধারিত গোল দেওয়ার স্থযোগ হেলায় নষ্ট করে। এজন্য তাহের ও মমতাজকেই সর্ব্বাপেক্ষা দায়ী করা চলে। তবে এদিনে মহমেডান দলের রক্ষণ ভাগের দৃঢ়তার প্রশংসা না করে থাকা যায় না। বলতে কি তাদেরই প্রচেষ্টায় বিপক্ষ দল স্থবিধা করতে পারেনি।

গত বুধবার ৩১শে মে মহমেডান দল স্পোঃ ইউনিয়নকে ২—০ গোলে পরাভূত করে! এদিনে রশিদ এবং নূর মহম্মদ মহমেডান দলের পক্ষে গোল দেন। স্পোঃ ইউঃ-এর এ, ব্যানার্জি একটি স্বর্ণ স্থযোগ নষ্ট করে। গত ১লা জুন মহমেডান দল বহু স্থযোগের অপব্যবহার করে কোনক্রমে ক্যালকাটাকে ১—০ গোলে পরাজিত করে ২টি পয়েন্ট সংগ্রহ করে। এদলের আক্রমণ বিভাগের খেলা অন্যান্য দিনের মতই নিস্পৃহ হয়ে উঠে। একমাত্র নূর মহম্মদের খেলাই যা দর্শনীয় হয়েছিল। ব্যাকে তাজ মহম্মদের খেলা ভাল হয়। এই একটি খেলোয়াড় যে সব পজিসনেই সমান কৃতিত্বের সঙ্গে খেলতে পারে। গত শনিবার দিন ভবানীপুর দলের দুর্ভাগ্য বশতঃ মহমেডান ২—১ গোলে জয়লাভ করে। ভবানীপুর দল এদিন সর্ব্বাগ্রে গোল দেয়, কিন্তু মহমেডান দল পর মুহূর্ত্তেই তা পরিশোধ করে আর ১টি গোল দেয়। এবং গোল দুটির জন্যই ডি, সেন দায়ী। এন, গুহ গড়গড়ীর চেয়ে বিশেষ কার্য্যকরী হবে বলে মনে হয়। "পজিসন" সম্বন্ধে তাঁর সচেতনতা এদিন দলের বিশেষ কাজের হয়ে উঠে। কিন্তু ভবানীপুরের আক্রমণ বিভাগের খেলা প্রীতিপ্রদ হয়নি। আর, সিংহ ভবানীপুরের পক্ষে গোল দেন। ৩১শে মে ভবানীপুর এরিয়ান্সের বিরুদ্ধে ২—২ গোলে খেলা শেষ করে। ভবানীপুরের গোলে তপেন দত্ত খেলে, তার খেলা উল্লেখযোগ্য হয়। এদের পক্ষে আর সিংহ ও আর দাস গোল দেন। গত মঙ্গলবার ৬ই জুন মোহনবাগান দল ভবানীপুরকে ৪—০ গোলে পরাজিত করে। প্রথম গোলটি হয় পেনালটিতে—মান্না স্কোর করেন! ২য় ও তৃতীয়টি দেন বি, বসু এবং চতুর্থ গোলটি দেন নিমু বসু। ভবানীপুরের রক্ষণ ভাগের খেলা মোটেই স্থবিধাজনক হয়নি। গোলগুলির জন্যে ডি, সেনকে বিশেষ দায়ী করা চলে না, তবে শেষ গোলটি অনেকের মতে তাঁর বাঁচান উচিত ছিল। এদিন মোহনবাগানের আও, মান্না এবং নিমু বসুর খেলা চমৎকার হয়। কে রায় ও দীপেন সেনের খেলা নিকৃষ্ট শ্রেণীর হয়।

ফুটবল লীগে কার কিরূপ স্থান :—

(রবিবার ৪ঠা জুন পর্য্যন্ত)

মোহনবাগান	৯	৮	১	০	১৬	৩	১৭
ইঃ বিঃ	১০	৮	১	১	১৯	৪	১৭
বি এণ্ড এ আর	১০	৭	২	১	১৭	১১	১৬
মহমেডান স্পোঃ	৮	৬	০	২	১০	৪	১২
ক্যালকাটা	১১	৫	১	৫	১০	১৪	১১
ভবানীপুর	১০	৩	৩	৪	১৩	১০	৯
ডালহৌসী	১০	৪	১	৫	১৫	১৪	৯
এরিয়ান্স	১১	২	৫	৪	৮	১০	৯
স্পোঃ ইউঃ	১১	৩	৩	৫	৭	১০	৯
এন্টিলোপ	১০	৩	২	৫	৭	১০	৮
কালীঘাট	১০	৩	১	৬	৪	৭	৭
রেঞ্জার্স	১০	১	২	৭	৬	১৭	৪
পুলিশ	১০	০	২	৮	২	২০	২

গত সপ্তাহের খেলা :—

৩১শে মে, বুধবার
মহমেডান স্পোঃ—২ স্পো ইউঃ—০
ভবানীপুর—২ এরিয়ান্স—২
ডালহৌসী—২ কালীঘাট—১

১লা জুন, বৃহস্পতিবার
মহমেডান স্পোঃ—১ ক্যালকাটা—০
বি এণ্ড এ আর—২ এন্টিলোপ—১

২রা জুন, শুক্রবার
স্পোঃ ইউঃ—১ কালীঘাট—০
এরিয়ান্স—২ পুলিশ—০

৩রা জুন, শনিবার
মহমেডান—২ ভবানীপুর—১
কালীঘাট—১ এন্টিলোপ—০
ক্যালকাটা—২ ডালহৌসী—১

৫ই জুন, সোমবার
ইঃ বিঃ—৭ ডালহৌসী—৩
এন্টিলোপ—১ স্পোঃ ইউঃ—০
মহমেডান—০ রেঞ্জার্স—০

৬ই জুন, মঙ্গলবার
মোহনবাগান—৪ ভবানীপুর—০
কালীঘাট—১ পুলিশ—০

নানাকথা

পুষ্প-স্মরণিকা

গত রবিবার ৫ই জুন সকালে দীপক সিনেমায় উত্তর কলিকাতার জনপ্রিয় অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট পুলিস কমিশনার রায় সাহেব শ্রীপুলিনকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা শ্রীমতী পুষ্পর ১৩শ মৃত্যু-স্মরণিকা উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। ডাঃ শ্রীরাধাবিনোদ পাল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার, সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। পণ্ডিত অশোকনাথ শাস্ত্রী প্রার্থনা ও প্রস্তাবনা করেন। ইহার পর সুকবি শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় সভাপতি বরণ করেন। উৎসব-সূচীর মধ্যে বহু সঙ্গীত ও নৃত্যের আয়োজন ছিল। অবশেষে শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

দীপালী কাজি নজরুল সাহায্য ভাণ্ডার

গত ২রা জুন সন্ধ্যায় সুসাহিত্যিক মিঃ, এস, ওয়াজেদ আলি সাহেবের ৪৮ ঝাউতলা রোডস্থ ভবনে অনুষ্ঠিত সভায় স্থির হয় যে কবি কাজি নজরুল ইসলামের সাম্প্রতিক অসুস্থতার জন্য তাঁহার সাহায্যার্থে একটী দীপালী সাহায্য ভাণ্ডার খোলা হউক। কবির বন্ধু-বান্ধব ও অনুরাগী পাঠক-পাঠিকাগণকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে কবির এই দুঃসময়ে তাঁহারা যেন যথাসাধ্য সাহায্য করেন।

সুকবি বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (দীপালীর প্রধান সম্পাদক) সভাপতি, মিঃ এস, ওয়াজেদ আলি সাহেব (কোষাধ্যক্ষ) এবং রবি বাসরের সম্পাদক শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ বসু এই ভাণ্ডারের সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। দেয় সাহায্য দীপালী অফিসে অথবা কোষাধ্যক্ষের ঠিকানায় প্রেরিতব্য।

মিতালী সঙ্ঘ

আগামী রবিবার ১১ই জুন উক্ত সঙ্ঘের ১৪০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে একটি বিশেষ অধিবেশন হইবে।

রায় বাহাদুর নিবারণচন্দ্র ঘোষ, ও-বি-ই

ইনি সম্প্রতি ই-আই-রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার নিযুক্ত হইয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে আর কোনও ভারতবাসী এই সর্ব্বোচ্চ পদের গৌরব লাভ করিতে সক্ষম হন নাই। ঘোষ মহাশয় মাতৃভাষার একজন পরম ভক্ত এবং সুলেখক। আমরা তাঁহার সুদীর্ঘ জীবন কামনা করি।

রবি-বাসর

গত ২১শে জ্যৈষ্ঠ, রবিবার অপরাহ্নে, কলিকাতা ১৩০নং কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীটে, শিল্পী শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের আবাসে রবি-বাসরের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এই অধিবেশনে রবি-বাসরের অন্যতম সদস্য অধ্যক্ষ সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র এম-এ (ক্যাণ্টাব) আই-ই-এস (রিটায়ার্ড) মহাশয়ের পরলোকগমনে বিশেষভাবে শোক প্রকাশ করা হয়। সর্ব্বাধ্যক্ষ রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র, সভায় স্বর্গত মৈত্র মহাশয়ের পাণ্ডিত্য, সাহিত্যানুরাগ, কবি-শক্তি, সঙ্গীত প্রীতি, সরলতা ও বন্ধুবাৎসল্য প্রভৃতি সদগুণের উল্লেখ করিয়া তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন।

এই অধিবেশনে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বসু "চিরন্তনী রূপকথা" শীর্ষক একটী সুলিখিত ছোট প্রবন্ধ এবং তৎসঙ্গে দীপালীতে প্রকাশিত "শিল্পী পূর্ণিমা" নামক গল্পটী পাঠ করেন। পাঠের পর রূপকথা সম্বন্ধে যে আলোচনা হয়, তাহাতে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, মন্মথনাথ ঘোষ, নরেন্দ্র দেব, বিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি সুধীবৃন্দ এবং সভাপতি এস, ওয়াজেদ আলি সাহেব বিশেষ ভাবেযোগদান করিয়াছিলেন।

দার্জ্জিলিংয়ে আমোদ-প্রমোদ

গত ৩০শে মে নৃপেন্দ্রনারায়ণ হিন্দু হলের ব্যায়ামাগারের উদ্যোগে এবং মুষ্টিযোদ্ধা রবীন সরকারের ও পরিচালনায় একটি বিচিত্র অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। মুষ্টিযুদ্ধে রবীন সরকারের সহিত (মণ্টু মজুমদার বনাম জব্বর ছত্রি) অমর প্রসাদ, জ্যোতি বসু, মানস মুখার্জ্জি ও প্রাইভেট স্মিথের মুষ্টিযুদ্ধ প্রদর্শনী, রবীন সরকারের মৃগব্যাধ নৃত্য, যুযুৎসু, ভারোত্তোলন, স্থানীয় বালকদের লইয়া ডাম্বল ড্রিল, গলজ্জলে খেলা প্রভৃতি উপভোগ্য হয়, সঙ্গীতে হৃষিকেশ বসু (ডালি) ও শ্যাম বসু সকলকে তৃপ্ত করেন। মাংসপেশী প্রদর্শনী ও ভারোত্তোলনে সনৎ বিশ্বাস ও লীলাময় রায়, অগ্নি ও ছোরার খেলায় জব্বর ছত্রি, ফাঁসির খেলায় মণ্টু মজুমদার, সুরেশ মিত্রের আবহ-সঙ্গীতে প্রবোধ দাসের কমিক ডান্স, মনোতোষ সেনগুপ্তের হাস্যকৌতুক বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সাপুরিয়া নৃত্যে ছবি রায়, দেবদাসী নৃত্যে লীলা চক্রবর্ত্তী এবং সাঁওতালী নৃত্যে রাধারাণী চক্রবর্ত্তী সকলকে আনন্দ দেয়।

ইন্‌ষ্টিটিউট অফ ফিজিক্যাল কাল্‌চার

আগামী ১৮ই জুন রবিবার সন্ধ্যায় ইনষ্টিটিউট অফ ফিজিক্যাল কাল্‌চারের সাহায্যকল্পে বি এণ্ড এ রেলওয়ে ম্যানসন হলে এক বিচিত্র সঙ্গীত জলসা ও জিম্‌নাষ্টিক্ ক্রীড়ানুষ্ঠান হইবে। প্রফেসার ধীরেন্দ্রনাথ বসু (স্বরোদী), কুমার শচীন দেববর্ম্মন, কৃষ্ণ গাঙ্গুলী (নাটু বাবু), সত্যেন ঘোষাল, প্রফেসার সতীশচন্দ্র ঘোষ, সিদ্ধেশ্বর দাস (সিধু বাবু) প্রভৃতি গুণীগণ কণ্ঠ ও যন্ত্র সঙ্গীত করিবেন। এতদ্ব্যতীত কুমারী পদ্মরাণী, কুমারী ভবানী ও রাধা দেবীর প্রাচ্য নৃত্যকলাও অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ হইবে। পরিশেষে ইনষ্টিটিউটের সভ্যবৃন্দ নানাবিধ ব্যায়াম-কৌশল ও জিম্‌নাষ্টিক ক্রীড়া প্রদর্শন করিবেন।

নাটমণ্ডপ

চিত্র-সংবাদ

নিউ থিয়েটার্সের "উদয়ের পথে" এবং "তুই পুরুষ" দুইখানি ছবিরই শুটিং শেষ হইয়া গিয়াছে এবং দুইখানি ছবিরই সম্পাদনা চলিতেছে। আমাদের মনে হয় আগামী মাসের প্রথম দিকেই হয় "দুই পুরুষ" নয় "উদয়ের পথে" কলিকাতায় মুক্তিলাভ করিবে।

* * *

বোম্বায়ের রণজিৎ ফিল্মে এখন দুইখানি বিরাট ঐতিহাসিক ছবি তোলা হইতেছে—যথা "শাহানশা বাবর" শ্রেষ্ঠাংশে খুরশীদ ও শেখ মুক্তার এবং দ্বিতীয়খানি "মমতাজ মহল" শ্রেষ্ঠাংশে খুরশীদ এবং চন্দ্রমোহন।

* * *

রঙমহলে নৃত্যোৎসব

আগামী সোমবার ১২ই জুন ও মঙ্গলবার ১৩ই জুন সন্ধ্যা ৭টায় রঙমহল মঞ্চে যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালের সাহায্যকল্পে যে একটি বিরাট সঙ্গীত ও নৃত্যানুষ্ঠানের আয়োজন করা হইয়াছে তাহার সংবাদ আমরা পূর্ব্বেই দিয়াছি। উক্ত নৃত্যানুষ্ঠানে ভারতের যাবতীয় সঙ্গীত কনফারেন্স ও সংবাদপত্র কর্তৃক প্রশংসিত কুমারী মঞ্জুলিকা ভাদুড়ীর নৃত্য-নৈপুণ্যের অপূর্ব্ব নিদর্শন পাওয়া যাইবে। তাঁহার সহিত ললিতা ভাদুড়ী নাম্নী যে কিশোরী শিল্পীটিকে দেখা যাইবে তাহার শক্তির পরিচয় ইতিপূর্ব্বে দেখা গিয়াছে, এবারে দুজনের সম্মিলিত "জলকন্যা" নৃত্যটি ভাবসম্পদে অপূর্ব্ব।

এই সব নৃত্যের প্রাণস্বরূপ হইল ইহার আবহ-সঙ্গীত এবং এই সঙ্গীতের মায়াজাল যিনি রচনা করিয়াছেন তাঁহার নাম রবি রায় চৌধুরী।

খবরা-খবর

মহাত্মা গান্ধী জুহুতে তাঁহার কুটিরে বসিয়া "Mission To Moscow" নামক ওয়ার্ণার ব্রাদার্সের ছবিখানি দেখেন। জীবনে তাঁহার এই প্রথম টকী দর্শন।

* * *

জগদ্বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্করের ভ্রাতা রাজেন্দ্রশঙ্কর বম্বে টকীজে যোগদান করিয়াছেন। ইনিও যে একজন খ্যাতনামা নৃত্যশিল্পী নৃত্যরসিকমাত্রেই তাহা অবগত আছেন।

প্রকাশ পিকচার্সের "বিক্রমাদিত্য" চিত্রে অভিনয়ার্থ পৃথ্বীরাজ চুক্তিবদ্ধ হইয়াছেন।

* * *

"খানদান" "দোস্ত" প্রভৃতি চিত্রের নায়িকা শ্রীমতী নুরজাহান একটি যমজ সন্তান প্রসব করিয়াছেন। ইহার স্বামীর নাম সৌকত হোসেন—যিনি উপরোক্ত ছবি দু'খানির পরিচালক।

* * *

তরুণী চিত্রনটী নলিনী জয়বন্ত পরিচালক বীরেন্দ্র দেশাইকে বিবাহ করিয়াছেন। মিঃ দেশাই-এর ইহা দ্বিতীয় বিবাহ, প্রথম স্ত্রী এখনও বর্ত্তমান।

* * *

পরিচালক জুন্নারকর শারদা নাম্নী এক চিত্রাভিনেত্রীকে বিবাহ করিয়াছেন। জুন্নারকর "লড়াই-কে-বাদ" পরিচালনা করেন এবং শারদা "নয়া তারানা'য় অভিনয় করেন।

চিত্রলেখায় "দেবদাস"

নিউ থিয়েটার্সের যুগান্তকারী চিত্র "দেবদাস গত সপ্তাহ হইতে পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে চলিতেছে। কর্ত্তৃপক্ষ ছবিখানিকে আরও এক সপ্তাহ প্রদর্শনের ব্যবস্থা করিয়া ভালই করিয়াছেন।

দীপালীর স্বত্বাধিকারী শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত, ১২৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, দীপালী প্রেসে মুদ্রিত ও দীপালী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

প্রধান সম্পাদক—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় :: সহঃ সম্পাদক—শ্রীধীরেন্দ্রমোহন মজুমদার বি. এল.

১৬শ বর্ষ VOL. XVI. } ১লা আষাঢ় ১৩৫১ :: June 15, 1944 { ২৪শ সংখ্যা No. 24

আলোচনী

বাংলা পরিষদে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে যে সব ঘটনা ঘটেছে তা থেকে অনেকে অনেক রকম সিদ্ধান্ত করেছেন। এই প্রতিষ্ঠানের মর্য্যাদা বাঁচাতে হলে অন্ততঃ কিছুদিনের মত পরিষদের কাজকর্ম্ম বন্ধ রাখা উচিত। এই রকম অনেকের ধারণা। গত ২৫শে মে মাধ্যমিক শিক্ষা বিলের আলোচনা প্রসঙ্গে যে হাঙ্গামার সুরু হয় পরবর্ত্তী কয়েকটি অধিবেশনে তা যেন আরও সংক্রামক হ'য়ে ওঠে। স্পীকার মহোদয়ের অবস্থা সহানুভূতির উদ্রেক করবে। বাংলা পরিষদের বর্ত্তমান মেজাজ (mood) ধীরে সুস্থে বিবেচনা করে কাজ করবার পক্ষে অনুকূল নয়। বিরুদ্ধদল উত্তপ্ত হয়ে রয়েছেন এবং এই উত্তাপের হেতু শুধু সাময়িক উত্তেজনা নয়। বাংলার জনসাধারণের ভাগ্য নিয়ে চলছে অদ্ভুত জুয়াখেলা। মাধ্যমিক শিক্ষা বিল এর দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। বিভিন্ন স্বার্থের পোষকতা লাভ করে লীগ দল এই বিলকে আইনে পরিণত করবার সঙ্কল্প করেছেন—এঁদের ব্যবহার বর্ত্তমান একটা চিন্তাহীন জিদে পরিণত হয়েছে। অপরপক্ষে বিপক্ষদল চান এই অনিষ্টকর আইন যাতে করে প্রত্যাহৃত হয়। সংবাদপত্রে, সভাসমিতিতে বিলের ধারা উপধারাগুলির চুলচেরা বিচার করা হয়েছে। এটা দেশের জনশিক্ষাকে সাম্প্রদায়িকতাদুষ্ট করবার এ রকম হীন প্রচেষ্টা অন্য কোথাও দেখা যায় নি। পরিষদের বর্ত্তমান ভোটসংখ্যার জোরে লীগ দল এই বিল পাশ করিয়ে নিতে পারেন। মনে রাখা উচিত, আইন সভার মেজরিটির মতামতেই একটা প্রদেশের ভাগ্য নির্দ্ধারণ করবার পক্ষে শেষ কথা নয়।

* * * * * *

বর্ত্তমান পরিষদের দলগত অবস্থার কথা বিবেচনা করলে দেখা যাবে বর্ত্তমান লীগদল একটা কৃত্রিম মেজরিটির সুবিধা ভোগ করছেন। দেশের শাসনরশ্মি ধারণ করবার মত যোগ্যতা এই মন্ত্রিদলের নেই। মাথাগুণতি মেজরিটির মূল্য খুব বেশি নয়। Quantityর বিচারে এদের স্থান কোথায় হওয়া উচিত সেটা চিন্তার যোগ্য। বাংলার সত্যকারের জনমত ব্যক্ত করবার মত শিক্ষা ও মনোবৃত্তি মন্ত্রিদলে পাওয়া যাবে না। বর্ত্তমান পরিষদে তথা-কথিত "মাইনরিটি" দল শিক্ষানীতির ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গী হারান নি। একটা বৃহত্তর জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এঁরা এই শিক্ষা বিলের বিরুদ্ধতা করছেন। একথা যেন আমরা না ভুলি। শিক্ষা বিল নিয়ে এই যে সংঘর্ষ চলছে এর পরিণতি শুধু বর্ত্তমানেই যদি সীমাবদ্ধ থাকত তা হলে আমরা নিশ্চিন্ত হতাম। এর অনিষ্টকারিতা ভবিষ্যতের দিনগুলির উপর কাল ছায়া মেলে অগ্রসর হবে। এই বিল আইনে পরিণত হলে বাংলার লীগ মন্ত্রিদল হয়তো একটা আত্মপ্রসাদ লাভ করবেন। কিন্তু এর জন্য কতখানি মূল্য দিতে হবে তা বিবেচনা করবার মত স্বচ্ছ দৃষ্টি এঁরা হারিয়েছেন। একটা গোটা জাতির বিশ্বাস ও সহযোগিতা তাঁদের হারাতে হবে।

গত কয়েক সপ্তাহের হাঙ্গামা ও হট্টগোল সম্বন্ধে Opposition দলের দায়িত্ব ও অধিকার কতটুকু তা নিয়ে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় সম্প্রতি পরিষদে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন—I do not feel ashamed to say that it is the privilege of the Opposition to adopt obstructionist tactics whenever suitable occasion arises etc. আমাদের বিশ্বাস opposition ও pandemonium এই দু'য়ের মধ্যে সীমারেখা কোথায় পরিষদের বিরুদ্ধ দল তা ভুলে গেছেন। কুৎসিত গালিগালাজ চড়-চাপড় প্রভৃতি বেপরোয়াভাবে ব্যবহার করবার অধিকার যদি বিরুদ্ধদলের "Privilege"এর অন্তর্ভুক্ত হয় তা হলে শেষ পর্যান্ত এই অধিকার কতদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হবে তা চিন্তার কথা। বিলেতি পার্লামেন্টের অভব্যতার নজির নিয়ে আলোচনা পরিষদকক্ষে সরস বাদানুবাদের সৃষ্টি করতে পারে; কিন্তু তাতে করে কি প্রমাণ হয় আমরা বুঝতে পারি না। একথা অস্বীকার করে লাভ নেই আমাদের গণপ্রতিষ্ঠানগুলি ক্রমশঃ আভিজাত্য হারিয়ে—একটা বাজার বা মেলায় পরিণত হয়েছে। বিলেতি পার্লামেন্টের নজির এখানে খাটে না।

* * *

ডাঃ মুখোপাধ্যায় বিলেতের পার্লামেন্টের ইতিহাস অনুসন্ধান করে কতগুলি সরস ঘটনার উল্লেখ করেছিলেন। Mr. Asquith তখন প্রধান মন্ত্রী। পার্লামেন্টের একটি বিশেষ অধিবেশনে যখন তিনি একটি "resolution" উত্থাপন করবার জন্য ওঠেন, বিরোধীদল অনবরত "Traitor" ইত্যাদি চীৎকার করে তাঁকে বাধা দেয়। যতবারই তিনি Resolutionটি প্রস্তাব করতে অগ্রসর হন ততবারই বিরোধীদল তাঁকে চীৎকার করে বসিয়ে দেয়। Speaker শেষ পর্য্যন্ত বিষয়টি ভোটে না দিয়ে অধিবেশন মুলতুবী রাখতে বাধ্য হন। এ সম্পর্কে Mr. Asquith তাঁর জীবনচরিতে পরে লিখেছেন যে, দেশের জনসাধারণ যাতে তার মতামত জানতে পারে সে জন্য তিনি অধিবেশনের রাত্রেই সংবাদ পত্রে একটি বিবৃতি দেন। এই ঘটনাটির উল্লেখ করে ডাঃ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলেন যে মিঃ গোস্বামীও এই পন্থা অনুসরণ করতে পারতেন। মিঃ গোস্বামীর বক্তব্য কি আমরা জানিনা কিন্তু বিরুদ্ধদলের বিশৃঙ্খলা ও হট্টোগোল সৃষ্টি করবার অধিকার মেনে নিয়ে মন্ত্রিদের যদি সংবাদ পত্রের আশ্রয় নিতে হয় তাহ'লে পরিষদের মর্য্যাদা কতটুকু বজায় থাকে তা বিবেচ্য।

* * *

ডাঃ মুখোপাধ্যায় আর একটি ঘটনার উল্লেখ করেছিলেন। একসময় পার্লামেন্টের একটি অধিবেশনে অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা ও হট্টোগোলের সৃষ্টি হয়। Speaker সংবাদ পান এই উত্তেজনা ও বিশৃঙ্খলা মহিলাদের গ্যালারী পর্য্যন্ত সংক্রামিত হয়েছে। Speaker মহোদয় একটু নোট লিখে উপরের মহিলা গ্যালারীর একজন কলহরতা মহিলাকে সেটী পাঠিয়ে দেন। তিনি এই সময় একটি চমৎকার সরস মন্তব্য করেন—So long I have been keeping the devils below in check without having the necessity of checking the angels above…বর্ত্তমান পরিষদে—"angels"এর উপদ্রবের সংবাদ পাওয়া যায় নি। এতৎসত্ত্বেও Speaker মহোদয়ের অবস্থা হয়েছিল শোচনীয়। Devils ও Deep Sea উভয়ের যোগাযোগে কি অবস্থার সৃষ্টি হত তা আমরা শুধু কল্পনা করতে পারি!
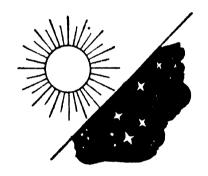
* * *

মিঃ জয়াকরকে লিখিত মহাত্মাজীর পত্র ভারতে এবং বিলেতে যথেষ্ট তিক্ত আলোচনার সৃষ্টি করেছে। এতখানি তিক্ততার সত্যকারের হেতু কিছু নেই। মহাত্মাজীর এই পত্রের একটি বিকৃত সংস্করণ ইতিপূর্ব্বেই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। এই পত্রের দু'টি অংশ সমালোচকদের উত্তেজনার খোরাক জুগিয়েছে। প্রথমতঃ, I can't withdraw the August Resolution. এ সম্পর্কে মহাত্মার সেক্রেটারী যে ভাষ্য করেছেন তা উল্লেখযোগ্য। তাঁর বিবৃতি থেকে ব্যাপারটা পরিষ্কার বোঝা যাবে। এই বিবৃতির পেছনে মহাত্মাজীর মৌন সম্মতি আছে তা ধরে নেওয়া চলে। সেক্রেটারী মহাশয় বলেছেন—"মহাত্মাজীর পত্রের এই অংশটি কংগ্রেসের গঠন-তান্ত্রিক ব্যাপার সম্পর্কিত। ১৯৪২ সালের August Resolution নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি কর্ত্তৃক গৃহীত হয়েছিল এবং একমাত্র এই পরিষদই Resolutionটির রদবদল করতে পারে। মহাত্মা এককভাবে রদবদল করতে পারেন না। দ্বিতীয়তঃ "You may differ about the sanction. It is the breath of life for me." মহাত্মাজী এখানে সত্যাগ্রহের কথা উল্লেখ করেছেন। August Resolutionএর বহু পূর্ব্ব থেকেই মহাত্মাজী তথা কংগ্রেস জাতীয় আন্দোলনে সত্যাগ্রহের উপযোগিতায় বিশ্বাসী। কংগ্রেসের দৃষ্টিভঙ্গী নূতন নয়। কংগ্রেস সত্যাগ্রহের এই Sanctionএর পরিবর্ত্তন করতে পারে। কিন্তু তার পূর্ব্বে প্রয়োজন ভারতের জাতীয় দাবী মেনে নেবার মত সরকারী-নীতির পরিবর্ত্তন। মহাত্মাজীর সেক্রেটারী স্পষ্টই বলেছেন—It is not the last word on this point, সত্যাগ্রহ সম্পর্কে এটা শেষ কথা নয়। এই পত্রের আলোচনা সম্পর্কে "Birmingham Post" যে মন্তব্য করেছেন, তা একশ্রেণীর বৃটিশ নেতৃমহলের মনোবৃত্তির পরিচায়ক। "Gandhi-Myth"—সমূলে বিনষ্ট করবার উৎসাহ কোন কোন বৃটিশ কূটনৈতিক হয়তো পোষণ করেন। কিন্তু সেটা মাত্র গাত্রদাহ ছাড়া আর কিছু নয়।

ঘরে-বাইরে

—কুল্লুক ভট্ট

'সাহিত্য' বলতে যা বুঝতুম, আধুনিক-সাহিত্যিক নামধারীদের দৌরাত্ম্যে তার সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে! সেদিন এক সভায় কথাশিল্পী ৺প্রভাতকুমারের রচনার সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছিল। সভায় দাঁড়িয়ে এক দিগ্‌গজ সম্পাদক বলেছিলেন—প্রভাত-কুমারের রচনা নাকি এযুগে অচল! তাঁর যুগে তিনি শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী বলে' খ্যাতি-অর্জ্জন করেছিলেন সত্য,—কিন্তু সে সব রচনা নাকি এতটুকু সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ যে তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সে সব রচনাও মানুষের বিস্মৃতির তলে লীন হয়েছে! সভায় দাঁড়িয়ে এমন অর্ব্বাচীনের মত মানুষ কথা বলতে পারে, এ জ্ঞান আমাদের ছিল না!

দিগ্‌গজ-সম্পাদকটি কি আধুনিক কথা-শিল্পীর দল যে সব গল্প লিখচেন, সেই মাপ-কাঠি দিয়ে প্রভাতকুমারের রচনার দাম কষেছেন? তা যদি কষে থাকেন তো জিজ্ঞাসা করি, এই যে দলীয় পত্র-পত্রিকাদিতে প্রেমেন্দ্র মিত্র, তারাশঙ্কর, বুদ্ধদেব বসু, প্রবোধ সান্যাল প্রভৃতির নামে 'অহহ' সমালোচনার ফোয়ারা ছুটছে, এসব লেখার পরমায়ু কতদিন? এঁদের লেখা গল্পে আমরা যে সব রক্তমাংসের মানুষকে নিত্যদিন পথে-ঘাটে বৈঠকে মজলিশে দেখছি—যে-সব মানুষ দোষে-গুণে বিজড়িত,—সুখ-দুঃখের আশা-নিরাশায় যে-সব মানুষ দোল্ খেয়ে দিন কাটাচ্ছে,—তাদের কাকেও কি এঁরা তুলির লেখায় এঁকে দেখিয়েছেন? এঁদের নায়ক-নায়িকা তো বিদেশী সাজ-পোষাক ছেড়ে—কোথাও বা বিদেশী পোষাক এঁটে—বিদেশী প্রব্লেম্ নিয়ে বইয়ের খাতা সমলঙ্কৃত করছেন! এঁদের কোনো রচনার সঙ্গে দেশের নাড়ীর এতটুকু যোগ আছে? প্রেমেন্দ্র মিত্র এককালে দুর্গত-দুঃস্থদের বেদনার কথা নিয়ে কবিতা লেখা সুরু করেছিলেন বটে—কিন্তু এখন?

এ-সব গল্প-উপন্যাসের সঙ্গে প্রভাত-কুমারের গল্প কি উপন্যাসের তুলনা করতে বলছি না—পাশাপাশি রেখে একবার মিলিয়ে দেখবেন—যদি নিরপেক্ষ দৃষ্টি থাকে এবং উপলব্ধি করবার শক্তি থাকে তা'হলে নিমেষে দেখবেন, প্রভাতকুমারের আঁকা চরিত্রগুলি জীবন্ত। "বলবান জামাতা" গল্পের জামাতা নলিনীকান্ত থেকে সুরু করে নলিনী-কান্তর শ্বশুর-বাড়ীর দাসী-চাকরটা পর্য্যন্ত আমাদের দেশের লোক—বিলাতী কিম্বা কবিত্বের চংয়ে বিজড়িত হলেও এদেশে এ-সব মানুষের অসদ্ভাব ঘটবে না কোনো কালে! প্রভাতকুমারের "নবীন সন্ন্যাসী," তাঁর "রত্নদীপ", "দেশী-বিলাতী" "ষোড়শী" প্রভৃতি বইগুলি বাংলা-সাহিত্যে 'ক্লাশিক' আসন অধিকার করে থাকবে! আর এই সব আধুনিকদের খোশ-খেয়ালী রচনা—কনটি-নেণ্টের ধার-করা বুলি আর কপচানি,—পণ্ডিত সাজবার প্রাণপণ প্রচেষ্টা—এ-সব এঁরা বেঁচে থাকতেই তো দেখছি ধূমবাষ্প জালে মিলিয়ে যাচ্ছে!

আসল কথা, যা সত্যিকারের সাহিত্য, মানুষ তা আপনা থেকেই উপলব্ধি করতে পারে—A thing of beauty is a joy for ever—সত্যকার রস, মানুষকে চেখে বুঝিয়ে দিতে হয় না। বঙ্কিমচন্দ্র যখন লেখা সুরু করেন তখন দেশের অশিক্ষিত লোক অপরের মুখে তাঁর রচনা শুনে তারিফ করতো—অল্প-শিক্ষিতের দলও বুঝতে পারতো—এ রচনা a thing of beauty—এবং লেখার সুধারস পানে বিমুগ্ধ হতো—কোনো ডাউডেন তাঁদের কাছে লেখা বা কথার ছটায় বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা-সৌকর্য্য বুঝিয়ে না দিলেও।

এই যে আজ ছোটখাট পত্র-পত্রিকার অভ্যুদয় দেখছি—এ-সব পত্র-পত্রিকাকে সাহিত্য-সাধনা করতে দেখছি না তো—এঁরা সুরু করেছেন দালালী! এঁর কাগজে ওঁর লেখার মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হচ্ছে—ওঁর কাগজে হচ্ছে এঁর লেখার নামে স্তুতি-পুষ্পাঞ্জলিদান! একে বলে দালালী! সাহিত্যে এ দালালীর অস্তিত্ব ছিল না—এ-দালালী আজ দেখা দিচ্ছে।

দেখা দেবার কারণ, লেখক বলে' নাম কেনবার দুরাশা।—লেখার জন্য যে গভীর জ্ঞান ও চিন্তাশীলতার প্রয়োজন—যে উদার দৃষ্টি না থাকলে মানুষ লেখক হতে পারে না—সে দৃষ্টি বা চিন্তাশীলতা এঁদের নেই! 'কনটিনেন্টাল্' বই পড়ে পাণ্ডিত্যের হুঙ্কার তুলে এঁরা যান অহমিকা প্রকাশ করতে—কোনোরকমে নাম বাজাতে—সাহিত্য-রচনার নামে এঁরা করতে চান আত্মস্তুতি! এ-আত্মস্তুতির দৃষ্টান্ত আমরা আসছে বারে ধরিয়ে দেবো!

কিন্তু এই সঙ্গে আমরা, পাঠকের দলও, এঁদের বলে রাখি,—আমরা লিখি না বলে' মনে করবেন না, ছাপার অক্ষর দেখলেই তাকে বেদবাক্য বলে মানবো। এঁরা যদি ভেবে থাকেন, এঁরা বেড়ান্ ডালে ডালে—আমরা পাঠকের দলও বেড়াই পাতায়-পাতায়!

প্রত্যাখ্যান

(উপন্যাস)

শ্রীসুধাংশু কুমার হালদার, আই, সি, এস্

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(৬)

উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় অসীম বলল, "ঠিক বলেছেন, এই তো বিধান। ভালবাসা আবার কি? বিবাহই তো সব! প্রেমটা বিবাহের পর একটা উপরি পাওনা মাত্র। আগে পরিণয়, তারপর পরিচয়—আগে লাথ্ পিছে বাত্। গ্র্যাণ্ড্। কবিতাটা চলুক।"

"চিরদিন শুনে আসা এ শাস্ত্রীয় বাণী
নাহি মানি।
শুষ্ক শাস্ত্র বাক্য দিয়ে রমণীর প্রাণ
পঞ্জর পিঞ্জরে বন্দী? ধিক্ এ বিধান!
জীবনের পরীক্ষায় বার'বার হেরে
আত্মপ্রবঞ্চনা হ'তে বাঁচায়ে নিজেরে
অবশেষে এ প্রাণের পুণ্যতম দিনে
সত্য প্রেম লই যেন চিনে—
যে-প্রেম মঞ্জরি উঠে মরুতাপ সহনে দুজনে
অন্তরেতে দাবী যার, নহে শুধু বিবাহ বন্ধনে
বেঁচে রব সে প্রেমের পন্থা চেয়ে চেয়ে—
আমি সেই সত্যনিষ্ঠ মেয়ে।"

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে অসীম বললে, "চমৎকার, চমৎকার! এমন ভাব তুমি কোথা থেকে পেলে! কতই না ভেবেছ তোমার এইটুকু জীবনে! ওগো সত্যনিষ্ঠ মেয়ে, তোমায় নমস্কার করি।" তারপর নিজের বাড়াবাড়িতে নিজেই লজ্জিত হ'য়ে খানিক চুপ ক'রে থেকে বললে, "মাফ করুন, বাধা দিলুম আপনাকে। কবিতাটা চলুক।"

মল্লিকা স্মিতহাস্যে বললেন, "মাফ করবার কিছুই নেই। তবে একবার যখন 'তুমি' বলেছেন, তখন 'আপনি'টা অচল। মনে রাখবেন এ কথা।

নাহি পেলে সে-প্রেমের দেখা
চলে যাবো একা।
বুকে বহি তীব্র জ্বালা রূঢ় আঘাতের
বাহিরিব খুঁজে নিতে এই জগতের
বিচিত্র সম্ভার ভরা সমারোহ মাঝে
পন্থা মোর কোথায় বিরাজে।"

অসীম বললে, "ঠিক আমার মনের কথাটির তুমি কেমন ক'রে খবর পেলে?"

মল্লিকা আবৃত্তি ক'রে চললেন—

"যত বিধি নিষেধের পালা
তাড়না ও শাসনের জ্বালা
তাহা শুধু রমণীর বেলা!
ধর্ম নয়, এ তো ছেলে খেলা।
এই যদি সমাজ বিধান,
সে সমাজে নাহি মোর স্থান।"

অসীম বলল, "ওগো বিদ্রোহিনী, তাহলে তুমি করবে কি? যাবে কোন্ পথে?"

মল্লিকা আবৃত্তি ক'রে গেলেন—

"সনাতন পন্থা দিব ছেড়ে।
তোমরা বলিবে মাথা নেড়ে
চিরদিন এই পথে অন্য সব নারী
চলিয়াছে, মনঃপূত হ'ল না ইহারি!
যেহেতু এ বাঙালীর মেয়ে
তাই চাও মৌনে রবে চেয়ে!
মনে রেখো, একদা এ ধরণীতে নাহি ছিল পথ
সনাতন কোনো মতামত
দূর অতীতের যুগে অজানা কে আমাদেরি মতো
রচে ছিল পন্থা নব নাহি মানি নিন্দা গ্লানি শত—
আজ তাহা হ'ল সনাতন।
বঙ্গবাসী হে বন্ধু সুজন
গলিবে না তোমাদের মন?
চলে যাবো তোমাদের পানে চেয়ে
বাক্যহারা অভিমানী মেয়ে?"

মল্লিকার দু'চোখ বেয়ে জল ঝরে পড়ল।

"একি, তুমি কাঁদছ মল্লিকা! অন্তরের কত গভীর স্তর হ'তে তোমার এ কবিতা যে উঠে এসেছে তা ঐ চোখের জলই সাক্ষী দিচ্ছে আমায় যদি আশীর্ব্বাদ করতে দাও, আমি এই আশীর্ব্বাদই করব যে আদর্শ তুমি গড়ে তুলেছ মনে মনে তা তুমি পাবেই পাবে একদিন।"

মল্লিকা অসীমের দুই পা ছুঁয়ে প্রণাম ক'রে বললেন—

"তোমাদের শুভাশীষ শিরে
একদিন আসিব কি ফিরে?—
পন্থাহীন প্রান্তরেতে পন্থা চিরে চিরে,
যেই পথে রমণীর প্রাণ
দাসত্বশৃঙ্খল ভাঙি স্ববলে লভিবে পরিত্রাণ
আপন গৌরব পরে রচিবে আপন প্রতিষ্ঠান।"

অসীম দু'হাত ধরে মল্লিকাকে তুলে বলল, "পারবে তুমি। আমি জানি না, তোমার মধ্যে কী যে দেখেছি এই স্বল্প ক্ষণে, তবু এ জানি, যদি কেউ নতুন পথ তৈরী করতে পারে,—সে তুমি। কি জানি আজ আমার মুখ দিয়ে কি এ সব কথা বেরুচ্ছে, মনে হচ্ছে সেদিন হয়তো আমি থাকব না, তবু তোমার সেই ভবিষ্যৎ দিনের উজ্জ্বল মহিমাচ্ছটা আমি আজ যেন দেখতে পাচ্ছি। তুমি যেন জয় ক'রে ফিরে এসেছ, তোমার মাথায় যেন কীর্ত্তির উজ্জ্বল মুকুট, সবাই তোমায় প্রণাম করছে, সবাই তোমায় বরণ করছে। সে উৎসবে আমার গান হাওয়ায় হাওয়ায় ভেসে গেল। তুমি একবার যেন চাইলে চারিদিকে, খুঁজলে যেন আমায়, কিন্তু পেলে না দেখা। আজ আমি এ দিনের প্রণাম তোমার সেই বিজয়োৎসবের দিনটির উদ্দেশে ভাসিয়ে দিলাম—

অনাগত যে-দেউলে, হে মল্লিকা, রবে তব নাম
সেইখানে রেখে গেনু আমার প্রণাম।"

মল্লিকার চোখের জল এবার আর বাধা মানল না।···

দু'জনে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইল, মুখে কারো কথা নেই। তারপর অসীম অত্যন্ত স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলল, "অনেক রাত হ'ল, যাও মল্লিকা শুতে যাও।"

"আরেকটু বসি অসীম বাবু, এখানটা চমৎকার।"

"আমি তো এক কথাতেই 'তুমি'তে নেমে এলুম, কিন্তু মেয়েরা কি conservativeই না হয়! তুমি এখনো 'অসীমবাবু' 'আপনি' এসব ছাড়তে পারলে না।" খানিক পরে বলল, "মল্লিকা, তুমি কি ভাবছ বল তো?"

"ভাবছি আপনার, তোমার মুখ দিয়ে একি ভবিষ্যদ্বাণী আজ শুনলুম! তুমি বললে, সবাই আমায় বরণ করবে আর শুধু তোমারি গান হাওয়ায় হাওয়ায় ভেসে যাবে। আমি যেন খুঁজব চারিদিকে, পাবো না তোমার দেখা! কেন বললে এ কথা অসীম?"

"তা আমিও জানি না মল্লিকা। তোমার আবৃত্তি শুনতে শুনতে কি জানি কেন মনে হ'ল কত দিনের চেনা এ সুর, কত যুগের পরিচয় যেন এর সনে, যেন কেবলি পেয়েছি আর হারিয়েছি। মনে হয় এর আগেও যেন কোথায় ছিলে তুমি, এর পরেও থাকবে, আর কেবলি আমি ঘুরে ঘুরে আসব তোমার কাছে, আবার ভেসে চলে যাবো হাওয়ায় হাওয়ায়!"

"কেন? বাঁধা কি তুমি পড়তে চাও না?"

"কে বলে চাই না! বাঁধা পড়বার জন্য আমার সমস্ত দেহমন যে আকুল হ'য়ে আছে! আজ আমি কার মুখ দেখে উঠেছিলুম জানি নে, কিন্তু যখনি দেখলুম তোমায়, অপরাহ্ণ-সূর্য্যের রশ্মি-আভা এসে পড়েছে তোমার মুখে, তখনি মনে মনে জানলুম, পেয়েছি তাকে। যে আমার জীবনের চেয়েও বড়ো, মরণের চেয়েও বড়—তাকে আজ দেখতে পেলুম। আশ্চর্য্য! তখনো তোমার কোন পরিচয়ই পাই নি, নাম পর্য্যন্ত জানতুম না, তবু জানলুম, নয়ন আমার সার্থক হ'ল।

"তবু অসীম এমনও তো হ'তে পারে যে তোমার ভুল হচ্ছে। কত অল্পক্ষণের পরিচয় আমাদের!"

"অল্পক্ষণে কিছু যায় আসে না। চেনবার হ'লে এমমুহূর্ত্তেই চিনে নেওয়া যায়, আবার একশো বছর একসঙ্গে ঘর করলেও চেনা যায় না। কিন্তু একটা কথা জিগেস করি তোমায়। তুমি কি চিনতে পারো নি?"

"হয় তো পেরেছি"—একটু থেমে মল্লিকা বল্লেন। "দেখ মল্লিকা, কত মস্ত বড়লোকের মেয়ে তুমি, আর আমি নিঃস্ব বললেই হয়। তবু আসতে পারবে কি তুমি তোমার সমস্ত বিলাস ত্যাগ ক'রে আমার সঙ্গে দারিদ্র্যব্রত বরণ ক'রে নিতে? আমি তোমায় আরাম দিতে পারব না, ভোগের প্রাচুর্য্য দিতে পারব না,—রুক্ষ দিনের দুঃখকে তোমায় নিত্য করতে হবে জয়,—পায়ে পায়ে পায়ের বাধা ক্ষয় ক'রে ক'রে চলবে তুমি, আর আমি দাঁড়িয়ে থাকব তোমারই মুখের পানে চেয়ে—তোমার চলার চরণমঞ্জীরের তালে তালে দুলে দুলে উঠবে আমার বুক। আসতে পারবে কি তুমি?"

"লোভে আমার বুক কাঁপছে। এমন অগ্নিপরীক্ষাতেও ফেললে তুমি! যদি বলতে, আছে তোমার সাতমহলা রাজপুরী, হীরে মুক্তোর ঝালর দোলানো পালঙ্কে সাত দাসীতে চামর ঢোলাবে, আমাকে করবে তোমার পাটরাণী, তাহ'লে উত্তর পেতে—'না'। কিন্তু এ যে তুমি আমায় মনুষ্যত্বের বন্ধুর পথে ডাক দিয়েছ বন্ধু,—আমি কি আর ঘরে থাকতে পারি? তবু সাবধানী মন বলছে, ধৈর্য্য ধর, ধৈর্য্য ধরো। অসীম, আজ আমি প্রস্তুত নই। আর একদিন তোমার কথার জবাব দেব।"

"আমার সবুর সইবে। পৃথিবীতে কোনো কিছুকেই নিবিড় ক'রে চাইব না, কেড়ে এনে লুঠে এনে মুঠোয় ভরে রাখব না। দেখার জিনিষকে চোখের মাঝখানে রগড়ে দিলেই কি দেখা যায়? চোখ থেকে দূরে রাখলেই তো দেখা। কাছের জিনিষকে যত দূরে নিয়ে যাবে ততই তো সে সুন্দর হ'য়ে অনুপম হ'য়ে দেখা দেবে।"

"তুমিও জেনো, এই নির্লিপ্ত চোখকে মুগ্ধ ক'রে দেবে বলেই তো সুদূর বনানীর তপস্যা।"

"দেখ মল্লিকা, আজ থেকে তোমায় তাহ'লে 'বনমল্লিকা' ব'লে ডাকব। আর আমি হলুম সুদূরপ্রসারি দৃষ্টি। তবু তুমি আমায় ভুল বুঝো না। তোমার পাণির প্রার্থনায় যে সব আই,সি, এস্ আই,পি,'রা গোকুলে বাড়ছেন, আমি তাঁদের পদনখাগ্রেরও যোগ্য নই। তুমি তাঁদের যে কোন একটিকে বেছে নিয়ে সারাজীবন স্বচ্ছন্দ আরামে ওয়াল্‌ট্‌জ্ নেচে ব্রিজ খেলে মুখে রঙ্‌চঙ্ ক'রে বেড়াতে পারবে। আমার নিমন্ত্রণ হ'ল দুঃখের অগ্নিশালায়, আমার আহ্বান ধুলায় ছাওয়া কাঁটায় ছড়ানো সেই পথে—মধ্যাহ্নের খরসূর্য্য যেখানে দগ্ধ করে, শ্রাবণের বর্ষণ যেখানে রেহাই দেয় না।"

"ভুলব না একথা কোনোদিন।"

মল্লিকা শুতে গেল। রাতের তারা হিংস্র শ্বাপদের চোখের মতো জ্বলতে লাগল।

(ক্রমশঃ)

কমরেড লেনিন

—শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

লেনিন ছিলেন দলের চিন্তা-নায়ক। তিনি লণ্ডনে চলে আসার সঙ্গে সঙ্গে দলের আড্ডাও চলে এলো লণ্ডনে। যখন যেমন দরকার নির্দেশ নেবার জন্য দলের আর সবাইকেও লণ্ডনেই আসতে হয়। সেখান থেকে লেনিন সমগ্র য়ুরোপ জুড়ে এমন এক জাল বিস্তার করলেন যার ফলে রুশিয়ার প্রত্যেকটি খবর প্রতিদিন তাঁর কাছে এসে পৌঁছাতো, এবং যখন যেমন দরকার তেম্‌নি আদেশ ও উপদেশ তিনি পাঠিয়ে দিতেন স্বদেশে! রুশিয়ার বিপ্লবীদলের কাজ ঠিকই চলতে লাগলো।

রুশিয়ার ভিতরে যারা লেনিনের মত প্রচার করছিল তারা অনেকেই কারখানার মজুর। কিন্তু সেজন্য 'ছোটলোক বলে কোনদিন তাঁরা উপেক্ষিত হয়নি। বরং তাদের সঙ্গে সোজাসুজি পত্রালাপ করতে লেনিন ভালবাসতেন। মজুর-কমরেডদের কাছে অদৃশ্য কালি দিয়ে তিনি নিয়মিত চিঠি লিখতেন, জিজ্ঞেস করতেন—কাজ কেমন চলছে? শ্রমিকদের অবস্থা কি রকম? আর তার সঙ্গে উপদেশও দিতেন কি ভাবে কাজ করতে হবে, কি করে দ্রুত জনগণকে বিপ্লববাদী করে তুলতে হবে।

শ্রমিক কমরেডরাও প্রয়োজন হলে লেনিনের কাছে চিঠি লিখতেন, আবার বেশী জরুরী কোন সমস্যা থাকলে চলেই আসতেন লেনিনের কাছে।

বিপ্লববাদের ক্রমঃবিকাশ দেখে জারের দল চঞ্চল হ'য়ে উঠলো, সারা রুশিয়ায় হৈ হৈ পড়ে গেল, পুলিশ সহর তোলপাড় করে ফেললো কিন্তু কোথা দিয়ে যে কি হচ্ছে তার সূত্র খুঁজে পেল না। কত জনকে পুলিশ সন্দেহ করলো, কতজনকে ধরলো, কিন্তু আন্দোলন তাতে ব্যাহত হোল না এতটুকু।

শাসকবর্গ ঠিক করলো যে ভাবেই হোক এই জন-জাগরণ রুখতে হবে। না হলে নিজেদের স্বার্থ ও কর্তৃত্ব বজায় রাখা কঠিন হবে। তাদের ইঙ্গিতে পুলিশের অত্যাচার বেড়ে চললো পুর্ণোদ্যমে।

বিপ্লবীদলে দুর্য্যোগ দেখা দিল।

দলপতিরা কিন্তু মাথা গরম করলেন না। যখন এক একজনের মাথার উপর সঙ্কট নেহাৎ ঘনীভূত হয়ে ওঠে, দিক্-নির্দেশ করা দুরূহ হয় তখনই তিনি এসে ওঠেন লেনিনের কাছে।

কখন কে আসবে তার ঠিক নেই, কতদূর থেকে কত কষ্ট সহে আসছে, খাওয়া হয়েছে কি হয়নি, কিছুই জানা নেই। সেজন্য অনেক সময় লেনিনের বসবার ঘরে তাদের জন্য খাবার ঢাকা দেওয়া থাকতো, দরজাও বন্ধ করা হোত না। যাতে বাড়ীতে কেউ না থাকলেও হঠাৎ দলের কেউ এসে পড়লে তার কোন অসুবিধা না হয়, জলযোগ করে স্বচ্ছন্দে সে খানিকক্ষণ বিশ্রাম করতে পারে।

একদিন শেষরাত্রে এক তরুণ যুবক এসে দরজায় ধাক্কা দিল লেনিন তখনও বিছানা ছেড়ে ওঠেননি, যুবককে দেখেই তিনি বিছানার উপর উঠে বসলেন, বললেন—ব্রাব্‌ষ্টেইন, না?

যুবক হেসে বিছানার এক পাশে বসে পড়লো, বললে—কোনদিন চাক্ষুষ পরিচয় হয়নি, তবুও চিনেছেন ঠিক!

তার পরেই দু'জনের মাঝে সুরু হোল রুষ-বিপ্লব সম্পর্কে আলোচনা।

এই যুবকই কমরেড ট্রট্স্কি।
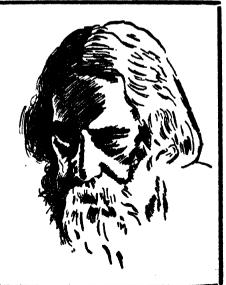
ট্রট্স্কির বয়স তখন বছর তেইশ হবে। লেনিনের চেয়ে দু'বছরের ছোট। সাইবেরিয়ায় তাঁর নির্বাসন হয়েছিল, সেখান থেকে তিনি পালিয়ে এসেছিলেন বরাবর লেনিনের কাছে।

লণ্ডনেই লেনিনের সঙ্গে ট্রটস্কির ঘটলো প্রথম পরিচয়।

ওখানেই ট্রটস্কি থেকে গেলো কিছুদিন।

তারপর আবার ট্রটস্কিকে রুশিয়ায় ফিরতে হোল, ছদ্মবেশে বিপ্লবীদের মধ্যে সংগঠনের প্রসার করার উদ্দেশ্যে।

উনিশ-শো-তিন সালে রুশিয়ার বিপ্লবীদের নেতাদের এক সম্মেলন বসলো লণ্ডনে। ধনিক আর মালিকদের অত্যাচার থেকে কি করে দেশের জনগণের মুক্তি হতে পারে, কি করে তাদের অবস্থার উন্নতি হয় — সেই সব আলোচনাই হোল এই বৈঠকে। এই আলোচনার মধ্যে বিপ্লবীদের দুটি মত দেখা দেয় : নরম আর চরম। নরম দলের নায়ক ছিলেন প্লেখানোভ আর চরম দলের নায়ক ছিলেন লেনিন। বহু তর্ক বিতর্কের পর কে কোন মতের সমর্থক সেই সম্পর্কে ভোট নেওয়া হয়; চরমপন্থীরা পঁচিশ ভোট পায়, নরমপন্থীরা পায় তেইশ। রুশভাষায় বড়দলকে বলে 'বলশেভিকি' আর ছোটদলকে 'মেনশেভিকি'। এই দিন থেকেই লেনিনের দলের নাম হয়ে গেল বলশেভিক দল আর এই দল যে সাম্যের নীতি প্রচার করছিল তার নাম দেওয়া হোল বল্‌শেভিজম্।

ট্রটস্কি

বল্‌শেভিজম্ নতুন কিছু নয়, মার্কসের সাম্যবাদই হচ্ছে এর মূল কথা। বল্‌শেভিক্‌রা বলে—অর্থের প্রয়োজন সব মানুষেরই সমান। সেই জন্য সবাইকার দরকারমত অর্থলাভের সুযোগ থাকা উচিত! সম্পত্তি কারুর ব্যক্তিগত হতে পারে না। একজন প্রয়োজনের চেয়েও বেশী পাবে, আরেকজন খেতে পাবে না, এর চেয়ে বড় দুর্নীতি আর নেই। মানুষের মাঝে শ্রেণীভেদ রাখা চলবে না। গবর্ণমেণ্টের উচিত সমভাবে সকলের কল্যাণ বিধান করা, কারুর ব্যক্তিগত স্বার্থ নিয়ে গবর্ণমেণ্ট চলতে পারে না। কিন্তু আজকের দিনে যে গণতন্ত্র চলছে তা বড়লোকের মুখের পানে তাকিয়ে চলছে, যারা চালাচ্ছে তারা সকলেই ধনিক আর মালিকদের এজেণ্ট, বিত্তশালীর স্বেচ্ছাচারকে তারা সমর্থন করে। এদের উচ্ছেদ করে এই গণতন্ত্রের শেষ করতে হবে, এবং জনগণের গবর্ণমেণ্ট, মানে সোভিয়েটের প্রতিষ্ঠা করতে হবে। মার্কসের নীতিই হবে সোভিয়েটের নীতি। লেনিন বলেন—মার্কসের নীতিকে যারা ছোট করে দেখবার চেষ্টা করবে তাদের বিরুদ্ধে আমরা জীবন পণ করে লড়বো। কুলি মজুরদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হতে আমরা দোব না।

বক্তৃতা করতে ট্রটস্কি ছিলেন অদ্বিতীয়, এই কংগ্রেসে লেনিনকে সমর্থন করে তিনি একটা বক্তৃতা করেন, তাঁর যুক্তি আর বাক্যবাণ বিরোধীদলকে বিপর্যস্ত করে তোলে। তাঁরা ট্রটস্কির নতুন নাম দেয় —'লেনিনের লাঠি'। (ক্রমশঃ)

আজকের পৃথিবী

(গল্প)

—শ্রীনিকুঞ্জ পাত্রী

ঘরের দুয়ারে মৃদু মৃদু আঘাতের শব্দ হোলো।

ভেতর থেকে অতসী বললো: কে?

অমিতাভ বলে: দোরটা খুলে দাও অতসী। ঠক্ কোরে দুয়ার খুলে গেলো। অমিতাভ ঘরের মোধ্যে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয়।

: তুমি যে একেবারে ভিজে গেছ অমিত দা'—একটা ছাতাও নিয়ে বেরুতে নেই! বোলে তাড়াতাড়ি সে অমিতাভের জন্যে একখানা শুকনো কাপড় এনে দেয়। ভিজে কাপড় জামা ছেড়ে রেখে শুক্নো কাপড় জামা পোরে অমিতাভ বলে: খাবার কিছু আছে অতসী?

: একটুখানি দাঁড়াও, বলে অতসী ঘর থেকে বেরিয়ে পাশের ঘরে চলে যায়। সেখান থেকে খানকতক লুচি আর তরকারি এনে ঘরের কোন্ থেকে একটা আসন টেনে অমিতাভকে খেতে দেয় সে। পেটের জ্বালা এমান নিদারুণ যে অমিতাভ গোগ্রাসে সেইগুলো এক নিঃশেষে শেষ কোরে ফেলে। তারপর ঢক্ ঢক্ কোরে দু' গেলাস জল খেয়ে সে জোরে একটা স্বাস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

তার সামনে বোসে অতসী জিজ্ঞাসা করে: এমন অসময়ে ভিজে ভিজে কেন ফিরে এলে? আজ আবার কোন নতুন বিপদ বাধিয়ে আসোনতো?

এক ঝলক্ হেসে নেয় অমিতাভ। তারপর বলে: বিপদকে ছাড়তে চাইলেই কি অমন ছাড়া যায় বোন্। সে যে পরা কাপড়ের মত সর্ব শরীরে জোড়িয়ে থাকে। খুলে ফেলতে গেলে নগ্নতার বীভৎস রূপ হোয়ে দেখা দেয়, আবার জোড়িয়ে রাখলে গরমের তাপে শরীর ভেপসে যায়। তবুও নগ্নতার আবরণের মতই তাকে প্রাণ নিয়ে গ্রহণ কোরতে হয়।

অতসী জানে অমিতাভের জীবনে বিপর্যয় একদিনও কাছছাড়া হবে না। সে চন্দ্র সূর্যের মতই সত্যি। তাই ভয়ে তার প্রাণ কেঁপে উঠলো। সেই সেদিন স্বদেশীয়তার বিরুদ্ধাচারী লোকগুলোর বিরুদ্ধে এমন তীব্র ভাব পোষণ করেছে যে রাজদ্রোহীতার অপরাধে রাজদরবারের রাজবিধানে সে হোয়ে আছে নজরবন্দী। যে একগুঁয়ে লোক সে! এত কোরে সে তাকে অনুনয় করেছে একটা মুচলেখা লিখে দিয়ে সেই আবেষ্টনির মাঝখান থেকে সরিয়ে আনতে। কিন্তু প্রত্যুত্তরে শুধু এই জবাবটুকু এসেছে: জীবন ক্ষণস্থায়ী অতসী। ওকে মুক্ত বিহংগের মতই চোলে ফিরে বেড়াতে দে, বৃদ্ধ ঘোড়ার মত আবদ্ধ রাখতে যাস্ না। গায়ের জোর না থাকলেও বিহংগের কণ্ঠে আছে গান—যেটা দূরের আকাশ থেকে প্রতিধ্বনিত হোয়ে মানব মনকে করে আনন্দিত; আর ঘোড়ার বীভৎস হ্রেষারব প্রাণে ততখানি আনন্দ দেয় না। কাছে যেতে লোক ভয় করে, পাছে পায় আঘাত। অভিসম্পাতকে লোকে ভয় করে কিন্তু আশীর্বাদকে সকলেই কামনা করে যদিও একই মানুষের মুখ থেকে দু'টোর জন্ম। তারপর থেকে অতসী কোন কথা বোলতে সাহস করেনি। তবুও আজ সে অমিতাভের এই আকস্মিক আসাটাকে কোন রকমেই ভালভাবে গ্রহণ কোরতে পারলো না। অনুনয় কোরে বলে: এ পথ ছেড়ে দাও অমিতদা।

: পথ ছাড়লেই কি পথিকের হাঁটার শেষ হয়রে পাগ্‌লি! আলো যতক্ষণ থাকে

কেউ কি আঁধারকে অনুভব করে? যখন আলো যায় নিভে, আঁধার দেয় চোখকে বন্ধ কোরে, তখনই লোক বুঝে আঁধারের বীভৎসতা, আলোর উদারতা। যে পথে আজ আমি পা বাড়িয়েছি সে পথটা জানি শ্বাপদসংকুল, জানি প্রাণের ভয় তাতে আছে—কিন্তু মানের ভয় তো সেখানে নেই বোন্।

: কিন্তু মান নিয়ে কি বাঁচা চলে? অতসী হঠাৎ বোলে ফেলে।

অমিতাভ হো হো কোরে খানিকটা হেসে নেয়। হ্যাঁ এক গাল হাসি—ধারালো ছুরির মত তীক্ষ্ণ, ঝল্‌সানো হাসি। তারপর বলে: বাঁচার কি অর্থ তা জানিনে অতসী; তবে এইটে মনে হয় যে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত অনাহারে অর্দ্ধাহারে পরের মুখাপেক্ষী হোয়ে বেঁচে থেকে কোন লাভ নেই। স্বাচ্ছন্দ্যতার আবরণকে সহজ সরল ভাবে গ্রহণ করবার যাদের এক তিল সাহস বা ক্ষমতা নেই, তাদের এ বাঁচার কতখানি মূল্য আছে? মৃত্যুর পরপারে কি আছে জানি না। সেখানে সুখ কতখানি, শান্তি কতখানি, দুঃখ কতখানি, অশান্তির জমাট আলো বা আঁধার আছে তার হিসাব নিকাশও জানা নেই; কাজেই অনাগতের আশায় অসীম সাগর-সৈকতে বোসে ঢেউ গণার মধ্যে উৎকর্ষ আছে কি?

অতসীর যেন আর সহ্য হয় না। সে বলে: ও সব হেঁয়ালীর কথা রাখ। বল এত রাত্রে ফিরে এলে কেন? জানতো তোমাকে এপাড়ার কেউ দেখতে পারেনা।

: তাই হয়তো আসি! আমার দেখা তারা সহ্য করতে না পারলেও তাদেরকে আমার দেখা বিশেষ প্রয়োজন। জানতো পাহাড় দেখতে হোলে সকলকে পাহাড়ের কাছে যেতে হয়, পাহাড় কাউকে দেখা দিতে আসে না? ওরা আমাকে যত ঘৃণা করে, যত অগ্রাহ্য করে, যত অবহেলা করে, আমার প্রাণ ততই এদের দিকে ঝুঁকে পড়ে। দাঁড়ি-পাল্লা দিয়ে যখন নিজের বিবেককে ওজন কোরতে যাই তখন ওদের অবহেলার দিকটাই আমার কাছে ভারি হয়; তাই ব্যালেন্স রাখতে পারি না—ওদের তালেই তাল ঠুকতে হয়—ওদের কাছে ছুটে আসতে হয়। যাক্ ওসব কথা, আজ তোমার কাছে কেন এসেছি জানো!

না: উত্তর দেয় অতসী।

: আজই, এখুনই আমার সংগে তোমাকে যেতে হবে।

: কোথায় অমিতদা!

: আর প্রশ্ন কোরো না, আমার সংগে যেতে হবে। যদি আমার আশ্রয়ে তোমার থাকতে ইচ্ছে হয়, যদি দাদা বোলে আমাকে গ্রহণ কোরতে চাও—তবে এখনি এই মুহূর্তেই আমার সংগে চোলে এস।

: তোমাকে আমি নিজের দাদার চেয়েও বেশী সম্মান করি—তোমার আশ্রয়ই আমার আশ্রয়। আজই তোমার সংগে বেরিয়ে যেতে পারি অনির্দ্দেশের জগতে। কিন্তু তবুও প্রশ্ন করছি কেন যাবো, এত রাত্রে কোথায় যাবো। সকলেই বা কি বোলবে?

: সকলে যা বোলবে তা তুমিও জানো, আমিও জানি আর যারা বোলবে তারা তো ভাল ভাবেই জানে। কিন্তু এটাও আমরা জানি তুমি আমি কি, কি আমাদের সম্পর্ক, যাচ্ছি কেন? তোমাকে বাঁচাতে। লোলুপ ব্যাঘ্রের জিঘাংসাবৃত্তির হাত থেকে,—আমাকে, তোমাকে, তোমার-আমার মর্যাদাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে।

মাত্র পনেরো দিন তারা এ বাড়ীতে এসেছে। এইখানে তারা দু'জনে থাকে—থাকে নির্জনভাবে। অমিতাভ কোন একটা ফ্যাক্টরীতে কাজ করে। আজ ক'দিন তার নাইট ডিউটী চলেছে। কিন্তু হঠাৎ এই গভীর রাত্রে কেন সে জলে ভিজে ফিরে এলো—তা অতসী বুঝতে পারে না। সে ভ্যাবাচাকা খেয়ে যায়। হাতঘড়িটা দেখে নিয়ে অমিতাভ বলে: এগারোটা। আর এক ঘণ্টা বাকি—

অতসী অমিতাভের সংগে বেরিয়ে যায়। সামনের বড় রাস্তা দিয়ে না গিয়ে সরু অপরিচ্ছন্ন গলি-পথ দিয়ে তারা হাঁটতে থাকে। হাঁটতে হাঁটতে তারা অনেকদূর চোলে যায়। জানাশোনা একটা ধর্মশালায় আশ্রয় নেয়। রাতের অতিথি তারা।

পরের দিন ঠিক সময়ে অমিতাভ ফ্যাক্টরীতে গিয়ে হাজির হয়। বড় সাহেব ডাকে: কাল তুমি না বোলে চলে গেলে কেন অমিতাভ?

: শরীরটা ভাল ছিল না স্যার। তাই চোলে গেছলাম।

: কিন্তু তোমার বাড়ীতো ছিলো খালি? কেউ নেই সেখানে। উদার অন্তঃকরণের কাছে সদ্ প্রশ্নের জবাব দেবার কিছু নেই। তাই অমিতাভ কোন উত্তরই দেয়নি। কিন্তু একখানি কাগজ পেয়েছিলো পরিষ্কার অক্ষরে লেখা···Your service is no longer required.

দুর্বলরা চিরদিনই প্রবলের কাছে এমনি ধারা আঘাত পেয়ে আসে। আত্মমর্যাদা যেন তাদের নেই। নিজের ঘরের শান্তি বজায় রাখবার যোগ্যতাও যেন তারা পেতে পারে না।

লোকের মুখে শোনা গেল বড় সাহেব বলেছে এমন একটা ইয়ে ফোস্‌কে গেলো?

অমিতাভ ধর্মশালায় ফিরে এসে বলে: চাকরীটা ছেড়ে দিলাম অতসী। যাক্ ভালই হোলো, মুক্ত বিহংগের মত তুই আর আমি ভেসে বেড়াতে পারবো।

অতসী প্রশ্ন কোরেছিলো: কেন? এখন খাবে কি?

অমিতাভ বোলেছিলো: ধনের মোহ ত্যাগ করে এলাম কিন্তু সত্যি বলেছি অতসী—মানের বোঝাকে এতটুকু হাল্‌কা কোরতে দিইনি।

সহজ ইঙ্গিত

—শ্রীশ্যাম বসাক

(২)

মধু—
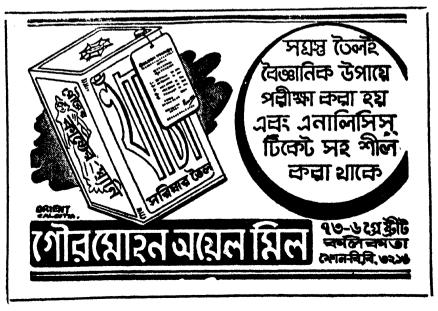
স্বাস্থ্যের পক্ষে মধু একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় জিনিষ বললে কোন প্রকার অত্যুক্তি করা হয় না। শরীরকে সুস্থ রাখার জন্য মধুকে নানাভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে। খাদ্য এবং ওষুধ হিসাবে মধুর যেমন একটা বিশেষ মূল্য আছে তেমনই রূপচর্যায়ও মধু ব্যবহারের যথেষ্ট সার্থকতা দেখা যায়।

মধু হচ্ছে একটী প্রথম শ্রেণীর বর্ণবর্দ্ধক উপকরণ। এই জিনিসটীর প্রয়োগ কখনও ব্যর্থ হয় না, কিছু না কিছু ফল পাওয়া যায়ই। সেটা অবশ্য নির্ভর করে মধুর বিশুদ্ধতার ওপর। মধু অতি সহজেই শরীরের মধ্যে গৃহীত হয়ে নিজের ক্রিয়া প্রকাশ করে। এই জন্যই মধু খুব কম দিনের মধ্যে ভাল ফল দিতে সমর্থ হয়।

বর্ণবর্দ্ধক উপাদান হিসাবে বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরিক উভয়ভাবেই মধু প্রয়োগ করা যেতে পারে। মধু এবং বার্লির জল একটি উপাদেয় পানীয়। নিয়মিত কিছুদিন খাওয়ার পর সহজেই বোঝা যাবে যে গায়ের রং আগেকার চেয়ে অন্ততঃ কিছু উজ্জ্বলও হয়েছে। এছাড়া কোষ্ঠকাঠিন্য, অগ্নিমান্দ্য, শ্বাসনালীর প্রদাহ, হৃদ্‌যন্ত্রের দুর্ব্বলতা প্রভৃতি রোগও প্রশমিত করে।

মধুর সঙ্গে বার্লির পরিবর্ত্তে দুধ মিশিয়েও খাওয়া যেতে পারে। এটীও একটি বলবর্দ্ধক পানীয়। যাঁদেরকে প্রায়ই গান গাইতে হয় এই পানীয় তাঁদের পক্ষে বিশেষভাবে উপযোগী, কেননা কণ্ঠকে সুস্থ রাখে এবং স্বরের উৎকর্ষ সাধন করে।

গায়ের ময়লা তুলে ফেলার জন্য সাবান বা ক্রীমের চেয়েও মধু অধিকতর কার্য্যকরী এবং স্বাস্থ্যবর্দ্ধক। ক্রীমের পরিবর্ত্তে অল্প পরিমাণ মধু কিছু জলের সঙ্গে মিশিয়ে মুখ, ঘাড়, গলা প্রভৃতি অংশে মাখিয়ে কয়েক মিনিট রাখার পর জল দিয়ে ভালভাবে ধুয়ে ফেললে ময়লা অতি সহজেই উঠে যায়। এতেও বর্ণের উৎকর্ষ সাধিত হয়। রক্তের লাল কণিকার ওপর প্রভাব বিস্তার করার জন্যই মধু অন্যতম প্রধান বলবর্দ্ধক উপাদান হিসাবে পরিগণিত হয়। তাছাড়া রক্তবহা নাড়ীমণ্ডলীর নিস্তেজ স্রোতের গতি বাড়িয়ে দেয়।

মধু চুলের স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্য্য যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি করে। মাঝে মাঝে চুলের গোড়ায় মধু মাখলে চুল দৃঢ়মূল ও সতেজ হয় এবং খুস্কিও কমে যায়। খানিকটা জলে চার পাঁচ চামচ মধু গুলে চুলের গোড়ায় ঘষে ঘষে লাগাতে হবে। আধ ঘণ্টা পরে সাবান দিয়ে মাথা ধুয়ে ফেলা দরকার। এতে চুলের গোড়ার ময়লাও অতি সহজেই উঠে যায় এবং চুলও বেশ চক্‌চকে হয়।

গিরিমাটী চূর্ণ মধুর সঙ্গে মিশিয়ে দাঁত মাজলে দাঁত বেশ ঝক্‌ঝকে হয় এবং নানা রোগও সারে।

শরীরের কোন অংশ পুড়ে গেলে সেইস্থানে মধু লাগালে ঘা সহজেই শুকিয়ে যায় এবং দাগ পড়ার তেমন সম্ভাবনা থাকে না।

চোখের পক্ষেও মধু বিশেষভাবে উপকারী, মধু ব্যবহারে চোখের স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকে এবং সৌন্দর্য্যও বাড়ে। এক্ষেত্রে মধু গোলাপজলের সঙ্গে মিশিয়ে ব্যবহার করাই ভাল।

প্রতিদিন সকালে একচামচ মধু জলের সঙ্গে মিশিয়ে পান করলে বল এবং বর্ণ বাড়ে আর শরীরও সুস্থ থাকে।

মধু উষ্ণ অবস্থায় ব্যবহার করা ঠিক নয়। অত্যধিক গাত্রসন্তাপবিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষেও মধু উপযোগী নয়।

ইংরেজী বর্ণমালা প্যাটার্ণ

—শ্রীমতী গায়ত্রী দেবী

"I"

(৯ ঘরে উঠিবে)

১ম কাঁটা—৬ঘর সাদা, ২ঘর কাল, ১ ঘর সাদা।

২য় কাঁটা—১ ঘর কাল, ৩ ঘর সাদা, ২ ঘর কাল, ৩ ঘর সাদা।

৩য় কাঁটা—৩ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ২ ঘর সাদা, ২ ঘর কাল, ১ ঘর সাদা।

৪র্থ কাঁটা—৫ ঘর সাদা, ২ ঘর কাল, ২ ঘর সাদা।

৫ম কাঁটা—২ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ১ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ৪ ঘর সাদা।

৬ষ্ঠ কাঁটা—৩ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ৩ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ১ ঘর সাদা।

৭ম কাঁটা—১ ঘর কাল, ১ ঘর সাদা, ৩ ঘর কাল, ৪ ঘর সাদা।

"K"

(১৪ ঘরে উঠিবে)

১ম কাঁটা—৩ ঘর সাদা, ২ ঘর কাল, ৫ ঘর সাদা, ৩ ঘর কাল, ১ ঘর সাদা।

২য় কাঁটা—১ ঘর কাল, ৩ ঘর সাদা, ২ ঘর কাল, ২ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ২ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ২ ঘর সাদা।

৩য় কাঁটা—৪ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ৩ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ২ ঘর সাদা, ২ ঘর কাল, ১ ঘর সাদা।

৪র্থ কাঁটা—৫ ঘর সাদা, ৪ ঘর কাল, ৫ ঘর সাদা।

৫ম কাঁটা—৪ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ২ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ২ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ৩ ঘর সাদা।

৬ষ্ঠ কাঁটা—২ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ২ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ১ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ২ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ২ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল।

৭ম কাঁটা—১ ঘর সাদা, ২ ঘর কাল, ২ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ৩ ঘর সাদা, ২ ঘর কাল, ৩ ঘর সাদা।

"J"

(১০ ঘরে উঠিবে)

১ম কাঁটা—৭ ঘর সাদা, ২ ঘর কাল, ১ ঘর সাদা।

২য় কাঁটা—১ ঘর কাল, ৩ ঘর সাদা, ২ ঘর কাল, ৪ ঘর সাদা।

৩য় কাঁটা—১ ঘর সাদা, ৮ ঘর কাল, ১ ঘর সাদা।

৪র্থ কাঁটা—৫ ঘর সাদা, ২ ঘর কাল, ১ ঘর সাদা, ২ ঘর কাল।

৫ম কাঁটা—৩ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ১ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ৪ ঘর সাদা।

৬ষ্ঠ কাঁটা—৩ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ১ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ৪ ঘর সাদা।

৭ম কাঁটা—১ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ৩ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ২ ঘর সাদা।

"L"

(১০ ঘরে উঠিবে)

১ম কাঁটা—৩ ঘর সাদা, ৩ ঘর কাল, ১ ঘর সাদা, ২ ঘর কাল, ১ ঘর সাদা।

২য় কাঁটা—১ ঘর কাল, ২ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ৩ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ২ ঘর সাদা।

৩য় কাঁটা—৪ ঘর সাদা, ২ ঘর কাল, ১ ঘর সাদা, ২ ঘর কাল, ১ ঘর সাদা।

৪র্থ কাঁটা—৫ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ৪ ঘর সাদা।

৫ম কাঁটা—১ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ১ ঘর সাদা, ২ ঘর কাল, ৫ ঘর সাদা।

৬ষ্ঠ কাঁটা—৬ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ২ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল।

৭ম কাঁটা—১ ঘর সাদা, ২ ঘর কাল, ৭ ঘর সাদা।

খেলার মাঠে

শ্রীউমেশ মল্লিক বি, এ

গত ১০ই জুন শনিবার মোহনবাগান বনাম ইষ্টবেঙ্গলের চ্যারিটী ম্যাচটিতে শেষোক্ত দলের রক্ষণ বিভাগের দুর্ব্বলতাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রকটিত হয়ে উঠে বেশী। ফলে মোহনবাগান দলের আক্রমণ বিভাগের খেলায় উৎকর্ষের পরিচয় পাওয়া যায়। ইঃ বিঃ দলের মধ্যভাগের অন্যান্য খেলোয়াড়দের মধ্যে তালুকদারের খেলা অতি নিম্নস্তরের হয়। অন্য ২টি হাফ-ব্যাকের খেলাও প্রীতিপূর্ণ হয়ে ওঠে নি। এদের জন্যই ব্যাকে পি, দাসগুপ্ত এবং পি, চক্রবর্ত্তীর উপর চাপ পড়ে বেশী। দাসগুপ্ত ও চক্রবর্ত্তীর খেলাও দর্শনীয় হয়ে উঠে। সর্ব্বাপেক্ষা প্রশংসাযোগ্য খেলা হয় কে, দত্তের। বাস্তবিক কতকগুলি আক্রমণ তিনি যেভাবে ব্যর্থ করে দেন তা তাঁর পক্ষেই সম্ভব এবং তাঁর অকৃপণ প্রশংসা করা উচিত। কে, দত্তের জন্য ইঃ বিঃ দল মাত্র ১ গোলে পরাজিত হয়েছে। নতুবা ফলাফল অন্য হ'ত। ইঃ বিঃ দলের আক্রমণ বিভাগের কোন খেলোয়াড়েরই প্রশংসা করা চলে না। এ দলের পাগসলী, সুনীল ঘোষ, পরেশ মুখার্জ্জীর খেলা মোহনবাগান দলের খেলোয়াড়দের দাপটে নিস্পৃহ হয়ে যায়। খেলার ৭ মিনিটের মধ্যে মোহনবাগান দল প্রয়োজনীয় গোলটি দেয়। এই জয়সূচক গোলটির জন্য নিমু বোসের কৃতিত্ব সর্ব্ববাদিসম্মত। তিনি যে ক্ষিপ্রগতিতে কে, দত্তকে পরাভূত করেন তা সত্যই প্রশংসনীয়।

এদিনে নিমু বোসের খেলা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হয়। এর নিদর্শন-স্বরূপ মিঃ ডি, পি, খৈতান তাঁকে সুবর্ণপদকদ্বারা উৎসাহিত করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। অমল মজুমদার এই গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতায় প্রথম অবতীর্ণ হন, কিন্তু তাঁর খেলা খুব সন্তোষজনক হয় নি। এর ফলে নির্ম্মল চ্যাটার্জ্জীর খেলাও তেমন উল্লেখযোগ্য হয় নি। নির্ম্মল মুখার্জ্জীও বি, বসুর খেলা ভালই হয়। মধ্যভাগে অনিল দে'র খেলা প্রাণস্পর্শী হয়ে উঠে। বস্তুতঃ অনিল দে এবং মান্নার দৃঢ়তায় ইঃ বিঃ দলের সমস্ত আক্রমণ-প্রচেষ্টা প্রতিহত হয়। এদিনে শরৎ দাস এবং আর ভট্টাচার্য্যের খেলাও উল্লেখযোগ্য। যদিও ব্যাকদ্বয়ের দৃঢ়তার ফলে রাম ভট্টাচার্য্যকে বিশেষ বিপর্য্যস্ত হতে হয় নি। তবে খেলার ৫ মিঃ-এর মধ্যে পাগসলীর বলটিকে যেভাবে তিনি রক্ষা করেন তাতে তাঁর প্রশংসা করা উচিত। চ্যারিটি বলে খেলাটিকে নির্দ্দেশ দেওয়া হয় এবং এদিনের সংগৃহীত অর্থ ২৩০০০৲। এ-জয়লাভের ফলে মোহনবাগান দল এখনো অপরাজেয় এবং প্রথমার্দ্ধের খেলায় বি, এণ্ড এ আর দল ব্যতীত অন্য ১১টি খেলায় ২১ পয়েন্ট সংগ্রহ করে লীগে শীর্ষস্থান অধিকার করে আছে।

গত ১৩ই জুন মঙ্গলবার মোহনবাগান দল পুলিশের বিরুদ্ধে ৩-০ গোলে জয়লাভ করে। বি, বসু ২টি এবং কে, রায় একটি গোল দেন। বি, বসু যেভাবে পেনালটী সট করেন, তাতে ভবিষ্যতে তাঁর পেনালটী সট আর না করাই উচিত।

গত বুধবার ৭ই জুন মহমেডান দল রেল দলকে ২-০ গোলে পরাজিত করে। এ-দিনে ফুটবল কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক অনুমতিপত্র পাওয়ায় মোহিনী ব্যানার্জী রেল দলের পক্ষে যোগদান করেন। মহমেডান দলের পক্ষে নূর মহম্মদ (বড়) যোগদান করলেও তাঁর খেলা মোটেই প্রীতিপ্রদ হন নি। রেল দলের পরাজয়ের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা আক্রমণ বিভাগের ব্যর্থতা। বি, করের উপর্য্যুপরী সহজ সুযোগ নষ্ট করা তাঁর সুনামের পরিপন্থী। নিলু মুখার্জীর খেলা মধ্যভাগে আকর্ষণীয় হয়ে উঠে। মহমেডান দলের পক্ষে মমতাজ এবং নূর মহম্মদ (বড়) গোল ২টি স্কোর করেন।

গত শুক্রবারে ৯ই জুন মহমেডান দল ডালহৌসী দলকে ৫-০ গোলে পরাজিত করে ২টি পয়েন্ট সংগ্রহ করে। এ দিনে মহমেডান দলের খেলা সুন্দর হয়ে উঠে। আক্রমণ বিভাগের খেলোয়াড়দের একাগ্রতায় দলটির বিশেষ উন্নতি দেখা যায়। রসিদ ২টি, তাহের ২টি এবং নূর মহম্মদ ১টি গোল দেন।

গত বৃহস্পতিবার ৮ই জুন ভবানীপুর দল রেঞ্জার্সের বিরুদ্ধে অমীমাংসিতভাবে খেলা শেষ করেছে। ভবানীপুর দল এদিন পেনালটী গোলের সুবর্ণ সুযোগ অপব্যবহার করে, ফলে ২টি প্রয়োজনীয় পয়েন্ট নষ্ট করে। এতদ্ব্যতীত এ দলের বহু সুযোগের অপব্যবহার হয়। রেঞ্জার্স মঙ্গলবার দিন বি, এণ্ড এ, আরকে ১-০ গোলে পরাজিত করে সকলকে বিস্মিত করেছে।

৮ই জুন কালীঘাট দল এরিয়ান্সের বিপক্ষে ১-১ গোলে খেলা শেষ করায় খেলার ফলাফলের কোন মীমাংসা হয় নি।

ফুটবল লীগে কার কিরূপ স্থান :—

(রবিবার ১১ই জুন পর্য্যন্ত)

মোহনবাগান	১১	১০	১	০	২১	৩	২১
ইঃ বিঃ	১২	৯	১	২	২৫	৮	১৯
মহমেডান স্পোঃ	১১	৮	১	২	১৭	৪	১৭
বি এণ্ড এ আর	১২	৮	২	২	২৩	১৪	১৭
ক্যালকাটা	১২	৬	১	৫	১১	১৪	১৩

ইত্যাদি

বঙ্গীয় বালক-সমিতি দুর্গাচরণ স্পোঃ ক্লাব কর্ত্তৃক ৪-২ গোলে পরাজিত হয়েছে। রবী ৩টি, হাবু ১টি এবং খগেন ২টি গোল দেয়। ফেলুর খেলা মন্দ হয় নি।

গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন—

দীপালীর বর্ত্তমান সংখ্যা (২৪শ) প্রকাশের সহিত আমাদের বর্ত্তমান বর্ষের প্রথমার্দ্ধ শেষ হইল। সুতরাং যাঁহাদের প্রথমার্দ্ধের দরুণ ষাণ্মাসিক চাঁদা দেওয়া আছে, তাঁহারা অবিলম্বে দ্বিতীয়ার্দ্ধের চাঁদা ৬৷৷০ পাঠাইয়া দিলেই নিয়মিতরূপে কাগজ যাইতে থাকিবে। টাকা পাঠাইতে বিলম্ব ঘটিবার ফলে হয়ত কোনও সংখ্যা পাওয়া সম্ভবপর নাও হইতে পারে ইহা পূর্ব্বাহ্ণেই জানান যাইতেছে।

গত এপ্রিল মাস হইতে দীপালীর মূল্য ৵০ স্থলে প্রতি কপি।০ ধার্য্য হইবার ফলে যাঁহাদের নিকট হইতে ষাণ্মাষিক অতিরিক্ত চাঁদা নূতন হারের পূরনার্থে আজও পাওয়া যায় নাই তাঁহাদেরও উহা অবিলম্বে পাঠাইতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

আশাকরি সকলের নিকট হইতে যেরূপ সহৃদয়তা ও সহানুভূতি দীপালী পাইয়া আসিতেছে তাহা আরও বর্দ্ধিত হইবে। —ম্যানেজার

'দীপালী' কাজি নজরুল সাহায্য ভাণ্ডার

—প্রাপ্তিস্বীকার—

১।	মিঃ এস্, ওয়াজেদ আলি	২৫৲ টাকা
২।	শ্রীযুক্তা রেখা দেবী	৫৲ "
৩।	মিঃ এস সামসের আলি	১৫৲ "
৪।	শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়	৫৲ "
৫।	মিঃ এ, রাউফ বি-এল	২৲ "
৬।	শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বসু	৫৲ "
৭।	শ্রীযুক্ত অনিল দেব	২৲ "
৮।	মাষ্টার বদরুদ্দীন ওয়াজেদ আলি	১৲ "

মোট ৬০৲ টাকা

এস্ ওয়াজেদ আলি — কোষাধ্যক্ষ
শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু — সম্পাদক

১৫ই জুন ১৯৪৪

('দীপালী' কাজি নজরুল সাহায্য ভাণ্ডার)

বিজনদা'র চিঠি

আমার আদুরে ভাই বোনেরা—

কিছুদিন আগে আমাদের এক বোন আর এক ভাইকে হারিয়েছিলুম; আবার গত ৭ই জুন আসরের আর একজন প্রিয় বোন কুমারী বীণাপাণি কর (২৩৬) আমাদের ছেড়ে চিরকালের মত চলে গিয়েছে। মৃত্যুর পূর্ব্বে

বহুদিন যাবৎ বোনটীকে রোগশয্যায় আশ্রয় নিতে হয়েছিল।...একটার পর একটা আঘাত আমাদের মনে এসে লাগছে, কিন্তু তাতে আমরা যেন মুসড়ে না পড়ি, সেটা সহ্য করবার শক্তি যেন আমরা না হারাই, আর বোনটীর আত্মা যাতে শান্তিলাভ করে সেই প্রার্থনা ছাড়া আজ আর ভগবানের কাছে জানাবার আমাদের কিছু নেই।...আজ আসি। তোমরা স্নেহ নিও।

তোমাদের : বিজনদা

রাণু আর তা'র দাদা

(৫)

—রূপকুমার—

বোনটী রাণু,

তোর এবারের চিঠিখানা পড়ে আশ্বস্ত হলাম যে আমার এটা পণ্ডশ্রম হচ্ছে না জেনে। বেশ আমি সেদিন পরীক্ষা করলে যদি তাতে কৃতকার্য্য লাভ করতে পারিস দেখি, তা' হলে তোকে পুরস্কৃত করবো। কিন্তু তুই সেদিন আমায় গুরু-দক্ষিণা দিবি তো?...সূর্য্য চুপটি করে বসে আছে মানে,সে চারিদিকে ঘুরে বেড়াতে পারে না। নিজের মেরুদণ্ডের ওপর সে পূব থেকে পশ্চিম দিকে প্রায় ছাব্বিশ দিনে একবার ঘুরে আসে।...

সূর্য্য তৈরী হয়েছে প্রায় ষাট রকম উপাদানে। ওর মধ্যে রেডিয়াম্, সোডিয়াম্, ম্যাগনেসিয়াম্, ক্যালসিয়াম্, এ্যালুমিনিয়াম, সীসা ইত্যাদি ধাতু, আর অক্সিজেন, হাইড্রোজেন্ প্রভৃতি গ্যাস বাষ্পাকারে আছে। অর্থাৎ সূর্য্যদেব হচ্ছেন একটি গ্যাসীয় পদার্থ।...এখন নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছিস যে ওর দেহ হচ্ছে এক বিরাট অগ্নিময় গ্যাস-পিণ্ড। তার চারধারে উজ্জ্বল ও প্রচণ্ড উত্তপ্ত বায়ুরাশি হাজার হাজার মাইল পর্য্যন্ত জ্বলন্ত অবস্থায় বিস্তৃত হ'য়ে আছে।...পৃথিবী থেকে সূর্য্য তেরো লক্ষ গুণ বড়। আর সূর্য্য থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে সময় লাগে আট মিনিট আঠারো সেকেণ্ড। আলোর গতি তোর নিশ্চয়ই জানা নেই, তাই এই প্রসঙ্গে ওর গতিটাও বলা ভালো; কেমন তাই নয় কি? আলোর গতি হচ্ছে প্রতি সেকেণ্ডে একলক্ষ ছিয়াশী হাজার মাইল।...

সূর্য্যের সম্বন্ধে মোটামুটি সব কিছুই জ্ঞান লাভ করলি আশা করি। আসছে বারের চিঠিতে তোর চাঁদের সম্বন্ধে প্রশ্ন কি নিয়ে তা জানতে পারলে পরে জানাবো।... ভালোবাসা রইলো।

মনে রেখো—

"যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই,
পাইলে পাইতে পার অমূল্য রতন।"

—ভারতচন্দ্র।

ওদেশের গল্প

—কুমারী ঝরণা দেবী (২৭৮)

বার্লিনের একটি ছেলে পিয়ানো বাজিয়ে তেরো বছর বয়সেই অদ্ভুত নাম করেছে। সুরের খেলায় তার এমনি আশ্চর্য্য নৈপুণ্য। ছেলেটির নাম ফেলিক্স মেণ্ডেলসন্।

একদিন তার সঙ্গীত শিক্ষক জেল্টার বললেন "ফেলিক্স, বেড়াতে যাবে?" ফেলিক্স জিজ্ঞেস করলে "কোথায়?" জেল্টার উত্তর দিলেন "উইমার সহরে।" "উইমার?" আনন্দে নেচে উঠল ফেলিক্সের মন। একে তো অত দূরের একটা সুন্দর সহরে বেড়াতে যাওয়াই কত আনন্দের কথা—তা ছাড়া, এ যে উইমার! ফেলিক্স জানে, ঐ উইমার শহরেই বাস করেন জার্ম্মানির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানুষ—জগতের সকল দেশের সকল লোকেই যাকে জানে, মানে, পূজো করে—সেই শ্রেষ্ঠ মহাকবি ও শ্রেষ্ঠ দার্শনিক গ্যেটে। যে শহরে এই মহামনীষী মহাকবির বাস, সে শহর একবার চোখে দেখতে পাওয়াই যে ভাগ্যের কথা। ফেলিক্স আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল, বললে—"আমি যাব। আপনি আমায় নিয়ে চলুন।"

দুজনে এলেন উইমারে। জেল্টার বললেন, "এই সেই শহর, গ্যেটে এইখানেই

থাকেন। ঐ যে গাছের ছায়ায় ঢাকা সুন্দর রাস্তাটি—কবি মাঝে মাঝে বেড়াতে আসেন ঐ পথে। ঐ দেয়ালটির ওপাশেই তাঁর বাগান, আর—ঐ চেয়ে দেখ, ঐ তাঁর বাড়ীর ছাদ। এই যে, এই সামনেই বাড়ীর সদর দরজা—চলো আমরা ভিতরে যাই, আমরা দু'জনে—তুমি আর আমি।"

বালক বিস্ময়ে অবাক। বললে, "ভিতরে যাব? কবিকে চোখে দেখতে পাব?" জেলটার বললেন "পাবে বই কি! কবি যে নিজেই তোমাকে দেখতে চেয়েছেন। তাঁর সাধ হয়েছে তুমি তাঁকে পিয়ানো বাজিয়ে শোনাবে।"

বাগানের পথেই গ্যেটের সঙ্গে দেখা হল। এঁদের পেয়ে কবি খুসী হয়ে বলে উঠলেন, "আরে জেলটার যে। এসো। তোমার সঙ্গে এটি বুঝি তোমার সেই প্রিয় ছাত্র ফেলিক্স মেণ্ডেলসন? বার্লিন থেকে এনেছ ওকে ধরে? বেশ, বেশ চলো ভিতরে চলো।"

যে ঘরটিতে তাঁরা এসে বসলেন, সেটি বেশ প্রশস্ত। ঘরের এক কোণে পিয়ানো। কবির কয়েকটি বিশিষ্ট বন্ধুও এলেন নিমন্ত্রিত হয়ে। তখন ফেলিক্স মেণ্ডেলসন্ পিয়ানোর সামনে গিয়ে বসল এঁদের বাজনা শোনাতে। প্রথমে তার হাত হয়তো একটু কেঁপে গেল, কিন্তু সে আর কতক্ষণ? তারপর সুরের নেশায় তন্ময় হয়ে বিশ্ব সংসার ভুলে গিয়ে অপূর্ব্ব নৈপুণ্যে, অসীম উৎসাহে সে অবিশ্রাম বাজিয়ে চলল। জগতের কোনো রাজা বা কোনো সম্রাটের সামনেও বোধ করি সে এতটা দরদ দিয়ে এমন করে প্রাণ ঢেলে দিয়ে বাজাতে পারত না! সে জানে, রাজা আর সম্রাটের কথা লোকে একদিন ভুলে যাবেই, কিন্তু এই শুভ্রকেশ বৃদ্ধ কবিকে মানুষ কোনদিন ভুলতে পারবে না! মরবে সবাই, মৃত্যু নেই শুধু কবির!

একটি ঘণ্টা কেটে গেল! সুরের সেই রেশটি মিলিয়ে যেতে কবি উঠে দাঁড়ালেন। তার পর ধীরে ধীরে বালকের সামনে এসে দাঁড়িয়ে সস্নেহে তার কাঁধে হাত রেখে বললেন—"কি পুরস্কার তোমায় দেব আমি? বলো তুমি কী চাও!"

ফেলিক্স মেণ্ডেলসন্ এক মুহূর্ত্ত কী ভাবলে, তারপর মহাকবির মুখের পানে চোখ তুলে চেয়ে বললে—"আপনি শুধু একটিবার কপালে চুম্বন করুন—আর আমি কিছুই চাইনে।"

* সংগ্রহ

নতুন বই

জীবনের জয়গান: শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক: ছোটদের আসর, ১৬।এ, ডফ ষ্ট্রীট, কলিকাতা; দাম: আট আনা।

ছেলেমেয়েদের জন্যে এই বইখানি হচ্ছে 'ছোটদের আসর গ্রন্থমালার' প্রথম গ্রন্থ। এই গ্রন্থখানির লেখক হচ্ছেন তোমাদের সবার প্রিয় বেতারের গল্পদাদুর আসরের "দাদুমণি"। এতে ইনি তোমাদের কাছে বলেছেন কয়েকজন মানুষের জীবনের রোমাঞ্চকর কাহিনী...যা দেবে তোমাদের সান্ত্বনা...দেবে আশ্বাস...দেবে তোমাদের জীবনপথে এগিয়ে চলার দুঃসাহসিকতা।

বইখানা পড়ে আমরাই যখন খুসী হয়েছি, তখন তোমরা যে তা পড়ে আনন্দ আর জ্ঞান দুইই লাভ করবে তা' আমরা নিশ্চয় করে বলতে পারি।

ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই ভাল হয়েছে।

নানাকথা

অল্ বেঙ্গল কালচারাল এসোসিয়েশন

গত ৮ই জুন সন্ধ্যায় ৪৭, হালদারপাড়া রোডে শ্রীযুত বিমল ভূষণের উদ্যোগে "এ-বি-সি-এ"র মাসিক সঙ্গীতানুষ্ঠান "পূর্ণিমা সম্মিলনী" সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এতদুপলক্ষে কুমার শচীন্দ্র দেব বর্ম্মা, পঙ্কজ কুমার মল্লিক, রেবতী মুখোপাধ্যায়, সুকুমার মণ্ডল ও শ্রীমান প্রভাত ভূষণের গান, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবৃত্তি, বিশ্বেশ্বর মল্লিকের কৌতুক নক্সা, ডাঃ যশোদাদুলাল মণ্ডলের হাসির গান, ও বিনয় মল্লিকের স্বরানুকৃতি বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছিল।

বালিকা ব্যায়াম সমিতি

গত ১২শে মে শুক্রবার (হৃষিকেশ পার্ক) বালিকা ব্যায়াম সমিতি কর্ত্তৃক রঙমহলে "নদের পাগল" নাটক অভিনয় হইয়া গিয়াছে। প্রথমেই ব্যাণ্ড, ড্রিল, ছুরি খেলা প্রভৃতি ক্রীড়াচাতুর্য্য দেখান হয়। ইহাদের অভিনয়ও বিশেষ মনোজ্ঞ হইয়াছিল। সুন্দর অভিনয় করিয়া শ্রীমতী শেফালী, কল্পনা, গীতা, আরতি, পদ্ম ও ললিতা বিশেষ পুরস্কার লাভ করেন।

ভবানীপুর সঙ্গীত সম্মিলনী

সম্মিলনীর গত ৪ঠা জুন (১৯৪৪) তারিখের রবি-বাসরীয় অধিবেশনে কুমারী রত্নম মহাদেবের সেতার বাদ্যের আয়োজন হইয়াছিল। কুমারী রত্নম্ বয়সে কিশোরী, কিন্তু বাগেশ্রী, ভীম-পলশ্রী, মিঞা-কী-মল্লার প্রভৃতি রাগের সাধনা-সাপেক্ষ বৈশিষ্ট্যগুলি এমনই নৈপুণ্যের সহিত ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন যে, শ্রোতৃমণ্ডলী তাঁর রস বিশ্লেষণের অলৌকিক ক্ষমতা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন।

কুমারী রত্নম্ শ্রীযুত ইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ছাত্রী। আমরা এই বালিকার দীর্ঘ জীবন ও সাধনার সিদ্ধি কামনা করি।

নিমাই মেমোরিয়াল চ্যালেঞ্জ কাপ

হাওড়া বসন্ত মিলনী পরিচালিত ৫৩, কাঁটাপুকুর তৃতীয় বাই লেনস্থ ভূতপূর্ব্ব বি-টি-এস-সির ময়দানে অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও "নিমাই মেমোরিয়াল চ্যালেঞ্জ কাপ" প্রতিযোগিতার খেলা অনুষ্ঠিত হইবে। যে সকল প্রতিষ্ঠান উপরোক্ত প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে ইচ্ছুক তাহাদিগকে ১৮ই জুনের মধ্যে ৫৩/৩ (বসন্ত মিলনীর কার্য্যালয়) কাঁটাপুকুর তৃতীয় বাই লেনস্থ শ্রীযুক্ত মুরালী মোহন নন্দীর নিকট আবেদনপত্র দাখিল করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

নাটমণ্ডপ

নিউ থিয়েটার্স লিঃ

পরিচালক বিমল রায় তাঁহার "উদয়ের পথে"র শূটিং শেষ করিয়াছেন। তরুণ সাহিত্যিক জ্যোতির্ম্ময় রায় ইহার কাহিনী রচনা করিয়াছেন। রাধামোহন ভট্টাচার্য্য ও বিনতা বসু নায়ক ও নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছেন এবং অন্যান্য ভূমিকায় বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, দেবী মুখার্জ্জী, জীবেন বসু, রেখা মিত্র, দেববালা প্রভৃতি চিত্রাবতরণ করিয়াছেন। ছবিখানির এখন সম্পাদনা চলিতেছে। ইহার সঙ্গীত পরিচালনা করিয়াছেন রাইচাঁদ বড়াল।

"দুই পুরুষে"রও সম্পাদনা চলিতেছে। পরিচালক সুবোধ মিত্র নিজেই এ ভার লইয়াছেন। উপরোক্ত দুইখানি ছবির মধ্যে কোনখানি যে প্রথম মুক্তিলাভ করিবে তাহা আমরা আগামী সপ্তাহে জানাইতে পারিব।

হেমচন্দ্রের পরিচালনায় "My Sister"-এর কাজ দ্রুত চলিতেছে।

শ্রীযুক্ত নীতীশচন্দ্র লাহিড়ী

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, কলম্বিয়া ফিল্মস্ অব ইণ্ডিয়া লিঃ'র জেনারেল ম্যানেজার এবং বাংলার চিত্রশিল্পের অন্যতম পাইওনীয়ার শ্রীযুক্ত নীতীশচন্দ্র লাহিড়ী মহাশয় আগামী বৎসরের জন্য কলিকাতা রোটারী ক্লাবের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। রোটারী ক্লাবের পরিচয় নিষ্প্রয়োজন, কারণ ইহা পৃথিবীর সর্ব্বদেশে বিস্তৃত; প্রায় ২০০,০০০ ক্লাব পৃথিবীর সর্ব্বত্র আছে। এ বৎসর দুঃস্থ ও অনশনক্লিষ্টদের সাহায্যার্থে স্থানীয় রোটারী ক্লাবের সেবা অতীব প্রশংসনীয়। শ্রীযুক্ত লাহিড়ীর এই সম্মানে আমাদের দেশের চিত্রশিল্পও যে গৌরবান্বিত হইল তাহা বলাই বাহুল্য। আমরা শ্রীযুক্ত লাহিড়ীর সর্ব্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।

মহেশতলায় নাট্যাভিনয়

গতপূর্ব্ব শনিবার মহেশতলা ক্লাব এণ্ড লাইব্রেরী" কর্তৃক 'কেদার রায়' অভিনীত হইয়াছে, এই উৎসবে স্থানীয় বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। অভিনয়ের মধ্যে সত্যেন মুখোপাধ্যায়ের "কার্ভালো" এবং অমর গোস্বামীর ওসমান খাঁ চমৎকার হয়। শ্রীমন্তর ভূমিকায় জীবন গোস্বামীর অভিনয় এবং নাম ভূমিকায় ইন্দুবাবুর অভিনয় একেবারেই সুবিধাজনক হয় নাই। তাহা ছাড়া সুশান্ত ব্যানার্জীর মায়া, ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের মানসিংহ মন্দ হয় নাই। কার্ভালো অনেকগুলি মেডেল পাইয়াছেন, সোনা সঙ্গীতালয়ের পক্ষ হইতে বারীন্দ্র কুমার কার্ভালোকে একটি মেডেল দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

সহরের সিনেমায়

এ সপ্তাহের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য আকর্ষণ হইল ওয়াদিয়া মুভীটোনের "বিশ্বাস" প্যারামাউণ্ট ও গণেশ টকী হাউসে। ইহাতে অভিনয় করিয়াছেন মেহতাব, সুরেন্দ্র, সুলোচনা চ্যাটার্জ্জী, বেবী মাধুরী প্রভৃতি। বম্বে পিকচার্স কর্পোরেশান ছবিখানির পরিবেশক।

রঙমহলে নৃত্যানুষ্ঠান

গত সোমবার ও মঙ্গলবার ১২ই ও ১৩ই জুন যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালের সাহায্যকল্পে ভারতীয় কলাসঙ্ঘ কর্তৃক যে নৃত্যানুষ্ঠানের আয়োজন হইয়াছিল তাহা বিশেষভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। এই নৃত্যানুষ্ঠানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণ ছিল কুমারী মঞ্জুলিকা ভাদুড়ীর নৃত্য ও রবি রায় চৌধুরীর সঙ্গীত পরিচালনা। সর্ব্বাপেক্ষা আমাদের ভাল লাগিয়াছে মঞ্জুলিকা ভাদুড়ীর "টোড়ী", মঞ্জুলিকা ও ললিতার 'জলকন্যা' এবং মঞ্জুলিকার 'তাজের স্বপ্ন'। রবি রায় চৌধুরীর সঙ্গীত পরিচালনা যে আবহাওয়ার সৃষ্টি করে তাহা অনবদ্য। রবিবাবু যে একজন সত্যিকারের গুণী এবং ভারতের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতস্রষ্টাদের মধ্যে অন্যতম তাহা তিনি পুনরায় সপ্রমান করিলেন। দ্বিতীয় দিন অসুস্থ অবস্থাতেও তিনি যেরূপ সুচারুরূপে তাঁহার কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন তাহা সত্যই বিস্ময়কর। শ্রীমতী মঞ্জুলিকার নাচগুলির মধ্যে যে উচ্চশ্রেণীর পরিকল্পনা ও নৃত্যনৈপুণ্য দেখা যায় তাহাতে তাঁহাকে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠা নৃত্যশিল্পী বলিলেও কোনরূপ অত্যুক্তি হইবে না। "Arabian knight"নৃত্যটিও আমাদের ভাল লাগিয়াছে। যদিও এ নাচটিকে যে-কোনো দেশীয় knight বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারিত।

রূপবাণীতে "সহর থেকে দূরে"র রজত-জয়ন্তী উৎসব

গত রবিবার ১১ই জুন রূপবাণী সিনেমায় বহু সমাগত ভদ্রমহোদয়ের উপস্থিতিতে রূপবাণীর রূপালী পর্দ্দায় ইষ্টার্ণ টকীজের অমর আলেখ্য "সহর থেকে দূরে"র বহু আকাঙ্ক্ষিত রজত-জয়ন্তী উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। বহু চিত্র নির্ম্মাতা, চিত্র পরিবেশক, চিত্র-প্রদর্শক, অভিনেতা-অভিনেত্রী চিত্রশিল্পী ও সাংবাদিক এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। বাংলা চিত্র ব্যবসায়ের জনক শ্রীযুক্ত অনাদিনাথ বসু মহাশয় এই অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন এবং ভারত প্রসিদ্ধ চিত্র পরিচালক শ্রীযুক্ত দেবকীকুমার বসু মহাশয় প্রধান অতিথি ছিলেন।

সকাল ৮॥০ ঘটিকায় "সহর থেকে দূরে" চিত্রখানি প্রদর্শন করিয়া অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। সভাপতি নির্ব্বাচন ও সমর্থনের পর প্রাতঃকালীন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের প্রথম কার্য্যসূচী ছিল এই চিত্রের সুযোগ্য পরিচালক শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়কে অভিনন্দন পত্র প্রদান। ইষ্টার্ণ টকীজ লিমিটেডের প্রযোজক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্ররঞ্জন সরকার এই অভিনন্দন পত্রখানি পাঠ করেন। অনন্ত বারিধি বক্ষে ক্ষুদ্র নিমজ্জমান তরণীর মত এই প্রতিষ্ঠান অকূল পাথারে পতিত হইয়াছিল তখন কেমন করিয়া শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় তাঁহার সহযোগীতায় ও সুযোগ্য পরিচালনাধীনে এই প্রতিষ্ঠানকে নব সুষমামণ্ডিত করিয়া নব রসে-রূপে গঠন করিয়া তুলেন তাহাই স্বীকার করিয়া শ্রীযুক্ত সরকার গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি আরও বলেন যে ছবিখানি বাংলার যে কোন চিত্রগৃহে প্রদর্শিত হইতেছে সেইখানেই রেকর্ড ভঙ্গ করিয়া বাংলা চিত্রজগতে এক নূতন রেকর্ড স্থাপন করিতেছে।

সভাপতি মহাশয় শারীরিক অসুস্থতা সত্বেও সভাপতিত্ব গ্রহণ করিয়া এবং যাহাতে এই প্রতিষ্ঠান অদূর ভবিষ্যতে এইরূপ আরও সাফল্যমণ্ডিত চিত্র নির্ম্মাণ করিতে পারেন, সেইরূপ কামনা করিয়া এক সাবলীল ও চিত্তাকর্ষক অভিভাষণ পাঠ করেন।

প্রধান অতিথি শ্রীযুক্ত দেবকীকুমার বসু তাঁহার অভিভাষণ প্রসঙ্গে বলেন যে, বন্ধুবর শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় "সহর থেকে দূরে" ছবিখানি নির্ম্মাণ করিয়া যে অসামান্য প্রতিভার এবং কলাজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন তাহা সত্যই প্রশংসার্হ। উপর্য্যুপরি "নন্দিনী" "বন্দী" ও "সহর থেকে দূরের" মত তিনখানি অসামান্য চিত্র পরিচালনা যে কোনও পরিচালকের পক্ষে গর্ব্বের বস্তু। বাংলার সাধারণ জীবনের অপরূপ আলেখ্য গঠনে শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় যে রচিজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন তাহা শ্রীযুক্ত বসুকে অনুপ্রাণিত করে এবং শ্রীযুক্ত বসুর অভিভাষণ সকলকে অপূর্ব্ব তৃপ্তি দান করে।

তাহার পর পণ্ডিত অশোকনাথ শাস্ত্রী মহাশয় ও শ্রীযুক্ত সুধীরেন্দ্র সান্যালের বক্তৃতার প্রত্যুত্তরে শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় একটী সময়োচিত বক্তৃতা দেন।

"সহর থেকে দূরের" সাফল্যের জন্য প্রযোজকের বিচার অনুযায়ী শ্রীযুক্ত জহর গাঙ্গুলী, ধীরাজ ভট্টাচার্য্য, ফণি রায়, নরেশ মিত্র, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, নবদ্বীপ হালদার পশুপতি কুণ্ডু, অজয় কর (চিত্র-শিল্পী), জে, ডি, ইরানী (শব্দ-যন্ত্রী), সুবল দাসগুপ্ত (সঙ্গীত-পরিচালক), শৈলেন রায় (গীতকার) ধীরেন দাশগুপ্ত (লেবরেটরী ইন্‌চার্জ), বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায় (এডিটার), বটু সেন (শিল্প-নির্দ্দেশক), শ্রীমতী মলিনা, রেণুকা রায়, প্রভা এবং রাজলক্ষ্মীকে সর্ব্ব সমেত ১৯ খানি সুবর্ণ-পদক উপহার দেন।

তৎপরে সমাগত ভদ্রমহোদয় ও মহোদয়াগণকে জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়। মেসার্স প্রাইমা ফিল্মস (১৯৩৮) লিঃ, স্ক্রীন কর্পোরেশান ও ইষ্টার্ণ টকীজ লিমিটেড সকলকে আপ্যায়ন করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয় ও মহোদয়াগণ উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনী দাস, সি, বি দেশাই, এস, এম বাগড়ে (কাপুরচাঁদ) মিঃ রাও (ই, টি, ভি), হরিপ্রিয় পাল (মিনার বিজলী, ছবিঘর), জগদীশ চক্রবর্ত্তী, বিমল রায় (এন, টি), মাধব ঘোষাল (চিত্ররূপা), কেশব দত্ত (রূপশ্রী), নরেশ ঘোষ (এ্যাসোসিয়েটেড), অজিত বসু, এস বসু, বীরেন বসু (অরোরা ফিল্ম) শম্ভু সিং (অরোরা ষ্টুডিও), ছোট্টা বসু (অরোরা সিনেমা) মিঃ আয়ার (ইউনিটি ফিল্ম এক্সচেঞ্জ), এইচ, বন্দ্যোপাধ্যায় (ইষ্টার্ণ ফিল্ম এক্সচেঞ্জ), সুকুমার দাশগুপ্ত, পশুপতি চট্টোপাধ্যায়, নির্ম্মল ঘোষ, কৃষ্ণেন্দু ভৌমিক ও চন্দ্রশেখর।

দীপালীর স্বত্বাধিকারী শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত, ১২৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, দীপালী প্রেসে মুদ্রিত ও দীপালী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

প্রধান সম্পাদক—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় :: সহঃ সম্পাদক—শ্রীধীরেন্দ্রমোহন মজুমদার বি. এল.

১৬শ বর্ষ VOL. XVI. } ৮ই আষাঢ় ১৩৫১ :: June 22, 1944 { ২৫শ সংখ্যা No. 25

আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়
জন্ম—২রা আগষ্ট ১৮৬১ মৃত্যু—১৬ই জুন ১৯৪৪

শিল্পী—নৃপেন সেনগুপ্ত

আমাদের আচার্য্যদেব

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র লোকান্তরিত হয়েছেন। এ-যুগের বাঙালী তাঁর সমস্ত কর্ম্মপ্রচেষ্টার সহিত এই জ্ঞানবীর তপস্বীকে একান্ত করে পেয়েছিল। তাঁর মৃত্যু হয়েছে এ সংবাদ বিশ্বাস করবার জন্য যেন সে প্রস্তুত ছিল না। পরিণত বয়সে আচার্য্যদেবের মৃত্যু হয়েছে, এটা আজ সান্ত্বনার কথা নয়। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র বাঙালীর কতখানি ছিলেন, মৃত্যু শোককাতর জাতির তা পরিমাণ করবার মত মানসিক অবস্থা নেই। গভীর পরিতাপের সহিত শুধু আমরা উপলব্ধি করি একটা মহাশূণ্যতা দেশের জাতীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনে আজ বিরাজ করছে। প্রফুল্লচন্দ্রের লোকান্তরের সহিত সে যুগের অতিকায় চিন্তাবীর মনীষীদের শেষ প্রতিনিধিও আজ বিদায় গ্রহণ করেছেন। জাতীয়তাবাদ, শিক্ষা, জনসেবা বাঙালীর অর্থনৈতিক কল্যাণ প্রচেষ্টার কতখানি চিন্তা ও দায়িত্ব তিনি তাঁর নিঃসঙ্গ জীবনে বহন করেছিলেন তা সাধারণ বাঙালীর পক্ষে সম্পূর্ণ ধারণা করবার সুযোগ নেই। বাংলার শিল্পপ্রচেষ্টার ক্ষেত্রে যেটুকু প্রাণস্পন্দন দেখা যাচ্ছে তার পশ্চাতে রয়েছে আচার্য্যদেবের চিন্তা ও ব্যক্তিত্বের প্রেরণা। প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দীকাল পূর্ব্ব হতে এই জ্ঞানী ও কর্ম্মনিষ্ঠ সন্ন্যাসী মৃত্যুর শেষদিন পর্য্যন্ত বাঙালীর সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ কামনা করে গেছেন। এ ইতিহাস বাঙালীর অবিস্মরণীয় সম্পদ। তাঁর লোকান্তরে, জাতীয় কল্যাণের ক্ষেত্রে যে হতাশার সৃষ্টি হয়েছে তার মধ্যে আমাদের সান্ত্বনা শুধু এই যে আচার্য্যদেব তাঁর নিজের হাতে গড়া একদল কৃতী শিষ্য রেখে গেছেন। এঁদের প্রতিভা ও কর্ম্মপ্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে আমরা আচার্য্যদেবের অমর আধ্যাত্মিক প্রেরণা উপলব্ধি করব। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র, ব্রজেন্দ্র শীল, স্যার নীলরতন, রামানন্দ, রবীন্দ্রনাথ—প্রতিভার বিরাট পুরুষগুলিকে আমরা অল্পদিনের মধ্যেই একে একে হারিয়েছি। বাংলা ১৩৫১ সাল আমাদের মহাগুরু নিপাতের বৎসর। বাঙালীর অবসিতপ্রায় গৌরবের প্রদীপ্ত শিখাটুকুও আজ দিগন্তে বিদায় নিয়েছে, একথা আমরা যেন ভুলতে পারি না। জাতির আত্মা মথিত করে আজ শুধু ধ্বনিত হচ্ছে 'পুনরাগমনায়'।

আলোচনা

স্যার জন উডহেড প্রস্তাবিত 'Bengal Famine Commission'-এর সভাপতি নির্ব্বাচিত হয়েছেন, নয়া দিল্লীর সাম্প্রতিক গুজব এই। এই গুজবের সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে ক্লাইভ ষ্ট্রীটের সুবিখ্যাত সাপ্তাহিক 'Capital' পত্রিকার সুপরিচিত 'Dicher' সাহেবের ডায়েরী থেকে। ব্যাপারটা হয়তো গুজব নয়। এই কমিশনের অন্যান্য সভ্য কারা হবেন সে সম্বন্ধেও কাণাঘুষা চলছে। শোনা যাচ্ছে, এদেশের ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্র থেকে একজন নির্ব্বাচিত হবেন, জনস্বাস্থ্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞ কাউকে নির্ব্বাচন করবার জল্পনা চলছে। তৃতীয় ব্যক্তিকে নির্ব্বাচিত করা হবে শাসনকার্য্যে অভিজ্ঞ সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে।

* * *

গত ১৯৪৩ সালের শেষভাগে এই মহামন্বন্তরের দায়িত্ব সম্বন্ধে যে তিক্ত আলোচনা হয়েছিল তা স্মরণ করা দরকার। প্রাদেশিক দায়িত্বহীনতা বা কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের শৈথিল্য—কারণ যেটাই হোক না কেন সমস্ত তথ্য উদ্ঘাটনের আজ একান্ত প্রয়োজন। দেশের একতৃতীয়াংশ লোক অন্নহীন অবস্থায় তিলে তিলে মারা গেছে এই রূঢ় সত্য আজ যেন স্বপ্নের মত মনে হচ্ছে। মাত্র কয়েকমাসের ব্যবধান। এরই মধ্যে মানুষের চিরন্তন বিস্মৃতি বহু তিক্ত অভিজ্ঞতাকে গ্রাস করে ফেলছে। বহু পরে সত্য মিথ্যা জড়িত একটা ইতিহাস হয়তো রচিত হবে। তার মূল্য কতটুকু? সিভিলিয়ানী শাসনের সীমাহীন জড়তা আজ মানুষের মুখে মুখে প্রবাদের মত প্রচারিত হচ্ছে। ভারতে বৃটিশ শাসনের ইতিহাসে কত দুঃখ কত দৈন্যের জন্য এই অনড় শাসনতন্ত্র দায়ী কে তার হিসেব করবে?

* * *

বাংলা পরিষদের নোংরামী চরমে উঠেছে। গত ২৫শে মে মন্ত্রী মিঃ তুলসীচরণ গোস্বামী যখন মাধ্যমিক শিক্ষা বিলের স্বপক্ষে বক্তৃতা করতে ওঠেন তখন থেকে এই ব্যাপারের সুরু হয়। তারপর প্রতিদিন বিরুদ্ধপক্ষের বাধাদানের নীতি অসহনীয় স্বেচ্ছাচারে পরিণত হচ্ছে। আমরা মন্ত্রিদলের সমর্থক নই। Secondary Education Bill-এর অনিষ্টকারিতা কতখানি তা আমরা উপলব্ধি করি। [illegible] জাতীয়তাবিহীন নীতিবাদ দেশে গভীর অকল্যাণকে ডেকে আনবে, একথা ঘোষণা করতে আমরা কোনদিন কুণ্ঠিত হইনি। তথাপি মনে হয় সর্ব্ববিষয়ে শালীনতা বোধ ও মাত্রাজ্ঞান যেন আমরা হারিয়েছি। সংবাদপত্রে পরিষদের যে বিবরণ প্রকাশিত হচ্ছে তা শুধু গ্লানিকর নয়। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় opposition দলের privilege সম্বন্ধে পরিষদে যে সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেছেন তদ্বারা যেন এই কেলেঙ্কারীরই সমর্থন করা হয়েছে। আমরা বুঝতে পারিনা ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ, মিঃ হক ও মিঃ সন্তোষকুমার বসুর মত প্রবীণ নেতৃবৃন্দের উপস্থিতি সত্ত্বেও এ ধরণের ব্যাপার কি করে সম্ভব হয়। ডাঃ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বিলিতি পার্লামেণ্টের নজির দেখিয়েছেন। কিন্তু যে মর্য্যাদাবোধ ওদেশের 'opposition দল তাদের আচরণে প্রকাশ করেন এখানে তার সামান্য পরিচয়ও পাওয়া যাবে না। পরিষদের speaker মহাশয়ের অবস্থা হয়েছে শোচনীয়। শৃঙ্খলা রক্ষা করবার দায়িত্ব তাঁর। কিন্তু তা বজায় রাখবার মত উপযুক্ত ক্ষমতা তাঁর হাতে নেই। প্রয়োজন হলে আইন তৈরী করে সে ক্ষমতা speakerকে দেওয়া উচিত। নচেৎ পরিষদের এ প্রহসনের সমাপ্তি কোনদিন হবে না।

* * *

বর্ত্তমান রেলভ্রমণের অসুবিধার কথা সরকারী ঘোষণা ও বিজ্ঞাপনে প্রচারিত হচ্ছে। জনসাধারণ আজকাল নিতান্ত প্রয়োজন না হলে রেল ভ্রমণ করেন না। সরকারী ধারণা কি আমরা জানিনা। গাঁটের পয়সা খরচ করে হাজার অসুবিধা ও বিপদ মাথায় করে রেলে চড়বার উৎসাহ মানুষের নেই। ব্যক্তিগত প্রয়োজন ও জরুরী অবস্থার কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। বর্ত্তমানে রেলওয়ে বিভাগ সাধারণ যানবাহনের জন্য গাড়ীর সংখ্যার যে বরাদ্দ করেছেন সে সম্বন্ধে তর্ক মিথ্যা। যুদ্ধের চাহিদা আগে মেটাতে হবে, পরে অন্য কথা। আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি এই অল্পসংখ্যক গাড়ীতে স্থানলাভ করবার যে অসুবিধা তা কিয়ৎপরিমাণে দূর করা চলে। Station staff-এর নিম্নতর কর্ম্মচারীদের দুষ্প্রবৃত্তি ও দুর্নীতি দমন করবার মত উপযুক্ত organisation-এর অভাব আমরা লক্ষ্য করছি। টিকিট কেনা থেকে আরম্ভ করে গাড়ীতে স্থানলাভের ব্যাপারেও অতিরিক্ত [illegible]

পরলোকে

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় গত শুক্রবার (১৬ই জুন) অপরাহ্ণ ৬-২৭ মিনিটের সময় আপার সারকুলার রোডস্থ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন।

১৬ই জুন বাঙ্গালা ও ভারতের ইতিহাসের এক স্মরণীয় দিন। ১৯ বৎসর পূর্ব্বে এই দিনে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় দার্জ্জিলিং 'ষ্টেপ এসাইড' ভবনে দেহরক্ষা করিয়াছিলেন।

আচার্য্য রায়ের পূতদেহ শুক্রবার রাত্রে বিজ্ঞান কলেজ ভবনে রাখা হয়। জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সহস্র সহস্র নরনারী শুক্রবার অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত বিজ্ঞান কলেজে আচার্য্য রায়কে শেষ দর্শন করিতে ও শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে গমন করেন।

শনিবার সকালে আট ঘটিকার সময় বিজ্ঞান কলেজ হইতে আচার্য্য রায়ের নশ্বরদেহ শোকযাত্রা সহকারে বাহির করিয়া [illegible] কলিকাতার বিভিন্ন রাজপথ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রেসিডেন্সি কলেজ, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দির ঘুরিয়া নিমতলা শ্মশানঘাটে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করা হইয়াছে।

নিমতলা শ্মশানে রবীন্দ্রনাথের নশ্বরদেহ যেখানে ভস্মীভূত করা হইয়াছিল তাহারই পার্শ্বে বাঙ্গালার সুসন্তান জগৎপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক আচার্য্য রায়ের নশ্বর দেহ ভস্মীভূত করা হইয়াছে।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ২রা আগষ্ট খুলনা জেলায় রাড়ুলি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা স্বর্গীয় হরিশচন্দ্র রায় তদানীন্তন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অগ্রণী ছিলেন। পারস্ত ভাষা ও ইংরাজী সাহিত্যের উপর তাঁহার অসামান্য দখল ছিল।

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র মেট্রোপলিটন ইনষ্টিটিউশনে যোগদান করেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে তিনি পদার্থ ও রসায়ন শাস্ত্র সম্পর্কে বক্তৃতা শুনিতে যাইতেন এবং স্যার আলেকজাণ্ডার পেডলারের পাণ্ডিত্যে তাঁহার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন।

জমিদার পুত্র হইলেও এই সময় প্রফুল্লচন্দ্রের পিতার আর্থিক অবস্থা নিতান্ত খারাপ হইয়া পড়ে এবং প্রফুল্লচন্দ্রের বিদ্যার্জ্জনের পথে তাহা বিশেষ অন্তরায় হইয়া উঠে। কিন্তু যুবক প্রফুল্লচন্দ্র তাহাতে নিরুৎসাহিত হন নাই। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে প্রফুল্লচন্দ্র গিলখ্রাইষ্ট বৃত্তি লাভ করিয়া উচ্চ শিক্ষালাভের জন্য পাশ্চাত্য দেশে যান। এই সময় "সিপাহী" বিদ্রোহের পূর্ব্বে ও পরে ভারতের অবস্থা সম্পর্কে তিনি একটি প্রতিযোগিতামূলক প্রবন্ধে বৃটিশ শাসনের তীব্র সমালোচনা করিয়াছিলেন এবং সেই সময় হইতেই তাঁহার লেখনীশক্তি বিকশিত হয়। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে তিনি রসায়ন শাস্ত্রের একটি মৌলিক প্রবন্ধের উপর 'বি এস সি' ডিগ্রি পান।

কর্ম্মচারীদের সাহস ও উৎসাহ এই দুর্দ্দিনের সুযোগে অসহনীয় হয়ে উঠেছে। এ অবস্থা সম্ভব হয় রেলওয়ের উচ্চতর কর্ম্মচারী মহলের শৈথিল্যে। জনসাধারণের প্রশ্ন করবার অধিকার আছে। কেন এ অবস্থার উদ্ভব হয়েছে তার জবাবদিহি করবার দায়িত্ব কর্ত্তৃপক্ষের। রেলওয়ে বিভাগ আজ বড় বড় সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন, তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে ব্যস্ত হবার সময় তাদের নেই, এই জবাব কেউ কেউ দিয়ে থাকেন। এ সম্বন্ধে তর্ক চালাবার প্রবৃত্তি আমাদের নেই। জাতিগতভাবে কতখানি নেমে গেলে এই অবস্থার সৃষ্টি হয় এইটুকুই শুধু আমরা চিন্তা করি।

তিনি এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় কেমিক্যাল সোসাইটির সভাপতি নির্বাচিত হন এবং বিশেষ গিলখ্রাইষ্ট বৃত্তি ও 'হোপ' বৃত্তি পান। অতঃপর তিনি ভারতীয় এডুকেশনাল সার্ভিসে যোগ দিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁহার উচ্চ শিক্ষা, স্যার উইলিয়ম মুইর, স্যার বার্ণস বার্ণার্ড প্রভৃতি শিক্ষাব্রতীগণের সুপারিশ ইণ্ডিয়া অফিসকে টলাইতে পারিল না। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। এক বৎসর অপেক্ষা করিয়া তিনি ২০০৲ টাকা বেতনে প্রেসিডেন্সি কলেজে সহকারী অধ্যাপকের চাকুরী গ্রহণ করেন। গন্ধক দ্রাবকের সহিত তাম্র, লৌহ, নিকেল প্রভৃতি কতকগুলি ধাতু মিশিয়া এক জাতীয় যৌগিক পদার্থ উৎপাদন করে, আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র এই ব্যাপার লইয়া গবেষণা আরম্ভ করেন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে এডিনবরা রয়েল সোসাইটির পত্রিকায় এই গবেষণার বিবরণ প্রকাশিত হইলে তিনি জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকের মর্য্যাদা পান। এই গবেষণার জন্য এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ডি-এস-সি উপাধিতে ভূষিত করেন।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র 'ইণ্ডিয়ান স্কুল অব কেমিষ্ট' ও 'ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে ২৮ বৎসর কাজ করার পর আচার্য্য রায় ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে সরকারী চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

আচার্য্য রায় অতঃপর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সায়েন্স কলেজে কেমিক্যাল লেবরেটরীর ডিরেক্টররূপে যোগদান করেন। তিনি ১৫ বৎসরকাল উক্ত কলেজে কাজ করেন এবং সেই সময় তাঁহার ১৫ বৎসরের সমগ্র বেতন সায়েন্স কলেজের যন্ত্রপাতি ও লেবরেটরীর উন্নতির জন্য এবং রিসার্চ্চ ফেলোশিপের জন্য দান করেন। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে তিনি সায়েন্স কলেজ হইতে অবসর গ্রহণ করেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন শাস্ত্রের 'এমিরিটাস' অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

শুধু শিক্ষাক্ষেত্রে নহে, শিল্পবাণিজ্যে আচার্য্য রায়ের দান অতুলনীয়। তাঁহার উৎসাহে, চেষ্টায়, অর্থে ও পরিশ্রমে যে সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার মধ্যে বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কাহারও নিকট কোনোরূপ সাহায্য না লইয়া আচার্য্য রায় সামান্য কয়েক শত টাকা মূলধনে তাঁহার বাটীতে লেবরেটরী করিয়া ঔষধ তৈয়ারী করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার স্বাস্থ্য কোন দিনই ভাল ছিল না, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তিনি দিবারাত্র পরিশ্রম করিতেন এবং অল্পদিনের মধ্যে তাঁহার ৯১ নং আপার সারকুলার রোডের বাড়ী বিরাট কারখানায় পরিণত হইয়া উঠিল। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কসকে দুই লক্ষ টাকা মূলধনের লিমিটেড কোম্পানীতে রূপান্তরিত করা হয়।

আচার্য্য রায় অনুভব করিতেন যে, দেশের অপরিমেয় দুঃখ দারিদ্র্য অনেকখানি প্রশমিত হইতে পারে যদি দেশবাসী 'চরকা ও খদ্দর গ্রহণ করে।

তিনি বলিতেন—প্রত্যেকে খদ্দর পরিধানের ব্রত গ্রহণ করিলে দেশ দরিদ্র থাকিতে পারে না।

খুলনার দুর্ভিক্ষে ও উত্তর বঙ্গের বন্যায় আচার্য্য রায়ের সেবাকার্য্য বাঙ্গালী ও ভারতবাসী কখনই ভুলিতে পারিবে না। গত বৎসরের দুর্ভিক্ষ যখন বাঙ্গলাকে গ্রাস করিয়াছিল সেই সময় রোগশয্যার মধ্যেও তিনি তাহা হইতে দূরে সরিয়া থাকিতে পারেন নাই।

আচার্য্য রায় শুধু যে একজন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক তাহা নহেন; সাহিত্যের উপর তাঁহার দখল অসামান্য; ইতিহাস তাঁহার একটি বিশেষ আকর্ষণ। তিনি মাঝে মাঝে বলিতেন—"আমি ভুল করিয়া রাসায়নিক হইয়াছি।" তিনি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার "হিন্দু রাসায়নের ইতিহাস" দশ বৎসরের বিরাট পরিশ্রমের ফল। "সাহিত্যে বিজ্ঞানের স্থান" নামক তাঁহার গ্রন্থটির মধ্যে তিনি দেখাইয়াছেন যে, বিজ্ঞানের সহিত সাহিত্যের কোন বিরোধ নাই—দুই-এর মধ্যে পারস্পরিক যোগ আছে। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে তিনি "হিন্দু রাসায়নিকের জীবনী ও অভিজ্ঞতা" শীর্ষক একটি আত্মজীবনী রচনা করিয়াছেন। বিশ্বের দরবারে গ্রন্থখানি বিশেষভাবে সমাদৃত হইয়াছে।

আচার্য্য রায় চিরকুমার ছিলেন। মধ্যে মধ্যে তিনি রহস্য করিয়া বলিতেন, "বিশ্ববিদ্যালয় আমার স্ত্রী আর ছাত্রেরা আমার পুত্র।" বাস্তবিক ছাত্রদের তিনি সন্তানের মত ভালবাসিতেন। ছাত্রদের জন্য তিনি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছায় দারিদ্র্যব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন।

১৯০৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আচার্য্য রায়কে 'পি এইচ ডি' উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরূপে লণ্ডনে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের কংগ্রেসে যোগদান করেন। সেই বৎসর ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে 'ডি এস সি' উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে তিনি "সি আই ই" উপাধি পান।

কমরেড লেনিন

—শ্রীবীরেন্দ্রলাল ধর

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

দল ভেঙে যাওয়ার উত্তেজনা লেনিনের মনকে অত্যন্ত চঞ্চল করে তোলে, মিটিং থেকে ফিরে এসেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন, দেহের উত্তাপ বেড়ে গেল, বুকে পিঠে দেখা দিল অসহনীয় বেদনা। তখনই একজন ডাক্তার ডাকা দরকার, কিন্তু লণ্ডন সহরে যে কোন ডাক্তারের ফী এক গিনি। কিন্তু তখন লেনিনের হাতে সে টাকা ছিল না, কাজেই লেনিনকে নিজেই নিজের চিকিৎসা করতে হোল, লণ্ডনের কুলি মজুরেরা যেভাবে চিকিৎসা করে থাকে। বেদনার জায়গায় ভালো করে আইডিন লাগিয়ে চুপ করে পড়ে রইলেন বিছানায়। সেই অসুখ সারতে তাঁর দু'সপ্তাহ লাগলো।

শরীর সারলেও মন সারলো না! মেন্‌শেভিক্ আর বলশেভিকদের দলাদলি ক্রমশঃ এমন উগ্র হয়ে উঠলো যে মাঝে মাঝে দু' দলে রীতিমত মারামারি বেধে যেত, মেয়ে বিপ্লবীরাও তার মধ্যে বাদ যেত না। লেনিন আর সইতে পারলেন না, শেষে একদিন সেণ্ট্রাল কমিটি থেকে পদত্যাগ করলেন, তারপর দেহের অবসাদ আর মনের চাঞ্চল্য থেকে মুক্তি পাবার জন্য বেরিয়ে পড়লেন, বেড়াতে সুইট্‌জারল্যাণ্ডের পাহাড়ে পাহাড়ে। রামধনু আঁকা পথের পাশে লেকের ধারে হেলান দিয়ে কর্মহীন একটা মাস কাটিয়ে দিলেন এলোমেলো ভাবে।

হতাশ হবার লোক লেনিন নন, আবার তিনি টেবিলের সামনে এসে বসলেন। রুশিয়ার কুলি মজুর চাষার সঙ্গে চললো পত্রালাপ। কত জন কত অন্যায় ও অব্যবস্থার কথা জানালো, উত্তরে তাদের প্রত্যেককে লেনিন নির্দ্দেশ দিলেন ভবিষ্যতে কি করতে হবে। গড়ে প্রতিদিন প্রায় তিনশো করে চিঠির উত্তর দিতে হয়, কিন্তু সেজন্য লেনিনের এতটুকু ক্লান্তি নেই। রীতিমত গণসংযোগের দিকে তিনি এবার দৃষ্টি দিলেন।

এই সময়ে রুশ-জাপান যুদ্ধ বাধলো। এই যুদ্ধের মূল কারণ ছিল 'পোর্ট-আর্থার' নামে একটি বন্দর। জার চেয়েছিল এই বন্দরটীকে রুশিয়ার জন্য একচেটিয়া করতে। দুর্ব্বল চীনের কাছ থেকে সেটুকু কেড়ে নেওয়াও বিশেষ কঠিন ছিল না। কিন্তু জাপানের সাবধানী চোখ ছিল সজাগ, সে চায়নি যে অপর কোন দেশ এখানে এসে তার ঘরের পাশে প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে বসে। জাপানে রুশিয়ায় বেধে গেল লড়াই। রুশিয়ার সঙ্গে তুলনায় দেশ হিসাবে জাপান নগণ্য কিন্তু লড়াইয়ে রুশিয়াই হেরে গেল এবং দু'লাখ রুশ সৈন্য মারা গেল এই যুদ্ধে।

যারা লড়াই থেকে বেঁচে ফিরে এলো, তারা দেখলো যে জীবনের সমস্যা এত জটিল হয়ে উঠেছে যে অনাহারে মরতে হবে তাদের সকলকেই। রাজার জন্য তারা লড়তে গিয়েছিল, সেই রাজা নিশ্চয়ই তাদের এ ভাবে মরতে দেবেন না,কৃতজ্ঞতা বলে তো একটা কথা আছে! সবাই মিলে ঠিক করলো রাজার কাছে একটী আবেদন জানাতে হবে কিছু সুযোগ সুবিধার জন্য। কাদার গাপুন নামে এক যুবক পাদ্রী হলেন তাদের নেতা। ইনি রাজধানীর কুলিমজুরদের মাঝে কিছুদিন ধরে খুব ভালোভাবে কাজ করছিলেন। বিপ্লববাদে তিনি খুব উৎসাহী ছিলেন। কিছুদিন দেশ থেকে পালিয়ে লেনিনের কাছেও যান। কিন্তু পরে অদৃষ্ট, ভগবান প্রভৃতিতে বিশ্বাস রেখে নরম পথ ধরার জন্য লেনিন এঁকে ছেড়ে দেন। তবে সে অনেক পরের কথা।....

দু লাখ আশী হাজার মজুরের এক শোভাযাত্রা বেরুলো, জারের দরবারে গিয়ে নিজেদের দুঃখের কথা জানাবার জন্য। কিন্তু তাদের অভাব অভিযোগ শোনা তো দূরের কথা জার তাদের ভীড় দেখেই চমকে উঠলো, আদেশ দিলে—গুলি চালিয়ে জনতা ছত্রভঙ্গ করে দাও। আদেশ তখনই তামিল হোল, সৈন্যদের গুলিতে সেদিন মরলো দুশো জন মজুর, আর আহত হোল দু-হাজার।

জারের দল এর নাম দিল 'নিহিলিষ্টদের বিদ্রোহ'। জনগণ কিন্তু এই দিনটিকে স্মরণ করে রাখলো অন্য নামে—'রক্ত-রঞ্জিত রবিবার'।

রুশ সর্ব্ব-হারারা নিজেদের অবস্থাটা এবার ভালো করেই বুঝলো, এতদিন ধরে তাদের মনে জার-জমিদার-মালিকদের সম্পর্কে যেটুকু সদিচ্ছা ছিল, এখন তাও নষ্ট হয়ে গেল। বলশেভিকদের কাজ করার সুবিধা হোল এবার, তারা চাষা মজুরদের মাঝে শ্লোগান তুললো— দুনিয়ার মজুর এক হও! জার ধ্বংস হোক্।

বলশেভিকদের চেষ্টায় দিন কয়েকের মধ্যে আবার আন্দোলন দেখা দিল। গাঁয়ের চাষারা জমিদারের গোলা লুঠ করলো, সহরের মজুরেরা কারখানায় করলো ধর্ম্মঘট। কশাক সৈন্য ছুটে এলো—ডাইনে বাঁয়ে চাবুক চালাতে লাগলো, গুলি চালালো ইচ্ছামত। খবরটা লেনিনের কানে পৌছালো, লেনিন বললেন—ভয় পেলে চলবে না, আমাদের জিততে হবে!

লেনিনের নির্দেশমত ধর্ম্মঘট ছড়িয়ে পড়লো ব্যাপকভাবে, মার খেয়ে খেয়ে মানুষগুলো মরিয়া হয়ে উঠলো। শেষে একদিন সৈন্যদেরও ক্লান্তি এসে পড়লো, বললে—এভাবে অস্ত্রহীন কুলিমজুরদের খুন করতে আমরা পারব না।

এবার জার-জমিদারদের মুখে চিন্তার রেখা পড়লো—তাইতো!
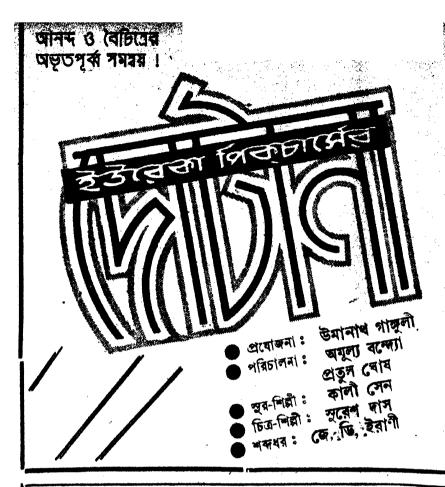
শেষে অনেক বিচার বিবেচনা করে জার একদিন ঘোষণা করলেন, মানে করতে বাধ্য হলেন—তোমরা যা চাও তাই দিলাম: সভাসমিতিতে ইচ্ছামত বক্তৃতা করতে পারবে, শোভাযাত্রা বের করতে পারবে,

[illegible] রুদ্ধ করিয়া রাখা যায় না—তাই কখনও কখনও সংসারে সমস্যার স্রোত ফেনিল হইয়া ওঠে—আর সমস্যার মধ্যেও জাগিয়া ওঠে এমন একটা প্রশ্ন...... যাহা মানুষের মনকে দোটানার স্রোতে ভাসাইয়া লইয়া যায়। কিন্তু তাহার পরিসমাপ্তি কোথায় ... ?

ভূমিকায় :

জহর গাঙ্গুলী
লতিকা মল্লিক
ধীরাজ ভট্টাচার্য্য
(এম, পির সৌজন্যে)
শৈলেন চৌধুরী
রমা ব্যানার্জি
শ্যাম লাহা
প্রভা, তুলিয়াবালা
কানু বন্দ্যো (এঃ)

তন্দ্রা : জ্বলন্ত এক টুকরো সিগারেট ফেলে গিয়ে তুমি আমাদের সুখের সংসারে আগুন ধরিয়ে দিতে চেয়ে ছিলে।...

অলক : হ্যাঁ। ভেবেছিলাম আগুন জ্বলে যখন স্বামী স্ত্রীকে ঘিরে ফেলবে তখন স্বামীকে ফেলে স্ত্রী-রত্নটিকে নিয়ে চলে যাবো।...

লম্পট অলককে তার এই দুরভিসন্ধির জন্য কি-ভাবে প্রতিফল পেতে হয়েছিল তা 'মাটির ঘর'-এ দেখুন।

●

কাহিনী : বিধায়ক ভট্টাচার্য্য
পরিচালনা : হরিচরণ ভঞ্জ
সুর-শিল্পী : শচীনদেব বর্ম্মণ

●

ছবিখানি একবার দেখে তৃপ্তি হয় না, বার বার দেখতে মন চায়—

●

আজই সপরিবারে ছবিখানা দেখার ব্যবস্থা করুন

পরিবেশক :
এম্পায়ার টকী ডিষ্ট্রিবিউটর্স

প্রত্যাখ্যান

(উপন্যাস)

শ্রীসুধাংশু কুমার হালদার, আই, সি, এস্

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(৭)

পরের দিন সকালে ড্রাইভারের দ্বারা চালিত হ'য়ে মোটর যখন মল্লিকাদের বাড়ীর গেটে পৌঁছাল, তখন যে কাণ্ডটি ঘটল, তাকে একটি ছোটখাট লঙ্কাকাণ্ডই বলা যেতে পারে।

মল্লিকার বাবা হরিমোহন বসু একদা যৌবনকালে এ অঞ্চলে শিকার করতে এসে জায়গাটা দেখে ভারি পছন্দ করেছিলেন। তারপর বিঘে দশেক জমি কিনে একটা বাড়ী ও বাগান তৈরি ক'রে নিতে তাঁর বেশী দেরী হয় নি। তাঁর ছিল হুগলী জেলায় বিস্তীর্ণ জমিদারি, এবং আমরা যাকে এখন "অজ পাড়াগাঁ" বলি, তেমনি এক পাড়াগাঁয়ে পিতৃ-পিতামহদের কালের বাড়ী বাগান পুষ্করিণী। ম্যালেরিয়ার কৃপায় যখন সেখানকার বাস উঠাতে হ'ল, তখন তৈরি হ'ল কলকাতায় অট্টালিকা, আর সাঁওতাল পরগণা অঞ্চলের এ বাড়ীটা রইল প্রতি বছরে একবার ক'রে বেড়াতে আসার জন্যে। এবার অসুখে ভুগেছিলেন কিছু বেশী, তাই স্থিতিটাও একটু বেশী দিনের।

তাঁর ছিল গোলাপের সখ। বাড়ীটা চারিদিকে তাই গোলাপ বাগান দিয়ে ঘেরা, সবুজ লাল সাদার কারুকার্য খচিত ফ্রেমে আঁটা ছবি যেন। অধুনা গোলাপ নিঃশেষ হ'য়ে এলেও ফুটছে প্রত্যহ চার পাঁচ ডজন ক'রে। তাছাড়া চামেলির ঝাড়ে মিহি সরু সাদা ফুল প্রচুর ফুটেছে, তারি মৃদু সুবাস বহুদূর ছড়িয়ে আছে। সাদা কাঁকরের রাস্তা বাড়ীটাকে বেষ্টন ক'রে গেছে। এক ধারে মস্ত ইঁদারা, লাটাখাম্বা দিয়ে জল তুলছে মালীরা।

হরিমোহন তাঁর বাগান, তাঁর পড়াশোনা, তাঁর খুশী আর খেয়াল নিয়েই থাকেন, কোনো কাজকর্মই দেখতে হয় না তাঁকে। ঘরকন্না দেখেন গৃহিণী মহামায়া আর জমিদারি দেখেন নায়েব ব্রজেন্দ্র চক্রবর্ত্তী। প্রাচীন কালে এ বংশের কর্ত্তাদের ছিল প্রচুর দানধ্যান এবং প্রচুরতর ইয়ারকি ও অপকর্ম। এখন দানধ্যানও কমেছে, অপকর্মও কমেছে। হরিমোহনের খুশী আর খেয়াল বদখেয়ালিতে পর্য্যবসিত হয়নি ব'লে গৃহিণী দুটি বেলা ঠাকুর দেবতাকে প্রণাম নিবেদন করেন। তিনি দেখেছিলেন কিনা তাঁর শ্বশুরকে! যে পরিমাণ সুরা তিনি পান ক'রে গেছেন তাতে আর অধস্তন সাতপুরুষের পানীয় না হ'লেও চলতে পারে।

হরিমোহন বহুদেশ ঘুরেছেন। গৃহিণী আপত্তি করেন নি তাতে। তিনি জানেন পুরুষমানুষদের এক একটা খেয়াল থাকা অনিবার্য্য, এবং ভাল খেয়াল যদি না মেটে, তাহলে বদখেয়াল এসে তার স্থান অধিকার করতে পারে। শেষে দু' একবার মেয়েকেও সঙ্গে নিয়ে গেছেন হরিমোহন বিদেশে। বিদেশ থেকে যখন ঘনঘন টাকার তাগিদ এসেছে, নায়েব ব্রজেন্দ্র চক্রবর্ত্তী গৃহিণীকে মাতৃ সম্বোধন ক'রে অনেক আপত্তি জানিয়ে গেছেন, কিন্তু গৃহিণী মহামায়া পত্রপাঠ টাকা পাঠাবার আদেশই দিয়েছেন প্রত্যেকবার। তিনি জানেন বিদেশে টাকা দিয়ে কর্ত্তা যা কিনবেন তা অন্তঃপুরবাসিনীদের জন্যেই। যদি এ খেয়াল তাঁর না মেটে তবে উপঢৌকন হয়ত চ'লে যাবে প্রত্যন্তপুরবাসিনীদের কাছেই, আর টাকা নষ্ট হবে তাতে দ্বিগুণ।

সামান্য কারণেই হরিমোহনের অস্থির হ'য়ে ওঠা স্বভাব। জীবন দেবতা তাঁকে না চাইতেই সমস্ত প্রার্থনা পর্য্যাপ্ত ক'রে মিটিয়ে দিয়েছেন,
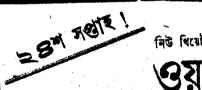
---

কাগজে মনোমত কথা লিখতে পারবে, ভোট দিয়ে নেতাদের রাজদরবারে পাঠাতে পারবে...

চাষী মজুরেরা এবার সত্যাই জিতলো।

সুবিধাবাদী নেতারা এবার ভোট নিয়ে রাজদরবারে যাবার জন্য তৈরী হতে লাগলো, বললো—এমনি ভাবেই সুযোগ সুবিধা ক্রমশঃ আসবে, বেশী চঞ্চল হবার প্রয়োজন নেই।

দুঃখ কি জিনিষ তা তিনি জানেন না। সেজন্তে যত কিছু কাল্পনিক দুঃখ আর অস্বস্তি নিয়ে তাকে ফেনিয়ে ফেনিয়ে বাড়িয়ে তোলায় স্বভাবে তিনি অন্তরে অন্তরে স্বার্থপর। ত্যাগ কোনোদিন না ক'রে পাওনাটাকে ষোলো আনার ওপর আঠারো আনা পুষিয়ে নিয়েছেন চিরদিন। কোনো বিষয়ে মতিস্থির করতে তাঁর সময় লাগে না বেশী, কিন্তু যখনই দেখেন অপটুত্বের অভিঘাত এসে সাফল্যকে সুদূরে ঠেলছে, তখনই সে কাজ ফেলে আর এক কাজে হাত দেন।

গত রাত্রিতে অন্ততঃ পঁচিশবার বিছানা ছেড়ে উঠেছেন এবং গৃহিনী মহামায়াকে ঘুম থেকে তুলে জিগেস করেছেন ভোর হবার আর দেরি কত। শেষে বকুনি খেয়ে রাত-প্রভাতের প্রতীক্ষায় বিনিদ্রভাবে কাটিয়েছেন। ভোর না হ'তে হ'তেই হাঁকডাক করে ড্রাইভারকে সাইকেল ক'রে পাঠিয়েছেন এবং তার পর থেকে একরকম রাস্তার পানে চোখ রেখেই বসে আছেন। এক একবার তাঁর মনে হয়েছে সাইকেল চড়তে জানলে তিনি নিজেও যেতেন সঙ্গে।

মহামায়া ভাঁড়ার ঘরে ঠাকুরকে ঘী বার ক'রে দিচ্ছিলেন। ঘীয়ের অল্পতা সম্বন্ধে ঠাকুর বারংবার মৃদু আপত্তি জানাচ্ছিল। প্রয়োজনের চতুর্গুণ না পেলে ঠাকুরের মনঃপূত হয় না।

জ্ঞানদা দাসী বারান্দায় বসে মাছ কাটছিল আঁশবঁটিতে। হরিমোহন পায়জামার উপর ড্রেসিং গাউন চাপিয়ে ভাঁড়ার ঘরের নীচে রাস্তায় দাঁড়িয়ে মালীকে জলসেচন সম্বন্ধে উপদেশ দিচ্ছিলেন। এই দিকে একটা গোল্‌মোহর গাছ ফুলের আগুনে রাঙা হ'য়ে উঠেছিল, তারি তলায় শীতল ছায়ায় রাখাছিল গোটাকয়েক ফার্ণের টব। মালী তাতে জল ছিটিয়ে দিচ্ছিল একটা ঝাঁঝরি ক'রে। এমন সময় গেটের বাইরে থেকে মোটরের পরিচিত হর্ণ শোনা গেল।

হরিমোহন দৌড়ে গিয়ে মহামায়াকে বললেন, "চল, চল, মিলি এসেছে।' এবং তাঁকে এক রকম টানতে টানতেই খাবার ঘর টপকে, ড্রয়িংরুম টপকে বাইরের বারান্দায় গিয়ে উৎসুক প্রতীক্ষায় দাঁড়ালেন। জ্ঞানদা ছাইমাখা আঁশমাখা হাতেই দৌড়ে এল, এবং তার এই ব্যস্ততা লক্ষ্য করে অত্যন্ত খুসী হয়ে একটা চিল অনায়াসে মাছটি নিয়ে উড়ে গেল। মালীরা ছুটল গেট খুলে দিতে। অন্যান্য চাকররা যে যেখানে ছিল সবাই দৌড়ে এল বাইরের বারান্দায়।

বেশ মস্ত দল জমেছে সেখানটায়—বাইরে থেকে দেখা যায়। সর্বাগ্রে দাঁড়িয়েছেন হরিমোহন নিজে। তাঁর ডোরাকাটা ড্রেসিং গাউন সকালের হাওয়ায় পতাকার মতো দুলছে। তাঁর পিছনে মহামায়া। চওড়া লাল পাড়ের গরদ সকালের সোনালী আলোয় চক্‌চক্ করছে। তাঁর পিছনে অনুচরবর্গের ভিড়। গাড়ী থেকে এ দৃশ্য দেখে মল্লিকা হেসে উঠলেন। তাঁর মনে হ'ল এক্ষুনি এই লাইট ব্রিগেডটি যেন ব্যালাক্লাভার যুদ্ধক্ষেত্রে ঝাঁপ দিয়ে পড়বে, এমনি তাদের উদগ্রীব ভঙ্গী।

মোটর থেকে নামতে না নামতেই যে প্রশ্নবর্ষণ শুরু হ'ল তা লাইট ব্রিগেডের গুলিবর্ষণের মতোই তীক্ষ্ণ। 'কি হয়েছিল ?'—'ব্যাপার কি'—

লাগে নি তো ?' 'কী সর্বনাশ, যদি গাড়ী উল্টে যেত।' 'আমি তখুনি বলেছিলাম, হ্যাঁগা, তুমি বলতো, আমি বলি নি ?' 'রাতে কোথায় ছিলে ?' 'কি খেলে ?' 'ঘুম হয়নি বোধ হয় ?' 'অসীম বাবুটা আবার কে ?' 'বাড়ী কোথা ?' 'এখানে কি করে ?' 'বিষণ সিং ?' 'বিষণ সিং ? বিষণ সিং কোথা ?' 'এইযে বিষণ সিং'—'শীঘ্র গাড়ী থেকে জিনিষপত্র যা আছে নামাও।' 'জ্ঞানদা ?' 'জ্ঞানদা কোথায় গেল ?' 'এই যে দাঁড়িয়ে আছে হাঁ ক'রে।' 'যাও দিদিমণির স্নানের জল ঠিক করো,—'আর হ্যাঁ, দেখো, যেন বুদ্ধি ক'রে তোমার আঁশ হাত জলে ডুবিও না' 'ও ঠাকুর ঠাকুর' —

কর্তার উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হ'য়ে মহামায়া বললেন "হামবড়াই করা রেখে মেয়েটাকে একটু বকো। এমনি ক'রে ওর মাথাটি একেবারে খেয়ে দিও না। আমি যদি এমনি করে সারা রাত কাটিয়ে বাড়ি ঢুকতুম, আমার বাপ মা আস্ত রাখত না ; বাপ বেটাতে যেন দিন দিন আরও ছেলে মানুষ হচ্ছ !"

তিনি ভোলেন নি এবাড়ীর পুরুষ মানুষদের কীর্ত্তি। তিনি তখন নতুন বৌ হ'য়ে এসেছেন। শ্বশুর ভাসুরে বাড়ী গম্‌গম্ করছে। দোল পূর্ণিমার পরদিন। এবাড়ীর বড়োকর্ত্তা, হরিমোহনের চেয়ে যিনি পনের বছরের বড় ছিলেন বয়সে,—সারারাত কোথায় কাটিয়ে সকালবেলা বাড়ী ফিরলেন। চোখ দুটো জবা ফুলের মতো লাল, পা তখনো টলছে। সেদিনও ঐ জ্ঞানদা আঁশবঁটিতে মাছ কাটছিল, পাশে ছাই

আর মাছের আঁশ গাদা করা। বড়কর্তা ছাইগাদাতেই শোবার উপক্রম করছিলেন, এমন সময় বড়বৌ এসে তাঁকে ধরে নিয়ে গেলেন। আজ সে সব অতীতদিনের কাহিনী গল্প বলেই মনে হয়। কিন্তু কে জানে! মল্লিকা সেই বংশেরই মেয়ে তো! পুরুষমানুষরা যা ক'রে গেছেন, আজ কি ঐ মেয়েটা তাই করতে আরম্ভ করেছে!

হরিমোহন বললেন, "Your mother starts it again!"

ঝঙ্কার দিয়ে মহামায়া বললেন, "আবার ইংরিজি আরম্ভ হ'ল—ইওর মাদার! ইংরিজি বেরবে, যখন মেয়ের বিয়ে দিতে হবে। ওকে কোনোদিন শাসন করলে না, তখন তার ফল টের পাবে।" এই বলে দুমদুম্ ক'রে ভাঁড়ার ঘরের দিকে চলে গেলেন। মহামায়া ইংরিজি জানেন না, কেবল দুটো একটা কথা শুনে শুনে বলতে পারেন। তাই পিতাপুত্রী যখন ইংরিজিতে কথা কইতেন, মহামায়া ভাবতেন তাঁকে নিন্দা করা হচ্ছে।

"আমার বড্ড ভাবনা হয়েছিল মা মণি" হরিমোহন বললেন।

"ভাবনা কিসের বাবা! আমি কি এখনো ছোট আছি?" মল্লিকা হেসে বললেন।

না, মল্লিকা আর ছোট নেই। সত্যিই তো, কি যেন একটা পরিবর্তন ঘটে গেছে। কাল ও ছিল আভা, আজ হয়েছে আলো। কেউ কি ওকে জাগিয়েছে? কে জাগাল?

মল্লিকা স্নান করতে চলে গেলেন। হরিমোহন দেখতে গেলেন গৃহিনীর রাগ পড়ল কি না।

মধ্যাহ্নে আহারের পর হরিমোহন একে একে অসীমের সম্বন্ধে অনেক কথা জিগেস করলেন মল্লিকাকে। তারপর বললেন, "আমার উচিত নিজে গিয়ে তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আসা। যাবে তুমি আমার সঙ্গে?"

"না বাবা, তুমি একাই যাও।"

যাবার ইচ্ছা খুব, কিন্তু সাবধানী মন কেবলই বলে, সুলভ কোরো না, নিজেকে অত সুলভ কোরো না।

"আচ্ছা, তবে আমি একাই যাবো। ড্রাইভার তার বাড়ী চেনে তো?"

"চেনে। বাড়ী পর্য্যন্তই মোটর যায়। একটা চওড়া কাঁচা রাস্তা বড় রাস্তা থেকে নেমে গেছে।"

বিকালে হরিমোহন গেলেন অসীমের ওখানে। অসীম তাঁকে তার জঙ্গল দেখিয়ে আনল, তার কাঠের সঞ্চয় দেখাল। এই যে দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ ছেলেটি এম, এ পাশ ক'রে কেরাণীগিরি করছে না, মাষ্টারি করছে না, ওকালতির জন্যেও লালায়িত নয়, ব্যবসা করছে, এতে হরিমোহন ভারি খুসী। ইয়োরোপে যেয়ে হরিমোহন দেখে এসেছেন সে দেশের মানুষের তেজ, তাদের আত্মনির্ভরতা। এদেশে এম্নি একটা দৃষ্টান্ত দেখবেন এ আশা করেন নি। খুব খুসী হলেন, এবং খুসীর আতিশয্যে তাকে পরের দিন নিমন্ত্রণ করেও ফেললেন। ভোরেই গাড়ী পাঠাবেন। অসীম যেন একটু সকাল সকাল আসে। আনতশিরে অসীম নিমন্ত্রণ গ্রহণ করল। কর্তা ফিরে এসে বারংবার মহামায়াকে বললেন, "বেশ ছেলেটি।"

ভোর না হতেই হরিমোহন হাঁকডাক লাগিয়ে দিলেন, আজ একজন অভ্যাগত আসছে অথচ বাড়ীর লোকের কোনো খেয়ালই নেই। মল্লিকাকে তিনি তাড়া দিয়ে স্নানে পাঠিয়ে দিলেন, খুব ভালো ক'রে পোষাক পরতে বললেন। তারপর নিজের পড়বার ঘরে গিয়ে দাঁড়াতেই দেখলেন একটা ছবির পাশে খানিকটা ঝুল। সচরাচর তাঁর দৃষ্টি কোনো কিছুতেই থাকে না, ফুলদানির বাসি ফুল, ছেঁড়া কাগজের টুকরো, সিগারের প্রান্ত—এসব তিনি গ্রাহ্যের মধ্যেই আনেন না। তাঁর নিজের প্রত্যহ ব্যবহার্য্য জিনিষপত্র সম্বন্ধেও তাঁর খোঁজখবর হয় যখনি সেটা হারায়। তাঁর চশমা হারালে বা একপাটি চটিজুতা খুঁজে না পাওয়া গেলে তখুনি বেয়ারা বিষণ সিংকে তম্বি করেন, বেটা নিশ্চয়ই চটিটা চুরী ক'রে রেখেছে। আর হুকুম দিয়ে বসেন তাকেই একটা পুলিস কনষ্টেবল ডেকে আনতে। আজ কিন্তু ঘুম থেকে উঠে পর্য্যন্ত তাঁর দৃষ্টি হয়েছে অত্যন্ত সজাগ। কেবল চাকরদের বকছেন এখানে নোংরা কেন, ওখানে এটা কে রাখল, ওটা কোথায় গেল, ইত্যাদি। আর ভয় দেখাচ্ছেন সবাইকার পুরো একটি মাসের মাইনে জরিমানা করবেন।

গোলমাল শুনে মহামায়া এলেন ছুটে। পূজায় বসবার আগে শুভ্র শুচিবাস পরেছেন, সদ্যস্নানসিক্ত এলো চুল পিঠের উপর ছড়ানো, চন্দন ঘষে এসেছেন, তারি সুবাস লেগে আছে অঙ্গে। তাঁর দিকে চাইতেই হরিমোহনের সমস্ত ক্রোধ জল হ'য়ে গেল। স্নিগ্ধ প্রসন্ন দৃষ্টিতে তিনি স্ত্রীর দিকে চেয়ে রইলেন।

"কুরুক্ষেত্র বাঁধিয়েছ যে! দেখ, ওদের বেশী ধমক দিও না, ওরা ঘাবড়ে যাবে। আমি পূজায় বসছি। তারপর রান্না আছে।"

"ঐ দেখ! ঝুল ঝাড়া নিয়েই ব্যস্ত ছিলুম, রান্নার কথাটা একেবারে ভুলে বসে আছি। তা কি কি রাঁধতে দিলে আমাকে একবার জিগ্যেস করলে না কেন?"

"দাঁড়াও, আগে বাজার আসুক তবে তো রান্নার ব্যবস্থা।"

"সাড়ে সাতটা বাজল, এখনো তোমার বাজার এল না কেন? কে তোমার বাজার করে? ঐ নবকেষ্ট না? ওরে কে আছিস, ডাক্ নবকেষ্টকে।"

"রক্ষে করো, আর নবকেষ্টকে ডেকে কাজ নেই। তাকে গয়লাবাড়ী পাঠিয়েছি, কিছু বেশী করে দুধ চাই।"

"তা যেন পাঠালে। কিন্তু তোমার বাজার করবে কে?"

"নবকেষ্টই করবে। বাজার তো সাড়ে আটটার আগে বসে না।"

"সাড়ে আটটার আগে বাজার বসে না! কই, এ কথা তো শুনি নি আগে! বাজার এত দেরী ক'রেই বা বসে কেন?

"তা আমি কমন ক'রে বলব? আমি তো আর বাজার বসাই নে।"

"দিচ্ছি আমি এখুনি বরদা বাবুকে লিখে। সাড়ে আটটার আগে বাজার বসাতে পারেন না, কেমনধারা চেয়ারম্যান্ তিনি?"

মুখ টিপে হেসে গৃহিণী বললেন, "আচ্ছা তুমি তোমার বরদা বাবুকেই লিখে দাও। আমি পূজায় চললুম। দেখো, আর হাঁকডাক কোরো না।"

চিঠি লিখে দিয়ে কর্ত্তা ভাবলেন রান্না ঘরে রান্নার কতদূর কি হ'ল সেটা তাঁর নিজের একবার দেখা দরকার। একজন অতিথি আসছে খেতে, রান্না ভাল হওয়া চাই। মহামায়া একলা মানুষ, তাঁকে একটু সাহায্য করাও তো চাই। এই ভেবে রান্না ঘরে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সশরীরে কর্ত্তাকে আসতে দেখে ঠাকুর ভয়চকিত নেত্রে তাড়াতাড়ি মুখের বিড়ি ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। হরিমোহন বললেন, "কি রান্না চাপিয়েছ দেখতে এলুম।"

ঠাকুর বুঝিয়ে দিল সেদিনকার রান্নার ব্যবস্থা। কর্ত্তা বললেন, "এতো দেখছি লম্বা ফর্দ। দুটো উনুনে হবে না। আর একটা উনুন কাটো।" ঠাকুর আপত্তি জানিয়ে বলল, না, তার দরকার হবে না। কিন্তু সে কথা শোনে কে? কর্ত্তা উচ্চৈঃস্বরে মালীকে ডাকলেন। এল মালী তার সাবল কোদাল প্রভৃতি নিয়ে। রান্নাঘরের মেঝেয় মস্ত একটা গর্ত্ত খোঁড়া হল, উনুন তৈরি হবে। হরিমোহন তখন বিষণ সিংকে ডেকে বললেন, একটা চেয়ার এনে দিতে, কতক্ষণ আর দাঁড়িয়ে থাকা যায়। ভোলা গেল তামাক সাজতে, জ্ঞানদা একটা হাতপাখা নিয়ে কর্ত্তাকে বাতাস করতে লাগল, রান্নাঘরটা যে বিশ্রী গরম।

উনুন তৈরি হল বটে, কিন্তু জ্বলতেই চায় না। কর্ত্তা বললেন, "ঝাঁঝরি ক'রে অন্য উনুন থেকে আগুন এনে এইটাতে দাও।" তার ফলে এ উনুনটা তো জ্বললই না, অন্য উনুন দুটোও গেল নিভে। বাঁশের চোঙা নিয়ে ভোলা উনুনে ফুঁ দিতে লাগল। ধোঁয়ায় রান্না ঘর ভরে গেল।

কর্ত্তা বললেন, "রান্নাঘর থেকে ধোঁয়া বেরুবার পথ নেই দেখছি। ছাতে একটা ফুটো করা চাই।" যে জিনিষটি তিনি নিজে না দেখবেন সেটি হবে না। কর্ত্তা বললেন, "ভোলা, নবকেষ্টকে ডাক।"

ভোলা ঘুরে এসে জানাল, নবকেষ্টকে দেখতে পাওয়া গেল না। কর্ত্তা বললেন, "তবে রাধুকে ডাক, আর রাধুকে না পাস্ তো ড্রাইভার বাবুকে ডাক।" কিন্তু রাধুকেও খুঁজে পাওয়া গেল না, আর ড্রাইভার তো গাড়ী নিয়ে অসীম বাবুকে আনতে গেছে।

"ও হাঁ হাঁ", কর্ত্তা বললেন। তিনি একথা ভুলে গেছলেন। "তবে ভোলা তুইই যা। চট ক'রে যেমন ক'রে পারিস একটা রাজমিস্ত্রীকে ডেকে নিয়ে আয়।"

"রাজমিস্ত্রী কোথায় আছেন হুজুর," বিনীত ভাবে ভোলা জিগ্যেস করল।

"ছাখ না, এদিক ওদিক পানে একটু চোখ মিলে তাকিয়েই ছাখ না। বেশী দেরি করিস নি। যাবি আর আসবি।"

ভোলা রাজমিস্ত্রী ধরে আনতে গেল। মালী আর ঠাকুর দুজনে পালা ক'রে উনুনে ফুঁ দিতে লাগল। উনুন জ্বলে না, কেবল ধোঁয়াই বেরয়।

ভোলার ফিরতে দেরী দেখে হরিমোহন মালীকে পাঠালেন তার খোঁজে। মালীও ফেরে না। তখন অগত্যা ঠাকুরকে যেতে হ'ল মালীকে ধরে আনতে। ঠাকুরটাও তেমনি, গেল তো আর আসবার নাম নেই। অগত্যা পাখা করা বন্ধ রেখে জ্ঞানদা গেল ঠাকুরের সন্ধানে। পূজা সেরে মহামায়া এলেন রান্নাঘরে, পিছন পিছন নবকেষ্ট এল রাশীকৃত বাজার নিয়ে। গৃহিণী দেখলেন রান্নাঘর জনশূন্য, উনুন সব নিভে গেছে, কাদাতে মাটিতে আর ছাইয়ে রান্নাঘরের মেঝে বিপর্য্যস্ত আর রান্নাঘরের বারান্দায় চেয়ার টেনে ব'সে কর্ত্তা তামাক খাচ্ছেন গড়গড়াতে।

(ক্রমশঃ)

সহজ ইঙ্গিত

—শ্রীশ্যাম বসাক

দুধ—

রূপচর্য্যায় দুধকেও নানাভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে। সকল বয়সের নরনারীই যে দুধের বাহ্যিক প্রয়োগ দ্বারা উপকৃত হবেন একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

মধুর ন্যায় দুধও হচ্ছে আর একটা প্রথম শ্রেণীর বর্ণবর্দ্ধক উপকরণ। দুধের প্রয়োগ কখনও ব্যর্থ হয় না, যে ভাবেই হোক কিছু না কিছু ফল দেয়ই। সত্যিকারের ফল পেতে হলে অন্ততঃ কিছুদিন দুধ নিয়মিত ব্যবহার করা উচিত।

দৈনন্দিন রূপচর্য্যায় দুধকে প্রধান স্থান দিলে অতি সহজেই যথেষ্ট পরিমাণে সাফল্য লাভ করা যায়। অথচ ব্যাপারটী বিশেষ ব্যয় বহুলও নয়। কারন খুব বেশী পরিমাণ দুধ একজন্য প্রয়োজন হয় না। নিয়মিত ব্যবহারের পক্ষে সামান্য পরিমাণ দুধই যথেষ্ট।

রুক্ষ গাত্রচর্ম্মকে মসৃণ রাখার জন্য দুধের প্রয়োজন সমাধিক। চার পাঁচ চামচ দুধ একটা ছোট পাত্রে রাখুন। অল্প পরিমাণ তুলো বা পরিস্কৃত কাপড়ের টুকরো ঐ দুধে ভিজিয়ে প্রথমে একবার সমস্ত মুখে ঘাড়ে এবং গলায় মাখিয়ে দিন। এবার ধীরে ধীরে ঐ সকল জায়গা অল্প চাপের সঙ্গে রগড়াতে থাকুন। দুধ বেশ ভালভাবে শুকিয়ে গেলে আর একবার লাগান দরকার। এবার রগড়াবার কোন প্রয়োজন নাই। তবে শুকিয়ে যাওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। পরে সাবান দিয়ে মুখ ঘাড় প্রভৃতি ধুয়ে জল মুছে নেওয়ার পর কয়েক ফোঁটা বাদাম তেল ঐ সকল জায়গায় বুলিয়ে দিন। পাঁচ মিনিট পরে শুকনো তোয়ালে দিয়ে ঐ তেল যতদূর সম্ভব তুলে ফেলুন।

মসৃণ চর্ম্মের পক্ষেও দুধ উপযোগী। এক্ষেত্রে পূর্ব্বোক্ত নিয়মে দুধ প্রয়োগ করার পর কেবলমাত্র সাবান দিয়ে ধুলেই চলবে। পরে তেল মাখার কোন প্রয়োজন নাই। **মুখে ব্রণ থাকলে দুধ না মাখাই ভাল।**

আরও কিছু বেশী দুধ ব্যবহার করায় কোন অসুবিধা না থাকলে সপ্তাহে অন্ততঃ একদিন স্নানের পূর্ব্বে সর্ব্বাঙ্গে পূর্ব্বের নিয়মে দুধ মেখে, পরে সাবান মাখা যেতে পারে, হিসাব করলে দেখা যাবে এইভাবে দুধ ব্যবহার করলে প্রাপ্তফলের তুলনায় খরচ খুব বেশী হয়না।

চোখের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য রক্ষার পক্ষে দুধ বিশেষ অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করে। মাঝে মাঝে দু'চার ফোঁটা দুধ প্রয়োগ করলে চোখ বেশ ভাল থাকে। চোখের নীচেকার কালোদাগ বা কুঁচকে যাওয়া ভাব দুধ প্রয়োগের দ্বারা বিদূরিত হয়। রাত্রে শোবার আগে ঐ অংশে একটু দুধ লাগিয়ে কিছুক্ষণ রাখার পর তোয়ালে দিয়ে মুছে ফেললেই হবে, ধোবার কোন দরকার নাই।

চুলের স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির পক্ষেও দুধ যথেষ্ট সহায়তা করে। মাথা ধোবার দিন খানিকটা দুধ সমস্ত চুলের গোড়ায় মাখিয়ে দশ মিনিট রাখার পর যথারীতি পরিষ্কার করে নিলেই চলবে। অসুবিধা না থাকলে মাঝে মাঝে চুলে দুধ মাখা যেতে পারে। দুধ চুলের শ্রীবর্দ্ধক ও তারুণ্য সংরক্ষক।

বাহ্যিক প্রয়োগের সঙ্গে দুধ আভ্যন্তরিক গৃহীত হলে ফল আরও তাড়াতাড়ি পাওয়া যায়। প্রত্যহ রাত্রে শোবার আগে এক পেয়ালা অল্প গরম দুধ খেলে শরীর যেমন অপেক্ষাকৃত সুস্থ হয় তেমনই স্বাভাবিক বর্ণও অন্ততঃ কতক পরিমাণেও বেড়ে যায়।

পোষাক পরিচ্ছদ

ইংরেজী বর্ণমালা প্যাটার্ণ

শ্রীমতী গায়ত্রী দেবী

"M"

(১৪ ঘরে উঠিবে)

১ম কাঁটা—১ ঘর সাদা, ২ ঘর কাল, ৪ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ২ ঘর সাদা, ৩ ঘর কাল, ১ ঘর সাদা।

২য় কাঁটা—১ ঘর কাল, ৩ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ২ ঘর সাদা, ২ ঘর কাল, ১ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ২ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল।

৩য় কাঁটা—২ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ১ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ১ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ১ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ২ ঘর সাদা, ২ ঘর কাল, ১ ঘর সাদা।

৪র্থ কাঁটা—৬ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ১ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ১ ঘর সাদা, ২ ঘর কাল, ২ ঘর সাদা।

৫ম কাঁটা—১ ঘর সাদা, ২ ঘর কাল, ২ ঘর সাদা, ঘর কাল, ৭ ঘর সাদা।

৬ষ্ঠ কাঁটা—৮ ঘর সাদা, ২ ঘর কাল, ২ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ১ ঘর সাদা।

৭ম কাঁটা—১ ঘর কাল, ৩ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ৯ ঘর সাদা।

"N"

(১৮ ঘরে উঠিবে)

১ম কাঁটা—৯ ঘর সাদা, ২ ঘর কাল, ৩ ঘর সাদা, ৩ ঘর কাল, ১ ঘর সাদা।

২য় কাঁটা—১ ঘর কাল, ৩ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ৩ ঘর সাদা, ২ ঘর কাল, ৮ ঘর সাদা।

৩য় কাঁটা—৮ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ৩ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ২ ঘর সাদা, ২ ঘর কাল, ১ ঘর সাদা।

৪র্থ কাঁটা—৬ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ২ ঘর সাদা, ২ ঘর কাল, ৪ ঘর সাদা, ২ ঘর কাল, ১ ঘর সাদা।

৫ম কাঁটা—১ ঘর কাল, ২ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ঘর সাদা, ঘর কাল, ১ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ১ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ৭ ঘর সাদা।

৬ষ্ঠ কাঁটা—৮ ঘর সাদা, ২ ঘর কাল, ২ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ৪ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল।

৭ম কাঁটা—১ ঘর সাদা, ৪ ঘর কাল, ৩ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ৯ ঘর সাদা।

"O"

(১১ ঘরে উঠিবে)

১ম কাঁটা—৫ ঘর সাদা, ৩ ঘর কাল, ৩ ঘর সাদা।

২য় কাঁটা—১ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ৩ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ৪ ঘর সাদা।

৩য় কাঁটা—৩ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ৪ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ২ ঘর সাদা।

৪র্থ কাঁটা—১ ঘর সাদা, ৪ ঘর কাল, ২ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ৩ ঘর সাদা।

৫ম কাঁটা—২ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ২ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ১ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ২ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল।

৬ষ্ঠ কাঁটা—১ ঘর কাল, ৩ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ১ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ১ ঘর সাদা, ২ ঘর কাল, ১ ঘর সাদা;

৭ম কাঁটা—১ ঘর কাল, ১ ঘর সাদা, ৫ ঘর কাল, ১ ঘর সাদা, ২ ঘর কাল, ১ ঘর সাদা।

বিজনদা'র চিঠি

আমার আদুরে ভাই বোনেরা,

আমরা একজন পুরো 'বাঙ্গালী'কে হারালাম গত শুক্রবার। সত্যিই ভাই, তাঁ'ছাড়া আর আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র সম্বন্ধে নতুন করে পরিচয় দেবার কিছু নেই, কারণ তিনি তাঁর নিজের পরিচয় নিজেই দিয়েছেন জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে। তাই তিনি বৈজ্ঞানিক, ব্যবসায়ী, সাহিত্যিক, দেশ-সেবক, রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক, ও সমাজ-সেবক মহলেও পরিচিত। এইজন্যে সবাই তাঁকে জানে, তিনি বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিভা সম্পন্ন ব্যক্তি।...আচার্য্যদেবের সব চেয়ে বড় পরিচয় হচ্ছে দেশবাসীর জন্য তাঁর দান আর স্বার্থত্যাগ। এই ত্যাগী ঋষি তাই বাঙ্গালীর কাছে দেবতা বলে পূজা পাবার যোগ্য। এতো সরল আর সাদাসিধা লোক আচার্য্যদেবের আগে কোন স্বনামধন্য ব্যক্তিকে দেখিনি। ...আজ সবচেয়ে চিন্তার কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে সবার কাছে এই যে, আচার্য্যদেব নেই। তাই বাংলা-দেশের সেই দুর্দ্দিনে—যেদিন বন্যার জন্যে বাঙ্গালী ভেসে যাবে, দুর্ভিক্ষে অনাহারে, মহামারীতে যেদিন শত-সহস্র লোকে মারা যাবে, সেদিন ত্রাণকর্ত্তারূপে বাঙ্গালীর পাশে কে গিয়ে দাঁড়াবে? কে গিয়ে তাদের জন্যে ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করবে?...সকলের বিশ্বাস যে এই দিক দিয়ে বাঙ্গালীর যে ক্ষতি হলো তা আর সহজে পূরণ হবে না...কিন্তু আমি আশাবাদী, তাই আমি আশা রাখি যে আমার ভাই-বোনেরা আচার্য্যদেবের আদর্শে নিজেদের গড়ে তুলবে। আর বাংলার সে দুর্দ্দিনের দিনে মৃত্যুমুখী বাঙ্গালীর পাশে সাহায্যকারী হিসাবে দাঁড়িয়ে তারাই মৃত্যুর পথ থেকে আমাদের জাতিকে বাঁচিয়ে নিয়ে আসবে।... আমার এ আশা সত্যে পরিণত হওয়া কি অসম্ভব? মনে থাকে যেন তোমরা আমাদের জাতির ভবিষ্যৎ, তাই তোমাদের ওপর আমাদের জাতি অনেক কিছুর আশা রাখে!

আজ যাবার আগে তোমাদের সবার সঙ্গে আমিও আচার্য্যদেবের পরলোকগত আত্মার উদ্দেশ্যে ভক্তিভরে প্রণাম জানাই।

তোমাদের : বিজনদা'

মনে রেখো

"বাঙালী আজ জীবন-মরণের সন্ধি-স্থলে উপস্থিত। একটা সমগ্রজাতি মাত্র কেরানী ও মসীজীবী হইয়া টিকিয়া থাকিতে পারে না; বাঙালী এতদিন সেই ভ্রান্তির বশবর্ত্তী হইয়া আসিয়াছে এবং তাহারই ফলে আজ সে সকল প্রকার জীবনোপায় ও কর্ম্মক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত। বৈদেশিকগণের ত কথাই নাই, ভারতের অন্যান্য প্রদেশস্থ লোকের সহিতও জীবন-সংগ্রামে আমরা প্রত্যহ হটিয়া যাইতেছি। বাঙালী যে 'নিজ বাসভূমে পরবাসী' হইয়া দাঁড়াইয়াছে, ইহা আর কবির খেদোক্তি নহে, নিদারুণ রূঢ় সত্য। জাতির ভবিষ্যৎ যে অন্ধকারাবৃত তাহা বুঝিতে দূরদৃষ্টির প্রয়োজন হয় না। কিন্তু তাই বলিয়া আশা-ভরসায় জলাঞ্জলি দিয়া হাত গুটাইয়া বসিয়া থাকিলেও চলিবে না। 'বৈষ্ণবী-মায়া' ত্যাগ করিয়া দৃঢ়হস্তে বাঁচিবার পথ প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে।" —আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র।

ছেলেটাকে চেনো?

—রূপকুমার

ঢং...ঢং...করে ঘরের দেওয়াল ঘড়ির সঙ্কেতের সাহায্যে জানিয়ে দিল যে এখন রাত তিনটে।...পৃথিবী এখন নিস্তব্ধ... নিশাচরেরা ছাড়া সবাই নিচ্ছে বিশ্রাম।... কিন্তু ঐ ঘড়ির সঙ্কেতধ্বনি একটা বারো বছরের ঘুমন্ত ছেলেকে জাগিয়ে তুলে বসাল তার শয্যায়।...নিজের হাতে চোখ-মুখ রগড়ে নিয়ে ছেলেটা তার ঘুমের ঘোর কাটিয়ে একটা দেশলায়ের কাঠির সাহায্যে অন্ধকার ঘরটা আলোকিত করে তুললো।... তারপর সেই জ্বলন্ত কাঠিটা ঘরের মধ্যে তেলের প্রদীপের মুখে নিয়ে গিয়ে ধরলো, কিন্তু তা জ্বলে উঠলো না তেলের অভাবে। ...দুঃখিত মনে ছেলেটা অন্ধকার ঘরে হতাশ হয়ে ফিরে এসে নিজের বিছানায় বসে বসে ভাবতে লাগলো...তাই তো, আজ তা' হলে আলোর অভাবে পড়া হবে না। প্রদীপটাও দেখছি আমার পিছনে লেগেছে, আমি রাতে উঠে পড়ি সে ইচ্ছে নেই।...

এরপর তোমরা হয়তো ভাবছো যে ছেলেটা বুঝি দুঃখিত মনে আলোর অভাবে আবার নিজের বিছানায় শুয়ে পড়লো ঘুমবার জন্যে? কিন্তু তা' নয়!...হঠাৎ কি ভেবে ছেলেটা আবার দেশালাইয়ের কাঠির সাহায্যে ঘর আলোকিত করে তুল্লো, তারপর সেই আলোর সাহায্যে ঘরের এক কোন থেকে এক শিশি মাথায় মাখা ফুলেল তেল বার করে তা' নিয়ে গিয়ে ঢাললো ঐ প্রদীপের মধ্যে। এর পরের ঘটনা আশা করি তোমাদের কাছে বলতে হবে না, কারণ যা তোমরা সবাই অনুমান করেছো তাইই ঠিক।...এই ছেলেটাকে তোমরা নিশ্চয়ই চিনতে পেরেছ?...হ্যাঁ, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র হচ্ছেন ইনিই।

২৯নং প্রতিযোগিতা

বিষয় : সবার শ্রদ্ধেয় আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র। প্রতিযোগিতায় যোগদানের শেষ তারিখ হচ্ছে ৮ই জুলাই।

পুরস্কার : ১ম, আচার্য্য স্মৃতিপদক, ২য় ও ৩য় : বই।

ছুটির ঘন্টা ২৯নং প্রতিযোগিতা কুপন।

নাম ....

বয়স: ....

ঠিকানা : ....

"মৃত্যু যাঁদের নাই"

শ্রীকিষণচাঁদ বর্মণ (৫৩)

......কি অদ্ভুত ত্যাগ! কি মহান স্বদেশপ্রেমিকতা!! কি নিঃস্বার্থ কর্ম তৎপরতা!!! বিশ্বাস হয় না যে রক্তমাংসে গড়া মানুষের পক্ষে এতদূর নিঃস্বার্থ ত্যাগ সম্ভব কি করে হয়!! কিন্তু অবিশ্বাসের কিছুই নাই, এই দেবভূমি সোনার বাংলার কোলেই জগতের বরেণ্য বিজ্ঞানাচার্য মনীষী প্রফুল্লচন্দ্রের জন্ম হয়েছিল ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ২রা আগষ্ট তারিখে। আজীবন চিরকৌমার্য ব্রত কঠোরভাবে পালন করে শুধু দেশের সেবায় আর আর্তের কল্যাণে নিজস্ব সত্ত্বাকে পর্য্যন্ত নিঃশেষে বিলিয়ে দেওয়া, এ কি কম দেবত্ব! দেবতারও বুঝি এতখানি বুকের বল নাই। কই আর কাউকে তো কখনো বলতে শুনিনি এমনি কথা?—"বিশ্ববিদ্যালয় আমার স্ত্রী, আর ছাত্রেরাই আমার ছেলে..."

আচার্যদেব কিন্তু একথা বলতে পেরেছিলেন, এবং শুধু বলা নয়, কাজেও অক্ষরে অক্ষরে একথা পালন করেছিলেন। তাঁর দীর্ঘ কর্মবহুল জীবনে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত তিনি যা কিছু অর্থ উপার্জন করেছেন, সমস্তই দেশের সেবায় আর বিজ্ঞানের কল্যাণে দান করে গেছেন। রসায়ন শাস্ত্রে এমন সব গবেষণা তিনি করে গেছেন যা জানবার সুযোগ এখনো আমাদের হয়নি, কিন্তু বিজ্ঞান ক্ষেত্রে তাঁর সেই সব আবিষ্কার তাঁকে চিরকাল অমর করে রাখবে। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-সাহিত্য অত্যন্ত দুর্বল—এটা তাঁর বড়ই আক্ষেপের বিষয় ছিল। নাম কেনবার মোহ বা বক্তৃতায় আসর গুলজার করবার উন্মাদনা থেকে তিনি চির-বঞ্চিত রাখতেন নিজেকে—তাঁর কীর্ত্তি ছিল অন্তঃসলিলা ফল্গুর মতই নীরবে আর লোকচক্ষুর অগোচরে। সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, দর্শনে, কলায় দেশে মনীষীর অভাব নেই, কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে হোক্ বা পরোক্ষভাবেই হোক্ তাঁদের প্রত্যেকের অনুষ্ঠানের পেছনে কিছু না কিছু নামের মোহ আছে। তাঁদের নিজস্ব বলে প্রত্যেকেরই বলবার মত কিছু রয়েছে—কিন্তু বিস্ময়ের দৃষ্টি নিয়ে মুগ্ধনেত্রে যখনই তাকাই বাংলার এই ব্রহ্মচারী বিজ্ঞানগুরু আর্তবন্ধু প্রফুল্লচন্দ্রের ঋষিপ্রতিম মূর্তির পানে—সেখানে দেখি নেই কোন নামের মোহ, নিজেকে জাহির করবার কোন প্রয়াস—নিঃস্ব, দধীচী মুনির মত শুধু যেন জগৎকে নিজস্ব সবকিছু বিলিয়ে দিতেই এই মহাপুরুষ [illegible] আর মহাত্যাগী বিধ্বস্ত অনাথা বাংলার মাটিতে নেমে এসেছেন ত্রাতা দাতা হয়ে।

......দেশে দুর্ভিক্ষের হাহাকার উঠেছে, বন্যায় ভেসে গেছে লোকের বাড়ীঘর দোর—আর্ত মুমূর্ষুর ব্যাথাতুর আর্তনাদে দেশের আকাশ-বাতাস মুহ্যমান হয়ে উঠেছে—দেশের দিক্‌পাল নেতাদের মত আচার্যদেব বিলাসের আড়ম্বরে আচ্ছাদিত হয়ে, নগরীর সৌধ অট্টালিকার ছায়ায় বসে ওজস্বিনী ভাষায় কাগজ-কলমের সাহায্যে দেশকে কাঁপিয়ে তুলে নিজেকে দেশ-প্রেমিক বলে জাহির করেন নি—আর্ত [illegible] আতুরের কুটিরে কুটিরে, বিধ্বস্ত অঞ্চলের আনাচে-কানাচে তিনি নিজে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন—কাঁধে তাঁর ভিক্ষের ঝুলি, পরণে তাঁর চিরাচরিত সেই বঙ্গসন্তানের দীনহীন বেশবাস, মুখে তাঁর সহানুভূতির দৃষ্টি, বুকে তাঁর করুণা আর স্নেহের প্রস্রবন, আজীবন ব্রহ্মচর্য পালনে শরীর তাঁর হিমাদ্রির মতই অটল দুর্ভেদ্য!!

......তাঁর কথা কে না জানে? বিলিতি ওষুধ বেশী দাম দিয়ে কিনে দেশের পয়সাওলা লোকেরা চিকিৎসা করাতে পারে, কিন্তু যে দেশের বেশীর ভাগ লোকই দু'বেলা দু'মুঠো পেট ভরে খেতে পায় না, অত দাম দিয়ে তারা ওষুধ কেনবার পয়সা পাবে কোথা হতে? দেশে কিন্তু পয়সাওলা, বুলিওলা দেশহিতৈষীর অভাব নেই, তাদের কারুরই প্রাণ এতে কেঁদে ওঠেনি—কেঁদেছিল আচার্যের প্রাণ, তাই প্রতিষ্ঠা হোল ওষুধের বিরাট এক কারখানা বেঙ্গল কেমিক্যাল এ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস—লক্ষ লক্ষ মৃতের প্রাণ সঞ্চার হোল, লক্ষ লক্ষ বেকারের অন্ন-সংস্থান হোল, দেশের আর দশের এক মহা কল্যাণ সাধিত হোল।

......গত ১৬ই জুন শুক্রবার সন্ধ্যা ৬-২১ মিনিটে আর্তবন্ধু বিজ্ঞানাচার্য রায়ের মহাপ্রয়াণ ঘটেছে...মনে পড়ে ঠিক এই দিনে বংগজননী আর এক কৃতি সন্তানকে হারিয়েছিল, তিনিও এক ত্যাগী মহাপুরুষ—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। রক্তমাংসে গড়া এ দেহের অবসান একদিন হবেই—"Dust thou art to dust returnest..." মাটির শরীর মাটিতে মিলিয়ে যাবেই। কিন্তু প্রফুল্লচন্দ্রের মৃত্যু কোথায়? পৃথিবীতে যতদিন চন্দ্র-সূর্য উঠবে—আচার্যদেব ততদিন বেঁচে থাকবেন, লোকের হৃদয়মন্দিরে তিনি চিরদিন পূজা পাবেন, মৃত্যুর করাল ছায়া আচার্যের অমর আত্মাকে ঢাকতে পারবে না—মহতের মৃত্যু নেই!!

মানব ভাবধারার প্রত্যক্ষ প্রতিচ্ছবি, পিতা ও পুত্র—এই দুই পুরুষের কাহিনী রঞ্জিত
সানরাইজ পিকচার্সের উদ্দেশ্যমূলক চিত্র-গাথা
মা-বাপ • মা-বাপ
শ্রেষ্ঠাংশে: বীণা (নাজমা প্রসিদ্ধা), মাজিদ, ইয়াকুব,
জগদীশ শেঠী, দীক্ষিত ও এম, মুসারফ
পরিচালনা: ভি, এম, ব্যাস
অষ্টআশি বৎসরের পুরাতন সভ্যতা ও সামাজিক রীতির চাঞ্চল্যমান প্রতিচ্ছবি
সিলভার ফিল্মসের
বড় নবাব সাহেব
দুর্দান্ত ও তোতলার ভূমিকায় বাংলার খ্যাতনামা
অভিনেতা পাহাড়ী সান্যাল
তৎসহ চন্দ্রমোহন, প্রমিলা, বিবো, কুমার, ঘোরী, লীলা মিশ্র
কাহিনী: সামস্ (লক্ষ্ণৌয়ী)
পরিচালনা: ভেদী
সঙ্গীত: বসির (দেলভী)
ছায়াছবির পর্দায় জীবনের ছন্দ
• গীতিমধুর চিত্রালেখ্য
আসন্ন মুক্তি-কামী
কমলা টকীজের
সোহানা গীত
ভূমিকায়: রোমিলা, ত্রিলোক কাপুর, নবীন যাজ্ঞিক
পরিচালক: এম, এ, মির্জা
রসিক প্রোডাকশন্সের
রাহগীর
শ্রেষ্ঠাংশে: শাস্তারীণ, ত্রিলোক কাপুর, মাসুদ, সাহাজাদী
পরিচালক: এ, রসিদ
সংগীত: এইচ, খাঁ মস্তানা
মুক্তি দিবসের অপেক্ষায় থাকুন
পরিবেশক:
বেঙ্গল ফিল্ম ডিষ্ট্রীবিউটার্স
৭২, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
গ্রাম: KALSUP
ফোন: বি, বি, ৫৫১৫

খেলার মাঠে

শ্রীউমেশ মল্লিক বি, এ

অশিষ্ট আচরণ

ত্রুটি বিচ্যুতিপূর্ণ পরিচালনাকে কেন্দ্র করে গত শুক্রবার খেলার মাঠে যে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে তা অতীব নিন্দনীয়। মহমেডান দলের এ দিন পুলিশের সঙ্গে অমীমাংসিতভাবে শেষ হওয়ায় মহমেডান দলের সমর্থকরা ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে। ক্রীড়া-পরিচালক মিঃ এন চ্যাটার্জী যখন খেলার অনেক পরে বাড়ী ফিরছিলেন তখন কয়েকজন মহামেডান দলের সমর্থক তাকে আক্রমণ করে। সৌভাগ্যবশতঃ কয়েকটি ব্যক্তির সহায়তায় এবং কয়েকজন রেফারীস্ এসোসিয়েশনের সভ্যদের প্রচেষ্টায় পরিচালক মহাশয় নির্দ্দয়ভাবে প্রহৃত হওয়ার হাত থেকে এ যাত্রায় রক্ষা পান।

খেলায় জয়-পরাজয় আছে। সব সময় ক্রীড়া পরিচালনাও নিখুঁত হওয়া সম্ভব নয়। এজন্য যদি কোন দলের সমর্থকরা নিরীহ পরিচালককে দলবদ্ধভাবে আক্রমণ করে প্রহার করে সেটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়।

খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড

সংবাদে প্রকাশ, ইষ্ট বেঙ্গল দল তাদের খেলোয়াড়দের উন্নতিকল্পে জনৈক ইংরাজ পেশাদার খেলোয়াড়কে নিযুক্ত করেছে। বাঙ্গলাদেশে অভিজ্ঞ বাঙ্গালী খেলোয়াড়ের কি এতই অভাব ?

খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ডের উন্নতির জন্য শুধু শিক্ষক নিযুক্ত করলেই দায়িত্ব শেষ হয়ে গেল বলে যেন কর্ত্তৃপক্ষরা না মনে করেন। সর্ব্বপ্রথম প্রয়োজন খেলোয়াড়দের স্বাস্থ্য। এজন্য রীতিমত ব্যায়ামাগার এবং ব্যায়াম চর্চ্চার প্রয়োজন। ফুটবল খেলার মরশুম আগতপ্রায় বলে খেলার পূর্ব্বে কয়েকমাস ফুটবল খেলার নিমিত্ত ব্যায়ামগুলির অনুশীলনী করলেই চলবে না। সারা বৎসর এগুলির অভ্যাস রাখতে হবে। এবিষয়ে লক্ষ্য রাখার ফলেই বৈদেশিক খেলোয়াড়দের খেলার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্যেরও উন্নতি দেখা যায়।

বর্ত্তমানে খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্রমশই নিম্নস্তরের হচ্ছে। এজন্য বিশিষ্ট খেলোয়াড় সামাদ, গোষ্ঠ পাল, হাবুল সরকার প্রভৃতি দুঃখ প্রকাশ করে মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। উপরোক্ত বিশিষ্ট খেলোয়াড়গণ যদি সম্মিলিত প্রচেষ্টায় উদীয়মান খেলোয়াড়দের শিক্ষার ব্যবস্থা করেন তা হলে বোধহয় খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ডের উন্নতি হওয়া সহজসাধ্য হয়। অভিজ্ঞতার দিক দিয়ে সামাদ প্রভৃতির সঙ্গে খুব কমই ইংরাজ শিক্ষকের তুলনা করা চলে। সুতরাং এঁরা যদি এবিষয়ে অগ্রণী হন তা'হলে বাঙ্গলা দেশের খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ডের উন্নতি হতে পারে। কোন প্রকার প্রচেষ্টা না করে কাগজে কেবলমাত্র মন্তব্য প্রকাশের কোন মূল্য হয় না।

আই, এফ, এর সুবর্ণ জয়ন্তী

আই, এফ, এ সুবর্ণ জয়ন্তী সম্বন্ধে যথাযথ ব্যবস্থা করার জন্য একটি বিশেষ সাব কমিটি গঠিত হয়েছে। সবিশেষ কিছু স্থিরীকৃত না হলেও সংবাদে প্রকাশিত হয় যে আগামী সেপ্টেম্বর মাসে মোহনবাগান ভেটারান্স বনাম অবশিষ্ট দলের একটি মনোমদ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হয়েছে। এ অনুষ্ঠানের মধ্যেও বোধহয় আন্তঃপ্রাদেশিক ফুটবল প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইনাল এবং ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হবে। বম্বে প্রদেশ এ বৎসর তাদের পূর্ব্বের মনোভাব বজায় রেখেছে। এ প্রকার অনুষ্ঠান নাকি গমনাগমনের অসুবিধার ফলে স্থগিত রাখা উচিত এই তাদের মনোভাব। আশ্চর্য্য !

লীগের প্রথমার্দ্ধ

লীগের প্রথমার্দ্ধ শেষ হওয়ার পরও আরো কতকগুলি প্রতিদ্বন্দ্বীতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সব দিক দিয়ে বিচার করলে মোহনবাগানকে এবৎসরে দুর্দ্ধর্ষ টীম বলে মনে হয়। ফলে লীগ তালিকায় তারা এখনো শীর্ষস্থান অধিকার করে আছে এবং মোহনবাগানের সঙ্গে অন্যান্য বিশিষ্ট প্রতিযোগিদের ব্যবধান তিন পয়েন্টসের। মোহনবাগান দল প্রথমার্দ্ধে ডালহৌসীর বিরুদ্ধে অমীমাংসিতভাবে শেষ করে একটি মূল্যবান পয়েণ্ট নষ্ট করে এবং প্রথমার্দ্ধের শেষ খেলায় বি এণ্ড এ আর-এর কাছে ১-০ গোলে পরাজয় বরণ করেছে। মহমেডান দলের অবস্থা এবৎসরে অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল। প্রথমার্দ্ধের প্রারম্ভেই তারা মোহনবাগান দল এবং এরিয়ান্সের নিকট পরাজিত হয়। এতদ্‌ব্যতীত মহমেডান দল পুলিশ এবং রেঞ্জার্সের বিরুদ্ধে ড্র করে। পূর্ব্বের সমস্ত খেলোয়াড়ই বর্ত্তমানে এদলে খেলছে, কিন্তু এদের আর পূর্ব্বের মত দৃঢ়তা নেই। এক নূর মহম্মদ (ছোট) ব্যতীত সকলেই এক স্তরের।

ইষ্ট বেঙ্গল দলের কয়েকজন অ-বাঙ্গালী খেলোয়াড় দলত্যাগ করায় এঁরা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত। ঢাকা, বার্ম্মা প্রভৃতি থেকে খেলোয়াড় সংগ্রহ করে দলটি কোন রকমে সুনাম বজায় রাখার চেষ্টায় আছে। বাঙ্গালী খেলোয়াড়দের সুযোগ না দিয়ে অন্য প্রদেশের খেলোয়াড়দের তদ্বির করলে এযাবৎ অসুবিধায় পড়তে হয়, আশা করি ই, বি, দল একথা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করছেন। এ দলের কে, দত্ত একটি বিশিষ্ট

সম্পদ। আক্রমণ বিভাগের খেলা সুনীল ঘোষ, স্বরাজ ঘোষ, পরেশ মুখার্জী, পাগলজী, সুশীল চট্টোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টায় কোনরূপে ই: বি: দলের সম্মান বজায় আছে। কিন্তু মধ্যভাগের অবস্থা অতীব শোচনীয়, ফলে মোহনবাগান এবং মহমেডান দলের নিকট এঁদের পরাজয় স্বীকার করতে হয়। ভবানীপুর সোমানা, আপ্পা রাও-এর উপর বিশেষ আস্থাবান ছিল। কিন্তু তাদের অনুপস্থিতিতে দলটি প্রাণহীন বলে মনে হয়। অভাবনীয়ভাবে এরা পরাজিত হচ্ছে। ডি, সেন এদের বিশেষ কার্য্যকরী হচ্ছে না। এন, গুহর খেলা ভাল হয়। আর দাস, এস ঘোষ, এস দাস প্রভৃতির খেলা মোটের উপর ভাল। কালীঘাট মোহিনী ব্যানার্জীর অভাবেও বেশ দৃঢ়তার পরিচয় দিচ্ছে। বাঙ্গালী উদীয়মান খেলোয়াড়দের এদল যে সুযোগ-সুবিধা দেয় তা প্রশংসনীয়। এঁদের অভিনন্দন জানাচ্ছি।

ডি চন্দ্র, এন বোস, এস কে মিত্রের খেলা প্রাণস্পর্শী। স্পো: ইউ: দলের খেলায় কিছু উন্নতি হয় নি। এরিয়ান্স দল প্রথম প্রথম কয়েকটি খেলায় অভাবিত ভাবে পরাজিত হলেও তারা ক্রমশ: উন্নতি করছে।

গত সপ্তাহের খেলা

গত সপ্তাহে মোহনবাগান দল সর্ব্বপ্রথম এ বৎসরে রেল দলের নিকট পরাজিত হয়ে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে। আক্রমণ বিভাগের ব্যর্থতাই সর্ব্বপ্রথম চোখে পড়ে। এদিন অমল মজুমদারের খেলা খুব ভাল হয় নি। অনিল দে আলাউদ্দিনের দ্রুত গতির সঙ্গে সমতা রক্ষা করতে না পারায় তার খেলা নিম্ন স্তরের হয়। শরৎ দাসের গাফিলতিতে মোহনবাগান দল পরাজিত হয়। চঞ্চল বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। বি, কর গোলটি দেন।

ই: বি: দল পুলিশের বিরুদ্ধে অমীমাংসিত ভাবে খেলা শেষ করে আর একটি পয়েণ্ট নষ্ট করে। কে, দত্তের মত গোলরক্ষকের গোলটি রক্ষা করা উচিত ছিল। সুশীল চট্টোপাধ্যায় একটি অবধারিত গোলের সুযোগ নষ্ট করে।

মহমেডান ও পুলিশ দলের খেলাটির ফলাফল অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়।

বি, এণ্ড, এ, আরের সঙ্গে দ্বিতীয় খেলায় মোহনবাগান তাদের পূর্ব্ব পরাজয়ের প্রতিশোধ নিয়েছে। এদিন মোহনবাগান এত ভাল খেলে যে যদি তারা ৬ গোলে জয়লাভ করতো তাহলেও অত্যুক্তি হত না। কিন্তু রেল দলের গোলকীপার কতকগুলি অব্যর্থ গোল রক্ষা করে কৃতিত্বের পরিচয় দেন। এদিন মোহনবাগান একটি পেনালটী পায়, কিন্তু মান্নার সট বারে লাগে। নির্ম্মল মুখার্জী একটি হেড করে গোল দেন সেটি অফসাইড বলে অগ্রাহ্য হয়। শেষে সমাপ্তির এক মিনিট পূর্ব্বে বিজন বসু প্রয়োজনীয় গোলটি দেন।

নানাকথা

রবি-বাসরে আচার্য্য প্রফুল্ল-চন্দ্রের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ

গত ৪ঠা আষাঢ় রবিবার অপরাহ্নে, বালিগঞ্জ-হিন্দুস্থান পার্কে, সুকবি শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেবের আবাসে রবি-বাসরের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। প্রথমে, সর্ব্বাধ্যক্ষ রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র নাথ মিত্র মহাশয় আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের পরলোকগমনে শোক প্রস্তাব উত্থাপন করিলে, সভাস্থ সকলে নীরবে দণ্ডায়মান থাকিয়া প্রস্তাবটী গ্রহণ করেন। তৎপরে "বর্ষামঙ্গল" উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীযুক্ত সুনীল রায়ের পরিচালনায় "গীতভারতী"র ছাত্র-ছাত্রীগণ কর্ত্তৃক উদ্বোধন সঙ্গীতের পর ক্রমান্বয়ে একটী করিয়া রবীন্দ্রনাথের বর্ষার কবিতা পাঠ ও বর্ষার গান চলিতে থাকে। সুকবি শ্রীমতী মমতা মিত্র, সুকবি শ্রীমতী রাধারাণী দেবী, সুকবি শ্রীযুক্ত সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, সুকবি শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা ও সুকবি শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব কবিতা পাঠ করিয়াছিলেন। "গীতভারতী"র বর্ষার গানগুলি অতি সুন্দর হইয়াছিল। সর্ব্বশেষে কুমারী জ্যোতিঃ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত সুনীল রায় কয়েকটী বর্ষাসঙ্গীত গাহিয়া সকলের আনন্দ-বর্দ্ধন করেন।

টাইগারে নৃত্য-নাট্যাভিনয়

আগামী জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে টাইগার সিনেমাগৃহে পার্বতী দেবীর প্রযোজনায় "সীতাহরণ" নামে একটি নতুন নৃত্যনাট্যাভিনয়ের আয়োজন হইতেছে। রামায়ণের অরণ্য কাণ্ডের গল্পাংশ লইয়া এই নৃত্যনাট্যটির পরিকল্পনা হইতেছে এবং এর বিশেষত্ব এই যে কথাকলি ও ভারতনাট্যম্ নৃত্যের টেকনিক অবলম্বনে রাবণ কর্ত্তৃক সীতাহরণের কাহিনীটি আগাগোড়া মুখোস-নৃত্যে অভিনীত হইবে। এই নৃত্যনাট্যটি পরিচালনা করিবেন শ্রীযুক্ত শান্তিদেব ঘোষ। তাঁহারই নির্দ্দেশে নৃত্য পরিকল্পনা করিয়াছেন প্রসিদ্ধ কথাকলি নৃত্যশিল্পী শ্রীযুক্ত এম্, কে, নায়ার। সঙ্গীত পরিচালনা করিবেন তিমিরবরণ। সীতার ভূমিকায় অভিনয় করিবেন দক্ষিনী নৃত্যশিল্পী কুমারী সরস্বতী শাস্ত্রী এবং রাবণের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইবেন এম্, কে, নায়ার। অন্যান্য ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করিতেছেন রাণী রায়, বাণী বসু, স্মৃতি বিশ্বাস, অমিতা বসু, অসীতা বসু ও মঞ্জুলা দত্ত। এই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত কৌতুক নাটিকা 'তাসের দেশ' পুনরভিনীত হইবে এবং আগের বারের অভিনয়ে যাঁহারা অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের সবাইকে এবারও দেখা যাইবে।

গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন—

দীপালীর বর্ত্তমান সংখ্যা (২৫শ) প্রকাশের সহিত আমাদের বর্ত্তমান বর্ষের দ্বিতীয়ার্দ্ধ আরম্ভ হইল। সুতরাং যাঁহাদের প্রথমার্দ্ধের দরুণ ষান্মাসিক চাঁদা দেওয়া আছে, তাঁহারা অবিলম্বে দ্বিতীয়ার্দ্ধের চাঁদা ৬।৷৹ পাঠাইয়া দিলেই নিয়মিতরূপে কাগজ যাইতে থাকিবে। টাকা পাঠাইতে বিলম্ব ঘটিবার ফলে হয়ত কোনও সংখ্যা পাওয়া সম্ভবপর নাও হইতে পারে ইহা পূর্ব্বাহ্নেই জানান যাইতেছে।

গত এপ্রেল মাস হইতে দীপালীর মূল্য ৵৹ স্থলে প্রতি কপি ।৹ ধার্য্য হইবার ফলে যাঁহাদের নিকট হইতে ষান্মাষিক অতিরিক্ত চাঁদা নূতন হারের পূরনার্থে আজও পাওয়া যায় নাই তাঁহাদেরও উহা অবিলম্বে পাঠাইতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

আশা করি সকলের নিকট হইতে যেরূপ সহৃদয়তা ও সহানুভূতি দীপালী পাইয়া আসিতেছে তাহা আরও বর্দ্ধিত হইবে। —ম্যানেজার

রূপালীতে আমোদ-প্রমোদ

আগামী ২৫শে জুন, রবিবার রূপালী সিনেমায় প্রাতে ৯ ঘটিকায় ডাঃ কালিদাস নাগের পৌরহিত্যে দি বেঙ্গল মিউজিক অ্যাণ্ড কালচারাল এসোসিয়েসন কর্ত্তৃক এক বিচিত্র প্রমোদ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হইয়াছে: ইহাতে তারাপদ চক্রবর্ত্তী, পঙ্কজ কুমার মল্লিক, কৃষ্ণাবাই, জগন্ময় মিত্র, হেমন্ত মুখার্জ্জির সঙ্গীত, লক্ষ্মণ ভট্টাচার্য্য ও মিণ্ট বাবুর যন্ত্র-সঙ্গীত, মায়া দাস এবং অমিতা দেবী ও পার্টির নৃত্য, অজিত চ্যাটার্জ্জীর হাস্য-কৌতুক ছাড়া "অঞ্জন রায়" নামক একখানি রঙ্গ নাটিকাও অভিনীত হইবে।

ইণ্ডিয়ান আর্ট ডিসপ্লে

আগামী মঙ্গলবার ২৭শে জুন সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় রঙমহলে ইণ্ডিয়ান আর্ট ডিসপ্লের নবম বার্ষিক উৎসব সুসম্পন্ন হইবে। সেদিন এই ক্লাবের সভ্য ও সভ্যাগণ ছাড়া আরও বহু বিখ্যাত শিল্পীর নৃত্যগীতের আয়োজন করা হইতেছে। কুমার বীরেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত থাকিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

বালীতে অভিনব অভিনয়

গত শনিবার ও রবিবার (১০ই ও ১১ই জুন) বালী সেন পাড়ায় মারুতী বিদ্যালয়ের প্রধান সংগঠক অরুণপ্রসাদ কুমারের প্রাঙ্গণে মারুতী নাট্য সমাজ কর্ত্তৃক "শ্রীকৃষ্ণ" ও বালী সান্ধ্য সম্মিলনী কর্ত্তৃক "পুরাণ ভকৃত" অভিনয় হয়। উভয়দিনই বহু দর্শকের সমাগম হয়। প্রথম দিন নাম ভূমিকায় হৃষিকেশ ঘোষ ও লক্ষণার ভূমিকায় অনিল মুখোপাধ্যায় অতীব সুন্দর অভিনয় করেন। অন্যান্য ভূমিকায় বিশেষতঃ 'মুকুল' ও 'অলক্ষ্মী'র ভূমিকায় কুমারী বিজলী মুখার্জ্জি ও কুমারী নিভা ঘোষ চমৎকার অভিনয়ে ও সঙ্গীতে সকলকে মোহিত করেন। অপরাপর ভূমিকা মন্দ নহে।

দ্বিতীয় দিবস, 'পুরাণ ভকৃত' অভিনয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে সুবিখ্যাত সৌখীন-অভিনেতা শ্রীজ্যোতির্ম্ময় কুমার অনিবার্য্য কারণে উপস্থিত হইতে না পারায় বালী নর্থ ক্লাবের নাট্য পরিচালক শ্রীবলাই চাঁদ ঘটক সুকঠিন স্ত্রী ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। শুধু মাত্র স্মারকের উপর নির্ভর করিয়া তিনি যেরূপ অভিনয় করেন তাহা সত্য সত্যই প্রশংসার্হ। সেইজন্য তাঁহাকে সম্মানিত করিবার জন্য আগামী রবিবার ২৫শে জুন মারুতী বিদ্যালয়ের প্রধান সংগঠক শ্রীঅরুণ প্রসাদ কুমার একটি সম্মান সভার আয়োজন করিতেছেন ও উক্ত দিবস তাঁহাকে একটি স্বর্ণপদক দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। তাহা ছাড়া নাম ভূমিকায় শ্রীতারা ভট্টাচার্য্য উপস্থিত হইতে না পারায় পরিচালক পঞ্চানন রায় চৌধুরী অবতীর্ণ হন এবং সু-অভিনয় করেন। সঙ্গীতগুলি সুগীত ও সুখশ্রাব্য হয়।

মেঘদূত উৎসব

গত ১লা আষাঢ় সুসাহিত্যিক শ্রীযুত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ভবনে পি, এক, ক্লাব কর্ত্তৃক মেঘদূত উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সুধীগণের সমাগমে অনুষ্ঠানটি বিশেষভাবে সার্থকতা লাভ করিয়াছিল। সভায় পৌরোহিত্য করেন প্রবীণ শিল্প-সমালোচক ও সাহিত্যিক শ্রীযুত যামিনীকান্ত সেন। বাংলার খ্যাত-নামা গায়ক শ্রীযুত তারাপদ চক্রবর্ত্তী ও তাঁহার শিষ্যগণ সঙ্গীত জলসায় যোগদান করেন। তারাপদবাবু প্রায় পৌনে দুই ঘণ্টা যাবৎ একখানি "মেঘমল্লার" রাগের আলাপ করিয়া প্রথম আষাঢ়ের আবাহনী জ্ঞাপন করেন। অপূর্ব্ব কণ্ঠস্বর ও কলাকুশলতায় আষাঢ়ের মেঘমেদুর আকাশের সমস্ত ব্যথা যেন নিবেদিত হইয়াছিল। তারাপদবাবুর শিষ্যা কুমারী শোভা চট্টোপাধ্যায় ও শীলা মুখোপাধ্যায় উচ্চশ্রেণীর ক্লাসিকাল গান গাহিয়া সকলকে চমৎকৃত করেন। শেষোক্ত বালিকাটির কণ্ঠে দরদ ও অনুভূতির স্পর্শ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুত ক্ষিতিশ দাশগুপ্ত ও কুমারী মঞ্জু ঘোষের সঙ্গীত প্রশংসনীয়। উপস্থিত সাহিত্যিকগণের মধ্যে শ্রীযুত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয় আবৃত্তি ও কবিতা পাঠ করেন। "প্রবর্ত্তক" সম্পাদক শ্রীরাধারমণ চৌধুরী মহাশয় "মেঘদূত উৎসব" সম্বন্ধে একটি সুন্দর বক্তৃতা করিলে সভাপতি মহাশয় কালিদাস প্রসঙ্গে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করেন। সভায় অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিগণের মধ্যে শ্রীযুত শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষাল, শ্রীকৃষ্ণধন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীধীরেন্দ্রমোহন মজুমদার (দীপালী) ও প্রবোধ ঘোষ মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। সভায় বহু মহিলা যোগদান করিয়াছিলেন।

"আরা বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজ" (আরা, বিহার)

গত ৭ই জুন সন্ধ্যা ৮ ঘটিকায় দুর্গা বাটীতে "আরা বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজ ও পুস্তকালয়ের" দ্বার উদ্‌ঘাটন উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ডাক্তার শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার গুপ্ত সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রবীন সাহিত্যিক অধ্যাপক শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্ত এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন-ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। গান, বক্তৃতা, আলাপ আলোচনার পর রাত্রি দশ ঘটিকায় উৎসব শেষ হয়। এই অনুষ্ঠানের জন্য সর্ব্বপ্রথম ধন্যবাদের পাত্র রিপণ কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক শ্রীঅতুলচন্দ্র সেন।

নাটমণ্ডপ

মুক্তি প্রতীক্ষায় "শেষ-রক্ষা"

চিত্রভারতীর প্রথম চিত্রার্ঘ্য রবীন্দ্রনাথের "শেষ-রক্ষা"র চিত্রগ্রহণ সমাপ্ত হইয়া রূপবাণীতে মুক্তি প্রতীক্ষা করিতেছে। বাংলার প্রথম মহিলা প্রযোজক শ্রীমতী প্রতিভা শাসমলের ইহাই প্রথম চিত্র-নিবেদন এবং ছবিখানিকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে তিনি কোনরূপ কার্পণ্য করেন নাই। শ্রীমতী বিজয়া দাস বি এ, অমর মল্লিক, যতীন বন্দ্যো, জীবেন বসু, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, বিপিন মুখোপাধ্যায়, পদ্মা, রেবা, এবং প্রভা বিভিন্ন ভূমিকায় চিত্রাবতরণ করিয়াছেন। পশুপতি চট্টোপাধ্যায় এম-এ "শেষ-রক্ষা" পরিচালনা করিয়াছেন এবং সঙ্গীত পরিচালনা করিয়াছেন দক্ষিণামোহন ঠাকুর এবং অনাদি দস্তিদার।

নিউ মহারাষ্ট্র পিকচার্স (বোম্বাই)

এই নবতম চিত্র-প্রতিষ্ঠানটির প্রথম চিত্রার্ঘ্য "দেবদাসী"র কার্য্য চলিতেছে। ফণী মজুমদার ও কৃষ্ণচন্দ্র দে তত্বাবধান করিতেছেন এবং চন্দ্রশেখর বসু পরিচালনা করিতেছেন। অভিনয় করিতেছেন পৃথ্বিরাজ, মণিকা দেশাই, কৃষ্ণচন্দ্র, বিক্রম কাপুর এবং নবাগতা সুমান। কারুশিল্পের ভার লইয়াছেন ব্রতীন ঠাকুর এবং চিত্রশিল্পের ভার লইয়াছেন বিভাপতি ঘোষ। পণ্ডিত নরোত্তম ব্যাস গল্প, সঙ্গীত ও সংলাপ রচনা করিয়াছেন।

সহরের সিনেমায়

এ সপ্তাহে মাত্র ১ খানি ছবি মুক্তিলাভ করিবে তিনটি সিনেমায়—মিনার্ভা, ম্যাজেষ্টিক ও সিটি সিনেমায় রঞ্জিত মুভীটোনের "পাগলী দুনিয়া"। ইহাতে মতিলাল ও মমতাজ শান্তি মুখ্যাংশে অভিনয় করিয়াছেন।

গণেশ ও প্যারামাউন্ট সিনেমায় ওয়াদিয়া মুভীটোনের "বিশ্বাস" ২য় সপ্তাহে পড়িল। চিত্র-লেখায় আগামী শনিবার হইতে শ্রীভারতলক্ষ্মীর "আলিবাবা" দেখানো হইবে। উত্তরায় শ্রীভারতলক্ষ্মীর "মাটির ঘর" এখনো সগৌরবে চলিতেছে—এই সপ্তাহে তাহার ৭ম সপ্তাহের বিজয় অভিযান সুরু হইল। নিউ থিয়েটার্সের "ওয়াপস"। এখন চিত্রা ও নিউ সিনেমায় চলিতেছে।

ইউরেকা পিকচার্স

ইহাদের নবতম ছবি "দোটানা" অমূল্য বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রতুল ঘোষের পরিচালনায় সমাপ্তি-পথে অগ্রসর হইতেছে। ইহাতে অভিনয় করিতেছেন লতিকা মল্লিক, ধীরাজ ভট্টাচার্য্য, জহর গাঙ্গুলী প্রভৃতি।

'দীপালী' কাজি নজরুল সাহায্য ভাণ্ডার

—প্রাপ্তিস্বীকার—

	পূর্ব্বের জের	৬০৲ টাকা
৯।	মিঃ কে, রহিম শালিখা, হাওড়া—২৲	"
১০।	শ্রীযুক্ত বিমলকুমার রায় শালিখা, হাওড়া—২৲	"
	মোট	৬৪৲ টাকা

এস্ ওয়াজেদ আলি — কোষাধ্যক্ষ
শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু — সম্পাদক
২২শে জুন ১৯৪৪
('দীপালী' কাজি নজরুল সাহায্য ভাণ্ডার)

দীপালীর স্বত্বাধিকারী শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত, ১২৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, দীপালী প্রেসে মুদ্রিত ও দীপালী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

প্রধান সম্পাদক—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় :: সহঃ সম্পাদক—শ্রীধীরেন্দ্রমোহন মজুমদার বি. এল.

১৬শ বর্ষ VOL. XVI. } ১৫ই আষাঢ় ১৩৫১ :: June 29, 1944 { ২৬শ সংখ্যা No. 26

আলোচনী

পুঁজিবাদ বা তথাকথিত Capitalism-এর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা আজ ফ্যাসনের মধ্যে দাঁড়িয়েছে। বক্তৃতার ফানুষ উড়িয়ে সভা সমিতি পার্টি ও বৈঠক মাৎ করা যায়। পার্টির কাগজে লম্বা লম্বা ফতোয়া দিয়ে ক্যাপিট্যাল-ইসমের মৃত্যুকাতর দেহের শেষ Convulsions যাঁরা কল্পনা করেন তাঁদের মত উগ্র আশাবাদী আমরা নই। এদের উচ্ছ্বাসের বিরাট দাপটে Clive Street-এর কোথাও সামান্য তরঙ্গ-বিক্ষেপও দেখা দেয় নি। বৃটিশ পুঁজিবাদের বিরাটকায় দেহটা এদেশের সম্পদে আরও স্ফীতকায় হয়ে উঠেছে। এই সব চীৎকার ও আমদানী বুলির মোহ এতখানি তরল ও বস্তুতন্ত্র বর্জ্জিত যে তা নিয়ে সত্যকারের পুঁজীবাদী সম্প্রদায়ের আজও বিশেষ কোন চিন্তার কারণ ঘটে নি। এঁরা ভাবেন, এই উচ্ছ্বাসের ফেনা কালক্রমে একদিন থিতিয়ে যাবে। পৃথিবীর চিন্তার ক্ষেত্রে আজ যে বিরাট আলোড়ন দেখা দিয়েছে, তার দু'চারটে স্ফুলিঙ্গ এ-দেশে ভেসে আসছে। স্বাভাবিক ভাবেই তা আসবে। কিন্তু এদেশের অভাব ও প্রয়োজনের ভিত্তির উপর যে আর্থিক ও রাজনীতিক সংগঠন হওয়া উচিত তা আমরা ভুলে গেছি। আমরা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হয়েছি আমাদের জাতের দৃষ্টিভঙ্গী ও তার বিশেষ গড়নকে। তাই এই সব ফাঁকা বুলি ও বেসুরো চীৎকার শুনে মাঝে মাঝে আমরা ভাবি, এঁরা সত্যিকার কি চান? এঁদের 'সাহিত্য' ও পত্রিকা পড়ে কোন সদুত্তর খুঁজে পাই না, সব যেন আরও অস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

* * * *

এদেশে সাম্রাজ্যবাদের ইতিহাস কত বিচিত্র ও জটিল তা কল্পনা করবার শক্তি এই সব বুলিসর্ব্বস্ব নেতাদের নেই। থাকলে এঁরা এতখানি cheap ও vulgar কর্ম্মপন্থার আশ্রয় নিতেন না। পৃথিবীর সর্ব্বদেশের মানুষ আজ কামনা করছে সাম্রাজ্যবাদের লোলুপতা অতীতের ইতিহাসে পরিণত হোক। ভারতের জনগণের কামনা তা থেকে ভিন্ন নয়। যুদ্ধের পাঁচটি বৎসরের রূঢ় অভিজ্ঞতা আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছে, কি নির্লজ্জতা, কতখানি স্বার্থপরতা একটা জাতিকে পরদেশ শোষণের প্রবৃত্তি দেয়। এই পাঁচটি বৎসরের তিক্ত অভিজ্ঞতায় ভারতবর্ষ উপলব্ধি করেছে ভারত শাসনের ভিত্তি কিসের উপর প্রতিষ্ঠিত। আমাদের দুর্ব্বলতার বিচিত্র রূপ দেখে শঙ্কিত হয়ে উঠেছি। জাতির নৈতিক বুদ্ধি ও আদর্শবাদ রুগ্ন, স্বাস্থ্যহীন ভাবালুতাকে আশ্রয় করে বেঁচে আছে। আজ ভারতে সুশৃঙ্খল রাষ্ট্রনীতিক কর্ম্মপন্থার অবসান দেখছি।

* * * *

১৯৪২-এর ৮ই আগষ্ট কংগ্রেস ও সাম্রাজ্যবাদের মুখোমুখি শক্তিপরীক্ষা আরম্ভ হয়। এর ফলাফল সম্বন্ধে অন্ততঃ কয়েকজন লোকও সুস্থভাবে চিন্তা করেছিল ধরে নেওয়া যেতে পারে। কংগ্রেসের আইন অমান্য অভিযানের আতঙ্ক এক শ্রেণীর শ্বেতাঙ্গ সিভিলিয়ান

মহলে যে দুশ্চিন্তার সৃষ্টি করেছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় এদের তৎকালীন কার্য্য-পদ্ধতিতে। ভবিষ্যতের ইতিহাসকার অবাক হয়ে ভাববে কতখানি চিন্তাহীনতা ও রাষ্ট্রীক বুদ্ধির অভাব থাকলে এ ধরণের ব্যস্ততা সম্ভব হতে পারে। মহাত্মাজী সে সময় পুনঃ পুনঃ বলেছিলেন, ভাইসরয়ের সঙ্গে সম্পূর্ণ বোঝা-পড়া ভিন্ন কোন আন্দোলন আরম্ভ করা হবে না। কংগ্রেসের আগষ্ট Resolution-ই শেষ কথা নয়। মহাত্মাজীর ভাইসরয়ের সহিত সাক্ষাৎকারের প্রার্থনার মধ্যে এঁরা কূটনীতিক চাল আবিষ্কার করেছিলেন। সেদিনকার শাসকমহলের বিশ্বাস ছিল, যথা সম্ভব ত্বরিতগতিতে এই আন্দোলনের জড় উচ্ছেদ করতে পারলে কংগ্রেস বিভীষিকার হাত হতে মুক্ত হওয়া যাবে। এ সম্বন্ধে গান্ধীজী তাঁর সদ্য প্রকাশিত পত্রের এক জায়গায় বলেছেন—

Congress activity up to the night of August 8, was confined to resolutions only. The dawn of the 9th saw the Congress Imprisoned.

* * *

সম্পূর্ণ পত্রাবলী প্রকাশিত হওয়ার পর একথা আজ অস্বীকার করা অসম্ভব—প্রকারান্তরে শাসক সম্প্রদায়ই সারা ভারতে অশান্তির ইন্ধন সরবরাহ করেছিলেন। যে আন্দোলনের অস্তিত্ব ছিল না, এই শ্রেণীর শাসকের উৎসাহে হয় তার জন্ম। তারপর সেই অশান্তি দমনের জন্য চলে চণ্ডনীতির প্রবর্ত্তন। এই নীতি মানুষের সহ্য করবার শেষ শক্তিটুকুর উপরও আঘাত হানে। তার প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিক ভাবেই সারা ভারতের উপর একটা বিরাট অশান্তির প্রবাহ বইয়ে দেয়। এ সম্পর্কে গান্ধীজী বলেছেন—

If government action was in excess of the endurance of human nature, its authors, therefore, were responsible for the explosions that followed.

* * *

গান্ধীজীর পত্রের এক স্থানে ভারতীয় গবর্ণমেণ্টের চমৎকার ব্যাখ্যা আছে। ভারতীয় শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে অল্প কথায় এতখানি প্রকাশের চেষ্টা সম্প্রতি দেখা যায় নি। এ ব্যাখ্যা সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করবেন রাষ্ট্রনীতিকেরা। সাধারণ মানুষ এই সহজ সরল কূটনীতিক বাগাড়ম্বর বর্জ্জিত ব্যাখ্যা পড়ে চমৎকৃত হবেন।

A population—numbering nearly 400 millions of people, belonging to an ancient civilisation, are being ruled by a British representative called the Viceroy and Governor-General aided by 250 officials called collectors and supported by a strong British garrison with a large number of Indian soldiers, trained by British Officers and carefully isolated from the populace. The Viceroy enjoys within his own sphere powers much larger than the King of England.

অর্থাৎ একটা প্রাচীন সুসভ্য জাতের প্রায় ৪০ কোটি লোককে শাসন করছেন ভাইসরয় বা বড়লাট, বৃটিশ জাতির প্রতিনিধি হিসেবে। কলেকটর নামধেয় ২৫০ জন কর্মচারী এই শাসনব্যাপারে বড়লাটকে সাহায্য করছেন। এদের পেছনে রয়েছে বৃটিশ সৈন্যাবাস যার অধিকাংশই বৃটিশ সামরিক অফিসার কর্ত্তৃক শিক্ষিত ভারতীয় সৈন্য। এদেরকে ভারতের জনসাধারণের সংস্পর্শ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক রাখা হয়েছে। ভাইসরয় বা বড়লাট তাঁর এলাকায় ইংলণ্ডের রাজার চেয়েও বেশী ক্ষমতাবান।

গান্ধীজী বলেছেন, এই ধরণের ক্ষমতাবান শাসক জগতের আর কোথায় আছে তাঁর জানা নেই। ভারতীয় শাসনতন্ত্র গহনঅরণ্য-সদৃশ এ ভ্রান্ত ধারণা অনেকের ছিল। গান্ধীজীর সহজ সরল ব্যাখ্যা সে ধারণা দূর করে দেবে।

* * *

কলিকাতার বহু অসুবিধার মধ্যে রিক্সা-ওয়ালাদের উপদ্রব চরমে উঠেছে। যান-বাহনের অভাবে সহরবাসীর অসহায় অবস্থার পুরো সুযোগ এই শ্রেণীর লোক আজ নিচ্ছে। বলবার কিছু নেই। সম্প্রতি হুগলীর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশে শ্রীরামপুর অঞ্চলে রিক্সা ভাড়ার হার নির্দ্ধারিত হয়েছে। কেউ এ আদেশ অমান্য করলে যাত্রীরা স্থানীয় পুলিস আফিসে সংবাদ দেবেন এ নির্দ্দেশ আছে। ভাড়া প্রথম মাইল বা আংশিক দুই আনা, পরবর্ত্তী প্রতি মাইল বা আংশিক ছয় পয়সা। যাত্রী সংখ্যা দুইজন এবং মাল ১৫ সের। অপেক্ষা করবার দরুণ প্রতি ঘণ্টায় দু'আনা অতিরিক্ত দিতে হবে। শ্রীরামপুরবাসীরা ভাগ্যবান। কলিকাতায় কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আজও এবিষয়ে সজাগ হয় নি। অথচ ভাড়া আদায়ের নামে দিনে দুপুরে চলছে রাহাজানি।

জীবন যুদ্ধে জয়ী হোক শুধু তারা

—শ্রীসুহাসকুমার দাস

দুঃখ যাদের হ'য়েছে জয়ের মালা,
সুখের নেশায় মাতাল হয়নি যারা।
আমার এ কথা তাদের কানেই বলা;
জীবন যুদ্ধে জয়ী হোক শুধু তারা॥

* * *

অভাবে যাদের কুভাব আসেনি মনে,
অর্থের মোহে স্বার্থে ভোলেনি যারা।
আমার এ কথা বলবো তাদের কানে;
জীবন যুদ্ধে জয়ী হোক শুধু তারা॥

* * *

দৈন্য যাদের নোয়াতে পারেনি মাথা,
ঝড়ে-ঝঞ্ঝায় অশ্রু ফেলেনি যারা।
আমার এ বাণী তাদের তরেই গাঁথা;
জীবন যুদ্ধে জয়ী হোক শুধু তারা॥

* * *

বিপদে যাদের ধৈর্য্য অটুট আছে,
ধ্বংস লীলায় অংশ নেয়নি যারা।
আমার কবিতা শোনাই তাদের কাছে;
জীবন যুদ্ধে জয়ী হোক শুধু তারা॥

উড়ো জাহাজের গুরু

আকাশের পাখী

(লেখক : বেণ্টওয়ার্থ ডে)

উড়ো জাহাজের আধুনিক বিস্ময়কর উন্নতির অনেকখানিই যে আকাশচারী পক্ষী-কুলের কাছে ঋণী, এই সম্বন্ধে বিশিষ্ট বৈমানিক বেণ্টওয়ার্থ ডে বিলাতের "সানডে ডেস্প্যাচ" পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। নিম্নে তাহার অনুবাদ দেওয়া গেল।

ইংল্যাণ্ড হইতে নিউজিল্যাণ্ড ৩ হাজার ৪৫০ মাইল দূরে। মাত্র ৩৯½ ঘণ্টায় ৫৫ জন যাত্রীকে সেখানে পৌঁছাইয়া দিতে পারে এই রকম একটি নূতন ধরণের উড়ো জাহাজ সম্প্রতি ইংল্যাণ্ডে তৈয়ার করিবার আয়োজন করা হইয়াছে। ইহার দৈর্ঘ্য হইবে ১১০ ফুট এবং পাখার বিস্তার হইবে ১৫০ ফুট। ১৪ হাজার অশ্বশক্তির বেগ লইয়া ইহা ছুটিবে, ঘণ্টায় ৩৫০ মাইল পথ পার হইয়া যাইবে।

কিন্তু আকাশ পথে উড়িবার বিষয় লইয়া আজকাল আমরা যতই কেন অহঙ্কার করি না, এখনও উর্দ্ধ বায়ুমণ্ডলে উড়িবার নানা কৌশল এবং নিয়ম আয়ত্ত করিবার জন্য আমরা আমাদের গুরু পক্ষীকুলের নিকটেই নতমস্তকে শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারি।

এই আকাশ পথ তাহাদের বহু কালের পরিচিত। ইহার উর্দ্ধ বায়ুমণ্ডলের স্রোতের গতির সহিত কি ভাবে গা ভাসাইয়া বেড়াইতে হয়, কেমন করিয়া গোত্তা খাইতে হয়, পাক খাইতে হয়, চক্রাকারে ঘুরিতে হয়, কেমন করিয়া বহু উর্দ্ধে উঠিয়া আবার শোঁ করিয়া নীচে নামিতে হয়, ঝড়ের মুখে কেমন করিয়া গন্তব্য পথে লক্ষ্য স্থির রাখা যায়—এই সমস্ত বিষয়েই উড়ো জাহাজকে গুরু মানিতে হইয়াছে আকাশের পাখীকে।

শরীরের ওজন এবং শক্তির সহিত তুলনা করিলে, এখনও উড়ো জাহাজ অপেক্ষা পাখীকেই দ্রুতগামিতার জন্য শ্রেষ্ঠতর বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। পৃথিবীর মধ্যে দ্রুততম গতিতে উড়িতে পারে অষ্ট্রেলিয়ার সুইফ্‌ট্ নামক এক জাতীয় ছোটপাখী। মাত্র দুই কি তিন আউন্স এই পাখীটির ওজন, কিন্তু ইহার গতিবেগ হইল ঘণ্টায় ১৮০ মাইল। গোল্ডেন প্লোভার এবং বিদ্যুৎগতি পেরিগ্রীন্‌ও ঘণ্টায় ৮০ মাইল বেগে উড়িয়া যাইতে পারে। গতিবেগ ছাড়া, অতি উর্দ্ধে উড়িয়া যাওয়ার ব্যাপারেও পাখীদের ক্ষমতা অসাধারণ। সাধারণতঃ দেশ-দেশান্তরে যাইবার সময়ে ৩ হাজার হইতে ৬ হাজার ফুট উঁচু পথেই পাখীরা যাতায়াত করে, কিন্তু বুনো হাঁসকে ১০ হাজার ফুট উঁচু দিয়াও উড়িয়া যাইতে দেখা গিয়াছে।

আধুনিক হেলিকপ্টার নামে যে উড়ো-জাহাজ তৈয়ার করা হইয়াছে, তাহার সৃষ্টির মূলে রহিয়াছে কেষ্ট্রেল এবং সর্ব্বজন-পরিচিত লার্ক পাখী।

গ্লাইডারের গুরু

গ্লাইডার জাতীয় উড়ো জাহাজের ব্যবহার আজকাল সর্ব্বত্রই খুব হইতেছে। বিখ্যাত গ্লাইডার বিশেষজ্ঞ রবার্ট ক্রোন্‌ফেল্ডকে লইয়া প্রাথমিক যুগের বৃটিশ বৈমানিকদের অন্যতম, লর্ড সেম্পিল একবার সমুদ্রের ধারে বসিয়া বসিয়া গাং-চিলের উড়িবার কায়দা গভীর মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিলেন। সমুদ্রের ধারে পাহাড়ের গায়ে ঢেউ এবং বাতাস প্রবল বেগে আছড়াইয়া পড়ে আর সেই প্রবল বাতাসের মধ্যে গাংচিল-গুলি কি রকম অবলীলাক্রমে, মনোহর ভঙ্গিতে ঢেউয়ের উপর হইতে পাহাড়ের মাথায় ডানা মেলিয়া দিয়া ভাসিয়া যায়, আবার ঢেউয়ের উপরে নামিয়া আসে—ইহাই তাঁহারা গভীর মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিলেন। সেই শিক্ষাকে পরে গ্লাইডার পরিচালনার কাজে খাটানো হইয়াছিল। কেবলমাত্র বায়ুস্রোতে ভর করিয়া, বিখ্যাত স্বর্ণ-ঈগলগুলি উঁচু পাহাড়ের চূড়া হইতে মাইলের পর মাইল ডানা মেলিয়া দিয়া

নামিয়া আসে—তাহা লক্ষ্য করিয়াও এই গ্লাইডার চালাইবার অনেক বিদ্যা আয়ত্ত করা গিয়াছে।

ঊর্দ্ধ আকাশে ঘুমন্ত পাখী

মিশরের মরুভূমি এবং লোহিত সমুদ্র তীরবর্ত্তী মরু পাহাড়ের উপর দিয়া আসিবার সময়ে আমি একাধিকবার আকাশে ঘুমন্ত চিল এবং বনেলি ঈগল পাখী দেখিয়াছি। ঊর্দ্ধ আকাশে বায়ুস্রোতে ডানা মেলিয়া ভাসিতে ভাসিতে তাহারা ঘুমাইতেছিল। আমার উড়োজাহাজ প্রায় তাদের গায়ের উপরে গিয়া পড়িলে হঠাৎ চমকাইয়া ঘুম ভাঙ্গিয়া তাহারা ঝুপ্ করিয়া নীচের দিকে সভয়ে গোত্তা খাইয়া নামিয়া গেল। এই যুদ্ধের আগে, অষ্ট্রেলিয়া ও ভারতবর্ষে যাতায়াত করিবার কালে লর্ড সেম্পিলও এই রকম ঘটনা লক্ষ্য করিয়াছেন। সমুদ্রের স্রোতের মত আকাশের বিভিন্ন স্তরের বায়ুস্রোতেরও নির্দ্দিষ্ট গতিপথ আছে, তাহার হিসাব ও মাপজোপ করা চলে। সমুদ্র-পথের মানচিত্রের মত আকাশপথেরও মানচিত্র তৈয়ার করিয়া উড়ো জাহাজ চলাচলের পথঘাট বাঁধিয়া দেওয়া যায়।

যুদ্ধের পরে, রেলগাড়ীর মত, একটির পিছনে আরেকটি গ্লাইডার বাঁধিয়া বহু যাত্রী ও মালপত্র লইয়া বৃহদাকার উড়ো জাহাজ আকাশপথে যাতায়াত করিবে। মানুষের এই সাফল্য পাখীর নিকটেই অনেকাংশে ঋণী। পাখীর ডানার গঠন, তাহার বায়ুস্রোতের জ্ঞান ও উড়িবার কৌশল, বায়ুস্রোতে ভাসিয়া যাইবার কায়দা ইত্যাদি সেম্পিল, সিগ্রেভ, ক্রোন্‌ফেল্ড প্রভৃতি বিমান বিশারদগণ বহুকাল ধৈর্য্য ধরিয়া লক্ষ্য করিয়াছেন। তাহার ফলেই উড়োজাহাজের উন্নতি হইতে পারিয়াছে।

ইহা আমার নিছক কবি-কল্পনা নয়। মেজর সিগ্রেভ্ যখন তাঁহার বিখ্যাত "ধূমকেতু" বিমানটি তৈয়ার করেন, তখন তিনি বলেন, "যদি একটি উড়ন্ত পাখী সম্পর্কে বায়ু গতি-শাস্ত্রের তত্ত্বগুলি আমাদের জানা থাকিত, পাখীর পালকে এবং শরীরে কতখানি বায়ু-প্রতিরোধ হয় তাহা যদি সঠিক জানা যাইত, তবে আমরা একেবারে নিখুঁত উড়ো জাহাজ তৈয়ার করিতে পারিতাম।" মেজর সিগ্রেভের এই কথাগুলির মূল্য আছে। তিনি বৈজ্ঞানিকের মতই বিষয়টির বিচার করিয়াছেন।

পাখীর ফাঁপা হাড়, সরু, পাতলা পাঁজর—পাখার গড়ন ইত্যাদির নকল করিয়াই হ্যাণ্ডলী-পেজ বিমানের সৃষ্টি হয়।

জার্ম্মাণদের এক রকম জঙ্গী বিমানের নাম ছিল টবে—অর্থাৎ একজাতীয় নীল রঙের পাহাড়ী কবুতর। তীব্র গতি এবং হঠাৎ মাথা নীচু করিয়া ছোঁ মারিবার জন্য ঐ পাহাড়ী কবুতর বিখ্যাত। জার্ম্মাণ-জঙ্গী বিমানটিরও ঐ সব গুণ ছিল। ঐ বিমানটির আকৃতি পর্য্যন্ত ঐ পাহাড়ী কবুতরের মত করা হইয়াছিল।

উড়ন্ত অবস্থাতেই উড়োজাহাজে পেট্রোল লওয়ার ব্যাপারটাও আমার মনে পাখীর কথাই আনিয়া দেয়। স্কুয়া পাখীর তাড়া খাইয়া গাং চিল তাহার মুখের মাছ ফেলিয়া দিয়া উড়িয়া পালায় এবং সেই মাছ সমুদ্রে পড়িবার আগেই স্কুয়া দ্রুতবেগে যাইয়া তাহা ধরিয়া খাইয়া ফেলে।

তারপর, এক উড়োজাহাজের পিঠে চড়াইয়া অন্য উড়োজাহাজ লইয়া যাওয়ার বিদ্যাটাও পাখীদের অজানা নয়। শত সহস্র বৎসর ধরিয়া রেণ পাখী এই কাজ করিয়া আসিতেছে। সারস কিম্বা বৃহৎকায় পেচকের পিঠে চড়িয়া ঐ ক্ষুদ্রকায় রেণ পাখীগুলি শত সহস্র মাইল পার হইয়া যায়।

পাখীর দলের দেশ দেশান্তরে যাইবার নির্দ্দিষ্ট সময় আছে, নির্দ্দিষ্ট পথ ধরিয়াই তাহারা চলে। ঊর্দ্ধাকাশের বায়ুস্রোতের গতির সহিতও তাহার সম্বন্ধ আছে। ভবিষ্যতে যখন আকাশপথে শত শত গ্লাইডার ট্রেণ এবং ছোট উড়োজাহাজের ঝাঁক ভাসিয়া বেড়াইবে, তখন আকাশপথের গুরুর কাছে শেখা বিদ্যা মানুষের অনেক উপকারে আসিবে।

কমরেড লেনিন

—শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

দূর থেকে লেনিনের কণ্ঠ শোনা গেল—জারের কথায় বিশ্বাস কর না, এই লড়াই সুরু হয়েছে, চলুক। তোমাদের অভাব অভিযোগ এখনও অনেক, তার হিসাব-নিকাশ সব একসঙ্গে শেষ করতে হবে!

লেনিন চুপিচুপি ফিরে এলেন রুশিয়ায়।

আবার গোলযোগ বেধে গেল, মাসকৌ সহরের কর্ম্ম-কোলাহল একদিন স্তব্ধ হয়ে গেল, মজুরেরা বললে—গায়ের রক্ত জল করে এই সহরের সব কিছুই আমরা তৈরী করেছি, এই শহরের মালিক আমরা!

বটে! জারের সৈন্যেরা বন্দুক বাগিয়ে ধরলো, পথে পথে মেশিনগান গর্জে উঠলো—বুম্ বুম্!

কতজন গুলি খেল। তার মধ্যে বয়স্ক স্ত্রী-পুরুষ মরলো এক হাজার, ছেলেমেয়ে মরলো ছিয়াশী জন।

অনেক নেতা ধরা পড়লো।

লেনিন ধরা পড়তেন, মজুরেরা তার আগেই তাকে রুশ সীমান্ত পার করে দিলে।

অনেকে বললে—কই কিছু তো হোল না।

লেনিন বললেন—এরই মধ্যে কি হবে? এই তো সুরু!

লেনিন কিছুদিন রইলেন ফিনল্যাণ্ডে।

এবার সেখানেই হোল দলের আড্ডা।

রুশিয়া আর ফিনল্যাণ্ড পাশাপাশি দেশ। দলের লোকদের যাওয়া আসাও সহজ। ফল্গুধারার মত কাজ চলতে থাকে ঠিকই।

কিন্তু এখানেও জারের গুপ্তচরের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ধারালো হয়ে উঠলো।

তাদের হাতে পড়লে মৃত্যু সুনিশ্চিত আর লেনিন মরলে পার্টিকে পরিচালনা করার মত লোক কেউ থাকবে না। সেইজন্য কমরেডরা লেনিনকে সেখান থেকে সরিয়ে দেবার ঠিক করলো। বল্টিক সাগরের এপারে ফিনল্যাণ্ড ওপারে সুইডেন, কথা হোল লেনিন কিছুদিনের জন্য সুইডেনেই যাবে। সোজাসুজি গেলে পুলিশের হাতে পড়ার সম্ভাবনা আছে, তাই একটু ঘুরে যেতে হবে।

ডিসেম্বর মাস, ঝিরঝির করে বরফ পড়ছে, পথের উপর পেঁজা তুলোর মত বরফ জমে উঠছে, এমন দিনে সহজে কেউ বাড়ীর বাহির হয় না। পুলিশের চোখকে ফাঁকী দেবার এই অবসর। রাতদুপুরে দুজন চাষা বন্ধুর হাত ধরে লেনিনের যাত্রা সুরু হোল।

বল্টিক সাগরের জল জমে গেছে। সেই বরফের উপর দিয়ে হেঁটে যেতে হবে এক দ্বীপে, তারপর সেখান থেকে উঠবে এক জাহাজে। পৌষ মাসের কনকনে ঠাণ্ডা, মেরু প্রদেশের ধারালো হাওয়া পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত কাঁপিয়ে দিচ্ছে। ওভারকোটের কলার কান অবধি তুলে দিয়ে, পথিক তিনজন এগিয়ে চলেছে বরফের উপর দিয়ে।

অর্দ্ধেক পথ পার হয়ে এসেছে এমন সময় শব্দ শোনা গেল বরফ ফাটছে। ফেটে ফেটে এবার গলতে সুরু করবে। তখন যে-কোন মুহূর্তে—যে-কোন নিমেষে পায়ের নীচে বরফ টলমল করে উঠবে।

পরক্ষণেই তলিয়ে যেতে হবে, বরফের নীচে জীবন্ত সমাধি হয়ে যাবে। কিন্তু এখন আর পিছিয়ে আসার উপায় নেই। ফিরে এসে জারের জেলখানায় ফাঁসী যাওয়ার চেয়ে এগিয়ে যাওয়াই ভালো। প্রতি পদক্ষেপে সন্দেহ আর শঙ্কা—মৃত্যুকে মুখোমুখি রেখে লেনিন এগিয়ে চললেন…রুশদের সৌভাগ্য বলতে হবে যে লেনিন সেইরাত্রে নিরাপদে সেই দ্বীপে গিয়ে পৌছেছিলেন।

সুইডেন হয়ে লেনিন এলেন সুইটজারল্যাণ্ডে। সেখানে দিনরাত কাজ করে চললেন, পরবর্তী আন্দোলনের জন্য তৈরী হতে লাগলেন।

সুইট্জারল্যাণ্ডে এক বিপ্লব বিদ্যালয় খোলা হোল। রুশিয়া থেকে বাছা বাছা চাষী আর মজুর আসতে লাগলো সেখানে। কি করে বিপ্লবের কাজ চালাতে হবে তাই শিখে তারা ফিরতে লাগলো রুশিয়ায়। তাদের কাজ যতই ছড়িয়ে পড়তে লাগলো দল ততই হয়ে পড়লো জনবহুল। লেনিনের বাণী আর নির্দেশ কোন রুশের কাছেই আর অজানা রইল না, বলশেভিক পার্টি রুশিয়ায় এক বিরাট শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হোল। আর তারই সঙ্গে ছোটখাট ধর্ম্মঘট আর পুলিশের হাংগামা ঘটতে লাগলো সারা দেশ জুড়ে।

কিন্তু বিপ্লবীরা তো আর হাওয়া খেয়ে কাজ করবে না, তাছাড়া রুশিয়া থেকে সুইটজারল্যাণ্ড পর্য্যন্ত গোপন গতিবিধির জাল বুনতেও অর্থের প্রয়োজন। বিপ্লবীরা অর্থ সংগ্রহ করে ডাকাতি করে, রুশ বিপ্লবীরাও টিকলিসের সরকারী খাজাঞ্চিখানা লুঠ করলো। হাজার হাজার রুব্‌লের নোট এসে পড়লো লেনিনের হাতে, কিন্তু কাজের কোন সুবিধা হোল না। বেশীর ভাগই ছিল পাঁচশো রুব্‌লের নোট, নম্বর জানাজানি হয়ে গেল। রুশিয়ার ভিতরে নোটগুলি ভাঙানো গেল না, বাইরে ভাঙাতে গিয়ে বার্লিন, মিউনিক্, ষ্টকহোল্‌ম্ প্রভৃতি সহরে দলের কয়েকজন ধরা পড়ে গেল।

এদিকে দলের অবস্থা অচল হয়ে পড়লো।

এক যুবক এই সময় দলের সামনে এসে দাঁড়ালো, সে নিকোলাই পাভ্‌লোভিচ্। বয়স ছিল কম, নতুন প্রভাতের স্বপ্ন ছিল তার চোখে, যখন যেমন টাকার দরকার সে জুগিয়ে যেতে লাগলো বলশেভিক পার্টিকে। তার টাকায় দলের নতুন কাগজ বেরুলো 'নভায়া জিজ্‌ন্'! তার টাকায় মাসকৌর বিপ্লবীরা অস্ত্রশস্ত্র কিনলো। মাসকৌতে তাদের এক বিরাট কারখানা ছিল, পুলিশ সেই কারখানার নাম দিল সয়তানের আড্ডা। কিন্তু অতবড় লোককে সহসা গ্রেপ্তার করা চলে না, পুলিশ প্রমাণ সংগ্রহে মন দিল। (ক্রমশঃ)

প্রত্যাখ্যান

(উপন্যাস)

শ্রীসুধাংশু কুমার হালদার, আই, সি, এস্

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(৮)

অসীমকে হরিমোহন তাঁর সমস্ত বাগান ঘুরে ঘুরে দেখালেন, দেখালেন তাঁর গোলাপ সংগ্রহ। স্বল্প পাপড়ীর প্রায়গন্ধহীন স্ফীতমধ্য ক্রমসূক্ষ্মাগ্র গোলাপের শুনেছেন আজকাল ভারি আদর, তাই আলেকজান্দ্রা, লেডী হিলিংডন প্রভৃতি গোলাপ রোপণ করা হয়েছে সামনে। আর সেকালের বাঁধাকপি জাতীয় এভোয়াল-দি-ফ্রাঁস, ব্ল্যাকপ্রিন্স বাসোরা, মার্সাল নীল নির্বাসিত হয়েছে বাড়ীর পিছন দিকে। বাগান দেখান শেষ হ'লে অসীমকে নিয়ে গেলেন তাঁর পড়ার ঘরে, দেখালেন তাঁর দেশবিদেশ হ'তে সংগ্রহ করা এখানকার যা সামান্য সঞ্চয়। বেশীর ভাগ আছে তাঁর কলকাতার বাড়ীতে। দেখালেন ভিনাস্-ডি-মিলোর মর্ম্মর অনুকৃতি, হার্মিসের ব্রোঞ্জ মূর্ত্তি পম্পে থেকে যা আনা, এমনি আরো কত কি।

ভিনাস্-ডি-মিলোর মর্ম্মর অনুকৃতি ঘরের এককোণের দেওয়ালে তিনকোণা ব্র্যাকেটের ওপর দাঁড় করানো। নৃত্যরতা তরুণী ভিনাসের নাচের ভঙ্গীটি যেন পাথরে জমাট হ'য়ে গেছে। সমুদ্রের চলোর্মি যেন পাষাণকায়া ধারণ করেছে। কি ছিল পাষাণীর হাত দুটির ভঙ্গী হাজার হাজার বছর আগে, কে তা জানে? আর কেই বা ছিল সেই নাম-না-জানা ভাস্কর? কত শ্রদ্ধায়, কত যত্নে যে এ মূর্ত্তি গড়েছে, যার শিল্প-চাতুর্য্য আজ সমস্ত জগৎকে মুগ্ধ করেছে, মানুষ তার নাম ধাম কিছুই জানে না। নামটুকুর জন্যে আমাদের কতই না প্রয়াস! পৃথিবী আমাদের নামটুকু মনে রাখুক, এর জন্যে আমাদের কি গভীর আগ্রহ! মনে রাখবার মতন করি নি তো কিছুই, দিই নি তো কিছুই, তবু তীর্থস্থানের মন্দিরগাত্রে, ঐতিহাসিক দুর্গস্তম্ভস্তূপের প্রস্তর দেওয়ালে, এমন কি যেখানেই লোক সমাগম হয়, সেখানকার কাঠের বেঞ্চে, গাছের গুঁড়িতে ছুরী দিয়ে কেটে কেটে নিজের নামটা লিখে রেখে আসি। আর এই যে মহাশিল্পী, যার দানের তুলনাই হয় না যুগের পর যুগ শ্রদ্ধা দিয়েও যার অমূল্য ঋণ শোধ করা যায় না, আপন নামটিকে সে কোন্ বৈরাগ্যে এমন ক'রে গোপন করল? সে কি ছিল গ্রীক, খড়্গের মতো উন্নত ছিল কি তার নাসিকা, পশমের মতো কুঞ্চিত কোমল কেশপাশ তার দুই কানের পাশ দিয়ে স্কন্ধ পর্য্যন্ত পড়ত কি নেমে? তারই প্রেয়সী নারীর অনুকৃতি কি এই মূর্ত্তি?

হার্মিসের ব্রোঞ্জমূর্ত্তিটি একদা ভিস্থভিয়াসের গলিত লাভার তলায় ড়ে লাবণ্য তার হারিয়েছে পুড়ে যেয়ে, কলঙ্ক লেগে সবুজ হয়ে গেছে। তেই হয়েছে বহু মূল্যবান। হারকুলেনিয়াম্, পম্পে—দু'হাজার চরের ছাইএর ঢাকা উন্মোচন করে বেরিয়ে এসেছে সেদিনের মানুষের ত স্থকীর্ত্তি, কত অকীর্ত্তি। সুসভ্য রোম্যান্‌দের ভোগের সঙ্গে, প্রমের সঙ্গে, বিলাসিতার সঙ্গে মেশানো সে কি দম্ভ ঔদ্ধত্য আর নষ্ঠুরতার ইতিহাস! তাদের সেদিনের রথচক্র পাথরবিছানো জপথকে ঘিরে ঘিরে যে গভীর লেখা লিখেছিল আজও তা ঠিক মনি আছে, গোরুর গাড়ীচলা কাদার রাস্তা শুকিয়ে গেলে যেমন হয় মনি। রথীদের লক্ষ্যবস্তুর নিদর্শনগুলিরও অভাব নেই,—স্নানাগার, য়ামশালা, নাট্যনিকেতন, অ্যাম্ফি থিয়েটার, শৌণ্ডিকালয়, গণিকালয়। কই কালে, একই যুগে এই পৃথিবীতে সাদা ও কালো, পুণ্য ও পাপ াজও যেমন পাশাপাশি বাস করে, সেদিনও তেমনি করত! চিরদিনই ক এমনি করবে? ভারতের বৌদ্ধ রাজারা যখন দুঃখ মোচনের তপস্যায় ানুষ আর পশুর জন্যে চিকিৎসাগার, পান্থশালা, পশুশালা নির্মাণ রাচ্ছিলেন, সাম্রাজ্যমদে মত্ত রোম্যান তখন জ্যান্ত মানুষকে সিংহের খে সমর্পণ ক'রে সবান্ধবে আমোদ করত। নালন্দায়, তক্ষশিলায় বনাগে আর পাহাড়পুরে মানুষের অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করবার ন্যে যখন চলছিল জ্ঞানবিজ্ঞানের সাধনা,—পম্পের গণিকালয়ের দেওয়ালে বারনারী তখন লিখে রাখছিল আর দৈনিক দেহবিক্রয়ের আয়ের তালিকা। জঙ্গল কেটে সহর বসিয়ে, নদীতে নীবীর সেতু বেঁধে মানুষ সভ্য হয়, বন্য প্রকৃতিকে নির্বাসিত করে, উলঙ্গ বীভৎসতাকে দূর ক'রে নিজের সাধনালব্ধ সংস্কৃতিকে প্রতিষ্ঠিত করে,—তাই কি ক্রুদ্ধ প্রকৃতি এমনি করেই তার প্রতিশোধ নেয়? অতীতের জ্ঞান বিজ্ঞানের ইতিহাস, ধর্মসাধনার ইতিহাস প্রকৃতি তার কঠোর হাতে প্রায় সমস্তই মুছে ফেলেছে। কোথায় সরস্বতী, কোথায় দৃসদ্বতী, কোথা উজ্জয়িনী, কোথায় অবন্তী? কিন্তু কুরুক্ষেত্রের গৈরিক অগ্নিজ্বালা, তরাইনের তৃণশূন্য প্রান্তর, পাণিপথের সমরক্ষেত্র আজও রয়েছে। মানুষের পাপের ইতিহাস, তার পতনের ইতিবৃত্ত—প্রকৃতি এমন অযথা স্নেহে রক্ষা করেছে কেন? এই কি তার নিষ্ঠুর পরিহাস? আর্য্যজাতির সমস্ত সুকীর্ত্তি লোপ পেতে বসেছে, কিন্তু তাদের বালখিল্য প্রপৌত্রদের অকীর্ত্তিগুলি ক্রমবর্দ্ধমান।

মহামায়ার সঙ্গে অনেক আলাপ হ'ল অসীমের। এই অল্পভাষী বিনয়নম্র ছেলেটিকে খুব পছন্দ করলেন তিনি। তাঁর বাপের বাড়ী আর শ্বশুর বাড়ীর ঐশ্বর্য্য সম্মানের গল্প শোনাবার এমন একজন নীরব শ্রোতা তিনি বহুদিন পান নি। প্রতিবেশীরা পুরানো হয়ে গেছে, তাদের কাছে সমস্ত গল্প নিঃশেষে বলাও হয়ে গেছে। তাছাড়া তাদের ঈর্ষান্বিত মনোভাব গল্প শোনাবার অনুকূল নয়। দেশের বাড়ীর কথা বললেন, পূজা পার্বনের ধূমধামের বর্ণনা করলেন, কলকাতার বাড়ীর কথা বললেন, আর তারি সঙ্গে বর্ণনা করলেন জ্ঞানদা দাসীর প্রথম কলকাতা দর্শনের
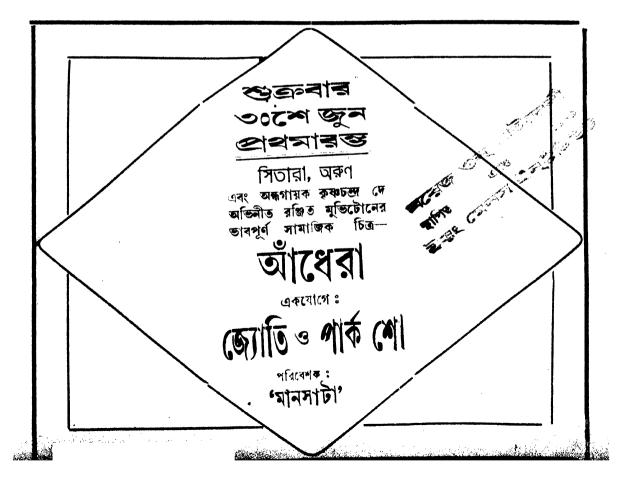
বিস্ময়। সামান্য একটা বোতাম টিপলেই মাথার ওপর বিজলী বাতী জ্ব'লে ওঠে, দশব ক'রে পাখা ঘোরে এ দৃশ্য নিজের চোখে দেখেও দাসীর বিশ্বাস হয় নি। তিনবার বোতাম টিপে টিপে যখন দেখল এতে আর সংশয় নেই, সে তখন তার গলায় আঁচল জড়িয়ে ঘরের বাতী ও আর পাখাটির উদ্দেশ্যে ভক্তিভরে প্রণাম করে মহামায়ার পায়ের কাছে ঢিপ্ ক'রে মাথা ঠুকল। মহামায়া জিগেস করলেন, 'কি রে জ্ঞানদা, তোর অত প্রণামের ঘটা কেন ?" জ্ঞানদা বলল, "মা, তোমরা বড়লোক, ইন্দির চন্দর, বায়ু অগ্নি তাই তোমাদের হাতে ধরা।"

হরিমোহন আর মহামায়া দুজনে মিলে মল্লিকার গল্প শুরু করলেন। কবিরা বলেছেন প্রিয়জনের প্রসঙ্গ মাত্রই মনোরম, কিন্তু অসীমের মনে হ'ল তার একটা সীমা আছে। বিশেষতঃ মল্লিকার দাঁত ওঠা, হাম হওয়া প্রভৃতির বিশদ বিবরণগুলির অনুল্লেখই শোভন হত। মল্লিকা শুনলে প্রবল আপত্তি করতেন, কিন্তু তিনি তখন নিষ্ঠুরের মতো অসীমকে তাঁর বাপমায়ের হাতে সমর্পণ করে শয়নকক্ষে উঠে গেছেন।

ঘুরে ফিরে আবার আরম্ভ হ'ল গাড়ী ঘোড়ার গল্প, দাসীচাকরদের গল্প, জাঁকজমকের গল্প। কর্তা যদি বা কিছু সংযত হন, গৃহিনী তাকে অতিক্রম করে যান। কোথায় যেন একটা কিসের বেসুর বেজে উঠল, কোথায় যেন কি একটা কাটার মতো বিঁধতে লাগল অসীমকে। কেন এই অতিভাষণ ? কিসের প্রয়োজন ছিল বারংবার এই জাঁকজমকের গল্পের ? এ কি তার চোখ ধাঁধিয়ে দেবার জন্যে ? একি গরীব ব'লে তাকে সুকৌশলে শ্লেষ করবার জন্যে ? কিংবা কে জানে, গরীবিয়ানার উষ্মায় হয়তো তার নিজের মনই দীনতাগ্রস্ত, তাই যা এঁদের কাছে সহজ, সরল, তাকেই সে অমন বিসদৃশ করে দেখচে ! অসীম ঠিক ভেবে পেল না, কিন্তু তার মনটা রইল আড়ষ্ট হয়ে।

মহামায়া অসীমকে তার ঠাকুরঘর দেখালেন, তবু তার সে আড়ষ্টভাব কাটল না। দেওয়ালের গায়ে চিত্রিত করা কটকটে নীল যমুনা নদী, অস্বাভাবিক উগ্র লাল ফুলে ভরা তীরতরুদের একপাশ দিয়ে ব'য়ে যাচ্ছে। কোথা থেকে একজোড়া ময়ূর এসে গাছের ডালে প্যাখম তুলে উদ্দাম নৃত্য সুরু করে দিয়েছে। চিত্রশিল্পী বহু আয়াসে বহু রঙের শ্রাদ্ধ ক'রে একডজন ব্রজগোপী এঁকেছেন, ভাবলেশহীন মুখতুলে তারা দূরের আকাশে চেয়ে আছেন। রাংতায় মোড়া কাঠের সিংহাসনে বিগ্রহ। বহুপূজার ভূরিভোজ্য উপচার সামনে বেদীপাদমূলে থরে থরে সাজানো, ভ্যান্ ভ্যান্ করছে মাছি। নেহাৎ দেবতা বলেই তাঁর সয়, মানুষ হলে হজম করা শক্ত হ'ত। অসীমের মনে হ'ল এঁদের যেমন নিজস্ব গাড়ীঘোড়া আছে, নিজস্ব খাট পালঙ্ক তৈজসপত্র, তেমনি এই নিজস্ব গৃহপালিত ঠাকুর। মনকে নম্র করে কেউ এ ঘরে আসেনা, পূজা হয় গঙ্গাজলের ধারা দিয়ে, চোখের জলের ধারা দিয়ে নয়। চোখের জল জিনিবটার বোধ হয় এ বাড়ীতে বিশেষ আনাগোনা নেই, এখানে তার মনে হ'ল সবাই খেয়ে দেয়ে বেশ নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমায়। "ঠাকুর তুমি বেশ আরামে রেখেছ আমাদের, এমনি আরামে চিরদিন রেখো"—এই প্রার্থনাই শোনা যায় বোধ হয় এই ঘরে। তার মনে হল ভয়ঙ্কর, এ আরাম অতি ভয়ঙ্কর। কিন্তু এসবের মাঝে কি আশ্চর্য্য ওই মল্লিকা ! কেমন করে সে সম্ভব হল ? এঁদের দম্ভ, মল্লিকার তেজ। এঁরা এদের ঘটিবাটিরও দাসত্ব করেন, দাসদাসীর দাসত্ব করেন, মল্লিকার তাই বুঝি এরই প্রতিক্রিয়ায় এত আত্মনির্ভরতা ! এঁরা মল্লিকার দাঁত ওঠার ইতিহাস জানেন, হাম হওয়ার ইতিহাস জানেন, কিন্তু তাঁর মনের এই প্রতিক্রিয়ার ইতিহাস জানেন না। কে যেন তাঁকে এই পাষাণগুহায় বন্দী করে রেখেছে, আকাশের বিদ্যুতকে যে কেন সোনার তারের পিঞ্জরে পুরে গতিহীন পঙ্গু করবার প্রয়াসী !

অবশেষে সারা হ'ল স্নানাহারের পালা। অসীম লক্ষ্য করল এবাড়ীর কর্তার ঠাসবোনা আরামের নীরেট আয়োজন। আহারের মধ্যে যে প্রাচুর্য্য ছিল, প্রৌঢ় বয়স্কের পক্ষে সে শুধু অশোভন নয়, অনিষ্টকর। কিন্তু গৃহিনীর সে কি বিষম পীড়াপীড়ি ! মাছের মুড়ো এবং পায়েসের বাটি নিঃশেষ না হওয়া পর্য্যন্ত সে কি 'নন্-ষ্টপ' তাগিদ ! মুখ ধোয়া শেষ না হতেই ভোলা এল খড়্কে হাতে ক'রে। স্বল্পাবশিষ্ট দাঁত-ক'টির মধ্যে আনাগোনা চলতে লাগল খড়কেটির। তারপর ডিবাভরা পান, কলকে ভরা সুগন্ধি তামাক। গড়গড়ায় জলের পরিমাণের সামান্য তারতম্য ঘটায় সে কি কণ্ঠভরা আস্ফালন ! স্বয়ং গৃহিণীকে আনতে হ'ল কাংসভৃঙ্গারে ক'রে জল। অবাধ উদ্গার তুলতে তুলতে কর্ত্তা যখন শয়ন কক্ষে ঢুকলেন, অসীমের মনে হ'ল প্রাগৈতিহাসিক যুগের
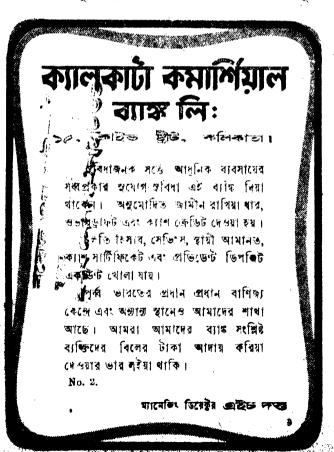
গুহাশ্রয়ী মানুষ যেন, লগুড়ের তাড়নায় অধীনস্থদের সুশাসনে তটস্থ রেখে প্রচুরতম হাড়চিবানোর নিবিড়তম পরিতৃপ্তির অন্তে বিশ্রামের অন্বেষণে যাত্রা। অসীমের মনে পড়ে গেল তার বাবাকে। তাঁর সাহচর্য্য ভাল ক'রে পাবার আগেই তিনি গেছেন চলে, শুধু মনে পড়ে তাঁর ক্ষীণ দীর্ঘ মূর্ত্তিখানি। যেন কোন অদৃশ্য দেবালয়ের প্রদীপশিখা জেলেছেন আপন অন্তরে, যেন কোন্ নীরব তপস্যায় রত। মনে পড়ে অসীম একদা তার ছোট হাত দুটি ভরে এনেছিল তাঁর জন্যে চাঁপা ফুল। তাকে বারম্বার বুকে চেপে কি উচ্ছ্বসিত আনন্দে বলেছিলেন তিনি, "আমার জন্যে চাঁপা ফুল এনেছ! সব থেকে প্রিয় আমার যে-ফুল, এত ছোট্ট হ'য়েও তার সন্ধান তুমি কেমন করে পেলে!" অসীমের মনে হ'ল তাঁর খাওয়ার কথা। কী স্বল্পাহারীই তিনি ছিলেন! কোনোদিন অনুযোগ করেন নি, তার মা যখনি জিগেস ক'রেছেন "কেমন হয়েছে? ভাল হয়নি বুঝি?"—তাঁর সেই একই উত্তর, "কেন? আমার তো খুব ভাল লেগেছে!" পাছে রান্না খারাপ হয়, সেই ছিল তার মায়ের উদ্বেগ। এ লোকটি তো কখনো নিজে কিছু বলবে না, কখনো নালিশ জানাবে না! পরিপূর্ণ সম্পদের দিনেও তাই তিনি স্বামীর রান্না নিজেই রাঁধতেন, কাকেও দিয়ে নিশ্চিন্ত হতেন না। দারুণ অসুখের সময়ও তাঁর সে কী ধৈর্য্য। হাসিমুখে রোগশয্যার একটি পাশে শুয়ে থাকতেন, কারো সেবা নিতেন না। সেবা করতে গেলে তাঁর সে কি কুণ্ঠা! দুরন্ত ব্যাধি যখন তাঁর অন্তরকে টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ছে, জিগেস করলে তখনো হাসি মুখে বলতেন, "কেন, আমি তো বেশ ভাল আছি!" তারপর অন্তিম সময় যখন ঘনিয়ে এল, তিনি শুধু বললেন, "আমার লেপ সরিয়ে দাও, ঘরের দরোজা জানালা সব খুলে দাও, এবার আমি ঘুমাব।" সে ঘুম আর তাঁর ভাঙল না।......

খাবার পর অসীম আর মল্লিকা হলঘরে গিয়ে বসল। মাথার ওপর টানাপাখা চলছে। মল্লিকা তাঁর নিজের আঁকা ছবিগুলি নিয়ে এসে অসীমকে দেখালেন। কেউ তাঁকে ছবি আঁকা শেখায় নি, প্রথমে হাতে খড়ি হয়েছিল তাঁর বাবার এষ্টেটের একজন কর্ম্মচারীর কাছে। তার বিদ্যার দৌড় ছিল কম। শীঘ্রই সে আবিষ্কার করল ছাত্রীর অসামান্য মেধা, লজ্জায় আর শেখাতে এল না। রঙ আর তুলি তাঁর যাদুস্পর্শে যেন কথা ক'য়ে উঠত। তেলের রঙে ছবি আঁকা, কিন্তু এমন সূক্ষ্ম এমন মৃদু টান, যে মনে হয় যেন জলের রঙেই আঁকা।

মস্ত চওড়া চামড়ার ব্যাগ থেকে বেরুল এক ছবি,—এক বাব্‌লা গাছের ঝোপের পাশে সূক্ষ্ম একটু জলের রেখা দেখা যায়, বনপথখানি চলেছে এঁকে বেঁকে। দুই সাঁওতালনারী মাথায় কলসী ক'রে জল নিয়ে ফিরছে, মাথার খোঁপায় তাদের রঙ্গনফুল গোঁজা, কাঁকন পরেছে মোটা মোটা, ভারি ভারি।

অসীম দেখে বললে, "চমৎকার!"

"কিসে তোমার মন ভোলাল?" মল্লিকা জিগেস করলেন।

"সবটা মিলিয়ে। আলোচনা ক'রে বোঝাবার চেষ্টা করব না, তার চেয়ে, তুলির আঁচড়ে তুমি যা ফুটিয়েছ, মিলছন্দে আমি তাই আধো আধো ভাষায় বলি শোন,—

"বাঁকন্ পথে কাঁকন বাজে, কলসভরা জল,
বাব্‌লা বনে কাজ্‌লা মেয়ের নয়ন ছল ছল।"

"বাঃ বাঃ, এ যে একেবারে জাত কবি!" মল্লিকা উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বললেন, "দাও, দাও ও'দুটি লাইন আমায় লিখে দাও, আমি ছবিটার নীচে এঁটে দেব।...তুমি নিশ্চয় খুব সুন্দর কবিতা লেখ, না?"

"উঁহু, কবিতা আমি লিখিনা কখনো, মুখে মুখে বলি, আর তারপর ভুলে যাই।"

"ভারি অন্যায়। তোমার লিখে রাখা উচিত।"

"বাঙালী পাঠক-পাঠিকাদের প্রতি দয়াপরবশ হ'য়েই লিখে রাখি না। লিখলেই ছাপবার লোভ হবে, এবং ছাপলেই সর্ব্বনাশ, পাঠক-পাঠিকাদের তা পড়তে হবে। বাংলাদেশের পাঠকপাঠিকারা জানেন না আমি ঘরে বসে প্রত্যহ তাঁদের কত উপকার করি।"

"তা করো। কিন্তু আমি তোমার বাংলাদেশের পাঠকপাঠিকা নই, কাজেই আমায় তোমার কবিতা লিখে দিতে হবে। ভয় নেই, ছাপাবো না। এখন, এই আর একখানা ছবি দেখ। কি ভাবোদয় হয় এ ছবিতে?"

এটি এক মরুভূমির ছবি। সবেমাত্র প্রভাত হচ্ছে। ধূ ধূ করছে বালি, কেবল এখানে সেখানে ছোট্ট একটুখানি কাঁটা ঝোপ, দু'একটা

খেজুর গাছ। একটা ঝোপের পাশে একজন লোক হাত নেড়ে গল্প করছে, আর এক জন লোক তার সামনে দাঁড়িয়ে তাকে বকছে। তিন দল উট এগিয়ে চলেছে। শেষের দলটির যাবার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না! দূরে দিকচক্রবালে সূর্য্যের উদয় সূচিত হ'চ্ছে।

মল্লিকা বললেন, "পারলে না বুঝি কিছু রস এর মধ্য থেকে আহরণ করতে? তা তোমার দোষ দেওয়া যায় না কবিবর, এ যে নীরস মরুভূমি।"

অসীম বলল, "উঁহু, গোলমাল কোরো না, শোন—"
খর্জ্জুর নিলে মের্জাই ভরি, বোটায় ভরিয়ে জল,
ঠুকুস্ ঠুকুস্ চলন উটের, এ কি রেলগাড়ী কল!
তিন তিন দল চলে গেল আগে, তোমাদেরি তাড়া নাই,
হাত নেড়ে নেড়ে গপ্‌পো না হয় পরেতেই হ'ত ছাই!
সূয্যি মামার ভাঙেনি কো ঘুম, এই বেলা পাড়ি দেও,—
আধেক নয়ন মেলিয়া পূরবে সূর্য্য হাঁকিল, "কেও?"

কবিতার টুকরোটা লিখে নিতে নিতে মল্লিকা বললেন, "ধন্য কবিবর ধন্য! আমি যে এমন কালিদাস সে কথাটি কে বুঝত যদি তোমার মতো আমার এমন একটি মল্লিনাথ না থাকত! একেই তো বলে প্রতিভা! অমন নীরস উট আর নীরসতর মরুভূমিতে তুমি যে রসের ধারা বইয়ে দিলে!"

"ঠাট্টা ক'রো না মল্লিকা" গম্ভীরভাবে অসীম বলল, "আমার কাব্যপ্রতিভা নিয়ে ঠাট্টা করা আমি পছন্দ করি না!"

"ওরে বাসরে! ভয়েই মরি!" মল্লিকা হেসে উঠলেন—"আচ্ছা এই ছবিটির ব্যাখ্যা করো দিকিন কবিকুলাগ্রগণ্য কবি-ধুরন্ধর!"—বলে ব্যাগ থেকে বেছে বেছে আর একখানি ছবি দিলেন।

সূর্য্যাস্তের গোধুলিরঙে রাঙা ছোট্ট একখানি প্রান্তর, একটিমাত্র গাছের কালো ডালের নীচে কপোত-দম্পতী চঞ্চুতে চঞ্চু ঠেকিয়ে বসে আছে।

অসীম দেখে বলল, "মনোরম! আমার 'কাব্য-কনসাস্' মন নাড়া খেয়ে উঠল। শোন—

'তোমারে ভালবাসি'—কপোত কহে মৃদু; চুমিয়ে কপোতীর চঞ্চুপরে,
শুনিয়ে কপোতীর শিহরে কলেবর, নয়ন মুদে আসে পুলক ভরে।
গাছের কালো ডাল কহিল, 'রে বাচাল,
আসিবে একদিন মৃত্যু শোক!'—
গোধূলি আলো কয়, 'নাহি গো নাহি ভয়,
তাহার পরে আছে আলোক-লোক।'

মল্লিকা এবার আর ঠাট্টা করলেন না, কপোত-কপোতীর ছবিখানি, আর একটা কাগজের টুকরায় লিখে নেওয়া অসীমের চার লাইন কবিতার পানে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে বসে রইলেন। "তোমারে ভালবাসি"—এল্লি আনন্দ-অভিভাষণ এল আজ জীবনে! "শুনিয়ে কপোতীর শিহরে কলেবর"—সত্যিই তো,' এ আনন্দের শিহরণ যে আর লুকিয়ে রাখা যায় না! নয়ন যে আপনি মুদে আসে! মল্লিকার মনে হ'ল হঠাৎ যেন কতদূর থেকে বাঁশীর আওয়াজ আসছে ভেসে, বুকের মাঝে উঠছে স্তিমিত কলরোল, কারা যেন সব দলে দলে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল! কত নরনারী পূজার উৎসবে চলেছে, অদূরে মন্দিরতলে বন্দনার গান হচ্ছে, সবাই যেন সবাইকে প্রণাম করছে, বুকে জড়িয়ে ধ'রে বলছে 'আজ আমার আনন্দ রাখবার ঠাঁই নেই।' তারপর ধীরে ধীরে নেমে এল কালো, নিথর পাষাণের মতো ভার হ'য়ে চেপে বসল বুকে। মৃত্যু এসে বিচ্ছেদ এসে সমস্ত যেন ম্লান ক'রে দিয়ে গেল, সব আলো নিভিয়ে দিল। কিন্তু তবু তো ছবি মুছল না! কোথা হ'তে নেমে এল গোধুলি আলো, পরম নির্ভয় দিয়ে কানে কানে সে কইল, 'না গো না, আমি গোধূলির আলো, সোনালী আলো, মৃত্যুপারের অমৃতের আলো, আমি আছি,—জেগে ওঠ" বারংবার মল্লিকার মন আবৃত্তি করল, "ভয় কোরো না, লজ্জা কোরো না, শোক কোরো না, জাগো আমার মন!"

মল্লিকা জিগেস করলেন, "তোমায় কি পুরস্কার দেব কবি? প্রার্থনা করো, এখুনি হুকুম দেব ভাণ্ডারীকে, দেব আমার রাজভাণ্ডার উন্মুক্ত ক'রে।"

অসীম বলল, "ওরে বাসরে! রাণী দেখছি আজ দাতাকর্ণ! আমার ছোট্ট দরখাস্তখানি তো দাখিল করাই আছে হুজুর।"

মল্লিকার কথা বেধে গেল। একদৃষ্টে অসীম তাঁর মুখের পানে রইল তাকিয়ে। প্রত্যুষের তারায় ভরা আকাশে সূর্য্যের আলো পড়লে দিকে দিকে যেমন নব নব দ্যুতির বার্ত্তা রটে যায়, মল্লিকার মুখে চোখেও তেমনি নব নব জ্যোতিঃর কিরণ ঠিক্‌রে পড়ল। অবাক হ'য়ে অসীম ভাবছিল, কে এ! কোন্ জন্মজন্মান্তরের দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধানের পারে মানবজীবনের প্রথম প্রভাতে এর সঙ্গে দেখা! নব-অনুরাগিনীর প্রথমজাত অনুরাগ কোন্ মায়ামন্ত্রবলে এমনি ক'রে লাখ লাখ যুগের পুরাতন হ'য়ে গেল! তবুও তো 'হিয়া জুড়ন না যায়!'

বলি-বলি করেও মল্লিকার আর বলা হ'য়ে ওঠে না। লজ্জা এসে বাধা দেয়। ভেবেছিলেন মনের দৃপ্ত তেজে বাধাও যেমন বাধে না, প্রাণের আবেগে তেমনি কণ্ঠেও কিছু বাধবে না,—কিন্তু দেখলেন তা হয় না। ধীরে ধীরে কোথায় গেল ওঁর সে তেজ, কোথায় গেল সে বিদ্রোহিনীর দৃপ্তভঙ্গিমা! ঠোঁট দুটি কাঁপছে, চক্ষুপল্লবে জলের আভাস, করপল্লবদুটি নমস্কারের ভঙ্গীতে সংবদ্ধ, সমস্ত দেহলতা যেন নীরব প্রণামে নত হ'ল। যেন ওরা দুজনেই কোন্ এক অনাদি অনন্ত মন্দিরের দুয়ার খুলে ভিতরে এসে দাঁড়াল, সকল প্রাণ যেখানে এসে চিরন্তন প্রাণে মিশিয়ে যাচ্ছে। ওদের মনে হল, যেন কোথায় নিবেদনের বীণা বাজছে, কোথায় যেন উদাত্তকণ্ঠে মন্ত্র উচ্চারণ হচ্ছে—দু'জনের হৃদয় যেন পূজার বেদীতে লুটিয়ে পড়ল।

অসীম উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "জবাব পেয়েছি। ধন্য হলুম।"

(ক্রমশঃ)

পোষাক পরিচ্ছদ

ইংরেজী বর্ণমালা প্যাটার্ণ

শ্রীমতী গায়ত্রী দেবী

"P"

(১০ ঘরে উঠিবে)

১ম কাঁটা—৬ ঘর সাদা, ৩ ঘর কাল, ১ ঘর সাদা।

২য় কাঁটা—১ ঘর কাল, ৩ ঘর সাদা, ২ ঘর কাল, ৪ ঘর সাদা।

৩য় কাঁটা—৪ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ৫ ঘর সাদা।

৪র্থ কাঁটা—২ ঘর সাদা, ২ ঘর কাল, ২ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ১ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ১ ঘর সাদা।

৫ম কাঁটা—১ ঘর কাল, ২ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ১ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ২ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ১ ঘর সাদা।

৬ষ্ঠ কাঁটা—২ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ৪ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ১ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল।

৭ম কাঁটা—১ ঘর সাদা, ৬ ঘর কাল, ৩ ঘর সাদা।

"Q"

(১১ ঘরে উঠিবে)

১ম কাঁটা—২ ঘর সাদা, ২ ঘর কাল, ১ ঘর সাদা, ৩ ঘর কাল, ৩ ঘর সাদা।

২য় কাঁটা—২ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ৩ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ২ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ১ ঘর সাদা।

৩য় কাঁটা—৩ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ১ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ২ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ২ ঘর সাদা।

৪র্থ কাঁটা—১ ঘর সাদা, ৪ ঘর কাল, ২ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ৩ ঘর সাদা।

৫ম কাঁটা—২ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ২ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ১ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ২ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল।

৬ষ্ঠ কাঁটা—১ ঘর কাল, ৩ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ১ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ১ ঘর সাদা, ২ ঘর কাল, ১ ঘর সাদা।

৭ম কাঁটা—১ ঘর কাল, ১ ঘর সাদা, ৪ ঘর কাল, ১ ঘর সাদা, ৩ ঘর কাল, ১ ঘর সাদা।

"R"

(১১ ঘরে উঠিবে)

১ম কাঁটা—১ ঘর সাদা, ২ ঘর কাল, ৪ ঘর সাদা, ৩ ঘর কাল, ১ ঘর সাদা।

২য় কাঁটা—১ ঘর কাল, ৩ ঘর সাদা, ২ ঘর কাল, ১ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ২ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল।

৩য় কাঁটা—২ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ২ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ৫ ঘর সাদা।

৪র্থ কাঁটা—২ ঘর সাদা, ২ ঘর কাল, ১ ঘর সাদা, ৪ ঘর কাল, ২ ঘর সাদা।

৫ম কাঁটা—১ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ২ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ১ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ২ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ১ ঘর সাদা।

৬ষ্ঠ কাঁটা—২ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ৪ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ১ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ১ ঘর সাদা।

৭ম কাঁটা—২ ঘর সাদা, ৬ ঘর কাল, ৩ ঘর সাদা।

বোম্বাই বিস্ফোরণের জের

১৯৪৪ সালের ১৪ই এপ্রিল তারিখের বিভীষিকাময় রাত্রে শত শত লোক নিজের জীবন ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিপন্ন করে' বোম্বাই বিস্ফোরণের আগুন নেবাবার চেষ্টা করেছিলো। সারারাত এই কর্মীরা আগুনের সঙ্গে সংগ্রাম করেছে আর সরিয়েছে শত শত মণ ভগ্নস্তুপ; ধোঁয়ার কালিতে তাদের দেহ গেছে ঢেকে আর চোখ গেছে যেন অন্ধ হয়ে। যখন ভোর হোলো, দেখা গেলো তখনো এদের অনেক কাজ বাকি। অনেক কিছুই তখনো করবার ছিলো, এবং তা করবার আগ্রহেরও কোনো অভাব ছিলো না। কিন্তু এদের শরীর আর বইছিলো না।

ভোরবেলাতেই কিন্তু হঠাৎ এদের সামনে এসে উপস্থিত হোলো সজীব, সরল হয়ে উঠবার এক অতিবাঞ্ছিত উপায়। দেখা গেলো ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট একস্‌প্যানশান্‌ বোর্ডের চায়ের গাড়ি বিধ্বস্ত অঞ্চলে ঘুরে' ঘুরে' সবাইকে চা দিচ্ছে। সারারাত্রি জাগরণ ও অক্লান্ত পরিশ্রমের পর কর্মীরা ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়েছিলো। তাদের প্রত্যেককে দু' টুকরো রুটির মধ্যে টিনের মাংস দিয়ে তৈরী করা একখানা করে' স্যাণ্ডউইচ্‌ আর এক এক পেয়ালা গরম গরম চা দেওয়া হচ্ছিলো। সৈন্য বিভাগের তরফ থেকে দেওয়া হচ্ছিলো স্যাণ্ডউইচ্‌ আর ইণ্ডিয়ান্‌ টী মার্কেট একস্‌প্যানশান্‌ বোর্ডের তরফ থেকে হাজার হাজার পেয়ালা চা। কি ব্রিটিশ, কি ভারতীয় এই চা খেয়ে যেমন সতেজ আর প্রফুল্ল হয়ে উঠ্‌লো, এরকম বোধ হয় আর কিছুতেই তারা হোতো না। চা তাদের নতুন করে' কাজের উৎসাহ এনে দিলে এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই দেখা গেলো সবাই আবার কাজে লেগে গেছে। সারাদিন ধরে' চায়ের গাড়ি সবাইকে বিনামূল্যে চা বিতরণ করে' বেড়ালো। চা-গাড়ির নিঃস্বার্থ কর্মীরা বিকেলেও সবাইকে চা জোগাতে ভুললো না। আর সে চা কর্মক্লান্ত লোকদের কাছে যে কী ভালো লেগেছিলো তার পরিচয় পাওয়া গেলো যখন চা-গাড়ি উপস্থিত হওয়া মাত্র সবাই সমস্বরে চেঁচিয়ে তাকে অভিনন্দন জানালো। ১৫ই এপ্রিল ও তার পর কয়েকদিনের মধ্যে সেখানে পঁয়তাল্লিশ হাজার পেয়ালা চা বিতরণ করা হয়েছিলো।

অগ্নি-নির্বাপক বাহিনীর কাছে চা যে কতো মূল্যবান এ-যুদ্ধে তার পরিচয় বারবারই পাওয়া গেছে। বোম্বাইয়ের অকুতোভয় অগ্নি-নির্বাপক ও জন-উদ্ধার কর্মীদের চা যেমন প্রেরণা ও কর্মশক্তি জুগিয়েছে লণ্ডন থেকেও তার অনুরূপ একটি ঘটনার সংবাদ পাওয়া গেছে। স্যালভেশান আর্মির একজন মহিলা কর্মী নিজেই একটি চায়ের গাড়ি চালিয়ে নিয়ে বেড়াতেন। তিনি লিখ্‌ছেন:

"এক রাত্রিতে ভীষণ বোমা পড়লো। সারারাত আমরা প্রতীক্ষা করে রইলাম, এখুনি আমাদের ডাক পড়বে। কিন্তু টেলিফোনটা একটু খারাপ ছিলো বলে' ভোর সাতটার আগে চা আর স্যাণ্ডউইচ্‌ নিয়ে যাবার ডাক এসে পৌঁছুলো না।

"তাড়াতাড়ি গাদা গাদা স্যাণ্ডউইচ কেটে আর জল ফুটিয়ে নিয়ে আধ মাইলটাক দূরে এক রাস্তার উদ্দেশে অন্ধকারের মধ্যেই আমরা বেরিয়ে পড়লাম। গিয়ে দেখি এক সার দোকান আর তার উপর বাড়িগুলো একেবারে গুঁড়ো হয়ে গেছে। অনেক লোক মরেছে, আর ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপাও

বিজনদা'র চিঠি

আমার আদুরে ভাই বোনেরা,

এর আগে তোমরা অনেকে আমায় জানিয়েছিলে যে, "প্রতিযোগিতায় বিষয় ও কুপন যে সংখ্যায় বার হয় সে সংখ্যা যদি কোন রকমে আমরা না পাই, তা' হলে সেবারে আর প্রতিযোগিতায় যোগদান করতে পারি না। সেইজন্যে যাতে আবার ঐ দুটো পরের সংখ্যায় ছাপা হয় তার ব্যবস্থা করতে।" এবারে তাই আবার ওদুটো ছাপলাম, অতএব এবারে তোমরা প্রত্যেকেই প্রতিযোগিতায় যোগদান করেছ যেন দেখতে পাই।......স্নেহ নিও।

তোমাদের : বিজনদা'

রাণু আর তা'র দাদা

(৫)

—রূপকুমার—

দাদা,

সূর্য্য সম্বন্ধে মোটামুটি সবই জানলাম তোমার এবারকার চিঠিতে। এবারে তোমার চিঠির মধ্যে দুটো মজার কথা পেলাম। "গুরু দক্ষিণা"র কথা বলেছ, সেটা আমার পক্ষে দেওয়া খুব সহজ, বিশেষ করে তোমার মত গুরুকে। বাড়ীতে এলে ভক্তিভরে গলায় আঁচল দিয়ে গুরুকে প্রণাম করা ছাড়া আর শিষ্য ও শিষ্যার কি আছে আমাদের! এটাই তো এ সংসারে শিষ্যদের কাছে সব থেকে বড় গুরুদক্ষিণা! কিন্তু তুমি তোমার শিষ্যাকে কি দিয়ে পুরস্কৃত করবে সেদিন?

...এবারে আমার প্রশ্ন হচ্ছে চন্দ্র সম্বন্ধে। ...চন্দ্রের মধ্যে আছে কি, পৃথিবী থেকে সে কত দূরে আছে? চন্দ্র পৃথিবীর থেকে নিশ্চয়ই সূর্য্যের মত আকারে বড়। চন্দ্র থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে কতক্ষণ সময় লাগে? চন্দ্র পৃথিবীকে কি প্রদক্ষিণ করে, যদি সে তা করে তবে তাতে তা'র কতদিন সময় লাগে? চন্দ্র নিশ্চয়ই সূর্য্যের মত উত্তপ্ত নয়? চন্দ্রের সবদিকই আমরা দেখতে পাই কি?...ভালো কথা, চন্দ্র ও সূর্য্য গ্রহণ কেন হয় সে কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করতে একেবারে ভুলে গেছি। ও দুটো হওয়ার কারণও জানিও। প্রণাম রইলো।

তোমার বোন : রাণু

মনে রেখো

"অপরের দুঃখ জ্বালা হবে মিটাইতে,
হাসি আবরণ টানি দুঃখ ভুলে যাও,
জীবনের সর্ব্বস্ব অশ্রু মুছাইতে
বাসনার স্তর ভাঙ্গি বিশ্বে ঢেলে দাও।"

—চিত্তরঞ্জন দাশ

অভিজ্ঞতা

কুমার অপূর্ব্ব মজুমদার (১১৪৭)

ট্রামে হঠাৎ ছেলেটার সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল—শুধু আলাপ বললে ভুল হবে খানিকটা হৃদ্যতাও জন্মে গিয়েছিল। ছেলেটার নাম করবো না, কারণ, পরিচয় থাকলে ছেলেটা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা তিক্ত হয়ে যাবে।

সুরুচিপূর্ণ কথাবার্ত্তা, ব্যবহারের কোমলতা সব কিছু মিলে ছেলেটাকে আমার বড় ভাল লেগেছিল। জন্মবাদ বিশ্বাস না করলেও সে মুহূর্ত্তে আমায় মেনে নিতে হয়েছিল যে ছেলেটা বুঝি পূর্ব্বজন্মে আমার কেউ ছিল। পরস্পরের ঠিকানা টুকে ভারাক্রান্ত মনে প্রথম দিন আমরা বিদায় নিয়েছিলাম।

তারপর বন্ধুটার সঙ্গে অনেকদিন দেখা হয়নি—কাজের চাপে তার সঙ্গে দেখাও করতে পারিনি। রূপবাণীতে এক শনিবার ম্যাটিনী শো'তে গিয়ে অপ্রত্যাশিতভাবে ওর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। অনেকক্ষণ গল্প-গুজব করবার পর ছেলেটা আমায় বল্ল—'ভাই, তোর কাছে টাকা আছে? আমায় পাঁচটা টাকা দিতে পারিস'। টাকা দিলে ও বিদায় নিয়ে চলে গেল।

এদিকে মাস-দুই কেটে গেল, ছেলেটার দেখা নেই—ছেলেটার দেওয়া ঠিকানায় খোঁজ নিয়ে কোন সন্ধানই পেলাম না। টাকার কথা একরকম ভুলেই গেছি। দিন কয়েক আগে ঢাকুরিয়ায় এক বন্ধুর বাড়ী যাচ্ছিলাম। শিয়ালদা'র মোড়ে ছেলেটার সাথে দেখা হয়ে গেল। দেখা হতেই বললাম—'ভাই, টাকাটা দিলে না।' ছেলেটার মুখে ফুটে উঠল বিস্ময়ের বিরাট স্তূপ। নাসিকা কুঞ্চিত করে বললো—'কাকে কি বলছ?' ভাল করে তাকালাম, ভুল হবার কথা নয়! স্তম্ভিত হয়ে গেলাম এতবড় মিথ্যা কথায়। পাশের ছেলেটার কাছে আমার সম্বন্ধে পরিহাস করতে দেখে লজ্জায় ঘৃণায় এতটুকু হয়ে গেলাম। দ্বিতীয় কথা আর না বলে এগিয়ে গেলাম। বুঝলাম পরিচয়ের প্রয়োজন ওর শেষ হয়ে গেছে।

টাকা গেল সামান্যই, কিন্তু টাকার বিনিময়ে অভিজ্ঞতা পেলাম অনেকখানি। অজানা বন্ধুদের প্রতি যে গভীর বিশ্বাস ও যে সন্দেহহীন উদার আচরণ আমার ছিল, বাস্তবের নগ্ন সত্যটা আমার সে অকৃত্রিম ভালবাসা ও বিশ্বাসের স্থানকে সঙ্কীর্ণ করে দিল।......

সব সত্যি

বিনয় ভৌমিক (৮২৮)

কালিফার্ণিয়া সহর......

ভারতবর্ষ থেকে এক মহাপুরুষ এসেছেন সেই সহরে। ইয়োরোপ ও আমেরিকার নানান জায়গায় ঘুরে তিনি হিন্দুধর্ম্মের মূল সত্যটিকে সহজ ভাষায় বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দিয়েছেন।...যা' হোক, এত বড় যোগী! তাঁর থাকবার ব্যবস্থা হ'লো বিরাট এক অট্টালিকায় দশ তলার উপর। জাঁকজমক ও আড়ম্বরের এতটুকু ত্রুটিও নেই তাঁর জন্য ব্যবস্থিত শোবার ঘরটিতে। ধবধবে মোলায়েম বিছানা, ঝালড় দেওয়া গদি, রংবেরং-এর আলো, কি আয়োজন!...

ভোর বেলায় সকলে দেখা করতে এলেন তাঁর সঙ্গে। কৈ, বিছানার উপর ত' তিনি নেই! কোথায় গেলেন? ব্যস্তসমস্ত হয়ে সকলে তাঁকে খুঁজতে আরম্ভ করে দিলেন। পড়েছে অনেকেই। দেখে শুনে মনে হোলো আমাদের আসতে বড্ডই দেরি হয়ে গেছে। কিন্তু আসলে দেরি হলেও আমাদের অতিরিক্ত দেরি হয়নি। কাজ তখনো পুরোদমেই চলছিলো। শত শত পেয়ালা চা তখন বিতরণ করা হোলো।"

শেষকালে দেখা গেল যে যোগী পুরুষটি বিছানা ছেড়ে ঘরের এক কোনে খালি মেঝের ওপর শুয়ে আছেন, আর তাঁর দু' চোখ বেয়ে নেমে আসছে অজস্র অশ্রুধারা। কৌতুহলের বশবর্ত্তী হয়ে সকলে তাঁকে জিজ্ঞেস করলো—ও কি! আপনি মেঝেয় শুয়ে কেন, আর কাঁদছেনই বা কি জন্যে? যোগীবর শান্তস্বরে উত্তর দিলেন: আমি কাঁদছি আমার সবহারা ভারতীয় ভাইদের জন্যে। যখন আমি ঐ দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন করে বেঘোরে নিদ্রা যাবো, তখনই হয়ত আমার অত্যাচারিত, নিপীড়িত অসহায় ভাইরা রাস্তার ধারে শুয়ে রাতটুকু কাটাবার অপেক্ষায় থাকবে। তাই পারলাম না ঐ কোমল বিছানায় আশ্রয় নিতে। শক্ত পাথরের মেঝেই আমার নিদ্রায় অনেকখানি সাহায্য করলো।"

এই মহাপুরুষটি কে জানো? ইনি হচ্ছেন শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ, যিনি একদিন সারা ভারতকে তার ধর্ম, কৃষ্টি ও সভ্যতার সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দিয়েছিলেন আত্মাভিমানী পশ্চিমের কাছে, যাঁর ত্যাগ ও মাহাত্মার আদর্শে সারা পৃথিবী একদিন বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল।

মজার খবর

—নির্ম্মলকুমার রায় (১০২২)

ফ্রান্সে নাকি মশা নেই। অসম্ভব কিছুই নয়। সেখানে হয়ত আমাদের দেশের মত পচা ডোবা, খাল, বিল প্রভৃতি নেই এবং হয়ত আমাদের মত সে দেশের সহর অপরিস্কারও নয়।

* * *

সাগরের জল নোনা, তা তোমরা সকলেই জান। কিন্তু এমন একটা যায়গা আছে যেখানকার জল নোনা নয়, মিষ্টি। যায়গাটা অষ্ট্রেলিয়ার পূর্ব্ব দিকে একটা দ্বীপের কাছাকাছি। তবে এ ক্ষেত্রে সমুদ্রের ওপরে নয়, একেবারে তলায়। ওপরে হয়ত নোনা জলের ঢেউ খেলে যাচ্ছে, কিন্তু নীচে বয়ে যাচ্ছে মিষ্টি জলের ঝরণা। কুয়ো থেকে জল তোলার মত সেখান থেকে মিষ্টি জল সংগ্রহ করা হয়। সেখানকার লোকেরা ডুবুরীর মত জলের তলায় নেমে গিয়ে সে জল তুলে আনে। আর এ জল শুধু মিষ্টিই নয়, সুস্বাদুও। বেশ মজার ব্যাপার নয়?

নতুন বই

শত্রুপক্ষের ট্রেঞ্চে—শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর; এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স লিঃ, কলিকাতা, দাম এক টাকা।

বইখানি আটটি গল্পের সমষ্টি। গল্পগুলি বর্ত্তমান রুশ-জার্মান যুদ্ধের পটভূমির উপর রচিত। যুদ্ধের গল্প লেখায় ধীরেন বাবু বাংলা সাহিত্যে এখন অদ্বিতীয়, সেজন্য কিশোর মহলে তিনি যে জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন এই বইখানিতেও তা অক্ষুণ্ণ থাকবে। প্রত্যেকটি গল্পই স্বদেশপ্রেমে প্রোজ্জ্বল। জাতি ও স্বাধীনতার জন্য রুশ ছেলেমেয়েরা যে ভাবে আত্মত্যাগ করছে, বাংলার কিশোর-কিশোরীদের কাছে তা শ্রদ্ধা আকর্ষণ করবে। বইখানির আমরা বহুল প্রচার কামনা করি। বর্ত্তমান দুর্মূল্যের যুগে ছবি, ছাপা, বাঁধাইয়ের তুলনায় দাম সস্তাই বলতে হবে!

গ্রহে-উপগ্রহে: শ্রীঅখিল নিয়োগী, প্রকাশক: অভিযান পাবলিসার্স, কলিকাতা। দাম: আট আনা।

এর আগে অভিযান সিরিজের প্রথম গ্রন্থের কথা তোমাদের বলেছি। এবারে এই বইখানা হচ্ছে ঐ সিরিজের দ্বিতীয় গ্রন্থ। এখানিও তোমাদের খুসী করতে পারবে। তোমাদের এই উপন্যাসের নায়ক হচ্ছে "অরুণ"। সে বাড়ীর থেকে বার হয়ে কেমন করে গ্রহে উপগ্রহে গিয়ে হাজির হলো তারই দুঃসাহসিকতাপূর্ণ অভিযানের গল্প তোমাদেরই প্রিয় লেখক এতে লিপিবদ্ধ করেছেন।

অভিযান সিরিজের এই দ্বিতীয় গ্রন্থখানিও আমাদের খুসী করেছে। —শ্রীবি

কিশোর বাংলা: (ছেলেমেয়েদের মাসিক পত্র), নির্ম্মলভাই কর্ত্তৃক পরিচালিত ও অধ্যাপক শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরীর সম্পাদনায় প্রকাশিত। ৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা; বৈশাখ ১৩৫১।

কলিকাতা বেতার কেন্দ্রের গল্পদাদুর আসরের ভূতপূর্ব্ব পরিচালক "নির্ম্মলভাই"এর পরিচালনায় "কিশোর বাংলার" সঙ্গে "ছোটদের আসর" সংযুক্ত হয়ে এই সংখ্যা থেকে নতুন পরিকল্পনায় ও আদর্শ নিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে দেখে খুসী হলাম। আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের খবর যাঁরা জানেন তাঁরা এদের জন্যে কিছু করছেন দেখলে মনের মধ্যে যেন আপনা থেকেই এই কথাটাই উদয় হয় যে, এরা এবার নতুন কিছু পাবে তাঁদের কাছ থেকে।

বাংলা সাহিত্যের খ্যাতনামা লেখক শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, সুনির্ম্মল বসু, অধ্যাপক শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, ৺অক্ষয় ভট্টাচার্য্য, প্রণব রায় প্রভৃতির লেখা গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, জীবনী, গান ও স্বরলিপি বর্ত্তমান সংখ্যায় স্থান পেয়েছে। এছাড়া এর বিশেষত্ব দেখলাম যে আট-ন' বছর বয়েসের ছেলেমেয়েদের উপযুক্ত তিন রকম রঙ্গীন কালিতে বড় বড় অক্ষরে ছাপা "শিশু-মহল" নামে একটা নতুন বিভাগ, আর শিল্পী প্রশান্ত চৌধুরীর আঁকা বহু কৌতুক চিত্র।

আসল কথা পত্রিকাখানি আমাদের খুসী করেছে, এবং আমাদের বিশ্বাস যে "কিশোর বাংলা" আমাদের দেশের শুধু কিশোর কেন শিশুদেরও খুব প্রিয় হয়ে উঠবে। —শ্রীবিঃ

২৯নং প্রতিযোগিতা

বিষয়: সবার শ্রদ্ধেয় আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র। প্রতিযোগিতায় যোগদানের শেষ তারিখ হচ্ছে ৮ই জুলাই।

পুরস্কার: ১ম, আচার্য্য স্মৃতি-পদক,
২য় ও ৩য়: বই।

ছুটির ঘণ্টা ২৯নং প্রতিযোগিতা কুপন।

নাম ....
বয়স: ....
ঠিকানা: ....

খেলার মাঠে

শ্রীউমেশ মল্লিক বি, এ

অদ্ভুত মনোবৃত্তি

খেলার মাঠের এক শ্রেণীর দর্শকদের আচরণ ক্রমেই এরূপ আপত্তিকর হ'য়ে উঠছে যার তীব্র প্রতিবাদ করা উচিত। অপক্ক গোল রক্ষকতায় রেল দলের গোলরক্ষক পি, ঘোষ যখন প্রায় মোহনবাগান দলের ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের কারণ হ'য়ে দাঁড়ান তখন মোহন-বাগান দলের একশ্রেণীর সমর্থক তাঁর মনঃসংযোগে ব্যাঘাত ঘটাবার জন্য পিছন থেকে ইষ্টক নিক্ষেপ করতে থাকে। নিলু মুখো-পাধ্যায় রেফারীর এবিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। আর যাই হউক যারা এপ্রকার ব্যবহারের জন্য দায়ী তাদের অখেলোয়াড়ী জনোচিত মনোবৃত্তি যে অত্যন্ত নিন্দনীয় সেকথা একবাক্যে স্বীকার করি।

কোনো খেলোয়াড় যদি কোনো দিন উন্নত শ্রেণীর খেলা দেখাতে না পারে তা'হলে "গ্রীন ষ্ট্যাণ্ড" থেকে গালি বর্ষণ হ'য়ে থাকে। রেফারী এবং লাইন্সম্যান এঁদেরও উপর দর্শকদের অত্যাচার কম হয় না। রেফারীকে প্রহার করাও দেখা গেছে। ইঃ বিঃ দল যেদিন কালীঘাটের বিরুদ্ধে ৩-২ গোলে পরাজিত হয় সে দিন অনুরূপ ঘটনার সূচনা হয়, কিন্তু সার্জ্জেণ্টদের মধ্যস্থতায় কোনপ্রকার অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে নি।

অসাবধানতায় লাইন্সম্যান যদি কোন বিচারে ভুল করেন, বিরুদ্ধ দলের সমর্থকরা তাঁর বিরুদ্ধে যে বাক্যবাণ বর্ষণ করেন তা আর যাই হোক ভদ্র কখনও নয়।

দর্শক সাধারণের এপ্রকার মনোবৃত্তি অতীব দুঃখের।

লীগ চ্যাম্পিয়নশিপ

দ্বিতীয়ার্দ্ধের প্রথম থেকেই মোহনবাগান দলের দৃঢ়তায় ভাঙ্গন ধরেছে। তিনটি দলের বিরুদ্ধে অমীমাংসিতভাবে খেলা শেষ করে এরা ৩টি মূল্যবান পয়েন্ট নষ্ট করেছে। ফলে মহমেডান দলের সঙ্গে এদের সমান পয়েন্ট এবং ইঃ বিঃ দলের সঙ্গে ২ পয়েন্টসের ব্যবধান। মোহনবাগান দল যে প্রথম ৪ পয়েন্টে অগ্রগামী ছিল সে সুযোগ এভাবে নষ্ট হচ্ছে দেখে সত্যিই দুঃখ হয়। মোহনবাগান দলের ফরওয়ার্ডদের খেলা ক্রমশঃ নিম্নশ্রেণীর হচ্ছে। বিজন বোসের গত কয়েকটি খেলায় গোলের সম্মুখে ব্যর্থতা ক্রমশঃই চরমে উঠছে। অমল মজুমদারও সুবিধাজনক নয়। অমিয় ভট্টা-চার্য্যের খেলা বিনা অনুশীলনীতে মোটেই প্রীতিপদ নয়। শরৎ দাস আহত, স্পোর্টিং ইউনিয়নের সঙ্গে খেলায় মান্নাও আহত হয়েছে, সুতরাং মোহনবাগান দলের লীগে শীর্ষস্থান অধিকার করা যে সুনিশ্চিত তা বলা চলে না।

মহমেডান দল ক্রমশঃই উন্নতি করছে। তদুপরি বর্ষাকালে মহমেডান দল অপেক্ষাকৃত ভালই খেলবে বলে মনে হয়।

ইঃ বিঃ দল অভাবিতভাবে কালীঘাটের কাছে ২টি পয়েন্ট নষ্ট করায় তাদের গতি প্রতিহত হয়েছে। এখনও কোন দল যে শ্রেষ্ঠ বলে প্রতিপন্ন হবে সে কথা নিশ্চিত-ভাবে বলা চলে না।
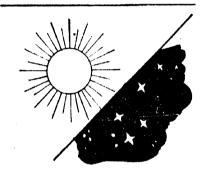
ফুটবল লীগে কার কিরূপ স্থান :—
(রবিবার ২৫শে জুন পর্য্যন্ত)

মোহনবাগান	১৭	১৩	৩	১	২৯	৫	২৯
মহমেডান স্পোঃ	১৬	১২	২	২	২৮	৬	২৬
ইঃ বিঃ	১৭	১২	৩	২	৩৮	১৩	২৬
বি এণ্ড এ আর	১৬	৯	২	৫	২৪	১৮	২১
কালীঘাট	১৭	৮	২	৭	১৪	১৪	১৮
এন্টিলোপ	১৬	৬	৪	৬	১১	১১	১৬

ইত্যাদি

গত সপ্তাহের খেলা

গত সপ্তাহের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা মোহনবাগান দলের ভবানীপুর, ডালহৌসী এবং স্পোর্টিং ইউনিয়নের বিরুদ্ধে অমীমাংসিতভাবে খেলা শেষ করা। ইঃ বিঃ দলের কালীঘাটের নিকট পরাজয় বরণ করাও বিশেষভাবে উল্লেখ করার মত।

গত ২২শে জুন বৃহস্পতিবার মোহন-বাগান দল ভবানীপুরের বিরুদ্ধে ১-১ গোলে খেলা শেষ করে। এদিন মোহন-বাগানের খেলা অতি নিম্নস্তরের হয়। ভবানীপুরকে জয়ী হতে দেখলেও আশ্চর্য্যান্বিত হবার কোন কারণ ছিল না। একমাত্র দ্বিপেন সেনের খেলা ভাল হয়। অমিয় ভট্টাচার্য্য প্রথম খেলেন। এন, চ্যাটার্জ্জীর এবং নিমু বোসের আক্রমণ বিভাগের খেলা মন্দ হয় নি। রক্ষণ বিভাগে অনিল দে'র খেলা উল্লেখযোগ্য হয় নি। আণ্ড এবং মান্না দৃঢ়তার পরিচয় দেয়।

২৪শে জুন মোহনবাগান দল ডালহৌসীর বিরুদ্ধে এক পয়েন্ট নষ্ট করে। বি, বোস এবং অমল মজুমদার বহু সুযোগের অপব্যয় করে। এন, চ্যাটার্জ্জীর খেলা ভাল হয় নি। আহত অনিল দে'র খেলাও ভাল হয় নি। এক মাত্র দ্বিপেন সেন এদিন চমৎকার খেলেন। ব্যাকদ্বয় এবং গোলরক্ষককে বিশেষ ব্যতিব্যস্ত হতে হয় নি।

গত মঙ্গলবার মোহনবাগান স্পোর্টিং ইউনিয়নের সঙ্গে ড্র করেছে। এদিনে মোহনবাগান যেরূপ নিকৃষ্ট শ্রেণীর খেলে

তা দেখে আমরা আশ্চর্য্য হয়েছি। স্পোর্টিং এর খেলা খুব ভাল হয়। এদিন তারা জয়লাভ করলে বিশেষ আশ্চর্য্য হবার ছিল না।

একপ্রকার কে, দত্তর অভাবেই ২৩শে জুন শুক্রবার ইঃ বিঃ দল কালীঘাটের নিকট ৩-২ গোলে পরাজিত হয়। কালীঘাট দলের বি, দাসগুপ্তের খেলা এদিন অপূর্ব্ব হয়ে উঠে এবং প্রতিটি গোলে তাঁর প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। এ, মুখার্জ্জী, এ, গাঙ্গুলীর খেলাও আকর্ষনীয় হয়। ইঃ বিঃ দল বহু সুযোগ নষ্ট করে। গোলরক্ষক অমিতাভের খেলায় গলদ দেখা যায়। গোলগুলির মধ্যে একটী অন্ততঃ তাঁর রক্ষা করা উচিত ছিল। পরপর ক'টি খেলায় কে, দত্তকে দেখা যাচ্ছে না কেন?

আপ্পারাও এবং সোমানা

উপরোক্ত খেলোয়াড়গণ কলিকাতার খেলার মাঠে কয়েক বৎসর উন্নত শুরের খেলা দেখিয়ে বিশেষ সুনাম অর্জ্জন করেছিলেন। ইঃ বিঃ দল ত্যাগ করে এঁরা ভবানীপুরে যোগদান করেন। ভবানীপুর দল এঁদের যোগদানে বিশেষ শক্তিশালী বলে মনে হয়। কিন্তু সংবাদে প্রকাশ, উপরোক্ত খেলোয়াড়গণ মহীশূরে খেলার জন্য আই, এফ, এর নিকট অনুমতি চেয়েছেন। অতঃপর এদের যোগদান না করায় ভবানীপুর দল যে ক্ষতিগ্রস্ত হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

আই, এফ, এ শীল্ড

এ বৎসর এই প্রতিযোগিতা আগামী ৮ই জুলাই আরম্ভ হবে বলে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। ১লা জুলাই যোগদানের শেষ দিন। জুলাইএর ২১শে তারিখের মধ্যে অনুষ্ঠান শেষ হবে বলে কর্ত্তৃপক্ষ আশা করেন। এ বৎসর এ প্রতিযোগিতা যেন একটু তাড়াতাড়িই সুরু হচ্ছে। বোধ হয় আন্তঃপ্রাদেশিক প্রতিযোগিতার জন্য এ প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন কর্ত্তৃপক্ষ। বহিরাগত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মহীশূর, দিল্লী, রাজপুতানা, ঢাকা ওয়ারী, ওসমানিয়া ক্লাব (পেশোয়ার), বাঙ্গালোর প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

জটীরাম ও গুরুচরণ স্মৃতি হা-ডু-ডু প্রতিযোগিতা

ব্রজগোপাল বালক সঙ্ঘের পরিচালিত উক্ত শীল্ডের প্রতিযোগিতার উদ্বোধন উৎসব গত রবিবার শ্রীযুক্ত গোকুলচন্দ্র নাহার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই পর্য্যন্ত বিভিন্ন খেলার ফলাফল নিম্নে প্রদত্ত হইল; সম্ভবতঃ আগামী ২রা জুলাই ফাইনাল খেলা হইবে।

বঙ্গীয় তরুণ সমিতি ৬৮ পয়েন্ট
ব্রজগোপাল বালক সঙ্ঘ ৩৮

কৃষ্ণদাশ পাল ইন্ ৪৮ পঃ কিশোর সঙ্ঘ ২১

ভিক্টোরিয়া এ, সি, ২৮ পঃ নিবারণ স্মৃতিসঙ্ঘ ২৬

বয়েজ স্পোর্টিং ক্লাব 'ক' ২৮ পঃ
বেঙ্গল ষ্টুডেন্টস্ এসোঃ ২৩

কৃষ্ণদাশ পাল ইন্ ৯১ পঃ
বয়েজ স্পোর্টিং ক্লাব 'খ' ৩১

বঙ্গীয় তরুণ সমিতি ৬০ পঃ
ব্রজগোপাল বালক সঙ্ঘ ৪৯

ভিক্টোরিয়া এ, সি, ৭২ পঃ
কিশোর ইউনিয়ান ৪০

বয়েজ স্পোর্টিং ক্লাব 'ক' ৪০ পঃ
ওয়েষ্ট বেঙ্গল ২৩

কৃষ্ণদাশ পাল ইন্ ৪১ পঃ
ভিক্টোরিয়া এ, সি, ৩৮

বঙ্গীয় তরুণ সমিতি ৭৭ পঃ
বয়েজ স্পোর্টিং ক্লাব 'ক' ৩৮

নানাকথা

যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালে সাহায্য

সম্প্রতি ভারতীয় কলা-সঙ্ঘের উদ্যোগে রঙমহলে অনুষ্ঠিত সুপ্রসিদ্ধা নৃত্যশিল্পী শ্রীমতী মঞ্জুলিকা ভাদুড়ীর নেতৃত্বে যে নৃত্যানুষ্ঠান হইয়াছিল তাহার বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে কর্তৃপক্ষ ৪৫১৲ টাকা যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালে প্রদান করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে ১৯৪২ সালে মেদিনীপুর ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ নরনারীর সাহায্যকল্পে ভারতীয় কলাসঙ্ঘ অনুরূপ একটি নৃত্যানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তাহার বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ ও রামকৃষ্ণ মিশনের মারফৎ অনুরূপ অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। কলাসঙ্ঘের এই মহৎ উদ্দেশ্যের আমরা প্রশংসা করি।

শোক-সভা

বিগত ২০শে জুন মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় ইণ্টালী রেশনিং অফিস ভবনে সাব-ইন্‌স্পেক্টর শ্রীযুক্ত পান্নালাল চক্রবর্ত্তী, এম্, এ, বি, টি, সাহিত্যভূষণ মহাশয়ের উদ্যোগে ও ইটালী শাখার বরাদ্দ ব্যবস্থাপক শ্রীযুক্ত এ, জেড, জলিল আহমদ, এম,এ, সাহেবের সভাপতিত্বে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের তিরোধান উপলক্ষে এক শোক-সভার অনুষ্ঠান হয়।

শ্রীযুক্ত পান্নালাল চক্রবর্ত্তী মহাশয় একটী ক্ষুদ্র সময়োচিত বক্তৃতা দেন। তিনি পরলোকগত আচার্য্য রায়ের সহিত বৈদিক যুগের শ্রেষ্ঠ রাসায়নিক নাগার্জ্জুনের তুলনা করেন।

শ্রীসুনীল রায়, এম, এ, বি, টী, শ্রীএরসাদ আলি চৌধুরী, বি, এ, (ইন্‌স্পেকটর), শ্রীমাহমুদাল হক, বি, কম্ (ঐ) পরলোকগত আচার্য্যের অনাড়ম্বর জীবন-যাত্রা প্রণালী ও দানশীলতার কথা উল্লেখ করিয়া নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন।

পরলোকে রায় সাহেব যতীন্দ্রনাথ বসু

কলিকাতা রাজাবাগান ষ্ট্রীট নিবাসী রায়সাহেব যতীন্দ্রনাথ বসু গত ২১শে জুন তারিখে তদীয় সালানপুরস্থ প্রবাস ভবনে সন্ন্যাস রোগে অকস্মাৎ দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা হাইকোর্টের চিফ-ইণ্টারপ্রেটরের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। যতীন্দ্র বাবু [illegible] ও মাতৃভাষায় একান্ত অনুরাগী ছিলেন। কিছুকাল তিনি "প্রভাতী" নামক একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদকতা করেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র প্রভাতকিরণ বসুকে আমরা আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন—

দীপালীর গত সংখ্যা (২৫শ) প্রকাশের সহিত আমাদের বর্ত্তমান বর্ষের দ্বিতীয়ার্দ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। সুতরাং যাঁহাদের প্রথমার্দ্ধের দরুণ ষান্মাসিক চাঁদা দেওয়া আছে, তাঁহারা অবিলম্বে দ্বিতীয়ার্দ্ধের চাঁদা ৬৷৹ পাঠাইয়া দিলেই নিয়মিতরূপে কাগজ যাইতে থাকিবে। টাকা পাঠাইতে বিলম্ব ঘটিবার ফলে উক্ত কোনও সংখ্যা পাওয়া সম্ভবপর নাও হইতে পারে ইহা পূর্ব্বাহ্নেই জানান যাইতেছে।

গত এপ্রিল মাস হইতে দীপালীর মূল্য ৵৹ স্থলে প্রতি কপি ।৹ ধার্য্য হইবার ফলে যাঁহাদের নিকট হইতে ষান্মাসিক অতিরিক্ত চাঁদা নূতন হারের পূরণার্থে আজও পাওয়া যায় নাই তাঁহাদেরও উহা অবিলম্বে পাঠাইতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

আশা করি সকলের নিকট হইতে যেরূপ সহৃদয়তা ও সহানুভূতি দীপালী পাইয়া আসিতেছে তাহা আরও বর্দ্ধিত হইবে। —ম্যানেজার

দুগ্ধ বিতরণ

শ্রীযুত সুধাংশু কুমার বিশ্বাসের তত্ত্বাবধানে গোয়াবাগান শিক্ষক ও ছাত্র সম্মিলিত রিলিফ কমিটীর উদ্যোগে, ১৫০ জন দুঃস্থ শিশুকে ২।১এ, প্যারী মোহন সুর লেন (বঙ্গীয় সাহিত্য সভা বিল্ডিং) হইতে প্রত্যহ বৈকালে দুগ্ধ বিতরণ করা হয়।

'দীপালী' কাজি নজরুল সাহায্য ভাণ্ডার

—প্রাপ্তিস্বীকার—

পূর্ব্বের জের ৬৪৲ টাকা

১১। মিস্ আরতি সেন (সংগৃহীত) হাটখোলা, কলিকাতা—২০৲ "

১২। শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন সরকার দেব লেন, কলিকাতা—১৲ "

১৩। শ্রীঅভয়পদ শীল ও বিশ্বনাথ শীল, কলিকাতা—৫৲ "

মোট ৯০৲ টাকা

এস্ ওয়াজেদ আলি, কোষাধ্যক্ষ
শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু, সম্পাদক
২৯শে জুন ১৯৪৪
('দীপালী' কাজি নজরুল সাহায্য ভাণ্ডার)

লিজার ক্লাব
(নাটোর)

গত ৩রা ও ৪ঠা আষাঢ় কাপুড়িয়াপটি কালীবাড়ী হলে নাটোর লিজার ক্লাবের ৮ম বার্ষিক গ্রীষ্মানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এতদুপলক্ষে গল্প, প্রবন্ধ, আবৃত্তি, বিতর্ক প্রভৃতি প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা ছিল। প্রথম দিনের অধিবেশনে অপরাহ্ণ ৬-৩০ মিনিটে ডক্টর হিরণচন্দ্র চৌধুরী, এম-এ, পি, এইচ-ডি (লণ্ডন) মহাশয় সভাপতিত্ব করেন। অধিবেশনের মাঝখানে অকস্মাৎ আচার্য্য স্যর প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া সভাপতি মহাশয় সেদিনের মত সভা স্থগিত রাখেন। পরদিন সকাল ৮টায়

পূর্ব্ব সভাপতি উপস্থিত হইতে না পারায় শ্রীযুত ভবেন্দ্রনাথ সরকারের সভাপতিত্বে আচার্য্যদেবের মৃত্যুতে শোক-সভা ও ডাঃ শচীন্দ্রনাথ মৈত্রের সভাপতিত্বে পূর্ব্ব দিনের সভার কার্য্য শেষ হয়।

দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় রাজসাহীর খ্যাতনামা ব্যবহারজীব ও প্রবীন সাহিত্যিক শ্রীযুত বিমলাচরণ মৈত্রেয়, এম-এ, বি-এল ও আনন্দবাজার পত্রিকার সহঃ সম্পাদক শ্রীযুত নলিনীকিশোর গুহ মহাশয় যথাক্রমে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'জনগণ মন অধিনায়ক' গানে সভার উদ্বোধন হয়।

ধানবাদ "তরুণ সমিতি" কর্ত্তৃক সাহায্যাভিনয়

রেডক্রশ ও দীপালী নজরুল সাহায্য ভাণ্ডারের জন্য ধানবাদ "তরুণ সমিতি" কর্ত্তৃক ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট রঙ্গমঞ্চে ২৯শে জুন বৃহস্পতিবার "পথের শেষে" অভিনীত হইবে।

পারিজাত সমাজ, বাঁটরা

বিগত ৪ঠা আষাঢ় রবিবার সায়াহ্ন ৭ ঘটিকায় সমাজের অন্যতম সভ্য, ভবানী বন্দ্যোপাধ্যায় ও কালিকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের আহ্বানে স্বর্গত পণ্ডিত যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ১৫।২ লক্ষীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী লেনস্থ ভবনে 'সংক্রান্তি মিলনের" ২৬৬ সংখ্যক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যভূষণ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভার প্রারম্ভে সভাপতির নির্দ্দেশক্রমে আচার্য্যদেব প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের পরলোক গমনে শোক প্রকাশ করা হয়। ইহার পর রসরাজ অমৃতলাল বসুর স্মরণোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রবন্ধ, সঙ্গীত, রসকৌতুক এবং 'খাসদখল" নাটকের একটী দৃশ্য রূপায়ণের ভিতর দিয়া 'রসরাজের' স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন যথাক্রমে শ্রীযুক্ত যুগল কিশোর মণ্ডল, শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সলিল চট্টোপাধ্যায়, রেখা চট্টোপাধ্যায়, শেফালী, পশুপতি, ননীলাল ভট্টাচার্য্য, তারাপদ দাস, সুপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়, পঞ্চানন, প্রফুল্ল, গুরুদাস, সঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ, গৌরীনাথ ও দেবব্রত মুখোপাধ্যায়। ইহার পর সভাপতি মহাশয়ের নাতিদীর্ঘ বক্তৃতার পর জলযোগান্তে বৈঠকের পরিসমাপ্তি ঘটে।
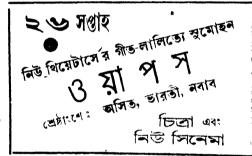
নাটমণ্ডপ

চলচ্চিত্রে ভারতীয় নৃত্য

প্রাচীন ভারতীয় কলা বৈশিষ্ট্যের অন্যতম প্রধান আঙ্গিক নৃত্যকলা। বহুকাল ধরিয়া বিশ্বের কৃষ্টির দরবারে ও রসিক-জনসভায় ভারতীয় নৃত্য সর্ব্ববাদীসম্মত শ্রেষ্ঠত্বের পুরস্কার লাভ করিয়াছে। ভারতীয় নৃত্য মূলতঃ মুদ্রাপ্রধান। মুদ্রার অভিব্যঞ্জনার ভিতর দিয়া শিল্পী আপন ভাবসম্পুষ্ট অন্তরের পরিচয় দিয়া থাকেন।

সম্প্রতি ভারত গবর্ণমেণ্ট Information Films of India বিভাগের দ্বারা, এজরা মীরের প্রযোজনায় ও মধু বোসের পরিচালনায় 'ভারত-নাট্যম' ও "কথাকলি" নামক দুইটি নৃত্যপ্রধান চিত্র গ্রহণ করিয়াছেন।

"ভারত-নাট্যম্" মুদ্রা-প্রধান এবং "কথাকলি" পৌরাণিক ঘটনার নাট্যাংশকে কেন্দ্র করিয়া নিৰ্ম্মিত। ভারতের পৌরাণিক কৃষ্টি সমৃদ্ধির সহিত এই নৃত্যের বিশেষ যোগ আছে। নানাপ্রকার সাজসজ্জা ও মুখোসের ভিতর দিয়া এই নৃত্যের প্রকাশভঙ্গি মালাবার প্রদেশে বহুদিন হইতেই প্রচলিত।

ইন্‌ফরমেসন ফিল্মস্ অফ ইণ্ডিয়া তাঁহাদের এই প্রচেষ্টাকে সার্থক করিয়া তুলিয়াছেন। মধু বোস বহু অনুসন্ধান করিয়া প্রাচীন নৃত্যশিল্পে সুযোগ্য নর-নারীর দ্বারাই এই চিত্র গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা গত সপ্তাহে এই চিত্র দেখিয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছি।

বাণী চিত্রাকারে রবীন্দ্রনাথের "শেষ-রক্ষা"

রবীন্দ্রনাথের কৌতুক-নাটিকা 'শেষ-রক্ষা' অবলম্বনে রচিত চিত্র-ভারতীর প্রথম চিত্রটি সম্প্রতি রূপবাণীতে মুক্তি প্রতীক্ষা করিতেছে। বাঙলার প্রথম মহিলা-প্রযোজক শ্রীযুক্তা প্রতিভা শাসমলের আন্তরিক যত্ন ও পরিশ্রমে এই ছবিখানি অতি নিপুণভাবে গঠিত হইয়াছে। পরিচালনা করিয়াছেন কৃতবিদ্য ও যশস্বী প্রয়োগ-শিল্পী শ্রীযুক্ত পশুপতি চট্টোপাধ্যায়।

"অভিনয় নয়"

গত সপ্তাহে কালী ফিল্মসের "অভিনয় নয়" ছবিখানির তিনখানি গান রেকর্ড করা হইয়াছে। সমগ্র ছবিখানির শূটিং শেষ হইতে আর সামান্যই বাকী। অহীন্দ্র চৌধুরী, দেবী মুখার্জ্জী, রেণুকা রায়, সুপ্রভা মুখার্জ্জীকে গত সপ্তাহে 'সেটে' দেখা যায়।

অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশান

ইহাদের নবতম চিত্রকথা "সন্ধ্যা" সমাপ্তির পথে চলিয়াছে। প্রকাশ যে, গল্পটি খুবই সম্ভাবনাপূর্ণ এবং চিত্রনাট্য রচনাতেও প্রচুর অভিনবত্ব দেখা যাইবে। অহীন্দ্র চৌধুরী, শ্যাম লাহা, মীরা দত্ত, স্মৃতি, রঞ্জিৎ রায়, জহর গাঙ্গুলী, বিজয়া দাস, পূর্ণিমা, রাজলক্ষ্মী, নৃপতি চ্যাটার্জ্জী, ইন্দু মুখার্জ্জী প্রভৃতি অভিনয় করিতেছেন। ছবিখানি পরিচালনা করিতেছেন মণি ঘোষ, চিত্র গ্রহণ করিতেছেন প্রবোধ দাস এবং শব্দ-নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন শম্ভু সিং।

"বিদেশিনী"

এম, পি, প্রোডাকশনের ছবি, রচনা ও পরিচালনা করিয়াছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। শ্রেষ্ঠাংশে—কানন দেবী, ধীরাজ ভট্টাচার্য্য, শৈলেন চৌধুরী, জীবেন বসু প্রভৃতি। বর্ত্তমানে কলিকাতায় দেখানো হইতেছে।

গ্রামধ্বনিত সময়ে এক এ, আর, পি আশ্রয়ে প্রকাশ ও মমতার দেখা হয়। মমতার ছোট ভাই এই সময় হারাইয়া যায়, শেষে প্রকাশ ও মমতা তাহাকে এক প্রাথমিক সাহায্য-কেন্দ্র হইতে খুঁজিয়া বাহির করে। প্রকাশ মমতাকে নিজের গাড়ীতে করিয়া তাহার বাড়ীতে পৌছাইয়া দিতে চাহিল কিন্তু মমতা এইরূপ গায়ে-পড়া সাহায্য লইতে অস্বীকার করিয়া চলিয়া গেল। প্রকাশ মমতার বাড়ীর ঠিকানাটিও জানিয়া লইতে ভুলিয়া গেল।

মমতা, তাঁহার পিতা ও ছোট ভাই এই তিনজন বর্ম্মায় বোমাবর্ষণের পর বাংলাদেশে পলাইয়া আসেন। কিন্তু আর্থিক অবস্থা তাঁহাদের অত্যন্ত খারাপ হইয়া পড়ে, এমন কি দুবেলা দুমুঠো অন্ন-সংস্থান করাও তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। এদিকে প্রকাশ বহু কষ্টে মমতার বাড়ীর ঠিকানা যোগাড় করে এবং নানাভাবে তাহাদের সাহায্য করিতে চেষ্টা করে, কিন্তু মমতা কোন সাহায্যই গ্রহণ করে না।

শেষে মমতা এক ফিল্ম ষ্টুডিওতে একট্রা গার্লরূপে যোগদান করে, প্রকাশ সেই কোম্পানীর অংশীদার হয় এবং মমতাকে নায়িকার পার্ট দেয় এবং নিজে নায়কের ভূমিকা অভিনয় করে। এদিকে প্রকাশের পিতা পুত্রকে সিনেমায় অভিনয় করিতে দেখিয়া তাহাকে গৃহ হইতে তাড়াইয়া দেন। শেষে কি ভাবে পিতা পুত্রে মিলন হইল এবং প্রকাশ মমতাকে লাভ করিল তাহাই বাকী অংশটুকুতে দেখানো হইয়াছে।

ছবিখানি প্রোপাগাণ্ডামূলক, কিন্তু প্রোপাগাণ্ডাটি নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতের সহিত যে সুকৌশলে গ্রথিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ষ্টুডিওর ভিতরের যে আবহাওয়া পরিচালক মহাশয় দেখাইয়াছেন সেগুলি উপভোগ্য হইয়াছে সন্দেহ নাই কিন্তু ভবিষ্যতে শিক্ষিতা ভদ্রবংশীয়া মহিলারা যদি এই দৃষ্টান্তের নজীর দেখাইয়া ষ্টুডিওতে ভদ্রমহিলাদের স্থান নাই বলিয়া বিতর্ক তোলেন তখন পরিচালক মহাশয় কি জবাব দিবেন?

নাটকের লঘু ও হাস্যরসাত্মক সিচুয়েশানগুলি যেরূপ জমিয়াছে 'সিরিয়াস' স্থানগুলি সেরূপ জমে নাই।

অভিনয়ের মধ্যে কানন দেবীর নাম সর্ব্বাগ্রে করিতে হয়। কিন্তু তাঁহার শারীরিক সৌন্দর্য্য পূর্ব্বাপেক্ষা বহুল পরিমাণে ম্লান হইয়াছে, তদুপরি আলোক-চিত্রকরের দোষে স্থানে স্থানে তাঁহাকে বিশ্রী দেখাইয়াছে। গানগুলি একটিও মনে রাখিবার মত নয়; সে দোষ তাঁহার নয়, সুরকারের। ধীরাজ ভট্টাচার্য্যের "প্রকাশ" মন্দ নয়। জীবেন বসুর 'চিত্র পরিচালক' এবং শৈলেন চৌধুরীর 'সত্যশিব' আমরা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী উপভোগ করিয়াছি। শ্রীমান কেশব রায়ের দুলাল ভাল। শ্রীমানের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বলিয়াই মনে হয়।

সঙ্গীতাংশের মধ্যে নূতনত্ব কিছু নাই।

"বিদেশিনী"র শ্রেষ্ঠ সম্পদ হইল ইহার সংলাপ। এজন্য প্রেমেনবাবু অবিমিশ্র প্রশংসার দাবী করিতে পারেন।

রঙমহলে "শেষ-চিত্রণ"

গত ২৩শে জুন শুক্রবার রঙমহল রঙ্গমঞ্চে বিবেকানন্দ পরিষদের উদ্যোগে শ্রীরাখাল মুখোপাধ্যায়ের "শেষ-চিত্রণ" নাটকখানি অভিনীত হয়। কাহিনীর বিষয়বস্তুর মধ্যে নূতনত্ব ও রসসৃষ্টির উন্নত রুচির প্রকাশে নাট্যকারের শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

এক চিত্রকর, তার মডেল ও এক ছাত্রীকে কেন্দ্র করিয়া নাটকের আখ্যানভাগ গড়িয়া উঠিয়াছে।

অভিনয় ভালই হইয়াছিল। নাট্যকার স্বয়ং 'শ্রীরেখা'র ভূমিকায় এবং 'সুশীলেশে'র ভূমিকায় দেবেন ব্যানার্জ্জি সু-অভিনয় করিয়াছেন। গোপেন বিশ্বাসের 'স্বরূপ' ও ফণী ঘোষের 'সুষমা' প্রশংসার্হ। টাইপ চরিত্রে—গৌর চক্রবর্ত্তীর 'সিদ্ধেশ্বর', অজিত সেনের 'সুন্দর-সাধক' ও কালিচরণ ব্যানার্জ্জির 'ব্যোমকেশ' প্রশংসনীয়। তাছাড়া 'বাউলে'র গানে গোপেন বিশ্বাস ও হীরালাল ব্যানার্জ্জি সুকণ্ঠের পরিচয় দিয়াছেন। গৌর ঘোষের সুর-সংযোজনা মন্দ নয়। নাট্য পরিচালনায় শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ মিত্র কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। তবে ত্রুটির মধ্যে নাটকের গতি বৃদ্ধির জন্য স্থানে স্থানে পরিবর্জ্জন আবশ্যক।

দীপালীর স্বত্বাধিকারী শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত, ১২৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, দীপালী প্রেসে মুদ্রিত ও দীপালী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

প্রধান সম্পাদক—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় :: সহঃ সম্পাদক—শ্রীধীরেন্দ্রমোহন মজুমদার বি. এল.

১৬শ বর্ষ VOL. XVI. } ২২শে আষাঢ় ১৩৫১ :: July 6, 1944 { ২৭শ সংখ্যা No. 27

আলোচনী

ভারত-সরকারের দপ্তর থেকে গত ১২ই জুন যে হুকুমনামা জারী হয়েছে তার নামকরণ হয়েছে Paper Control (Economy) order. এই সদ্যোজাত আইন যে গবর্ণমেণ্টের দীর্ঘ গবেষণাপ্রসূত সে কথা কর্ত্তৃপক্ষ আমাদের সবিস্তারে জানিয়েছেন। গত ফেব্রুয়ারী মাস থেকেই নাকি ভারত-সরকারের একটি বিশেষ বিভাগ দেশীয় কাগজের মিতব্যয়িতা সম্বন্ধে চিন্তা করছিলেন। আরও বলা হয়েছে এদেশের একজন Leader of the Paper Industry-র সহিত যথেষ্ট আলাপ-আলোচনা ও পরামর্শ করবার পর ভারত-সরকার এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়েছেন। দুঃখের বিষয়, এই Leader মহোদয়ের নাম সরকারী বিবৃতিতে গোপন রাখা হয়েছে। গোপন রাখা হলেও এই পরামর্শদাতার অমূল্য উপদেশের মহিমা আমরা উপলব্ধি করছি। এ দেশের মুহামান্য গবর্ণমেণ্ট জনসাধারণের কল্যাণ ও অকল্যাণের কোন প্রশ্ন নিয়েই জনমতের দ্বারস্থ হওয়া সম্মানজনক মনে করেন না। এই আদেশনামার ব্যাপারেও এই যে আকস্মিকতা এতে আমরা এতটুকু বিস্মিত হই নি। এই ধরণের ব্যবহার আমাদের গা-সওয়া হয়ে গেছে। বিপরীত কিছু ঘটলেই বরং বিস্ময়ের কারণ হত।

* * *

শুধু আদেশ জারী করেই গবর্ণমেণ্ট ক্ষান্ত হন নি, এই আদেশ যাতে অবিলম্বে (immediately) কার্য্যকরী হয় তার নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ আদেশের সঙ্গে সঙ্গে আইন বলবৎ হয়েছে এবং ভারতবর্ষের সমস্ত সাময়িকপত্র তথা সাপ্তাহিক, অর্দ্ধসাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক ইত্যাদি পত্রিকা এই আদেশের কবলিত হয়েছে। এই আইনের অন্য কোন সরকারী ভাষ্য আমাদের সামনে নেই, কাজেই বলা চলে বর্ত্তমানে এই অদ্ভুত আদেশনামার রাজত্বে আমরা বাস করছি। ইতিমধ্যেই ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে এই তথাকথিত economy order-এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদের সুর শোনা যাচ্ছে। গত ১৯৪২ সালে যখন সর্ব্বপ্রথম Paper Control Order জারী হয় তখনও ভারতীয় প্রেস ও সংবাদপত্রের তরফ থেকে এতখানি আন্দোলন হয় নি।

* * *

অযৌক্তিকতা ও ব্যস্ততার দিক দিয়ে গবর্ণমেণ্টের এই আদেশনামা তাঁদের পূর্ব্বতন ইতিহাসকে অতিক্রম করেছে। ভারতীয় প্রেস ও সংবাদপত্রের অভিযোগ করবার অধিকার আছে যে, তাঁদের প্রায় অজ্ঞাতসারে এই মারাত্মক আদেশের অস্ত্র নিক্ষেপ করা হয়েছে। ভারতীয় আইন, হুকুম ও অর্ডিনান্স সম্বন্ধে সবচেয়ে মজার কথা এই যে, যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে এগুলির কবলিত হবেন তাঁদের মতামতের মূল্য নেই। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে তার কোন ব্যতিক্রম হয় নি। সরকারী বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে,

ভারতীয় কাগজ শিল্পের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির পরামর্শ নেওয়া হয়েছে এবং সরকার প্রায় গত ফেব্রুয়ারী মাস থেকেই এই বিষয়ে চিন্তা করছিলেন। গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যে ব্যস্ততা ও একতরফা সিদ্ধান্তের অভিযোগ করা হয়েছে সরকারী বিবৃতিতে যেন তারই একটা জবাব দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। আশ্চর্য্যের কথা এই যে, আদেশের ফলে এদেশের প্রেস ও সংবাদপত্র ব্যবসায়ের অপমৃত্যুর আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। সে আদেশ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট একটা সম্পূর্ণ indifferent বা উদাসীন মনোভাব গ্রহণ করেছেন। কাগজ শিল্পের তরফ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করবার প্রয়োজন হয়েছে, প্রয়োজন হয় নি শুধু তাদের মতামত শোনবার যারা স্বাভাবিক সময়ে এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখে।

* * *

নয়া দিল্লীর বিবৃতিতে বলা হয়েছে দেশী মিলের উৎপাদন স্বাভাবিকের তুলনায় শতকরা ৩০%এ নেমে দাঁড়িয়েছে। ব্যাপারটি যে সত্য নয় তা বিবৃতির দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফটি থেকে বোঝা যাবে। এখানে বলা হয়েছে যে বর্ত্তমান উৎপাদন ৭০,০০০ হাজার টন, সর্ব্বোচ্চ উৎপাদনের (Production) সংখ্যা দেওয়া হয়েছে ১,০২,০০০ টন। যুদ্ধ-পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে কাগজের উৎপাদন সংখ্যা ছিল ৬০,০০০ টন। Statistics বা অঙ্কশাস্ত্র সম্বন্ধে পারদর্শিতার অহঙ্কার যাদের নেই তাঁরাও সরকারী বিবৃতির এই অসামঞ্জস্য দেখে বিস্মিত হবেন। বর্ত্তমান উৎপাদন হার যে ৩০%এ এসে দাঁড়ায়নি গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত সংখ্যা থেকেই তা সরলভাবে বোঝা যায়। এই বিবৃতি প্রকাশ করবার আগে সরকারী দপ্তরের কর্ত্তারা বিবৃতির কোথায় ফাঁক আছে লক্ষ্য করে দেখেন নি—এতে আমরা বিস্মিত হচ্ছি। কতখানি ব্যস্ততা ও অনবধানতার ফলে এই গলদ সম্ভব হয় তা চিন্তা করবার বিষয়।

* * *

বর্ত্তমান উৎপাদন ৩০% পার্সেণ্টে নেমে গেছে গবর্ণমেণ্টের এই দাবীর মূলে কোন সত্যতা নেই, তাঁদের দেওয়া সংখ্যা থেকেই এটা প্রমাণিত হচ্ছে। ফলে সাময়িকের পৃষ্ঠা সংখ্যা হ্রাসের যে নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে, গবর্ণমেণ্টের দেওয়া হিসাবমত তা misleading. এই ব্যাপার থেকে মনে হয় এই আদেশ জারী করবার ব্যাপারে গবর্ণমেণ্ট সত্যকারের কোন চিন্তাই করেন নি; এই আদেশের ফলে ভারতীয় প্রেস ও পত্রিকাগুলির কতখানি অসুবিধা হবে, তাদের বেঁচে থাকা সম্ভব হবে কিনা, তা বুঝিয়ে দেবার মত উপযুক্ত লোক ভারত সরকারের উপদেষ্টা মহলে আছে কি না আমাদের সন্দেহ। সমস্ত ব্যাপার দেখে জনসাধারণের মনে এই ধারণাই বদ্ধমূল হবে যে ভারত সরকার তথাকথিত 'paper economy'র অজুহাতে ভারতবর্ষের একটি অনতিপুষ্ট শিল্প ও ব্যবসায়ের উপর অত্যাচার করছেন। বর্ত্তমানে এদেশের প্রেস ও সাময়িকপত্র যে অবস্থায় দাঁড়িয়েছে—বিশেষ করে বর্ত্তমান যুদ্ধের ফলে যে অসুবিধার মধ্য দিয়ে তাদের অস্তিত্ব বজায় রেখে চলতে হচ্ছে তাতে এদেশের গবর্ণমেণ্টের সহানুভূতির উদ্রেক হয় নি এইটেই আশ্চর্য্যের কথা! দুঃখের সঙ্গে আমরা বলতে বাধ্য, যুদ্ধ ব্যাপারে স্বতঃপ্রবৃত্ত ভাবে ভারতীয় সাময়িক ও দৈনিকগুলি সরকারের সহিত যে সহযোগিতা করেছে তার বিনিময়ে তারা কোন প্রকার সহানুভূতি ও বিবেচনা গবর্ণমেণ্টের কাছ থেকে পায় নি। সমস্ত ব্যাপারটাই এক তরফা হবে—এতখানি দাবী করবার অধিকার কোথা থেকে এল, আজ একথা চিন্তা করবার সময় এসেছে।

* * *

ভারত সরকারের Paper Control (Economy) order সম্বন্ধে সংক্ষেপে আমাদের পাঠক-পাঠিকাদের এইটুকু জানান প্রয়োজন মনে করি। এই আদেশের ফলে সাপ্তাহিক মাসিক প্রভৃতি সাময়িক পত্রগুলির যে প্রচলিত পৃষ্ঠা-সংখ্যা আছে তার শতকরা সত্তর (৭০%) ভাগ ছাটাই করতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, যে-পত্রিকার পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ২৫, তাকে হ্রাস করে ৮ পৃষ্ঠায় নামাতে হবে। ১০০ পৃষ্ঠাওয়ালা পত্রিকা ৩০ পৃষ্ঠায় পরিণত হবে। এই আদেশ গত ১২ই জুন প্রকাশিত হয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে সারা ভারতে বলবৎ হয়েছে। সাময়িক প্রেস ও প্রেস কর্ম্মচারীসঙ্ঘের তরফ থেকে অজস্র প্রতিবাদ ভারত সরকারের নিকট প্রেরিত হয়েছে। এর ফলাফল আমাদের অজ্ঞাত। এই আদেশের ফলে একটা গভীর অকল্যাণের পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। সরকারী আদেশ সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ পরিস্থিতি ও আমাদের ইতিকর্ত্তব্য যথা সময়ে আমরা নিবেদন করব।

———

প্রত্যাখ্যান

(উপন্যাস)

শ্রীসুধাংশু কুমার হালদার, আই, সি, এস্

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

৯

মিসেস্ ঘোষের ভারি অসুখ।

নমিতার সমস্ত দিনটা কাটে রোগিনীর ঘরে। দোতালার দক্ষিণের কক্ষে পুরু নীল কাপড়ের পরদা ঝুলছে দ্বারে দ্বারে, নার্স্‌রা আনাগোনা করছে, বাইরে নীচের গাড়ীবারান্দায় ঘন ঘন মোটর এসে থামছে, ডাক্তার আসছেন, আলাপী পরিচিত বন্ধু বান্ধবরা খবর নিয়ে যাচ্ছেন। বৃদ্ধ শম্ভু চাটুয্যে বাড়ীময় ছুটাছুটি করে বেড়াচ্ছেন। তাঁর মাথায় মস্ত টাক, কিন্তু দুপাশে কান পর্য্যন্ত লম্বা গোঁফ। তিনি এঁদের বিশ্বস্ততম কর্ম্মচারী, এ বাড়ীতে আত্মীয়ের মতো সম্মানিত, মিসেস্ ঘোষ বরাবর তাঁকে 'শম্ভুদাদা' ব'লে ডেকে এসেছেন শুধু নয়, বড় ভায়ের মতো মেনেও এসেছেন। সন্ত্রস্ত উদ্বিগ্ন চাকরের দল পা টিপে টিপে চলছে, ফিস্ ফিস্ ক'রে কথা কইছে, পাছে কর্ত্রীর শান্তির ব্যাঘাত ঘটে।

রোগিণী ঘরের ভেতর খাটের ওপর ধব্‌ধবে প্রশস্ত বিছানার একটি-পাশে জড়সড় হ'য়ে শুয়ে আছেন। বেশীর ভাগ আসবাবপত্র এঘর থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হ'য়েছে। দুতিনটে তেপায়া টেব্‌লের ওপর নানা আকারের, নানা বর্ণের ওষুধের শিশি, কাচের গ্লাস, পেয়ালা, পিরিচ, মুখ ধোবার কলাই করা গামলা, জলের জাগ্। থার্মোমিটার, ফিডিং-কাপ, রক্তচাপ মাপবার যন্ত্র, ইন্‌জেক্‌শান্ টিউব, কাগজ, পেন্সিল যথা-স্থানে সাজানো ঘরের একটি কোণে জলে ডোবানো পায়ার ওপর তারের জালের ডুলি, তার ভেতর বার্লি গ্লুকোজ, কমলালেবু, হরলিক্‌স্ প্রভৃতি পথ্য। শয্যার ওপর ধীরে ধীরে পাখা ঘুরছে, একটা পামষ্ট্যাণ্ডের ওপর মোরাদাবাদী কাজকরা পিতলের গামলায় এক ঝাড় রজনীগন্ধা। বাতী গুলি সব নীল কাপড় দিয়ে ঢাকা। একখানি সরু হাল্‌কা আরাম চেয়ারে বসে আছেন নমিতা, মায়ের অসুখের ভাবনায় মুখ তাঁর শুখনো, মাথার অবিন্যস্ত চুলগুলি উড়ে উড়ে কপালে পড়ছে। গৃহ নিস্তব্ধ। পাশের ঘরে কর্ম্মব্যস্ত নার্স্‌রা চাপা গলায় কথা কইছে।

বেহারা কার্ড দিয়ে বলল, "চৌধুরী মেমসাহেব এসেছেন।" ব্যারিষ্টার চৌধুরী সাহেবের স্ত্রী। মিসেস্ ঘোষের সঙ্গে সেই সাদা মজলিসের দিন তাঁর দেখা হয়নি, মোটর গিয়েছিল বিগড়ে, বরাকর-ডাকবাংলায় তাই রাত কাটিয়ে বাড়ী ফিরতে পরের দিন দশটা বেজে গিয়েছিল। স্বামীর অনুরোধে রোজই ভাবছিলেন দেখতে আসবেন মিসেস্ ঘোষকে, বিশেষতঃ তাঁর যখন অসুখ। কিন্তু ক্লাবে একটা চ্যারিটি শো ছিল, তার ওপর বালীগঞ্জের চিত্রপ্রদর্শনী, ব্যারাকপুর পার্কের পিক্‌নিক্ পার্টি, এম্‌নিতর নানা ব্যাপার নিয়ে ভারি ব্যস্ত, সময় পান কখন?

হাঁফাতে হাঁফাতে এসে ঘরে ঢুকলেন, নমিতা প্রণাম ক'রে তাঁকে বসবার চেয়ার টেনে দিলেন। চেষ্টার ত্রুটি নেই, তবু মিসেস্ চৌধুরীর শরীরটি যেন বিদ্রোহ ক'রেই বেমানান রকম স্থূল হ'য়ে উঠছে দিন দিন। নানা দড়ি দড়া বেঁধে অবাধ্য মাংসপিণ্ডগুলিকে শাসনে রাখবার প্রয়াস চলছে। কিন্তু বিধাতার অভিশাপ দৃষ্টি যেন লেগেছে তাঁর ওই দেহটিতে। যেখানটা সরু হওয়া দরকার সেখানটা ক্রমেই স্ফীত হ'য়ে উঠছে, আর যেখানটিতে দরকার সুরুচিসঙ্গত স্ফীতি সেখানটিতে হচ্ছে ঠিক তার উল্টা। চোখের দুপাশে দুই রগের ওপর কাকপদের মতো বলি রেখা, পাউডার ঘষলে মরানদীর সরুখাতের শুভ্র বালির রেখার মতো দৃষ্টিকটু হ'য়ে দেখা দেয়। মাথার চুল যখন ক্রমশঃই বিরল হ'য়ে উঠল, মেয়েদের দেখাদেখি তখন তিনিও শিংগল্ ক'রে চুল ছেঁটে এলেন বিলাতী নাপ্‌তিনীর দোকানে। এখন নানাজাতীয় কেশবৰ্দ্ধক শ্যাম্পু আর লোশান্ ঘষার ফলে যে ক'টি চুল বাকি ছিল সেগুলিও খড়ের গোছার মতো বিবর্ণ খসখসে হ'য়ে উঠেছে। আয়নার দিকে তাকালেই এখন তাঁর রাগ ধরে। একবার ভাবেন সীতাকুণ্ডের জলই না হয় দিন কতক খেয়ে দেখবেন, চৌধুরী সাহেবের এক বুড়ী পিসীর কাছে তার অনেক গুণবর্ণনা শুনেছেন।

বর্ণে, স্বাদে ও গন্ধে
মনোগ্রাহী অথচ দামে
সস্তা বলেই লিপ্‌টনের
জাকুজা চা বাজারের
সব চেয়ে সেরা খরিদ

লিপ্‌টনের
জাকুজা চা

LIPTONS

BRAND

ভারতীয় চায়ের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট গুঁড়ো চা

LTK 84 J

আর একবার ভাবেন স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে কিছুদিনের জন্যে ইয়োরোপের বাডেনে গিয়ে থেকে আসেন। গন্ধকের গ্যাস মেশানো সেখানকার জল খেলে নাকি অসম্ভবও সম্ভব হয়, বিশবছর আগেকার তনুদেহটি আবার নাকি ফিরে পাওয়া যায়!...শুনেছেন প্যারিসের কোথাকার এক দোকানে কপালের আর গালের লোল চামড়া সব টেনে টেনে মাথার চুলের নীচে লুকিয়ে নিয়ে এসে কাঁচি দিয়ে কেটে সেলাই ক'রে দেয়, তাতে নাকি সমস্ত বলিরেখা অন্তর্হিত হ'য়ে মুখ চোখের চামড়া সব ঢাকের চামড়ার মতো টন্‌টনে হ'য়ে ব'সে থাকে। ইচ্ছা আছে সেখানেও যাবার। কিন্তু তাঁর পুরানো চিকিৎসকটি বলেছেন এসব করবার আগে অন্ততঃ কিছুদিন তাঁর পরামর্শ মতো চ'লে দেখতে। আশ্বাস দিয়েছেন এতে ক্ষতি কিছু হবে না। অন্ততঃ চিকিৎসকের নিজের যে কোনো ক্ষতিই হয় নি একথা নিঃসন্দেহ। চৌধুরী গিন্নী আজকাল একস্লাইস্ পাউরুটির ছিব্‌ড়ে একগ্লাস গোঁড়ালেবুর রসে ভিজিয়ে তাই দিয়ে প্রাতরাশ সমাধা করেন। সমস্ত দিনের জঠরজ্বালা নিবারণ করেন গরম জল খেয়ে। এক একদিন গরমজল আর লেবুর রসের ওপর বীতশ্রদ্ধ হ'য়ে পেটভরে ঘৃতপক্ক মুর্গীর কোর্মা, পোলাও পুডিং আর পেষ্ট্রী খেয়ে ফেলেন, আর ডাক্তার সাহেবের কাছে অপরাধ কবুল ক'রে প্রতিষেধক নিতে ছুটে যান। চিকিৎসক প্রচুর ধমকের সঙ্গে প্রচুরতর ম্যাগ্‌সাল্‌ফের ব্যবস্থা ক'রে দেন, মেমসাহেবকে আর তিনদিন বিছানা ছেড়ে উঠতে হয় না!

মিসেস ঘোষের গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে মিসেস চৌধুরী জিগেস করলেন, "আজ কেমন আছেন? চেহারা বড্ড শুখিয়ে গেছে দেখছি যে!"

"ভাল নয়, মাথায় বড় যন্ত্রণা।"

"মাথার যন্ত্রণার কথা আর বলবেন না। মাথার যন্ত্রণা কি আর আমারি কম! অ্যাস্‌পিরিন্ খান, খুব ক'ষে অ্যাস্‌পিরিন্ খান। তা, দেখছে কে আপনাকে?"

"দেখছেন ডাক্তার মুখার্জি, আর তাঁর সঙ্গে দুজন অ্যাসিষ্ট্যান্ট্।"

"দেখুন, ঐ একটি মস্ত ভুল করেছেন আপনি। কিছু মনে করবেন না, কিন্তু আমাদের শরীর কি ওসব মুখুজ্যে ফকুজ্যেরা কিছু বোঝে! না, চিকিৎসার ওরা কিছু জানে? ওরা বোঝে কুলী-কাবারিদের শরীর। সায়েব ডাক্তার আনান। ভাগ্যিস আমার ডিক্‌-ডবসন্ ছিলেন তাই কোন রকমে বেঁচে আছি মিসেস ঘোষ। নইলে এতদিন কোন্ কালে মরে ভূত হয়ে যেতুম। উনি বলেন, শরীরের সঙ্গে চালাকি নয়, বাঙালী ডাক্তার ডেকেছ কি মরেছ!

মিসেস্ ঘোষের অসুখ সারছে না, অনেকদিনই তো চিকিৎসা হ'চ্ছে তাই কথাটা তাঁর খুব সমীচীন বলেই বোধ হ'ল। বললেন, "কালই তাঁকে ডেকে পাঠাবো। উঃ কী দুর্বলই লাগছে! এই আপনার সঙ্গে কথা বলছি আর মাথা ঘুরছে। আমার খুব ব্লাড্‌প্রেসার বেড়েছে কিনা, তার ওপর এই জ্বর। আপনি বুঝতে পারবেন না মিসেস্ চৌধুরী, কি কষ্ট!"

"ওমা, তা আর বুঝতে পারব না, খুব বুঝতে পারব। ব্লাড্‌প্রেসার তো আমারো বেড়েছে! কোন্ রোগটি আমার নেই! তবু বেঁচে আছি কেবল ঐ ডিক্ ডবসনের গুণে। আর জ্বর? সর্বক্ষণ আমারো জ্বর লেগে আছে, হাড়ের ভেতর ভেতর জ্বর। বাইরে থেকে কখনো টের পাওয়া যায়, কখনো যায় না। এই দেখুন না আমার গা"—এই ব'লে তাঁর কন্‌কনে ঠাণ্ডা স্থূল বাহুটি মিসেস্ ঘোষের উত্তপ্ত হাতের ওপর রাখলেন। সৌজন্যের খাতিরেই হোক্ আর দুর্বলতার জন্যেই হোক, মিসেস ঘোষ চুপ ক'রে রইলেন।

"তাহলে আজ উঠি মিসেস্ ঘোষ, উঠি নমিতা। সেদিন আপনাদের সঙ্গে দেখা না হওয়াতে ভারি দুঃখিত। কোনো ভয় নেই, সেরে যাবেন মিসেস ঘোষ। ভয় কি?"

ক্ষীণ কণ্ঠে মিসেস্ ঘোষ বললেন, "একটি কথা,—অসীমের কোনো খবর জানেন কি?"—আজ এই জীবনমৃত্যুর সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে নমিতার জন্যে তাঁর মনে যেন শান্তি ছিল না। যদি অসীম ফিরে আসে, যদি সে নমিতাকে গ্রহণ করে, তা'হলে সব ভাবনাই যে শেষ হয়।

"ওমা, তা আর জানিনা! সে যে মস্ত ব্যবসাদার হয়েছে এখন, সাঁওতাল পরগণায় কাঠের ব্যবসা করছে।"

"মা নমিতা, তুমি ওর কাছ থেকে অসীমের ঠিকানাটা লিখে নাও তো!"—এই ব'লে মিসেস ঘোষ পাশ ফিরে শুলেন।
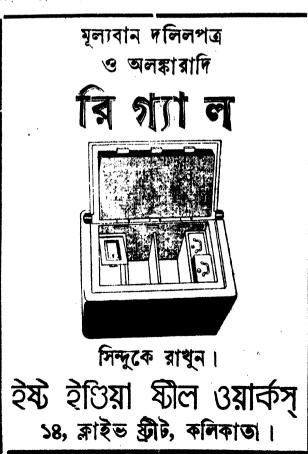
কম্পিত হস্তে নমিতা অসীমের ঠিকানা লিখে নিলেন। মিসেস চৌধুরী চলে গেলেন।

কিন্তু কোনোমতেই ডাক্তার ডিক্ ডব্সনের দোষ দেওয়া যাবে না। তিনি এসে চিকিৎসার ভার গ্রহণ করতেই রোগিণীর অবস্থা দ্রুত খারাপ হ'তে লাগল। তা ব'লে কি আর ডাক্তারের দোষ? পরমায়ু থাকলে তবে তো ডাক্তার! এতো আর মুখুজ্যে কুকুজ্যে নয়, যে তুমি তার দোষ দেবে!

দুদিন কাটল আচ্ছন্ন ভাবে। বিছানায় পড়ে আছেন, মুখটা টকটকে লাল,—হুঁস নেই। ওষুধ দিলে চোখ না খুলেই খেয়ে ফেলেন, কি কষ্ট হচ্ছে তা মুখ ফুটে বলতে পারেন না।

আজকের রাতটা যেন আর কাটতে চায় না! শম্ভু চাটুয্যে বসে আছেন একটু তফাতে, একটা মোড়ার ওপর। তাঁর হাত দুটী নীরব প্রার্থনায় জোড় করা। মায়ের মাথার ওপর বরফের ব্যাগটা চেপে নমিতা বসে আছেন শিয়রে। আজ দুদিন তাঁরো ঘুম নেই। নার্সরা নাড়ী দেখছে, ঘড়ী দেখছে, টেলিফোন ক'রে ডাক্তার সাহেবের কাছে উপদেশ নিচ্ছে। তাদের চলাফেরায় দেওয়ালের গায়ে বড় বড় কালো কালো ছায়া পড়ছে।...দূরে কোথায় একটা রাস্তার কুকুর হাউ হাউ ক'রে কাঁদছে। অন্ধকার ভেদ ক'রে সে-কান্না বড় বীভৎস শোনাচ্ছে।... অকারণে নমিতা চমকে চমকে উঠছেন। ঘড়ীর কাঁটা যেন চলতে ভুলেছে।...রাত দুটো।...

হঠাৎ মিসেস্ ঘোষ মাথার বালিসের নীচে হাতড়ে হাতড়ে কি যেন খুঁজতে লাগলেন। নমিতা তাঁর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে জিগেস করলেন, "কি খুঁজছ মা, কি চাই?"

"আঃ নমিতা, তুই কি এসেছিস? আমি তোকেই খুজে পাচ্ছিলুম না।"—জ্ঞানের সঙ্গে প্রলাপ মিশিয়ে যাচ্ছে তাঁর কথায়।

"এই তো আমি বসে আছি মা তোমার কাছে।"

"অসীম কোথায়, অসীম?"—ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে চারিদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন মিসেস্ ঘোষ।

"তিনি তো আসেন নি মা। তাঁকে তো খবর দেওয়া হয়নি।" মিসেস্ ঘোষ কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন। তারপর ক্ষীণকণ্ঠে আবৃত্তি করতে লাগলেন—

"এখনো গেল না আঁধার
এখনো রহিল বাধা
এখনো মরণ ব্রত
জীবনে হ'ল না সাধা।"

কে জানে, এ তাঁর প্রলাপের উক্তি কিনা।

নমিতা বললেন, "মা, তুমি একটু ঘুমোবার চেষ্টা করো।"

"নমিতা—"

"মা?"

"ছবি, আমার সে ছবি কোথায় গেল?"

নমিতা বুঝতে পারলেন। মিসেস ঘোষের হাতবাকসের ডানধারের খোপের মধ্যে একটা সাদা খামের ভেতর ছিল সে ছবি। অনেক দিনের পুরাণো ফটোগ্রাফ, ম্লান হ'য়ে গেছে। স্বামী-স্ত্রী পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছেন, স্ত্রীর কোলে একটি চারমাসের শিশু কন্যা। মিসেস ঘোষ অতিকষ্টে চোখের সামনে ধরলেন, কি দেখতে পেলেন তিনিই জানেন। পলকবিহীন দৃষ্টি মেলে ছবির দিকে রইলেন তাকিয়ে। ঠোঁট কাঁপতে লাগল, বড় বড় চোখের জল টপ্ টপ্ ক'রে ক'রে পড়তে লাগল বালিসে, বিড় বিড় ক'রে বলতে লাগলেন—

"এখনো নিজেরি ছায়া
রচিছে কত যে মায়া,
চকিতে বিজলী আলো
চোখেতে লাগাল ধাঁধা।"

আজ এসেছে হিসাব নিকাশের দিন, মায়ার সকল বাঁধন কাটাবার দিন। যে-পথে পা পড়ল, তার পাথেয় কিই বা আছে সঙ্গে! যাকে পাপ বলি, তাই দিয়েই তো ভর্ত্তি করেছেন জীবনের পশরা। এই সব প্রাচুর্য্য, এই সব আরামের সরঞ্জাম,—কি দাম দিয়েই না কিনতে হয়েছে তাঁকে! তবুও যাত্রার সময় এই পাপিষ্ঠার মুখে এমন শান্ত জ্যোতিঃ ফুটে উঠল কেমন ক'রে! এক নিমেষেই এম্নি ক'রে যে-লোক সংসারের ধুলো গা থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারে, সে কার দয়া পেয়ে গেছে, সেই তা জানে।

দেখো, মানুষের কত বড় দম্ভ, কত বড় স্পর্দ্ধা, সে নিজের ক্ষুদ্র মাপকাঠি দিয়ে অন্যের ভালমন্দ দেখতে চায়! সে মানুষের মনের ভাব দিয়ে তার কাজের বিচার করে না, মানুষের কাজ দিয়ে তার মনের বিচার করতে চায়।...ছেলেমেয়েকে ভালো তো বাসে সবাই, তার সুখবিধানের চেষ্টাও সব বাপমায়েই তো ক'রে থাকে। কিন্তু এতো শুধু তাই নয়,—এযে নারীর সকলের বড় ধর্ম, সতীত্ব ধর্মকে জলে ভাসিয়ে দেওয়া, সে কিসের জন্যে?—এ যে বুক থেকে নিজের পাঁজরা খসিয়ে দেওয়া, দধীচী যেমন ক'রে দিয়েছিলেন! এই ত্যাগ, এই দান চোখে যদি ধরা না পড়ে, সে চোখ নিয়ে আর যাই করি, গর্ব করা চলে না। কিন্তু এ'সব কথা বোঝাবই বা কাকে, আর শুনবেই বা কে? মানুষকে যেখানে বিনাপ্রমাণেই দোষী ব'লে ধরে নিতে মন সতত ব্যগ্র, কুৎসার রসনা যেখানে বিরাম মানে না, ধৈর্য্য জানে না, সেখানে কী প্রত্যাশাই বা করতে পারে এই নারী? সেখানে কে দেখবে তার মনের ভাব, কে বুঝবে তার চোখের জল, কে করবে তার ন্যায় বিচার?

তবু, মন্দ ব'লে এই হতভাগিনীকে সমাজ পরিত্যাগ করলেও তিনি পরিত্যাগ করেন না, যিনি সকল ভালমন্দের আধার হ'য়েও সকল ভালমন্দের অতীত। অপমানিতের জন্যে, আর্ত্তের জন্যে, পতিতের জন্যে তিনি যে তাঁর দক্ষিণ হাতখানি আগে থেকেই বাড়িয়ে রেখেছেন। ভ্রান্তের তরে, পথভ্রষ্টের তরে তাঁর যে আছে অনন্ত ক্ষমা। সবাই যাকে ছেড়েছে সে তো নিরাশ্রয় নয়, সে যে তাঁরই আশ্রয় পেয়ে গেছে। এসব কথা যদি সত্যি না হ'ত, তাহ'লে এই জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে এই হতভাগিনীর মুখে এত আলো আসত কোথা হ'তে!...

কমরেড লেনিন

—শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শেষে গুপ্তচরের দল তাকে একদিন ধরিয়ে দিল। দলের সব কথা জানবার জন্য, পুলিশ তার উপর অসহনীয় অত্যাচার সুরু করলো, সে মরলো কিন্তু একটা কথাও তার মুখ থেকে বেরুলো না। তবে মৃত্যুর আগে সে কোন রকমে দলের কাছে এই খবরটুকু পাঠিয়ে দিলে—আমার সব টাকা আমি দলের কাজে দিয়ে গেলাম। ভাইয়ের মৃত্যুর পর বোন এলিজাভেটা সমস্ত সম্পত্তির মালিক হোল, নাবালিকা হওয়ায় খরচ করার কোন অধিকার তার রইল না। কিন্তু ভায়ের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবার জন্য সে ছিল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বিয়ে তার হয়েছিল, স্বামীও ছিলেন বর্তমান, তবু সে লোক-দেখানো বিয়ে করলো এক বলশেভিককে, এবং ভাইয়ের সব অর্থ দলের হাতে তুলে দিলে।

এই সময়টা বছর কয়েক লেনিনের কাটে কখন প্যারিসে, কখন জুরিচে, কখন বা ক্রাকার্ড সহরে।

প্যারিসে পড়াশুনার অনেক অসুবিধা ছিল। বাড়ীওলা জামিন না থাকলে লাইব্রেরী থেকে বই ধার পাওয়া যেত না। দুবেলা সাইকেল চালিয়ে লেনিনকে যেতে হোত লাইব্রেরীতে। একবার তো সাইকেল চুরী হয়ে গেল, আরেকবার পথে মোটরগাড়ীর সঙ্গে এমন ধাক্কা লাগলো যে সাইকেল চুরমার।

সুইট্‌জারল্যাণ্ড কিন্তু ফ্রান্সের মত নয়। সেখানকার কোন গাঁ থেকে যদি কোন লোক একখানি চিঠি পাঠিয়ে দেয় কোন লাই-ব্রেরীতে, কোন প্রশ্ন, কোন সুপারিশ, কোন জামিনের দরকার হয় না, প্রয়োজনীয় বইখানি এসে পড়ে বিনা খরচে। এইজন্যই লেনিন অন্যান্য জায়গার চেয়ে সুইট্‌জারল্যাণ্ডই বেশী পছন্দ করতেন। সেখানে সোরেনবার্গ নামে এক গ্রামে থেকেও তাঁর পড়াশুনার কিছুমাত্র অসুবিধা হয়নি।

ষ্ট্যালিন

প্যারিসে থাকার সময়কার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে কার্ল মার্কসের মেয়ে-জামাইয়ের সঙ্গে লেনিনের সাক্ষাৎ। লরা লাফার্গ আর পল লাফার্গ থাকতেন প্যারিস থেকে মাইল কয়েক দূরে ড্রাভেন্ট গাঁয়ে। মার্কসের আদর্শবাদ তারা পেয়েছিলেন উত্তরাধিকার সূত্রে। সারা জীবন তাঁরা জনগণের সুখসুবিধার আন্দোলন করেই কাটিয়ে দেন, নিজেদের সুখ সুবিধার সুযোগ করে নিতে তারা পারেনি, সেজন্য সারা জীবন এঁদেরকে দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছিল। লেনিনের সঙ্গে যখন এঁদের দেখা হয়েছিল তখন এদের মাথার চুল পেকে গেছে, বার্দ্ধক্যের জড়তা জমেছে জীবনের উপর। লেনিন মার্কসের আদর্শকে রূপায়িত করছেন শুনে আনন্দে লাফার্গের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, কিন্তু দেহের সামর্থ্য তখন নিঃশেষ হয়ে এসেছে।...কিছুদিন পরে এঁরা দুজনেই আত্মহত্যা করেন, একখানি চিঠি লিখে যান: 'বুড়ো হয়ে গেছি, গণ আন্দোলনের কাজ আর ঠিকমত করতে পারছি না, পৃথিবীতে বেঁচে থাকার প্রয়োজন আমাদের ফুরিয়ে গেছে।' তাঁদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় লেনিন উপস্থিত ছিলেন, তিনি বলেন—বিপ্লবীদলে যারা কাজ করতে চায় তাদের সত্যনিষ্ঠ হতে হবে এবং যখনই বুঝবে যে তার দ্বারা আর কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় তখনই লাফার্গের মত আত্মহত্যা করার সৎসাহস তার থাকা উচিত।

এই সময় লেনা সোণার খনিতে ঘটলো ধর্মঘট। মজুরেরা বললে—আমাদের সুখসুবিধা চাই, আমরা ভালো ভাবে বাঁচতে চাই। এতো কম মাইনেতে আমাদের চলছে না। তার উত্তর তারা পেল সৈনিকের গুলিতে, কটকট করে বন্দুক গর্জে উঠলো, ধর্মঘটীরা একে একে রক্তাক্ত দেহে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো, সাইবেরিয়ার ধূসর প্রান্তরের বুকে রক্তগোলাপের ছেঁড়া পাপড়ি ছড়িয়ে পড়লো যেন।

নমিতা ঝুঁকে পড়েছিলেন মায়ের মুখের ওপর, দেখছিলেন সেই অনির্ব্বচনীয় জ্যোতিঃ। নার্সরা প্যাট্ প্যাট্ ক'রে ইন্‌জেক্‌সান্ দিচ্ছে, রোগিনীর ভ্রুক্ষেপ নেই।...হঠাৎ তাঁর চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে হয়ে এল, ধীরে ধীরে আঁখিপল্লবের নীচে চোখের তারা দুটি অস্তমিত হ'ল, ছবিধরা হাতখানি বুকের ওপর অসাড় হ'য়ে পড়ে গেল। শ্বাসনালী একটু কাঁপল, নাকমুখ নীল্‌চে হয়ে গেল। তারপর সমস্ত স্থির।

ঘড়ীতে তখন চারটে বেজেছে। (ক্রমশঃ)

রুশিয়ার সর্বত্র এর প্রতিধ্বনি উঠ্‌লো। হাজার হাজার মজুর কারখানা ছেড়ে বেরিয়ে এলো।

ধনীদের মাইনে করা পাদ্রীর দল গির্জায় গির্জায় উপদেশ দিল—ভুল করছ, খাবে কি? ফিরে যাও—

মজুরেরা বললে—ফিরবো না, না খেয়ে মরি সেও ভালো, তবে ওদের সঙ্গে একটা চরম বোঝাপড়া করতে চাই!

লেনিন বললেন—এই আবার সুরু হোল। এবার আমরা এমন আঘাত হানবো যে জারের পতন ঘটবে, আর তারই সঙ্গে নিপাত যাবে যত মালিক আর জমিদারের দল।

লেনিন ঠিক করলেন, রুশিয়ার ভিতরেই একখানি নতুন কাগজ ছাপা হ'য়ে বেরুবে, তাতে দলের কাজ আরও সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে যাবার সুবিধা হবে।

রাজধানীর ভীড়ের মধ্যেই গোপন প্রেস প্রতিষ্ঠিত হোল।

শ্রমিকদের সুখদুঃখ নিয়ে বিপ্লবের আহ্বান জানিয়ে নতুন কাগজ বেরুলো 'সত্য'—'প্রাভ্‌দা'। কাগজখানি চালাবার ভার নিল দলের এক বিপ্লবী যুবক—যোসেফ ষ্টালিন।

কাগজ পড়ে জার চঞ্চল হয়ে উঠলো, ওপরওয়ালাদের স্বার্থপর চোখ লাল হয়ে উঠলো, পুলিশের সন্দেহ আর অত্যাচার ব্যাপক হয়ে ছড়িয়ে পড়লো, যাকে সম্পাদক বলে মনে হয়, তাকেই পুলিশে ধরে, জেলে দেয়, কিন্তু কাগজ বেরুতে থাকে ঠিকই।

কারখানায় কারখানায় কাগজ যায়, যে পড়তে জানে আর সবাইকে সে পড়ে শুনিয়ে দেয়।

বস্তির ঘুপ্‌সী ঘরে মজুরদের বৈঠক বসে, বলশীরা এসে ধনতন্ত্রীদের রাজনীতি তাদের বুঝিয়ে দেয়। শ্রমিকদের চোখ খোলে, মন হয়ে ওঠে উগ্র।

কোন একদিন পুলিশ ষ্টালিনকে ধরে ফেললো, ছ'বছরের জন্য তাকে পাঠিয়ে দিল নির্বাসনে।

এই সময় থেকে বলশেভিক দলে ষ্টালিনও প্রাধান্য পেতে সুরু করেন।

ষ্টালিন এঁর ছদ্ম নাম। আসল নাম হচ্ছে যোসেফ ডিজুগাসিলি। ছেলে বেলায় লোকে ডাকতো সোসা বলে, পরে বিপ্লবী হিসাবে গা ঢাকা দেবার জন্য এঁকে চারবার নাম বদলাতে হয়: কোবা, নিজারেজ, চিজিকোব ও ইভানোভিচ।

ককেসাস পর্বতমালার উত্তরে জর্জিয়া প্রদেশ, সেখানকার টিফ্‌লিশ নগরে ষ্টালিনের জন্ম। পিতা চর্মকারের কাজ করতো, দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করতে করতেই তার সারা জীবন কাটে। জীবনে শুধু তার একটি কামনা ছিল—সোসা পাদ্রী হবে। পাদ্রি হওয়াটা তখনকার দিনে জর্জিয়ানদের কাছে খুব সম্মানের কথা ছিল।

সোসা এদিকে পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। এক দল ডানপিটে ছেলে ঘোরে তার সঙ্গে, ছোট নগরটাতে সকলে সন্ত্রস্ত এই দলটার ভয়ে। হয়তো তাদের একদিন ইচ্ছা হোল তরমুজ খাবে। সদলে বাজারে গিয়ে ঢুকলো, তরমুজের দোকান থেকে একটা বড় তরমুজ নিয়ে ছুট দিলে। দোকানী হা-হা করে ছুটে এলো পিছনে, কিন্তু তরমুজ-চোরকে পাক্‌ড়াও করা সহজ হোল না। সে যখন দেখলো দোকানী নাছোড়বান্দা হয়ে তাড়া করেছে, তখন সে একেবারে নদীতে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো। তরমুজটা কিন্তু ছাড়লো না, দলবল সুদ্ধ ওপারে গিয়ে তরমুজের ফলার সেরে এপারে এলো।

এই রকম ঘটনা ঘটতো শুধু দু-একদিনই নয়, প্রতিদিনই।

(ক্রমশঃ)

বিজনদা'র চিঠি

আমার আদুরে ভাই-বোনেরা,

এবারে তোমাদের কাছে একটা খুব দরকারী কথা জানাবার আছে। কথাটা হচ্ছে এই যে 'দীপালী' কাজি নজরুল সাহায্য ভাণ্ডারের সাহায্যার্থে আমার কাছে তোমাদের মধ্যে দু'একজন টাকা পাঠিয়েছিলে। কিন্তু আমার নামে আর কেউ যেন ও টাকা পাঠিও না। ঐ সংক্রান্ত টাকা-কড়ি বা চিঠি-পত্র সবই পাঠাবে ঐ সাহায্য ভাণ্ডারের সম্পাদক মশাইয়ের নামে। আবার অনেকের অভ্যাস আছে চিঠির খামের মধ্যে ডাকযোগে চিঠির সঙ্গে এক, দুই, বা পাঁচ টাকার নোট পাঠান। ও অভ্যাস অত্যন্ত খারাপ। ডাক বিভাগে মারা যাবার সম্ভাবনা ওতে খুব আছে। অতএব ওকাজ বোকার মত কেউ করবে না আশা করি।... আসি, স্নেহ নিও তোমরা।

তোমাদের : বিজনদা,

মনে রেখো

"উচ্চশির যদি তুমি কুলমানধনে।
কারওনা ঘৃণা তবু নীচ শির জনে॥"
—মাইকেল।

রাণু আর তার দাদা

(৬)

রূপকুমার

বোনটা রাণু,

এবারে তোর চিঠি পেয়ে বুঝলাম যে আজকাল তুই খুব কথা বলতে শিখেছিস্। একেবারে 'পাকা-বুড়ী' তৈরী যে হয়েছিস তা' বেশ বুঝতে পারলাম।...গুরুদেবের কাছে থেকে শিষ্য বা শিষ্যারা সর্ব্বদা পুরস্কার স্বরূপ পাবার প্রার্থনা জানায় আশীর্ব্বাদ। আমি তোকে সে দিন আমার স্নেহাশীষই পুরস্কার স্বরূপ দেবো। কেমন তাতে খুসী হোবি তো? এবারে তোর প্রশ্নের উত্তর দিতে আরম্ভ করি এক এক করে।...

পৃথিবী থেকে চন্দ্র দু'লক্ষ চল্লিশ মাইল দূরে আছে। চন্দ্রের মধ্যে আছে কেবল ছাই, পাথর, পাহাড়, গুহা আর সমুদ্রের বড় বড় শুকনো খাদ। চন্দ্রে না আছে জীবন্ত প্রাণী, না আছে জল, না আছে বাতাস।...না, পৃথিবীর থেকে চন্দ্র সূর্য্যের মত বড় নয়, সে আকারে পৃথিবীর পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগ। চন্দ্র থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে সময় লাগে ১·২ সেকেণ্ড। হাঁ, পৃথিবীকে একবার চন্দ্রের প্রদক্ষিণ করতে সময় লাগে সাতাশ দিন, আট ঘণ্টা।...না, ওর মধ্যে মজা আছে। চন্দ্রের যেদিক যখন সূর্য্যের দিকে থাকে তখন সে দিকটা ভীষণ গরম হয়ে ওঠে, অথচ তার বিপরীত দিকটা তখন একেবারে বরফের মত ঠাণ্ডা।...না, চন্দ্রের একপিঠ চিরকালটা পৃথিবীর দিকে ফেরানো আছে তাই ওর গোলাকারটা আমরা সমস্ত দেখতে পাই না। কারণ চন্দ্রের নিজের মেরুদণ্ডের ওপর ঘুরতে সময় লাগে সাতাশ দিন আট ঘণ্টা, অথচ সেই সময়েই সে পৃথিবীকেও একবার প্রদক্ষিণ করে আসে।

এবারে 'গ্রহণের কথা বলি। সূর্য্যের আলো পড়ে চন্দ্রকে দেখায় উজ্জ্বল। পৃথিবী থেকে আমরা চন্দ্রের আকার পঁচিশভাগের একভাগ মাত্র দেখতে পাই, তার সম্পূর্ণ অংশে সূর্য্যের আলো পড়লে বলি 'পূর্ণিমা'। পৃথিবী থেকে এই আলোর অংশ এক এক রাতে এক এক আকারে দেখা যায়, সেই অনুযায়ী তিথি-বিভাগ হয়।...অতএব পূর্ণিমা তিথিতে পৃথিবী যদি সূর্য্য ও চন্দ্রের মধ্যে এক সমতলে আসে তা'হলে ওর ছায়া চন্দ্রের ওপর পড়ে ওকে সম্পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে ঢেকে ফেলে। একেই বলে চন্দ্রগ্রহণ। আর লোকে বলে রাহু চন্দ্রকে গ্রাস করলো। আবার অমাবস্যা তিথিতে চন্দ্র যদি ঐরকমভাবে সূর্য্য আর পৃথিবীর মধ্যে এসে সূর্য্যকে আড়াল করে তা'হলে ওর অবস্থান অনুযায়ী সূর্য্যের পূর্ণ, বা আংশিকভাবে গ্রহণ হয়। এমনি করে হয় সূর্য্য গ্রহণ।...আজ আর বলবার কিছু নেই, সব প্রশ্নের উত্তরই দিলাম।

তোর দাদা

সব সত্যি

শ্রীদীপশিখা ভট্টাচার্য্য (১০০৭)

এক ভদ্রলোক বিলেত থেকে ব্যারিষ্টারী পাশ করেছেন। দেশে আসার আগে একটা ভোজ দিলেন। সেই বিদায় সভায় সবাই কিছু কিছু বল্লেন। এবার এল সেই ভদ্র লোকের পালা। তিনি বলবার জন্যে উঠে দাঁড়ালেন। কয়েকটা কথা বলবেন বলে আগে থেকেই মনে মনে ঠিক করেছিলেন। কিন্তু উঠে দাঁড়াতেই মাথা গেল গুলিয়ে, একটা লাইনের বেশী বলতে পারলেন না। তখন তাঁর এডিশনের কথা মনে পড়ে গেল। তিনি কমন্স সভায় দাঁড়িয়ে তিনবার বলেছিলেন 'আমি মনে করি' তারপর আর কথা যোগায় নি। তখন আর একজন লোক উঠে বলল ইনি তিনবার মনে করতে পারেন কিন্তু বলতে একবারও পারেন। ঐ ভদ্রলোক ভাবলেন ওই কথাটা নিয়ে হাস্য-রস করে কিছু বলি, কিন্তু তা হাসাতে গিয়ে তাঁর মুখের চেহারা হয়ে গেল অদ্ভুত রকমের। তার একটা কথাও মুখ দিয়ে বার হলো না। তখন তিনি কোন রকমে বললেন, আপনারা যে আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন সেজন্যে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তারপরই বসে পড়লেন। ইনি কে জান? ইনি হচ্ছেন মহাত্মা গান্ধী। আজও অবশ্য ইনি খুব বড় বক্তা নন। তিনি বলেন 'আমি যে বক্তা হতে পারিনি সেজন্যে আগে খুব বিরক্তি লাগত কিন্তু এখন এটা আনন্দই দেয়। লোকের কথা বলায় যে শক্তি ও সময় নষ্ট হয় সে সময়টা নিজের চিন্তাশক্তি বাড়িয়ে তোলে। তোমাদের মধ্যে অনেকেই মুখে বড় বড় কথা বল কিন্তু কাজের বেলা কিছু নয়। আজ থেকে চেষ্টা কর যাতে বড় বড় কথা না বলে কাজে কিছু করতে পার।

গল্প শোন

হিরণ্ময় ভট্টাচার্য্য (৭৬৪)

আমার ভাগ্যপরীক্ষা

ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছিলাম। পাশ করবার ভরসা যেমন ছিল, নিরাশ হবার

কারণও কোন অংশে কম ছিল না। শেষে ভাবলাম যাই হোক দেওয়া যখন হয়ে গেছে তা ভেবে মিছে মিছে মন খারাপ করে কি লাভ? কিন্তু না ভেবেও আবার উপায় ছিল না। যত দিন এগিয়ে আসছিল ভাবনাও তত ডিগ্রী বেড়ে যাচ্ছিল। এমন সময় হঠাৎ খবরের কাগজের একটা বিজ্ঞাপনের ওপর চোখ পড়ে গেল—"ভারতের এক শ্রেষ্ঠ জ্যোতিষী ক' দিনের জন্যে কলকাতায় আসছেন। এ সৌভাগ্য কলকাতাবাসীর আর আসবে কি না সন্দেহ ইত্যাদি ......পারিশ্রমিক বিশেষ কিছুই নেন না। মাত্র এক টাকা দিয়েই আপনার ভূত-ভবিষ্যৎ সব কিছুই জানতে পারবেন।"

জল খাবারের পয়সা জমিয়ে প্রায় টাকা-খানেকের ওপর করে ফেলেছিলাম। ভাবলাম টাকার ভাবনা যখন ভাবতে হবে না, দেখিই না একবার ভাগ্য পরীক্ষা করে।

একদিন গিয়ে জ্যোতিষীর ওখানে হাজির হলাম। ঘণ্টাখানেক বসার পর আমার ডাক এল। আশা নিরাশায় দোদুল্যমান মন নিয়ে হাজির হলাম। তাঁর সৌম্যমূর্ত্তি, বিরাট শ্মশ্রু, চোখে প্রতিভার দীপ্তি দেখে মন শ্রদ্ধায় ভরে গেল।

আমার মনের গোপন কথা অকপটেই জানালাম। শেষে তিনি জানালেন, "এ বছর তোমার ভাগ্য বড়ই খারাপ। শনির যে শ্যেন দৃষ্টি রয়েছে তোমার ওপর।"

"তাহলে কি পাশ করতে পারব না" বলে কেঁদে আমি তার পা জড়িয়ে ধরলাম। "ওঠ বৎস" বলে তিনি সান্ত্বনা দেন, "ভয় কি? আসছে শনিবার গোটা পাঁচেক টাকা এনো, শনির পূজার পর তোমায় তাঁর প্রসাদ দেব তাহলেই ঠিক হয়ে যাবে।"

যাক আশ্বস্ত হলাম। সাধুর অশেষ দয়ার কথাও মনের মধ্যে গেঁথে গেল। টাকাটা যে কি করে জোগাড় করবো সে ভাবনা তখন মাথায় গজায়নি। এখন দেখলাম, পড়ে পাশ করার চেয়ে পাঁচটা টাকা দিয়ে পাশ করা আমার পক্ষে আরও কঠিন।

আমারই দলের আরও কয়েকটী ছেলের সঙ্গে জোট পাকিয়ে ঠিক করলাম "ফেল ত করবই তবুও ফলাফলটা বার হওয়া পর্য্যন্ত দেখা যাক।"

পাশ করার আশার চেয়ে নিরাশার ভাগটা বেশী নিয়েই ভোর চারটের সময় যাত্রা করলাম বাড়ী থেকে। আশ্চর্য্য, সিনেট হলে গিয়ে দেখি শুধু আমি নয় আমার দলের সবাই একশো এগার নম্বরে পাশ করেছে।

বলা বাহুল্য সেই দিন খোঁজ করেছিলাম সাধু বাবাজীর আখড়া। শুনলাম ভাড়াটাড়া না দিয়ে অনেক দিন আগেই এখান থেকে সটকান দিয়েছে।

মজার খবর

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার মিত্র (৯৫২)

পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম বইয়ের সন্ধান পাওয়া যায় পোল্যাণ্ডের রাজধানী ওয়ার্সতে। ইহা ⅜ ইঞ্চি লম্বা, ¼ ইঞ্চি চওড়া। ইহাতে ১২০টি পাতা ও কয়েকখানি ছবি আছে।

নিউইয়র্কের "গ্র্যাণ্ড সেণ্ট্রাল টারমিনাস" পৃথিবীর বৃহত্তম রেলওয়ে ষ্টেশন। এই ষ্টেশনে ৭৪টি প্ল্যাটফর্ম আছে।

প্যারীর "বিব্লিওথেক ন্যাশন্যাল লাইব্রেরী" পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় লাইব্রেরী। বইয়ের সংখ্যা একশো কোটিরও বেশী।

পৃথিবীর বৃহত্তম ঘড়ি মণ্ট্রীল সহরে অবস্থিত। ঘণ্টার কাঁটা ২০ ফুট লম্বা ও মিনিটের কাঁটা ৩০ ফুট লম্বা। ব্যাস ৬০ ফুট। কলকব্জার ওজন ১৬২ মণ।

১৮৫৭ সালের চীন সম্রাট কুঙাঙৎসাইয়ের আমলের টাকা, সব চেয়ে বড় রৌপ্য মুদ্রা। ইহার ওজন ১½ সের।

টুকে রাখো

শ্রীগঙ্গারাম ঘোষ (১০৭৬)

অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেসে ১৫০ রকমের ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় ছাপিবার সরঞ্জাম আছে।

পৃথিবীতে প্রতিদিন ৩৫ লক্ষের অধিক 'ষ্টীল পেন' ব্যবহৃত হয়।

যে মেলবোর্ণ সহর এখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সপ্তম সহর বলিয়া পরিগণিত, মহারাণীর সিংহাসন প্রাপ্তির সময় সেই মেলবোর্ণে মাত্র ১৩টী কুটীর ছিল। সমস্ত ইউরোপের মধ্যে স্পেনে অন্ধের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী।

একটি মাকড়সা যে জাল বুনিতে পারে তাহা দৈর্ঘ্যে দুই মাইলেরও অধিক।

একটুখানি হাসো

শ্রীরবীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (৮৭৮)

ইস্কুলে ইন্সপেক্টর এসেছেন। "ক্লাস টেনে" ঢুকে ছাত্রদের এক প্রশ্ন করলেন, মন্দ থেকে ভাল ছেলেদের মধ্যে কেউই এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারল না। তখন এক বালক উঠে বললে :—"সি সামারী" (See Summary) ক্লাস টীচার তো উত্তর শুনে রেগে বলে উঠলেন :—তার মানে?

বালক :— কেন নোটে যে লেখা আছে, স্যার!

বাস্তবের রূপ

(গল্প)

—শ্রীঅজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সামাজিক বৈষম্য, জাগতিক বিশৃঙ্খলা, আর সাংসারিক দ্বন্দ্বরই একটি করুণ ছবি। বাস্তবিক নির্যাতিতা বাংলার এইরূপ নিষ্ঠুর কাহিনী বিশেষতঃ এই বিংশ শতাব্দীতে ইহার পূর্ব্বে আমার কখনও চোখে পড়ে নাই।

নিজের ঘরের জানলায় বসিয়াছিলাম। বার বৎসরের পূর্ব্বের ছবি আমার সামনে ভাসিয়া উঠিল—প্রমদাচরণের বৃহৎ অথচ সুখের সংসার—তিন কন্যা সন্ধ্যা, উষা, মিত্রা, আর চারটি ছোট ছোট পুত্র! একমাত্র কনিষ্ঠ ভ্রাতা শিবচরণ, ভ্রাতৃবধূ প্রভাসুন্দরী আর একটি মাত্র কন্যা মালা।

মাত্র ১৫ দিনের ছুটিতে প্রমদাচরণ আসিয়াছিলেন কলিকাতায় তাঁহার মেজ কন্যা উষার বিবাহের চেষ্টায়। সস্ত্রীক থাকেন সিমলা পাহাড়ে কাজ উপলক্ষে। তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা সন্ধ্যার কিছুদিন পূর্ব্বেই বিবাহ হইয়াছিল কিন্তু তখনও শ্বশুর ঘর করতে যায় নাই।

উষা তো উষাই, প্রভাতের মত স্নিগ্ধ পবিত্র উজ্জ্বল। ছিপছিপে গড়ন, গৌর বর্ণ, বেশ একটা কমনীয় আলগা শ্রী তাহাকে প্রথম শ্রেণীর সুন্দরের কোঠায় ফেলিয়াছিল।

বিশ্রী নোংরা পল্লীর ভিতর আমরা দু'জনেই বাস করিতাম। সেইজন্য এই দুই বাড়ীর ভিতর বেশ সৌহার্দ্য ও আন্তরিক হৃদ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল। প্রমদাচরণ মানুষটি সরল উদার। তাঁহাকে আমরা জ্যাঠামহাশয় বলিয়া ডাকিতাম। জ্যাঠাইমা মানুষটিও খুব ধীর শান্ত ঠাণ্ডা। লোককে খাওয়াইতে বড়ই ভালবাসিতেন। সিমলা হইতে আসিলেই আমার ডাক পড়িত। জানলা হইতে ডাকিতেন—অমিয় কুমার, ছুটিতে এসেছি। কেমন আছ? এস একবার।

পাশাপাশি বাড়ী, অথচ রাস্তা দিয়া ঘুরিয়া যাইতে হয়। বলিতেন, তারপর বাড়ীর চার্জ্জ দিয়ে গেলাম দেখাশুনা করতো।

বলেন কি নিশ্চয়ই, বলিয়া কথায় উত্তর দিতাম।

সন্ধ্যা, উষা দুই বোন নিয়মিত আমাদের বাড়ী বেড়াইতে আসিত। আমার বোনের খুব বন্ধু। উষা সাজিয়া গুজিয়া আমাকে জানলা হইতে ডাকিত—অমিয়দা, আমরা তৈরী, আসুন আমাদের নিয়ে যান।

কলেজ যাইতাম, দেখি উষা বারান্দায় দাঁড়াইয়া আছে। আমাকে দেখিয়া বলিত বাপরে বাপ, বাবু কলেজ যাচ্ছেন না জামাই শ্বশুর বাড়ী যাচ্ছেন বোঝা দায়।

বলিতাম—কেন, কি দেখলে এমন?

উষা বলিত, না কি আর দেখব, সিল্কের পাঞ্জাবী, ৫২ ইঞ্চি ধুতি, কোঁচা লুটুচ্ছে, চকচকে জুতো, হাতে আংটি, আর কি চাই?

সন্ধ্যায় ডাক পড়িত; অমিয় দা, শিগ্‌গির আসুন। একগাদা টাস্ক দিয়েছে—আপনার সাহায্য দরকার, Substance বলে দিন, আমার দ্বারা হয় না।

হাসিয়া উত্তর দিতাম—তবে কি ম্যাট্রিক পরীক্ষা তোমার হয়ে আমায় দিতে হবে?

উষা ম্যাট্রিক পাশ করিল। প্রমদাচরণ আমার উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। তোমার মত এমন ছেলে বাবা আজকাল দেখা যায় না। বলিতাম, অত ভালবাসবেন না জ্যাঠাবাবু, শেষরক্ষা করতে পারব না।

উষা হাসিয়া উত্তর দিত, কি যে বল বাবা তার ঠিক নেই। আমি খেটে পাশ করলাম আর বাহাদুরি দিচ্ছ তুমি অমিয়দাকে।

আমিই উষাকে কলেজে ভর্ত্তি করিয়া আসিলাম। সে বলিল: কি কি Subject নেব অমিয়দা? আপনি ঠিক করে দিন।

বলিতাম, তুমি কি কি নেবে তা আমি ঠিক করে দেব কি?

উষা বলিত, তবে মাষ্টার মহাশয় হয়েছেন কেন ?

হাসিয়া বলিতাম, তবে লজিক নাও তর্কে তো তোমার সঙ্গে পারা যাবে না।

কখন কখন আমার বোনকে খাবার পাঠাইয়া দিত। আমি বলিতাম, বড় এক চোখা তুমি উষা, বন্ধুর ওপরই টান, আমি কি কেউ নই ?

উষা গম্ভীরভাবে বিজ্ঞের মত বলিত, আপনারা বাইরে হোটেলে কতখেয়ে বেড়ান। আপনাকে খাইয়ে কি লাভ ?

বিকালে ছাদে উঠিতাম সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর ক্লান্তি দূর করিবার উদ্দেশ্যে। মুক্ত বায়ু সেবন করিতে করিতে পায়চারি করিতাম। উষাও তাহার ছাদে উঠিত। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া চোখে কাজল পরিয়া, কপালে একটি টিপ পরিয়া, যেন শুকতারা জল জল করিতেছে। আলসেতে ভর দিয়া বলিত, কখন এলেন ?

একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিতাম, আসচি এইমাত্র, কিন্তু আমি ছাদে উঠলে তুমি কেন ওঠ বলত? পাড়ার সমস্ত যুবকদের চোখ যে আমাদের ওপর পড়েছে, শেষে দুর্ণাম রটলে তখন ?

রাগিয়া উত্তর দিত, যান আপনি বড় গোঁড়া, কি আবার রটবে ?

হাসিয়া বলিতাম, মুখরোচক কথাগুলি আলোচনা করবে। পাড়া-প্রতিবেসীরা আমাদের নিয়ে অনেক গবেষণা সুরু হবে, তাদের সুনিদ্রার ব্যাঘাত হবে সুতরাং তাদের ভিতর আশ্রম-পীড়া ঘটিয়ে লাভ কি ?

উষা উত্তর দিত—তা বেকার বাবুদের না হয় আমাদের নিয়ে একটু সময় কাটবে ভাল, হয়তো রিসার্চ্চ করতে করতে ডক্টরেটও পেতে পারেন।

আশপাশ নজর হইতে নিজেকে আড়াল করিয়া বলিতাম, কিন্তু কলংক গায়ে লাগলে যে বড় মুস্কিল হবে উষা, আমার জন্য তো ভয় নয়, আমরা পুরুষ মানুষ, দোষ তো আমাদের, কিন্তু বিচিত্র সমাজের নিয়মানুসারে সাতখুন মাপ। ভয় হয় তোমাদের জন্য।

উষা হাসিয়া উত্তর দিত—হ্যাঁ, আপনাদের গঙ্গাস্নান করলেই সব দোষ কেটে যায় কিন্তু আমার জন্য চিন্তার প্রয়োজন নাই, নিজেকে বাঁচাতে জানি।

তারপর একদিন পুত্রকন্যাসহ প্রমদাচরণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন উষার বিবাহের ব্যবস্থা করিতে। পাত্রও ঠিক হইয়া গেল। নাম কল্যাণ, সুন্দর কার্ত্তিকের মত চেহারা, কলিকাতার বিখ্যাত বনেদী বংশ, এম-এ পাশ করিয়া অধ্যাপকের চাকুরীর চেষ্টা করিতেছে, সদা হাস্যময় প্রফুল্ল—উষার সহিত মিলিবে ভাল।

প্রমদাবাবু বলিলেন—বুঝলে অমিয়, চট করে এমন পাত্র পাব ভাবিনি। ভগবানই মিলিয়ে দেন বাবা। 'জন্ম মৃত্যু বিবাহ' এতে মানুষের কোন হাত নেই বাবা।

ভালয় ভালয় এখন কাজ চুকে যায় তো নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। তোমায় কিন্তু ভয়ানক খাটতে হবে, আমার তো আর উপযুক্ত ছেলে নেই।

উষা আমায় দেখিয়া লজ্জায় লুকাইত। বলিতাম, এতে লজ্জা পাবার কি আছে উষা, তুমিতো আর অন্যায় কিছু করতে যাচ্ছ না।

ভারী দুষ্টু বলিয়া উষা পালাইত।

মহাসমারোহে উষার বিবাহ হইয়া গেল। সকলে একবাক্যে স্বীকার করিল—হ্যাঁ, দুটিতে মানিয়েছে বটে। সত্যই তাহাদের দুজনকে একসঙ্গে দেখিলে চোখ জুড়াইত।
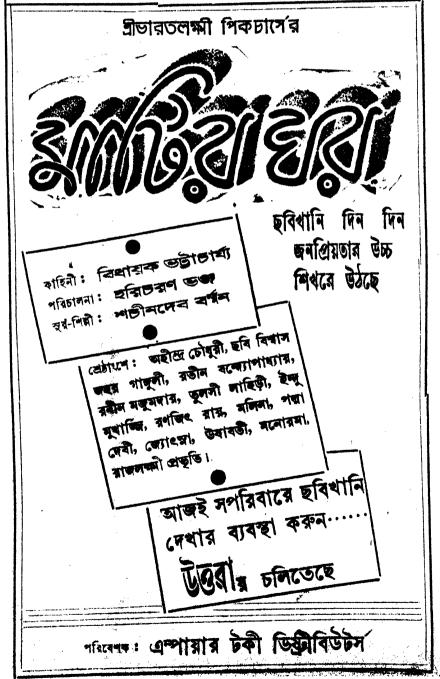
আত্মীয়স্বজন একবাক্যে আশীর্বাদ করিল—আহা দুটিকে ভগবান যেন বাঁচিয়ে রাখেন।

কল্যাণ আর উষা যখন তখন ছাদে উঠিয়া প্রেম নিবেদন করিত, ফিস্ ফিস্ করিয়া আলাপ আলোচনা করিত, আমি লজ্জায় নামিয়া আসিতাম।

উষা আমাকে ঠাট্টা করিয়া বলিত—এতে লজ্জা পাবার কি আছে? ছোট বোন আর বোনাই, আপনি দাদা গুরুজন।

সংকুচিত হইয়া পড়িতাম, কল্যাণ বলিত, কি আশ্চর্য্য, দাদার সঙ্গে অমন ইয়ারকি করে বুঝি?

উষা চীৎকার করিত—নীচে নামছেন কেন অমিয়দা, Scandalএর পথ তো মেরে দিয়েছি। তবে আর ভয় কি?

একদিন উষা স্বামীর সহিত ঘর করিতে চলিয়া গেল।

তারপর দীর্ঘ বার বৎসর পশ্চিমে ভবঘুরের মত ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি—আজ দিল্লী, কাল মীরাট, পরশু লাহোর।

দীর্ঘ বার বৎসর পরে আবার নিজের বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলাম; কি পরিবর্ত্তন! এই বার বৎসরের ভিতর কত বদলাইয়াছে, কত বিপ্লব ঘটিয়াছে কিন্তু প্রমদা বাবুর বাড়ী আজও দাঁড়াইয়া আছে। বাহির হইতে দেখিয়া মনে হয় ঠিক সেই বাড়ী, কিন্তু ভিতরে কত পরিবর্ত্তন। বাড়ীটিকে দেখিলে মনে হয় পৃথিবীর অনেক অভিজ্ঞতা লইয়া আজও মাটির বুকে তাহার অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছে যেন অভিজ্ঞতার প্রতীক! জানালা দিয়া তাকাইয়া তাই ভাবিতেছিলাম সংসারের সুখদুঃখের কথা। সভ্যতার নামে স্বার্থ নিয়ে সংঘাত, মানুষে মানুষে কাটাকাটি মারামারি, তার কথা না হয় ছাড়িয়া দিলাম কিন্তু ঘরের ভিতর এইরূপ বিপ্লব বিংশ শতাব্দীতেও এইরূপ নাটকীয় পাশবিক চিত্র বড় একটা চোখে পড়ে না।

প্রমদাচরণ বাবু অবসর লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। বার্দ্ধক্যের দ্বারে তিনি এখন উপস্থিত। দাঁতগুলি সব পড়িয়া গিয়াছে, চুলগুলি সব সাদা হইয়াছে, শরীরের মাংস কুঁচকাইয়া গিয়াছে—জ্যাঠাইমাকে দেখিলে কে মনে করিবে যে তিনি এক কালে সুন্দরী ছিলেন। মিত্রা বিবাহের উপযুক্ত হইয়াছে, ঠিক উষার প্রতিমূর্ত্তি।

গলির মোড়ে দেখা হইয়া গেল। চীৎকার করিয়া ডাকিলেন, অমিয় কবে এলে? এতদিন তোমাদের বাড়ী বন্ধ ছিল, কাল থেকে খোলা দেখছি।

বলিলাম—কালই এসেছি জ্যাঠাবাবু। আপনি কবে এলেন?

প্রশান্ত হাসিমুখে বলিলেন—পেন্সন নিয়ে এসেছি। বাকি এখন নিজের বাড়ীতে নিজের যায়গায় আরামে থাকব। বিদেশে আর কতদিন ভাল লাগে বল?

বলিলাম—খবর সব ভাল?

একটু কাষ্ঠহাসি হাসিয়া উত্তর দিলেন—সব ভাল, আমার ভ্রাতৃবধূর একমাত্র কন্যা মালা কলেরায় মারা গেছে, তাঁর বাবা; মা, ভাই, বোন সব একে একে মারা গেছে, একমাত্র স্বামী ছাড়া তার আর কেউ নেই। তাই বৌমা পাগল হয়ে গেছেন। আর উষা আত্মহত্যা করেছে—

সামনে যেন বোমা ফাটিল—উষা আত্মহত্যা করেছে? বলেন কি?

হ্যাঁ বাবা, ঐ অমন সুন্দর চেহারার ভিতর সভ্যতার যে কাল কীট থাকতে পারে তা জানতাম না। উঃ পাষণ্ড, পিশাচ, সয়তান।

উত্তেজনায় প্রমদাচরণের সমস্ত শির কাঁপিতে লাগিল।

বড় লোকের ছেলে হইলে যা হয়! অসৎ পথে গিয়া মদ আর মেয়েমানুষ লইয়া কল্যাণ সময় অতিবাহিত করিত। গভীর রাত্রে ফিরিত, উষা প্রতিবাদ করিলে বা দরজা খুলিতে দেরী করিলে—নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিত। সমস্ত শরীরে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে পতি-দেবতার সৌহার্দের চিহ্ন মুক্তার ন্যায় জল জল করিত। উষা সমস্ত অত্যাচার হাসিমুখে চুপ করিয়া সহ্য করিত। এই সময়ে তাহাদের মাঝে একটি তৃতীয় ব্যক্তি আসিয়া স্থান দখল করিল। কিন্তু তাহাতেও কল্যাণের কোন পরিবর্ত্তন ঘটিল না। কিন্তু যে দিন কল্যাণ উষাকে লইয়া গিয়া তাহার পাপ-মহলে কিছু রোজগারের চেষ্টা করিল, সে দিন উষা আর থাকিতে পারিল না—স্ত্রীর মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য, স্ত্রী বাজারের মেয়ে-মানুষ নয়, তার সঙ্গে কেবল দেহেরই সম্পর্ক নয়, এই কথা বোঝাইবার নিমিত্ত আফিম খাইয়া আত্মহত্যা করিল। সময়মত তাহাকে হাঁসপাতালে পাঠাইলে হয়তো সে বাঁচিত। পতি দেবতা, পতি পরম গুরু, তখন তার অঙ্গ হইতে শেষ হারটুকু খুলিয়া লইতে ব্যস্ত, যদি হাতছাড়া হইয়া যায়। অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়া, উষা একটা মূক প্রতিবাদ জানাইয়া অজানার পথে যাত্রা করিল।

তাই যখন উত্তেজিতভাবে প্রমদাচরণ বলিয়া উঠিলেন—এর চেয়ে মেয়ে যদি আমার তার স্বামীকে ত্যাগ করে নিজের পায়ে দাঁড়াত, আমি ঢের খুশী হতাম অমিয়। তুমি তো জান সে আই, এ পাশ করেছিল, স্কুলের টিচারী করতে পারত, নিজে স্বাধীনভাবে কাটাতে পারত—কিন্তু এ কি করলে? আজকালকার মেয়ে হয়ে লেখাপড়া শিখে আত্মহত্যা—

কি উত্তর দেব? বৃদ্ধ পিতাকে কি বলিয়া সান্ত্বনা দিব। চুপ করিয়া রহিলাম।

প্রমদাচরণ আবার বলিয়া উঠিলেন—সে হতভাগা আবার বিবাহ করেছে। আবার আর একটি মেয়ের সর্ব্বনাশ করছে। আমাদের দেশে এ রকম প্রতি ঘরে ঘরে ঘটতে থাকবে আর তোমরা দাঁড়িয়ে তাই দেখবে, প্রতিকার করবে না? তোমরা বড় বড় বক্তৃতা দেবে, সমাজ সংস্কার সম্বন্ধে বড় বড় প্রবন্ধ লিখবে, কিন্তু কাজে নাববে কবে? কোন প্রতিবাদ করবে না?

খেলার মাঠে
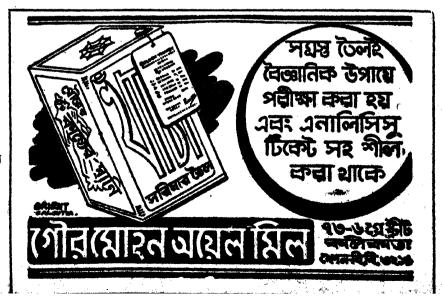
শ্রীউমেশ মল্লিক বি, এ

ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাব

ক্যালকাটা ক্লাবের সভ্য তালিকা ইংরাজ সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ইদানিং এই বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানটি আই, এফ, এর নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে যে প্রকার ব্যবহার করছেন তা মোটেই এই প্রতিষ্ঠানের পক্ষে গৌরবের নয়। বোধ হয় এঁরা বর্ণ বৈষম্যের জন্যই বিশিষ্ট নিমন্ত্রিত ভারতীয়দের বিশেষ আমল দিতে চান না। তা না হলে সামান্য ক্যালকাটা ক্লাবের কর্ম্মচারী পর্য্যন্ত বিশিষ্ট ভারতীয়দের সঙ্গে অসদ্ ব্যবহার করে এবং এবিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষকে জানান হলেও তাঁরা কোন ব্যবস্থা করেন না। যতদিন না তাদের এপ্রকার আচরণের কোন প্রতিকার হয় ততদিন কোন নিমন্ত্রিত ব্যক্তির এঁদের মাঠে খেলা দেখতে যাওয়া উচিত নয়। আশা করি আই, এফ, একে উপেক্ষা করার জন্য সর্ব্বজাতীয় ফুটবল প্রতিষ্ঠান এ ব্যবহারের বিহিত করবেন।

সোমানা-আম্মারাও

বাটাদলের পক্ষে এ বৎসরে ফুটবল খেলায় যোগদান করায় আই, এফ, এ এঁদের মহীশূরে খেলার আবেদন গ্রাহ্য করেন নি।

আই, এফ, এ শীল্ড

এ বৎসরে এই প্রতিযোগিতায় যোগদানকারীর সংখ্যা কয়েক বৎসর অপেক্ষা অপেক্ষাকৃত বিশেষ কম বলে মনে হয় না। ৮ই-এর পরিবর্ত্তে আগামী ১০ই জুলাই এ প্রতিযোগিতা আরম্ভ হবে। পরবর্ত্তী সংবাদে প্রকাশ আরো ৫টি দল যোগদান করেছে। তন্মধ্যে ২টি সামরিক দল। আশা করা অসঙ্গত নয় যে এ বৎসরের প্রতিদ্বন্দ্বীতা প্রতিযোগিতামূলক হয়ে উঠবে।

সর্ব্বসমেত ৫১টি দল এবৎসর যোগদান করেছে।

লীগ খেলায় কার কিরূপ স্থান :—

(রবিবার ৩রা জুলাই পর্য্যন্ত)

	খে	জ	ড্র	প	স্ব	বি	পঃ
মোহনবাগান	১৯	১৪	৪	১	৩৩	৭	৩২
ইঃ বিঃ	২০	১৩	৪	৩	৪১	১৪	৩০
মহমেডান স্পোঃ	১৮	১৩	৩	২	৩০	৬	২৯
বি এণ্ড এ আর	১৯	১১	৩	৫	৩১	১৯	২৫
কালীঘাট	২০	৮	৩	৯	১৭	২০	১৯

ইত্যাদি

গত সপ্তাহের খেলা

মহমেডান দলের অগ্রগতি গত বুধবার ২৮শে জুন প্রতিহত হয়েছে। ইঃ বিঃ দলের বিরুদ্ধে মহমেডান দল প্রতিদ্বন্দ্বীতা করে অমীমাংসিতভাবে খেলা শেষ করে। এ দিন মহমেডান দল ১টি প্রয়োজনীয় পয়েন্ট নষ্ট করেছে। এ দিনের খেলায় সর্ব্বাগ্রে প্রশংসা করা উচিত ইঃ বিঃ দলের মধ্যভাগের খেলোয়াড়দের। এতদিন পর এই বিশেষ দিনে এঁদের খেলা আকর্ষনীয় হয়ে উঠে, ফলে মহমেডান দলের আক্রমণ বিভাগকে বিশেষ পরিশ্রম স্বীকার করতে হয়। মহমেডান দলও এদিনে কয়েকটি অব্যর্থ সুযোগ নষ্ট করে। ইঃ বিঃ দলের গোলরক্ষক অমিতাভের খেলাটি অতীব দর্শনীয় হয়ে ওঠে। ইঃ বিঃ দলের পি, দাসগুপ্ত এবং পি, চক্রবর্ত্তী-র খেলাও ভাল হয়। সুশীল চ্যাটার্জীর কয়েকটি প্রচেষ্টা সফল হয়ে উঠবার সুযোগ পায়নি, আমীন প্রভৃতি প্রতিপক্ষ দলের খেলোয়াড়দের মারাত্মক "ফাউলে"। পাগসলীর অনুপস্থিতি বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করা যায়। ইঃ বিঃ দল গত সোমবার ৩রা জুলাই বি এণ্ড এ আরের বিপক্ষে ১—১ গোলে খেলা শেষ করে। লীগ প্রতিযোগিতায় তাদের অগ্রবর্ত্তিতা আরও নষ্ট হল ১ পয়েন্টের জন্য। এ দিন কে, দত্ত অনেক দিন পর যোগদান করেন এবং রেলদলের আলাউদ্দিনের একটি আক্রমণ প্রচেষ্টা প্রশংসনীয় ভাবে ব্যর্থ করেন। বি, কর আলাউদ্দীনের সুন্দর "পাসিং" থেকে প্রথমে গোল করেন কিন্তু শেষ মুহূর্ত্তে পাগসলী গোলটি পরিশোধ করায় ২ দলই ১টি করে পয়েন্ট সংগ্রহ করে। অনেকের মতে এই গোলটি অফ-সাইডে হয়। মোহনবাগান দল এ সপ্তাহে এরিয়ানের বিরুদ্ধে ৩—১ গোলে জয়লাভ করে। বি, বোস ২টি এবং এ, ব্যানার্জী একটি গোল দেন। মোহনবাগান দলের কয়েকটি বিশিষ্ট খেলোয়াড় আহত হওয়ায় এ দলের বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে। এরিয়ান পেনালটীতে একটা গোল পরিশোধ করে।

শিবদাস বিজয়দাস শীল্ড

বাঙ্গলার এই অসাধারণ খেলোয়াড় ২টির নাম সংযুক্ত করে একটি প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হয়েছে। ৫ ফিট ২ ইঞ্চির নিম্নতন খেলোয়াড়রা এতে যোগদান করতে পারেন। ছোট ছেলেদের মধ্যেই এ প্রতিদ্বন্দ্বীতাটি সীমাবদ্ধ। উদ্যোক্তা বোসপাড়া স্পোঃ ইউঃ ক্লাব।

অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলিলাম—জ্যাঠা মহাশয়, যে প্রতিবাদ করবার সে নীরবে অসহ্য যন্ত্রণার মাঝে নিজের জীবন উৎসর্গ ক'রে প্রতিবাদ করে গেছে। আশা করি সংসার-রংগমঞ্চে তার এই নিজেকে বলি দেওয়া যেন আমাদের ভবিষ্যৎ সম্প্রদায়ের চোখ খুলে দেয়, যেন তার উৎসর্গই শেষ উৎসর্গ হয়।

প্রমদাচরণ আর কিছু বলিলেন না, তাঁর দুচোখ বহিয়া তখন জল গড়াইতেছে।

পোষাক পরিচ্ছদ

ইংরেজী বর্ণমালা প্যাটার্ণ

শ্রীমতী গায়ত্রী দেবী

"S"

(১১ ঘরে উঠিবে)

১ম কাঁটা—৬ ঘর সাদা, ৪ ঘর কাল, ১ ঘর সাদা।

২য় কাঁটা—১ ঘর কাল, ৪ ঘর সাদা, ২ ঘর কাল, ৪ ঘর সাদা।

৩য় কাঁটা—৪ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ৪ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ১ ঘর সাদা।

৪র্থ কাঁটা—৪ ঘর সাদা, ৫ ঘর কাল, ২ ঘর সাদা।

৫ম কাঁটা—১ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ১ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ৩ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ৩ ঘর সাদা।

৬ষ্ঠ কাঁটা—৩ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ৪ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ১ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল।

৭ম কাঁটা—২ ঘর কাল, ২ ঘর সাদা, ৩ ঘর কাল, ৪ ঘর সাদা।

"T"

(১২ ঘরে উঠিবে)

১ম কাঁটা—৮ ঘর সাদা, ৩ ঘর কাল, ১ ঘর সাদা।

২য় কাঁটা—১ ঘর কাল, ৩ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ৭ ঘর সাদা।

৩য় কাঁটা—৬ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ৩ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ১ ঘর সাদা।

৪র্থ কাঁটা—৫ ঘর সাদা, ২ ঘর কাল, ৫ ঘর সাদা।

৫ম কাঁটা—৫ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ২ ঘর সাদা, ২ ঘর কাল, ২ ঘর সাদা।

৬ষ্ঠ কাঁটা—১ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ৫ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ৪ ঘর সাদা।

৭ম কাঁটা—১ ঘর সাদা, ৯ ঘর কাল, ২ ঘর সাদা।

"U"

(১২ ঘরে উঠিবে)

১ম কাঁটা—২ ঘর সাদা, ২ ঘর কাল, ২ ঘর সাদা, ২ ঘর কাল, ৪ ঘর সাদা।

২য় কাঁটা—৩ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ২ ঘর সাদা, ২ ঘর কাল, ২ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ১ ঘর সাদা।

৩য় কাঁটা—৩ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ৪ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ৩ ঘর সাদা।

৪র্থ কাঁটা—১ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ২ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ৩ ঘর সাদা, ২ ঘর কাল, ২ ঘর সাদা।

৫ম কাঁটা—১ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ১ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ২ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, [illegible] সাদা, ১ ঘর কাল, ১ ঘর সাদা, [illegible] কাল।

৬ষ্ঠ কাঁটা—১ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ৩ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ৩ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ১ ঘর সাদা, ১ঘর কাল।

৭ম কাঁটা—১ ঘর সাদা, ১ ঘর কাল, ৫ ঘর সাদা, ৩ ঘর কাল, ২ ঘর সাদা।

নানাকথা

ব্রজগোপাল বালক সঙ্ঘ

গত রবিবার ২রা জুলাই অপরাহ্ন ৫৷৷০ ঘটিকায় ৫৭এ কৈলাস বোস ষ্ট্রীটে সঙ্ঘের মাঠে জটীরাম ও গুরুচরণ স্মৃতি হাডুডু প্রতিযোগিতার পরিসমাপ্তি হয়। সুকবি বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উক্ত অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য ও পুরস্কার বিতরণ করেন। এই অনুষ্ঠানে নৃত্যগীত, ব্যায়াম, লাঠি খেলা প্রভৃতি নানাবিধ আনন্দোৎসবের আয়োজন ছিল।

কয়লা নিয়ন্ত্রণ

কয়লার দুষ্প্রাপ্যতা হেতু গভর্ণমেন্টের আদেশ অনুসারে গত সপ্তাহ হইতে সব সিনেমায় স্লাইড প্রদর্শন নিষিদ্ধ হইয়াছে। প্রত্যেক সিনেমায় প্রত্যেক প্রদর্শনীতে ৭।৮ মিনিট করিয়া স্লাইড প্রদর্শন বন্ধ করিলে বিদ্যুতের খরচ অনেকখানি কম হইবে, ফলে কয়লাও অনেক বাঁচিবে। শুধু কয়লার দ্বারা যে সব জায়গায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয় এ নিয়ম শুধু সেই সব দেশেই প্রযোজ্য। শোনা যাইতেছে, গভর্ণমেন্ট নাকি শীঘ্রই একটি বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ আদেশ জারী করিবেন।

'মিলন-বীথি'তে শোকসভা

গত ২৩শে জুন, শুক্রবার, সন্ধ্যা ৭৷৷০ ঘটিকায় ডাঃ পি, সি, মিত্র এম-এ,পি-এইচ-ডি (বার্লিন), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক মহাশয়ের সভাপতিত্বে মিলন-বীথিতে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের তিরোধানে একটি মহতী শোক-সভা হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও কালী সেন প্রভৃতি অনেকেই আচার্য্যদেবের পরলোকগত আত্মার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেন। তার পর সভাপতি মহাশয় কর্ত্তৃক একটি সুচিন্তিত বক্তৃতার পর সভাপতিকে ধন্যবাদান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

ইণ্ডিয়ান আর্ট ডিসপ্লে

গত ২৭শে জুন সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় রঙমহল মঞ্চে উক্ত প্রতিষ্ঠানের নবম বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। গৌরীপুরের কুমার বীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী এম-এল-সি প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন। সম্পাদকের বার্ষিক বিবরণী পাঠের পর প্রধান অতিথি মহাশয় একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। তারপর উক্ত প্রতিষ্ঠানের শিল্পীবৃন্দ ছাড়াও অন্য ২১ জন খ্যাতনামা শিল্পী নৃত্যগীত এবং বাদ্যে অংশ গ্রহণ করেন। তন্মধ্যে উক্ত প্রতিষ্ঠানের শীলা চট্টোপাধ্যায়ের ইন্দ্র-নৃত্য এবং তাঁহার ঠুংরী গান সকলের প্রশংসা অর্জ্জন করে। তাহা ছাড়া ধীরেন্দ্র মিত্র তাঁহার সুললিত কণ্ঠে সকলকে প্রীত করেন। মহম্মদ হোসেন (গান), রতন সরকার (সেতার), দুলাল কর (স্বরোদ) তাঁহাদের কৃতিত্ব প্রকাশ করেন।

হিন্দুস্থান কো অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটি

গত ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৪৩ সোসাইটীর যে বৎসর শেষ হইয়াছে আমরা তাহার ব্যালান্স সীট প্রাপ্ত হইয়াছি—সেই ব্যালান্স সীটটি ৩৭শ বার্ষিক সাধারণ মিটিং-এ গৃহীত হইয়াছে। নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে সোসাইটীর অভাবিত উন্নতি সর্ব্বতোভাবে প্রশংসনীয়।

১। এই বৎসরে নূতন কার্য্যের পরিমাণ ৫ কোটি ১১ লক্ষ টাকা—পূর্ব্ব বৎসরে ছিল ২ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা—অর্থাৎ ১৯৪২ সাল হইতে ৪৩ সালে শতকরা ৮৫ টাকা বৃদ্ধি।

২। মোট প্রিমিয়াম আদায় ১ কোটি ১২ লক্ষ এবং মোট আয় (লগ্নী আয় সমেত) ১ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা।

৩। বীমা তহবিল পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ৬৭ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ৫ কোটি ৪২ লক্ষ টাকারও বেশী দাঁড়াইয়াছে। রিজার্ভ ফাণ্ডের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে প্রায় ১২ লক্ষ টাকা।

৪। সোসাইটী কোম্পানীর কাগজ এবং অন্যান্য অনুমোদিত সিকিউরিটিতে যে সমস্ত টাকা খাটাইতেছেন তাহা বীমা-আইনের নির্দ্দেশমতই হইয়াছে। প্রত্যেকটি লগ্নী ব্যাপারই বিশেষ সতর্কতার সহিত করা হইয়াছে।

৫। বোনাসসহ মেয়াদী বীমার দাবী মেটানো হয় ১৬ লক্ষ টাকার উপর এবং বোনাস-সহ জীবন বীমার দাবী মেটানো হয় ১৪২ লক্ষ টাকার উপর।

৬। বর্ত্তমান উচ্চ হারে ইনকম্ ট্যাক্স এবং সুপার ট্যাক্স দেওয়া সত্ত্বেও শতকরা ৪'৬৩ হারে সোসাইটি সুদ অর্জ্জন করিয়াছে। হিন্দুস্থানের এই সাফল্য গৌরবে বাঙালী মাত্রেরই গর্ব্ব অনুভব করা উচিত।

মেঘদূত উৎসব

(নাটোর)

গত ১লা আষাঢ় নাটোরের মুন্সেফ শ্রীযুত ফটিকচন্দ্র রায় চৌধুরীর উদ্যোগে ও নাটোরের খ্যাতনামা বৃদ্ধ কবি 'মেঘদূতের' বঙ্গানুবাদক পণ্ডিত শ্রীযুত রঘুনাথ শুক্লা মহাশয়ের সভাপতিত্বে 'মেঘদূত উৎসব' অনুষ্ঠিত হয়। মুন্সেফবাবু, পণ্ডিত শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ ও শ্রীযুত নিরঞ্জন সাহা মহাকবি কালিদাস ও মেঘদূত সম্বন্ধে প্রবন্ধ এবং শ্রীযুত গজেন্দ্রনাথ কর্ম্মকার কাব্যরত্ন, মোহাম্মদ হামার উদ্দিন ও শ্রীমান প্রতিভা কুমার চক্রবর্ত্তী কবিতা পাঠ করেন। কুমারী নমিতা সিদ্ধান্ত মেঘদূতের কিয়দংশ আবৃত্তি, শ্রীযুত নৃপেন চক্রবর্ত্তী কবি-বন্দনা, শ্রীযুত জগদীশ্বর রায়, শ্রীগোবিন্দ সাহা ও সভাপতির বক্তৃতা-শেষে গানের জলসা হয়।

নাটমণ্ডপ

চিত্রভারতীর "শেষ-রক্ষা"

চিত্রভারতীর আগামী নিবেদন 'শেষ-রক্ষা' ছবিতে কমলমণির ভূমিকায় চিত্রাবতরণ করিয়াছেন শ্রীমতী পদ্মা দেবী।

প্রৌঢ় ডাক্তার শিবচরণের ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছেন অমর মল্লিক। নিউ থিয়েটার্সের বাইরে এই তাঁর প্রথম চিত্রাবতরণ। ছবিখানি রূপবাণীতে পরবর্তী আকর্ষণ হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে।

সহরের সিনেমায়

নিউ থিয়েটার্সের বহু প্রশংসিত 'ওয়াপস্' এখনও চলিতেছে চিত্রা ও নিউ সিনেমায়। আগামী কল্য হইতে ২৮শ সপ্তাহ আরম্ভ হইবে। ওয়াদিয়া মুভীটোনের 'বিশ্বাস' গণেশে ৭ম সপ্তাহে পড়িল। মেহতাব, সুরেন্দ্র ও বেবী মাধুরীর অভিনয় ও গান সহজে ভুলিবার নয়। উত্তরায় 'মাটীর ঘর' বিপুল উৎসাহে চলিতেছে। ম্যাজেষ্টিক, মিনার্ভা ও সিটিতে 'পাগলী দুনিয়া' বেশ ভাল রকম আসর মাতাইয়া রাখিয়াছে।

আগামী চিত্রাবলী

নিউ থিয়েটার্সের "উদয়ের পথে" অবিলম্বে চিত্রায় মুক্তি প্রতীক্ষায়। প্রধান পিকচার্সের "দাসী" মিনার্ভা সিনেমায় পরবর্তী আকর্ষণ বলিয়া বিজ্ঞাপিত হইয়াছে।

শীঘ্রই জ্যোতি ও ছায়া সিনেমায় বম্বে টকীজের "চার আঁখে" মুক্তিলাভ করিবে। জয়রাজ ও লীলা চাৎনিশকে নায়ক ও নায়িকার ভূমিকায় দেখা যাইবে।

নির্ম্মীয়মান চিত্র

"গৃহলক্ষ্মী"—শ্রীভারতলক্ষ্মী
"প্রতিকার"—নিউ সেঞ্চুরী
"নন্দিতা"—রূপশ্রী লিঃ
"অভিনয় নয়"—কালী ফিল্মস
"তকরার"—আর্ট ফিল্মস
"মেরা বহিন"—নিউ থিয়েটার্স
"দুই পুরুষ"— ঐ
"বন্দিতা"—নিউ টকীজ লিঃ
"সন্ধি" ও "মূল্য"—চিত্ররূপা লিঃ
"সন্ধ্যা"—অরোরা ফিল্ম

দীপালীর স্বত্বাধিকারী শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত, ১২৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, দীপালী প্রেসে মুদ্রিত ও দীপালী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

প্রধান সম্পাদক—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় :: সহঃ সম্পাদক—শ্রীশ্রীরেন্দ্রমোহন মজুমদার বি. এল.

১৬শ বর্ষ VOL. XVI. } ১৪ই অগ্রহায়ণ ১৩৫১ :: November 30, 1944 { ৪৮শ সংখ্যা No. 48

দীপালীর চাঁদার হার

প্রতি সংখ্যা	···	চার আনা
ডাকে	···	সাড়ে চার আনা
বার্ষিক চাঁদা	···	১২।০
ষাণ্মাষিক „	···	৬।০
ত্রৈমাসিক „	···	৩।০

লেখকদের প্রতি

১। গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা বা যে-কোনো রস-রচনা দীপালীতে প্রকাশার্থ লেখকরা পাঠাইতে পারেন।

২। অমনোনীত রচনা ছিঁড়িয়া ফেলা হয়। অবশ্য যদি সঙ্গে উপযুক্ত ডাক টিকিট থাকে তবেই তাঁহাকে রচনা ফেরৎ দেওয়া হয়।

৩। প্রত্যেক রচনার সহিত লেখকের নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট ভাবে লিখিতে হইবে।

এজেন্সীর নিয়মাবলী ও বিজ্ঞাপনের হার সম্বন্ধীয় অনুসন্ধানের জন্য পত্রালাপ করুন :

ম্যানেজার, দীপালী

১২৩/১ আপার সার্কুলার রোড

কলিকাতা

ফোন : বড়বাজার ৩২৫৩

টেলিগ্রাম : DIPALI

দীপালীর কথা

বর্ত্তমান সংখ্যা হইতে "দীপালী" পুনরায় বর্দ্ধিত কলেবরে আত্মপ্রকাশ করিল। দীর্ঘ আবেদনের পর আমরা ভারত সরকারের দপ্তর হইতে এ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় অনুমতি-পত্র পাইয়াছি। বিলম্ব হইলেও নয়া দিল্লীর কর্ত্তৃপক্ষকে ইহার জন্য আমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি।

* * * *

গত এপ্রিল মাসে আমরা সরকারী নির্দ্দেশে "দীপালী"র পৃষ্ঠাসংখ্যা চব্বিশ ও মূল্য চারি আনা ধার্য্য করি। এই পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া আমরা ভাবিয়াছিলাম অতঃপর হয়তো নিরুদ্বেগে পত্রিকা প্রকাশ সম্ভব হইবে। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা ছিল অন্যরূপ। এপ্রিল হইতে মাত্র ৬ই জুলাই পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত আকারে ও মূল্যে "দীপালী" প্রকাশিত হয়। তাহার পর কাগজ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত বিবিধ আইন ও আদেশের মর্য্যাদা রাখিতে গিয়া আমরা ৬ই জুলাই "দীপালী"র শেষ সংখ্যা প্রকাশ করিয়া অনিচ্ছিত নির্ব্বাসন বরণ করিয়া লই।

* * * *

ইহার পূর্ব্বে গত ১২ই জুন ইণ্ডিয়া গেজেটে "Paper Control (Economy) Order" প্রকাশিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহা সারা ভারতে বলবৎ হইয়া সাময়িকপত্রের জগতে একটা অদ্ভুত অনিশ্চয়তা ও আন্দোলনের সৃষ্টি করে। তিন সপ্তাহ কাগজ বন্ধ রাখিবার পর গত ৩রা আগষ্ট এই নবতম পেপার কণ্ট্রোল ইকনমি অর্ডারের নির্দ্দেশ সর্ব্বাঙ্গে অক্ষরে অক্ষরে বহন করিয়া ১২ পৃষ্ঠার বিশীর্ণ "দীপালী" বাজারে বাহির হয়। সাময়িকের ক্ষেত্রে "দীপালী" ভিন্ন অন্য কোন পত্রিকা এতখানি আইনানুবর্ত্তিতা দেখাইয়াছে কি না জানি না, কিন্তু এতৎসত্ত্বেও তাহাকে ভুগিতেও বড় কম হয় নাই, ইহাই আজ আশ্চর্য্য মনে হইতেছে। গত ৬ই জুলাই দীপালীর শেষ সংখ্যা প্রকাশ করিয়া যখন আপাততঃ আমরা পত্রিকা প্রকাশ স্থগিত রাখিবার সিদ্ধান্ত করি তখন গভীর বেদনার সহিত আমরা উপলব্ধি করিয়াছিলাম যে, আইনানুযায়ী বরাদ্দ কাগজদ্বারা পত্রিকা প্রকাশ করা অসম্ভব। অন্ততঃ পত্রিকা প্রকাশ সম্বন্ধে আমরা যে ধারণা পোষণ করি আইনের নির্দ্দেশ পালন করিতে হইলে তাহার বিন্দুমাত্র মর্য্যাদা রক্ষিত হইবে না।

* * * *

গত ৬ই জুলাইয়ের পর "দীপালী"র সেবার ধারাবাহিকতায় সাময়িকভাবে যে ছেদ আসে, সেই অনভিপ্রেত অবকাশে আমরা বুঝিয়াছিলাম জনসাধারণের সহিত আমাদের

যোগাযোগ কতখানি বিস্তৃত ও নিবিড়। এ অভিজ্ঞতারও প্রয়োজন ছিল। এই সময়ে আমাদের বহু গ্রাহক, এজেন্ট ও বিজ্ঞাপন-দাতা সংক্ষিপ্ত আকারেও "দীপালী" প্রকাশিত হউক এইরূপ জানান। সাময়িকের জগতে তখন গভীর নৈরাশ্য ও বেদনার ছায়া ঘনাইয়া আসিয়াছে। এই দুর্দিনে ইঁহাদের প্রীতি ও সহৃদয়তার এই পরিচয় দূরাগত ক্ষীণ আলোকরেখার মত মনে হইল। শেষ পর্য্যন্ত মাত্র ১২-পৃষ্ঠা সম্বল করিয়াই আমরা গত ৩রা আগষ্ট হইতে আবার যাত্রা সুরু করিলাম।

* * *

এই কয়েকমাস খণ্ডিত ও বিশীর্ণকায় পত্রিকাকে কতখানি কৃচ্ছ্রসাধন ও সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতে হইয়াছে তাহা জনসাধারণ ও কর্তৃপক্ষকে বুঝাইবার উপায় নাই। ইহা শুধু সম্ভব হইয়াছে আমাদের বিজ্ঞাপনদাতাগণের সত্যকারের সহানুভূতি ও সহযোগিতায়। এই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে আজ "দীপালী" গৌরব অনুভব করিতেছে। দুর্দিনের তমসায় যাঁহাদের সহিত "দীপালী"র হৃদয়ের গ্রন্থিবন্ধন হইয়াছে, এই মধ্যরাত্রিশেষে তাঁহাদের সহিত আমাদের সম্বন্ধ আরও ব্যাপক ও গভীর হইবে ইহা আমরা কামনা করিতেছি।

* * *

আজ অপেক্ষাকৃত সুস্থ কলেবরে "দীপালী" আত্মপ্রকাশ করিল। আগামী বর্ষ হইতে ইহাকে সংবাদ, সাহিত্য ও চিত্রে অধিকতর মনোজ্ঞ করিয়া তুলিবার জন্য কর্তৃপক্ষ চিন্তা করিতেছেন। এ সংবাদ আমরা পাঠকগণকে আনন্দের সহিত জানাইতেছি। বর্ত্তমানে ভারতব্যাপী শিল্প ও ব্যবসায়ের নবজন্মের বেদনা প্রত্যক্ষ করিতেছি। যুদ্ধোত্তর কালে এ দেশে যে শিল্প-জাগরণ সম্ভব হইবে তাহার পতাকাবাহী হইবে দেশের সাময়িক ও সংবাদপত্র। সাধারণ নিয়মে "দীপালী"কে তাহার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। শিল্প সম্ভারের প্রচারের দিক দিয়া তাহার কলা-সম্মত দৃষ্টিভঙ্গী ও অভিজ্ঞতার যে-টুকু মূল্য তাহা স্বীকৃত হইয়াছে সত্য। কিন্তু আগামী কালে এই পত্রিকাকে দেশের শিল্প ও ব্যবসায়ের বর্দ্ধিত দাবীর সহিত পা ফেলিয়া চলিতে হইবে তাহার বহু লক্ষণ দেখা যাইতেছে। এদিক দিয়াও "দীপালী"র প্রচেষ্টা চলিতেছে, ইহা উল্লেখ করা প্রয়োজন।

"দীপালী"র সহিত দূষিত সাম্প্রদায়িকতার সম্পর্ক নাই। আমরা রাষ্ট্রনীতি লইয়া অর্থহীন কলরব করিয়া আসর জমাইবার পক্ষপাতী নই। সমালোচনা আমাদের করিতে হইবে — সংবাদ-সাহিত্যের আসরে তাহা অনিবার্য্য। আমরা খ্যাতনামা Harold J. Laski-এর কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতে চাই—

"The degree, in fact, to which a State, permits criticism of its authority is the surest index to its hold upon the allegiance of the community." অর্থাৎ গবর্ণমেণ্ট জন-সাধারণকে সমালোচনা করিবার যে পরিমাণ অধিকার দেয় তদ্বারা রাষ্ট্রের প্রতি সাধারণের আনুগত্যের পরিমাণ ও চেহারা বোঝা যায়। "দীপালী"র সমালোচনায় দলগত রাষ্ট্রনীতি উদ্দেশ্যমূলক ভাবে কাহাকেও আঘাত করিবার প্রবৃত্তিকে আমরা সাংবাদিক বৃত্তির চরম বলিয়া মনে করি নাই। স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া দীপালীর সংবাদ-সাহিত্য বিভাগ পরিচালিত হইবে—আজও আমরা এই কথার পুনরাবৃত্তি করিতেছি। পত্রিকার পরিচালন-নীতি সম্পর্কে এই কয়েকটি কথার উল্লেখ আজ প্রয়োজন ইহা আমরা মনে করি।

ছোট গল্প

—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

স্বামী ও স্ত্রী এই নিয়েই সংসার। অবস্থা তাদের মোটেই ভাল নয়। স্বামীর নাম কমল ও স্ত্রীর নাম সুনন্দা।

সেদিন যেন কিসের ছুটি। কমলবাবু বাড়ীর রকে বসে গল্প করছিলেন। এমন সময় একটি ভৃত্য একখানি পত্র তার হাতে দিল। খামের উপর তার স্ত্রীর নাম লেখা।

সুনন্দা চিঠিখানি পড়ে কমলবাবুর হাতে দিলেন। চিঠিটা এই রকম :—

সুনন্দা ;

এই চলন্ত মাসের……তারিখে আমার জন্মদিন। আসতে ভুলে যাবি না নিশ্চয়ই।

অনামিকা

*

অনামিকার আজ জন্মদিন। বাপের একমাত্র মেয়ে। অবিবাহিতা, পয়সার অভাব ছিল না। বহু বন্ধু আমন্ত্রিত হয়েছিল এইদিনে—সুনন্দা তাদের মধ্যে একজন।

অনামিকা—আমাকে এখনও ভুলিস নি তাহলে!

সুনন্দা—তোকে কখন ভুলতে পারি?

অ—বিয়ের পরই অনেক বন্ধুই ত ভুলে যায়। তা যাই হোক বিয়ের সময় ত' খাওয়ালি না, কবে খাওয়াবি বল?

সুনন্দার বিয়ের সময় সত্যই ওরা কাউকে নেমন্তন্ন করে নি—আর্থিক অস্বচ্ছলতা হেতু।

সু—যবে তোর ইচ্ছে।

অ—শীঘ্রই রেঙ্গুন যাচ্ছি—তার মধ্যে একদিন যাব। যাওয়ার আগে খবর পাঠাব।

দশ বার দিন পরে—

অনামিকা খবর পাঠিয়েছে যে, সে পরশু দিন সুনন্দাদের বাড়ী খেতে আসবে।

সুনন্দা ভীষণ মুস্কিলে পড়ল—কেন না তাদের হাতে একটিও পয়সা নেই। আর খাওয়াতে হলে তার সমস্ত বন্ধুদেরই খাওয়াতে হবে। আজেই ২০০।৩০০ টাকার প্রয়োজন।

অনেক ভেবে চিন্তে সে তার স্বামীকে অনুরোধ করল—টাকা ধার করবার জন্য।

*

অনেক কষ্টে তার স্বামী টাকা জোগাড় করল।

*

আজ খাওয়ান'র দিন। বাড়ীতে আজ হৈ চৈ পড়ে গেছে।

ক্রমে ক্রমে বারটা বাজল। বারটার সময়ই তার বন্ধুদের আসবার কথা।

সুনন্দা অপেক্ষা করতে লাগল……

হঠাৎ বাড়ীতে কড়া নাড়ার শব্দ হল। একজন ভৃত্য একখানি পত্র সুনন্দার হাতে দিল।

সুনন্দা ;

অনিবার্য্য কারণবশতঃ আমাকে আজই রেঙ্গুন যেতে হল। আর বাকী যাদের কথা ছিল তারাও যাবে না, কেননা তারা আমাকে জাহাজে পৌঁছে দিতে এসেছে। অপরাধ মার্জ্জনা করিস্।

অনামিকা

সুনন্দা তখন ভাবতে লাগল টাকা ধার করবার কথা।

১ তা যাক, ওরা যে অন্ততঃ সুস্থ শরীরে পৌঁছেছে এই যথেষ্ট।

২ সতীশ বাবুকে অফিসের কাজে এর আগে দু'একবার কলকাতায় যেতে হয়েছে। তিনি জানেন রেলে যাতায়াত আজকাল কি কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আজকাল অত্যাবশ্যক যানবাহন চলাচলের ব্যবস্থাই সর্বাগ্রে করতে হচ্ছে বলে সাধারণ লোকের পক্ষে ভ্রমণ হয়ে দাঁড়িয়েছে একটা কষ্টসাধ্য ব্যাপার।

AAA 863

অযথা ভ্রমণ পরিহার করুন

প্রত্যাখ্যান

(উপন্যাস)

শ্রীসুধাংশু কুমার হালদার, আই, সি, এস্

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(১০)

পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের চুম্বক : মাতৃবিয়োগের পর অসীম তাহার বাড়ী, বাগান প্রভৃতি নামমাত্রমূল্যে বিক্রয় করিয়া কলিকাতায় তাহার মাতুল ব্যারিষ্টার মিঃ চৌধুরীর নিকট গেল। সেখানকার 'এরিষ্টোক্রেটিক সোসাইটী'তে দু' এক দিন ঘোরাফেরা করিয়া দেখিল যে তাহার স্থান এখানে নয়। মিঃ চৌধুরী প্রদত্ত এক পার্টিতে তাহার সহিত আলাপ হইল মিসেস ঘোষের ও তাঁহার কন্যা নমিতার সঙ্গে। মিসেস ঘোষের বিপুল ঐশ্বর্য্যের খ্যাতি এবং নমিতার রূপ ও গুণের খ্যাতি দেশে প্রসারিত। মিসেস ঘোষ নমিতাকে অসীমের হাতে তুলিয়া দিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিলেন। কারণ অসীমের দীর্ঘ বলিষ্ঠ গৌরবর্ণ দেহ এবং অস্বাভাবিক চরিত্র-মাধুর্য্যে মাতা ও কন্যা উভয়েই হইলেন মুগ্ধ। কিন্তু অসীম নমিতাকে প্রত্যাখ্যান করিল মিসেস ঘোষের মসীলিপ্ত অতীতের জন্য নহে, নমিতার মধ্যে সে এমন একটি নারী দেখিয়াছিল যাহার মধ্যে আছে তাহার মা, ভগিনী ও অনাগত কন্যার মূর্ত্তি।

এই "সোসাইটী'র হাত এড়াইবার জন্য অসীম সাঁওতাল পরগণার পলাশননা গ্রামে গিয়া কাঠের ব্যবসায় ফাঁদিয়া বসিল। সেখানে অপ্রত্যাশিত ভাবে আলাপ হইল আধুনিকা সুন্দরী ও বিদুষী মল্লিকা বসুর সঙ্গে। দুজনের প্রকৃতির মধ্যেই অদ্ভুত মিল উদ্দাম, গতিশীল এবং আত্মনির্ভর। এই দুজনেই যেন দুজনকে যুগযুগান্ত ধরিয়া খুঁজিতেছিল এবং উভয়েরই উভয়ের অন্তরে আসন সুপ্রতিষ্ঠা করিয়া লইতে দেরী লাগিল না।

এদিকে অসীমের প্রত্যাখ্যানে মিসেস ঘোষ এত বেশী আঘাত পাইলেন যে তিনি শয্যা গ্রহণ করিলেন, এবং সে শয্যা হইতে আর উঠিলেন না।

তারপর—

অমিতার দিন যে কেমন ক'রে কেটেছে তা তিনিই জানেন। তাঁর প্রথম মনে হয়েছিল তাঁর বাপের কথা। তিনি নাকি বিদেশে থাকেন। কোথায় সেই বিদেশ? কর্ম্মচারীদের ডেকে জিগেস করলেন। তারা কোনো খোঁজ রাখে না। শম্ভু চাটুয্যে টাকে হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, "না, তুমি শৈশবেই পিতৃহীনা।"

"তবে, মায়ের এই যে সধবার মতো বেশ, আচরণ?"

"সে কথা আজ নয় মা, আর একদিন হবে।"

বাড়ীতে কত লোকের আনাগোনা, কত বন্ধু সমবেদনা জানাতে এলেন, কত জনে কত উপদেশ দিয়ে গেলেন, নমিতা শুধু ছবির মত চুপ ক'রে বসে রইলেন। মায়ের সঙ্গে নমিতার খুব অন্তরঙ্গ পরিচয় না থাকলেও, হাজার হোক মা তো! তিনি থাকতেন যেন এক ভিন্ন জগতে, নমিতার মনে হত, যেন তিনি ইচ্ছা করেই নিজেকে দূরে রেখেছেন। ক্লাবজেন, খোঁজ হয় সংসারের কাজকর্ম্মের চাপে মায়ের অবসর মোটেই ছিল না, যাতে মেয়ের সঙ্গে অবাধে মেশা যায়। কিন্তু একটি জিনিষ সর্বদা চোখে পড়েছে, তার সম্বন্ধে মায়ের সদা-জাগ্রত দৃষ্টি। খাওয়া পরা থেকে আরম্ভ ক'রে নমিতার সমস্ত বিষয়ে কোনো অভাব অনুভব করবার আগেই আড়াল হ'তে মা দিতেন তা পূর্ণ ক'রে। নমিতা ভাবতেন, মা কি অন্তর্য্যামী! কেমন ক'রে জানতে পারেন আমার ঠিক কোন্ জিনিষটার অভাব! পশুপক্ষীর উপর মিসেস ঘোষ কোনোদিনই প্রসন্ন ছিলেন না, তিনি ভাবতেন, ঈশ্বরের সৃষ্ট জীবজগতে এরা হচ্ছে নিরবচ্ছিন্ন আপদ, এবং যতটা সম্ভব দূরে রাখাই বিধেয়। তাই পাড়া-প্রতিবেশীর কুকুর বেড়াল এসে ঘরে ঢুকলেই তাঁর হুকুমে চাকরেরা 'মার মার' শব্দে তেড়ে যেত। কাকদের তাড়া ক'রে ফিরত লাঠি হাতে দারোয়ান, চড়াই পাখীতে ঘর নোংরা করে পাছে, তাই বারান্দার ফাঁকটা সরু তারের জাল দিয়ে ঢাকা ছিল। কিন্তু নমিতার কুকুরের, নমিতার বেড়ালের, নমিতার হরিণের ছিল সাত খুন মাফ। একদিন মিসেস্ ঘোষ দেখতে পেলেন, একটা তিন-ঠেঙো কুকুর বাগানের লনের ওপর খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলেছে। তৎক্ষণাৎ নিজেই গেলেন তাকে তাড়াতে, মালীদের উপর আস্থা না রেখে! কাছাকাছি হ'তেই বুড়ো মালী বেহারী জানালে 'দিদিমণির কুকুর।"

"তাই নাকি" ব'লে উদ্যত যষ্ঠি সংবরণ ক'রে ফিরে গেলেন মিসেস্ ঘোষ। বস্তুতঃ এই তিন ঠেঙ্গোটির প্রতি নমিতার ছিল বিশেষ টান।

কুকুরটি আভিজাত্য বংশীয়ের তো নয়ই, তাছাড়া যে নিগূঢ় কারণে তার চতুর্থ পা'টি কাটা গেছল সে হ'ল এক চৌর্য্যব্যাপার। যেমনি তার কদর্য চেহারা, তেমনি কদর্য্য তার ভাবভঙ্গী। কিন্তু নমিতার পিছু পিছু যখন সে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলত, তাঁর দামী শাড়ীর প্রান্তদেশ ছুঁয়ে ছুঁয়ে, তখন তার সে বাহার দেখলে তারাও হাসত জীবনে যে কোনদিন হাসে নি। এই কুকুরের নাম দেওয়া হয়েছিল 'খুঁড়ী'। একদা গুরু ভোজনের ফলে এই খুঁড়ী অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়ল, এবং এমন সব লক্ষণ দেখা গেল যাতে মনে হ'ল সে তিন ঠ্যাং দিয়েই মহাপ্রস্থানের পথে সবেগে যাত্রা করেছে। নমিতা যখন তাকে ওষুধ খাওয়াচ্ছিলেন তখন দিনের মধ্যে তিন চার বার মিসেস ঘোষ নিজে এসে খুঁড়ীর গায়ে হাত বুলিয়ে গেলেন। নানারকম ওষুধ খেয়েও খুঁড়ী যখন বাঁচল না, তখন নমিতা সবিস্ময়ে দেখেছিলেন মিসেস্ ঘোষের চোখের কোণে জলের আভাস।…আজ নমিতার সে সকল কথা মনে পড়তে লাগল। নিজেকে আড়ালে রেখে এই যে সতত মঙ্গলবিধান,—আজো কি মা তাঁর সজাগ দৃষ্টি মেলে রেখেছেন কোন অদৃশ্যলোক থেকে? কে জানে!

নমিতার মনে হচ্ছিল আর এক জনের কথা। এত যে শূন্যতা, এত যে শোক,—তবু মনে হয় এ শূন্য নয়, এ যেন কার পরিপূর্ণ স্পর্শ দিয়ে ভরা। মা গেছেন, মা তো আর কারো চিরদিন থাকেন না, এই বলে নমিতা মনকে বোঝাচ্ছিলেন। যাবার সময় অসীমের জন্যে মায়ের সে আকুল আগ্রহ নমিতা ভোলেন নি। এই যা কিছু আছে সব একদিন একজনের সেবায় লাগবে, নিজেকেও দেবেন সেই সাথে নিবেদন ক'রে। সব শূন্যতা তখন মধুতে ভরে উঠবে, সব চোখের জল সার্থক হবে। তাঁর

ডাক শুন্‌লে তাঁর বহু প্রয়োজনের ক্ষণে অসীম কি ছুটে না এসে থাকতে পারবে? অসীমের কণ্ঠের সেই 'নমিতা' ডাক, যে কতবড় স্নেহের ডাক নমিতা তা জানেন।...নমিতাকে শুধু ধৈর্য্য ধরে সেদিনটির জন্যে প্রস্তুত হ'য়ে থাকতে হবে, সেদিনটীর উপযুক্ত হতে হবে।

দিন দশেক ধরে নমিতা গুন্ গুন্ ক'রে গাইছিলেন, 'দুঃখতাপে ব্যথিতচিত্তে নাইবা দিলে সান্ত্বনা, দুঃখ যেন করিতে পারি জয়।' শম্ভু চাটুয্যে দূর থেকে নমিতার খোঁজ খবর করছিলেন, কাছে আসেননি পাছে নমিতা বিরক্ত হন এই ভেবে। কিন্তু তারও ঠিক মায়ের মতো সজাগ দৃষ্টি। মা গেছেন, কিন্তু তাঁর এই বৃদ্ধ প্রতিনিধিটিকে রেখে গেছেন।

সেদিন প্রথম নমিতা বাগানে নেমে এসেছেন, পোষা হরিণীটি বেড়ার উপর দিয়ে তাঁর দিকে গলা বাড়িয়ে দিয়ে বড় বড় চোখে চেয়ে আছে। বর্ষাধোয়া সকালের সূর্য্যের আলো এসে পড়েছে গোল্ডমোহর গাছের চূড়ায় চূড়ায়। শম্ভু চাটুয্যে খুব খুসী হলেন নমিতাকে দেখে, টাকে হাত বোলাতে বোলাতে কাছে এসে দর্শন দিলেন।

"একটু বেড়িয়ে আসবে খুকি, ড্রাইভারকে বলব গাড়ী আনতে? কতদিন তো বাড়ী থেকে বেরোওনি।"—শম্ভু নমিতাকে কখনো ডাকেন 'খুকী', কখনো ডাকেন 'খুকু মা', কখনো শুধু 'মা'।

"না বড়মামা, আমার কত কাজ পড়ে আছে, এখন কি বেড়াতে যাবার সময়?—কি যে বল তুমি!"

"তাই তো মা, আমি সে কথা ভুলেই গেছলুম। বুড়োর বুদ্ধি শুদ্ধি কি আর আছে কিছু! সব গুলিয়ে গেছে। কত কাজ যে আমারো পড়ে আছে! তা আমার মনেই ছিল না, তোমার মতো কচি মেয়েকে তা মনে করিয়ে দিতে হ'ল।"

"কচি মেয়েই বটে, কুলোয় শুয়ে দুধ খাই।"

"ঠাট্টা নয় মা, তোমার এত কম বয়সে এই দারুণ শোক তুমি যেমন মুখ বুঁজে সহ্য করছ, আমরা বুড়োরা তা পারি না। আজ ক'দিন ধরেই আমরা সে কথা সবাই মিলে বলাবলি করছি।"

"আচ্ছা বড়মামা, আমার চিত্রা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছে আজ আমার মা নেই। নইলে ও অমন ক'রে আমার দিকে তাকাচ্ছে কেন?"—নমিতার হরিণীর নাম চিত্রা।

"নিশ্চয় বুঝতে পেরেছে।"

"আচ্ছা বড়মামা, কেমন ক'রে ওরা বোঝে বল তো?"

"ওদের instinct আছে, তাতে ওরা বুঝে নেয়।"

"Instinct না ছাই। তোমার কিছু বুদ্ধি নেই বড়মামা। জন্তু-জানোয়ার হ'ল অন্তর্যামী, তাতেই ওরা জানতে পারে।"

"জান মা, যখন ছোট ছিলে তখন একদিন আমার কোলে উঠে আমার এই টাকে হাত দিয়ে জিগ্‌গেস করেছিলে, বড়-মামা, তোমার চুল গেল কোথায়? আমি বলেছিলুম, বুদ্ধি আমার মাথা ছাপিয়ে উঠেছে কি না, তাই চুলগুলোর আর ঠাঁই হচ্ছে না। সেদিন তাই বুঝেছিলে। কিন্তু আজ আর তোমায় আমার বুদ্ধি সম্বন্ধে ঠকানো যাবে না।"

"সত্যিই তো বড়মামা, তোমার সর্বাঙ্গে অত মোটা মোটা চুল, অত বড়ো বড়ো দুটো গোঁফ, কিন্তু মাথায় একটিও চুল নেই কেন?"

"তার কারণ চুলের দেবতা আমার মাথাটি একদম খেয়ে বসে আছেন।"

"বড়মামা, তুমি একটা ওষুধ ব্যবহার করো, চুল গজাবে। আমি নিশ্চয় বলছি গজাবে। দাঁড়াও, বিজ্ঞাপন দেখে তোমায় একটা ওষুধ কিনে দেবো।"

"রক্ষে করো খুকী। মাথায় আমার চুল একটিও নেই তা সত্যি, কিন্তু চেয়ে দেখ দিকি, কেমন সুন্দর ঝক্‌ঝকে পালিশ! কোথায় লাগে তোমাদের আর্শি টার্শি। ওষুধ লাগালে সেটি আর থাকবে না, ব্রণ আর ফুস্কুড়িতে ভরে উঠবে।"

নমিতা হেসে উঠলেন। অনেকদিন পরে নমিতার এই প্রথম হাসি শম্ভু চাটুয্যের কানে মধু বর্ষণ করল।

এমনি লঘু আলাপ চলল খানিকক্ষণ। তারপর নমিতা বললেন, "বড়মামা, তোমায় একবার অসীমবাবুর কাছে যেতে হবে আমার চিঠি নিয়ে। চিঠি ডাকে দিলে চলবে না, তোমায় গিয়ে মুখে সব বুঝিয়ে বলতে হবে। সব শুনলে তিনি তোমার সঙ্গে চলে আসবেন।"

"তিনি থাকেন অনেক দূরে, আমার সেখানে গেলে তো চলবে না মা, অনেক কাজ নিয়ে এখানে জড়িয়ে পড়েছি। বিশেষ, এই ঝঞ্ঝাটের সময়। তা তোমার কোনো চিন্তা নেই খুকী, গোকুলকে পাঠাবো সমস্ত ব'লে ক'য়ে। গোকুল হ'ল পুরাণো আর পাকা লোক।"

"গোকুল আবার কে? কই দেখিনি তো কোনোদিন তাকে? তোমাদের কত সাঙ্গপাঙ্গই যে আছে!"

"বিষয়-আশয় থাকলে গোকুল-টকুল থাকবে বই কি মা। দেখেছ তাকে এ বাড়ীতে, তবে ভুলে গেছ বোধ হয়। গোকুল আছে আমাদের কয়লার খনির চার্জে, ও সব সাঁওতালী দেশ সে চেনে ভাল। তাকেই পাঠিও।"

"আচ্ছা, তা হ'লে গোকুল যেন আমার কাছে আজ বিকেলে আসে। আমিও চিঠিটা লিখে রাখব।"

অসীমের সঙ্গে নমিতার কি সম্বন্ধ একথা কর্মচারিদের মধ্যে একা শম্ভু চাটুয্যেই জানতেন। অসীমের আগমনের আশায় তিনিও উৎফুল্ল হ'য়ে উঠলেন।

শম্ভু চলে গেলেন, যাবার সময় সাবধান করে গেলেন, নমিতা বেশীক্ষণ আর রোদে না থাকেন যেন।

শম্ভু চলে গেলে হরিণীর গলাটি হাত দিয়ে জড়িয়ে নমিতা তার কানে কানে বললেন, "জানিস চিত্রা, কাকেও বলিস নি, আমার বর আসবে।"

প্রত্যুত্তরে চিত্রা তার মাথাটি নমিতার কাঁধে রাখল।

দ্বিপ্রহরে নির্জন গৃহকোণে নমিতা চিঠি লিখছেন। বারংবার কাটছেন, কাগজ ছিঁড়ে ফেলছেন, মনের মতন লেখা আর হয় না। কখনো চোখে জল এসে পড়ে, কখনো লজ্জায় হাতের কলম আর চলে না। অনেক কাটকুট ক'রে অবশেষে লিখলেন—"তোমায় আজ আমার

সেণ্ট্রাল • শ্রী • ম্যাজেষ্টীক

সেণ্ট্রাল	শ্রী	ম্যাজেষ্টীক
কলিঃ ৮৪৪	বি, বি, ১৫১৫	কলিঃ ২০৯১
প্রত্যহ :	প্রত্যহ :	প্রত্যহ :
৩, ৬ ও ৯টা	৩, ৬ ও ৯টা	২-৩০, ৫-৩০ ও ৯টা
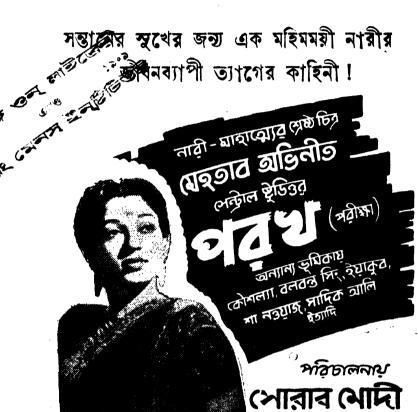
অগ্রিম স্থান সংগ্রহ করুন।

বিজনদা'র চিঠি.

আমার আদুরে ভাই-বোনেরা,

না, আজ এটা স্বপ্ন নয়, সত্যিই তোমাদের আসর আবার সেই আগেকার মত বড় হয়েছে। দীপালী ফিরে পেয়েছে এই যুদ্ধের বাজারে আবার তার সেই আগেকার আকার, তাই সেই সঙ্গে সঙ্গেই তোমাদের বিভাগ তো বাড়বেই। কারণ তোমাদের দাবী "দীপালী"র পরিচালকমণ্ডলীর কাছে সবার আগে এবং বেশী রকমের, তার প্রধান কারণ হচ্ছে তোমাদের ওপর ওঁদের স্নেহটা একটু বেশী কিনা।···আবার আমি চেষ্টা করবো তোমাদেরই খুসী অনুযায়ী আগের মত প্রতিবারে আসর সবার সামনে সাজিয়ে প্রকাশ করতে। নতুন ধরণের উপন্যাস, আর তোমাদের প্রিয় লেখক রূপকুমারের লেখা সেই ধারাবাহিক রচনা "রাণু আর তার দাদা" প্রকাশিত হবে আবার খুব শীঘ্রই।···তবে একটা কথা বলে সাবধান করে দিই, এদিকে আনন্দে যেন মেতে উঠো না আরো কিছুদিন, কারণ সামনেই সবার বাৎসরিক পরীক্ষা।··পরীক্ষা হয়ে গেলে অনেক সময় পাবে, তখন সবাই নিশ্চিন্ত মনে কাগজ কলম নিয়ে বসবে আসরের জন্যে। আমায় দেবে বিরাট বিরাট চিঠি, তার প্রতি ছত্রটী থাকবে তোমাদের আনন্দেতে বোঝাই।···আমি ততক্ষণ তোমাদের যে সব পুরাতন লেখা মনোনীত আছে সেগুলি প্রকাশ করে যাই। কেমন, সেই ভালো কথা নয় কি ?···তোমাদের মধ্যে আমার যে সব ছোট্ট ভাই-বোনেরা আছো, তাদের জানাচ্ছি যে, আসছে বারে নিশ্চয়ই ৩০নং প্রতিযোগিতার ফলাফল জানাবো। রাগ করলে না তো ?··· সবার জন্যে স্নেহ রইলো! আজ আসি কেমন ?

তোমাদের : বিজনদা'

বুদ্ধির দৌড়

—রূপকুমার

আমি গতবারে তোমাদের বুদ্ধির দৌড় যে কত তা' দেখার জন্যে দিয়েছিলুম ; এখন তা আমি দেখেছি। যাই হোক মিলিয়ে দেখে নাও কা'দের উত্তর সঠিক হয়েছে।

উত্তরটা হচ্ছে এই—কোন গহনার দোকানের বাইরের "নোটিশ বোর্ডে" ঐ বিজ্ঞাপনটী দেখে, যাঁরা মাঝে মাঝে গহনা তৈরী করান তাঁরা খুসী হয়ে উঠলেন।···আর

বহু প্রয়োজনে ডাকছি। জানি, তুমি আমায় প্রত্যাখ্যান করবে না। মা নেই, সংসারে আজ আমি নিতান্ত একলা। দিন আমার আর কাটে না। তবু মনে হয়, একলা নই, তুমি আছ সর্বক্ষণ আমার পাশে পাশে। আমার যা কিছু সব মনে মনে নিবেদন করেছি তোমায়। এসো, এসে আমার কায়মনোবাক্যে তা গ্রহণ করো—নমিতা।"

চারটের সময় গোকুল মুখুজ্যে এল। চোখ দুটি মিট্‌মিট্‌ করছে, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি গোঁফ। দেখলে মনে হয় অত্যন্ত ধূর্ত্ত লোক। বিষয়কর্মে চতুর বলে তার খুব সুনাম।

"সাঁওতাল পরগণার পলাশবনী চেনেন ?"—নমিতা জিগ্‌গেস করলেন।

"চিনি না বটে. তবে পোষ্টাপিসের নাম জানা থাকলে চিনে নিতে আর কষ্ট কি ?"—চোখ মিটমিটিয়ে গোকুল বলল।

"নিন তবে এই চিঠি। লেখা আছে এতে নাম ঠিকানা, পোষ্টাপিসের নাম। আজকের রাত্রের গাড়ীতেই যেতে পারবেন ?"

"তা পারবো না কেন ? এ আর শক্ত কাজ কি ?"

"বেশ, আপনার কথায় খুসী হলুম। তাহলে যান, তৈরী হ'য়ে নিন। এখানকার সমস্ত খবর তাকে বুঝিয়ে বলে পারেন তো তাকে সঙ্গে করেই নিয়ে আসবেন। পারবেন আনতে ?"

"কেন পারবো না ?"—তারপর আঙল গুণে হিসেব ক'রে গোকুল বলল, "ছ'টা ছাপ্পান্নয় ছাড়ে, নটা বত্রিশে পৌছায়. তারপর হল গিয়ে, যতদূর মনে পড়ছে, তেরোটা বেয়াল্লিশ,—আজ, কাল পর্শু, —হাঁ, পর্শু-দিন দশটার মধ্যেই তাকে নিয়ে আসব সঙ্গে করে।"—গোকুল চটি ফট ফট করতে করতে সিঁড়ি বেয়ে নিচে চলে গেল।

লোকটি কথা কয় কম, কোনো কিছুতেই 'না' বলতে জানে না। একেবারে যে পাকা লোক তাতে আর সন্দেহ নেই।

যেতে যেতে গোকুল ভাবল, এই অসীম বাবুটি কে ? গিন্নীর কোনো আত্মীয়-টাত্মীয় নিশ্চয়। পলাশবনীতে যখন বাবুটির থাকা হয়. তখন নিশ্চয়ই ব্যবসায় সংক্রান্ত কাজে। অত তাড়াতাড়ি যখন সঙ্গে নিয়ে আসবার তাগিদ রয়েছে তখন বোঝা যাচ্ছে ব্যাপারটা জরুরি। কিসের জন্য অত জরুরি দরকার ? বোধ হয় ও-অঞ্চলে কোনো জঙ্গল-টঙ্গল সস্তায় পাবার খবর এসেছে, দলিলও দু'একটা জুটেছে, তাই তাড়াতাড়ি ক'রে কাজ সারা চাই।···গোঁফের ফাঁক দিয়ে গোকুল একটু মুচকি হাসল।···না হ'লে ছ'পয়সার টিকিটেই সারত, না হয় বড় জোর ন'গণ্ডা পয়সা দিয়ে একটা টেলিগ্রাফ্ পাঠাত। মেয়ের রাজত্বে সাড়ে ছ'টাকা সাড়ে ছ'টাকা—একুনে তেরো টাকা গাড়ীভাড়া দিয়ে লোক পাঠানো। গোকুল চোখ মিটমিটিয়ে ভাবল; এমন বেহিসেবী হ'লে তো বিষয় থাকবে না !

(ক্রমশঃ)

দুঃখে কেঁদে উঠলো শ্রমিকের দল, তাদের কারখানার বাইরেও নোটীশ বোর্ডে ঐ বিজ্ঞাপনটী দেখে।…এখন বুঝতে পারলে তো একই বিজ্ঞাপন কারুর মনে যোগালো আনন্দ, আমার কারুর মনে যোগালো দুঃখু।

ও দেশের কথা

—শ্রীসৌরীন্দ্র মোহন দেব (৭৮৬)

—শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত (১১৩০)

বর্ত্তমানে রাশিয়ার শিক্ষাবিস্তারের ইতিহাসে যে অসম্ভব রকমের পরিবর্ত্তন হয়েছে, সেকথা সকলেই স্বীকার করে। যে দেশের জনসাধারণ শতাব্দীর পর শতাব্দী অজ্ঞতার অন্ধকারে মোহগ্রস্ত ছিল, সে দেশে আজ জ্ঞানের আলোক অজস্র ধারায় পড়ছে। প্রশ্ন উঠতে পারে, এই অসম্ভব কেমন করে সম্ভব হল?

এই প্রশ্নের মীমাংসা হতে পারে, যদি আমরা সেখানকার শিক্ষা বিস্তারের বিভিন্ন পন্থাগুলি আলোচনা করি। বিস্তারিত ভাবে এখানে আলোচনা করা সম্ভব নয়। কি ভাবে সবাক চলচ্চিত্রের সাহায্যে সেখানের জনসাধারণের শিক্ষা সহজ হয়েছে, আজ সেকথাই কেবল আলোচনা করব।

শিক্ষাবিস্তারের যতপ্রকার উপায় আজ পর্য্যন্ত উদ্ভাবিত হয়েছে তার মধ্যে চলচ্চিত্রের দাবী :সর্ব্বাগ্রগণ্য, একথা সুধীজন মাত্রেই স্বীকার করেছেন। কিন্তু আমাদের এ দুর্ভাগা দেশে এ প্রচেষ্টা আজও হল না, চলচ্চিত্রে বস্তুগত ও ভাবগত শিক্ষা পাশাপাশি চলে বলে শিক্ষার্থীর মনে এর প্রভাব অসীম।

রাশিয়ার সাম্রাজ্য-পরিচালকসঙ্ঘ থেকে চলচ্চিত্রের বিষয়বস্তু নির্দ্ধারণ করে দেওয়া হয়। শিক্ষার্থীদের শিক্ষনীয় যা থাকা সম্ভব তাই হয় তার বিষয় বস্তু। আবার তাঁদের পক্ষে এই আদেশও সেই সঙ্গে জারী করা যাচ্ছে যে, প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে ছবি দেখতেই হবে। অন্যথায় শাস্তিরও ব্যবস্থা তাদের জন্যে করা হয়েছে। স্কুল-কলেজের ছেলেদের নিয়ে স্কুলের ও কলেজের শিক্ষকেরা ছবি দেখতে যান। ছবি দেখার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা ছেলেদের ছবির শিক্ষণীয় বিষয়গুলি পরিষ্কার ভাবে তাদের বুঝিয়ে দেন।

আজ আমাদের দেশের ছেলেদের মনে শিক্ষার নামে আতঙ্ক উপস্থিত হয়। কিন্তু রাশিয়ার ছেলেদের তা হয় না। তারা শিক্ষার সঙ্গে সহজ ভাবে যোগসাধন করে। সেই জন্যই আজ তারা পৃথিবীর সবজাতির ছেলেমেয়েদের থেকে সর্ব্ব বিষয়ে উন্নত।

> ### মনে রেখো
>
> "সত্য পালনের দুঃখ আছে, তাকে আঘাতের মধ্যে দিয়ে বরঞ্চ একদিন পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু বঞ্চনার প্রতারণার মিষ্ট পথ দিয়ে সে কোনদিন আনাগোনা করে না।" —শরৎচন্দ্র

কেমন করে সৃষ্টি হলো?

—অজিত কুমার মিত্র (৯১২)

অনেকদিন আগেকার কথাই বলছি। তখন যদি কোন রোগীর উপর অস্ত্রোপচার করা হতো, তবে তার হাত পা বেঁধে ভীষণ যন্ত্রণা দিয়ে অস্ত্রোপচার করতে হতো।… সে সময়ে স্কটল্যাণ্ডে সিমসন নামে একটী ছেলে ছিলেন। তাঁর রসায়ন শাস্ত্রের দিকে খুব ঝোঁক। যখনই কোথাও কোন বৈজ্ঞানিকের বক্তৃতা হবার কথা থাকতো, তিনি আগে থেকেই সেখানে গিয়ে হাজির হতেন। তিনি যৌবনে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে রসায়ন শাস্ত্রে অনেক জ্ঞানলাভ করলেন। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের নেশায় তিনি নিজেকে ডুবিয়ে রাখতেন। তাঁর কথামতো একজন ওষুধওয়ালা নানারকম রাসায়নিক জিনিষ মিশিয়ে সেগুলো তাঁর কাছে রোজ পাঠাতো। আর তিনি সেগুলো নিয়ে পরীক্ষায় মগ্ন থাকতেন। একদিন তিনি ওষুধওয়ালাকে কতকগুলি তরল জিনিষ মিশিয়ে একটা নতুন রকম তরল রাসায়নিক জিনিষ তৈরী করে তাঁর কাছে পাঠাতে বল্লেন। সেই তরল পদার্থটা যখন তাঁর কাছে পৌঁছালো তখন তিনি আর তাঁর কয়েকজন বন্ধু এটাকে নিয়ে পরীক্ষা করতে লাগলেন। সেই তরল পদার্থ দিয়ে বেশ মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ বেরোচ্ছিল। সেই গন্ধটা শুঁকতে শুঁকতে সিমসন আর তাঁর বন্ধুরা জ্ঞানহীন হয়ে পড়লেন। তাঁরা মারা গেছেন ভেবে বাড়ীর অন্য সবাই তো কাঁদতেই আরম্ভ করে দিলে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে সিমসন ও তাঁর বন্ধুদের জ্ঞান হলো। এই তরল পদার্থটার গুণ দেখে সিমসন আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন। তিনি তখন শিশিটা একটা খরগোসের নাকের কাছে ধরে রইলেন। কিছুক্ষণ পরে খরগোসটাও অজ্ঞান হয়ে গেল। সিমসন তখন বুঝতে পারলেন যে—এই তরল পদার্থটার এমন গুণ যে এর সাহায্যে রোগীকে কিছুক্ষণের জন্যে অজ্ঞান করে, কোন যন্ত্রণা না দিয়ে অস্ত্রোপচার করা যায়।…

…এরকম ভাবেই ক্লোরোফর্ম্মের সৃষ্টি হলো।

মনে মনে

—দিলীপ দে চৌধুরী (৯৫৭)

চিঠি লিখছিলাম বন্ধুকে।

কালি আর কলমের সাহায্যে ঠিক কাগজের বুকে মনের রঙীনতাকে উজাড় করে দিয়ে। এলোমেলো চিন্তার ঝড়ে ভেসে চলেছিলাম দূর হতে দুরান্তে, কূল থেকে অকূলে।

অকস্মাৎ থামতে হলো মাঝ পথে! কালি-কলম কথা বলছিল কাগজের সঙ্গে। কেমন যেন অভিভূত হয়ে গেলাম। কাণ দুটোকে অতিরিক্ত সজাগ করে তুলি।

"আর পারি না ভাই। সেই কোন মান্ধাতার আমল থেকে আমাদের খাটুনী সুরু হয়েছে, আজো তার শেষ হ'লো না। ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে আমাদের খাটুনী।" কথা ক'টা বলে সশব্দে নিঃশ্বাস ফেললে কালি-কলম।

"আমাদের অবস্থাও ঠিক তাই। যদিও তোমাদের মত অত বেশীদিন ধরে আমরা কাজ করছি না, তবু ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।" দুঃখের সঙ্গে জবাব দিলে কাগজ।

"মানুষের মত নিষ্ঠুর স্বার্থপর জীব আর হয় না। নিজের সামান্য একটু সুবিধার জন্যে অপরের সহজ দুঃখ বেদনাকে তারা ফিরেও দেখে না।" কালি-কলমের কণ্ঠে হিংসা ও বিদ্রূপ ফুটে উঠলো।

"তোমরা তো তবু ভাল আছো। আমাদের যখন মেশিনের তলায় ঢুকিয়ে দেয় তখনকার অবস্থা তোমরা ভাবতেই পারো না। সে কী বেদনা! সে কী ভীষণ চাপ। অসহ্য যন্ত্রণায় আমরা চিৎকার করে উঠি উচ্চ কণ্ঠে। কিন্তু বধির মানুষ শুনতে পায় না। নিঃশব্দে সে তার কাজ করে যায়।" ঐ কথা বলতে বলতে কাগজের কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে উঠলো, অন্য দিকে ফিরিয়ে চোখ মুছলে সে।

দরদী কণ্ঠে কালি-কলম সান্ত্বনা দিয়ে বল্লে, "তাইতো, আমরা বলি পায়ে জুতো নেই বলেই যদি দুঃখ করি, তাহলে যার নেই সে কি করবে?" পুরাণ সেই উপমা—তবু মনে হলো কী চমৎকার।

কাগজ কিন্তু তখনও তার সেই আগের জের টেনে চলেছে, "তাতেও কি নিস্তার আছে? এর পর ছুঁচ ফুটিয়ে ফুটিয়ে সেলাই করে বই তৈরী হলো। তারপর আবার মাপমত কাটা হলে তবে একটু রেহাই।"

"সবই ঠিক। তবু কিন্তু ভাই ওই মানুষই আমাদের সৃষ্টিকর্তা।"

"তাতেই তো অত নিষ্ঠুর তারা। সৃষ্টি-কর্তা ছাড়া তার সৃষ্টিকে এত কষ্ট, এত যন্ত্রণা কেউ দেয় না।"

কাগজের কথা শুনে অবাক হয়ে গেলাম। মনে পড়লো কিছুদিন আগে এই ভদ্রলোক অভাবের তাড়নায় অস্থির হ'য়ে আমাদের সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বলে ছিলেন, "ভগবান, তুমি এত নির্দয়! কে বলে তোমাকে দয়াময়? তুমি হিংস্র পশুর মত বর্বর।"

"দাদা"। চমকে উঠলাম ঐ ডাক শুনে। কাগজের উপর থেকে মাথা তুলে চেয়ে দেখি আমার ছোট বোন কনক সামনে দাঁড়িয়ে।

গুলিয়ে গেল সমস্ত চিন্তারাশি। বিরস মুখে বললাম: "কিরে কনক?"

"মা তোমায় ডাকছেন শীগ্‌গির," বলে সে ছুটে ঘর থেকে বার হয়ে গেল। আমিও তাকে অনুসরণ করলাম।

খেলার মাঠে

পরিচালক:
শ্রীউমেশ মল্লিক, বি-এ

পার্শীদলের বিরুদ্ধে জয়লাভের পর ফাইনালে হিন্দুদের উৎকর্ষের অভাব অনেকেরই নিকট বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে। সেমি-ফাইনালে মার্চেন্টের ২২১ রাণের পর ফাইনালে প্রথম ইনিংসে ১ রাণ তোলা সত্যই হিন্দুদলের প্রথম ইঃ-এর ভাগ্য বিপর্য্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এদিনে কিষণচাঁদের ৭২ রাণ এবং মানকাদের ৫২ রাণই উল্লেখযোগ্য। মুস্লিম দলের প্রথম ইঃ-এর খেলাও বিশেষ প্রীতিপ্রদ হয় নি। মুস্তাক আলী তাঁর সুনাম অনুযায়ী কিছু রাণ সমষ্টি তুলেন। দ্বিতীয় ইঃ-এও তিনি ৩৬ রাণে তোলেন। এস, ব্যানার্জীর বলে তিনি বেশ গুরুতর আহত হওয়া সত্বেও মুস্তাক আলীর অভাবে প্রথম ইঃ-এ মুস্লিম দলের অধিনায়কত্ব করেন সৈয়দ আমেদ। আমির ইলাহী এবং সৈয়দ আমেদ হিন্দুদলের প্রথম ইঃ-এর রাণ সমষ্টির বাধার সৃষ্টি করেন। ফলে তাঁরা ৪টি এবং ২টি উইকেট লাভ করেন। ২য় ইংনিসে হিন্দু দলের মধ্যে মার্চেন্টের ৬০ রাণ, জি কিষণচাঁদের নট আউট ১১৮ রাণ, হিন্দুদলের ৩১৫ রাণ সংগ্রহে সাহায্য করে।

মুস্লিম দল প্রথম ই'-এ ২২১ রাণ করে কোন প্রকারে হিন্দুদলের রাণ-সমষ্টিকে অতিক্রম করে ১৮ রাণে অগ্রগামী হয়। দ্বিতীয় ইনিংসে মুস্লিম দল তৃতীয় দিন ১ উইকেটে ১৩ রাণ সংগ্রহ করে। চতুর্থ দিনের খেলা খুব উত্তেজনাপূর্ণ হয়। একমাত্র কে সি ইব্রাহিমের দৃঢ়তাপূর্ণ খেলার জন্যই মুস্লিম দল জয়লাভ করতে পেরেছে। তিনি ৩০০ মিনিটে ১৩৭ রাণ করে এবং নট আউট থেকে জয়সূচক রাণটি তিনিই করেন। এদিন মুস্লিম দল ৯ উইকেটে ২৯৮ রাণ করেন। ফলে তাঁরা এক উইকেটে জয়লাভ করেন।

সংবাদে প্রকাশ যে কর্ম্মে নিরত সামরিক দল ভারতের সমস্ত ক্রিকেট খেলোয়াড়দের মধ্য থেকে বাছাই করে একটা দল গঠন করছে। এ দলে বহু স্বনামধন্য খেলোয়াড় যোগদান করছেন। হার্ডষ্টাফ, কম্পটন, বাটলার প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট খেলোয়াড়রা যোগদান করবেন বলে সংবাদ প্রকাশিত হওয়ায় আমরা একটি আকর্ষণীয় খেলা দেখবার আশায় রইলাম। এ দল ভারতের বহু স্থানে ভ্রমণ করবে বলে তাঁদের তালিকা প্রকাশ করেছেন। আশা করি ভারতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড়রা তাঁদের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখতে সচেষ্ট হবেন।

*

স্থানীয় যে কয়েকজন খেলোয়াড় বর্ত্তমানে ব্যাটিং-এ সাফল্য প্রদর্শন করেছেন তাঁদের তালিকা:

নাম	রাণ সৃষ্টি	কার বিরুদ্ধে
জে, দাসগুপ্ত	১৩০ নট আউট	রেঞ্জার্স (ইঃ বিঃ)
জি, পার্থসারথী	১২৯ রাণ	বি, এণ্ড এ আর (মোহনবাগান)
কে. ভট্টাচার্য	৮৬ রাণ	অমৃতবাজার
পি, বি, দত্ত	১০৬ রাণ নট আউট	এরিয়ান্স (কালীঘাট)
টি, সি, লঙফিল্ড	৮৪ রাণ	ইউ, স্পোঃ
মানডেন	৭৪ রাণ	ক্যাবালস্
গ্রীণ	৭১ রাণ	ঐ

মধুসূদনের কাব্যমাধুরী

—শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা-সাহিত্যের পরম শুভক্ষণে ১৮৩৩ সালে মাত্র ৮।৯ বৎসর বয়সে মধুসূদন হিন্দু-কলেজের জুনিয়ার স্কুলে নিম্নশ্রেণীতে প্রবেশ করেন। ছাত্রাবস্থায় হিন্দু-কলেজের অনেক বিশিষ্ট ছাত্রের ন্যায় বাংলাভাষা ও সমাজশাসনের প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ ছিল, বাংলায় কথা বলা বা পত্রাদি লেখা তখন নূতন ইংরাজী-শিক্ষিত শিক্ষার্থীর কাছে Inferiority Complex.

সে সময়ের গ্রাম্যতাদোষদুষ্ট বাংলা রচনার ধারা, শালীনতা ও সুরুচির অভাব, সংস্কৃত ও প্রাকৃতের বিকৃতমিশ্রন, ভাষার দৈন্য, কল্পনার পঙ্গুত্ব, ছন্দের বৈচিত্র্যহীনতা, প্রকাশভঙ্গীর অসংযম, সামাজিক কু-প্রথা ও শিক্ষার সংকীর্ণতা প্রভৃতি স্মরণ করিলে এই Complex-এর জন্য বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। সে যুগে কবি ঈশ্বরগুপ্তের প্রভাব, পয়ারের বেড়ী, অনুপ্রাস ও (বহুস্থলে) অর্থহীন শব্দ-ঝঙ্কারের মোহ, ছাত্র মধুসূদন অতিক্রম করিতে পারেন নাই। তাঁহার বাল্যরচনা বাংলায় দু'একটি মাত্র দেখিয়াছি—

"হিমঋতু"

"হিমন্তের আগমনে সকলে কম্পিত
রামাগণ ভাবে মনে হইয়া দুঃখিত।
ফুরায়েছে সব আশা মদন রাজার
আসিবে বসন্ত আশা—এই আশা সার।
আশায় আশ্রিতজনে নিরাশ করিলে
আশাতে আশার বস আশায় মারিলে।

* * *

যে জন করয়ে আশা আশার আশ্বাসে
নিরাশ করয়ে তারে কেমন মানসে?"

Mark the contrast, later in
"মেঘনাদবধ"
"হিমান্তে দ্বিগুণ তেজ ভুজঙ্গ যেমতি"

"বর্ষাকাল"

* * *

"সমীরণ ঘন ঘন ঝন ঝন রব
বরুণ প্রবল দেখি প্রবল প্রভাব"

* * *

Mark the contrast later in "মেঘনাদবধ"
"বরিষার কালে সখী
প্লাবন-পীড়নে কাতর প্রবাহ
ঢালে তীর অতিক্রামি
বারিরাশি দুই পাশে"

আবার—

"হুহুঙ্কারি বায়ুকুল বাহিরিল বেগে,
[illegible] জলরাশি, ঘনে ডাকে আছাড়িছে

জাঙ্গাল। কাঁপিল মহী; গর্জ্জিল জলধি
তুঙ্গশৃঙ্গধরাকারে তরঙ্গনিকর
কল্লোলিল, বায়ুসঙ্গে রণরঙ্গে মাতি"

ইংরাজীতে পদ্য ও চিঠি লেখাতে ছাত্র মধুসূদনের প্রতিভার প্রথম উন্মেষ দেখা যায়। প্রথমে বায়রণ তাঁহার আদর্শ ছিল—সুতরাং আদর্শের দোষগুণের ছাপ তাঁহার ইংরাজী বাল্যরচনায় ও চরিত্রে রহিয়া গেল। পরিণত বয়সে লিখিত "আত্মবিলাপ" পড়িলে Byron-এর Manfred-এর অংশবিশেষ মনে জাগিয়া উঠে।

ইংরাজী কবিতা রচনায় তিনি Derozio ও Captain Richardson-এর নিকট বিশেষ উৎসাহ ও প্রেরণা পাইয়াছিলেন। এই প্রেরণাই তাঁহার মনে দুইটি দুর্দ্দমনীয় ইচ্ছা জাগাইয়াছিল—Great Poet হইবার ও বিলাত যাইবার। ইংরাজী সাহিত্যের মাধুর্য্যে, ভাববৈচিত্র্যে, ছন্দলীলায় ও ওজোগুণে তিনি একান্ত আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। ছাত্রজীবনে তিনি বলিয়াছিলেন, "Shakespeare চেষ্টা করিলে Newton হইতে পারিতেন, কিন্তু Newton Shakespeare হইতে পারিতেন না।" ইংরাজী সাহিত্যের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তির পরিচয় ইহা হইতে পাওয়া যায়। তিনি হয়ত ইংরাজী-সাহিত্যের সেবা আজীবন করিয়া যাইতেন, যদি না বঙ্গজননীর শুভাদৃষ্টবশে Bethune সাহেব তাঁহাকে বাংলাভাষার সেবা করিতে বিশেষভাবে প্রবুদ্ধ করিতেন। "Captive Lady" উপহার পাইয়া Bethune সাহেব মধুসূদনের অন্তরঙ্গ বন্ধু গৌরদাস বসাককে ১৮৪৯ সালের ২০শে জুলাই তারিখে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ কৃতজ্ঞতার সহিত উদ্ধৃত করিতেছি।

"But he (Michael M. S. Dutt) could render far greater service to his country and have a better chance of achieving a lasting reputation for himself, if he will employ the taste and talents, which he has cultivated by the study of English, in improving the standard and adding to the stock of the poems of his own language, if poetry at all events he must write.

By all that I can learn of your vernacular literature, its best specimens are defiled by grossness and indecency. An ambitious young poet could not desire a finer field for exertion than in taking the lead in giving his countrymen in their own language a taste for something higher and better"...

বসাক মহাশয় ইতিপূর্ব্বে বহু চেষ্টাতেও মধুসূদনকে বাংলা ভাষার প্রতি আকৃষ্ট করিতে পারেন নাই—এবার তিনি আরও উৎসাহের সহিত মধুসূদনকে বাংলার আদর করিতে বলিলেন। প্যারীচাঁদ মিত্রের "আলালী" ভাষার বিরুদ্ধে মধুসূদন মন্তব্য করিলে মিত্র মহাশয় বলেন, "তুমি বাংলা ভাষায় কি বুঝিবে? তবে জানিয়া রাখ আমার প্রবর্ত্তিত এই রচনা পদ্ধতিই বাংলা ভাষায় নির্ব্বিবাদে প্রচলিত ও চিরস্থায়ী হইবে।" উত্তরে মধুসূদন বলিলেন 'It is the language of Fishermen, unless you import largely from Sanskrit. উহা কি আবার একটা ভাষা! দেখিবেন, আমি যে ভাষার সৃষ্টি করিব, তাহাই চিরস্থায়ী হইবে।" বহু ভাষা শিক্ষায় শিক্ষিত অক্লান্ত কর্ম্মী মধুসূদন মাতৃভাষার চর্চায় লাগিয়া গেলেন। তাঁহার মাতৃভাষার প্রতি আকর্ষণের আর একটি বিশিষ্ট কারণ আমরা জানিতে পারি বসাক মহাশয়কে লিখিত তাঁহার ১৮৬৫ সালের ২৬শে জানুয়ারী তারিখের চিঠি হইতে—

"I pray God that the noble ambition of Milton to do something for his mother tongue and his native land may animate all men of talent among us. If there is anyone among us anxious to leave a name behind and not pass away into oblivion like a brute, let him devote himself to his mother-tongue".

Byron তাঁহার কৈশোরের সহচর হইলেও, Milton তাঁহার যৌবনের গুরু। Milton-এর মতোই তিনি বাণীবিদ্যাদায়িনীকে প্রাণ ভরিয়া আবাহন করিয়াছেন। 'Paradise Lost"এ Milton লিখিয়াছেন—

"Celestial patroness who deigns
Her nightly visitation unimplored
And dictates to me slumbring, or inspires
Easy my unpremeditated verse" Bk IX.

রবীন্দ্রনাথ 'অন্তর্য্যামী' কবিতায় এই কথাই বলিয়াছেন:

"অন্তর মাঝে বসি অহরহ
মুখ হ'তে তুমি ভাষা কেড়ে লহ,
মোর কথা ল'য়ে তুমি কথা কও
মিশায়ে আপন সুরে।
কি বলিতে চাই সব ভুলে যাই
তুমি যা বলাও আমি বলি তাই

সঙ্গীত স্রোতে কূল নাহি পাই
কোথা ভেসে যাই দূরে”

আনন্দরসাশ্রিত বৈষ্ণবচূড়ামণি “চৈতন্য-চরিতামৃত”কার কৃষ্ণদাস কবিরাজ বহুপূর্ব্বে এই সুরেই গাহিয়াছেন, “একথা বলিবার নয় পাছে পাঠকেরা দম্ভ বলিয়া মনে করেন, কিন্তু না বলিলেও সত্যের অপলাপ হয়—তাই সহৃদয় পাঠকগণের নিকট করযোড়ে বলিতেছি—‘এই গ্রন্থ লিখায় মোরে মদনগোপাল।”

Milton Rhyme অর্থাৎ মিত্রাক্ষর ছন্দকে নিন্দা করিয়াছেন: “the invention of a barbarous age to set off wretched matter”

মধুসূদনও চতুর্দ্দশপদী কবিতায় বলিয়াছেন—

বড়ই নিষ্ঠুর আমি ভাবি তারে মনে
লো ভাষা! পীড়িতে তোমা গড়িল যে আগে
মিত্রাক্ষর রূপ বেড়ী। কত ব্যথা লাগে
পর যবে এ নিগড় কোমল চরণে—

* * *

প্রকৃত কবিতারূপী প্রকৃতির বলে
চীন-নারী-সম পদ কেন লৌহ ফাঁসে?

এই লৌহ ফাঁস হইতে ভাষা সুন্দরীকে মুক্তি দিয়া তিনি ‘তিলোত্তমাসম্ভব’, পরে ‘মেঘনাদবধ’ কাব্য রচনা করেন। উৎসাহ পাইয়াছিলেন কয়েকজন বিশিষ্ট বাঙালীর নিকট, তাঁহাদের নাম দেশবাসী শ্রদ্ধার সহিত মনে রাখিয়াছে—দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র, মহারাজা স্যর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও পাইকপাড়ার বিদ্যোৎসাহী পরিবার।

(আগামীবারে সমাপ্য)

সকলেরই সান্ত্বনা

ব্রিটেনের আকাশযুদ্ধের সময় চা যে জনসাধারণের কতো বড় সহায় হয়ে দাঁড়িয়েছিলো, সেকথা আজ আর কারুর অজানা নেই। সেই যুদ্ধ নিয়ে লেখা প্রায় প্রত্যেক বইয়ে এবং ১৯৪০-৪১ সালের সেই ভয়াবহ সময়ের প্রায় প্রত্যেক ছবিতেই পাওয়া যায় চায়ের উল্লেখ। জার্মানীর আকাশ বাহিনীর বিরুদ্ধে ব্রিটেন সেদিন যেভাবে আত্মরক্ষা করেছিলো, তার বর্ণনা আজ এক মহাকাব্যের মতো শোনায়। সে-সময়ের একটি যথাযথ এবং মনোহর বিবরণ পাওয়া যায় হিল্ডি মার্চাণ্ট্ প্রণীত “উইমেন এণ্ড্ চিল্ড্রেন লাস্ট্” নামক গ্রন্থে।

ব্রিটেনের যুদ্ধের নিখুঁত বর্ণনা দিতে গিয়ে এই মহিলা সাংবাদিক জাতির অগ্নি-পরীক্ষার দিনে চা যে কতখানি বল দিয়েছে সেকথা বার বারই উল্লেখ করেছেন। বিশেষতঃ গ্রন্থকর্ত্রী যখন এই দৈনন্দিন যুদ্ধের সময় মেয়েদের মনোভাব কী হয়েছিলো বর্ণনা করেছেন, তখন তাঁর চায়ের স্তুতি যেন আরো বেশি স্পষ্ট ও স্বতঃ উৎসারিত হয়ে দেখা দিয়েছে। তিনি লিখছেন:

“আমাদের সব দুঃখের আঘাতেই চা ছিলো যেন শান্তির প্রলেপ। আমাদের সমগ্র জাতির মতোই চা-ও তার বাইরের চটকটা হারিয়ে ফেলেছিলো। আগেকার মতো পাৎলা ফুলতোলা চীনেমাটির পেয়ালায় করে' নেবু আর গল্পগুজব-সহযোগে আর কেউ কারুকে চা পরিবেশন করতো না। মস্ত একটা বাসন থেকে দাগ লাগানো চীনে মাটির পেয়ালাতেই চা সবাইকে ভাগ করে দেওয়া হতে লাগলো। জন-উদ্ধারবাহিনী তাদের ময়লা রক্তমাখা আঙুলে মগগুলোকে ধ'রে চুমুকে চুমুকে তাদের মুখের ধুলো মাটি যেন মুছে ফেলতে শুরু করলো। অগ্নি-নিরোধ বাহিনী দু'হাত দিয়ে মগ ধরে তাদের শুকনো তৃষ্ণার্ত কণ্ঠ ভিজিয়ে নিতে লাগলো। আহত লোকদের রাস্তা থেকে সযত্নে ষ্ট্রেচারে তুলে' তাদের তপ্ত ঠোঁটে চায়ের মগ তুলে ধরা হতে লাগলো। কখনো কখনো চা আবার মগে করেও দেওয়া চলে না। এমনও দেখেছি যে, ইটের স্তূপের নীচে গর্ত্তের মধ্যে লোক আটক পড়ে গেছে, আর কোনো একটা ফুটোর মধ্যে নল গলিয়ে তার ভিতর দিয়ে এদের জন্য গরম চা ঢেলে দেওয়া হচ্ছে। একটা পাড়া বিধ্বস্ত হয়ে গেলে সবার আগে সেখানে এসে হাজির হোতো চায়ের গাড়ী, গৃহহীন হয়ে লোকে প্রথমেই চাইতো এক পেয়ালা চা।

“কর্তৃপক্ষ চায়ের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে নেবার আগে থেকেই আশ্রয় কেন্দ্রে কেন্দ্রে লোকেরা চাঁদা তুলে প্রাইমাস ষ্টোভ আর চা তৈরির সরঞ্জাম কিনেছে আর ওয়ার্ডেনরা ঠাণ্ডায় দীর্ঘকাল টহল দিয়ে এসে প্রথমেই উনুনে বসিয়েছে চায়ের কেৎলি।

“একটা ছোটো বোমায় একবার আমার এক বন্ধুর পিছনের বাগানটা প্রায় উড়ে গিয়েছিলো। সেই ধাক্কায় চারদিককার বাড়িগুলোর যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছিলো। তার মধ্যে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলো আমার বন্ধুর শহুরে গৃহরক্ষিণীর বাড়ি। তার বাড়ির সিঁড়ি, ছাদ, জানালা সবই ভেঙে পড়েছিলো। দেখ্লেন যে তার গৃহরক্ষিণী বাইরে বাগানে দাঁড়িয়ে চুল থেকে ধুলো ঝাড়ছে আর আপন মনে বকে যাচ্ছে। বন্ধুটি জিজ্ঞেস করলেন, তিনি কোনো সাহায্য করতে পারেন কি? জবাব এলো:

‘কিছু না। কিন্তু এক ঘণ্টা ধরে অপেক্ষা করে আছি যে গ্যাসওয়ালারা আবার গ্যাস দিতে সুরু করলে চা খাবো।’

“অর্দ্ধেক ভেঙে যাওয়া বাড়িতে বাস করবার বিরক্তি শুধু চা-ই যেন দমন করতে পারতো। প্রচুর, অসংখ্য পেয়ালা চাই সবাইকে সেদিন সান্ত্বনা ও শান্তি জুগিয়েছিলো।

শনিবারের বৈঠকের "সহরতলী"

—চন্দ্রশেখর

শনিবারের বৈঠক তাঁদের তৃতীয় অবদান "সহরতলী"কে মঞ্চস্থ করে নাট্য-জগতে বেশ একটু চাঞ্চল্যের সঞ্চার করেছেন। শনিবারের বৈঠকের পূর্ব্ববর্ত্তী অবদান দুটীর নাম "বনবিহগী" ও "বুভুক্ষা"। প্রথমটি ইবসেনের "Wild Ducks" অবলম্বনে রচিত, দ্বিতীয়টি শ্রীযুক্ত প্রতাপ চন্দ্র চন্দ্রের মৌলিক রচনা। এই দুটি নাটকের মধ্যেই রসসৃষ্টির যে প্রাণময় প্রচেষ্টা ছিল তারই সর্ব্বাঙ্গীন পূর্ণতা ঘটেচে "সহরতলী" নাটকে। শক্তিমান নাট্যকার হিসাবে প্রতাপবাবুর দাবী আজ অস্বীকার করবার উপায় নেই।

প্রতাপবাবু "সহরতলী" নাটকে নূতন দিক্‌-নির্দ্দেশ করেছেন আমাদের সমাজ জীবনের একটি অন্ধকারময় অংশের ওপর আলোকপাত করে। আধুনিক নাগরিক সভ্যতার বাহিক চাকচিক্যের আড়ালে যে নোংরামির পাঁক আমাদের সামাজিক সত্বাকে নিরন্তর কলুষিত করে চলেচে, "সহরতলী" তারই বাস্তব চিত্র।

"সহরতলী"র অধিবাসীদের পঙ্কিল পরিবেশ দেখে গা ঘিন্ ঘিন্ করলেও তার বাস্তবতাকে অস্বীকার করবার উপায় নেই। যে এগারোটি চরিত্র এই নাটকের মধ্যে স্থান পেয়েছে তাদের প্রত্যেকের সঙ্গেই যেন আমাদের পরিচয় আছে। শুধু নাটকীয় ঘটনা-সংঘাতের মধ্যে তারাই আরো উজ্জ্বল হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। এইখানেই নাট্যকারের শক্তিমত্তার পরিচয়।

যেমন নাটক তার অভিনয়ও হয়েচে তেমনি উচ্চাঙ্গের। সবার আগে নাম করতে হয় মহীতোষ চট্টোপাধ্যায়ের। নিবারণের ভূমিকায় ইনি একেবারে নিখুঁত অভিনয় করেচেন। গাঁজা খাওয়াই যেন তার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। স্ত্রীকে অন্যভোগ্যা জেনেও তার কৃপাপ্রার্থী হয়ে বেঁচে থাকতে তার বাধে না। সব দিক দিয়েই অপদার্থ সে। বাইরে বোকামির আবরণ থাকলেও শয়তানী বুদ্ধি তার পেটে পেটে! এ হেন চরিত্রকে জীবন্ত রূপ দিয়েছেন অভিনেতা। তাঁর নাটনৈপুণ্যে অভিনয় দেখছি একথা ভুলে যেতে হয়। এইখানেই অভিনয়ের সার্থকতা।

নিবারণের স্ত্রী রূপসীর ভূমিকায় অমিতা বসু সাবলীল অভিনয় করেচেন। স্বামীকে সে দু'চক্ষে দেখতে পারে না। ভাত-কাপড় দিয়ে যে আশ্রয় দিয়েচে তাকে দেহদান করতে তার বাধে নি। মন কিন্তু বাঁধা পড়েছে গৌরহরির কাছে। সে যাত্রার দলে "অ্যাক্টো" করে, ফিল্মে নামবার স্বপ্ন দেখে, আর রূপসীকে মজাদার গান শেখাতে চায়। হীরেন চট্টোপাধ্যায় বেশ একটি "টাইপ" সৃষ্টি করেচেন এই চরিত্রটির অভিনয়ে। আর একটি চমৎকার "টাইপ" হয়েচে কপিল সেনের ননীলাল। ফুটবল খেলোয়াড় সে, ধেনো মদের খদ্দের, কিন্তু কথায় কথায় শোনায় উইলিয়াম শীল্ড জিতে সেবার কি রকম বিলিতি মদের স্রোত বইয়ে দিয়েছিল। তার জীবনের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি হচ্চে যেদিন সে ফুটবলের বড়াই ত্যাগ করে গৌরহরির কাছে গান শেখাবার অনুরোধ জানালে রূপসীর মনে রেখাপাত করবার জন্যে!

করালী চরণের ভূমিকায় শঙ্কর সেনের অভিনয়ও উচ্চ প্রশংসার যোগ্য। সহরতলীর একটি বস্তীতে তার চায়ের দোকান। তার আসল কারবার কিন্তু মেয়েদের কুপথে টেনে আনা। রূপসী তারই আশ্রিতা। যেমন হাঁকডাকে, তেমনি মিষ্টি কথাতেও সে পটু। তার দুষ্কর্ম্মের সহচর ছোটুলাল। এই ভূমিকায় অজিত চট্টোপাধ্যায়কেও আমরা মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করতে পারতুম, যদি না তিনি সজ্জায় এবং বাচনে একটু অবাস্তবতার সৃষ্টি করতেন। তিনি পরেছেন মুসলমান গুণ্ডার পোষাক, কিন্তু কথা বলেছেন মাড়োয়ারী ঢ'য়ে। এই ক্রটীটুকু উপেক্ষা করতে পারলে অভিনেতার শক্তিমত্তার সুখ্যাতি করতে হবে।

এইবার নাটকের "ভদ্র" চরিত্রগুলির প্রসঙ্গে আসা যাক্। করালীরই বস্তীতে থাকেন অবিনাশ বাবু। সামান্য আয়ের কেরাণী তিনি। মেয়েকে কলেজে পড়াতেই তাঁর পুঁজি যায় ফুরিয়ে, তাই বিয়ের কোন ব্যবস্থাই করতে পারেন না, স্ত্রী যক্ষ্মায় ভোগেন, কিন্তু ওষুধ-বদ্যির বদলে যোগাড় হয় মাদুলি ও কবচ। ভদ্রলোক তাঁর চরম দারিদ্র্য থেকে escape খোঁজেন লাখ টাকার স্বপ্ন দেখে। শেয়ার মার্কেট, ঘোড়দৌড়ের মাঠ, ডার্ব্বির টিকিট, crossword puzzle—কিছুই বাদ পড়ে না। এই চরিত্রের অভিব্যক্তিতে নীরেন ভঞ্জ চমৎকার একটি attitude বজায় রেখেচেন। অবিনাশবাবুর মেয়ে কমলা (লাবণ্য পালিত) এবং স্ত্রী মোক্ষদা (রাণু পাল) মনের উপর বিশেষ রেখাপাত করতে পারে না—প্রথমটি নাটকীয় উপাদানের অভাবে এবং দ্বিতীয়টি অভিনয়ের অক্ষমতায়।

জন-জাগরণের ধ্বজা বয়ে অবিনাশ বাবুদের বস্তীতে আসে ধনীপুত্র রমেন। কমলার সাহচর্য্য তাকে আকৃষ্ট করে। কিন্তু কমলার চরম দুর্ভাগ্যের দিনে মৌখিক সহানুভূতি ছাড়া তার কাছে আর কিছুই পাওয়া যায় না। রমেনের ডাক্তার বন্ধু শচীন এই পরিবারে চিকিৎসা করতে এসে তার সত্যিকারের বড় মনের পরিচয় দেয় এদের নানাবিধ সাহায্যে এবং অবশেষে কমলার পাণিপ্রার্থী হয়। কমলা তখন গুণ্ডা কর্ত্তৃক অপহৃতা এবং দুর্বৃত্তদের হাতে বিধ্বস্তা। রমেন ও শচীনের ভূমিকায় যথাক্রমে রণজিৎ চন্দ্র ও সলিল দত্ত চরিত্রানুযায়ী অভিনয় করেচেন।

"সহরতলী"র stage presentation-এ উন্নতির অবকাশ আছে। কয়েকজন অভি-নেতাকে স্মারকের ওপর অত্যধিক নির্ভর করতে দেখা গেল। এই ক্রটীগুলি শুধরে নিলে পুনরভিনয়ে নাটকটি আরো জমে উঠবে।

পেশাদার রঙ্গমঞ্চে যেভাবে নাটকের দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েচে তাতে শনিবারের বৈঠকের এই নব-নাট্য আন্দোলন সর্ব্বতো-ভাবে সুধীসমাজের সমর্থনযোগ্য।
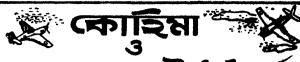
ও
কাবার ঊর্ধ্বে
আমাদের বিমানবহর

"..... আজ আমাদের বিমানবহর শত্রু এলাকায় গিয়ে হাজার হাজার পাউণ্ড ওজনের বোমা বর্ষণ করে শত্রুর ঘাঁটি, সুরক্ষিত স্থান এবং সৈন্য জমায়েতের কেন্দ্রস্থল ধ্বংস করেছে ...."

সাময়িক সংবাদ সম্পর্কিত বিবৃতির এটি একটি সাধারণ নমুনা। এর পিছনে আছে আমাদের ভারতীয় বিমানবাহিনীর কার্যতৎপরতা ও সাফল্য-অর্জনের কাহিনী। এদের উপর আমরা যে আস্থা স্থাপন করেছিলাম, এরা নিজেদের তার উপযুক্ত বলে প্রমাণ দিয়েছে। যারা এদের জেনেছেন এবং এদের কাজ দেখেছেন এরা তাদের সকলেরই শ্রদ্ধা অর্জন করেছে—অতি দুর্গম দেশে পৃথিবীর সবচেয়ে কদর্য আবহাওয়ার মধ্যে শূন্যে ও স্থলে নিজেদের সাহস, দক্ষতা ও সহ্যশক্তির পরিচয় দিয়ে।

এখন জঙ্গী বিমান, ডাইভ বোম্বার এবং পরিদর্শন কার্যে নিযুক্ত ভারতীয় বিমানবহরগুলি সদর্পে আরাকান ও বর্মায় শত্রুর অধিকৃত অঞ্চলে যুদ্ধ চালাচ্ছে।
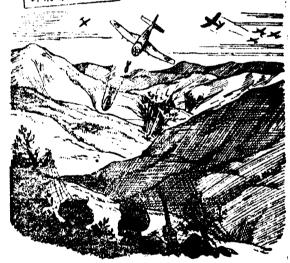
কোহিমার এপিক যুদ্ধের সময়ে এরা আকাশ ছেয়ে ছিল। আজ এরা বর্মার অভ্যন্তরে বহু দূরে পাড়ি দিচ্ছে। এদের হারিকেন ও ভেনজেন্স বিমানগুলি শত্রুর উপর মৃত্যু ও ধ্বংস বর্ষণ করছে।

ভারতীয় বিমান বহরের যুবকদের জন্য ভারতবর্ষ গর্ব বোধ করে।

এরা প্রমাণ করেছে যে আমরা জাপানীদের হটিয়ে দিতে পারি

এবং হটিয়ে দিচ্ছি

ন্যাশনাল ওয়ার ফ্রন্ট কর্তৃক প্রচারিত

AAA 1300

নাটমণ্ডপ

"শহর থেকে দূরে"—ইষ্টার্ণ টকীজের "শহর থেকে দূরে" বাংলার চিত্রজগতে এক নূতন অধ্যায়ের সৃষ্টি করিল। এযাবৎ কোনো বাংলা ছবি একাদিক্রমে একই চিত্রগৃহে ৫০ সপ্তাহ চলিবার সৌভাগ্য অর্জ্জন করে নাই। আগামী কল্য হইতে রূপবাণীতে "শহর থেকে দূরে"র কনক-জয়ন্তী সপ্তাহ সুরু হইবে। ছবিখানির এই অভাবিত সাফল্যের জন্য লেখক ও পরিচালক শৈলজানন্দকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

"শেষ-রক্ষা"—এতদিনে চিত্রভারতীর "শেষ-রক্ষা"র মুক্তি-দিবস ঘোষিত হইয়াছে—১৫ই ডিসেম্বর ১৯৪৪ রূপবাণীতে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের এই রস-নাট্যখানিকে পরিচালনা করিয়াছেন পশুপতি চট্টোপাধ্যায়, প্রযোজনা করিয়াছেন বাংলার প্রথম মহিলা চিত্রনির্ম্মাতা শ্রীমতী প্রতিভা শাসমল এবং অভিনয় করিয়াছেন বিজয়া দাশ বি-এ, অমর মল্লিক, পদ্মা দেবী, জীবেন বসু, রেবা বসু, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, প্রভা, রতীন বন্দ্যো প্রভৃতি। অনাদি দস্তিদার ও দক্ষিণা ঠাকুর সঙ্গীত পরিচালনা করিয়াছেন।

"পরখ"—মিনার্ভা মুভীটোনের ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন সোরাব মোদী। ভূমিকায় মেহতাব, ইয়াকুব, শা' নওয়াজ, কৌশল্যা, বলবন্ত সিং প্রভৃতি। বর্ত্তমানে সেন্ট্রাল, শ্রী ও ম্যাজেষ্টিকে দেখানো হইতেছে।

মাতা যে সন্তানের মঙ্গলার্থে নিজের সমস্ত সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জ্জন দিয়া তিলে তিলে মৃত্যুকে বরণ করিতে পারে তাহারই চিত্তদ্রাবী কাহিনী "এই পরখ"। আর একটি প্রশ্ন স্বতঃই মনে জাগে—মাতার মসীলিপ্ত অতীতের জন্য সন্তান কি সমাজে স্থান পাইবার অযোগ্য?

পণ্ডিত সুদর্শন "পরখ"-এর কাহিনী ও তাহার বিন্যাসে যথার্থ মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়াছেন এবং সেই অনুপাতে সোরাব মোদীর পরিচালনাও হইয়াছে প্রথম শ্রেণীর।

অভিনেতৃবর্গের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিনয় করিয়াছেন মেহতাব। অন্যান্য ভূমিকার মধ্যে শা নওয়াজ, কৌশল্যা এবং ইয়াকুব চরিত্রানুগত মনোমদ অভিনয় করিয়াছেন। বলবন্ত সিংহের অভিনয় প্রাণহীন মনে হইল।

টেকনিকাল দিকে বলিবার কিছু নাই।

খবরাখবর—বাংলার খ্যাতনাম্নী চিত্রনটী শ্রীমতী যমুনাও এবার বোম্বাই-এর দিকে পা বাড়াইলেন। সানরাইজ পিকচার্সের শ্রীযুক্ত বিষ্ণুকুমার ব্যাস সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়া তাঁহার নির্ম্মীয়মান ছবি "ঘর"-এর একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় অভিনয়ার্থ তাঁহার সহিত চুক্তি করিয়াছেন।

ডি-লুক্স পিকচার্সের বাংলা ছবি "সংসার"এ অভিনয় করিতেছেন শ্রীমতী কানন দেবী, ছবি বিশ্বাস, তুলসী লাহিড়ী, জহর গাঙ্গুলী, পূর্ণিমা প্রভৃতি। পরিচালনা করিতেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র।

দক্ষিণ কলিকাতায় একমাত্র রঙ্গমঞ্চ **কালিকা থিয়েটার** আগামী বড়দিনের সময় দ্বারোদ্ঘাটন করিবে বলিয়া শুনিতেছি। শরৎচন্দ্রের "বৈকুণ্ঠের উইল উপন্যাস-খানিকে শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য্য নাট্যরূপ দিতেছেন, সম্ভবত তাহা দিয়াই দ্বারোদ্ঘাটন হইবে। নরেশ মিত্র, ধীরাজ ভট্টাচার্য্য, সুশীল রায়, রণজিৎ রায় প্রমুখ অভিনেতাগণ ইতিমধ্যে এখানে যোগদান করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

প্রভাতের যুগান্তকারী চিত্র "রাম-শাস্ত্রী"র একটি বিশেষ প্রদর্শনী সেদিন লাইটহাউসে হইয়া গিয়াছে। ছবিখানি যে সত্যই সকল দিক দিয়া অনবদ্য তাহা প্রত্যেকেই স্বীকার করিয়াছেন। বিস্তারিত সমালোচনা যথাসময়ে আমরা করিব।

নূতন ছবি—এ সপ্তাহে সানরাইজ পিক-চার্সের "মা-বাপ" প্যারামাউণ্ট ও সিটি সিনেমায় মুক্তিলাভ করিবে। ইহাতে অভিনয় করিয়াছেন বীণা, নাজির, ইয়াকুব, জগদীশ প্রভৃতি।

রণজিৎ মুভীটোনের "ধীরাজ" এসপ্তাহে জ্যোতিতে মুক্তিলাভ করিবে। ইহাতে অভিনয় করিয়াছেন ঈশ্বরলাল, সিতারা প্রভৃতি।

রেশনিং প্রবর্ত্তনের জের—লাহোরে রেশনিং প্রবর্ত্তিত হওয়ায় বিরাটকায় চিত্রা-ভিনেতা দুর্গা মোটাকে (দেহের ওজন আট মণের কাছাকাছি) প্রায় একাদশীর খাদ্য খাইয়া প্রাণধারণ করিতে হইতেছে। একা-দশীর খাদ্য খাওয়ার ফলে দুর্গা মোটার দেহের ওজন ইতিমধ্যেই ৮০ পাউণ্ড (প্রায় একমণ) কমিয়া গিয়াছে। দুর্গা মোটা বর্ত্তমানে হাস-পাতালে আছেন। হাসপাতালে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিলে, খাদ্যের জন্য বায়না ধরিয়া ছোট ছেলেমেয়ে যেমন করিয়া কাঁদার ভঙ্গীতে চ্যাঁচায় প্রায় তেমন করিয়া কাঁদার ভঙ্গীতে তিনি বলেন—"আমার জন্য আরো আটা ও চিনি বরাদ্দ করিবার প্রার্থনা জানাইয়া আবেদন করিয়াছিলাম, কিন্তু আমার আবেদন অগ্রাহ্য করা হয়। যে পরিমাণ খাদ্য বরাদ্দ করা হইয়াছে, তাহাতে আমার পক্ষে বাঁচিয়া থাকা সম্ভব নয়, সাধারণ লোকের জন্য যে পরিমাণ খাদ্য দরকার আমার তাহার প্রায় দ্বিগুণ খাদ্য লাগে। দিনে আমি ১০।১২ বার চা খাই এবং প্রতিবারে চারি কাপ করিয়া চা না খাইলে আমার মৌতাতই হয় না।"

দুর্গা মোটার বয়স ৩০ বৎসর। রেশনিং প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে তাঁহার দেহের ওজন ৬৩০ পাউণ্ড (প্রায় আটমণ) ছিল। দৈনিক তাঁহার এক সের করিয়া আটা ও ৫০ কাপ চা লাগে। ইঁহাকে আপনারা পাঞ্চোলী আর্ট প্রোডাক-শনের সব ছবিতেই দেখিয়াছেন।

শ্রদ্ধা-স্রক্

(পরম ভাগবত বৈষ্ণবাচার্য পণ্ডিতবর শ্রীল রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের ১০৫ বর্ষ বয়ঃক্রমলাভে)

—শ্রীবরেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়, এম্-এ

(১)

উনিশ-শ' এক অব্দ !—ধন্য মানি আয়ু মম !
লোচন হেরিল মোর, মূর্ত্তি তব, দেবোপম !
সাহিত্যে-অর্পিত-প্রাণ, সামান্য কিশোর আমি,
"অমৃত","আনন্দে "লিখি,সাধ্য কি গহনে নামি।
পাণ্ডিত্যের গভীরতা, চরিত-মাধুরী তব
মজায়েছে, শান্তি দে'ছে, পুলকে মহিমা নব !

(২)

রসিক ! পরশমণি বিনয়ের অবতার !
প্রাজ্ঞ যাজ্ঞবল্ক তুমি, নীতি-শাস্ত্র-পারাবার।
টুটিল ছোঁয়াচ লেগে অজ্ঞান-দুরিত-ভার !
হে সুধী ! সুহৃদোত্তম ! নমোনমঃ শতবার !
অজ্ঞানের অন্ধকারা ভেদি, ভেদাভেদ-ভ্রান্তি
বিদূরিল পাপ-স্বার্থ পুণ্যের হিরণ-কান্তি।
নহ আরণ্যক ঋষি, ঋতম্ভর ! হে ঋত্বিক !
দ্বিতীয় জনক তুমি, অকুণ্ঠ বলিব ঠিক।
অনিত্য, অলীক, তিক্ত বিষয়াদি-হলাহলে,
প্রপঞ্চের মদগর্ব্বে জ্বলে জীব তুষানলে !
পাপী-তাপী-উদ্ধারণ, নব-প্রাণ-সঞ্জীবনী !
বিতরিলে আচণ্ডালে বৈকুণ্ঠের প্রেম-ননী।

(৩)

শিশির, রসিক দেশে ভাসাইল গৌর-প্রেমে—
পাবনী ত্রিদিব-গঙ্গা প্লাবনে কি এল নেমে ?
প্রেমের ঠাকুরে পূজি জ্যোতিঃ-পুঞ্জে ধন্যধরা !
হেরিনু নয়নময় অপ্রমেয় শ্রান্তি-হরা।
তোমার বিবৃতি-ভাষ্যে, স্মিতহাস্যে শান্তি পাই,
তোমার তুলনা তুমি, অনবদ্য ! জোড়া নাই !
স্মেরাননে পুণ্য-প্রভা ভাতে, ধর্ম্ম-অবদান।
তুমি সাধু, গৃহী মোরা—ভক্ত-ভাক্তে ব্যবধান !
নদের নিমাই ভালে জয়টীকা দিলা, গুনি !
হৃদয়ে ঝঙ্কারে তব নিত্য ভক্তি-সুরধুনি !
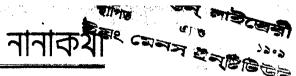
শিশির-পেলব-প্রতিভায় ভাতে রস-তনু !—
ত্রিদিব-ধরার সেতু বাঁধে প্রেম-রামধনু !
যে লভেছে একবার সান্নিধ্য তব, চুম্বক !
সাষ্টাঙ্গে সিঞ্চিল সে যে গঙ্গোত্রীর পুণ্যোদক !
কমনীয়, কান্তচিত, হৃদ্যবাণী, হে ঋত্বিক !
ভক্তি-কণ্টকিত-দেহ, প্রেমাতুর, অনিমিক !
বহিছে হৃদয়ে তব যে মেদুর মন্দাকিনী—
শীকর-সিঞ্চনে জনে পাবে স্বর্গ মর্ত্ত্যে জিনি' !
হে সুভগ, পরন্তপ ! বিপুল সৌভাগ্য গণি,
যতদিন আছ তুমি, "কোহিনুরে" মোরা ধনী !
করাল, ভয়াল-দৃশ্য কবন্ধের বিভীষিকা
সমাজে পশিতে নারে,—ত্রাসহরা হোমশিখা !
হে তাতঃ ! হে গুরু মোর ! শ্রদ্ধান্নাত-প্রাণ মম,
প্রেমোদধি ! ওহে সুধি, নরোত্তম ! নমোনমঃ !

নানাকথা

স্বর্গতা সুধীরা সেনগুপ্তা

গত পূর্ব্ব সোমবার চক্রবৈঠকের উদ্যোগে যশস্বিনী গায়িকা শ্রীমতী সুধীরা সেনগুপ্তার চতুর্থ বার্ষিক স্মরণানুষ্ঠান স্থানীয় আশুতোষ কলেজ লাইব্রেরী হলে উদযাপিত হইয়াছে। ডক্টর কালিদাস নাগ অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করিয়াছিলেন।

কুমারী অঞ্জলি দাশগুপ্তার উদ্বোধন সঙ্গীতের পর অনুষ্ঠানের কাজ আরম্ভ হয়। ডক্টর নাগ, 'চক্রবৈঠকের' সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মজুমদার, 'উদয়ের-পথে' খ্যাত শ্রীযুত জ্যোতির্ম্ময় রায়, ব্যারিষ্টার শ্রীযুত নীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত, শ্রীমতী সুধীরার সঙ্গীত-নৈপুণ্য, সাহিত্য-প্রতিভা ও বহু গুণাবলীর আলোচনা করিয়া বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্ত দীনেশ দাশ পরলোকগতার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদর্শন করিয়া একটি সুন্দর কবিতা আবৃত্তি করেন।

তৎপর সঙ্গীত জলসা সুরু হয়। শ্রীযুত সুবল দাশগুপ্ত, পরিতোষ শীল, রাজেন সরকার, জগন্ময় মিত্র, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য, গোপেন মল্লিক প্রভৃতি কৃতি সঙ্গীতজ্ঞ জলসায় অংশ গ্রহণ করেন।

যতীন্দ্রমোহন সম্বর্দ্ধনা

আগামী ১৭ই অগ্রহায়ণ, রবিবার (৩রা ডিসেম্বর ৪৪) অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় শ্রীযুক্ত অতুল গুপ্তের সভাপতিত্বে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আশুতোষ হলে বাংলার বর্ত্তমান শ্রেষ্ঠ কবি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী মহাশয়কে দেশবাসীর পক্ষ হইতে তাঁহার ৬৩তম জন্মদিন উপলক্ষে সম্বর্দ্ধনার আয়োজন করা হইয়াছে।

এই অনুষ্ঠানটিকে সর্বতোভাবে সাফল্য-মণ্ডিত করিবার জন্য যিনি যাহা দিতে ইচ্ছুক ১৩৩-বি রাসবিহারী এভেনিউস্থিত বেঙ্গল ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেডের কোষাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেবের নামে "যতীন্দ্র-সম্বর্দ্ধনা সমিতির" হিসাবে জমা দিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

বাংলাদেশের বিভিন্ন সাহিত্য প্রতি-ষ্ঠানের পক্ষ হইতে যাঁহারা কবিকে মানপত্র দিতে ইচ্ছুক তাঁহারা শ্রীঅখিল নিয়োগী সম্পাদক, যতীন্দ্র সম্বর্দ্ধনা সমিতি, ১৬, মহারাণী হেমন্তকুমারী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—এই ঠিকানায় প্রেরণ করিলে উহা সাদরে গৃহীত হইবে।

রবি-বাসর

সদস্য শ্রীযুক্ত তিনকড়ি দত্ত মহাশয়ের আহ্বানে গত ১০ই অগ্রহায়ণ (ইং ২৬শে নভেম্বর) রবিবার অপরাহ্ণ ২॥ ঘটিকার সময় বর্দ্ধমান, ই-আই-আর ইণ্ডিয়ান ইনিষ্টিটিউট ভবনে রবিবাসরের পঞ্চদশবর্ষের ত্রয়োদশ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সুকবি শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, কাব্যরত্নাকর, মহাশয় "সাহিত্যের উৎপত্তি" শীর্ষক একটা প্রবন্ধ পাঠ করেন।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

গত ২৫শে ও ২৬শে নভেম্বর বর্দ্ধমান রাজ কলেজে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। বর্দ্ধমানের মহারাজা বাহাদুর এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন।

দীপালীর স্বত্বাধিকারী শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত, ১২৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, দীপালী প্রেসে মুদ্রিত ও দীপালী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

প্রধান সম্পাদক—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় :: সহঃ সম্পাদক—শ্রীধীরেন্দ্রমোহন মজুমদার বি. এল.

১৬শ বর্ষ VOL. XVI. } ২১শে অগ্রহায়ণ ১৩৫১ :: December 7, 1944 { ৪৯শ সংখ্যা No. 49

দীপালীর চাঁদার হার

প্রতি সংখ্যা	...	চার আনা
ডাকে	...	সাড়ে চার আনা
বার্ষিক চাঁদা	...	১২।০
ষান্মাষিক „	...	৬॥০
ত্রৈমাসিক „	...	৩॥০

লেখকদের প্রতি

১। গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা বা যে-কোনো রস-রচনা দীপালীতে প্রকাশার্থ লেখকরা পাঠাইতে পারেন।

২। অমনোনীত রচনা ছিঁড়িয়া ফেলা হয়। অবশ্য যদি সঙ্গে উপযুক্ত ডাক টিকিট থাকে তবেই তাঁহাকে রচনা ফেরৎ দেওয়া হয়।

৩। প্রত্যেক রচনার সহিত লেখকের নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট ভাবে লিখিতে হইবে।

এজেন্সীর নিয়মাবলী ও বিজ্ঞাপনের হার সম্বন্ধীয় অনুসন্ধানের জন্য পত্রালাপ করুন :

ম্যানেজার, দীপালী
১২৩/১ আপার সার্কুলার রোড
কলিকাতা
ফোন : বড়বাজার ৩২৫৩
টেলিগ্রাম : DIPALI

আলোচনী

ডাঃ জর্জ্জ ক্রেসী একজন মার্কিণ অধ্যাপক। সম্প্রতি সারা পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া ইনি দেশবাসীর নিকট ভারত সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিয়াছেন। কয়েকজন বিশিষ্ট ভারতীয় তাঁহাকে নাকি বলিয়াছেন, "they believed that Mr. Churchill had purchased American aid by mortgaging Indian Empire to President Roosevelt" অর্থাৎ "এই বিশিষ্ট ভারতীয়গণ" বিশ্বাস করেন মিঃ চার্চ্চিল প্রেসিডেণ্ট রুজভেণ্টের নিকট "ভারতবর্ষ" বন্ধক রাখিয়া মার্কিণের সাহায্য ক্রয় করিয়াছেন।

* * * *

ডাঃ ক্রেসী "বিশিষ্ট ভারতীয়"দের মতামত বলিয়া যাহা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা এদেশের সাধারণদের কল্পনা-বিলাস বলিয়া ইদানীং আমাদের ধারণা হইয়াছিল। হাটে, বাজারে, সস্তা রেস্তঁরা বা চায়ের দোকানে, কিছুদিন যাবৎ এই ধরণের মুখরোচক আলোচনা আমরা অগ্রাহ্য সহকারে শুনিয়াছি। চার্চ্চিল সাহেব বৃটেনের এই বিরাট জায়গির বন্ধক দিয়া নাকি মার্কিণের নিকট হইতে মাল কিনিতেছেন। মার্কিণ শিল্পপতিরা ধুরন্ধর কারবারী লোক—ধারে বা I. O. U. এর মর্য্যাদা না রাখিয়া বন্ধকরূপ পাকা বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছেন। তাহা অত্যন্ত অশ্রদ্ধেয় গুজব বা অশিক্ষিত সাধারণের আলোচনা বলিয়া ধরিয়া লওয়া গিয়াছিল তাহাই যে কতিপয় বিশিষ্ট ভারতীয়ের মতামত বলিয়া প্রচারিত হইবে তাহা কে ভাবিয়াছিল! বাংলা দেশ তথা ভারতের অজ্ঞ জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত গুজব আজ এ্যাংলো-মার্কিণ সাংবাদিক জগতে বিশ্রী কোলাহলের সৃষ্টি করিয়াছে। আমাদের দেশের "অসাধারণ"গণ এই ধরণের গুজব যে বিশ্বাস করেন এইরূপ আমাদের ধারণা ছিল না। ডাঃ ক্রেসী এই ভ্রম সংশোধনের সুযোগ দিয়াছেন বলিয়া এ দেশের অনেকেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবেন।

* * * *

আসলে, Lend-lease তত্ত্বের মূল কথা আজও জনসাধারণ কেন, বহু শিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যেও পরিস্ফুট হয় নাই। Lease-lend ইহার শব্দগত অর্থ করিয়াই আমরা যত অনর্থের সৃষ্টি করিয়াছি। আমরা ইজারা দিতেছি তাহার পরিবর্ত্তে তোমরা আমাদের ধার দাও—সোজা এই মানে করিয়া যাঁহারা গুজব সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাদের দোষ দেওয়া যায় না। যুদ্ধের প্রয়োজনে এ্যাংলো-মার্কিণ অর্থনীতি কত গ্রন্থীর উপর গ্রন্থী রচনা করিয়াছে তাহা জনসাধারণে জানিবে ইহা আশা করাই অন্যায়। কত অলিখিত বোঝাপড়া, গুপ্ত protocol, কত সহস্র জটিলতার পথ বাহিয়া বর্ত্তমান এ্যাংলো-মার্কিণ একতার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা যদি আমরা এত সহজে জানিয়া ফেলিব তাহা হইলে professional বা পেশাদার diplomacyর মান রহিল কোথায়!

কিন্তু তথাপি মনে হয় বহু প্রচারিত এ্যাংলো-মার্কিণ আঁতাতের কোথায় যেন চিড় খাইয়াছে। মাঝে মাঝে তাহার বিস্ফোরণ বিভিন্ন নিউজ এজেন্সির মারফৎ এ দেশে ভাসিয়া আসে। সবটুকু হয়তো আসে না। মনে হয় মিতালীর যে বিচিত্র প্যাটার্ণ দুইটি দেশের রাষ্ট্রনায়ক গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন তাহা বজায় রাখা বাস্তব ক্ষেত্রে সম্ভব হইতেছে না। ফিলিপস্ রিপোর্ট হইতে আরম্ভ করিয়া বিলাত হইতে persona non grata হিসাবে তাঁহার অপসারণ—সব কিছুর মধ্যেই যেন একটা বহু প্রসারিত উত্তাপের আমেজ রহিয়াছে। পরলোকগত রাষ্ট্রনৈতিক Wilkie-এর বহুখ্যাত গ্রন্থ "One world"এর মধ্য দিয়াও বৃটেনের সাম্রাজ্যনীতির অসহিষ্ণু সমালোচনা পরিবেশিত হইয়াছে। পৃথিবীর রাষ্ট্রীয় চিন্তার বিরাট কটাহ হইতে ধূম উদ্গীরণ হইতেছে। যুদ্ধশেষে কোন বস্তু পরিবেশিত হয় তাহা আজ অনেকেই সশঙ্ক চিত্তে লক্ষ্য করিতেছেন।

* * *

কেন্দ্রীয় পরিষদের বর্ত্তমান সেসনেই এইরূপ গুজব প্রচারিত হইতেছিল, অতঃপর কলিকাতার খাদ্য রেশন সরবরাহ করিবার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করিবেন না। বাংলা সরকারকেই ইহার দায়িত্ব ও ব্যবস্থার ভার গ্রহণ করিতে হইবে। সম্প্রতি নয়া দিল্লী হইতে স্যার জাওলাপ্রসাদ যে বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন তদ্বারা এই গুজবের সত্যতা সমর্থিত হইয়াছে। এই বিবৃতির চতুষ্পার্শ্বে অফিসিয়াল ভাষার কেরামতি থাকা সত্বেও আসল কথা বুঝিতে জনসাধারণের দেরী হয় নাই। যাহাতে কোনরকম আশঙ্কার সৃষ্টি না হয় তাহার জন্য এই বিবৃতিতে যথেষ্ট বাগাড়ম্বর করা হইয়াছে। Statesman পত্রিকা এসম্বন্ধে মন্তব্য করিতে গিয়া বলিয়াছেন এই পন্থা "Psychologically unwise" অর্থাৎ জনসাধারণের মনস্তত্ত্বের কথা বিবেচনা করিলে ভারত সরকারের এই পন্থা চিন্তাশীলতার পরিচায়ক নয়। শুধু মনস্তত্ত্বের কথাও নয়, বাস্তবের ক্ষেত্রে মানুষের জীবন-মৃত্যুর প্রশ্ন যেখানে রহিয়াছে সেই দিক দিয়া এই পন্থা কতখানি অভ্রান্ত তাহা আগামী দিনগুলি প্রমাণিত করিবে। এ সম্পর্কে বর্ত্তমানে ইহার বেশী কিছু বলা চলে না।

* * *

১৯৪৩ সালের গোড়ার দিকেও সরকারী বিবৃতিতে যে আশ্বাসের বার্ত্তা পাওয়া গিয়াছিল বৎসরের মধ্যভাগ কাটিতে না কাটিতে দেখা গেল তাহার মূল্য কতটুকু। সরকারী প্রচারকার্য্যের বিরাট ব্যবস্থা থাকা সত্বেও কোন প্রকারে সে বিপর্য্যয়কে কেহ রোধ করিতে পারে নাই। ১৯৪৪ সালের শেষ প্রান্তে দাঁড়াইয়া মনে হইতেছে, গত বৎসর অনাহার—মৃত্যুর মধ্য দিয়া মহাবঙ্গের যে আহুতি চলিয়াছিল, আজ মহামারী ও স্বাস্থ্যহীন অকালমৃত্যুর মধ্য দিয়া যেন তাহারই জের চলিতেছে। বাঙলার অর্থনীতি আজও তাহার স্বাস্থ্য অর্জ্জন করিতে পারে নাই। ভারত সরকার অতিব্যস্ততায় সে দিকেও যেন বাধার সৃষ্টি করিলেন!

* * *

সম্প্রতি "ডেলী হেরাল্ড"এর বিশেষ সংবাদদাতার মতামতের যে ছিটাফোঁটা এদেশে প্রচারিত হইয়াছে তাহা এদেশের ইউরোপীয় মহলে বিশেষ উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়াছে। ব্যাপারটী এদেশের শ্বেতাঙ্গ অসামরিক অধিবাসী ও সামরিক ব্যক্তিদের সম্পর্ক লইয়া। 'ডেলী হেরাল্ডে'-এর বিশেষ সংবাদদাতা অভিযোগ করিয়াছেন, এদেশের বড় সাহেব ও মেমসাহেবগণ বৃটেনাগত সৈনিকদের সহিত পার্থক্য রক্ষা করিয়া চলেন। মেলামেশা ও খানাপিনার ব্যাপারে এদেশের সাহেব-মেমগণ এই সব বিলাতী সৈনিকদের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন তাহা আপত্তিকর। সাধারণ মানুষ হিসাবে এইসব সৈনিকদিগের সহিত ব্যবহার করিতে না কি এ দেশের ইউরোপীয় মেমসাহেবদের বাধে। বিলাতি সৈনিকদের সুখ-সুবিধা সম্বন্ধে লর্ড মানষ্টার সম্প্রতি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল দেখিয়া গিয়াছেন, তাঁহার রিপোর্টেও নাকি এই সমস্যার কথা আলোচিত হইবে। ভারতীয়দের পক্ষে এ সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করা শক্ত। সেযুগে সামাজিকতার ক্ষেত্রে ত্রুটি-বিচ্যুতি হইলে বা পংক্তি ভোজনের ব্যাপারে অশোভন কিছু ঘটিলে সমাজপতিদের মধ্যে লড়াই বাধিয়া যাইত। ইহা নিছক ভারতীয় tradition। 'ডেলী হেরাল্ডে'র সংবাদে সেই সামাজিকতার প্রশ্নই উঠিয়াছে, বিশেষ করিয়া এই যুগে। দেখিয়া তাক্ লাগিয়া যাইতেছে। ইহাকে শুধু ভাবপ্রবণতা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় কি? কোন সত্যবস্তু না থাকিলে সাগরপার হইতে এ সংবাদ এতদূরে প্রচারিত হইবার সার্থকতা কি ছিল? বিলাত-ফেরৎ বহু ভারতীয়ের মুখে শুনিয়াছি সুয়েজ পার হইলেই মেম সাহেবদের আচরণের পরিবর্ত্তন ঘটে। বিলাত হইতে গোটা রাস্তাটা ইহাদের আচার ব্যবহার ত্রুটিহীন থাকে। ভারতের কাছাকাছি হইলে মেজাজ ও ব্যবহার দুইই বিগড়াইয়া যায়। ইহা হইল খাস তালুকের প্রজা যাহারা তাহাদের সম্পর্কে। বৃটিশ সৈনিকদের সম্পর্কে তো সে কথা খাটে না।

* * *

সিন্ধু সরকার আর্য্য সমাজীদের পবিত্র গ্রন্থ "সত্যার্থ প্রকাশ"এর ১৪শ অধ্যায় ভারতরক্ষা আইনে নিষিদ্ধ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে যথেষ্ট আন্দোলনও হইতেছে। "মাসিক বসুমতী" হইতে এ সম্পর্কে আমরা কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"এই গ্রন্থখানি ৭৭ বৎসর পূর্ব্বে প্রচারিত। চার বৎসর পূর্ব্বে যখন ইহার উর্দ্দু অনুবাদ প্রকাশিত হয়, তখন মুসলমানদের তরফ হইতে বহু কলরব উঠিয়াছিল, কিন্তু সে কলরব থামিয়া যায়। মুসলিম লীগের প্রভাবে সিন্ধুসরকার এইবার মনে করিয়াছেন, 'সত্যার্থ প্রকাশ'-এর চতুর্দ্দশ অধ্যায় প্রচারিত থাকিলে ভারতকে আর বৃটিশ রাজ্যের কবলে রাখা সম্ভব হইবে না। ভারতরক্ষা আইনের ৪১ বিধির এই অপপ্রয়োগের বিরুদ্ধে ভাই পরমানন্দ কেন্দ্রীয় পরিষদে যখন প্রস্তাব উত্থাপন করেন (২১শে কার্ত্তিক) তখন মুসলিম লীগের সদস্যগণ সিন্ধু সরকারের কাজের সমর্থন করেন এবং মুসলিম লীগের সহিত এক সান্কিতে খানা খাইবার লোভে তথাকথিত কংগ্রেসপন্থী সদস্যগণ বেমালুম সরিয়া পড়েন। ফলে প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যাত হয়। আলোচনাকালে শ্রীযুত আনন্দমোহন দাস বলেন,—বাইবেলেও খ্রীষ্টান ও ফ্যারিসিজদের বিরুদ্ধে আক্রমণ আছে, কোরাণেও বিধর্ম্মীদিগকে আক্রমণ করা হইয়াছে। স্যার সৈয়দ আমেদ খাঁন কোরাণের কোন কোন অংশের বিরুদ্ধে মন্তব্য লিখিয়াছেন। এসকল গ্রন্থ তো ভারতরক্ষার বিঘ্নস্বরূপ বিবেচিত হয় নাই। স্যার বিঠল চন্দ্রাবরকর বলেন—ভারত সরকারের যদি ইহাই ধারণা হইয়া থাকে যে, ভারতের সকল প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থ আপত্তিকর, তাঁহারা কমিটি গড়িয়া গ্রন্থগুলি আপনাদের অকলঙ্ক নীতিবোধের মাপকাঠিতে মাপিয়া দেখুন না। ভারতরক্ষা বিধি ধর্ম্মব্যাপারেও প্রযুক্ত হইতে পারে কি না তাহা জানা প্রয়োজন। "সত্যার্থ প্রকাশ"এ এমন কোন বিষয় আছে কি যাহা ইংরেজের শত্রুকে সাহায্য করিতে পারে। ইহাতে এমন কোন আপত্তিকর বিবরণ বা গুপ্তভাষা লিপিবদ্ধ হইয়াছে কি যাহা গত ৭৭ বৎসর অবাধে

মধুসূদনের কাব্যমাধুরী

—শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

অপূর্ব্ব ভাষায় অনির্ব্বচনীয় আবেগে পরম শ্রদ্ধার সহিত মধুসূদন বলিয়াছেন :—

"উর তবে, উর দয়াময়ি বিশ্বরমে
উরি দাসে দেহ পদছায়া"

কোনও বড় কাজ মানুষ কি দেবতার দয়া ছাড়া করিতে পারিয়াছে ?

মধুসূদন—খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী, বীর্য্যবান দুঃসাহসী কবি নিঃসঙ্কোচে লিখিয়াছেন—

"নিজবলে দুর্ব্বল সতত মানব
সুফল ফলে দেবের প্রসাদে"

ইংরাজীতে অমিত্রাক্ষর ছন্দ (Blank-verse) মধুসূদনের পূর্ব্বে অন্ততঃ একজন বাঙ্গালী কবির দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল; কিন্তু কেহই তাহা ব্যবহার করিতে সাহস করেন নাই। পরন্তু কবি ঈশ্বর গুপ্তই ছন্দ সম্বন্ধে বিদ্রূপের সহিত লিখিয়াছেন :

"কবিতা কমলা কলা পাকা যেন কাঁদি
ইচ্ছা হয় যত পাই, পেট ভরে খাই"

ইন্দ্রনাথের "ছুছুন্দরী বধ" শীর্ষক খণ্ড কবিতাও এই ছন্দের প্রতি অকারণ শ্লেষ ও "মেঘনাদবধ কাব্যের" প্রতি বিদ্বেষ-মূলক অভিব্যক্তি।

মধুসূদন বলিয়াছেন "I shall look to the great Dramatists of Europe as my model ; তাঁহার ইংরাজী, ফ্রেঞ্চ, ইতালী, গ্রীক, জার্ম্মাণ ও সংস্কৃত ভাষায় দক্ষতা বাংলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছে। তিলোত্তমার বিলাসলীলা Paradise Lostএ Eveএর কথা মনে পড়াইয়া দেয়। রাজ্যচ্যুত দেবরাজ ইন্দ্রের কাহিনী Keatsএর Hyperionএর প্রথমাংশের ছায়া; বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক তিলোত্তমা সৃষ্টি Vulcan কর্ত্তৃক Achilles এর বর্ম্ম নির্ম্মাণের সহিত অনেকাংশে মিলিয়া যায়; 'পদ্মাবতী' নাটকে স্বর্ণ পদ্ম বৃত্তান্ত সম্পূর্ণ গ্রীক কল্পনা; 'মেঘনাদবধ' কাব্যের শব্দসম্ভার, বাক্য-বিন্যাস, বহু উপমা ও বর্ণনার ধারা Paradise Lost ও Danteর Infernoর সহিত মিলিয়া যায়। কিন্তু ইহাকে অনুকরণ বলে না; সমালোচকরা ইহাকে স্বীকরণ বলিয়াছেন। বঙ্কিম, রমেশ, রবীন্দ্রনাথ, স্বর্ণকুমারী দেবী, হেমচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, নবীন চন্দ্র প্রভৃতি মনিষীরা স্বীকরণ দ্বারা বঙ্গভাষা সমৃদ্ধ করিয়াছেন।

কবির প্রধান গুণ সৃষ্টি-কৌশল; মনের কষ্টি-পাথরে যাচাই হইয়া যে সৃষ্টি খাঁটি সোনার পদ লাভ করিল তাহাই কবিকে অমর করে। এ আস্বাদের আনন্দকে যে উপনিষদ "ব্রহ্মস্বাদের" আনন্দের "সহোদর বলিয়াছেন। ব্রহ্মাই যে আদিকবি। মধুসূদন নানা রসের পরিবেশনে বাঙালীকে তৃপ্ত করিয়াছেন। নিরবধি আনন্দে তাঁহার সযত্ন-সঞ্চিত সুধা পান করিতেছি। তাঁহার ভাষার অলঙ্কার ভাষার বাহিরের সজ্জা নহে, তাহা লতায় পুষ্পের মতো আপনি বিকশিত। তাহা পুষ্পের, গন্ধের মতো, মলয়ের স্নিগ্ধতার মতো, বসন্তের শ্যাম শোভার মতো নিবিড়। তাঁহার ভাষার বাণী-লাবণ্য অপূর্ব্ব স্বাদ ও সৌরভ তাঁহার বর্ণনায় সুমার্জ্জিত রুচি ও রসবোধ উপমার মাধুর্য্য ও শব্দবিন্যাস ও ছন্দ-ঝঙ্কার তাঁহার একান্ত নিজস্ব। অনুপ্রাস তাঁহার দুর্ব্বোধ্য কষ্টকল্পনা নহে, সাবলীল সারল্যে মন মাতাইয়া বহিয়া যাইতেছে; নূতন শব্দ-সৃষ্টি, ধ্বনিমাধুর্য্য, বলিষ্ঠ অভিব্যক্তি তাঁহার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। চিঠিপত্রে তাঁহার যে সকল উদার, স্নেহকোমল অথচ দৃঢ় মনের পরিচয় পাই, রচনাতেও সেই ভাবের মনের বিকাশ দেখি। 'শর্ম্মিষ্ঠা' নাটকের 'প্রস্তাবনা'য় তিনি লিখিয়াছেন—

"অলীক কুনাট্য রঙ্গে মজে লোক রাঢ়ে বঙ্গে
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়
সুধারস অনাদরে বিষবারি পান করে,
তাহে হয় তনু মন ক্ষয়
মধু বলে, জাগ মা গো, বিভু স্থানে এই মাগ
সুরসে প্রবৃত্ত হউক তব তনয় নিচয়"

বীর, রৌদ্র, বীভৎস, আদি, করুণ, শান্ত রস তাঁহার প্রতিভার স্পর্শে মুখর হইয়া উঠিয়াছে। করুণ রসকে তিনি প্রাধান্য দিয়াছেন—

করুণা বামার নাম রসকুলে রাণী
সেই ধন্য বশ সতী যার তপোবলে।'

বীর ও রৌদ্র রসের অভিব্যক্তির তুলনা ...। আদি রস শান্ত রসের সহিত '...

মাত্র বর্ণনার উল্লেখ করিব—যজ্ঞাগারে যাইবার পূর্ব্বে ইন্দ্রজিৎ প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করিয়া পত্নী প্রমীলার ঘুম ভাঙ্গাইয়া বিদায় লইতেছেন :—

"প্রমীলার করপদ্ম করপদ্মে ধরি
রথীন্দ্র, মধুর স্বরে, হায়রে, যেমতি
নলিনীর কানে অলি কহে গুঞ্জরিয়া
প্রেমের রহস্য কথা, কহিলা (আদরে
চুম্বি নিমীলিত আঁখি) ডাকিছে কূজনে,
হৈমবতী উষা তুমি, রূপসি তোমারে
পাখী-কুল ! মিল, প্রিয়ে, কমল লোচন !
উঠ চিরানন্দ মোর ! সূর্য্যকান্তমণি—
—সম এ পরাণ, কান্তে; তুমি রবিচ্ছবি ;—
তেজোহীন আমি তুমি মুদিলে নয়ন।
উঠি দেখ শশিমুখী, কেমন ফুটিছে,
চুরি করি কান্তি তব মঞ্জু কুঞ্জবনে
কুসুম"

কাব্যের সর্ব্বত্র কবি প্রমীলার মাধুর্য্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কোমলতায় বঙ্গ কুলবধু, বীর্য্যে ভৈরবী, শোকে অটল। সীতা সরমার সখিত্বে তিনি বঙ্গ সাহিত্যকে পরম সম্পদ দিয়াছেন—ভাষা ও ভাবের চরমোৎ-

---

প্রচারিত থাকিলেও বর্ত্তমানে তাহার প্রচারে রাষ্ট্রবিপ্লব, রাজনীতিক প্রলয়, অন্ততঃপক্ষে গোলামীর তকমাবহী লিল্লু প্রাদেশিক ... অনিবার্য্য হইবে ...

কর্ষ, মাধুর্য্যের শতদল এমনটি কোথাও দেখিয়াছি কি ?

'পঞ্চবটি বনে মোরা গোদাবরী তটে
ছিনু সুখে! হায় সখি, কেমনে বর্ণিব
সে কান্তার-কান্তি আমি?
অজিন (রঞ্জিত আহা, কতশত রঙে!)
পাতি বসিতাম কভু দীর্ঘ তরু মূলে
সখীভাবে সম্ভাষিয়া ছায়ায়, কভু বা
কুরঙ্গিনী সঙ্গে রঙ্গে নাচিতাম বনে
গাইতাম গীত শুনি কোকিলের ধ্বনি।
নব-লতিকার সতি, দিতাম বিবাহ
তরুসহ; চুম্বিতাম মুঞ্জরিত যবে
দম্পতি, মঞ্জরীবৃন্দে, আনন্দে সম্ভাষি
নাতিনী বলিয়া সবে! গুঞ্জরিলে অলি
নাতিনী-জামাই বলি বরিতাম তারে।
কভু বা প্রভুর সহ ভ্রমিতাম সুখে
নদী তটে, দেখিতাম তরল সলিলে
নূতন গগন যেন, নব তারাবলী,

নব-নিশাকান্তকান্তি!"

মন লইয়া বুঝি এমন খেলা কেহ খেলেন নাই। টেনিসনের সুরমাধুরী, ধ্বনিঝঙ্কার, অনুপ্রাসের লীলা মনে পড়িতেছে। পরম আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছি এই ভাবিয়া—যে আমরা ইংরাজের মত কাব্যসম্পদে ধনী! আমাদেরও বাংলা কাব্যের শব্দতরঙ্গ সুরের লীলামাধুরী বহিয়া অনন্তের পথে জয়যাত্রা করিয়াছে! কবি ধন্য, তাঁহার দেশ ধন্য! যোগীন্দ্রনাথ বসু, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, নগেন্দ্রনাথ সোম, প্রসিদ্ধ কবি ও সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার মধুসূদনের কাব্য লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। আরও আলোচনা আবশ্যক। মধুসূদন ঋণস্বীকারে কার্পণ্য করেন নাই। দান্তে, ভার্জিল, হোমার, ট্যাসো, ভবভূতি, কালীদাস, বিদ্যাসাগর প্রত্যেককেই অর্ঘ্য দিয়াছেন। বাংলা কবিতায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্ত্তনের মতো চতুর্দ্দশপদী কবিতা তাঁহার নূতন সৃষ্টি। নাটক, প্রহসন, নীতিমূলক কবিতা প্রত্যেকটিই তাঁহার বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়াছে। নাটকে ও প্রহসনের স্থানে স্থানে তিনি রচনায় সৌষ্ঠব ও সুরুচি ব্যাহত রাখিতে পারেন নাই। তাহার কারণ, কতকটা সে যুগের প্রভাব ও পরিস্থিতি।

বহু বিদেশী ভাষার কবিতা তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল, মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা আগেও তিনি Shakespeare হইতে Tomorrow, Tomorrow & Tomorrow সমগ্র মনের মাধুরী মিশাইয়া আবৃত্তি করিয়াছিলেন। তিনি বাণীর বরপুত্র, কমলার কৃপালাভ করেন নাই—তাই কমলার উদ্দেশে এই মর্ম্মস্পর্শী কবিতা নিবেদন করিয়াছিলেন :—

ভেবেছিনু, মোর ভাগ্যে, হে রমাসুন্দরি!
নিবাইবে সে রোষাগ্নি, লোকে যাহা বলে
হ্রাসিতে বাণীর রূপ তব মনে জ্বলে।
ভেবেছিনু হায়, দেখি ভ্রান্তি ভাব ধরি'
ডুবাইছ, দেখিতেছি ক্রমে এই তরী;
অদয়ে অতল দুখসাগরের জলে
ডুবিনু, কি যশ তব হবে রঙ্গস্থলে?"

প্রত্যাখ্যান

(উপন্যাস)

শ্রীসুধাংশু কুমার হালদার, আই, সি, এস্

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(১১)

কাল মল্লিকার সঙ্গে তার বিয়ে।

চুপ করে অসীম বসেছিল ট্রেণের প্রথম শ্রেণীর একটা কামরায়। বাইরের চলন্ত দৃশ্যপটের দিকে তার মন ছিল না। তার আপন মনের মধ্যে ভেসে চলছিল আর একটা চলন্ত দৃশ্যপট,—তার মা, তাদের গ্রামের বাড়ী, দত্তমাসীমা, নমিতা, মিসেস্ ঘোষ, মল্লিকা,—বিশেষ ক'রে নমিতা আর মল্লিকা। মল্লিকার মূর্ত্তিখানি তার সমস্ত মন প্রায় জুড়ে আছে, শুধু কোথায় যেন একটু দ্বন্দ্ব বেধেছে, কে যেন কেবলি তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে,—ফিরে এস, ফিরে এস। কে এমন ক'রে আজ ডাকে রে, কার সজল চোখের করুণ চাহনি ভেসে আসে এমনি ক'রে?···সহসা অসীমের মনে জাগল নমিতার মূর্ত্তি, দুটি হাত জোড় করা, একদৃষ্টে যেন চেয়ে আছে তারই পানে,কী দেখছে সেই জানে!···অসীমের অন্তরটা হাহাকার ক'রে উঠল, কি করবে, কি করা উচিত তার? এখনো সময় আছে, কিন্তু কাল হয়ে যাবে অনেক দেরী। এ কী সমস্যার মধ্যে ফেলেছেন ভগবান তাকে! নমিতা আর মল্লিকা, অসীমের মনে হ'ল বর্ষা ঋতু আর বসন্ত ঋতু। আপনাকে নিবেদনে নিঃশেষ ক'রে যিনি জলদান করেন, ফলদান করেন, সমস্ত জ্বালা সমস্ত দাহ ধুইয়ে মুছিয়ে নিশ্চিহ্ন ক'রে দেন, পুরুষের জন্যে বাইরের সমস্ত অধিকার খোলা রেখে যিনি শুধু গৃহের মধ্যে পাতেন তাঁর সিংহাসন, সে মেয়ে নমিতা, ঐ যে তার মনের একটি গোপন কোণে করজোড়ে আছেন দাঁড়িয়ে।···অসীম ভাবল, যদি আমি সেবা-লোলুপ হতুম, লালনের জন্যে, যত্নের জন্য হতুম লালায়িত, তাহলে যেতুম অবিচলিতচিত্তে নমিতার কাছে। কিন্তু মন যে আমার তেমন নয়। রুক্ষ শুষ্ক গাছের মতন সে, যা কেবল মরুভূমিতেই জন্মায়,—সরস আর্দ্রতায়, লালনের পালনের আতপ্ত আবহাওয়ায় সে যে অতিষ্ঠ হ'য়ে হাঁফিয়ে উঠবে।...আর যে মেয়ে একটি নিমেষের একটি চাহনিতেই মনের তন্ত্রীকে সুরসপ্তকে বাজিয়ে তোলেন, যিনি ঘরে এবং বাইরে উভয়ত্রই আনন্দের সাথী, বিপদের বন্ধু, যিনি জোড়হাত ক'রে পদসেবা করেন না, সমকক্ষ হ'য়ে এসে একেবারে পাশে বসেন,—যিনি মনে স্নেহ জাগান না, উন্মত্ততা আনেন,—সে মেয়ে মল্লিকা।···অসীম মনে মনে বলল, হে ভগবান, যে-পথে পা বাড়িয়েছি, আসবে কি সে-পথে মঙ্গল?···তুমিই জানো, তুমিই জানো।

অবিরল বেগে ট্রেণ ছুটে চলেছে।

নাঃ আর ভাবতে পারা যায় না, যা হয় হবে।···বাইরে তখন অবিশ্রাম ধারা বর্ষণ চলেছে। ট্রেণটা যেন প্রকাণ্ড আর্দ্র জানোয়ারের মতো বিকট লাল চোখে গর্জ্জন ক'রে উঠছে। ক্লান্ত হ'য়ে অসীম ট্রেণের বাতি নিভিয়ে তার বিছানার ওপর শুয়ে পড়ল। সশব্দে পাশ দিয়ে ঠিক উল্টা দিকে আর একখানা ট্রেণ ছুটে চলে গেল। তারি এক ইন্টার-ক্লাসের কামরায় বসে বসে গোকুল ঝিমুচ্ছিল।

ঘুমে আর জাগরণে অসীমের মনটা যখন ঘুলিয়ে গেছে, তখন সে দেখল তার মাকে। এ যেন একটা আগুনে পুড়ে যাওয়া কোন্ বিকট দেশে সে এসেছে, এখানকার সব কালো। মাটির রঙ কালো, গাছের রঙ কয়লার মতো কালো। আকাশ ছাই-এর মতো কালো-সাদায় মেলানো। জলের চিহ্ন নেই কোনোখানে, কয়লার গুঁড়া দিয়ে তৈরী ভসভসে রাস্তায় চলেছে সে হেঁটে। তার মা চলেছেন পিছনে পিছনে। পৌছল একটা শালকাঠের খুঁটি দিয়ে তৈরি ঘরে, ওপরে তার টিনের চাল, দরোজা নেই, জানালা নেই,—শুধু সামনের দিকটা হাঁ হাঁ করছে খোলা, তার তিনদিকে দেওয়াল দিয়ে ঘেরা ঘরের মাঝখানে কয়লার গুঁড়োর মেঝের ওপর একটা কালো কাঠের বেদী, তার ওপর লাল চেলী দিয়ে ঢাকা কি একটা পদার্থ রয়েছে! হঠাৎ অসীমের মনে হ'ল সে বিয়ে করতে এসেছে, কিন্তু কনে কই, বরযাত্রীরা কই, বাজ্‌না বাজে না কেন! আশপাশে কারা যেন সব ছায়ামূর্ত্তির মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে, কোনো শব্দ নেই, হাওয়া নেই, সব থম্‌থমে। বেদীর সামনে এগিয়ে যেয়ে হঠাৎ তার মায়ের কথা মনে পড়ল, পিছনদিকে তাকিয়ে দেখল তিনি নেই, কখন গেছেন চলে। ভাবল, এখন কি করা যায়! কিন্তু ফিরে যাবার আর সময় নেই, অনেক হয়ে গেছে দেরী। বেদীর সামনে ঝুঁকে পড়ে দু'হাত দিয়ে লাল চেলী ঢাকা জিনিষটি তুলে ধরল,—দেখল এ কী! এ যে একটা শাণিত তরবারি!···কোথায় যেন কান্না উঠল মর্ম্মরিয়ে, দূর হ'তে তার ধ্বনি এল অতি মৃদু বীণাধ্বনির মতো। কে যেন কাঁদছে,—বুকফাটা কান্না কাঁদছে!...

ধড়মড় ক'রে অসীম বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। সকাল হ'য়ে গেছে, ট্রেণটা মন্থর গতিতে একটা বড় ষ্টেশনে এসে থামছে।

হৈ হৈ ক'রে হরিমোহনের লোকজন এসে তাকে অভ্যর্থনা করে নিল। কেউ বললে "এস বাবাজী নেমে এস, রাত্রে কোনো কষ্ট হয় নি তো!" কেউ বললে, "আমায় চিনতে পারলে না হে, আমি যে সম্পর্কে মল্লিকার ভাই হই, তোমার বড় কুটুম।" রাশি রাশি ফুলের মালায়, রাশি রাশি আদর-আপ্যায়নে অসীমের স্বপ্নের স্মৃতি কোন্‌খানে তলিয়ে গেল। হরিমোহনের গ্রামে যেতে হলে এখানেই গাড়ী বদল করতে হবে, মেল তো সে ছোট ষ্টেশনে থামবে না। সবাই তাকে একরকম হিড় হিড় ক'রে টেনে নিয়ে গেল পাশের প্ল্যাটফর্মে, চড়িয়ে দিলে আর একটা ট্রেণের কামরায়। তারপর চায়ের আয়োজনে, কেল্‌নার কোম্পানীর তকমাপরা উর্দ্দীধারী খানসামাদের ছুটাছুটিতে, সঙ্গের দল-বলের চীৎকারে প্ল্যাটফর্মের সে অংশটাতে যেন হাট বসে গেল।...

গোধূলি লগ্নে বিয়ে, কিন্তু গোধূলির অনেক আগে হ'তেই আকাশ ঘোলাটে ক'রে এল ঝড়। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হ'ল বর্ষণ। অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারার মাঝে বরের মোটরগাড়ী যখন বোসেদের পুরাণো প্রাসাদের দেউড়ীতে এসে থামল, বুড়ো রামদীন দরোয়ান যখন ছুবার বন্দুকের আওয়াজ ক'রে বরের শুভাগমন ঘোষণা করে দিল, হঠাৎ তখন ডাইনামোর কলকজা কেমন ক'রে বিগড়ে গিয়ে সমস্ত বাড়ী অন্ধকার হ'য়ে গেল। হট্টগোলের আর অন্ত রইল না, কেউ হোঁচট খেয়ে পড়ল, কেউ গাল দিয়ে উঠল, কেউ চীৎকার ক'রে কাকে ডাকতে লাগল। নিবিড় অন্ধকারকে বিদ্ধ ক'রে কোথায় পোঁ পোঁ ক'রে শাঁখ বেজে উঠল, ছেলে-মেয়েদের, গৃহিণীদের কোলাহলকে বিদ্রূপ ক'রে আকাশে গুরু গুরু মেঘের গর্জন শোনা গেল। লণ্ঠনধারী দু'জন আত্মীয়কে সঙ্গে করে হরিমোহন এসে বরের হাত ধরে গাড়ী থেকে নামালেন। অন্তঃপুরে কোনো সুরসিকা বধূর বেশে সজ্জিতা মল্লিকাকে বললেন, স্বয়ং অসীমচন্দ্র যখন এসে হৃদয়ে উদিত হয়েছেন, তখন নকল আলোর দরকার কি!

আধঘণ্টার মধ্যে ডাইনামোর ত্রুটি সংশোধন ক'রে নেওয়া হ'ল, সমস্ত বাড়ী আবার আলোয় আলো হয়ে গেল। প্রচুর ধূম-ধামের সঙ্গে বিয়ে হ'য়ে গেল।

বাসরঘরে জনতা যখন বিরল হয়ে এল, মল্লিকা তখন অসীমকে বললেন, "এইবার তুমি আমায় রজ্জুবন্ধনে বেঁধেছ, দেখছ না এই গাঁটছড়া। মা গো মা, আমার স্বাধীনতা গেল!"

অসীম বলল, "কখনো নয়। যদি বলো তো খুলে দিচ্ছি গাঁটছড়া। তুমি চিরদিনই রইলে স্বাধীন।"

"সত্যি বলছ?"

"সত্যি বলছি।"

"যা খুসী করতে পারব?"

"যা খুসী করতে পারবে।"

"যদি অন্যায় করি?"

"নিজের ইচ্ছায় যত খুসী অন্যায় কোরো, আবার নিজের ইচ্ছায় সে অন্যায়কে শুধরে নিও। বাইরে থেকে কেউ কিছু বলতে আসবে না।

"তুমি রাগ করবে না তো?"

"অন্যায় তো আমিও করতে পারি মল্লিকা। তোমার থাকবে অনন্ত ক্ষমা, কেন না তুমি যে ভালবাসো। যে-যাকে ভালবাসে সে কি তার দোষ কোনোদিন দেখতে পায় চোখে? পায় না।"

উত্তর না দিয়ে মল্লিকা নিবিড় ক'রে অসীমকে তাঁর বাহুবন্ধনে টেনে নিলেন।

"দেখ মল্লিকা, এসো আজ আমরা প্রতিজ্ঞা করি, কেউ কাকেও ঠকাব না কোনোদিন।"

"প্রতিজ্ঞা করলুম।"

"চিরদিন সত্য পরিচয় দেব পরস্পরের কাছে।"

"সত্য পরিচয় তুমি কাকে বলো অসীম?"—নমিতা জিগেস করলেন, "আমি যখন ক্ষণিক মোহে রাগ ক'রে থাকি, সেই কি আমার সত্য পরিচয়? অন্তরের ভালবাসাটা কি সত্য পরিচয় নয়?"

"রাগই বল, অভিমানই বল, ভালবাসাই বল আর ঘৃণাই বল,—সবই সত্য পরিচয়। সব কিছুকে জড়িয়েই তো আসল পরিচয়। কিন্তু অন্তরে যদি থাকে বিদ্বেষ আর মুখে যদি থাকে হাসির ভান,—সেটা মিথ্যা। এই মিথ্যাকে আমরা দূর ক'রে দেব।"

খানিকক্ষণ দুজনে চুপচাপ। তারপর অসীম বলল, "মল্লিকা।"

"কি অসীম?"

"আমাকে তোমার ভালো লেগেছে? সত্যি করে বল।"

মল্লিকা অনেকক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন। অসীমের বুক দুরু দুরু করতে লাগল। মল্লিকা বললেন, "ঠিক বলতে পারছি না।…আমায় তুমি ভুল বুঝো না অসীম। মেয়েদের এ প্রশ্নের জবাব দিতে সময় লাগে। পুরুষের ভালবাসা ব্যাপক হয়ে ছড়িয়ে পড়ে না; সে এক নিমেষেই জাগে, স্বল্পক্ষণেই তার বিকাশ, তারপর রয়েছে তার কাজ, তার বাইরের অবাধ কর্ম্মক্ষেত্র। সেখানে গিয়ে সে নিজেকে ভোলে। কিন্তু মেয়েমানুষের ভালবাসা তার সারা দেহ, তার সারা অন্তর জুড়ে, সে কোনো ক্ষণকালের ব্যাপার নয়। আমায় সময় দাও, এ প্রশ্নের সত্য উত্তর পাবে। প্রতিজ্ঞা করেছি তোমায় ঠকাব না।"

"জান তো পুরুষ মানুষের ধৈর্য্য কম। একটা কিছু বল, যাতে এই অসহিষ্ণুতা ঘোচে। আচ্ছা বল তো, আমাকে তোমার খারাপ লাগে না তো?"

"মন্দ নয়"—তামাসা করে মল্লিকা বললেন; "এক রকম চলনসই গোছের। আমি যাদের যাদের আজ পর্য্যন্ত জানি, তাদের সকলের তুলনায় তুমি চমৎকার।"

"তাই নাকি! এটাই কি সোজা কথা নাকি। তবু মনে একটা খট্‌কা থেকে যাচ্ছে। তোমার শেষ উত্তরটা যথাসম্ভব শীঘ্র যেন পাই।"

"যথাসময়েই পাবে।"

অসীমের বার বার ক'রে মনে হতে লাগল নমিতার কথা। নমিতার সমস্ত কথা মল্লিকাকে বলা দরকার, এ সম্বন্ধে কোনো মিথ্যা পোষণ ক'রে রাখা অনুচিত।…কিন্তু আজ একথা বলতে কেমন যেন বেধে যাচ্ছে। অসীমের মনে হ'ল, তার আর মল্লিকার মাঝে এখনো যে ব্যবধান দূর হয় নি! অসীমের প্রশ্নের উত্তরে মল্লিকা যদি বলতেন, হ্যাঁ আমি সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে তোমারি, তাহলে সেই পরিপূর্ণ মিলনের ক্ষণটিতে নমিতা-সংক্রান্ত মনের সমস্ত ভারটি নামিয়ে দেওয়া সহজ হ'ত। কিন্তু আজও তো সে অবসর আসে নি!

মল্লিকা বললেন, "জান অসীম, আমার এক বাল্যসখীর কথা মনে পড়ছে। সে একজনকে খুব ভালবাসত। তার গান শুনে আর তার চেহারা দেখে সে মনে মনে তাকেই আত্মসমর্পণ করেছিল। কিন্তু বিয়ে হয়ে গেল তার আর একজনের সাথে। মেয়েটির কোনো স্বাধীনতা

তো ছিল না, তাই। তার বর একজন মস্তবড় কৃতী লোক, মস্ত বড় তার আয়। তার ধারণাতেই এল না যে কোনো মেয়ে তাকে ভাল না বেসে থাকতে পারে।"

"তারপর ?"

"ফুলশয্যার রাত্রে মেয়েটি তার বরের সঙ্গে কোনো কথাই বলল না, মুখ ফিরিয়ে রইল। তবে সখী আমার বুদ্ধিমতী। সে বুঝল যাকে পাবার কোনো উপায় নেই, তার জন্যে মন খারাপ করা মিছে। যার সঙ্গে ঘর করতে হবে তাকে ভালবাসার চেষ্টা করা উচিত। এই মনে ক'রে সে প্রাণপণে সুরু করল তার সেবা।"

"কি বিড়ম্বনা !"

"বিড়ম্বনাই তো! কিন্তু এসব বিষয়ে ফাঁকি চলে না। সখী আমার একবার ভাবত তার বরকে সে ভালবেসেছে, সে সুখী হয়েছে। আবার সাংসারিক গোলোযোগের দিনে তার মনে হ'ত সমস্ত মিথ্যে। মিথ্যে তার চেষ্টা, মিথ্যে তার সাধনা। ক্রমে এমনি হ'ল, যে-অপ্রাপণীয়কে সে পায়নি, তারি সন্ধানে বাইরে উড়ল তার মন। কোনোদিন কোনোখানে দেখত যদি সেই ধরণের হাসি, সেই ধরণের রূপ, সেখানেই হারিয়ে যেত তার মন।"

"আহা, বেচারী !"

"তারপর এমন হ'ল, সে ভুলে গেল খুঁজছে কাকে, শুধু রয়ে গেল তার খোঁজার অভ্যাস। ঘরে তার মন বসল না, বাইরেও সে পেলে না শান্তি। সবাই তার দোষ দিলে, বললে, কেমন ধারা মেয়ে এ! এ যা পেয়েছে তার অর্দ্ধেক পেলেও যে সুখী হ'ত যে-কোনো অন্য মেয়ে! কী চায় এ!"

"সত্যিই তো, কে বুঝবে তার দুঃখ !"

"কে বুঝবে বল? তার স্বামী তো বুঝলই না, কেবল রেগেই অস্থির! একদিন তো বিশেষ কোনো বেচাল দেখে সে ব'লে বসল,—দেখ শুভ্রা,—আমার সখীর নাম শুভ্রা,—দেখ শুভ্রা, সেকালের নবাব বাদশাদের অনুকরণে তোমার একটা হারেম রাখা উচিত, একটি স্বামীতে তোমার মন উঠে না।"

"ছিঃ ছিঃ, লোকটা কি পাষণ্ড!" উত্তেজিত হয়ে অসীম বলল।

"লোকটাকেও বেশী দোষ দেওয়া যায় না। সে তো সাধারণ মানুষ, খাবে দাবে আরামে ঘর-সংসার করবে। তার এসব ঝঞ্ঝাট সইবে কেন? শেষটায় যা হ'ল তা বড় ভীষণ। একদিন একজনকে দেখে তার মনে হ'ল;—পেয়েছি! এতদিন যাকে খুঁজছিলুম সে এই! গেল তার কাছে ছুটে, নিবেদন করেছিল নিজেকে। কিন্তু অমনি তার ভুল ভাঙল! বুঝল এ নয়, এ নয়, এ মোহ, এ মিথ্যা! শুভ্রা আত্মহত্যা ক'রে মরে গেল!"

স্তম্ভিত হ'য়ে অসীম এ কাহিনী শুনে গেল। সে ভাবতে লাগল, শুভ্রা মেয়েটির উচিত ছিল কিছুতেই এ বিয়ে না করা।···কিন্তু সে বিষয়ে যখন তার কোনো স্বাধীনতা ছিল না, তখন তার উচিত ছিল সমস্ত কথা বিয়ের রাত্রেই অকপটে তার স্বামীকে জানানো। তাতো সে করেনি, তাই সারাজীবন তাকে আত্মগোপন ক'রে, ছলনা ক'রে কাটাতে হয়েছে! তারপর এসেছে সেই ভয়ঙ্কর পরিণাম!···হঠাৎ অসীমের মনে হ'ল সেও তো শুভ্রার মতো হয়তো নিজের পরিচয় গোপন করছে মল্লিকার কাছে! নমিতাকে অবিশ্যি সে প্রিয়া বলে ভালবাসেনি, তবু—তবু তার সমস্ত কথা বলা উচিত মল্লিকাকে, এখুনি বলা উচিত!···

কিন্তু তা আর হ'ল না। জানালার ফাঁক দিয়ে সূর্য্যের আলো এসে পড়ল ঘরে, মল্লিকা উঠে বললেন, "আমি এখন যাই, সবাই জেগে উঠেছে।" যাবার সময় ছোট্ট একটি চুম্বনরেখা অঙ্কিত ক'রে গেলেন অসীমের মুখে। (ক্রমশঃ)

বিজনদা'র চিঠি

আমার আদুরে ভাই-বোনেরা,

তোমাদের আসরে যে নতুন উপন্যাসটি ছাপার ঠিক করেছিলুম কিন্তু তা' এখন না ছাপাই ঠিক, কারণ এই দীপালীর বছরের শেষ মাসে তা ছাপলে, এর সামনেই নতুন বছরে যে সমস্ত নতুন গ্রাহক-গ্রাহিকা ও পাঠক-পাঠিকা দীপালীর হবেন তাঁদের, আর যে সব নতুন ভাই-বোন আমাদের এই আসরে আসবে তাদেরও পক্ষে সে ধারাবাহিক উপন্যাস মাঝখান থেকে বোঝা সম্ভব নয়, এতএব সবার সুবিধা আমাদের দেখা কর্ত্তব্য নয় কি?—

চাঁদা পাঠাও : বছর শেষ হয়ে এলো, নতুন বছরের চাঁদা পাঠাতে কেউ দেরী করো না। কারণ নতুন বছরের প্রথম সংখ্যা থেকেই নতুন প্রতিযোগিতা, আরো সব নতুন ধরণের তোমাদেরই লেখায় সমৃদ্ধ হয়ে বার হবার চেষ্টা এখন থেকেই আমি করছি। তবে মনে রেখো চাঁদা পাঠাবার সময় পুরাতন সভ্য হলে সম্পূর্ণ নাম আর পুরাতন সংখ্যাটি স্পষ্ট করে লিখতে যেন ভুল না হয়। আর সেই সঙ্গে একথাও লিখে দেবে যে, ১৯৫৫ সালের জন্যে চাঁদা পাঠালে।

৩২নং প্রতিযোগিতার ফলাফল :

১মঃ শ্রীমান অমর দাশগুপ্ত (৯৪৮)

২য়ঃ কুমারী উমারাণী ক্ষেত্রী (১০৬৩)

আজ আর নতুন জানাবার মত কোনও খবর নেই, তাই এইখানেই তোমাদের স্নেহ জানিয়ে আজকের মত বিদায় নিই।

তোমাদের : বিজনদা'

গল্প হলেও সত্যি

—গোবর্দ্ধন প্রামাণিক (১১২৮)

একটা বছর দশেকের ছেলে...

হয়তো তোমার মতই সে দেখতে... হয়তো তোমার মতই সে সাধারণ...

মায়ের পাশে বসে পরম আগ্রহভরে একদিন রামায়ণ শুনছিল...

শুনছিল—'মহাবীর হনুমান সে পাহাড়টা মাথায় করে নিয়ে এসে লক্ষ্মণের জীবন বাঁচিয়েছিল।...

ছেলেটির নিঃশ্বাস বোধ হয় রুদ্ধ তখন...

উঃ! এত বড় বীর! জিজ্ঞেস করলে সে তার মাকে—'আচ্ছা মা, হনুমানকে কি এখানে কোথাও দেখা যায় না।"

হেসে ফেলে মা বললেন—'যায় বৈ কি। আমাদের ঐ বাগানটায় এসে রোজ রোজ আম কলা খেয়ে যায়'।

ছেলেটি মায়ের কথা শুনে মনে মনে ভাবে...

ওঃ! তাই তো! এতদিন তাকে দেখিনি? ছি ছি, বড় লজ্জার কথা!

পরদিন সকালে তার মা, যখন তাকে দুধ খেতে ডাকলেন...তখন তার কোনো উত্তর না পেয়ে তিনি ভাবলেন যে—হয়ত পড়ছে...

> ### মনে রেখো
>
> "মানুষ যদি মানুষের উপর কর্ত্তা হইতে না চাহিত, তবে কতদিন ভাই-ভাই হইয়া যাইত।"
>
> —হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

দুপুর বেলা খাবার সময়ও তার দেখা পাওয়া গেল না। তখন তিনি বেশ চিন্তিত হয়ে উঠলেন...তাই ত'! কোথায় গেল?

খোঁজ—খোঁজ...

একটা...দুটো বাজল...তবু...

মার বুক কেঁপে উঠল...খোঁজাখুঁজি সুরু হলো।

এমন সময় বাগানের মালী এসে খবর দিলে—'খোকাবাবু বাগানে বসে রয়েছেন... আসতে চাইছেন না কিছুতেই।'

মা ছুটে এলেন বাগানে...তাঁর পেছন পেছন চাকর দারোয়ান...

ছেলেটি তখনো দীঘির সিঁড়ির ওপোর বসে উদাস দৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকিয়ে রয়েছে...

শংকিত মনে মা তাকে জিজ্ঞেস করলেন—'ওখানে কী করছিস্ বীরু?'

সহজ সরল এবং করুণস্বরে ছেলেটি উত্তর দিলে—'ওই ভাখো মা। গাছে কত আম পেকে রয়েছে...আজকে বোধ হয় আর হনুমান আসবে না...'

বুক ভেঙে ছেলেটির একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল—সংগে সংগে কয়েক ফোঁটা চোখের জল...

মা তাকে বুকে তুলে নিলেন...

এই হনুমান-দেখা লোভী ছেলেটি কে জানো?

স্বামী বিবেকানন্দ...

মজার খবর

—জ্যোতির্ম্ময় গঙ্গোপাধ্যায় (১০৪৩)

১। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে মানুষ আর ইঁদুরের সংখ্যা সমান।

২। ব্রহ্মদেশে একটিও খ্যাঁকশিয়াল নেই।

৩। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯২০ পর্য্যন্ত প্রতি বিশ বছর অন্তর একজন করে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট অফিসে থাকতেই মারা গেছেন।

যেমন :—

উইলিয়াম হ্যারিসন	১৮৪০
আব্রাহাম লিংকন	১৮৬০
জেম্‌স্ গারফিল্ড	১৮৮০
উইলিয়াম ম্যাক্‌কিন্‌লি	১৯০০
ওয়ারেন হার্ডিং	১৯২০

৪। পারস্যের সম্রাট সাইরাস তাঁর সৈন্য বাহিনীর প্রত্যেকটি সৈন্যের নাম মুখস্ত বলতে পারতেন।

থেমিস্টকল্ এথেন্সের বিশ হাজার লোককে নাম ধরে ডাকতে পারতেন।

৫। বিখ্যাত ইংরাজ ঔপন্যাসিক জোসেফ কন্‌রাড পঁচিশ বছর পর্য্যন্ত ইংরেজী ভাষার একটা অক্ষরও জানতেন না।

'মৃত্যু যাঁদের নেই'

—শ্রীকিরণচাঁদ বর্ম্মণ

ভারতভূমি থেকে অ-নে-ক দূরে—কোথায় সেই শিকাগো সহর!! প্রচণ্ড শীত পড়ে গেছে, বরফের আর তুষারের ঝঞ্ঝাবাতে সহরটা যেন মুষড়ে পড়েছে, তার ওপর আবার

রাত্রির গাঢ় অন্ধকার। সে এক মহা বিভীষিকার রাজ্য, থেকে থেকে শুধু শোঁ শোঁ করে ঝড় বইছে, যেন শিকল ছেঁড়া কোন মস্ত দানবের নিষ্ফল আক্রোশের প্রতিধ্বনি···কিন্তু আশ্চর্য বলতে হয় ওই সন্ন্যাসীটাকে !! পথে দেখ কোথাও জনমানব নেই আর এই ভীষণ দুর্যোগের মাঝে কিনা একলা সামান্য একটা চাদর গায়ে ঢাকা দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে···লোকটা। ভারতীয়...সাত সমুদ্দর তের নদী পেরিয়ে বিদেশ বিভুঁইয়ে এসে একি পাগলামী লোকটার ? কিন্তু দেখ্‌লে পরে তো ওকে সামান্য একটা পাগল সন্ন্যাসী বলে মনে হয় না !! তুষারের এই কনকনে ঠাণ্ডা, যা কি না সারা সহরটাকে নিঝুমপুরী করে দিয়েছে, ওর শরীরে কিন্তু এর জন্য এতটুকুও বৈষম্য দেখা যাচ্ছে না, দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে, যেন কঠোর সংযম আর তপস্যায় ও শরীরটাকে হিমাদ্রির মতই সর্ব-সহনশীল করে তুলেছে। কেই বা আর আশ্রয় দেবে তাকে ? তখনকার দিনে একে তো ভারতবাসীর নাম শুনলে ওদেশের লোকেরা বেজায় নাক সিঁট্‌কে বলে উঠ্‌তো—এঃ, ব্ল্যাক্ নিগার ! নেটিভ্ !! কালা আদমী !!! নিঃসম্বল, কপর্দকহীন, অসভ্য, নেটিভ একটা অর্ধ উলংগ সন্ন্যাসীকে সভ্য-দেশের অন্যতম একটা শ্রেষ্ঠ উন্নত সহর শিকাগোর মত জায়গায় কে ঠাঁই দেবে ?··· সন্ন্যাসী সারাটা রাত রেল-ষ্টেশনের ধারে একটা ভাঙা কাঠের বাক্সের আশ্রয়ে কাটিয়ে ফেল্লে, এরজন্য কিন্তু তাঁর প্রশান্ত মুখমণ্ডলে এতটুকু কষ্টের বা বিরক্তির লেশমাত্র চিহ্ন নেই। আশ্চর্য্য বটে !! ক্রমে রাত্রি প্রভাত হোল। সারারাত জাগরণের ফলে একটু ক্লান্তি এসেছে, তার ওপর পেটে কাল থেকে একটা দানা পর্য্যন্ত নেই···রাস্তার একধারে বসে ভাবছে সন্ন্যাসী, কি করা যায়···এমন সময় প্রকাণ্ড একটা মোটর এসে হঠাৎ থামলো সন্ন্যাসী যেখানে বসেছিল সেইখানে। আমেরিকার এক কোটিপতির স্ত্রী যাচ্ছিলেন মোটরে করে বেড়াতে, পথের ধারে হঠাৎ এক ভারতীয় সন্ন্যাসীকে বসে থাকতে দেখে তাঁর কৌতুহল হওয়ায় তিনি গাড়ী থামিয়ে রাস্তায় নেমে এসে অসহায় সেই সন্ন্যাসীকে তাঁর গাড়ীতে সাদরে ডেকে নিলেন, তারপর বাড়ী এসে সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি সেই সাত সমুদ্দুর তের নদীর ওপারে ভারতবর্ষ থেকে এতদূরে এই আমেরিকায় এসেছেন কি উদ্দেশ্যে ?

সন্ন্যাসী উত্তরে বলে—শুনলুম শিকাগোয় বিরাট একটা সর্বধর্মসম্মেলন হচ্ছে, তাই এলুম আমাদের ভারতীয় ধর্মের সম্বন্ধে দু'চারটে কথা বলতে আপনাদের দেশের ভাই-বোনদের কাছে···

—আপনাকে সভার তরফ থেকে কোন নিমন্ত্রণ করা হয়নি ?

—না। আমি বিনা আমন্ত্রণেই এসেছি। ভারতকে আজ পশ্চিম জগত ভুলে গেছে, তার ফলে আজ যে অন্যায় আর অবিচারের স্রোত পাশ্চাত্য জগত হতে এসে ভারতকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে বসেছে, আমি এসেছি আপনাদের দেশের লোকদের মন হতে ভারত-ভূমির সম্বন্ধে সেই ভুল ধারণা ভেঙে দেবার জন্যে, এরজন্যে আমি কোন আমন্ত্রণের অপেক্ষা করিনি···

কি দুঃসাহস এই সন্ন্যাসীর ? ক্রোড়পতি ধনী আশ্রয়দাতা তো সম্বলহীন একটা উলংগ ফকিরের মুখে এই তেজস্বী এবং অবিশ্বাস্য কথাগুলো শুনে হতভম্ব হয়ে গেলেন···যাই-হোক, ধনীর টাকার অভাব নেই, বহুকষ্টে সভায় প্রবেশের জন্য সন্ন্যাসীর আশ্রয়দাতা একটা টিকিট কিনে আনলেন। কিন্তু বিরাট সেই সভায় এই অর্ধনগ্ন এক ভারতীয় সন্ন্যাসীকে বক্তৃতা করতে দেবে কে ? বহু অনুরোধে উপরোধের ফলে শেষ পর্যন্ত সভার কর্তৃপক্ষের কাছ হতে সন্ন্যাসী মাত্র কয়েক মিনিট বক্তৃতা প্রদানের অনুমতি পেল।··· সন্ন্যাসী বক্তৃতামঞ্চে উঠ্‌লো সহস্র উৎসুক শ্রোতার বিস্মিত দৃষ্টির মাঝে···কে এই ভারতীয় তরুণ তাপস ?? সভার মাঝে মুহূর্তের জন্য একটা চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে··· তারপরে হঠাৎ অদ্ভুত ভাবে, অশ্রুতপূর্ব এক অভিনব সম্বোধনে সচকিত করে সকলকে সন্ন্যাসী সুরু করে : "হে আমার আমেরিকার ভাই বোনেরা !!"

···কয়েক মিনিট বক্তৃতা হ'বার পর বিপুল জয়ধ্বনি আর করতালির মধ্যে দিয়ে সুদূর ভারতের সেই 'নেটিভ্' সন্ন্যাসীকে সভ্য-জগতের তথাকথিত সুসভ্য নাগরিকেরা সম্বর্ধিত করলো। এই তরুণ তাপসই সর্ব প্রথম ভারতীয় ধর্মের সু-মহান আদর্শে পাশ্চাত্য দেশবাসীকে প্রণোদিত করেছিলেন, এতদিন যে দেশের ধর্ম, ধর্মশাস্ত্র ওদেশের কাছে ছিল অজ্ঞাত, ভুল ধারণার কুহেলিকা যে দেশের মহান ধর্মকে পাশ্চাত্যদেশবাসীর কাছে নিতান্ত হেয়, তুচ্ছ করে রেখেছিল—বাংলার এই অমর মনীষী স্বামী বিবেকানন্দই একদিন সে কুহেলিকাজাল ছিন্ন করে জগতকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে ভারতীয় ধর্মের স্থান কত উচ্চে, জগতের অন্যান্য ধর্মের চেয়ে ভারতীয় ধর্ম কতো গভীর, কত প্রাচীন, কত সু-মহান।
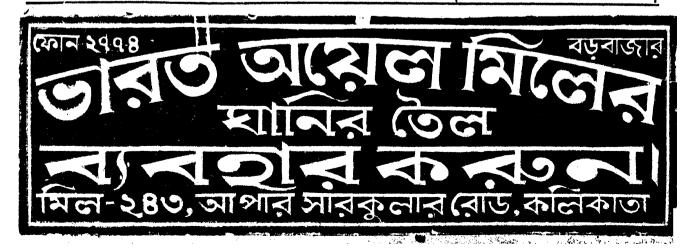
কবি যতীন্দ্রমোহনের জন্মবার্ষিকী

মনীষীবৃন্দের শ্রদ্ধাঞ্জলি তর্পণ

বাঙলার জাতীয় কবি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী মহাশয়ের ৬৬তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে গত রবিবার অপরাহ্ণে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ হলে দেশবাসীর পক্ষ হইতে কবিকে অভিনন্দিত করা হয় এবং তাঁহার দীর্ঘজীবন কামনা করা হয়। শ্রীযুক্ত অতুল চন্দ্র গুপ্ত মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। বাংলার বহু যশস্বী কবি ও সাহিত্যিক এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন।

পণ্ডিত অশোকনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের মঙ্গলাচরণের পর শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার যতীন্দ্রমোহনের উদ্দেশ্যে কাজি নজরুল রচিত একখানি গান করেন। ১৩ বৎসর পূর্ব্বে কবির সম্বর্দ্ধনা উপলক্ষে কাজি নজরুল স্বয়ং গানটি গাহিয়াছিলেন। অতঃপর শঙ্খধ্বনির মধ্যে কবিকে মাল্যচন্দনে ভূষিত করা হয়। ১৩ বৎসর পূর্ব্বে রসচক্রের যতীন্দ্র-সম্বর্দ্ধনা উপলক্ষে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র যে আশীর্ব্বাণী পাঠাইয়াছিলেন শ্রীযুক্ত অখিল নিয়োগী তাহা পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় দেশবাসীর পক্ষ হইতে, কবির ৬৬তম জন্মদিনে তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়া 'অভিনন্দন কবিতা' পাঠ করেন এবং রৌপ্যপাত্র খোদাই করিয়া তাহা কবির হস্তে অর্পন করা হয়। কবিশেখর কালিদাস রায়, সজনী কান্ত দাস, রাধারাণী দেবী, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, সুনির্ম্মল বসু, প্রভাতকিরণ বসু, অখিল নিয়োগী তাঁহাদের স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ও যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত রচিত কবিতা দুইটি শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব ও সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত মোহিত লাল মজুমদার, প্রবোধ সান্যাল, কেশবচন্দ্র গুপ্ত, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, উমা মজুমদার, ননী দাসগুপ্ত, যতীন্দ্রমোহন রচিত কবিতা আবৃত্তি করেন।

রবি-বাসরের পক্ষ হইতে নরেন্দ্র বসু, সাহিত্যবাসরের পক্ষ হইতে অপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, রসচক্র সাহিত্য সংসদের পক্ষ হইতে কবিশেখর কালিদাস রায় অভিনন্দন পাঠ করেন। ইহা ছাড়া বহু প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে কবিকে অভিনন্দন-পত্র দেওয়া হয়।

কবির প্রতিভাষণ

কবি যতীন্দ্রমোহন অভিনন্দনের উত্তরে তাঁহার পূর্ব্বাচার্য্য ও গুরুস্থানীয় বয়ঃবৃদ্ধ ও জ্ঞানবৃদ্ধদের প্রণাম, বন্ধু ও সতীর্থদের প্রীতিনমস্কার ও বয়ঃকনিষ্ঠদের স্নেহালিঙ্গন জানাইয়া বলেন—

প্রত্যেক সাহিত্য-সাধকের অন্তরের মধ্যেই দুটি শরীক পাশাপাশি বাস করে। একজন করে তার মধ্যে সৃষ্টি আর একজন করে তার সমালোচনা। প্রথমদিকে স্রষ্টার অংশ প্রবল হলেও যত দিন যায়, সমালোচক অংশ ততই প্রবলতর হ'তে থাকে। নিজের চিন্তা ও নানা ভাল লেখকের ভাল লেখার পাঠের সহায়তায় এই দ্বিতীয় শরীকটির অধিকার ক্রমেই বড় হ'তে থাকে। এই হিসেবে আমি দেখেছি, কিছুদিন লেখার পর এই দ্বিতীয় ব্যক্তিটী এমনি প্রবল হয়ে উঠেছে যে, প্রথম ব্যক্তির সৃষ্টির আনন্দ আর তেমন আমল পায় না। আমার নিজের লেখক-জীবনেও তার ব্যতিক্রম হয় নি, যৌবনের পর যত লেখাই লিখেছি, বেশীর ভাগই মনে হয়েছে এ ঠিক হল না। যে ভাব মনের মধ্যে এসেছিল তা ঠিকমত প্রকাশ করতে পারিনি, যে ছবি আঁকতে চেয়েছিলাম তা ফুটে উঠেনি। বাণী-প্রেরিত যে কাব্য-প্রেরণা ছন্দের মধ্যে ধরতে চেয়েছিলাম, তার বেশীর ভাগই হাতছাড়া হয়ে গিয়েছে। হাতের মধ্যে যা ধরা দিয়েছে তা অস্পষ্ট ও যৎসামান্য মাত্র। আপন রুচি ও রসবোধের কাছে তা খাটো হয়ে পড়েছে। তাই আনন্দের দিক থেকে কাব্যরচনা ক'রে অন্তরের মধ্যে আমি তেমন তৃপ্তিলাভ করতে পারিনি। কিন্তু যাক্ সে কথা। আমার অতৃপ্তি আমারই থাক। আপনাদের অন্তরনিহিত সৌন্দর্য্য-জ্ঞান ও রসবোধের দরবারে বিন্দুমাত্র আনন্দও যদি আমি দিয়ে থাকতে পারি যার জন্যে আজ আপনারা আমাকে অভিনন্দিত করছেন তার জন্যে আমার অন্তরতম অন্তরের কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছি। তবে একটা কথা আমি অকপটে বলতে পারি, যে স্নেহ প্রেম করুণা, যে দেশপ্রীতি আমার অধিকাংশ রচনার বিষয়বস্তু তা আমার মেকি বা ফাঁকি ভাব-বিলাস নয়—তা আমার অন্তরের বস্তু। দেশের দুঃখ-দৈন্য দুর্দ্দশা ও মানুষের প্রতি ভালবাসা আমি অন্তরের মধ্যে গভীর ভাবেই উপলব্ধি করেছি, প্রকাশ সম্বন্ধে যতই তার অক্ষমতা থাকুক।"

সভাপতি শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় সম্বর্দ্ধনা সমিতির পক্ষ হইতে কবির হাতে 'টাকার তোড়া' প্রদান করেন এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি কবিকে বস্ত্র দান করেন।

সভাপতি মহাশয় যতীন্দ্রমোহনের সৃষ্ট কাব্য সম্বন্ধে সুন্দর একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দেন। তিনি বলেন যে, তরুণেরা যেন বিস্মৃত না হন যে, যতীন্দ্রমোহনের মত লেখকরাই বর্ত্তমান যুগের সৃষ্টি করিয়াছেন এবং কালের কষ্টি-পাথরে যতীন্দ্রমোহন অমর হইয়া থাকিবেন।

ডাঃ কালিদাস নাগ, কবি যতীন্দ্রমোহনকে অভিনন্দিত করেন এবং এই অনুষ্ঠানের জন্য সম্বর্দ্ধনা কমিটি ও সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দেন। গীতভারতী ছাত্রছাত্রীগণ রবীন্দ্র সঙ্গীত করেন।

কৈ মাছের প্রাণ

(গল্প)

—শ্রীশচীন্দ্রনাথ মিত্র

খৃষ্টীয় ১৯৪৩ সাল, জুন মাসের প্রারম্ভ।

বছর খানেক পূর্ব্বে থেকে অভাবের যে ইঙ্গিতটা দেশের মধ্যে ধীরে ধীরে ধূমায়িত হ'য়ে উঠছিল, অকস্মাৎ তার নগ্ন মূর্ত্তিটা, বাঙ্গলা দেশের প্রতি গ্রামে গ্রামে, অতি বীভৎসভাবে প্রকটিত হয়ে উঠল। দুর্ব্বল দেশবাসীর দল সভয়ে, সন্ত্রস্ত হৃদয়ে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হ'তে লাগল ভবিষ্যৎ ভেবে।

হলুদ গাঁয়ের বৃদ্ধ গাঁতিদার বিপিন বিদ্যানিধি মহাশয় ভবিষ্যতের দিকে চাইলেন, কিন্তু নিকষ কালো গাঢ় অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলেন না। সুনীতিকে ডেকে বললেন: এমন করে আর কদিন চলবে বৌমা?

সুনীতি কী উত্তর দেবে? পাশের ঘোষাল বাড়ী থেকে ভাতের ফ্যান ভিক্ষে করে এনে আজ তিনদিন যাবৎ সে তার ছেলে মেয়ে দুটির ক্ষুধা মিটিয়েছে; কিন্তু ক্রমাগত উপবাস করে করে চিন্তা করবার শক্তিটুকুও তার লোপ পেয়ে গিয়েছিল।

বৃদ্ধ আবার বললেন: এ সব কী হলো মা! যুদ্ধে চাকুরী নিলে রোজকার বেশী, লোভে পড়ে তাকে যেতে দিলাম, কিন্তু দু' মাস হ'তে চলল, একখানা চিঠি লিখেও সে খবর নিলে না!

স্বামীর প্রসঙ্গ উঠতেই সুনীতি সরে গেল।

"আমার একমাত্র সন্তান, বংশের প্রদীপ, কী হলো"—বৃদ্ধ একটা নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

ভিক্ষা পাওয়ারও একটা সীমা আছে! ঘোষাল বাড়ীর ফ্যানও বন্ধ হ'লো, কারণ ফ্যানের সন্ধানে তাঁদেরই যেতে হলো অন্যত্র।

সমস্ত গ্রামের মধ্যে শুধু তারাই নয়, সকলেই ভিক্ষুক। সুতরাং মায়ের চোখের ওপর ছেলেমেয়ে দুটির উপবাস আরম্ভ হলো। কিন্তু তারা সুনীতিরই সন্তান। মায়ের মতোই তারা সহ্য করতে শিখেছিল, কথা কইতে শেখেনি।

পুণ্যস্থান হিন্দুস্থানের শস্য-সম্পদের ভবিষ্যৎ সর্ব্বজ্ঞ ঋষিগণের অবশ্যই কল্পনারও অতীত ছিল। তাই প্রাচুর্য্যের দিকে লক্ষ্য রেখে, উপবাসের বিধান দিয়ে গিয়েছিলেন তাঁরা [illegible]। কিন্তু রাষ্ট্রের উপবাসের প্রয়োজনটা ভিন্ন ব্যাপার; এ প্রথমে মানুষকে শয্যা নিতে বাধ্য করে, পরে অনন্ত ধামে যাত্রা করবার নির্দ্দেশ দেয়।

বিদ্যানিধি মহাশয়রাও নিষ্ঠাবান হিন্দু গৃহস্থ। শ্বশুর এবং পুত্রবধূ উভয়েই নানাবিধ বার-ব্রতাদির অজুহাতে উপবাসে বেশ পরিপক্ক হয়ে উঠেছিলেন; কিন্তু রাষ্ট্রের প্রয়োজনে তাঁদের আজ শয্যা নিতে বাধ্য করল। ফলে পরম দার্শনিক বিদ্যানিধি মহাশয় সুদীর্ঘ ৭০ বৎসর পরে হঠাৎ একটা কঠিন সমস্যার সমাধান করে ফেললেন। বললেন: ওরা ঠিকই বলে বৌমা,—ঈশ্বর নেই—

কিন্তু ঈশ্বর যে আছেন পরদিন সকালেই তার প্রমাণ পাওয়া গেল। উলুখড়ের বাদাড় ঠেঙিয়ে বিদ্যানিধি মহাশয়ের চণ্ডী-মণ্ডপের সুমুখে প্রকাণ্ড এক লরী এসে উপস্থিত হলো; লরীর ওপর বস্তাবন্দী প্রচুর চাল।

বুভুক্ষু গ্রামবাসীর দল তাদের কোটরাগত নয়নযুগল যতদূর সম্ভব বিস্ফারিত করে, দূর থেকে লরী বোঝাই বস্তাগুলির দিকে চেয়ে রইল, নিকটে আসতে সাহস করল না। এদিকে লরী থামতেই খাকীর সর্ট-সার্ট পরা রিভলবারধারী একটি যুবক, মুখের সিগারেটটা ফেলে দিয়ে বাড়ীর মধ্যে ঢুকল।

যুবক বিদ্যানিধি মহাশয়ের নিকট সম্পর্কীয় ভ্রাতুষ্পুত্র। কিন্তু ভাইপোকে চিনতে সেই দিবালোকেও তাঁকে যথেষ্ট বেগ পেতে হলো; উঠে বসবার শক্তি তাঁর ছিল না, শায়িত অবস্থাতেই চক্ষু-পল্লব সঙ্কুচিত করে অনেক ইতস্ততঃ করে জড়িতস্বরে বললেন: তুমি প্রভঞ্জন?

প্রভঞ্জন প্রণাম করল। বৃদ্ধ তখন আনন্দের আতিশয্যে চীৎকার করে উঠলেন। অনাহারজনিত ক্ষীণ কণ্ঠস্বরকে যতদূর সম্ভব উচ্চগ্রামে তুলে, হাঁফাতে হাঁফাতে বলে উঠলেন, ঈশ্বর আছেন, শুনছো বৌমা, ঈশ্বর আছেন—

সুনীতি ইতিমধ্যে উঠে বসে মুখের ওপর গুণ্ঠনী টেনে দিয়েছিল। কিন্তু ঘোমটার ফাঁক দিয়ে তার চিবুকের যেটুকু অংশ দেখা যাচ্ছিল, তাই দেখেই প্রভঞ্জন স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। সে শুনেছিল, তার এই বৌদিদিটি রূপবতী। কিন্তু সে যে এতখানি, তা সে কল্পনাও করেনি।

আহারের ব্যবস্থা তখনই হলো। সুনীতি বহুকষ্টে টলতে টলতে স্নান করে এসে রান্নাঘরে ঢুকল। বহুকাল পরে পেটভরে ভাত খেতে পাবার উৎসাহে ছেলে মেয়ে দুটোও কোনোরকমে বিছানার ওপর উঠে বসল।

তারপর সংবাদাদি আদান-প্রদানের পালা। বৃদ্ধ বললেন: এসব কী হলো বাবা। দুশো বছর পূর্ব্বে এদেশে এক মণ চালের দাম ছিল মাত্তর সাত পয়সা। আর আজ এক টাকা দিয়ে এক সের চালও পাওয়া যায় না! হা ভগবান!

প্রভঞ্জন গবর্ণমেণ্ট সাপ্লায়ার। চাল সংগ্রহ করতেই বেরিয়েছিল সে। এবং সেই সূত্রেই বহুকাল পরে পল্লীবাসী এই খুল্লতাতটির কথা তার মনে পড়েছিল। বলল: আপনাদের এমন অবস্থা, বিভূদা কি কোন খবর পায়নি?

বিভূ অর্থাৎ বিভূতি বৃদ্ধের একমাত্র সন্তান। তিনি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলেন: তুমি জান বাবা তার ঠিকানা? আমরা আজ দু'মাস তার কোন খবর পাইনি—

প্রভঞ্জন কোন উত্তর দিল না, ঈষৎ ইতস্ততঃ ক'রে থেমে গেল।

যথাসময়ে মধ্যাহ্ন-ভোজনের ডাক পড়ল। প্রভঞ্জনের কৃপায় বহুদিন পরে সকলে পেট-ভরে ভাত খেল। তারপর দু'মণ চালের একটি বস্তা ও কিছু টাকা সুনীতির হাতে জোর করে গুঁজে দিয়ে প্রভঞ্জন বিদায় নিল, বলে গেল এ সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব তার, কাল সকালেই আবার সে আসছে।

পরদিন যথাসময়ে প্রভঞ্জনের অষ্টিন্ এসে সুনীতিদের বাড়ীর সামনে থামল। গাড়ী

ভর্তি ম্লানাবিধ দ্রব্য-সামগ্রী। লোকেরাবকে সেগুলি একে একে নিয়ে আসতে বলে প্রভঞ্জন বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করল।

বাড়ীর মধ্যে তখন ঢেঁকিশালের এক কোণে, কয়েকটি লোক কলাপাতা পেতে ভাত খেতে বসেছিল, প্রভঞ্জনকে দেখে তারা অভ্যর্থনা করল: এই যে, বাবুমশাই এসে পড়েছেন—

স্থনীতি মেয়েটিকে নিয়ে রান্নাঘরের দাওয়ার আঁচল পেতে শুয়েছিল, প্রভঞ্জনকে দেখে, ঘোমটা টেনে ধীরে ধীরে শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকল। মেয়েটিও মাকে অনুসরণ করল।

কিছু বুঝতে না পেরে বিস্ময়-বিমূঢ় হয়ে প্রভঞ্জন সেই লোকগুলোর দিকে তাকাল। তখন ভাত খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে তারা যা বলল, তার মর্মার্থ হচ্ছে: অনেক দিন পরে হঠাৎ পেটভরে ভাত খাওয়াটা কারুরই সহ্য হয়নি। বার আটেক দাস্ত হবার পর বিত্তানিধি মহাশয় গঙ্গালাভ করলেন; ঘণ্টা-খানেক পরে পৌত্রটিও পিতামহের অনুগমন করে। তারা সকলেই প্রতিবেশী ব্রাহ্মণ, সুতরাং সৎকারের কোন ত্রুটি হয়নি।

শুনে প্রভঞ্জন কথা কইতে পারল না, ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল।

প্রচণ্ড একটা উদ্গার তুলে একজন বললেন: ভাগ্যি ভাল যে ওলাবিবির দয়া মাত্তর দু'জনের ওপর দিয়েই গেল, না হলে—

"তুই থাম্"—বাধা দিয়ে আর একজন বললেন: ক্ষেপেছেন মশাই! মেয়েমানুষের প্রাণ, তা সে ছুঁড়িই হোক, আর বুড়াই হোক, কই মাছের চেয়েও সরেস! দয়া অমনি হলেই হলো?

প্রভঞ্জন আর সেখানে দাঁড়াল না, দ্রুত-পদে স্থনীতির ঘরে গিয়ে ঢুকল।

পরদিন এক সময়ে সে স্থনীতিকে বলল: যা হ'বার তা তো হয়েই গেল, এবার তুমি আমার ওখানে চল—

সদ্য পরিচিত দেবরটির সঙ্গে কথা কইতে স্থনীতির তখনও সংকোচ হচ্ছিল। তাই সে শুধু সবেগে মাথা নেড়ে অসম্মতি জানাল।

স্থনীতি যে সম্মত হবে না, একথা প্রভঞ্জন যেন পূর্ব্বেই বুঝতে পেরেছিল। ঈষৎ দৃঢ়স্বরে সে বলল: তা হয় না। আমি যখন আজও বেঁচে আছি, তখন সব দায়িত্ব আমার। কাল সকালেই আমাদের যেতে হবে।

স্থনীতির সম্মতির অপেক্ষা না রেখেই সে ফিরে এসে বলল: তোমাদের উমেশ বাঁড়ুজ্জের সঙ্গে ব্যবস্থা করে এলাম। মাস মাইনে নিয়ে সে এই ভিটের খবরদারি করবে।

এবার স্থনীতি প্রভঞ্জনের সঙ্গে কথা কইতে বাধ্য হলো। বলল: আপনার দাদাকে একটা খবর দিতে পারেন?"

স্থনীতির কণ্ঠস্বর শুনে প্রভঞ্জন অভিভূত হয়ে গেল। ক্ষণকাল পরে স্নিগ্ধকণ্ঠে বলল: পারি বৈকি, কিন্তু তার দ্বারা তোমাদের তো কোন উপকারই হবে না—

—"কেন?"

এবার প্রভঞ্জন অত্যন্ত বিস্মিত হ'ল। স্থনীতির মুখের ওপর থেকে ঘোমটাটা তখন অনেকখানি সরে গিয়েছিল। এবার হারিকেন লণ্ঠনের ম্লান আলোকের সাহায্যে সেই মুখের মধ্যে সে এমন একটা বস্তু আবিষ্কার করল, যাকে তাচ্ছিল্য করে এড়িয়ে যাওয়া, তার মতো লোকের আত্মসম্মানের পক্ষে হানিকর। স্থনীতির আকর্ণবিস্তৃত চক্ষুদুটির মধ্যে যে অবিশ্বাসের দৃষ্টি ফুটে উঠেছিল, সেটা অত্যন্ত স্পষ্ট! তাই অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হয়ে সে বলল: তার সম্বন্ধে কোন খবরই যে তোমরা রাখনা, তা আমি কালই টের পেয়েছিলাম। বিভূদাকে আমি যে শুধু চিনি তাই নয়, তার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা আছে। সে মিলিটারী ম্যান,—আমি তাদের কণ্ট্রাক্টর। তাই বলছি, তার আশা তোমরা ত্যাগ করো—

—"কেন ?"

এবার সে আত্মবিস্মৃত হলো। অভিভাবক-হীন অসংসারী প্রভঞ্জন বেতনভুক কর্মচারী-দের আজীবন শুধু আদেশই করে এসেছে। প্রতিবাদের প্রশ্নটা তার জীবনে একেবারে নতুন। বলল: কেন। তার এখন মদের খরচ কত জান ? বেরিলির ট্রেণিং শেষ করে দেশে ফিরেছে সে আজ মাত্তর ক' মাস। কিন্তু এর মধ্যে শুধু আমার কাছে তার দেনা কত জান ? দেড় হাজারের ওপর—

কিন্তু ভুল করলেও, অনুশোচনা আসতে তার বেশী বিলম্ব হতো না। পরক্ষণেই অত্যন্ত দুঃখিতভাবে সে বলল: তার আর দোষ কী বল। মিলিটারীতে গেলে তো কেউ মানুষ থাকে না,—মেশিন হয়ে যায়। এই যে বাপ, মা, স্ত্রী-পুত্র ছেড়ে দিনের পর দিন—

—"একবার দেখা করিয়ে দিতে পারেন ?" —স্থির দৃষ্টিতে প্রভঞ্জনের দিকে তাকিয়ে, ধীরে ধীরে সুনীতি বলল।

—"কিন্তু, আগে কলকাতায় চল—তবে তো।"—বলে প্রভঞ্জন ম্লান ভাবে একটু হাসল।

শেষে সুনীতিকে কলকাতাতেই আসতে হলো। বদ্ধ ডোবার পুঁটি মাছ বিশাল সমুদ্রের মধ্যে পড়ে যেন দিশা হারিয়ে ফেলল। প্রভঞ্জনের ঐশ্বর্য্য দেখে আশ্চর্য্য হবার মতো অবস্থাও তার আর রইল না। অবিবাহিত প্রভঞ্জনের মা এবং ডজন তিনেক দাস-দাসী নিয়েই সংসার। বিশৃঙ্খলতার বৈশিষ্ট্যে বিরাট বাড়ীটি তার বিচিত্র হয়ে উঠেছিল। সে বৈচিত্র্যের রূপ দেখে সুনীতি ভীত হলো। কিন্তু তখনও তার অনেক কিছু জানতে বাকি ছিল।

মায়ের সঙ্গে প্রভঞ্জনের কোন সম্পর্কই ছিলনা। সংসারের মধ্যে থেকেও নিষ্ক্রিয়-ভাবে তিনি তেতলায় ঠাকুর-ঘরে বাস করতেন। সুনীতিকে পেয়ে তিনি যেন হাতে স্বর্গ পেলেন। ঠাকুরের সেবার ভার তার ওপর দিয়ে, ইষ্টমন্ত্র জপের সংখ্যাটা তিনি হাজার থেকে লাখে দাঁড় করালেন। সুনীতির শিশু কন্যাটি দাসী চাকরের ভীড়ের মধ্যে সাময়িকভাবে হারিয়ে গেল।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

খেলার মাঠে

পরিচালক :
শ্রীউমেশ মল্লিক, বি-এ

ভারতীয় একাদশের বিরুদ্ধে সামরিক দলের প্রদর্শনীয় প্রতিযোগিতাটি তীব্র প্রতিযোগিতামূলক হয়ে ওঠে। বিশেষ করে যখন ভারতীয় দল ৩ উঃ-এ ৬১৫ রাণ সংগ্রহ করে বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। মার্চেন্টের ২০১ রাণ এবং হাজারীর ২০০ রাণ ভারতীয় দলের সাফল্যের নিদর্শন। মার্চেন্টের ২০১ রাণ করে অবসর গ্রহণ তাঁর ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দেয়। মুস্তাক আলীর প্রথম ইঃ-এ ৯০ রাণ এবং বহুকাল পরে কর্ণেল সি কে নাইডুর ৯১ রাণ সামরিক দলের প্রথম ইনিংসের ৬৩২ রাণ সংগ্রহে বিশেষ সাহায্য করে। সামরিক দলের বিপর্য্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায় এস, ব্যানার্জীর ৮০ রাণে ৪ উইকেট এবং সি এস নাইডুর ৭২ রাণে ৩ উঃ গ্রহণ। ভারতীয় দল প্রথম ইঃএ ৬১৫ রাণ

করে "ডিক্লেয়ার" করে। সামরিক দল দ্বিতীয় ইনিংসে ২৬৮ রাণ করায় ভারতীয় একাদশ দল ১ ইঃ ১৫ রাণে জয়ী হয়েছে। সামরিক দলের বিরুদ্ধে ভারতীয় দল যে দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছেন তা প্রশংসনীয়। হাজারী ও মার্চেন্টের মারাত্মক ব্যাটিংএ হার্ডষ্টাফ, কম্পটনের প্রতিভা ম্লান হয়ে যায়। কঃ নাইডু সামরিক দলের এবং মার্চেন্ট ভারতীয় দলে অধিনায়কত্ব করেন।

এ মাসের মধ্য সপ্তাহে এবং নববর্ষের প্রথম দিকে কলকাতার বাছাই সামরিক দলের একটি প্রদর্শনী খেলার ব্যবস্থা হয়েছে। বাঙ্গলাদেশে বিশেষ করে কলকাতার ক্রীড়ামোদীরা যে একটি প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলা দেখবার সুযোগ পাবেন এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দিহান।

ভারতীয়দিগকে সিলোনে পাঠাবার পুনর্বিচার আমরা প্রশংসা করি। সামরিক পরিস্থিতির জন্য যখন পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সঙ্গে সংযোগ রাখা সম্ভব হচ্ছে না তখন সিলোন ভ্রমণের নির্দ্দেশ আমরা অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের দিক থেকে সমর্থন করি।

রঞ্জী ট্রফী প্রতিযোগিতা আগতপ্রায়। বাঙ্গলা দেশের খেলোয়াড় নির্ব্বাচনে একটা সমস্যা দেখা দেবে। এ বৎসরও কুচবিহারের মহারাজাকে অধিনায়কত্ব করতে দেখা যাবে। বাঙ্গলা দেশের প্রতিযোগী এবার ইউ, পিঃ দল। আশা করি বাঙ্গলা দেশের সুনামের প্রতি লক্ষ্য রেখে বাঙ্গলা দলের নির্ব্বাচক মণ্ডলী দল গঠন করবেন।

* * *

আগামী জানুয়ারী মাসের শেষাংশে কলিকাতার ইষ্ট বেঙ্গল দল স্থানীয় অন্যান্য কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের খেলোয়াড়দের সাহায্যে শক্তিশালী দল গঠন করে দক্ষিণ-ভারত ভ্রমণে বার হবেন। শুনা যায় ত্রিবন্দ্রামে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতায় এদলটি যোগ দান করবে।

বিলাতের আরসেনাল দলের প্রসিদ্ধ খেলোয়াড় কার্টিস নাকি কলকাতায় অবস্থানকালীন মোহনবাগান ক্লাবের খেলোয়াড়দের শিক্ষা দিতে সম্মত হয়েছেন। আশা করি এ প্রতিষ্ঠানের কোন খেলোয়াড়ই এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে ভুলবেন না।

* * *

অদূর ভবিষ্যতে কলকাতায় ইউ, এস, এর কয়েকটি বিশিষ্ট খেলোয়াড়কে টেনিস প্রদর্শনী খেলায় খেলতে দেখা যাবে বলে আশা করা যায়। এবলসন, হীলি এবং বিলেফ, সম্প্রতি কলকাতায় আসবেন বলে সংবাদে প্রকাশ। এঁরা টেনিসক্ষেত্রে আমেরিকার প্রথিতযশা খেলোয়াড় বলে সম্মানিত। সামরিক পরিস্থিতিতে দেশ-বিদেশের বহু বিশিষ্ট খেলোয়াড় ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করেছেন এদের কাছ থেকে ভারতীয় খেলোয়াড়গণ যদি কিছু শিক্ষালাভ করতে পারেন তাতে তাঁরাই লাভবান হবেন। আশা করি খেলোয়াড়গণ এ সুযোগের অপব্যবহার করবেন না।

বহু প্রত্যাশিত ইষ্ট ইণ্ডিয়া লন্ টেনিস প্রতিযোগিতা সাউথ ক্লাবের তত্ত্বাবধানে আগামী ২২শে ডিসেম্বর থেকে ৩১শে পর্য্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। যোগদানের শেষ দিন ১৮ই ডিসেম্বর।

* * *

আন্তঃপ্রাদেশিক ক্রিকেট প্রতিযোগিতার অনুরূপ আন্তঃপ্রাদেশিক হকি প্রতিযোগিতাটি চিরস্থায়ী অনুষ্ঠান করার জন্য কর্ত্তৃপক্ষ যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন। আন্তঃপ্রাদেশিক ফুটবল এবং হকির স্থায়িত্ব বিশেষ থাকে না। কোন প্রকারে কোন বৎসর ফুটবল হকির অনুষ্ঠানগুলি হয়ে থাকে এবং এই [illegible] না হওয়ার মধ্যে অনেকেই সন্দেহের দোলায় কোনপ্রকার অনুষ্ঠান হওয়া সম্পর্কে মত দিতে পারেন না। ফলে একটা বিশিষ্ট প্রতিযোগিতার তোড়জোড় এবং অনুশীলনী বড় একটা হয় না। ক্রিকেটের মত হকিতে যদি স্থায়ীভাবে প্রাদেশিক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হয় তা'হলে সে চেষ্টা প্রশংসার হবে।

নাটমণ্ডপ

শহর থেকে দূরে—গত রবিবার রূপবাণী চিত্রগৃহে "শহর থেকে দূরে"র সুবর্ণ-জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে এক মহতী সভার আয়োজন হয়। এই সভায় পৌরহিত্য করেন কাশিমবাজারের মহারাজা শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন কুমার প্রমথেশ বড়ুয়া, শ্রীযুক্ত শচীন সেনগুপ্ত; সুধীরেন্দ্র সান্ডাল, প্রমথেশ বড়ুয়া ও সভাপতি মহাশয় পরিচালক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়কে ও প্রযোজক জ্ঞানেন্দ্র সরকারকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। এই উপলক্ষ্যে কর্ত্তৃপক্ষ সমস্ত কর্মীদিগকে একটি করিয়া আংটী উপহার দেন। পরিশেষে জলযোগের ব্যবস্থা ছিল এবং "শহর থেকে দূরে" ছবিখানি সকলকে দেখানো হয়।

সহরের সিনেমায়—আগামী কল্য হইতে প্রভাত ফিল্মের যুগান্তকারী চিত্র "রামশাস্ত্রী" মিনার্ভা, ম্যাজেষ্টিক, গণেশ ও শ্রীতে মুক্তিলাভ করিবে। প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত দর্শকদের আগ্রহ সমান ভাবে বজায় রাখিয়া নিখুঁত ভাবে যে ঐতিহাসিক ছবি তোলা ভারতবর্ষেও সম্ভব তাহার প্রমাণ "রামশাস্ত্রী"।

উত্তরা, পূরবী ও পূর্ণ থিয়েটারে নিউ থিয়েটার্সের "প্রতিকার" এখনও ভালভাবেই চলিতেছে। সেন্ট্রালে "পরখ" এবং জ্যোতিতে "ধীরাজ" প্রত্যেক প্রদর্শনীতেই প্রচুর দর্শক আকর্ষণ করিতেছে।

খবরাখবর—প্রসিদ্ধ চিত্রাভিনেতা চার্লি "Justice" নামক একখানি হিন্দী ছবির একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় অভিনয় করিতেছেন। এই ছবিতে তাহার কুকুর একটি ভূমিকায় অভিনয় করার জন্য ৭৫০০, টাকা পাইবে। একটি ছবিতে অভিনয় করার জন্য কুকুর যদি ৭৫০০ টাকা পায় তবে চার্লি কত পাইবেন আন্দাজ করুন।

বোম্বায়ে একাদিক্রমে ৬৬ সপ্তাহ চলিয়া "বসন্ত" যে রেকর্ড স্থাপন করিয়াছিল বর্ত্তমানে "রাম-রাজ্য" তাহা ভঙ্গ করিয়াছে। উহা এখন ৬৮শ সপ্তাহে চলিতেছে।

ফেমাস ফিল্মসের "ভূল" চিত্রের প্রযোজক আবদাল্লা নাকি উক্ত চিত্রের কাহিনী রচনার জন্য রচয়িতাকে দুই লক্ষ টাকা দিয়াছেন বলিয়া সংবাদপত্রে প্রকাশ।

এমন একটি পোষাক পরিধান করিয়াছেন যাহার দাম ৫০০০ হাজার টাকা।

স্বপনের জ্বালা—আগামী শুক্রবার ৮ই ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬॥ ঘটিকায় শ্রীরঙ্গম মঞ্চে শ্রীঅনাথ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত "স্বপনের জ্বালা" মঞ্চস্থ হইবে। রূপায়নে শ্রীমতী আরতি চক্রবর্ত্তী, রাণী ঘোষ, বেলা বসু, রেখা দত্ত, অরুণকুমার, বিদ্যুৎবরণ প্রভৃতি অংশ গ্রহণ করিবেন। বিবেকানন্দ কন্যা শিল্প-পীঠের বালিকাগণ কর্ত্তৃক সঙ্গীত ও নৃত্য প্রদর্শিত হইবে। উক্ত শিল্পপীঠের সাহায্যকল্পে এই অভিনয়ের আয়োজন।

"মা-বাপ"—সানরাইজ পিকচার্সের ছবি, অভিনয় করিয়াছেন বীণা, নাজির, জগদীশ, ইয়াকুব, দীক্ষিত প্রভৃতি। পরিচালক ভি, এম, ব্যাস্।

অন্ধ বিহারী। তাহার দুই পুত্র বংশীলাল ও নারায়ণ, এক খঞ্জ কন্যা অঞ্জনা এবং ভক্তিমতী স্ত্রী যমুনাকে লইয়া তাহার সংসার। বংশীলাল অর্থগর্ব্বে এবং তাহার কলহপ্রিয়া স্ত্রী দুর্গার প্ররোচনায় তাহার পিতামাতাকে সংসার হইতে তাড়াইয়া দিল কিন্তু অর্থ-সম্পদহীন কনিষ্ঠ নারায়ণ সেই অন্ধ পিতা, মাতা এবং খঞ্জ ভগিনীকে লইয়া পথের উপরে আশ্রয় বাঁধিল। নারায়ণ শেঠ শ্রীগোপালের কন্যা মালতীকে অনেক বাধা বিপত্তির পর্দ্দা সরাইয়া বিবাহ করিলেও যখন সে বিলাত যাইতে অস্বীকার করিল তখন শ্রীগোপালজী তাহাকে গৃহ হইতে বিতাড়িত করিয়া দিল। স্বামী-অনুরক্তা মালতীও স্বামীর পদানুসরণ করিল। শেষে নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া সকলের মিলন ঘটিল।

সর্ব্বকালের উপযোগী এই পিতৃভক্তির কাহিনীটা ছায়াছবির পর্দ্দায় প্রতিফলিত হইয়া দর্শকগণকে যে পরিপূর্ণ আনন্দ বিতরণ করিতেছে তাহা পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহ দেখিলেই বোঝা যায়।

অভিনয়ের মধ্যে নাজির, জগদীশ ও ইয়াকুব যথাক্রমে নারায়ণ, বিহারী ও বংশী-লালের ভূমিকায় [illegible] অভিনয় করিয়াছেন।

বীণার "মালতী" অভিনয় ভাল হইলেও পরিচালক মহাশয় তাহাকে তেমন বিশেষ "স্কোপ" দেন নাই। বর্ত্তমান যুগের নবতম ব্যারিষ্টারের একটি বিশেষ টাইপ আমরা দেখিলাম যাহা কল্পনা করা চলে না। দীক্ষিতের চাকরের অভিনয়টা হইয়াছে অতি অভিনয়-দোষে দুষ্ট।

ছবিখানি কিছুদিন দর্শক আকর্ষণ করিবে বলিয়া মনে হয়। সঙ্গীত ও ফটোগ্রাফী মন্দ নয়।

দীপালীর স্বত্বাধিকারী শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত, ১২৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, দীপালী প্রেসে মুদ্রিত
ও দীপালী কার্যালয় হইতে প্রকাশিত।

প্রধান সম্পাদক—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় :: সহঃ সম্পাদক—শ্রীধীরেন্দ্রমোহন মজুমদার বি. এল.

১৬শ বর্ষ VOL. XVI. } ২৮শে অগ্রহায়ণ ১৩৫১ :: December 14, 1944 { ৫০শ সংখ্যা No. 50

দীপালীর চাঁদার হার

প্রতি সংখ্যা	...	চার আনা
ডাকে	...	সাড়ে চার আনা
বার্ষিক চাঁদা	...	১২।০
যান্মাষিক „	...	৬।০
ত্রৈমাসিক „	...	৩।০

লেখকদের প্রতি

১। গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা বা যে-কোনো রস-রচনা দীপালীতে প্রকাশার্থ লেখকরা পাঠাইতে পারেন।

২। অমনোনীত রচনা ছিঁড়িয়া ফেলা হয়। অবশ্য যদি সঙ্গে উপযুক্ত ডাক টিকিট থাকে তবেই তাঁহাকে রচনা ফেরৎ দেওয়া হয়।

৩। প্রত্যেক রচনার সহিত লেখকের নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট ভাবে লিখিতে হইবে।

এজেন্সীর নিয়মাবলী ও বিজ্ঞাপনের হার সম্বন্ধীয় অনুসন্ধানের জন্য পত্রালাপ করুন :

ম্যানেজার, দীপালী

১২৩/১ আপার সার্কুলার রোড

কলিকাতা

ফোন : বড়বাজার ৩২৪৩

টেলিগ্রাম : DIPALI

আলোচনী

সম্প্রতি মিঃ রাজাগোপালাচারী নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেসন উপলক্ষে যে বক্তৃতা দিয়াছেন তাহা এদেশের মুসলিম লীগ মহলে উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়াছে। স্বীকার করিতে বাধা নাই, এই শ্রেণীর নেতাদের উত্তপ্ত হইবার যথেষ্ট খোরাক রাজাজীর বক্তৃতার মধ্যে ছিল। এই প্রবীন রাষ্ট্রনৈতিক তাঁহার বক্তৃতায় পাকিস্থানের কল্পনাবিলাসী মনোবৃত্তিকে আহত করিয়াছেন। ইহাই ছিল তাহার অপরাধ। লীগ পরিচালিত প্রেস এই অপরাধের শোধ লইয়াছেন, ফেনায়িত রচনা প্রকাশ ও যুক্তিহীন কটু কাটব্য করিয়া। আসল কথা, পাকিস্থানী স্বপ্নতন্ত্রের সবচেয়ে দুর্ব্বল স্থানটিতে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া রাজাজী ফ্যাসাদ বাধাইয়াছেন। মনে রাখিতে হইবে হিন্দু মুসলমান মিলনের ফরমুলা হিসাবে রাজাজীর প্রস্তাব দেশের বহু চিন্তাশীল ব্যক্তিই মানিয়া লইতে পারেন নাই। কেহ কেহ বলিয়াছিলেন, রাজাজীর ফরমুলা গৃহীত হইলে মিঃ জিন্না পরিকল্পিত ভেদ নীতির জয়জয়কারই ঘোষিত হইবে। খুব বেশী দিনের কথা নয়। লীগ পত্রিকা মহলে রাজাজীর প্রশংসার প্রতিপত্তি হইয়াছিল অসাধারণ। আজ হাওয়া বদলাইতেছে। মিঃ জিন্নার চড়া সুরের সহিত তাল রাখিয়া এই বয়োবৃদ্ধ রাষ্ট্রনৈতিক চলিতে পারিতেছেন না। ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই।

* * *

If the League's contention is that Pakisthan cannot maintain itself without the inclusion of non-muslim areas within its boundaries, it is a vital admission aganist the case for separation and makes the argument for united India unanswerable অর্থাৎ অমুসলমান অঞ্চলকে অন্তর্ভুক্ত না করিলে পাকিস্থান অচল হইবে ইহাই যদি লীগের বক্তব্য হয় তাহা হইলে এই স্বীকারোক্তি পৃথক রাষ্ট্রের জন্য তাহাদের দাবীর বিরোধী সন্দেহ নাই। অখণ্ড ভারতের জন্য যাহারা দাবী করিতেছেন এতদ্বারা তাহাদের যুক্তির অকাট্যতা প্রমাণিত হইতেছে। যুক্তি অকাট্য হইলে কি হইবে, মিঃ জিন্না ও তাহার অনুবর্ত্তীগণ চীৎকার করিয়াই আসর জমাইতে চান। রাজাজীর এই উক্তির যে সমালোচনা লীগ

পর্যালোচনা করিয়াছেন তাহা হইতে ইহাদের দুর্বলতা আরও সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। ইহাদের সমালোচনায় রাজাজীর এই সুস্পষ্ট মন্তব্যের সোজা জবাব খুজিয়া পাই নাই। ভারতের বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে, ইহার প্রত্যেকটি ভৌগলিক বিভাগের অর্থনৈতিক ভিত্তির প্রশ্ন উঠিয়াছে। মিঃ জিন্না এ প্রশ্নকে এড়াইয়া চলিবেন কি করিয়া আজ লীগ দল সেই সমস্যার কথা চিন্তা করিতেছেন। জোড়া-তাড়া দিয়া ভারতের ঘাড়ে একটা কিছু চাপাইয়া দেওয়ার সুযোগ সন্ধান যাহারা করিতেছিলেন আজ অর্থনীতির পাষাণ প্রাচীর তাহাদের সম্মুখে অভ্রভেদী হইয়া উঠিয়াছে। এই বাস্তবতাকে কোন Sentimentalism এর দোহাই দিয়া অস্বীকার করা চলিবে না। মহাযুদ্ধের আবর্ত্তিত চঞ্চল ঘটনাবলীর মধ্য দিয়া দেখিতেছি প্রাদেশিক মুখাপেক্ষিতা কতখানি সত্য। ইহা শুধু যুদ্ধ কালের কথাই নয়, স্বাভাবিক অবস্থায় ইহার সত্যতা হয়তো নজরে পড়িত না, তাহা আজ আমরা ঠেকিয়া শিখিতেছি।

* * *

ভারত রক্ষা আইন-এর অক্টোপাশ বাহু কত দিকবিদিগ প্রসারিত তাহা চিন্তা করিয়া অনেকে বিস্ময় অনুভব করেন। মক্ষিকারও ইহার কবল হইতে পরিত্রাণ পাওয়া দুরূহ যাহারা এই ধরণের মন্তব্য করেন তাহাদিগকে অতি-ভাষণের অপরাধে অপরাধী করা চলে না। সম্প্রতি "লিডার" পত্রিকার একটি সংবাদে জানা যায় স্যার মরিস গায়ারের প্রাক্তন সেক্রেটারী ইউ পির কোন এক স্থানে ভারত রক্ষা আইনে আটক আছেন। তাঁহাকে আটক রাখার কারণ অবশ্য জানা যায় নাই। তবে সম্প্রতি কোন শাসনতান্ত্রিক ফরমুলা সম্পর্কে তিনি মহাত্মা গান্ধী ও অন্যান্য বিশিষ্ট নেতাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতেছিলেন ইহা অনেকেই হয়তো জানেন। ব্যাপারটি বেশ রহস্যাবৃত।

* * *

কলিকাতা পুলিশ ও ফায়ার ব্রিগেডের বাৎসরিক প্যারেড উপলক্ষে স্যার নাজিমুদ্দীন কলিকাতার বাসে অতিমাত্রায় ভীড়ের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য নূতন বৎসরে কতকগুলি অতিরিক্ত বাস দেওয়া হইবে। ইদানীং কলিকাতার জান-বাহন সমস্যা যে আকার ধারণ করিয়াছে তাহার গুরুত্ব সরকারী মস্তিষ্কে প্রবেশ করে নাই ইহাই জনসাধারণ মনে করিবে। দীর্ঘ দিন ধরিয়া এই অবস্থা যাঁহারা চলিতে দিয়াছেন তাহাদের দায়িত্ব বোধের প্রশ্ন না তোলাই ভাল। কর্ত্তৃপক্ষ মহল এদিকে দৃষ্টি দিলে পেট্রোল বা নূতন বাসের অভাব সত্বেও অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হইতে পারিত। প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ লোক এই সহরের পথ দিয়া যাতায়াত করে। বাস বা ট্রামে যাহারা ভ্রমণ করে তাহাদের সংখ্যা কত তাহাও সঠিক জানিবার উপায় নাই। উভয় শ্রেণীর লোকই আজ প্রাণ হাতের মুঠায় করিয়া সহরে ঘোরাফেরা করিতেছে। পদাতিক হইলেও নিস্তার নাই, মিলিটারী লরীর কবলে প্রাণ যাওয়ার আশঙ্কা প্রতি-মুহূর্ত্তে। বাস বা ট্রামে আরোহীর অবস্থাও বিপজ্জনক। বেইজ্জতি স্বীকার করিয়া যাহারা ট্রামে বাসে চড়িতে প্রস্তুত তাহাদের কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু ইহার বাহিরে সাধারণ ভদ্রলোক যাহাদের প্রত্যহ দু'মুঠা অন্নের সন্ধানে বাহির হইতে হয় তাহাদের দুরবস্থা চরমে আসিয়া ঠেকিয়াছে।

* * *

নিউ ইয়র্ক টাইটম্স্ এর একটি সংবাদ হইতে জানা গেল, বৃটেন ও মার্কিণের WACs বা নারীবাহিনীকে জার্ম্মানীর যুদ্ধক্ষেত্রের বিভিন্ন অঞ্চলে লইয়া যাওয়া হইবে। অবশ্য ইহা সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষ। মহিলা বাহিনীর নিরাপত্তা যাহাতে বজায় থাকে তাহাও দেখিতে হইবে। মার্কিন ও ইংরেজ সৈনিকগণ যাহাতে জার্ম্মান স্ত্রী-পুরুষের সহিত ঘনিষ্ট মেলামেশা না করিতে পারে ইহার জন্যই না কি এই ব্যবস্থা। যুদ্ধ সম্বন্ধে আনাড়ি যাহারা তাঁহাদের জ্ঞানো-দয়ের জন্য এই সংবাদদাতা আরও বলিয়াছেন, বিদেশে অবসর সময়ে সৈনিকেরা মেয়েদের সংসর্গ কামনা করে। একটি মেয়েকে নৃত্য-সঙ্গিনী করার মধ্যে যে সকল আমোদ আছে অপর একজন সৈনিককে partner হিসাবে লইলে সে আমোদ পাওয়া যায় না। যুদ্ধ-ক্ষেত্র হইতে ফিরিয়া মেয়েদের সঙ্গে দু'দণ্ড কথা বলা, ব্রিজ খেলা বা চা-বৈঠক জমানোর মধ্যে প্রচুর আনন্দ আছে ইহাও সংবাদে জানানো হইয়াছে। ব্যাপারটীর মধ্যে অস্পষ্টতা কিছু নাই। কলিকাতায় WACs বা নারীবাহিনীর parade যাহারা দেখিয়া-ছেন তাঁহারা হয়তো প্রশ্ন করিতে পারেন, চা-খাওয়া, নৃত্য-করা ইত্যাদির সহিত রণ-ক্ষেত্রের সম্পর্ক কোথায়। এ প্রশ্নের জবাব কি আমরা জানি না।

খবরের শেষাংশে সংবাদদাতার উচ্ছ্বাস প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। যুদ্ধক্ষেত্রের উপরোক্ত পরিকল্পনায় মার্কিণ সাংবাদিকদের ভাগ্যেও আরামের ছিটা-ফোটা হয়তো জুটিতে পারে ভাবখানা এই। How much more pleasant it would be if Allied troops had English speaking women from the U. S. A. and Britain. This would be much easier than with Serman Franlenis.

মার্কিনী নষ্টামী জার্ম্মান franlenis-রা যে সহজে বরদাস্ত করিবে না ইহার নজির আছে।

কৈ মাছের প্রাণ

(গল্প)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীশচীন্দ্রনাথ মিত্র

সাতদিন পরে হঠাৎ প্রভঞ্জন অন্তঃপুরে এসে হাঁক দিল : বৌদি—

ঠাকুরঘর থেকে অপরূপ সাজে বেরিয়ে এল সুনীতি। পরণে তার চওড়া লাল পাড় শাড়ী, ললাটে সিন্দুর, চরণে অলক্তক, বাঁ-হাতে ফুলের সাজি! মুহূর্ত্তকাল প্রভঞ্জন কোন কথাই বলতে পারল না।

তাকে অভিভূতের মতো চেয়ে থাকতে দেখে আনতমুখে, মৃদুস্বরে সুনীতি বলল : তিনি কি এসেছেন?

প্রশ্ন শুনেই প্রভঞ্জনের বিমুগ্ধ ভাবটা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। ঈষৎ রূঢ়স্বরে সে বলল : তোমার কি আর তর সয় না? বললুম না, র‍্যাশন নিয়ে সে আম্বালা গেছে, ফিরতে দেরী হবে। শোন, আজ রাহা সাহেবকে এখানে নেমন্তন্ন করিছি। মস্তবড় অফিসার। ভাল করে খাতির করতে পারলে অন্ততঃ বিশ লক্ষ টাকার কণ্ট্রাক্ট পাব। বুঝলে, তুমি নিজের হাতে পরিবেশন করবে, হেসে কথা কইবে—

—"সাহেব!" সুনীতি অদ্ভুত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল।

—আঃ, সাহেব, মানে বাঙালী সাহেব। আমি বাবুর্চ্চিকে সব বুঝিয়ে দিয়েছি। তুমি সন্ধ্যের পর ঠিক হয়ে থেকো। হুকুম দিয়ে প্রভঞ্জন চলে গেল।

যথা সময়ে রাহা সাহেব এলেন। কিন্তু সুনীতির দেখা পাওয়া গেল না। সে সময়-টুকু সে ঠাকুর ঘরে, মায়ের আশ্রয়ে নিরাপদে কাটিয়ে দিল।

এদিকে গৃহস্বামীর বিশেষ অনুরোধে মাত্র এক পেয়ালা চা খেয়ে রাহা সাহেব প্রস্থান করলেন। তারপর প্রভঞ্জন ছুটে এল অন্তঃপুরে। তার মাথায় তখন যেন আগুণ জ্বলছিল। হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে সে চীৎকার করে উঠল : কোথায় গেল সে—

সুনীতির বিবর্ণ মুখের পানে চেয়ে, বহুকাল পরে মা এগিয়ে গেলেন ছেলেকে ঠাণ্ডা করতে। ওদিকে ঠাকুরের পায়ের তলায় পড়ে নীরব ক্রন্দনে সুনীতি আকুল হয়ে উঠল।

মাতা-পুত্রের বাক্যালাপ সবটা শোনা গেলনা। কিন্তু যতটুকু শ্রুতিগোচর হলো, সুনীতির পক্ষে সেইটুকুই যথেষ্ট।

পুত্র বলল : দুধ কলা দিয়ে কাল সাপ পুষেছি। আজ কত লক্ষ টাকা হাত ফসকে বেরিয়ে গেল জান? এক্ষুনি দূর করে দাও—সয়তানী—

মা বললেন : বামুনের ঘরের গাড়ল কোথাকার! ঘরের বৌয়ের রূপ দেখিয়ে টাকা রোজগার করতে চাস? ইত্যাদি ইত্যাদি—

সেইদিনই রাত্রি নিস্তব্ধ হলে, ঘুমন্ত মেয়েটিকে বুকে নিয়ে সুনীতি পথে এসে দাঁড়াল। আষাঢ়ের সজল আকাশ তখন যেন শতধারে ভেঙ্গে পড়েছিল। শানিত বর্শার তীক্ষ্ণ ফলকের মতো বর্ষার হিমাণী প্রবাহ গায়ে লাগতেই মেয়েটি ফুঁকিয়ে কেঁদে উঠল।

মেয়েকে আরও নিবিড়ভাবে বুকের মধ্যে চেপে ধরে সুনীতি মনে মনে বলল : নারায়ণ, তুমি কি সত্যই নেই।

—"আমি থাকতে ভয় কি বৌদি—" কাদু মাসী যে তাকে অনুসরণ করেছিল, সুনীতি তা লক্ষ্য করেনি। কাদু প্রভঞ্জনের

দাসীদের মধ্যে অন্যতমা। সুনীতি আবার আশ্রয় পেল।

* *

প্রভঞ্জন ভদ্রলোক, ভদ্রসন্তান, কিন্তু বিচিত্র তার স্বভাব। অন্যায় করার পর অনুতাপ আসতে তার বিলম্ব হয়না। সুনীতির চলে যাওয়ার ব্যাপারে সে যেন একেবারে মুসরে পড়ল। এমন কি তার অর্থোপার্জ্জনের আসক্তিটাও যেন লোপ পেয়ে গেল। সে যেন হঠাৎ উপলব্ধি করল তার চলার পথে কোথায় একটা ফাঁক রয়ে গেছে! যেন একটা বিরাট হাহাকার তার বুকের মধ্যে গুমরে গুমরে উঠছে, আর তারই সঙ্গে সমতা রেখে ভেসে উঠছে একটা অসহনীয় রোদনের রোল। আত্মাভিমানী পুরুষের সব দর্প যেন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে! শাশ্বত পুরুষত্ব যেন আজ চিরন্তন নারীত্বের করুণাভিখারী হয়ে, শক্তি ভিক্ষা করছে।

মাসখানেক পরে সম্বিৎ ফিরে পেয়ে, প্রভঞ্জন নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করল। অর্থাৎ কর্ম্মচারীদের নিকট মর্য্যাদা বজায় রাখার জন্য "পেগের" মাত্রাটা সে বাড়িয়ে দিল।

এমনি করে আরও দুদিনে কাটবার পর হটাৎ বিভূতি এসে হাজির হলো, সঙ্গে একজন বন্ধু। পুরোণ বন্ধুদের দেখে প্রভঞ্জন আশান্বিত হয়ে উঠল, কিন্তু পরক্ষণেই কী যেন একটা অজানা আতঙ্কে তার গায়ে কাঁটা দিল।

—"আম্বালা থেকে কবে ফিরলে?"

—"কাল। শোন, বেড়াতে যাবি?" এক চক্ষু মুদ্রিত করে বিভূতি একটা ইঙ্গিত করল।

প্রভঞ্জনের বুকের ওপর থেকে যেন একটা পাষাণভার নেমে গেল। বলল: লোরার ওখানে তো?

—"না না—"

—"তবে ফ্লোরার ওখানে তো? একঘেয়ে ভাল লাগে না—"

"আরে না না। এ নতুন, বাঙ্গালী। জিগগেস করনা গুপ্তকে।"

বিভূতি সমভিব্যাহারীর নাম মিঃ গুপ্ত। ইনিও মিলিটারী সাপ্লায়ার, তবে "সাইড বিজনেস" হিসেবে আরও অনেক রকমের দালালী করে থাকেন। বললেন: একেবারে আনকরা নতুন! গোবরে পদ্ম জন্মায় শুনেছেন তো?"

—"অর্থাৎ?"

—"অর্থাৎ বর্ত্তমান নিবাস বস্তীতে। নাক সিঁটকবেন না, অমন রূপ, লাখে একটা দেখা যায় না। পছন্দ না হয়, 'পার্সেণ্টজ' আমি এক পয়সাও নোব না।

—"রূপ! আমাকে দেখাতে চায়?"—ঢক ঢক করে খানিকটা নির্জ্জলা ব্র্যাণ্ডি গলায় ঢেলে প্রভঞ্জন বলল: "অল্...রাইট্..."

সন্ধ্যার পর তিনজনেই বেরিয়ে পড়ল। পথ প্রদর্শক গুপ্ত, প্রভঞ্জনের বাড়ী থেকে প্রায় এক মাইল দূরে, একটা বস্তীর সামনে এসে গাড়ী থামাতে ইঙ্গিত করলেন। বললেন: দাঁড়ান, আমি আগে দেখে আসি।

অপরিচ্ছন্ন গলিপথ অতিক্রম করে গুপ্ত অগ্রসর হলেন। কিন্তু কিছুদূর যেতেই, একটা সনাতন-প্রথার মড়া-কান্না ভেসে এসে তাঁর গতি রুদ্ধ করল।

গলিপথের একেবারে শেষাংশে, ক্ষুদ্র একটি অঙ্গণকে আশ্রয় করে চতুষ্পার্শে গুটিকয়েক জীর্ণ মাঠকোঠা দাঁড়িয়েছিল। গুপ্ত এগিয়ে গিয়ে দেখলেন, সেই উঠানের মাঝখানে জনাকয়েক নিম্নশ্রেণীর নর-নারী কী একটা পদার্থকে ঘেরে দাঁড়িয়ে সমস্বরে বিলাপ করছে।

—"ব্যাপার কী?"

ভদ্রলোক দেখে কান্না থামিয়ে, সকলেই গুপ্তর দিকে তাকাল। জনতার মধ্যে দু'জন এ-আর-পি'র তকমাধারী যুবকও ছিল। একজন এগিয়ে এসে, একটি কুৎসিতদর্শনা প্রৌঢ়া নারীর দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করে উত্তেজিতস্বরে বলল: ওই বাড়ীওয়ালী মাগী কি কম পাজী মশাই! মেয়েটাকে চাল আনবার জন্যে রোজ পাঠাতো কণ্ট্রোলে। দেখছেন তো কী রকম বর্ষা নেমেছে, এই বৃষ্টি রোজ তার মাথার ওপর দিয়ে যাচ্ছিল! আজ তিন দিন তার একশো তিন ডিগ্রী জ্বর, তবুও নিস্তার নেই! মেয়েটা আজও গিয়েছিল, 'কিউ' হয়ে দাঁড়িয়েও ছিল, কিন্তু টাকার ভাঙানি জোগাড় করতে পারেনি বলে চাল পায়নি! চাল আনতে না পারলে, মাগী নাকি, মেয়েটাকে বেদম ঠ্যাঙাতো! তাই, একে মার খাবার ভয়, তার ওপর ভীষণ জ্বর, হয়তো ধুঁকতে ধুঁকতে রাস্তা পার হচ্ছিল, এমন সময়—

বাধা দিয়ে তার সহকর্মী বলল: কিন্তু চাপা দিলেও, অ্যামেরিক্যানরা পয়সা দেয় ভাল মশাই। আমাদের পাড়ার ক্যাবলা মলো বটে, কিন্তু তার মা নাকি বাইশ হাজার টাকা পাবে—

—"তুই থাম"—এক ধমকে তাকে থামিয়ে দিয়ে পূর্ব্বোক্ত যুবক বলল: আমরা চিনতাম মেয়েটাকে, তাই নিয়ে এলাম চ্যাঙদোলা করে। কিন্তু বিপদ দেখুন না, মেয়েটাকে উঠোনে শুইয়ে দিতেই, ওর মা দোতলায় কাপড় মেলে দিচ্ছিল, মাথলে টেনে লাফ, একেবারে 'সুইসাইড মশাই'—

ব্যাপার শুনে গুপ্ত স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। একটু পরে উঁকি মেরে দেখলেন, জনতার মধ্যে, বিরাট রক্তসমুদ্রের মাঝখানে দুটি দেহ পাশাপাশি শোয়ান রয়েছে। একটি শিশু, বয়স সম্ভবতঃ পাঁচ ছ' বছরের বেশী নয়। লরীর চাকা একেবারে মাথার ওপর দিয়ে চলে যাওয়ার জন্যে মুখ চেনবার কোন উপায় ছিল না। পার্শ্ববর্ত্তিনী তাহার জননী,—তার কাটা মাথা দিয়ে তখনও রক্ত গড়িয়ে পড়ছিল।

—"কী বাবা, —আমাদের ফাঁকি দিয়ে একলাই মজা লুটছ" প্রভঞ্জনের কাঁধে ভর দিয়ে বিভূতি টলতে টলতে এসে দাঁড়াল। গুপ্তর বিলম্ব দেখে উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠছিল সে, কিন্তু জনতা দেখে হ'লো বিস্মিত।

"কী ব্যাপার?"—কৌতূহলী হ'য়ে একটু এগিয়ে যেতেই জনতা তাকে পথ দিল। কিন্তু নিমেষমাত্র। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে সুনীতির নাম করেই বিভূতি প্রভঞ্জনের দেহের ওপর ঢলে পড়ল।

স্বামীর আর্ত্তনাদ স্ত্রীর কানে পৌঁচেছিল কিনা সন্দেহ, কিন্তু তার দেহটা যেন একটু নড়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে কাদু মাসী লাফিয়ে উঠল। প্রভঞ্জনকে দেখে সে এতক্ষণ মুখ ঢেকে বসেছিল, বলে উঠল: ওগো, মরেনি গো মরেনি। আমি তখুনি জানি, মেয়ে মানুষের জান্, ওযে কৈ মাছের প্রাণ—

সমাপ্ত

৮/২৭

চিত্র-ভারতীর
সশ্রদ্ধ নিবেদন
রবীন্দ্রনাথের
শেষরক্ষা
পরিচালক :
পশুপতি চট্টোপাধ্যায়
চিত্র-শিল্পী :—বিভুতি লাহা
—রূপবাণীতে—
বর্ত্তমান সপ্তাহে শুভারম্ভ
বিজয়া, পদ্মা, অমর মল্লিক, জীবেন, বিপিন,
রতীন, মনোরঞ্জন, প্রভা এবং রেবা।
সুর-শিল্পী :
অনাদি দস্তিদার ও দক্ষিণা ঠাকুর
অগ্রিম সিট বুক করিতে ভুলিবেন না।

ছুটির ঘণ্টা

পরিচালক শ্রীবিজনকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
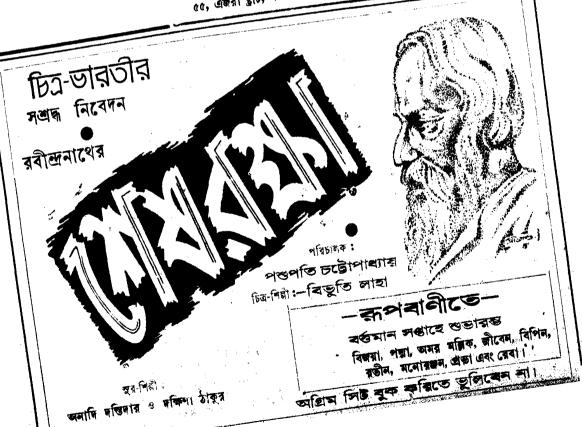
বিজনদা'র চিঠি

আমার আদুরে ভাই-বোনেরা,

তোমরা সকলে জানতে চেয়েছ যে দীপালীর নতুন বছর থেকে নতুন ধরণের কি রকম উপন্যাস বার হবে এবং তার লেখক কে?…একেবারে নতুন ধরণের উপন্যাস বার হবে। বিষয়টা হচ্ছে: আজকের যুগ হচ্ছে যন্ত্রের যুগ, বা বিজ্ঞানের যুগও বলা যেতে পারে। এ যুগের যেমন ক্রমোন্নতি হতে দেখা যাচ্ছে তাতে করে "আজি হ'তে লক্ষ বর্ষ পরে" এর যে অসাধারণ উন্নতি হবে এবং কি ধরণের উন্নতি হবে কথা শিল্পী শ্রীযুত প্রবোধ সরকার সেই কল্পনার জাল বুনে তোমাদের জন্যে সত্যিই একটা নতুন ধরণের উপন্যাসের সৃষ্টি যে করেছেন তা' তোমরা পড়লেই বুঝতে পারবে।…… বলেছি তো", রাণু আর তার দাদা' নামে যে ধারাবাহিক লেখাটা বার হচ্ছিল তা' একেবারে নতুন বছর থেকেই আবার আরম্ভ করবো. যখন ধৈর্য্য ধরে এতদিন ছিলে তখন আর এই ক'টা দিনও থাকতে পারবে আশা করি।…হ্যাঁ, নতুন বছরের চাঁদা পাঠাতে আরম্ভ করেছ কিন্তু অনেকে পুরাতন সভ্য সংখ্যাটা জানাতে ভুল করেছ দেখলাম। সভ্য সংখ্যা জানাতে ভুল করলে নতুন সভ্য বলে হবে। সাবধানে লিখো এবার থেকে।…স্নেহ নিও।

তোমাদের: বিজনদা'

একটুখানি হাসো

—হিরণ্ময় ভট্টাচার্য্য

সাধারণ জ্ঞানের ঘণ্টায় শিক্ষক মশাই ছেলেদের পড়াতে পড়াতে বললেন "শের-শাহের সময় প্রথম ঘোড়ার ডাক হয়।"

একটা ছেলে উঠে বলল "স্যার, তা কি

শিক্ষক—তার মানে? তুমি বলতে চাও কি?

ছাত্র—এ শুনে প্রথমে সে থতমত খেয়ে গেল, তারপর বললে: "আচ্ছা স্যার, তার আগে ঘোড়ারা বোবা ছিল নাকি?"

* * *

সেদিন সাহেবের জন্মদিন। তাই বেয়ারাকে ডেকে ইংরিজীতে বললেন "এক টাকার flower কিনে আন।"

কিছুক্ষণ পরে বেয়ারা একঠোঙা ময়দা (flour) এনে হাজির করলো।

* * *

একটা ছেলে স্যাকরার দোকানে নতুন কাজ শিখতে এসেছে। স্যাকরা তাকে বলল. চার আনার পান কিনে আন।

কিছুক্ষণ পরে সে এক বোঝা খাবার পান এনে হাজির করল।

মনে রেখো

…"মানুষের চামড়ার রঙ ত মনুষ্যত্বের মাপ কাঠি নয়! কোন একটা বিশেষ দেশে জন্মানই ত অপরাধের হতে পারে না।……ধর্ম্মমত ভিন্ন হলেই কি মানুষ হীন প্রতিপন্ন হবে? এ কোথাকার বিচার! এই বলছি যে, তারা একদিন মরবে। এই যে মানুষকে যারা অকারণে ছোট করে দেখে, এই যে ঘৃণা, এই যে বিদ্বেষ, এ অপরাধ ভগবান কখ্‌নো ক্ষমা করবেন না।" —শরৎচন্দ্র।

মুক্তার জন্ম

—শ্রীঅতুলচন্দ্র সরকার

এক যে ছিল রাজকন্যা, হাসলে তার মুখ দিয়ে মণি ঝরতো, আর কাঁদলে তাঁর অশ্রুবিন্দু

গল্প বুড়ি ঠাকুরমার কাছ থেকে শুনে ছোট বেলায় একটা বিশ্বাস জন্মেছিল যে মুক্তাগুলো বুঝি সত্যি করেই রাজকুমারীর অশ্রুকণা… তোমরাও কি তাই মনে করো? তাহলে খুলেই বলছি তোমাদের মুক্তার জন্ম রহস্য।…সমুদ্রের তলায় শুক্তি জাতীয় ঝিনুক হচ্ছে মুক্তার জন্মদাতা। একটা তাজা ঝিনুকের মুখ ফাঁক করলেই দেখতে পাবে তার ভিতরে রয়েছে খুব নরম মাংসে তৈরী ঝিনুকের দেহ। বাইরের খোলাটা যে খুব শক্ত তা তো সকলেই দেখেছ। যাতে চলাচল করবার সময়ে ঝিনুকের এই কঠিন খোলের সঙ্গে দেহের সংঘর্ষ না হ'তে পারে তার জন্য খোলের ভিতর পিঠে Nacre বা Mother of pearl বলে সাদা একরকমের ভেজলিন জাতীয় জিনিষ মাখান থাকে। একটা শুকনো খোলের ভিতরটা লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবে রূপালী রংয়ের একটা coating, এটা আর কিছুই নয় ঐ শুকনো Nacre… …সমুদ্রের বুকে থাকতে থাকতে হঠাৎ কোন প্রকারে ঝিনুকের ভিতরে প্রদাহ আরম্ভ হয়। এই সময় খোলের গায়ের Nacreগুলো গলে এসে এই বালুকণাকে ঢেকে ফেলে আর তার ফলে ঝিনুকের অস্বস্তি প্রশমিত হয়। এখন এই Nacre ঢাকা বালুকণাই হচ্ছে মুক্তা; রাজকুমারীর চোখের জল কিন্তু নয়!

আদর্শ

--নৃপেন সেনগুপ্ত, (সভ্য নং ৩৮৯)

আদর্শের নিজস্ব কোন কায়া নাই, তবে ছায়া আছে। মানব-চরিত্র গঠনের মূলে রহিয়াছে এই ছায়ায় অদৃশ্য প্রভাব, আমাদের সুখ-শান্তি, উন্নতি-অবনতি—সব কিছুই নির্ভর করিতেছে সেই আদর্শের উপর, যে আদর্শকে ভিত্তি করিয়া আমরা আমাদের জীবনকে গড়িয়া তুলিয়াছি। আমাদের ভাগ্য আমরা নিজেরাই গড়িয়া তুলি—নিজের সুখ-দুঃখ নিজেই টানিয়া আনি। ইহার উপর অন্য কাহারো হাত নাই। সুতরাং বলা যাইতে পারে আমাদের উত্থান-পতনের জন্য আমরাই দায়ী; অন্যকে এইজন্য দোষী করা ভুল।

জীবনে উন্নতি করিতে হইলে প্রত্যেকেরই একটা লক্ষ্য থাকা দরকার এবং সেই লক্ষ্যে পৌঁছিবার উপযুক্ত করিয়া নিজের জীবন-পথকে গড়িয়া তুলিতে হইবে। লক্ষ্যহীন জীবন কখনো উন্নতির শিখরে আরোহণ করিতে পারে না। ইংরাজীতে একটা কথা "A life without aim is like a ship without rudder"—হালশূন্য জাহাজ যেমন মাঝ সমুদ্রে পড়িয়া ঢেউয়ের তলায় নিজেকে হারাইয়া ফেলে, লক্ষ্যহীন জীবনও ঠিক তেমনি জীবন-সমুদ্রে খেই হারাইয়া হাবুডুবু খাইতে থাকে—কখনো গন্তব্যস্থানে পৌঁছিতে পারে না।

লক্ষ্য স্থলে পৌঁছিতে হইলে জীবনকে তার উপযুক্ত করিয়া তুলিতে হইবে; এই গড়নের জন্য যে জিনিষটা দরকার তাকেই এক কথায় বলা যাইতে পারে 'আদর্শ'। জীবন-ক্ষেত্রে চলিবার পথে নানাপ্রকার প্রলোভন, আকর্ষণ আমাদিগকে পথচ্যুত করিতে চায়, আলেয়ার মতো তাহারা চোখকে আমাদের ধাঁধিয়া দেয়। আমরা অধিকাংশ সময়েই অন্ধের মতো সেই আলোতে ঝাঁপাইয়া পড়ি—দিক্-বিদিক্ বিবেচনা করিবার অবসর তখন আমাদের থাকে না। অগাধ সমুদ্রে নিজেকে বিসর্জন দিয়া বসি। ভাবি—এই বুঝি শান্তিধাম। এখানেই বুঝি জগতের সবকিছু সুখ, সম্পদ, ভোগ-বিলাস রহিয়াছে। কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই আলেয়া মরিয়া যায়—নিজের ভুল বুঝিতে পারি, মিথ্যা আলেয়ার পরিচয় পাই যখন থমকিয়া দাঁড়াইয়া দেখি—আমি কোথায়! উঠিবার পথ আর খুঁজিয়া পাই না। তারপর যতোদিন বাঁচি ঐ অতল গর্ত্তের ভিতর হাহাকার-পূর্ণ দুঃখময় জীবন যাপন করি। অনুতাপ, অনুশোচনা জীবনকে অতিষ্ঠ করিয়া তোলে।

আদর্শই পথের শেষে গিয়া লক্ষ্যে রূপ পাইয়াছে। আদর্শই লক্ষ্যে পৌঁছিবার পথ। পথভ্রষ্ট হওয়ার অর্থই আদর্শচ্যুত হওয়া। এই পথে অগ্রসর হওয়া কঠিন—খুবই কষ্টকর। নিজেকে স্থির রাখিতে হইলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন সংযম এবং চরিত্রবল। জীবন-পথের ঝড় ঝঞ্ঝা প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা এই দুইটীর সবচেয়ে বেশী। আর এই ভিত্তিকে দৃঢ়তর করে ধৈর্য, নম্রতা, ভালবাসা, বিশ্বাস প্রভৃতি বিভিন্ন সদ্গুণ। ইহারাই সমষ্টিগত হইয়া আখ্যা নেয়—আদর্শ।

এই সকল গুণ যাহারা আয়ত্ব করিতে পারে, তাহারা কখনো নিজেকে ভুলের বেড়াজালে জড়াইয়া ফেলে না—পা তাহাদের কখনো ফস্‌কায় না—পথভ্রষ্ট তারা কোনোদিন হয় না। সত্যিকারের জীবন উপভোগ করে তাহারাই। আলেয়াতে তাহারা ভুলিয়া যায় না—প্রকৃত আলোই তাহাদের ডাকিয়া নেয়, —তাদের পথ দেখায়। বিপদের ভ্রূকুটী, বজ্রের গর্জন, দুঃখের বাঁকা চাহনী তাহাদের কখনো বিচলিত করিতে পারে না—মিথ্যা প্রলোভন তাহাদের কামনাকে উদ্দীপিত করিতে পারে না। নিঃশঙ্কভাবে তাহারা যাত্রাপথে আগাইয়া চলে, নির্বিঘ্নে আপন লক্ষ্যে গিয়া পৌঁছিতে পারে। সেই আনন্দ লোকের যে সকল দৃশ্য তাহারা দেখে তাহা তাহাদের মনে প্রাণে পরিপূর্ণতা এবং শান্তির ফোয়ারা বহাইয়া দেয়! তাহাদের জীবনের বিনাশ হইলেও তাহার ভিতর এমন কিছু বাঁচিয়া থাকে যাহা অবিনশ্বর—চিরন্তন—শাশ্বত।

প্রত্যাখ্যান

(উপন্যাস)

শ্রীসুধাংশু কুমার হালদার, আই, সি, এস্

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(১২)

গোকুল মুখুর্য্যের ফিরতে সেই পরশু। এ'কটা দিন কাটে কেমন ক'রে?···নমিতা মায়ের দেরাজের চাবি নিয়ে দেরাজ খুললেন। কি আছে না আছে সমস্ত একবার দেখে নিতে হবে। মনে মনে একটা উৎসুক্য ছিল, কতটাকার সম্পত্তি মা রেখে গেছেন কে জানে? দেরাজে থাকে থাকে কাগজের বাণ্ডিল, লাল নীল ফিতে দিয়ে বাঁধা। একপাশে ব্যাঙ্কের পাশ বই, চেক বই। একি, পাশ বই নমিতার নামে, চেক বইয়ে একটা চেকও কাটা হয় নি। নমিতার মনে পড়ল, মায়ের অসুখ উগ্রমূর্ত্তি ধরবার পুর্ব্বক্ষণেই মা তাকে একটা কাগজে সই করে দিতে বলেছিলেন। এখন নমিতা বুঝতে পারলেন, সমস্ত টাকা মা ব্যাঙ্ক থেকে উঠিয়ে তাঁর নিজের নামে রেখে গেছেন। নমিতা পাস্ বই খুলে বিস্মিত হ'য়ে দেখলেন পাঁচ অঙ্কের টাকা রয়েছে তার মধ্যে লেখা! মনে পুলক জাগল, এ সমস্তই হবে অসীমের, পড়ে থাকতে হবে না আর তাকে সুদূর পলাশবনীর নির্ব্বাসনে। এই যে নিবেদন ক'রে দেবার ঝোঁক এ এমন করে মনকে পেয়ে বসে কেন? এর মধ্যে কোনো ফাঁকী নেই তো? সস্তা বাহাদুরী পাবার লোভ নেই তো!...না, না, না। "ঝোঁকের মাথায় যে-চলা সেই তো আসল চলা"—মনে পড়ল অসীমের একথা। এই যে নিজেকে রিক্ত ক'রে একটি মুহূর্ত্তে যা কিছু সব দান ক'রে দেওয়া,—কী অসহ্য পুলক রয়েছে এর মধ্যে!···সে যদি না নেয়! হঠাৎ কথাটা কাঁটার মতো বিঁধল বুকে। ইস্, না নিয়ে থাকুন দেখি! নমিতা ভাবলেন অসীমের দুটি পায়ে মাথা ঠেকিয়ে জলভরা মিনতির চোখে তিনি যখন চেয়ে দেখবেন উর্দ্ধমুখে তাঁর মুখের পানে, তখন সে কি অনাদরে পায়ে ঠেলে ফেলে দিয়ে চলে যেতে পারবে? নমিতার ভালবাসার কি কোন জোরই নেই! শুনেছেন পুরাণে উপকথায় কতশত সতী নারীদের কাহিনী। পড়েছেন কুমারসম্ভবে উমার সে কঠোর তপস্যার কাহিনী। হিমাচলের মেয়ে হয়েও যিনি পর্ণ পর্য্যন্ত না খেয়ে শিবের জন্যে কঠিন সাধনা ক'রে অপর্ণা নাম অর্জন করেছিলেন। হয়নি কি শিবের দয়া? সার্থক করেন নি তিনি কি উমার ভালবাসাকে?··· নমিতা একটু হাসলেন। মন তাঁর অত্যন্ত সন্দিগ্ধ তাই কেবল কু গাইছে। হঠাৎ চোখে পড়ল একপাশে একতাড়া পুরাণো চিঠি সেই তাড়াটা উঠিয়ে নিয়ে দেরাজ বন্ধ করে দিলেন। গেলেন শোবার ঘরে। পড়ে দেখতে হবে আজ রাত্রে। কোথায় যেন কি একটা গোলমাল আছে, বড়মামা সে কথা ভেঙে বলতে চান না। নমিতাকে নিজেই আবিষ্কার করে নিতে হবে।

নীল শেড্ দেওয়া বাতী জ্বলছে বিছানার পাশে। নমিতা চিঠির বাণ্ডিল খুলে শুয়ে শুয়ে পড়ছেন। নিচে মেঝেয় বিছানা করে শুয়ে আছে দুজন দাসী। অনেক দিনের লেখা, ম্লান হয়ে গেছে কালির অক্ষর গুলি। 'জ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ'—এতো তাঁর বাবার নাম। স্কুলে ভরতি হবার সময় লেখাতে হয়েছিল এ নাম। 'কল্যাণীয়েষু' ব'লে সম্বোধন ক'রে জানতে চেয়েছেন, 'তুমি কেমন আছ? খুকী এখন কি কি কথা বলতে পারে? জ্ঞাতিরা কি বড্ড উৎপীড়ন আরম্ভ করেছে?'—লিখেছেন মহেশপুরের এম, ই, স্কুল থেকে। সে আবার কোথায় কে জানে! একখানি চিঠি শেষের দিকে লেখা, 'এ মাসে তোমায় অতিকষ্টে দশটি টাকা পাঠাচ্ছি। কোনক্রমেই আর এর চেয়ে বেশী জোগাড় করতে পারলুম না। দরিদ্র স্কুলমাষ্টারের এর চেয়ে বেশী সঙ্গতি তো নেই!'— দরিদ্র স্কুল-মাষ্টার, মহেশপুর এম,-ই- স্কুল, দশটি মাত্র টাকা,—তাহ'লে এই সব প্রাচুর্য্য,—নমিতার কানের পাশ দিয়ে যেন বন্দুকের গুলি ফেটে গেল, তাহ'লে এব সব বড়মানষী তাঁর বাবার পয়সায় নয়। তবে এ সব এল কোথা থেকে!···

সারারাত নমিতা বিছানায় ছটফট করতে লাগলেন। সকাল হ'তে না হতেই আবার সেই দেরাজের আকর্ষণে ছুটলেন, কিন্তু খুলতে সাহস হ'ল না! না জানি, কী সর্বনেশে জিনিষই না আছে ওর মধ্যে! থাক তা ওর মধ্যেই চাপা থাক। দুই হাতে মাথা টিপে একটা চেয়ারে বসে পড়লেন। শম্ভু চাচুর্য্যে দূর থেকে দেখে সন্ত্রস্ত হ'য়ে উঠলেন, কিন্তু কিছু বললেন না! এম্নি ক'রে সারা সকালটা কাটল।

কিন্তু সংশয়ের দোলায় কতক্ষণই বা থাকা যায়! ইচ্ছা ছিল বিকেলে দেখবেন অনুসন্ধান ক'রে। কিন্তু ভিড় ক'রে এলেন বান্ধবীর দল; সমস্ত সন্ধ্যা কেটে গেল তাঁদের সহানুভূতি নিবেদনে।...তার পরের দিন সকালবেলা। খুঁজতে খুঁজতে বেরুল তাঁর মায়র হাতের লেখা ছোট্ট একখানি খাতা, ওপরে লেখা, 'আমার কন্যা নমিতার জন্যে।' অসমান হরফে, অসংলগ্ন ভাষায় লেখা সংক্ষিপ্ত অভিসপ্ত জীবনের কাহিনী,— বুকের রক্ত দিয়ে, চোখের জল দিয়ে লিখেছেন যেন! সবশেষে লিখেছেন, —এই তোমার মা, ইচ্ছা হয় তাকে মনে রেখো, না হয় তার কথা স্মৃতি হ'তে দূর দিও। করে আমার কেবল একটীমাত্র প্রার্থনা, তুমি সুখী হও।

নমিতার মনে হ'ল এই বিলাসের উপকরণ কী মূল্যে সংগ্রহ করেছেন তাঁর মা! ছিঃ! নমিতার গা বমি বমি ক'রে উঠল। পায়ের তলা থেকে হঠাৎ যেন সমস্ত মাটি নেমে গেল, এক মুহূর্ত্তে সমস্ত প্রাসাদ, সাজ সরঞ্জাম, দাস দাসী যেন মরীচিকার মতো অদৃশ্য হয়ে গেল। নিজের শরীরটার উপরই ঘৃণা হ'ল তার এখানকার কোন জিনিষ ছুঁতে গা ঘিন্ ঘিন্ করতে লাগল!···তাই মায়ের এই তফাতে তফাতে থাকা, তাই তাঁর এই আত্মগোপন!...পাশ বইয়ের পাঁচ অঙ্কের টাকাটা যেন নমিতার মুখের

দিকে দাঁত খিঁচিয়ে চেয়ে রইল, এবাড়ীর চেয়ার টেবিল আয়না, সোফা, কৌচ্ গুলো যেন তাঁর দিকে চেয়ে খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠলো। ব'লে উঠল "কেমন জব্দ! কেমন জব্দ!"

চাকর এসে খবর দিল, গোকুল মুখুয্যে ফিরে এসেছে।

চটী ফট্ ফট্ ক'রে এল গোকুল মুখুয্যে,—একা। অসীম আসে নি।

গোকুল সখেদে জানাল, "আজ্ঞে সাড়ে ছ'টাকা, সাড়ে ছ'টাকা, একুনে তের টাকার ট্রেণভাড়াই মাটী, ন দেবায়, ন ধর্মায়!"

"পলাশবনী খোঁজ ক'রে যেতে পারেন নি?"

"না, না, তা পারব না কেন? সেখান থেকেই তো আসছি।"

"তবে?"

"বাবু তো সেখানে নেই।"

"নেই? গেছেন কোথা?"

"বিয়ে করতে গেছেন। বাবুর মস্ত কপাল! প্রকাণ্ড জমিদারের একমাত্র মেয়ে, তাঁরি সঙ্গে বিয়ে।···আহা-হা···পড়ে গেলেন নাকি! পাখাটা খুলে দিচ্ছি! তেম্নি অসহ্য গুমোট গরম করেছে আজ!···হাঁা, যে কথাটা বলতে যাচ্ছিলুম, ঐ যে ডাকসাইটে জমিদার হরিমোহন বোস, তাঁরই মেয়ের সঙ্গে বিয়ে।...তবে একেবারে নিষ্ফল হয় নি আমার যাওয়া। বাবুর চাকরকে বিশেষ করেই বলে এসেছি, বাবু ফিরে এলেই যেন তাঁকে এখানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।···আপনার চিঠিখান? না, না, সেখানা ফেলে রেখে আসব কেন? সঙ্গে করেই এনেছি, এই নিন। কোনো চিন্তা করবেন না মা, বাবুর চাকর বলেছে বাবু দু'চার দিন পরেই ফিরবেন।"···তারপর হঠাৎ নমিতার রক্তশূন্য পাণ্ডুর মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁর দুঃখের কারণটা অনুমান ক'রে নিয়ে গোকুল বলল, "তবে আফ্ শোষের কথাই তো মা! সাড়ে ছ'টাকা, সাড়ে ছ'কা একুণে এই তের টাকা একেবারে জলে গেল কি না! কষ্ট হবার কথাই তো!"—নমিতার ইসারায় গোকুল সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেল।

নমিতা চিঠিখানা এমন শক্ত ক'রে চাপে ধরেছিলেন যে, তাঁর আঙুলের গাঁটগুলো সাদা হয়ে উঠেছিল। টুকরো টুকরো ক'রে চিঠিখানা ছিঁড়ে ফেলে দিলেন। একজন দাসী গ্লাসে ক'রে দুধ নিয়ে এসেছিল, তাঁর মূর্ত্তি দেখে সে সন্ত্রস্ত হ'য়ে শম্ভু চাটুয্যেকে খবর দিতে চলে গেল।

নমিতার সব মিথ্যা···এত ধন, এত সম্পত্তি, অত আশা, এত আকাঙ্ক্ষা, জীবন, যৌবন, রূপ, দেহ—সমস্ত মিথ্যা হ'য়ে গেল! বিধাতার কী চমৎকার পরিহাস! নমিতার নিজেরই খুব জোরে হাসতে ইচ্ছা হ'ল।...

শম্ভু চাটুর্য্যে এসে দেখলেন অভাবনীয় দৃশ্য! পাগলের মতো চুল এলোথেলো, মুখ রক্তবর্ণ,—নমিতা নিজের মনে খিল খিল ক'রে হাসছেন। শম্ভুকে দেখে বলে উঠলেন, "বড়মামা, দাঁড়াও, চলে যেও না। তোমায় একটা ভারি হাসির গল্প শোনাব!"—ব'লে আদ্যোপান্ত যা ঘটেছিল তাই শোনালেন। কথা বলবার মাঝে মাঝে তাঁর সুতীক্ষ্ণ হাসির আওয়াজ ঠিক যেন ছুরীর মতো শম্ভু চাটুর্য্যের বুকে বিঁধতে লাগল।

তিনি জানেন সময়ই হচ্ছে এ রোগের একমাত্র ওষুধ। দাসীদের ডাকিয়ে নমিতাকে বিছানায় শুইয়ে দিলেন। দ্বারের পরদা ফেলে দিয়ে, পাখা চালিয়ে দিয়ে চলে গেলেন, কেউ যেন নমিতার বিশ্রামের ব্যাঘাত না করে, নমিতা অসুস্থ।

বিকাল বেলা নমিতার ডাকে শম্ভু চাটুর্য্যে এলেন তাঁর শোবার ঘরে। দেখলেন নমিতা অনেকটা প্রকৃতিস্থ হয়েছেন।

"বড়মামা, আমি এ বাড়ীতে আর একটুও তিষ্ঠুতে পারছি না। আমায় চলে যেতে হবে।"

"সে কি! কোথায় যাবে খুকী?"

"যেখানে হয়। এ বাড়ীর সব জিনিস যেন দাঁত বার করে আমায় দেখে হাসছে। এ বাড়ীর সব নোংরা, নোংরা—আমার গা ঘিন্ ঘিন্ করছে!

শম্ভু নীরবে তাঁর টাকে হাত বুলাতে লাগলেন।

"আমি কিছুদিন ঘুরে বেড়াব, কোনো জায়গায় বেশীদিন টেঁকতে পারব না। তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াব।

"শম্ভু কিছুক্ষণ ভাবলেন। তারপর বললেন, "ভাল কথাই বলেছ মা। তবে এখানকার ব্যবস্থা কি হবে মা!

"সে এখনো কিছুই ঠিক করিনি বড়মামা। আমায় ভেবে দেখতে দাও। অনেকদিন লাগবে মন ঠিক করতে।

"আচ্ছা মা, তার জন্যে কোনো তাড়া নেই। আমায় কেবল দুটি দিন সময় দাও। আমি এখানকার সবাইকে কাজের ভার বুঝিয়ে দিই। তারপর আমরা বেরিয়ে পড়ব। প্রথমে কোথায় যাবে? চলো না কাশীতে যাওয়া যাক।"

"আমরা আবার কে? শুধু আমি একা যাবো।"

"পাগলী মা, মনে করেছ এ বুড়োটাকে নিলে কেবল ঝঞ্ঝাট বাড়বে! তা, হবে না মা, বুড়ো যাবেই যাবে সঙ্গে।"

"তুমি সঙ্গে যাবে কেমন ক'রে বড়মামা? এই যে সেদিন বললে, তোমার এখান থেকে নড়া অসম্ভব? তোমাদের এসব বিষয়-সম্পত্তি দেখবে শুনবে কে?"

"তার অন্য লোক আছে মা, কিন্তু আমি না গেলে তোমাকে দেখবে কে?"

"দেখ বড়মামা, আমার কথায় তুমি দুঃখ পাবে জানি, কিন্তু তবুও আমায় বলতে হবে। দুঃখকে এড়িয়ে গেলে চলবে না। এখানকার কোনো কিছুর সঙ্গে সম্বন্ধ রাখব না ঠিক করেছি, তাই তোমাদের সকলের সঙ্গেও আমার সমস্ত সম্বন্ধ ছিন্ন হ'ল।"

শুনে শম্ভু চাটুর্য্যে শিশুর মতন কেঁদে ফেললেন। তারপর কোঁচার খুঁটে চোখ মুছে বললেন, "তোমায় এতটুকু বয়েস থেকে বুকে পিঠে ক'রে মানুষ করেছি, মা ব'লে ডেকেছি। সে কি বিষয় সম্পত্তির সম্পর্কে খুকী? বড্ড ভয়ে ভয়ে ছিলুম মা, জানতুম একদিন যখন তুমি সমস্ত শুনবে, তোমার রোষের বজ্র পড়বে এই হতভাগা সংসারে। কিন্তু সে বজ্র যে আমার ওপর এমন নিদারুণ হ'য়ে পড়বে, তা ভাবিনি।"

নমিতা চুপ করে বসে রইলেন, কোনো কথা বললেন না।

শম্ভু বললেন, "আমাকে ছাড়লেও আমি তোমায় ছাড়ছি নে মা। যেখানে যাবে, বুড়ো শম্ভু পিছু পিছু যাবে। এখানকার কোনো টাকা তোমাকে ছুঁতে হবে না। এতদিন চাকুরি করলুম, একেবারে নিঃসম্বল নই। আমার যা খুদকুঁড়ো আছে তাতে মা বেটার বেশ চলে যাবে।"

কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে নমিতা চেয়ে রইলেন শম্ভুর মুখের পানে। আজ জীবনের এই দারুণ দুর্য্যোগের রাতে যখন সবাই ছেড়েছে, কেবল এই একটিমাত্র লোক তখন তার বার্দ্ধক্যজীর্ণ ক্ষীণ বাহুদুটি দিয়ে তাঁকে সর্বনাশ হ'তে রক্ষা করতে দাঁড়িয়েছে। নমিতা স্তব্ধবিস্ময়ে ভাবতে লাগলেন, ঠাকুর, একী লীলা তোমার!...যার হাত থেকে এসেছে আজ এই নিদারুণ মার, সেই তিনিই আবার পাঠিয়েছেন বুড়ো শম্ভুর বুকে এত অযাচিত স্নেহ নমিতাকে সেই মার থেকে বাঁচাতে!...এম্নি করেই যে তি তাঁর খেলা খেলে থাকেন মানুষের সঙ্গে? তাঁর ললাট-নেত্রে আছে বহ্নির জ্বালা, আর তাঁর অন্য দুটি চোখে আছে সমবেদনার অশ্রুজল! বাম হাতে তিনি নিয়ে আসেন মৃত্যু, দক্ষিণ হাতে অমৃত!...

শম্ভু চলে যাবার জন্যে পিছন ফিরলেন, কিন্তু একটু ইতস্তত ক'রে ঘুরে দাঁড়ালেন। অনেক দ্বিধা ঠেলে অত্যন্ত ব্যথিত কণ্ঠে তিনি বললেন, "একটা কথা খুকী,—তুমি আজ এতবড় প্রচণ্ড দুটো আঘাত পেলে, তোমার মনে যে কি হচ্ছে তা আমি জানি। তবু মা, তোমায় সাবধান ক'রে দিচ্ছি, যদি,—যদি তোমার মাকে তুমি ভুল বোঝ। দধীচি যেমন ক'রে নিজের অস্থি দিয়েছিলেন পরের জন্য, তিনিও তেমনি ক'রে তাঁর সর্ব্বস্ব দিয়েছিলেন—শুধু তোমারি কল্যাণে। আমি যে দেখেছি মা, এই ষোলটা বছর ধরে প্রতি মুহূর্ত্তে দেখেছি। আমার চোখ তো ভুল দেখে না মা!"— শেষের দিকটায় তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হ'য়ে এল।

নমিতা তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে বললেন, "আমায় সময় দাও, সবটা ভাল ক'রে বুঝে দেখতে দাও, তোমরা আমায় ভুল বুঝো না, দয়া করো। মা, মাগো, আর যে আমি সইতে পারি না।"

(ক্রমশঃ)

টিফিন

—শ্রীকাত্যায়নী দেবী

ছোট ছোট বালক-বালিকাদিগের জন্য ভাবিতে হয় পিতা অপেক্ষা মাতাকেই অধিক, কেননা খাদ্য বণ্টন পরিবেশনের ভার মায়ের হাতেই থাকে। টিফিনের সময় কিছু খাইবার জন্য অধিকাংশ ছেলেরাই কিছু পয়সা লইয়া বা পাইয়া থাকে, তাহাতে কি যে খায়—সে সংবাদ হয়ত সকল মা রাখেন না। এখনকার দিনে দু'পয়সা বা চারিপয়সায় কিছু বড় খাওয়া যায় না আর যাও-বা খাওয়া যায় তাহা খাদ্য নাম ভুক্ত হইলেও অখাদ্য পর্য্যায়েই পড়িয়া থাকে। তবে ছোটদের খাদ্যাখাদ্য বিচার থাকে না এবং ক্ষুধার উদ্রেকও হয় প্রবল, তাই যাহা পায় তাহাই খায়।

বেলা দশটায় খাইয়া চারিটা পর্য্যন্ত কিছু না খাইয়া থাকা শিশুদের পক্ষে বড়ই কঠিন, অথচ এদেশের শিক্ষা-পদ্ধতি বা প্রণালী এত বাহুল্যতা দোষ-দুষ্ট যে অতটা সময়েও কুলাইয়া উঠে না। তাই মনে হয় মায়েদেরই উচিৎ এই লইয়া আন্দোলন তুলিয়া, স্কুল কর্ত্তৃপক্ষ যাহাতে টিফিনের সময় ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কিছু খাবারের ব্যবস্থা করেন, তাহারই দাবী জানান। বাঙ্গালী বা ভারতবাসী ভিক্ষুকের ন্যায় গবর্ণমেন্টের দুয়ারেও হাত পাতিয়াই আছে, আমাদের দেশে ভবিষ্যৎ জাতি শিশুদের জন্য না হয় 'দেহি দেহির' তালিকায়—আরও একটা 'দেহি' যোগ হইবে। আইনের কঠোর নির্দ্দেশ ব্যতিরেকে আমাদের দেশে কিছুই হয় না; তাই রাষ্ট্রের আদেশ পাইলে স্কুল কর্ত্তৃপক্ষ টিফিনে 'কিছু' ব্যবস্থা করিতে দ্বিরুক্তি করিবেন না।

'ব্যবস্থা' অর্থাৎ লুচি পোলাওয়ের ব্যবস্থা নহে, মুড়ি-মুড়কি, ডাল-রুটী, মাখন-পাঁউরুটী পাকা কলা, নারিকেল প্রভৃতি সহজ লভ্য অথচ পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা করার কথা বলিতেছি। কোন ময়রা বা ঐ প্রকার দোকানীর সহিত ব্যবস্থা করিলে (কনট্রাক্ট) তাহাদের লোকই খাবার আনিয়া ভাগ করিয়া দিয়া যাইবে। পূর্ব্বে দু'একটী স্কুলে এরূপ ব্যবস্থার কথা শুনিয়াছি। যাক্ ইহা ত হইল সুদূর কল্পনা। আকাশ-কুসুম বলিলেও চলে। মায়েদের এ বিষয়ে কিছু করা চলে কি না তাহাই বলিতেছিলাম। তবে প্রথমেই বলিয়া রাখি—যাঁহারা চাকরের হাতে টিফিন-ক্যারিয়ার ভর্ত্তি লুচি, মাংস, ডিম প্রভৃতি ছেলে-মেয়ের জন্য স্কুলে প্রেরণ করেন আমার এ প্রবন্ধ তাঁহাদের জন্য নহে।

আজিকার সঙ্কটে ধ্বংসের পথে মধ্যবিত্ত ঘরের, দরিদ্র ঘরের সন্তানেরাই।' মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র গৃহের মাতারাই আজ মর্ম্মান্তিক বিপন্না। তিলে তিলে স্বাস্থ্যহারা হইতেছে তাঁহাদেরই সন্তান। হাতে তুলিয়া পুষ্টিকর খাদ্য মাতা সন্তানকে পরিবেশন করিতে পারিতে পারিতেছে না। কোনও প্রকারে যা তা দিয়া পেট ভরাইয়া দিতে পারিলেই তাঁহারা বাঁচিয়া যান। তবু মায়েরা এত অভাব অনটনের ভিতরও সন্তানের আব্দারে, দৌরাত্মে, বা মমতায় টিফিনে কিছু খাইবার জন্য দু'চারিটা পয়সা দিয়া থাকেন, সেই সামান্য দুই চারি পয়সাতেই—কলা, শশা, পেয়ারা, কুল, কমলালেবু, প্রভৃতি যে কোন একরকম ফল কিনিয়া শিশুর নিকট দেওয়া ভাল। পয়সা লইয়া তাহারা যাহা কিনিয়া খায় তাহাকে কখনই খাদ্য বলা চলিতে পারে না, [illegible]

অস্বাস্থ্যেরই কারণ হইয়া থাকে। অবশ্য ছেলেরা প্রথমে বলিবে—"যতক্ষণ পকেটে খাবারটি থাকিবে ততক্ষণ মনটা সেইদিকে থাকিবে। খাওয়া না হইলে শান্তি হয়না।"—ইত্যাদি, কিন্তু তথাপি ও টিফিনে পয়সা না দিয়া কিছু ফল কিনিয়া দেওয়াই মায়েদের একত্রিত চেষ্টা হওয়া উচিত। স্কুল হইতে টিফিনের ব্যবস্থার জন্য সকল সভ্য দেশেই স্কুল হইতে শিশুদের কিছু পুষ্টিকর খাদ্য দেওয়ার রীতি আছে। আর আমাদের দেশ ত আজ দারুণ বিপন্ন। মধ্যবিত্ত ঘরের স্বাস্থ্যে ইতিমধ্যে যথেষ্ট ভাঙ্গন ধরিয়াছে—আরও বাড়িবে, ইহার কারণ শুধুই পুষ্টিকর খাদ্যাভাব। দেশের মনস্বীগনের লক্ষ্য এদিকে বিশেষ ভাবে পড়া উচিত, যদি আমাদের সন্তানই ক্ষীণদেহ, স্বল্পায়ু হইতে থাকিল তবে দেশে সুখ স্বাধীনতা স্বাচ্ছন্দ্য কি কাজে লাগিবে?

খেলার মাঠে

পরিচালক :
শ্রীউমেশ মল্লিক, বি-এ

পেণ্টাঙ্গুলার প্রতিযোগিতার পর রঞ্জী ট্রফীর খেলা আরম্ভ হয়েছে। এবৎসরের প্রতিযোগিতার বিশেষত্ব এই যে প্রতি খেলাটি চারদিন ধরে অনুষ্ঠিত হবে। ফলে উত্তেজনার অভাব হবে না। আজ পর্য্যন্ত যে কয়টি এ অনুষ্ঠানের খেলা আরম্ভ হয়েছে তার মধ্যে মহারাষ্ট্র এবং বাঙ্গলা দলের ফলাফলের উপর অনেকেই অধীর প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করছিলেন। মহারাষ্ট্র দল প্রতিপক্ষ নওনগরকে ৪৯৪ রাণে পশ্চিম বিভাগের খেলায় পরাজিত করেছে। মহারাষ্ট্রদলের অধিনায়ক অধ্যাপক দেওধর ২টি ইঃ-এই শতাধিক রাণ করে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছেন। অধ্যাপকের ১ম ইঃ-এর ১০৫ রাণ এবং দ্বিতীয় ইঃ-এর ১৪১ রাণ তাঁর স্বীয় বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দেয়। মহারাষ্ট্র দলের কে, এম, যাদব-এর ১মঃ ইঃ নট্ আউট ৮৪ রাণও এ দলের ১ম ইঃ-এ ৩৭২ রাণ সংগ্রহ করায় বিশেষ কার্য্যকরী হয়। দ্বিতীয় ইঃ-এ মহারাষ্ট্র দল ৩৮২ রাণ করে। বিপক্ষীয় নওনগর দল ১ম ইঃ ১৩১ এবং দ্বিতীয় ইঃ-এ ১১৫ রাণ করায় ৪৯৪ রাণে পরাজিত হয়। নওনগর

তবে ১মঃ ইঃ-এর এস জি সিন্ধের ১৮ রাণে ৫ উইঃ গ্রহণ কৃতিত্বের বিষয় সন্দেহ নেই।

বাঙ্গলা দলের খেলা ইউঃ পিঃ দলের সঙ্গে শেষ হয়েছে। বাংলা দল ১ম ইনিংসে ২৪৮ ও ২য় ইনিংসে ১৭৬ রাণ করে এবং যুক্ত-প্রদেশ দল ১ম ইনিংসে ১৫৭ ও ২য় ইনিংসে ১৫৪ রাণ করে মাত্র ৭৫ রাণে জয়লাভ করেছে। ইউঃ পিঃ বনাম বাঙ্গলা দলের খেলাটা মোটেই আকর্ষনীয় হয়ে উঠেনি। বাঙ্গলা দলের কাছে আমরা অনেক কিছুই আশা করেছিলাম কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে আমরা যা দেখলাম তাতে বাঙ্গলা দলের পক্ষে নিশ্চয়ই গৌরবের নয়। তবে ক্রিকেট খেলা নির্ভর করে সুযোগ এবং সন্ধানের উপর। পরের প্রতিযোগিতায় বাঙ্গলা দল যে উৎকর্ষের পরিচয় দিতে পারবে না একথা কেউ মুক্ত-কণ্ঠে বলতে পারেন না। তবে যাতে বাঙ্গলা দল তাঁদের সুনামের জন্য অনুশীলনী করে এদিকে আমরা কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। কে, ভট্টাচার্য্য, এন চৌধুরী প্রভৃতি বোলিংএ সাফল্যের পরিচয় দিলেও ব্যাটিংএ বিশেষ

বোম্বায়ের পেণ্টাঙ্গুলার ক্রিকেট ফাইনালে দর্শকের বিপুল জনতার একটি দিক। এই খেলাটি Indian News Parade কর্তৃক ছায়াচিত্রে গৃহীত হইয়াছে।

বি দত্তের ১মঃ ইঃ-এর ৫৩ রাণ এবং পি, সেনের ৬৩ রাণ যা মন্দের ভাল। নির্ম্মল চ্যাটার্জ্জীর কাছে আমরা অনেক কিছুই আশা করেছিলাম এবং আরও আশা করেছিলাম পার্থসারথীর কাছে।

রঞ্জী ট্রফীর উত্তর ভারত ক্রিকেট এসো-সিয়েশনের বিরুদ্ধে দিল্লী দলের খেলাটীতে প্রথমোক্ত দল এক ইঃ ও ২২ রাণে জয়লাভ করে। আশাতীত রাণ সংগ্রহ হওয়ায় বিজয়ী দল ৭৫ উইঃ ৩৫৮ রাণ করে প্রতিপক্ষ দলকে "ফলো অন্" করতে বাধ্য করে, কিন্তু বিজয়ী উত্তর ভারত দলের আমিনের মারাত্মক বোলিং বিজিত দলের ভাগ্য বিপর্য্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আমীন ৩৩ রাণে ৫ উঃ সংগ্রহ করে। হাফিজের ২৫ রাণে ৭ উঃ গ্রহণ ও ২৪ রাণে ৩ উঃ লাভও কৃতিত্বের পরিচয়। উত্তর ভারত ক্রিকেট প্রতিষ্ঠানের প্রথম ইঃ-এর সাফল্যে ভিন্ডের ১১৪ রাণ ও হাফিজের ৬৮ রাণ প্রশংসাযোগ্য।

কর্ম্মেনিরত বাছাই সৈনিক দলের একটী দল ভারতের নানান স্থানে ক্রিকেট খেলায় যোগদান করবে শুনা গিয়েছিল। এখনও এ বিষয়ে স্থির নিশ্চিত হওয়া সম্বন্ধে একটু সংশয় আছে। তবে একটা কথা শুনা যাচ্ছে যদি এ দল ভারতের নানান স্থানে প্রতি-যোগিতা করে বেড়াবার স্থিরসঙ্কল্প করে থাকেন তাহলে হার্ডষ্টাফ্ বিহার দলে এবং কম্পটন হোলকারের পক্ষে যোগদান করবেন না।

নাইডুর সুবর্ণ-জয়ন্তী উপলক্ষে ভারতের সুপ্রসিদ্ধ খেলোয়াড় দলীপ সিংজী সভা-পতিত্ব করবেন বলে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। তিনিও নাকি জয়ন্তী উপলক্ষে প্রদর্শনী খেলায় যোগদান করবেন বলে গুজব শুনা যায়।

নানা কথা

শুভ-বিবাহ

গত ২৪শে অগ্রহায়ণ রবিবার, ৩।এ ডাফ্ লেন নিবাসী শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার সিংহের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান প্রসাদ কুমারের সহিত ৩৫।ই কৈলাস বসু ষ্ট্রীটস্থ শ্রীযুক্ত তুলসীরাম মিত্র মহাশয়ের প্রথমা কন্যা কল্যাণীয়া শান্তিলতার শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। বিবাহ বাসরে সহরের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। আমরা নবদম্পতীর দীর্ঘজীবন কামনা করি।

রবি-বাসর

গত ২৪শে অগ্রহায়ণ রবিবার অপরাহ্নে সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডক্টর পঞ্চানন নিয়োগী মহাশয়ের আহ্বানে তদীয় কলিকাতা, নিউ শ্যামবাজার ষ্ট্রীটস্থ ভবনে রবি-বাসরের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভায় সদস্যগণ ব্যতীত অন্যান্য বহু ভদ্রমহোদয় ও মহিলা যোগদান করিয়াছিলেন। সর্ব্বাধ্যক্ষ রায় বাহাদুর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই অধিবেশনে সদস্য-শিল্পী শ্রীযুক্ত ফণীভূষণ গুপ্ত ভারত-শিল্পে-সমসাময়িক ভারতের "চিত্র ও শিল্পকলা" শীর্ষক একটী তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করেন। ঐ সম্বন্ধে আলোচনায় শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র গুপ্ত বিশেষ ভাবে যোগদান করেন। সভার প্রারম্ভে ও অন্তে খ্যাতনামা গায়ক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেন কয়েকটী সঙ্গীত দ্বারা সকলের আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছিলেন।

সিঁথি বৈষ্ণব সম্মিলনী

গত ১০ই ডিসেম্বর ৫ ঘটিকায় ২৫নং বাগবাজার ষ্ট্রীটে বৈষ্ণব সম্মিলনী কর্তৃক সাধু টি. এল. ভাসোয়ানীকে একটী অভিনন্দন পত্র প্রদান করা হয়। এই সভায় বৈষ্ণবাচার্য্য পণ্ডিত রসিক মোহন বিদ্যাভূষণ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

ভারতীয় সাংবাদিক সঙ্ঘ

গত ১০ই ডিসেম্বর, রবিবার, বৈকাল ৪॥০ ঘটিকায় ৬২নং বাগবাজার ষ্ট্রীটস্থ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশান হলে শ্রীযুক্ত যোগেশ চৌধুরী এম, এ, (ক্যাণ্টাব) বার-এট-ল ও মাননীয়া শ্রীযুক্তা সরলা দেবী চৌধুরাণীকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হয়।

ব্রজগোপাল বালক-সঙ্ঘ

গত ১০ই ডিসেম্বর রবিবার ব্রজগোপাল বালক সঙ্ঘের পুরস্কার-বিতরণী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সভায় শ্রীযুক্ত নীরদচন্দ্র ঘোষ মহাশয় সভাপতি ও শ্রীযুক্ত কালীচরণ সেন মহাশয় প্রধান অতিথি ছিলেন। বিষ্ণুপদ রায়ের সঙ্গীতের পর সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। সভ্যগণ দীর্ঘ পাঁচ ঘণ্টা ব্যায়াম ক্রীড়া প্রদর্শন করিয়া উপস্থিত দর্শকবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ইহাদের মধ্যে পান্না মণ্ডল, অমর ও অরুণ চ্যাটার্জ্জী, বিশ্বনাথ

খ্যাতনামা ব্যায়ামবীর সত্যনিরঞ্জন মণ্ডল

সাহা, দেবেন্দ্র পাত্র, ইন্দ্রজিৎ সাহা, হেমন্ত নিয়োগী, মতি মণ্ডল, প্রোঃ সত্যনিরঞ্জন মণ্ডলের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ব্যায়াম-প্রদর্শনীর সময় শ্রীযুক্ত মতিলাল মণ্ডল মহাশয় মাইক্রোফোন যোগে বক্তৃতা করেন। এই সঙ্ঘের ক্রীড়া নৈপুণ্য দেখিয়া অনেকেই অনেক সভ্যকে পুরস্কার দিতে প্রতিশ্রুতি দেন এবং অনেকেই সমিতির উন্নতিকল্পে এককালীন চাঁদা দিতে প্রতিশ্রুত হন।

গীতশ্রী দীপ্তি বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীমতী দীপ্তি বন্দ্যোপাধ্যায় গত সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতায় সঙ্গীত সম্মিলনীর পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হইয়া গীতশ্রী উপাধি লাভ করিয়াছেন। ইনি হিজ মাষ্টারস্ ভয়েস ও অল ইণ্ডিয়া রেডিয়োর শিল্পী। শ্রীমতী আধুনিক, বাউল, ও রবীন্দ্র সঙ্গীতে পারদর্শিতার জন্য খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। ইনি কলিকাতা পুলিস শ্রীযুক্ত শৈলেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্নী ও শ্রীঅজিত ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যা। শ্রীমতী বর্ত্তমানে সঙ্গীতাচার্য্য গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের শিক্ষাধীনে আছেন।

নাটমণ্ডপ

"শেষ-রক্ষা"

আগামী কল্য রূপবাণী চিত্রগৃহে চিত্রভারতীর বহু প্রতীক্ষিত প্রথম চিত্রার্ঘ্য রবীন্দ্রনাথের সর্ব্বজন সমাদৃত "শেষরক্ষা" মুক্তিলাভ করিবে। 'পরিণীতা'র সুযোগ্য পরিচালক শ্রীযুক্ত পশুপতি চট্টোপাধ্যায় ছবিখানির পরিচালক। শ্রীযুক্ত অনাদি দস্তিদার ও দক্ষিণা ঠাকুর সঙ্গীত পরিচালনা করিয়াছেন এবং মুখ্যাংশে অভিনয় করিয়াছেন পদ্মাদেবী, বিজয়া দাশ, অমর মল্লিক, মনোরঞ্জন, জীবেন বসু, বিপিন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। আমরা এই ছবিখানির সাফল্য কামনা করি।

"দিল-কী-বাত"

আগামী কল্য আত্রে পিকচার্সের চিত্র "দিল-কি বাত" প্রভাত সিনেমায় মুক্তিলাভ করিবে। ছবিখানিতে অভিনয় করিয়াছেন—বনমালা, দুর্গা খোটে, দীক্ষিত ও ঈশ্বরলাল। ছবিখানির ভূমিকালিপি দেখিয়া মনে হয়—ইহা জনসমাদর লাভ করিতে সক্ষম হইবে।

কালিকা থিয়েটার্স

আগামী কল্য সকাল ৮৷৷০ ঘটিকায় ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে নবনির্ম্মিত কালিকা থিয়েটার্সের দ্বারোদ্ঘাটন হইবে। ইহারা বিধায়কের নাট্যরূপায়িত শরৎচন্দ্রের 'বৈকুণ্ঠের উইল' লইয়া প্রথম পাদপ্রদীপের সম্মুখে উপস্থিত হইবেন। অভিনয় আরম্ভ হইবে ২৭শে ডিসেম্বর হইতে। মলিনা, নরেশ মিত্র, ধীরাজ ভট্টাচার্য্য, রঞ্জিত রায়, ফণীরায়, তপনকুমার প্রভৃতি বিভিন্ন চরিত্রে মঞ্চাবতরণ করিবেন।

সহরের সিনেমায়—

প্রভাতের "রাম শাস্ত্রী" শ্রী, মিনার্ভা, গণেশ ও ম্যাজেষ্টিকে বিপুল সম্বর্দ্ধনার সহিত প্রদর্শিত হইতেছে। অভিনয়ে ও পরিচালনায় নিখুঁত এই ছবিখানি আমাদের আনন্দ দিয়াছে। "প্রতিকার" উত্তরা, পূরবী ও পূর্ণ থিয়েটারে সমান ভাবে চলিতেছে। সেণ্ট্রালে "পরখ", জ্যোতিতে "ধীরাজ" চলিতেছে। সিটি ও প্যারামাউণ্ট সিনেমায় সানরাইজ পিকচার্সের "মা-বাপ" বিপুল জনতা আকর্ষণ করিতেছে। নিউ থিয়েটার্সের অমর চিত্র "উদয়ের পথে" চিত্রা ও রূপালীতে ৩১ সপ্তাহে পড়িল। ছবিখানি বর্ত্তমান কালের উপযোগী বলিয়া মানব-মনে যে গভীর রেখাপাত করিয়াছে পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহই তাহার প্রমাণ।

মুক্তি-প্রতীক্ষায়

বোম্বে টকীজের নূতন চিত্র "জোয়ার-ভাটা" শীঘ্রই মুক্তিলাভ করিবে। এই ছবিতে অভিনয় করিয়াছে—মৃদুলা, শামিম, আগা জান ও দীলিপ কুমার। পরিচালক—অমিয় চক্রবর্ত্তী। ইউরেকা পিকচার্সের "দোটানা" শীঘ্রই মুক্তিলাভ করিবে। ছবি খানির বিভিন্ন চরিত্রে শৈলেন চৌধুরী, জহর গাঙ্গুলী ও লতিকা মল্লিক আত্মপ্রকাশ করিবেন।

দীপালীর স্বত্বাধিকারী শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত, ১২৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, দীপালী প্রেসে মুদ্রিত

প্রধান সম্পাদক—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় :: সহঃ সম্পাদক—শ্রীধীরেন্দ্রমোহন মজুমদার বি. এল.

১৬শ বর্ষ VOL. XVI. } ৬ই পৌষ ১৩৫১ :: December 21, 1944 { ৫১শ সংখ্যা No. 51

দীপালীর চাঁদার হার

প্রতি সংখ্যা	...	চার আনা
ডাকে	...	সাড়ে চার আনা
বার্ষিক চাঁদা	...	১২।০
ষান্মাষিক „	...	৬।০
ত্রৈমাসিক „	...	৩।০

লেখকদের প্রতি

১। গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা বা যে-কোনো রস-রচনা দীপালীতে প্রকাশার্থ লেখকরা পাঠাইতে পারেন।

২। অমনোনীত রচনা ছিঁড়িয়া ফেলা হয়। অবশ্য যদি সঙ্গে উপযুক্ত ডাক টিকিট থাকে তবেই তাঁহাকে রচনা ফেরৎ দেওয়া হয়।

৩। প্রত্যেক রচনার সহিত লেখকের নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট ভাবে লিখিতে হইবে।

এজেন্সীর নিয়মাবলী ও বিজ্ঞাপনের হার সম্বন্ধীয় অনুসন্ধানের জন্য পত্রালাপ করুন :

ম্যানেজার, দীপালী
১২৩/১ আপার সার্কুলার রোড
কলিকাতা
ফোন : বড়বাজার ৩০৫৩
টেলিগ্রাম : DIPALI

আলোচনী

কলিকাতার জিনিষপত্রের দর গত বৎসরকাল মধ্যে কি ভাবে চড়িয়াছে তাহা দেখিয়া জনৈক ইংরেজ ভদ্রলোক বিস্মিত হইয়াছেন। এই ভদ্রলোক গত বৎসরাধিক কাল এদেশে ছিলেন না, সম্প্রতি বিলাত হইতে ফিরিয়াছেন। "Second City"র এই অবস্থায় বিচলিত হইয়া ইনি সংবাদপত্রের দ্বারস্থ হইতে বাধ্য হইয়াছেন। তাঁহার পত্রখানি গত শনিবারের "Statesman" পত্রিকায় বাহির হইয়াছে। সার্জ্জের কাপড় জামা, ট্যাক্সি ভাড়া ইত্যাদির দামের বহর দেখিয়া পত্রলেখক একেবারে ঘাবড়াইয়া গিয়াছেন। কলিকাতার সাধারণ লোকের পক্ষে ট্যাক্সি ভাড়া দেওয়া বা সার্জ্জের জামা কাপড় কিনিবার শক্তি বা সামর্থ্য নাই। দেশী ও বিলাতী জীবনযাত্রার বিভিন্ন মানদণ্ড থাকিবেই। সেই দিক দিয়া বলিবার কিছু নাই। আমাদের বক্তব্য হইতেছে এই, কোনপ্রকারে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে যে অবস্থাগুলি বর্ত্তমান থাকা দরকার তাহাও যেন ক্রমশঃ দুর্লভ হইয়া উঠিতেছে। অবস্থা যখন ধীরে ধীরে খারাপ হইয়া ওঠে তখন মানুষ কিছুদিন চীৎকার করে, তাহার পর আঘাতের পর আঘাতে তাহার বোধ-শক্তিও যেন অসাড় হইয়া যায়। বাংলা দেশে আমাদের অবস্থা হইয়াছে অনেকটা সেই রকম। প্রথম আঘাত যখন আসিয়াছিল তখন আমরা চীৎকারে আসর জমাইয়া তুলিয়াছিলাম। এখন আর জীবন-যাত্রার দুর্ব্বহ জোয়ালটা বহিয়া লইয়া যাইতে আমাদের আপত্তি নাই। সব জিনিষেরই একটা সীমা আছে। মনে হয় বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে সর্ব্বক্ষেত্রে আমরা bursting point-এ আসিয়া পৌঁছিয়াছি। হয়তো আজও বিস্ফোরণ হয় নাই ঠিক সেই কারণে যে কারণে ১৯৪৩ সালের মানুষ নিঃশব্দে মরাটাকেই বাহাদুরী মনে করিয়া বিদায় লইয়াছিল।

মিঃ সাপ্রু এদেশের রাষ্ট্রনৈতিক জটিলতা দূর করিবার জন্য কিছুদিন হইতে চেষ্টা করিতেছেন। স্যার তেজবাহাদুর রাষ্ট্রনীতির theory ও practice উভয় বিষয়েই বিশেষজ্ঞ। কাজেই ইহাতে কাহারও বলিবার কিছু থাকিতে পারে না। দীর্ঘদিন ধরিয়া দেখিতেছি রাষ্ট্রনৈতিক আলাপ আলোচনায় যখনই একটা অচলভাব উপস্থিত হয় তখনই স্যার তেজবাহাদুর অগ্রসর হন। কংগ্রেস-গবর্ণমেণ্ট, গান্ধী-জিন্না বা যে কোন আলাপ আলোচনার পরিশিষ্টরূপে স্যার তেজ বাহাদুরকে অগ্রসর হইতে দেখা গিয়াছে। এক সময়ে সাপ্রু জয়াকার ছিলেন peace makers, শান্তিদূত নামের খ্যাতিও তাঁহার

জুটিয়াছিল। স্যার তেজবাহাদুর একক আজও সেই অভিনয় করিয়া যাইতেছেন। ফল বা পরিণতি যাহাই হউক না কেন ইহাতে তিনি কোন দিনই চিন্তিত হন নাই। একটা অপরিসীম অধ্যবসায় লইয়া ইনি দীর্ঘদিন চলিতেছেন—একটি tragic figure—হয়তো তাঁহার প্রচেষ্টার ফসল একদিন ফলিবে এই আশা লইয়া।

* * *

সম্প্রতি মিঃ সাপ্রু তাঁহার conciliation কমিটির তরফ হইতে জিন্না সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। উদ্দেশ্য সাম্প্রদায়িক সমস্যার বিভিন্ন দিক অনুসন্ধান ও আলোচনা। জিন্না সাহেব তাহার জবাব দিয়াছেন এবং ইহা লীগ নেতার উপযুক্তই হইয়াছে। মোট কথা মিঃ জিন্না নন-পার্টি কনফারেন্স বা তাহার ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি অথবা এই ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি কর্ত্তৃক মনোনীত conciliation কমিটিকে গ্রাহ্য করেন না এবং এই কারণেই মিঃ সাপ্রুর সাক্ষাৎ প্রার্থনাও মঞ্জুর করিতে তিনি অপারগ। জিন্না সাহেবের এই সাফ জবাব মিঃ সাপ্রুকে বিস্মিত করে নাই ইহা ধরিয়া লওয়া যায়। দীর্ঘদিন রাজনীতি করিয়া সাম্প্রদায়িক মতিগতি সম্বন্ধে বিস্মিত হওয়ার দিন তাঁহার চলিয়া গিয়াছে। সাপ্রু কনসিলিয়েসন কমিটির প্রতিক্রিয়া কোন্ পথে অগ্রসর হয় ইহাই আমরা বর্ত্তমানে লক্ষ্য করিতেছি। এই সম্পর্কে আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, ভাইসরয় সম্প্রতি তাহার Associated chamber of Commerceএর বক্তৃতায় এই কমিটির প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করিয়া প্রশংসাসূচক মন্তব্য করিয়াছেন। অবশ্য তিনি কাহারও উল্লেখ না করিয়া সাধারণভাবেই মন্তব্য করিয়াছিলেন। তথাপি ভাইসরয় যে সাপ্রু কমিটিকেই উদ্দেশ করিয়াছিলেন ইহা অভিজ্ঞ ব্যক্তির দৃষ্টি এড়াইবে না। মিঃ জিন্নার এই tactcic সাম্প্রদায়িকতার পরিপোষক ভারত সরকারের রাষ্ট্রনীতিক দপ্তরেও প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিবে ইহা অনুমান করা যাইতে পারে। লীগদল বর্ত্তমান রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে একটা উদ্দেশ্যমূলক পন্থা গ্রহণ করিয়া সুর উঁচু পর্দ্দায় বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। ইহাদের দাবী দাওয়ার চেহারা যুগোচিত নয় শুধু ইহা বলিলেই সব বলা হইল না। পৃথিবীর চিন্তাধারা এই মহাপ্লাবনের অন্তে নূতনতর রূপ লইয়া জাগিয়া উঠিতেছে। ভারতের বিভিন্ন রাষ্ট্রনীতিক দলকে যুগোপযোগী মনোবৃত্তি লইয়া অগ্রসর হইতে হইবে। সেই দিক হইতে বিবেচনা করিলে ডিক্টেটর চালিত লীগদল আজও যেন দেশের মাটি ও মানুষের স্পর্শ এড়াইয়া পাকিস্থানী বেহেস্তের শুচিতা রক্ষা করিয়া চলিতেছেন।

* * *

সে দিন কলিকাতার কোন একটি বস্তির সম্মুখে দাঁড়াইয়া কয়েকজন তরুণ কোরাসে গান জুড়িয়া দিয়াছেন দেখিলাম। আসে পাশে বস্তীর লোকের ভীড়ও জমিয়া গিয়াছে। গায়ক দলকে বয়সে, পোষাকের পারিপাট্যে ও চুলের কায়দায় অতি-তরুণ বলিয়াই মনে হইল। ব্যাপার দেখিয়া কৌতূহল হওয়ায় অগ্রসর হইলাম। ভাবিলাম হয়তো শ্রমিক বা সাম্যবাদী প্রচার কার্য্য ইহারা করিতেছেন। অস্বাভাবিক কিছু নয়। বর্ত্তমানে এই ধরণের ব্যাপার তো পথে ঘাটে নিত্যই দেখা যায়। জাপানী বিতাড়ণের জন্য বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট কবিতা-যুদ্ধ চালাইতেছেন সে কথাও একবার মনে হইল। কিন্তু বিস্মিত হইবার বাকী ছিল। ভীড় ঠেলিয়া অগ্রসর হইয়া দেখিলাম এই বালখিল্য প্রচারকদল খৃষ্টের মাহাত্ম্য প্রচার করিতেছেন। অনেক দিন পরে ইহাদিগকে কলিকাতার পথে দেখা গেল। কিন্তু প্রচারকদের বেশ ও চেহারা এবং বিষয় বস্তুর এতখানি গরমিল দেখিয়া উচ্ছ্বসিত হাসির আবেগ রোধ করা সত্যই সে দিন কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল। পথের মাঝে এই ধরণের বেয়াদবী চলিবে না মনে করিয়াই কোন প্রকারে সামলাইয়া লইয়াছিলাম। কলিকাতার বাইবেল সোসাইটির কর্ত্তৃপক্ষের রসবোধ আছে সন্দেহ নাই। স্কুল পলাতক এই বালখিল্যদলকে যাঁহারা ধর্ম্মপ্রচারক বানাইয়া কলিকাতার পথে ছাড়িয়া দিতে পারেন তাঁহারা নিশ্চয় রসিক ব্যক্তি।

* * * *

নাৎসি কবলমুক্ত ইউরোপীয় দেশগুলির বিভিন্ন সমস্যায় মিত্রপক্ষ বেশ বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন। সামরিক ও কূটনৈতিক সমস্যার কথা বলিতেছি না। এই সব দেশের সামাজিক সমস্যাও অদ্ভুত রকমের। বর্ত্তমানে প্যারিসের ডাইভোর্স কোর্টে প্রায় ৫০,০০০ হাজার নরনারী ডাইভোর্সের জন্য দরখাস্ত করিয়াছেন। দেশের স্বাধীনতা হইতে না হইতেই ব্যক্তিগত স্বাধীনতা লাভের এই উৎকট আগ্রহ প্যারিসের কর্ত্তৃপক্ষকে বিচলিত করিয়া তুলিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গেল। প্যারিসের রঙ্গালয় গুলিতেও রূপ ও আলোকের জৌলুষ ফিরিয়া আসিতেছে। প্যারিস রঙ্গমঞ্চের শো-গার্লস যাহারা বিভিন্ন "Revues"-এ অবতীর্ণ হইতেছেন তাহাদের তরফ হইতেও অভিযোগ এই যে, যথেষ্ট পরিমাণ দেহসজ্জা তাহাদের জুটিতেছে না। ধর্ম্মঘট করিবেন বলিয়াও ইহারা শাসাইয়াছেন। অতিরিক্ত দেহসজ্জার এই দাবী প্যারিস গার্লদের প্রবল শালীনতা বোধ প্রমাণ করিতেছে ইহা ভাবিলে ভুল করা হইবে। দর্শকেরা আরামে ওভার কোট মুড়ি দিয়া অভিনয় উপভোগ করিবেন আর এই সব Venus de Milos হিমশীতল ষ্টেজের উপর অর্দ্ধ নগ্ন অবস্থায় অভিনয় করিয়া যাইবেন ইহা আর চলিবে না।

প্রত্যাখ্যান

(উপন্যাস)

শ্রীসুধাংশু কুমার হালদার, আই, সি, এস্

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(১৩)

বিয়ের অনুষ্ঠান চুকে গেলে হরিমোহন ধরা গলায় অসীমকে জিগেস করলেন, "বাবাজী, এখন তোমার প্ল্যান কি ?" স্বভাবতঃই তিনি চেঁচামেচি ভালবাসেন, এ কয়দিনে তাঁর অনাবশ্যক ফাই-ফর্মাসেরও যেমন বিরাম ছিল না, তাঁর চীৎকারেরও তেমনি সীমা ছিল না। তাই তারই অনিবার্য্য পরিণামে তাঁর গলা ভেঙেছে।

অসীম বলল, "ইচ্ছে আছে মল্লিকাকে নিয়ে সবপ্রথম আমাদের গ্রামে যাই। অনেক স্মৃতি রয়েছে জড়ানো—"

কল্পনাশক্তিবিহীন হরিমোহন ঔদাসীন্যের সঙ্গে বললেন, "তা তো রয়েইছে, তা তো রয়েইছে, তবে কিনা শুনেছি সেটা একটা অজ পাড়াগাঁ আর তোমার ঘরবাড়ীও তো কিছু নেই সেখানে। থাকবে কোথায় ?"

কণ্ঠের সুরটা অসীমের কানে বাজল। ইনি মেয়ের বিয়ে দিয়ে ইতিমধ্যেই ধরে নিয়েছেন বুঝি যে তাঁর নায়েব গোমস্তাদের মতো তাঁর জামাইটিও তাঁর হুকুমের চাকর, সর্বদা 'হুজুর হুজুর' ক'রে মন জুগিয়ে চলবে? অসীম সংক্ষেপে জবাব দিল, "থাকবার জায়গার অভাব হবে না।"

"আমার তো আর বাপু এখানে মন টেঁকছে না"—হরিমোহন বললেন, "তোমার শাশুড়ীর গোছগাছ শেষ হলেই আমরা কলকাতায় চলে যাবো। আমার কি ইচ্ছে জান অসীম ?"

"কি বলুন।"

"আমার ছেলে নেই, এখন তুমিই আমার ছেলে হলে। পাড়াগাঁয়ে যদি তোমার আকর্ষণ থাকে তাহ'লে এই বাড়ীতেই থাকো না!"

ঘর জামাই ক'রে নেবার মৎলব, অসীম ভাবল মনে মনে। মুখে বলল, "না, সে হয় না।"

"বললুম একটা দানপত্র রেজেষ্ট্রী করে দিই, তা তুমি রাজি হ'লে না। বিয়েতে যৌতুকও কিছু নিলে না। তোমাদের আজকালকার ছেলেদের এসব কি মতিগতি হচ্ছে বল দিকিন! আমাদের কালে শ্বশুর মশায় নিজে থেকে যা দিতেন তা তো নিতুমই, তাছাড়া জোর ক'রে আদায় ক'রে নিতুম যত নিতে পারি।"

অসীমের মনের মধ্যে যে মেঘটুকু উঠেছিল তা কেটে গেল। প্রত্যুত্তরে সে হাসল।

"বিষণ, বিষণ"—ধরা গলায় আওয়াজ বেরুল না, বিষণকে একটু ডাক দাও তো বাবা, কতক্ষণ যে তামাক খাই নি তা কি বেটার খেয়াল আছে!"

অসীম বিষণ সিংকে ডেকে দিয়ে চলে গেল।

হয়েছে কি, ইতিমধ্যেই অসীম তার দত্তমাসীমাকে এক টেলিগ্রাম ক'রে দিয়েছে,—'সস্ত্রীক আসছি, মত বদলেছে, আমার বাড়ীঘর আমায় ফিরিয়ে দিতে হবে।' মল্লিকাকে একথা বলা হয় নি, মনে মনে ঠিক করা আছে যথাকালে তাঁকে এই খবরটা দিয়ে চমক লাগিয়ে দিতে হবে।

অসীমের পৈতৃক গ্রামে যাবার প্রস্তাব শুনে মল্লিকা বললেন, "চল, দেখে আসি মহাপুরুষের জন্মস্থান। দেওয়ালের গায়ে লিখে আসব নিজের নামটি খুদে, মল্লিকা বসু, না, না, 'মল্লিকা সরকার, মহাপুরুষের অন্যতম তাঁবেদার'।"

"এবং তারই নিচে আমি লিখে রাখব নিজের নাম, 'উক্ত তাঁবেদারের অন্যতম মহাপুরুষ।"...

যাবার সময় হরিমোহন আবার হাঁকডাক লাগিয়ে দিলেন তাঁর ধরা গলায় যতটুকু সম্ভব,—সঙ্গে ক'জন চাকর যাচ্ছে, জলের কুঁজো নেয়া হয়েছে তো? আর মশারি,—মশারি নেওয়া হয় নি। যা ভেবেছি তাই! যেটি না দেখব, সেটিতে থাকবে এমনি গলদ, ইত্যাদি।...

দত্তবাড়ী পৌঁছে ওরা বিস্মিত হ'ল, ঘরে ঘরে ঝাড় লণ্ঠন দুলছে, বারবাড়ীতে শানাই বাজছে, বহু লোকের আনাগোনা।

অসীম ও মল্লিকা এসে দত্তগিন্নীকে প্রণাম করল। খুব চওড়া লালপেড়ে গরদ পরেছেন তিনি, কপালের সিঁথিতে তেমনি মোটা সিঁদুর। টকটকে গৌরবর্ণ দেহ, মুখে স্নেহ আর করুণা যেন উপচে পড়ছে। অসীম মল্লিকাকে সগর্বে বলল, "মল্লিকা, এই আমার মাসীমা। দেখ দিকি, এমন দেবীমূর্ত্তি আর তুমি দেখেছ কি কোনোদিন।" তারপর অত্যন্ত নিরীহের মতন দত্তগিন্নীকে জিগেস করল, "এত ধুমধাম কিসের মাসীমা, পটুর বিয়ে নাকি ?"

দত্তগিন্নী অসীমের পিঠে সস্নেহ মৃদু চপেটাঘাত ক'রে বললেন, "দেখছ মা, বাঁদর ছেলের বুদ্ধি দেখেছ? ছেলে-বউ ঘরে আসবে, কতকাল ধরে এই দিনটির পথ চেয়ে আছি, আর ও বলে কি না, পটুর বিয়ে নাকি!"

"তুমি আমাকে আর বাঁদর ফাঁদর ব'ল না মাসীমা, বিশেষতঃ যে-সে লোকের সামনে!"—কপট গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে অসীম বলল।

"ওঃ, উনি এখন বড়লোকের জামাই হয়েছেন, ওঁকে আর বাঁদর বলা চলবে না!" মাসীমা বললেন,—"জান মা, একদিন আমি আমসত্ব রোদে দিয়েছিলুম, আর ঐ বাঁদর কোথা থেকে এসে তার খানকটা মুখে পুরে দিলে"

"আর সেদিন তুমি আমার কান ম'লে দিয়েছিলে মাসীমা, মনে আছে আমার। কিন্তু দাও দিকি আজ আমার কান ম'লে ?"

শে ষ ঘ নি য়ে এ ল

নামগুলি মনে আছে ?... কিছুদিন আগেও নামগুলি খবরের শিরোনামা ছিল। ডিমাপুরের কাছে রেলপথে শত্রুর আক্রমণের আশঙ্কা ছিল। কোহিমার ভারতীয়বাহিনী সংখ্যায় অনেক বেশি শত্রুসেনা কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছিল। জাপানী সৈন্যেরা ইম্ফলের সমভূমিতে প্রবেশ করেছিল এবং বিষেণপুরের উত্তর ও দক্ষিণে পৌঁছেছিল। উখরুল নিরাপদ ছিল না...

এ সব আজ পুরোনো কথা। জাপানীরা পরাস্ত হয়েছে এবং পিছু হটছে। আজ ডিমাপুরের ১৫০ মাইলের মধ্যে কোথাও তাদের অস্তিত্ব নেই। নাগারা কোহিমায় ফিরে এসেছে। গুলি, গোলা ও বোমায় পর্যুদস্ত এই পার্বত্য সহরটির পুনর্গঠনের পরিকল্পনা এগিয়ে চলছে। জাপানীরা নিজেরাই যাকে বলেছিল,—"অপরাজেয় বাহিনী" ...আজ সেই সব জাপসৈন্যের অস্থি বিষেণপুর পাহাড়গুলিতে ছড়িয়ে আছে। এইভাবে তাদের শেষ ঘনিয়ে আসছে। আপনি যখন এটা পড়বেন...তখন যে সব সাহসী বীরপুরুষ এই জয়লাভ সম্ভব করেছে তাদের কথা স্মরণ করবেন

আমাদের সৈন্যেরা প্রমাণ করেছে —
জাপানীরা উপদেবতাও নয়, অপরাজেয় মহাপুরুষও নয়।

ন্যাশনাল ওয়ার ফ্রন্ট কর্তৃক প্রচারিত

AAA 1306
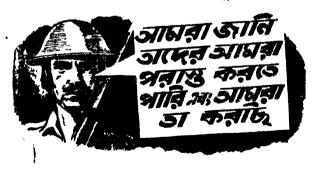
"কেমন ক'রে ব'লব বাবা, তোকে যে আর নাগাল পাই না। তুই যে আমার বাবা হয়েছিস আজ!"—তারপর একটু থেমে দত্তগিন্নী বললেন, "আজ থেকে থেকে আমার মনটা হাহাকার ক'রে উঠছে মা, সেই অভাগীর জন্যে! ছেলে বউ ঘরে এল, সে দেখতে পেলে না···জানি, আজ শুভদিনে চোখের জল ফেলতে নেই, কিন্তু আমি তো আর যে থাকতে পারছি না।···চল মা, তোমাকে তোমার ঘর দেখিয়ে দিই।"

এ বাড়ীর সব থেকে ভাল ঘরটায় সেই সাবেক কালের প্রকাণ্ড খাটে ধব্‌ধবে বিছানা করা হয়েছে। মোটা মোটা ফুলের মালা ঝুলছে খাটের ছত্রীতে।

গ্রামের লোক সবাই ভিড় ক'রে বউ দেখতে এল। মল্লিকার ব্যবহার পল্লীবাসিনীদের কাছে যথেষ্ট সলজ্জ ব'লে মনে হল না, মাথার ঘোমটা লম্বা তো নাই, তার ওপর পায়ে রয়েছে ক্ষুরওয়ালা জুতো। নিন্দের গন্ধ পেয়েই অসীমের দূর সম্পর্কের খুড়ো ভবানীচরণ পাড়াময় রাষ্ট্র ক'রে দিলেন, বউ নাকি একেবারে মেম সাহেব, সিগারেট খেতে খেতে দত্তগিন্নীর সঙ্গে শেক্‌হ্যাণ্ড করেছে, পেলিটির বাড়ীর চপ-কাটলেট ছাড়া আর কিছু খাবে না বলেছে। তাঁর নিজের ছেলে তারিণীচরণ গাঁজাগুলি খেয়ে আর থিয়েটারে সখী সেজে দিন কাটাচ্ছিল। তার কাছে অসীমের ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের বর্ণনা করে ভবানী বললেন, ত্যাখ্‌ দিকি ঐ অসীমকে! কাঠের কারবারে কেমন ফেঁপে উঠেছে! রাজকন্যে আর রাজত্ব নিয়ে ঘরে ফিরে এল! তুই পারিস! হতভাগা, তুই কেবল গুলি খাচ্ছিস, আর গাঁজা খাচ্ছিস!"

তারিণী রুখে বলল, "খবরদার বাবা, গাঁজাকে 'গ্যাঁজা' ব'ল না, ভাল হবে না বলে দিচ্ছি!"

মল্লিকাকে সঙ্গে ক'রে সারাগ্রাম ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাল অসীম। দেখাল তাদের সাবেক বাগান, বাড়ী, পুকুর। সব ঠিক তেম্‌নি আছে। জানে মল্লিকা বড়লোকের মেয়ে, এরকম বাড়ী বাগান পুকুর তাঁর অনেক দেখা আছে, তবু দেখাবার লোভ তো ছাড়া যায় না।

একটা করম্‌চা গাছ সবুজাভ লাল করম্‌চার ভারে নুয়ে পড়েছিল। সেটা দেখে মল্লিকা বলে উঠলেন, "দেখ, দেখ, কি সুন্দর!"

"কোন্‌টা তোমার অমন ক'রে মন ভোলাল মল্লিকা?" "কোন্‌টা আবার! এই সুন্দর ফলে ভরা করম্‌চা গাছটা। গল্‌স্‌ওয়ার্দি ফলে ভরা পীচ্‌ গাছ দেখে বলেছিলেন bejewelled trees,—তিনি এই করম্‌চাগাছটি দেখলে কি বলতেন বল তো!"

"সেটা বলা ভয়ঙ্কর শক্ত। তিনি বেঁচে থাকলেও বা এই গাছটাকে পার্শেল ক'রে তাঁর কাছে পাঠানো যেত।"

"তুমি অত্যন্ত বেরসিক অসীম। শোনো আমি বলছি।"—এই বলে একগুচ্ছ করম্‌চা তাঁর চম্পকাঙ্গুলিতে ধরে হাসতে হাসতে বললেন, "এ তো আর বিলিতি ফল নয় যে এর ইংরিজি বর্ণনা চলবে, খাঁটি বাংলার এ হ'ল রক্তমুক্তার গাছ। দেখছ না, ফলগুলি যেন এক একটি মুক্তো, লাল রঙের মুক্তো।"

"জান মল্লিকা, আমার প্ল্যানটা তবে বলেই ফেলি তোমায়। এ-বাড়ী বাগান, পুকুর আবার সমস্ত কিনে নেব ঠিক করেছি। বাড়ীটা ভেঙে তৈরি করব ছোট্ট একখানি কুটীর, দেখতে হবে ঠিক ছবিখানির মতো। নাম দেব, 'বনমল্লিকা'। সুরকি-ঢালা লাল রাস্তার পাড় দিয়ে মোড়া থাকবে সবুজ ঘাসের লন, ফুলের বাগান, আর তোমার রক্তমুক্তার গাছ যত চাও। ঘাটবাঁধানো পুকুর, ঘাটের দু'ধারে মল্লিকাফুলের ঝাড়। পুকুরে চরবে তোমার পোষা রাজহাঁস। এই যে দেখছ তুলসীতলা, এখানে গড়ব একটি ছোট্ট সাদা ধব্‌ধবে মন্দির। প্রতি সন্ধ্যায় তুমি এখানে নিজের হাতে জ্বালিয়ে দেবে প্রদীপ।"

মল্লিকা বললেন, "আর যেদিন আমার কম্প দিয়ে জ্বর আসবে, ম্যালেরিয়া জ্বর,—সেদিন?"

"না মল্লিকা, তুমি অমন ক'রে ঠাট্টা ক'র না। শোনো। আমাদের সেই ফুলবাগানে ঘেরা বাড়ীটি দেখতে পাওয়া যাবে গ্রামে প্রবেশ করবার মোড় থেকে। আমি যখন কাজকর্ম সেরে বাড়ী আসব, অনেক দূর থেকে চোখে পড়বে আমাদের বাড়ী। ভাবতে ভাবতে আসব, এতক্ষণ কি করছ তুমি। সারা হয়ে গেছে তোমার দিনের কাজ। স্নান ক'রে পরেছ তোমার সেই কলাপাতার রঙের সাড়িটি, টুক্‌টুকে লাল ভেল্ভেটের পাড় যার। সাজি হাতে নিয়ে ফুল তুলছ বাগানে, আর গান গাইছ গুন্‌ গুন্‌ ক'রে। ভাবতে ভাবতে আসব, সে কি গান। দূর থেকে কানে আসবে শিশুর কলকণ্ঠ, আমাদের পাঁচ বছরের শিশু—"

"আরে দাঁড়াও, দাঁড়াও"—বাধা দিয়ে মল্লিকা বললেন, "আল্‌নাস্কার মশাই, তুমি যে তোমার কল্পনার ঘোড়াকে উদ্দামভাবে একেবারে চোখ বেঁধে ছেড়ে দিয়েছ! মায় পাঁচ বছরের শিশু পর্য্যন্ত! কিছুই যে আর বাদ রইল না!"

"কেন? এসব কি সত্যি হ'তে পারবে না কোনোদিন?"

"পাগলামি কর না। এই সুদূর পাড়াগাঁয়ে এই নানা ঝঞ্ঝাটের মধ্যে বাঁধা পড়তে চাও! গ্রাম্য দলাদলি, মাম্‌লা মকরদামা, পঞ্চায়েৎ নির্বাচন, দারোগা-সেবা, জ্বরঘ্ন বটিকা, প্লীহাকালান্তক রস—"

"নাঃ, তোমাকে নিয়ে আর পারা গেল না। আমি যে আজ ক'দিন ধরে কত কি সব গ'ড়ে তুলছিলুম, আর তুমি তামাসার এক ফুঁয়ে সব উড়িয়ে দিলে'"—অসীমের দীর্ঘশ্বাস পড়ল।

"তা তো গড়ে তুলছিলে, কিন্তু আমি তোমার কতকগুলি টাকা বাঁচিয়ে দিলুম বল তো!"

"কিসের টাকা?"

"এই ধরো কুইনীনের খরচা, মামলা-মকরদামার চরচা, ভোটাভুটির খরচা, দারোগা-সেলামির টাকা।"

নীরব হ'য়ে গেল অসীম। তার মন ভেসে গেল পলাশবনীর সেই জ্যোৎস্না-উদ্ভাসিত রাতে,···একদিন তুমি বলেছিলে আমার এই নির্লিপ্ত চোখকে মুগ্ধ ক'রে দেব ব'লেই তো তোমার সুদূর বনানীর তপস্যা।··· আজ আমি ভুল করেছি, নির্লিপ্ত হ'তে পারলুম কই। আশা করেছি, অমনি এল আঘাত! এ আঘাত আমার ভালই হল।—আর একটি ক্ষুদ্র দীর্ঘশ্বাস পড়ল অসীমের।

"কি গো, চুপচাপ কেন? ভাবছ কি? রাগ হল বুঝি?"—মল্লিকা জিগেস করলেন।

অসীম বলল, "ভাবছিলুম। একদিন তোমার নাম দিয়েছিলুম বনমল্লিকা। মনে আছে তোমার? আজ সে কথা একেবারে ভুলে গিয়েছিলুম।"

"কি ঠিক করলে?"

"ওগো মল্লিকা, আমার বনমল্লিকা! ঘরে এনে ফুলের টবে রোপণ করব না তোমায়।"…

অসীম দত্তগিন্নীকে এসে বলল, "হল না মাসীমা, ভেস্তে গেল সমস্ত প্ল্যান।"

দত্তগিন্নী জিগেস করলেন, "সে কি? কেন রে! কালই যে কর্তা সদরে যাবার সমস্ত ঠিকঠাক করেছেন, তোর সম্পত্তি তোকে ফিরিয়ে দেবার দলিল রেজেষ্ট্রী করতে। এর মধ্যে তোর হ'ল কি?"

মল্লিকা বললেন, "ওঁর কোনো দোষ নেই মাসীমা। দোষ আমারি আমিই বলেছি, পাড়াগাঁ আমার পোষাবে না।"

"কেন মা, পাড়াগাঁয়ের তো কোনো অপরাধ নেই, অপরাধ তাদেরই পাড়াগাঁকে যারা বাসোপযোগী ক'রে তুলতে পারল না।"

মল্লিকা চুপ করে রইলেন। তিনি জানেন, কিছু বলতে গেলে এখনি উঠবে প্রবল তর্ক। এ তর্ক বহুদিনের পুরোনো, এবং সহজে মীমাংসা হবারও নয়; পল্লীগ্রামের লোক অর্দ্ধশিক্ষিত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, রোগজীর্ণ,-এর জন্যে দায়ী কে? দায়ী তো তারাই যারা নিশ্চিন্ত আরামে সহরে পালিয়ে বসে আছে। এইটে হ'ল এক পক্ষের কথা। আর এক পক্ষ বলবে, এদের মাঝখানে এসে চিরদিন এদের বিদ্রূপ আর কুৎসা সহ্য ক'রে যাবার ধৈর্য কার? রোগ ভোগ দূর করা তো দু'এক জন লোকের কর্ম নয়। লাভের মধ্যে স্বাস্থ্য বিসর্জন দিয়ে অর্দ্ধমৃত হ'য়ে থাকায় এদের কি উপকারটা করা হবে? পল্লী উন্নয়ন দু' দশজন লোকের কর্ম নয়। সে সব চেষ্টা অনেক হয়ে গেছে সমগ্র জাতির সমবেত শক্তিকে প্রয়োগ করতে হবে, শাসন যন্ত্রের সমর্থন থাকা চাই সঙ্গে, তবেই এ কাজ সম্ভব হবে।

দত্তগিন্নী তাঁর স্বামীকে সদরে যেতে নিরস্ত করলেন। তাঁর মনটা অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে গেল।

খবরটা শুনে ভবানী চরণ নাকের ডগায় চশমাটা নামিয়ে এনে প্রতিবেশী উমেশ চক্রবর্ত্তীকে বললেন, "বুঝেছ ভায়া, মেমসাহেব যে। ছোঁড়াটাকে একেবারে ভেড়া বানিয়েছে! পরিবারের কথাতেই ছোঁড়া পুতুল নাচ নাচছে। হ'ত আমাদের পরিবার, তো দেখিয়ে দিতুম একবার!"—পৌরুষ গর্বে তিনি হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন।

উমেশ হুঁকা'থেকে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, "সে আর বলতে! তবে এ এক রকম ভালই হ'ল। আমার ভিটেটা ওর একেবারে লাগোয়া যে; ওখানে বসবাস করলে প্রত্যহ কত গো-হাড় মুর্গীর হাড় ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলত, আমার জাতজন্ম আর কিছু থাকত না। তা থেকে নিষ্কৃতি তো পেলুম।"

ভুরু কুঁচকে ভবানীচরণ বললেন, "কি বললে, তোমার ভিটে! তোমার ভিটে আবার ওর লাগোয়া হ'ল কেমন করে?"

"কেন, ঐ যে মাদার গাছ আর ডোবা, ওটা আমার নয়? নিস্তারণ চক্রবর্ত্তীর কাছ থেকে ওয়ারিশ-সূত্রে আমি পাই নি! একথা তো সবাই জানে"

"আরে ওটা নিস্তারণ চক্কোত্তির হ'তে যাবে কেন? ওটা যে আমার বাপ পিতাম'র সম্পত্তি।"

"অবাক করলে তুমি ভবানীচরণ! ওটা তোমার বাপ-পিতাম'র সম্পত্তি!"—ব'লে উমেশ বিদ্রূপাত্মক স্বরে খ্যাক্ খ্যাক্ ক'রে হাসতে লাগলেন।

"বারো শো একাত্তর সালে আমার পিতামহ যখন দুর্গোৎসব করেন, তখন ওখানে ঢোলোক বেজেছিল, জানো তার প্রমাণ আছে?"

"আছে নাকি! আদালতে সে কথা ব'ল। তাহ'লেই ডিক্রী পেয়ে যাবে।"

"ডিক্রী পেয়ে যাবো মানে? ডিক্রী তো পেয়েই গেছি। গেল বছর পাঁচ ধারা ক'রে ও জমি আমারি নামে উঠে গেছে তার খবর রাখো?"

"কই, আমি তো আর কোনো নুটিশ পাইনি! পাঁচধারা করলে কি রকম?"

"তুমি নাক ডাকিয়ে ঘুম মারলে নুটিশ আর পাবে কি ক'রে? সে কি আমার দোষ?"

"ভাল হবে না ভবানী, ধর্মে সইবে না! এখনো চন্দ্রসূর্য্য উঠছে, ব্রাহ্মণকে ঠকিয়ে শূদ্দুর তুমি—"

"আরে রেখে দাও তোমার বামনাই! দেবো মোক্ষদার কথাটা ফাঁস ক'রে!"

তারপর এই দুই বৃদ্ধে মিলে প্রকাশ্য চণ্ডীমণ্ডপে যে বীভৎস কাণ্ডটি পাকিয়ে তুললেন, একমাত্র বাংলা দেশের পল্লীগ্রাম ছাড়া বোধ করি সমস্ত জগতে সে দৃশ্য বিরল। বয়ঃকনিষ্ঠরা এই দুই গ্রামের শীর্ষস্থানীয় বৃদ্ধের হাতাহাতি মারামারি সানন্দে উপভোগ করতে লাগল, এঁদের গালাগালি শোনবার জন্যে অন্তঃপুর হতে মেয়েরাও ঘোমটা দিয়ে আড়ালে এসে জুটলেন। অবিলম্বে উভয় পক্ষ থেকেই দেওয়ানী এবং ফৌজদারি মাম্‌লা রুজু হ'য়ে গেল। যাবার সময় মল্লিকা ও অসীমকে দত্তগিন্নী আশীর্ব্বাদ করলেন, "যেখানেই থাকো মাসীমার আশীর্ব্বাদ রইল তোমাদের ওপর, সুখী হও, দুজনে দুজনকে সুখী করো।" তারপর অসীমকে বললেন, "যাবার আগে তোদের গৃহদেবতাকে একবার প্রণাম ক'রে যাবিনে বাবা? ভট্টাচার্য্যি বাড়ী থেকে তোর খুড়ো ভবানীচরণ নিজের বাড়ীতেই বিগ্রহ এনে প্রতিষ্ঠা করেছে। শুনতে পাই, খুব পূজা অর্চনাও করে। আজকের দিনে আর মান-অভিমান রাখতে নেই বাবা, যা একবার খুড়োর বাড়ী ঘুরে আয়।"

"না মাসীমা, অমন কথা আমায় ব'ল না।"

"ঠাকুর প্রণাম করে আসছি, তাতে আবার আপত্তিটা কিসের ?"

মল্লিকাও বললেন, "যাও না, লক্ষীটি, অমন একগুঁয়েমি করতে আছে কি !"

অসীম রুখে দাঁড়িয়ে বলল, "তুমি জাননা মল্লিকা, আমার খুড়োটি কি ধাতের মানুষ !"—তারপর দত্তগিন্নীকে বলল, "তুমি যখন এত ক'রে বলছ তখন যাচ্ছি। কিন্তু যদি কিছু হয় তার জন্যে তুমি দায়ী থাকবে মাসীমা। খুড়ো যদি শাপমন্যি কিছু দেন, তাহলে তোমার ঠাকুরের বাবাও তাঁকে রক্ষা করতে পারবে না। আমি অনেক সয়েছি, আর সইব না।"

দত্তগিন্নী সন্ত্রস্ত হ'য়ে বললেন, "আমার ঘাট হয়েছে বাবা, তোমায় আর সেখানে যেয়ে মারামারি বাঁধাতে হবে না। তোমায় ঠাকুর প্রণামও করতে হবে না। যা করবার আমিই করব। বুক চিরে রক্ত দিয়ে তোর জন্যে ঠাকুরের কাছে মার্জ্জনা চেয়ে নেব।"

অসীম বলল, "তা চাইতে হয় চেও। কিন্তু আমার প্রণাম রইল তোমারি পায়ে।"···

যতক্ষণ ওদের দেখা গেল, দত্তগিন্নী একদৃষ্টে সজল চোখে চেয়ে রইলেন। মনে মনে প্রার্থনা করতে লাগলেন, ভগবান, নারায়ণ, ছেলেটাকে সুখী ক'রো। ও আমার দুরন্ত দুষ্টু ছেলে, কিন্তু ওর মধ্যে কোনো খলকপট নেই! এতটুকু বয়েস থেকে ওকে দেখছি! আমি ওকে যেমন ক'রে বুঝেছি, মল্লিকা কি ওকে তেমনি ক'রে বুঝবে? কে জানে! ও কোনোদিন কষ্ট পেয়েছে একথা শুনলে যে আমার বুক ফেটে যাবে!···আঁচল দিয়ে তিনি বারংবার চোখ মুছলেন, তারপর চুপ ক'রে যেয়ে শুয়ে পড়লেন। আজ আর কোনো কাজে তাঁর মন লাগছিল না, ক্ষুধা-তৃষ্ণাও চলে গিয়েছিল।

ষ্টেশনে এসে অসীম জিগেস করল, "কোথাকার টিকিট করব মল্লিকা? কলকাতায় যাবে তো? তোমার বাবা মা তো সেইখানেই।"

একটুও না ভেবে মল্লিকা উত্তর দিলেন, "না কলকাতায় নয়, যাবো আমরা পলাশবনী। তোমার সেই নীরস কাঠের গুঁড়ি আমার মনকে টান দিয়েছে।"

অসীম ভাবল, এই তো! নির্লিপ্ত চোখের জন্যে এই তো সুদূর বনানীর তপস্যা! আমি তো চাই নি, তুমি আপনা থেকেও কেন এসে ধরা দাও! এই জন্যই তো এত অপ্রত্যাশিত তোমার মাধুর্য্য। সব কিছু নৈরাশ্য সওয়া যায়, এইজন্যে। (ক্রমশঃ)

মহাত্মা গান্ধী ও অনশন

গত নভেম্বর মাসে ৭৫ বৎসর বয়সে মহাত্মা গান্ধী অনশন ব্রত গ্রহণের সংকল্প করিলে দেশব্যাপি এক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

গত বৎসর যখন মহাত্মাজী ২১ দিন ব্যাপী অনশন ব্রত গ্রহণ করেন তখন তাঁহার শরীর এরূপ অবস্থায় পরিণত হইয়াছিল যে ডাক্তারগণ পর্য্যন্ত তাঁহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়াছিলেন। এই জন্য এই বৎসরের অনশনের কথা শুনিয়া চতুর্দ্দিক হইতে অনশন ভঙ্গের জন্য তাঁহার কাছে আবেদন আসে।

ইতিপূর্ব্বে তিনি বহুবার বহুতর কারণে অনশনব্রত পালন করিয়াছিলেন। কতবার কোন্ কোন্ কারণে এবং কখন তিনি অনশন করিয়াছিলেন নিম্নে তাহার একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল :—

তাঁহার জীবনে তিনি ১৫ বার অনশন করিয়াছেন। এবং ইহার মধ্যে বহুতর কারণ থাকিলেও হরিজন উন্নয়ন ও হিন্দু-মুসলমান মৈত্রীই প্রধান।

অতীত দিনে যীশু-মহম্মদ-বুদ্ধ ও দেশের শান্তির জন্য নিজ শরীরের জন্য উপবাস করিতেন। মহাত্মা গান্ধীও মাঝে মাঝে অনশন করিয়া থাকেন ইহার তাঁহার সাধনার অন্যতম পন্থা—ইহাই তাঁহার রাষ্ট্রীয় যুদ্ধের প্রধানতম অস্ত্র। তবে মহাত্মাজীর অনশন ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অদ্বিতীয় হইয়া থাকিবে।

১৯১৩ সালে প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্বে যখন তিনি সাউথ আফ্রিকায় ছিলেন তখন তিনি তাঁহার জীবনে প্রথম অনশন ব্রত গ্রহণ করেন এবং তাহা এক সপ্তাহ ব্যাপী ছিল। তাহার পর বৎসরই আবার অনশন করেন এবং ১৪ দিন ছিল ইহার স্থিতিকাল।

আমেদাবাদ ধর্ম্মঘট

তাঁহার ভারতে প্রথম ধর্ম্মঘট ১৯১৭ সালের ১২ই মার্চ্চ আমেদাবাদে প্রথম অনুষ্ঠিত হয়। এবং তাহা মিলের কর্ম্মচারী-দের পক্ষে। আর এই ধর্ম্মঘটের জন্য তিনি তিনদিন ব্যাপী অনশন করেন। শেষে ধর্ম্মঘটের পরিসমাপ্তি ঘটে।

১৯১৯ সালে গান্ধীজীর পন্থানুগামী বলিয়া পরিচিত কয়েকজন দুর্ব্বৃত্ত কর্ত্তৃক নাদিয়াদে রেললাইন অপসারিত করার জন্য তিনি আবার তিনদিন অনশন করেন। কারণ ইহা তাঁহার সত্যাগ্রহের বিপরীত রীতি।

১৯২১ সালে যখন প্রিন্স অফ ওয়েলস বোম্বাইএ আগমন করেন তখন দাঙ্গাহাঙ্গামা ও রক্তস্রোত বহে। সেইজন্য তিনি নিদারুণ দুঃখে পাঁচ দিন অনশন করেন।

১৯২২ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী অসহযোগ আন্দোলনের সময় ইউ, পি'র একটী গণ্ডগ্রাম চৌরী-চারীতে কয়েকজন দুর্ব্বৃত্ত দুইজন পুলিশ ও একজন দারোগাকে পুড়াইয়া মারিয়া ফেলে। অহিংসনীতির পরিপন্থী এ মনোবৃত্তি নিবারণের জন্য তিনি আবার পাঁচ দিন অনশন করেন।
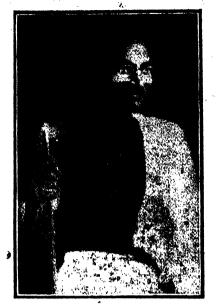
১৯২৪ সালে যখন হিন্দু-মুসলমান জাতিভেদ লইয়া বিরাট দলাদলির সৃষ্টি হয় তখন দিল্লীতে মৌলানা মহম্মদ আলির গৃহে তিনি ২১ দিন অনশন করেন। পরে যখন বিভিন্ন দলের নেতৃবর্গ জাতিভেদ নীতি অপসারণ করিবার আশ্বাস দেন তখন তিনি অনশন ত্যাগ করেন।

১৯২৫ সালের নভেম্বর মাসে তিনি পুনরায় ৭ দিন ব্যাপি অনশন করেন। কারণ তাঁহার সবরমতি আশ্রমের সদস্যগণের মধ্যে অন্যায় পরিলক্ষিত হয়।

জাতিভেদ নীতি

১৯৩২ সালে যখন মহাত্মাজী ওয়ার্দ্ধা জেলে

ছিলেন তখন জাতিভেদ নীতি প্রবর্ত্তিত হয়। তিনি হিন্দুদের পক্ষ সমর্থন করিয়া অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য অনশন ব্রত গ্রহণ করেন। এই সময়ে লবণযুক্ত ও লবণহীন জল ছাড়া আর কিছুই তিনি গ্রহণ করেন নাই।

পাঁচদিন পরে যখন পুণা প্যাক্ট স্বাক্ষরিত হয় তখন অনুন্নত শ্রেণীকে বিভিন্ন করিয়া দেওয়া হয়। এই সময় তিনি অনশনব্রত ত্যাগ করেন এবং অনুন্নত শ্রেণীর সামাজিক দুর্দ্দশা দূর করিতে হরিজন আন্দোলন সুরু করেন।

ইহার দুই মাস পরে যখন জেল কর্তৃপক্ষ আপ্পা সাহেব পটবর্দ্ধনকে নীচকাজ হইতে অপসারিত করিতে অস্বীকার করেন তখন তিনি পুনরায় দুইদিন অনশন করেন।

যখন গুরুভাইএর মন্দিরে হরিজনদের প্রবেশাধিকার বন্ধ করা হয় তখন মহাত্মাজী অনশন করিবেন বলিয়া স্থির করেন। শেষে গুরুভাই-এর জনসাধারণ এই রীতি পরিবর্ত্তন করেন।

এই বৎসর মে মাসে পুনরায় তিনি ২১ দিন অনশন করেন। ইহার উদ্দেশ্য ছিল হরিজন উন্নয়ন। গভর্ণমেণ্ট মহাত্মাজীকে মুক্ত করিলে তিনি পুণায় "পর্ণ কুটী"তে ২৯শে মে অনশনব্রত ভঙ্গ করেন।

হরিজনদের উপর লাঠি চালাইয়া উন্মত্ত জনসাধারণ এক বিক্ষোভের সৃষ্টি করায় গান্ধীজী সাতদিন অনশন করেন।

রাজকোটের অগ্নিপরীক্ষা

১৯৩৯ সালে ৩রা মার্চ্চ রাজকোটের অন্তর্গত কাটিয়াবাড়ের ক্ষুদ্র শাসনকর্ত্তার বিপক্ষে অন্যায় আচরণের ফলে গান্ধীজী ৫ দিন অনশন করেন।

১৯৪৩ সালে যখন মহাত্মাজীকে আগাখাঁ প্রাসাদে বন্দী রাখা হয় তখন তিনি পুনরায় অনশন করিতে আরম্ভ করেন এবং ইহা ২১ দিন স্থায়ী হয়। সমস্ত দলের নেতাদের লইয়া তাঁহার মুক্তির জন্য দিল্লীতে একটী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। গভর্ণমেণ্টের এক্জিকিউটিভ কাউন্সিলের তিনজন সদস্য—স্যার হোমি মোদী, মিঃ এম, এস, আনে ও মিঃ নলিনী রঞ্জন সরকার মহাত্মাজীর মুক্তি দাবী করিয়া তাঁহাদের পদত্যাগ করেন। এই অনশনের ত্রয়োদশ দিবসে গান্ধীজীর অবস্থা এমন শোচনীয় হয় যে ডাক্তারগণ তাঁহার জীবনের আশা ত্যাগ করেন। কিন্তু তাঁহার অলৌকিক মহিমায় তিনি ২১ দিন অনশন পূর্ণ করিয়া সবল ও সুস্থ দেহ লাভ করেন।

মনুষ্যত্বের উপর অবিচার

মহাত্মা গান্ধী কেন এতবার অনশন করিয়াছিলেন তাঁহার উত্তর এই যে তিনি আজীবন অসত্য, অন্যায় ও অত্যাচারের বিপক্ষে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতে চাহেন। তিনি বিশ্ববাসীকে ভালবাসেন বলিয়া অনশন করিতে তাঁহার কোন কষ্ট হয় না। তিনি বলেন : কোন অত্যাচারীর বিরুদ্ধে অনশন করিয়া সুফল ফলে না, কিন্তু যাহাদের মধ্যে ভালবাসা থাকে তাহাদের সংশোধন করিতে হইলে অনশন কার্য্যকরী। যেমন সন্তান তাহার পানাসক্ত পিতাকে সুপথে আনিতে দিনের পর দিন অনশন করিতে কষ্টবোধ করেনা। যাহারা আমাকে ভালবাসে তাহাদের সংশোধনের জন্যই আমি উপবাস করিয়াছি। আমি জেনারেল ডায়ারের জন্য অনশন করিব না, কারণ তিনি শুধু ভালই বাসেন না তাহা নয়, পরন্তু আমাকে তাঁহার শত্রু বলিয়া মনে করেন। তিনি আরও বলেন অনশন সত্যাগ্রহীর চরম অস্ত্র। তিনি অহিংসার মধ্য দিয়া দেশে শান্তি আনিতে চান—দেশকে স্বাধীন করিতে চান।

ছুটির ঘন্টা

পরিচালক শ্রীবিজনকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

বিজনদা'র চিঠি

আমার আদুরে ভাই-বোনেরা,

তোমরা অনেকে জানতে চেয়েছ যে, "মনে রেখো" নামে বিভাগটায় তোমাদের জন্যে যে সব বাণী আমি সংগ্রহ করে প্রতি বারে দিই তা' তোমরা সংগ্রহ করে পাঠালে আমি সেগুলো ছাপাবো কি না!...একটা কথা তোমাদের আমি বহুবার বলেছি যে, এ আসর তোমাদের, অতএব আসর সাজাবার জন্যে যা কিছু তোমরা পাঠাবে তাইই আমি নিতে বাধ্য, তবে সবাই সেটা পেলে খুসী হবে কি না তা' নির্ব্বাচনের ভার কেবল মাত্র আমার হাতে তোমরাই নিজে একদিন তুলে দিয়েছ; তাই আমি আমার কর্ত্তব্য করে যাই মাত্র। যা'তে করে তোমাদের সকলকে খুসী করা যায় এমন জিনিষ দিয়ে আমি সাজিয়ে তোমাদের আসরটাকে প্রতিবারে তোমাদেরই কাছে পৌঁছে দিই.....এবারে তোমাদের গত ৩২ নং প্রতিযোগিতার প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত রচনা দুটী ছাপলাম।...তোমরা আমার স্নেহ নিও।

তোমাদের—বিজনদা'

ছুটির ক'টা দিন

—অমর দাশগুপ্ত (৯৪৮)

প্রতিযোগিতার বিষয় হলো—পূজোর ছুটি কেমন করে কাটিয়েছি, কিন্তু আমাদের মতো মধ্যবিত্ত ঘরের বাঙালীর সেই একঘেয়ে জীবন-যাপন ছাড়া আর কী-ই বা করা সম্ভব। বিশেষ করে এই দিনে। দরিদ্র দেশের সন্তান আমরা—ছুটিতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াবার মতো সুযোগ-সামর্থ্য আমাদের কোথায়। কিন্তু তবুও এ ছুটিতে জীবনে যদিও সেটা আমার ছুটির আনন্দকে ভেঙে চুরে খান্‌খান্ করে দিয়েছে। এ ক'টা দিনকে জীবনে আমি কোনদিনও ভুলতে পারবো না। মনে যে-দাগ কেটে দিয়েছে, কোনোদিন কি সে দাগ মুছে যাবে!—জানি না প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত বিচারে আমার কথাগুলো কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়—তবুও না বলে থাকতে পারছি না।

পূজোর ছুটিতে মা দেশে যাবেন। আমাদের কাউকেই সংগে নেবার ইচ্ছে তাঁর নেই, শুধু বড়দা' আর মা। আজ দু'বছর হতে চললো ভিটে ছেড়ে এসেছি—সামরিক প্রয়োজনে আমাদের সারাটা গ্রাম কর্তৃপক্ষ নিয়ে গিয়েছেন। ভিটের মায়া

> ### মনে রেখো
>
> "সত্য পালনের দুঃখ আছে, তাকে আঘাতের মধ্যে দিয়ে বরঞ্চ একদিন পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু বঞ্চনা, প্রতারণার মিষ্ট পথ দিয়ে সে কোনদিন আনাগোনা করে না।" —শরৎচন্দ্র।

ছেড়ে প্রত্যেককে দেখতে হয়েছে নিজের পথ। আমাদের পরিবারও গৃহহীন দলের মধ্যে একটি। যাযাবরের মতো চলতে চলতে শেষটায় এসে থেমেছি এই মহানগরীর বুকে।—কিন্তু কালের রঙ বদলেছে কিছুটা—গ্রামে ফিরে যাবার আদেশ কর্তৃপক্ষ কিছুদিন হলো দিয়েছেন। দাদা-মা গিয়ে দেখে আসবেন গ্রামের অবস্থা কি, তারপর ভালো হলে আমাদেরও যাবার ব্যবস্থা হবে। কিন্তু অতদিন ধৈর্য্য ধরে বসে থাকার মতো স্থিরতা আমার নেই—তাই মা'র সংগ নেবার জন্যে মনটা ছটফট করতে এবং পথের ভিড়ের কথা ভেবে মা ঠিক করেছেন কিছুতেই আমাকে তাঁর সংগে নেবেন না। কি আর করি—মা'র মন তো জানি—সুতরাং উপায় না দেখে শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করলাম। খাওয়া বন্ধ হলো—চোখের জলে ভিজে উঠতে লাগলো বালিশ। শেষটায় জয় হলো আমারই। আমি, মা, দাদা চেপে বসলাম চিটাগাং একস্‌প্রেসে।—

ট্রেণে বসে ভাবতে লাগলাম কতো কি! নাটু, বুলু, মুকুল, বিশু, রতন এরা সব আমার খেলার সাথী—একে একে সব ভেসে উঠতে লাগলো চোখের সামনে। এদের সংগে হৈ-চৈ করে সারাটা দিন কী মজা করেই না কাটাতাম! আমাদের বাড়ীর সামনের সেই বিরাট সবুজ মাঠ—যার প্রতিটি ঘাস আমাদের চেনা; তরতর করে বেয়ে-চলা ছোট্ট নদীটি; সাহাদের বিরাট পদ্মভরা দীঘিটি, একে একে ভেসে উঠলো চোখের ওপর ছবির পর্দার মতো। কার্ত্তিকবাবুর সেই বেড়ায় ঘেরা আমবাগান, গ্রীষ্মের তপ্ত দুপুর যার স্নিগ্ধ ছায়ায় কাটতো; সেই বুড়ো গোঁফ-ওয়ালা দারোয়ান, যাকে ফাঁকি দেবার নতুন নতুন ফন্দী বার করতো রতনটা—অত্যন্ত বেশি করে মনে পড়ছে আজ। খুশি-ভরা মনখানা কল্পনার রঙীন পাখায় চড়ে কখন চলে গেছে গ্রামে—দীর্ঘ দু'বছরের জমে-থাকা কথার পুঞ্জকে উজাড় করে বলে যাচ্ছে সাথীদের কাছে—খুঁজে বেড়াচ্ছে অতি পরিচিত জায়গাগুলোকে, যা প্রতিদিনের স্মৃতিকে অতি যত্নে বুকে ধরে রয়েছে। খুশির উত্তেজনায় মন যেন লাফিয়ে উঠতে চাইছে—কখন গিয়ে গাড়ী থামবে বাড়ীর স্টেশনে। ভাবতে ভাবতে কখন তন্দ্রায় ঢলে পড়েছি মনে নেই।

মা'র ধাক্কায় জেগে উঠলাম। গাড়ী

কানে ভেসে এলো,—ফা—জিল পু—র! আরে এ যে আমাদের বাড়ীর স্টেশন! তাড়াতাড়ি নেমে পড়লাম।

······পরদিন সকালে উঠেই বেরোলাম গ্রাম ঘুরতে। সব ফাঁকা—মনটা দমে গেল গ্রামের এমনি অবস্থা দেখে। বাড়ীগুলো আধভাঙা হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঝিমোচ্ছে—কোথাও চাল গেছে খসে, কোথাও বেড়া গেছে ভেঙে, কারো ঘরে হয়তো কবাটই নেই। সারাটা উঠোন জুড়ে বিরাট বিরাট ঘাসের বন ঘন হতে ঘনতর হচ্ছে—কেঁচোর দল ঘরের ভিটিতে জুড়ে দিয়েছে অবাধ রাজত্ব। ইঁদুরের মাটি এখানে ওখানে ছোট পাহাড়ের মত জমে আছে—লাউ কুমড়োর লতা আপন মনে চাল বেয়েই চলেছে। প্রথমেই গেলাম রতনদের বাড়ীর দিকে—কেউ নেই। বেরোতেই দেখা হরিহর মণ্ডলের সংগে, আমায় চিনতে পেরে গড় হয়ে প্রণাম করে বললে: দাদাবাবু কবে এলেন? জিগ্যেস করলাম—হরিহর, গ্রামের খবর কি?

: দেখতেই তো পাচ্ছেন বাবু! কথায় কি এর চেয়েও বেশি বোঝাতে পারবো! চাষ বন্ধ—ঘরে খাবার নেই। ঘাঁটিতে মাটি কেটে এতোদিন পেট চালিয়েছি; এখন কাজও শেষ হয়েছে, পেটের আগুনও জ্বলে উঠেছে। আপনারা সকলে সহরে চলে গেলেন, পড়ে রইলাম আমরা—নড়বার সামর্থ্য নেই। বিষ্ণুপুরের জলার ধারে খোলার ঘর করে সারাদিন ঘাঁটিতে কাজ করে দিন কাটিয়েছি—এতো দিন নয় বাবু—যেন এক একটি বছর! রোগ অকটোপাশের মতো ঘিরে ধরেছিল—ওষুধ নেই—যারা নিজ ক্ষমতায় লড়তে পেরেছে রোগের সংগে তারা বেঁচেছে, যারা পারেনি মরণের কোলে ঢলে পড়েছে। এখনো আমরা বেঁচে আছি—এ যে প্রাণের মায়া, বাবু, প্রাণের মায়া! বলতে বলতে হরিহরের চোখ ছল ছল করে উঠলো। কথা না বাড়িয়ে বললাম—হরিহর, মা, বড়দা' এসেছেন—একবার দেখা করে

দু'এক পা এগিয়েই চোখ পড়লো একটু দূরের বটগাছটার তলায়। আমারই বয়সের একটি ছেলে বসে বসে ঝিমোচ্ছে। কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম—অত্যন্ত পরিচিত মুখের ছাপখানা মনে হচ্ছে; কিন্তু ঠিক চিনতে পারছি না। ও নিজেই আমার দিকে খানিকটা তাকিয়ে শুক্‌নো হাসি হেসে বললে: চিন্‌তে পারছেন না ছোটবাবু?

: হ্যাঁ, আমি তাই ভাবছি—তোর এমনি অবস্থা কেন বিশু?

: কি আর বলবো বাবু! দাদা সেই যে চলে গেল আসামে যুদ্ধের কাজে আজো খোঁজ খবর নেই। আমি, মা, ছোট বোনটি কিছুদিন গিয়ে রইলাম কুঠিরহাটে এক মামার বাড়ীতে। কিন্তু তাদের আশ্রয়ও কিছুদিন পরেই ছাড়তে হলো। ঘুরতে ঘুরতে শেষটায় মণ্ডলদের চালার পাশে চালা বাঁধলাম। কিন্তু এ চরম দুর্দশার মধ্যেও অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তি পেলাম না। একদিন ভৈরব মণ্ডল এসে আমাকে চুল ধরে চালার বাইরে এনে বেদম মারতে লাগল—আমি নাকি ওদের ফেন চুরি করে এনেছি। মা বাধা দিতে এলো—কিন্তু ভৈরবের সড়কির ঘায়ে মার পিঠও ফুলে উঠলো! কার কাছে প্রতিবাদ জানাবো—শত অত্যাচার, লাঞ্ছনা গঞ্জনা মুখ বুজে সহ্য করে সেখানেই কাটাতে লাগলাম দুঃখের দিনগুলো। বোনটির জ্বর হলো—পিলেতে এই ফুলে উঠলো পেট—ওষুধ নেই এক ফোঁটা—এতটুকু কচি বোনটি আমার, ক'দিনই বা লড়বে যমের সংগে! একদিন নিজেকে সকল যন্ত্রণা থেকে মুক্ত করে যমের হাতে বিলিয়ে দিল! মা দু'দিন ঠায় উপোস পড়ে রইলো।—আমি দূর গাঁয়ে ভিক্ষায় বেরোতাম—কেউ দিত, কেউ তাড়াত। ফেনের প্রার্থী হয়ে কুকুরের পাশে গিয়েও দাঁড়িয়েছি।

যখন শুনলাম গাঁয়ে ফিরে আসার আদেশ হয়েছে, তখন ভাবলাম দুঃখের রাত বুঝি শেষ হলো। কিন্তু এসে দেখছি গ্রামের অবস্থা আরো ভয়াবহ। বাড়ীর একটা দিক ভেঙে পড়েছে—লোকজন নেই। আজ আপনাদের ফিরে আসতে দেখে কতকটা আশ্বস্ত হয়েছি—বুঝিবা আবার সে-দিন ফিরে আসবে।—একটু থেমে বিশু বললে—তারপর ছোটবাবু, আপনারা তো শুনেছি সহরে গেছেন—কেমন আছেন?

বসে-যাওয়া চোখ দুটো জিজ্ঞাসু নেত্রে বিশু তুলে ধরলো আমার দিকে। এই বিশু নাপিতদের ছেলে—আমার খেলার সাথীদের একটি। কত বাধ্যই না ও—সব কিছু করতে পারতো আমার জন্যে। ওকে ঠিক আমরা কেউ নীচ জাতের বলে ভাবতে পারতাম না—খেলাধূলোর মধ্য দিয়েও

খেলার মাঠে

পরিচালক :
শ্রীউমেশ মল্লিক, বি-এ

মোহন বাগান ক্লাবের বার্ষিক নির্ব্বাচনে নিম্নলিখিতগণ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন—

সভাপতি :—মিঃ জে, এন, বসু—এটর্নী
সহ ,, :—মিঃ বি, সি, ঘোষ—বার-এট-ল
সাধারণ সম্পাদক :—ডাঃ এস্ কে গুপ্ত
সহ সাধারণ সম্পাদক :—মিঃ ইউ, কুমার
কোষাধ্যক্ষ :—মিঃ বি কে ঘোষ
ফুটবল সম্পাদক :—মিঃ সরোজ দত্ত
ক্রিকেট ,, :—মিঃ ধীরেন দে
টেনিস ,, :—মিঃ মাল সেন।

* * *

বহু প্রসিদ্ধ ইষ্ট ইণ্ডিয়া লন্ টেনিস প্রতিযোগিতায় প্রায় ভারতের সমস্ত বড় বড় খেলোয়াড়রা যোগদান করায় আগামী সপ্তাহে যে খেলার মাঠে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হবে তার জন্য উদ্যোগী সাউথ ক্লাবের আন্তরিক প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। সৈনিক খেলোয়াড়েরা ব্যতীত ঘউষ মহম্মদ; ইফ্‌তিকার আমেদ; যুধিষ্ঠির সিং, সোহানী, সুমন্ত মিশ্র, দিলীপ বসু, থসু সেন, ইসরাদী হোসেন, সাবুর, মেহটা, ম্যানমোহন, লিসিং ভ্রাতৃদ্বয়, জে, এন্ চৌধুরী, রাজেন ব্যানার্জ্জী প্রভৃতিকে খেলতে দেখা যাবে। আমরা এ অনুষ্ঠানের সর্ব্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।

নিঃ ভাঃ টেনিস খেলা ১লা ফেব্রুয়ারী থেকে আরম্ভ হবে।

* * *

ট্রুপ্ এমেনেটিজ ফণ্ডের সাহায্যকল্পে কলিকাতায় সামরিক একাদশ এবং গভর্ণর একাদশ দলের খেলাতে পূর্ব্বোক্ত দল এক ইনিংস এবং এক রাণে জয়লাভ করেছে। বহুদিন পরে কলিকাতার অধিবাসীরা সামরিক দলের খেলোয়াড়দের কয়েকজনার খেলা দেখে আনন্দ উপভোগ করেন। বিশেষ করে ডেনিস কম্পটন এবং জো হার্ডষ্টাফের খেলা দেখে দর্শকরা প্রচুর আনন্দ পান। তাঁরা যথাক্রমে ১০৯ এবং ১৫০ রাণ করে দলের জয় যাত্রার পথে যথেষ্ট সাহায্য করেন। প্রতিপক্ষ বাঙ্গালাদলের জয়লাভের আশা ক্ষীণতর থেকে ক্ষীণতম হয়ে উঠে। কিন্তু গভর্ণর দলের দ্বিতীয় ইঃ-এ নির্ম্মল চ্যাটার্জ্জী ১১৫ রাণ-সংগ্রহ করে স্বীয় দলকে পরাজয়ের হাত থেকে রক্ষা করতে বিশেষ চেষ্টা করেন। যদিও তাঁর আন্তরিক চেষ্টা কার্য্যকরী হয়ে ওঠে নি তবে ক্রীড়ামোদীরা যে এদিনের খেলা দেখে বিশেষ আনন্দ পান এ কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না।

সুহৃদ মিত্র এবং এন চৌধুরী এই খেলাটিতে বোলিংএ বিশেষ কৃতিত্ব দেখান। ফলে হার্ডষ্টাফ ও কম্পটনের কাছ থেকে সুহৃদ মিত্র, এন চৌধুরী অকৃপণ প্রশংসা লাভ করেন। নির্ম্মল চ্যাটার্জ্জীর ব্যাটিং-এর তাঁরা ভূয়সী প্রশংসা করেন।

রঞ্জী ট্রফী প্রতিযোগিতায় অধ্যাপক দেওধর নওনগর দলের যে প্রতি ইনিংসে শতাধিক রাণ সংগ্রহ করে বিজয় মার্চ্চেণ্ট প্রতিষ্ঠিত ১৯৪১০ সালের রেকর্ডের সমতুল্য করে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেন তার জয়ধ্বনি মিলিয়ে যাওয়ার পূর্ব্বেই আর একজন খেলোয়াড় অনুরূপ স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়েছেন। ইনি হচ্ছেন ভারতের বর্ত্তমান ক্রিকেট জগতের উজ্জল জ্যোতিষ্ক ভি, এস, হাজারী। হাজারীর আর একটি ব্যক্তিগত রেকর্ড স্থাপিত হল। পশ্চিমাংশের বরোদা ও মহারাষ্ট্রের খেলায় হাজারী ১ম ইঃ-এ ১.৭ রাণ এবং দ্বিতীয় ইঃ-এ ১৬২ রাণ করে অসাধারণতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি এখনো ব্যাটিং করছেন। হাজারীর ব্যাটিং এর অভাবনীয় সাফল্যের ফলে বরোদা দল এখনো ৬২১ রাণে অগ্রগামী আছে সুতরাং তাদের জয়লাভ যে সুনিশ্চিত একথা স্বীকার করতে বাধা নেই। বরোদা দলের এত অধিক সংখ্যক রাণের জন্য অবশ্য নিম্বলকারের ১১৭ রাণ এবং অধিকারীর ১৬৪ রাণও বিশেষ ভাবে দায়ী। অধিকারী এখনো ব্যাটিং করছেন। দেখা যাক্ হাজারী এবং অধিকারী শেষ পর্য্যন্ত কত রাণ সংগ্রহ করে স্ব স্ব রেকর্ডের সৃষ্টি করতে পারেন।

রঞ্জী ট্রফীর পূর্ব্বাংশের খেলায় হোলকার ১ ইনিংস ১৪০ রাণে প্রতিপক্ষ বিহার দলকে পরাজিত করে বাঙ্গালা দলের বিরুদ্ধে খেলার যোগ্যতা অর্জ্জন করেছে। বলতে কি এই দুটি প্রতিযোগিতার মধ্যে খেলাটি আশানুরূপ ভাল হয় নি। হোলকার দলই যা কিছু সামান্য উৎকর্ষের পরিচয় দেয়। বিহার দলের খেলা নিম্নস্তরের হয়। একমাত্র এ, দে সরকারের ৪৬ রাণ এবং এস বাগচীর ২৫ যথাক্রমে ১ম এবং ২য় ইঃ-এর সর্ব্বাপেক্ষা বেশী রাণ সংখ্যা। হোলকার দলের একমাত্র জগদলের ১৪২ রাণ ১ম ইঃ-এর যা কিছু উৎকর্ষের পরিচয় দেয়। মুস্তাক আলী, সি, কে নাইডু এবং সি এস-এর কাছ থেকে আমরা বিশেষ কিছু আশা করি। ১ম ইঃএ হোলকার দল ৩৮৯ করে। বিহার দল সেই অনুপাতে মাত্র ১৫৮ রাণ করে "ফলো অন্" করতে বাধ্য হয়। দ্বিতীয় ইঃ-এ মাত্র ৯১ রাণ করায় বিহার দল ১ ইঃ ১৪০ রাণে পরাজিত হয়।

আগামী জানুয়ারী মাসের প্রথম দিকে কলকাতায় রেডক্রশ ফাণ্ডের সাহায্যকল্পে কলকাতায় গভর্ণরের একাদশ বনাম ষ্টুয়ার্টস একাদশের একটি আকর্ষনীয় প্রতিযোগিতার ব্যবস্থার কথা শুনা যাচ্ছে। এতে ভারতের বিশিষ্ট ক্রিকেটিয়ারদের দেখা যাবে।

কেমন জানি এক হয়ে গেছলো আমাদের সংগে। আজ বিশুর এমনি অবস্থা দেখে মনটা অত্যন্ত কেঁদে উঠলো। বললাম—চল বিশু আমাদের বাড়ী থাবি!...

ফিন্তু গ্রামে থাকা অসম্ভব হয়ে উঠলো। আমিও কেমন মনমরা হয়ে গেলাম। উঃ—কী ভীষণ!......

দিন সাত পরে আবার রওনা হলাম কোলকাতার দিকে। ট্রেণের জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে আছি। দূরে খেতের আল বেয়ে চলেছে একদল লোক—ছেলে, মেয়ে, বুড়ো, বুড়ি—সব আছে। কাঠির মতো শীর্ণ দেহকে ঘিরে রয়েছে শতছিন্ন কাপড়ের টুকরো। আল ধরে ধরে ক্লান্তপদে ওরা চলেছে—কোথায় কে জানে! মনে হলো—এমনি করে চলে যাবার জন্যেই বুঝি একদিন

"শেষ-রক্ষার" অভাবনীয় সাফল্য

রবীন্দ্রনাথের মিলনান্ত কৌতুক-নাটিকার অপূর্ব বাণীচিত্র রূপায়ণ

চিত্রভারতীর প্রথম অবদান রবীন্দ্রনাথের সর্বজনসমাদৃত সাফল্যমণ্ডিত নাটক "শেষ-রক্ষা" বাণীচিত্রাকারে রূপায়িত হইয়া অদ্ভুত-কীর্তি স্থাপন করিল।

চিত্র নির্মাণ

বিভূতি লাহার ফটোগ্রাফী এই চিত্রের উন্নতির মূলে যে অসাধারণ কৃতিত্বের দাবী করিল তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। পরিচালক পশুপতি চট্টোপাধ্যায় তাঁহার এই দ্বিতীয় চিত্র পরিচালনায় অপূর্ব্ব দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। এই চিত্রের শব্দগ্রহণ কার্যও এমন নিপুণভাবে গৃহীত হইয়াছে যে কালী ফিল্মসের শব্দধরকে আন্তরিকভাবে প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের বৈশিষ্ট রক্ষা করিয়া শব্দমাধুর্য-সম্পন্ন সংগীতগুলি এখনও আমাদের কানের নিকট বাজিতেছে। ইহা যেন নতুন সুর-লালিত্যে মণ্ডিত হইল। হাসি ও কৌতুকের অফুরন্ত উৎসমুখর এই চির-নতুন কাহিনী রূপালী-পর্দার বুকে চিরনন্দিত বলিয়া মনে হয়।

বিজয়া দাশের কৃতিত্ব

অতীত ইতিহাসের অগৌরবময় পৃষ্ঠাকে তিনি আবার নিজ নিপুণতার আলোকপাতে গৌরবময় করিয়া তুলিলেন। এই ছবির একটি বিশিষ্ট ও প্রধান চরিত্র ইন্দুমতীর ভূমিকায় অপূর্ব দরদের সহিত অভিনয় করিয়া তিনি প্রমাণ করিলেন যে সুযোগ্য পরিচালকের ইঙ্গিতে সু-অভিনয় করা সম্ভব। শ্রীমতীর কণ্ঠের দুইখান গানও আমাদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছে।

পদ্মা দেবীর অসামান্য অভিনয়

আজ পর্যন্ত যতগুলি চরিত্রে ইনি অভিনয় করিয়াছেন তাহা তাঁহার যোগ্যতার পরিচায়ক। তথাপি আমাদের মনে হয় তিনি এই চিত্রের কমলমুখির ভূমিকায় অভিনয় করিয়া তাঁহার অতীত অভিনয়গুলিকে ম্লান করিয়া দিলেন। তাঁহার চিরহাস্যমধুর বাচন-ভঙ্গিও সঙ্গীতনিপুণতা অবিস্মরণীয়।

জীবেন বসু

অমর মল্লিক, জীবেন বসু ও বিপিন মুখোপাধ্যায়

ইহারা প্রত্যেকেই সু-অভিনয়ে নিজেদের সুনাম অক্ষুন্ন রাখিয়াছেন। চিত্রজগতে নবাগত বিপিন মুখোপাধ্যায় কবি বিনোদের চরিত্রটিকে গৌরবদানই করিয়াছেন। মেডিকেল কলেজের ছাত্র গদাই রূপে জীবেন ও তাহার পিতার ভূমিকায় অমর মল্লিকের সুন্দর ও সাবলীল অভিনয়ে নিজ নিজ সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছেন।

আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা

আমরা চিত্র-জগতে নবাগতা প্রথম নারী প্রযোজিকা, শ্রীমতী প্রতিভা শাসমলের অসাধারণ সাফল্যমণ্ডিত প্রচেষ্টাকে প্রশংসা করি। তিনি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের অমর প্রহসনকে রূপদান করিয়া চিত্রজগতে যে সুনাম অর্জন করিলেন তাহা খুব কম প্রযোজকের ভাগ্যেই ঘটে। আমরা তাঁহাকে অভিনন্দন জানাই।

শ্রীমতী বিজয়া দাশ বি-এ

নাটমণ্ডপ

কালিকা থিয়েটার্সের উদ্বোধন

গত শুক্রবার সকালে কলিকাতার ভবানীপুর অঞ্চলে নবনির্ম্মিত নাট-দেউল 'কালিকা' থিয়েটার্সের উদ্বোধন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জী উদ্বোধন করেন।

অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীত গীত হয় এবং পণ্ডিত অশোক নাথ শাস্ত্রী বেদপাঠ ও মঙ্গলাচরণ করেন।

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জী 'কালিকা' থিয়েটার্সের উদ্বোধন করিতে উঠিয়া বলেন যে, মাত্র সাত সপ্তাহের মধ্যে এইরূপ সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর একটি নাট্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করা তাঁহার নিকট বিস্ময়কর বলিয়া মনে হইতেছে। এই নাট-দেউলের 'কালিকা' থিয়েটার্স নামকরণ করিয়া তাহারা যে ভারতের সংস্কৃতি গত জাতীয় বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়াছেন সেজন্ত ডাঃ মুখার্জ্জী এই প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তৃপক্ষকে ধন্তবাদ জানান।

জাতীয় জীবন গঠনে নাটকের প্রভাব ও নাট্যালয়গুলির এ বিষয়ে গুরুদায়িত্বের কথা উল্লেখ করিয়া ডাঃ মুখার্জ্জী বলেন যে নাটক প্রকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট এই দুইভাবেই জাতীয় জীবনকে প্রভাবান্বিত করিতে পারে। ইহা একদিকে যেরূপ জাতির উন্নতি ও কল্যাণ সাধন করিতে পারে, অপর দিকে তেমনি ইহার কুপ্রভাব জাতিকে অধঃপতনের পঙ্কেও টানিয়া লইয়া যাইতে পারে।

পরিশেষে ডাঃ মুখার্জ্জী বলেন যে, এই নাট্যালয় সর্ব্বদা জাতির কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া অদূরভবিষ্যতে বাঙ্গলা দেশের মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ ও আদর্শ জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হউক তিনি ইহাই কামনা করেন।

শ্রীযুক্ত রাম চৌধুরী 'কালিকা' থিয়েটার্সের পক্ষ হইতে উপস্থিত জনমণ্ডলীকে ধন্তবাদ জ্ঞাপন করেন।

কুমার ধীরেন্দ্র নারায়ণ রায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, বাঙ্গলার নাট্যামোদী ব্যক্তিগণ উৎসাহ দানে দেশের নাট্য-শিল্পকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছেন। তাহার ফলে সর্ব্বপ্রকার আয়োজনের কেন্দ্র বিশিষ্ট নাট্য-মঞ্চগুলি কলিকাতার উত্তর প্রান্তে গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু কলিকাতার দক্ষিণ প্রান্তের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে উক্ত অঞ্চলে একটি নাট্যগৃহের প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভূত হইতেছিল। দীর্ঘদিন পরে সেই প্রতীক্ষার আজ অবসান হইল। আশা করা যায়, এই নব নাট-দেউল কলিকাতা তথা সমগ্র বাঙ্গলা দেশের দৃষ্টান্তস্বরূপ ইহা জাতীয় জীবনের কল্যাণ সাধন করিবে। প্রার্থনা করি, চিরপ্রবুদ্ধ আত্মার লীলাময় বৈচিত্র্যের অনুলেখনে "কালিকার" কর্ম্মীবৃন্দের এই শুভ প্রচেষ্টা সার্থক ও জয়যুক্ত হউক; তাঁহাদের এই বিজয় বৈজয়ন্তী উন্নত ও অক্ষুন্ন থাকুক।

আগামী ২৩শে ডিসেম্বর হইতে "বৈকুণ্ঠের উইল" মঞ্চস্থ হইবে।

"বিন্দুর ছেলে"

অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের আরও একখানি উপন্যাস নাটকীকৃত হইয়া পাদ-প্রদীপের সম্মুখে উপস্থিত হইল। ইহার প্রযোজনা করিতেছেন নাট্যাচার্য্য শিশির কুমার। অদ্য হইতে শ্রীরঙ্গমে "বিন্দুর ছেলে" দর্শকদের অভিবাদন করিবে।

"সন্তান" পরিত্যক্ত

বাণীকুমার কর্ত্তৃক সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিম চন্দ্রের "আনন্দ মঠ"কে নাট্যরূপায়িত করিয়া রঙমহল অভিনার্থ প্রস্তুত হইতেছিল, এমনকি উদ্বোধনের দিন পর্য্যন্ত বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল হঠাৎ সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি সম্পন্ন একটি দল 'বন্দে মাতরম' গানটির জন্য আপত্তি করেন।
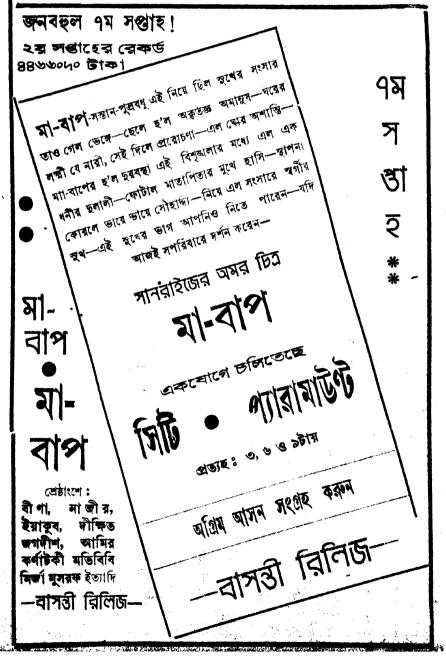
তাঁহারা বলেন বাংলার এই জাতীয় সঙ্গীতটি বাদ দিয়া নাটক মঞ্চস্থ করিতে। কিন্তু তাহা অসম্ভব বলিয়াই কর্তৃপক্ষ "সন্তান" ('আনন্দ মঠ'এর নাট্যরূপ) কে পরিত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু মজার বিষয় হইল যে পুলিশ কর্তৃপক্ষ এই নাট্যরূপ দেখিয়া পাশ করিয়াছিলেন।

ছবির রেকর্ড

বোম্বায়ে "রামরাজ্য" সুপার সিনেমায় একাদিক্রমে ৭১শ সপ্তাহ চলিতেছে। পূর্ব্বে ৬৬ সপ্তাহ "বসন্ত" চলিয়া যে রেকর্ড করিয়াছিল "রাম-রাজ্য" তাহা ভঙ্গ করিয়াছে। কলিকাতায় "কিসমৎ" ৬৬শ সপ্তাহে চলিতেছে। শান্তারামের "শকুন্তলা" আজ পর্য্যন্ত নয় লক্ষ টাকা পাইয়াছে। বাংলা ছবির মধ্যে "শহর থেকে দূরে" এক রূপবাণী হইতেই পাঁচ লক্ষ টাকা পাইয়াছে। "উদয়ের পথে" চিত্রা ও রূপালীতে গত ১৬ সপ্তাহ ধরিয়া চলিতেছে এবং উভয় চিত্রগৃহের সম্মিলিত ৩০ সপ্তাহে চার লক্ষাধিক টাকা পাইয়াছে। আমাদের মনে হয় "উদয়ের পথে" সকল বাংলা ছবির রেকর্ড ভঙ্গ করিবে।

"শ্রীদুর্গা"

মতিমহল থিয়েটার্সের "শ্রীদুর্গা"র শুটিং শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় পুনরায় সুরু করিয়াছেন ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে। ভূমিকালিপি নির্ব্বাচিত হইয়াছে এইরূপ: রাম—ছবি বিশ্বাস, লক্ষ্মণ—ধীরাজ ভট্টাচার্য্য, সীতা—রেণুকা রায়, সরমা—ছায়া দেবী, রাবণ—নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী, বিভীষণ—অহীন্দ্র চৌধুরী, মারুতি—অমল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি।

সহরের সিনেমায়

এসপ্তাহের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য আকর্ষণ হইল বম্বে টকীজের "জোয়ার ভাটা"। ইহার রচনা ও পরিচালনা করিয়াছেন অমিয় চক্রবর্ত্তী। অভিনয় করিয়াছেন মৃদুলা, শামিম, আগাজান, দিলীপ কুমার প্রভৃতি। জ্যোতি ও শ্রী'তে ছবিখানি মুক্তিলাভ করিবে।

অন্যান্য ছবির মধ্যে প্রভাত সিনেমায় "দিল-কী-বাত" (২য় সপ্তাহ), মিনার্ভা, ও গণেশ টকীতে "রামশাস্ত্রী" (৯ম সপ্তাহ) উত্তরা, ও পূরবীতে "প্রতিকার" (১৯শ সপ্তাহ), সেন্ট্রালে "পরখ" (১১শ সপ্তাহ), সিটি ও প্যারামাউণ্টে "মা-বাপ" (৭ম সপ্তাহ), রূপবাণীতে "শেষরক্ষা" (২য় সপ্তাহ) সাফল্য সহকারে চলিতেছে।

"রামশাস্ত্রী"

প্রভাত ফিল্মের ছবি, পরিচালনা করিয়াছেন জি, জাগীরদার। অভিনয় করিয়াছেন জাগীরদার, অনন্ত মারাঠে, মীনাক্ষী, বেবী শকুন্তলা, হংসা ওয়াদকার প্রভৃতি। এখন মিনার্ভা ও গণেশ টকীতে চলিতেছে।

মারাঠা ইতিহাসে নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিয়াছিলেন যে পণ্ডিত, নির্ভীক এবং সত্যাশ্রয়ী বিচারক রামশাস্ত্রী—তাঁহারই জীবনী লইয়া এই চিত্রনাট্যখানি গড়িয়া উঠিয়াছে। গভীর দারিদ্র্য ও দুঃখকষ্টের মধ্য দিয়া তাঁহার শৈশব অতিবাহিত হয়, লেখাপড়া তিনি কিছুই করিতেন না। একদিন তিনি মাতার নিকট প্রতিজ্ঞা করেন যে যেমন করিয়া হউক বিদ্যার্জ্জন করিয়া দশজনের একজন হইবেন। একদিন গভীর রাত্রে তিনি পুণা হইতে পদব্রজে যাত্রা করিলেন কাশীর দিকে। সেখানকার পণ্ডিতেরা রামকে টোলে ভর্ত্তি করিতে চাহিলেন না, কারণ যে ধাতুরূপ-শব্দরূপ জানে না তাহার স্থান এ টোলে হইবে না। কিন্তু রাম অমানুষিক অধ্যবসায় সহকারে দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে বিদ্যাভ্যাস সমাধা করিয়া পুনায় পেশোয়া দরবারে সর্ব্বোচ্চ বিচারকের সম্মানলাভ করিলেন। সেখানে তিনি অন্যায়, অবিচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে যেভাবে দাঁড়াইলেন তাহাতে লোকে তাঁহাকে ভয় করিত। চিত্রনাট্যের মধ্যে আরও কয়েকটি অধ্যায় সংযোজিত হইয়াছে যাহা তাঁহার চরিত্রের অন্যান্য দিকগুলি বিশেষভাবে পরিস্ফুট করিয়াছে।

চিত্রনাট্যরচনায় ও পরিচালনায় জাগীরদার যে সূক্ষ্ম রসজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে হয়। ছবিখানির প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত যে আবহাওয়া রক্ষিত হইয়াছে তাহা সত্যই অপূর্ব্ব। পরিচালক জাগীরদার ও প্রযোজক প্রভাত ফিল্মকে তাঁহাদের অভাবনীয় সাফল্যের জন্য আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি।

অভিনয়ের মধ্যে নাম-ভূমিকায় অনন্ত মারাঠে ও জাগীরদার উভয়েই চমৎকার। আমরা ভাবিতেই পারি না অন্য কোন অভিনেতা ইহাপেক্ষা ভাল করিতে পারিতেন কিনা। অন্যান্য ভূমিকায় মীনাক্ষী, হংস ওয়াদকার এবং রামশাস্ত্রীর মাতার ভূমিকাভিনেত্রীটি চরিত্রানুগত মনোজ্ঞ অভিনয় করিয়াছেন। বেবী শকুন্তলা নামে যে ছোট্ট মেয়েটি অভিনয় করিয়াছে তাহার স্বচ্ছন্দ সাবলীল অভিনয় আমাদের মুগ্ধ করিয়াছে।

ফটোগ্রাফী নিখুঁত।

পরলোকে শ্রীমতী সরোজিনী বসু

টাকীর সুপ্রসিদ্ধ জমিদার ৺রাজেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সরোজিনী দেবী ৭২ বৎসর বয়সে কলিকাতায় পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তিনি তাঁহার বৃদ্ধ স্বামী শ্রীনিশানাথ বসু, ৪ পুত্র এবং ৭টি কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। সরোজিনী দেবী অত্যন্ত ধর্ম্মপ্রাণ মহিলা ছিলেন। শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় বসু বি-এল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ল'কলেজের অফিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র।

[illegible] স্বত্বাধিকারী শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত, ১২৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, [illegible] হইতে মুদ্রিত

লতিকা বন্দ্যোপাধ্যায়

নিউ থিয়েটার্সের আগামী বাংলা ছবি "দুই পুরুষ"-এ একটি বিশিষ্ট ভূমিকায়
ইনি আপনাদের প্রথম অভিবাদন করিবেন।

সুমিত্রা দেবী

এই নবাগতা সুদর্শনা চিত্রনটীকে নিউ থিয়েটার্সের "ভুল" (হিন্দী) ছবিতে আপনারা দেখিতে পাইবেন।

(উপরে)

মতিমহল থিয়েটার্স পরিবেশিত হিন্দী "বন্দুকওয়ালী" ছবিতে রমিলা ও অনিলকুমার।

(দক্ষিণে)

নাদিয়া—লাফ ঝাঁপ, মারামারি করিতে ইহার জোড়া নাই বলিয়া ইনি "Fearless" আখ্যা পাইয়াছেন। "পাঞ্জাব মেল" ছবিতে এইবার আপনারা ইঁহাকে দেখিতে পাইবেন।

পদ্মা দেবী

"শেষ-রক্ষা" ছবিতে ইহার অভিনয় চিত্রপ্রিয়দের চিত্তজয় করিয়াছে।

রতীন বন্দ্যোপাধ্যায় ও রমা বন্দ্যোপাধ্যায় ইউরেকা পিকচার্সের "দোটানা"

অ্যান শেরিডান

গত সপ্তাহে ইহাকে "Shine On The Harvest Moon" ছবিতে দেখা

রেণুকা রায়

কালী ফিল্মসের "অভিনয় নয়" চিত্রে
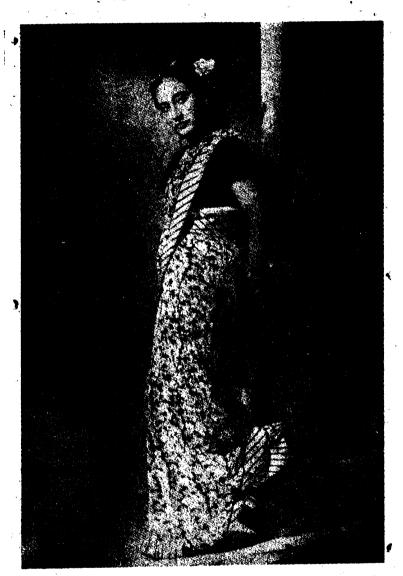
ইহাকে নায়িকার ভূমিকায় দেখা যাইবে

প্রধান সম্পাদক—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় :: সহঃ সম্পাদক—শ্রীধীরেন্দ্রমোহন মজুমদার বি. এল.

১৬শ বর্ষ VOL. XVI. } ১৩ই পৌষ ১৩৫১ :: December 28, 1944 { ৫২শ সংখ্যা No. 52

বর্ষশেষ

বৎসরের শেষ প্রান্তে দাঁড়াইয়া আমরা আজ বিস্মিত হইয়া ভাবিতেছি, "দীপালী"র আর এক বৎসরের আয়ু-ও বাড়িল। পিছনে ফেলিয়া আসা দিনগুলির ভয়াবহতায়, এই পত্রিকার কঠোর পথযাত্রার শেষ হইয়াছে ইহা নিশ্চিন্ত হইয়া বলিতে পারিলে আমরা সর্ব্বাপেক্ষা সুখী হইতাম। এদেশে পত্রিকা পরিচালনা খুব আরামের নয়। কত অতর্কিত দুর্য্যোগ কোন সুযোগে আসিয়া দুস্তর সমস্যার সৃষ্টি করে তাহার সঠিক পরিচয় পাঠক সাধারণের জানিবার উপায় নাই। তথাপি বিগত দীর্ঘ বৎসরের মরুপথ অতিক্রম করিয়া আমরা নববর্ষের দ্বারপথে পৌঁছিয়াছি ইহা অনেকখানি ভরসার কথা। ইহা যাঁহাদের জন্য সম্ভব হইয়াছে তাঁহাদের নিকট বারবার অন্তরের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেও ঋণমুক্ত হওয়া যায় না। একথা স্বীকার করিতে আজ আমাদের বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা নাই। এই পত্রিকার বাঁচিয়া থাকার সমস্যা যখন গভীর হইয়া দেখা দিয়াছিল তখন কতদিক হইতে কত অযাচিত সাহায্য ও উপদেশ আমরা লাভ করিয়াছিলাম তাহা স্মরণ করিয়া আজ গৌরব বোধ করি। আমাদের বিজ্ঞাপনদাতা এজেন্ট ও গ্রাহক ও তাহারও বাহিরে দীপালীর শুভানুধ্যায়ীগণের সহযোগিতার কথাও আজ সর্ব্বাগ্রে স্মরণীয়।

আগামী নববর্ষ হইতে "দীপালী" সপ্তদশ বর্ষে পদার্পণ করিবে। নববর্ষ হইতে পত্রিকার প্রসাধন-সৌন্দর্য্য ও বিষয়-বৈচিত্র্য-যাতে বৰ্দ্ধিত হয় তাহার জন্য কর্ত্তৃপক্ষ সাধ্যমত আয়োজন করিতেছেন। বর্ত্তমানে আমরা "নিউজপ্রিন্ট" ব্যবহারের অনুমতি পাইয়াছি এবং মাসাধিক কাল হইতে "দীপালী" স্বাভাবিক আকারে প্রকাশিত হইতেছে। বিগত বৎসরে পত্রিকার বিবিধ বৈচিত্র্য সাধনের পরিকল্পনা থাকিলেও আমরা অসহায় হইয়া সময়ের স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছিলাম। আজ অল্পায়ু বৎসরের দিকে তাকাইয়া ভবিষ্যতের জন্য যে পরিকল্পনা করিতেছি তাহার মূল্য কতটুকু নববর্ষের প্রায়াগত দিনগুলিতে তাহা প্রমাণিত হইবে। পৃথিবীর বুকের উপর হইতে শ্মশানধূমের এই কৃষ্ণ যবনিকা কবে উত্তোলিত হইবে কে জানে? খৃষ্টের মহা-আবির্ভাবের এই শুভক্ষণকে ম্লান করিয়া পশ্চিম রণক্ষেত্র হইতে আবার রক্তাক্ত মানুষের আর্ত্ত-স্বর শোনা যাইতেছে। বহু আঘাতে মানুষের বিশ্বাস করিবার স্বাভাবিক প্রবৃত্তির উপর যে অসহনীয় চাপ পড়িয়াছে তাহার ফলে আমরা অবিশ্বাসী হইয়া উঠিয়াছি। খৃষ্ট-রাজ্য স্থাপনের জন্য পশ্চিম গণতন্ত্রের যুদ্ধোত্তর প্রচেষ্টার কথা আমরা শুনিতেছি। বিশ্বাসহীনতার কঙ্কালের উপর কি সেই রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইবে?

সাহিত্যের উৎপত্তি

—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

পদ্য গদ্য এবং পদ্য-গদ্য মিশ্রিত তাবৎ রচনাই অর্থাৎ সর্ব্ববিধ রচনার ব্যাপক সংজ্ঞারূপে এখন সাহিত্য শব্দটি ব্যবহৃত হয়। পদ্য গদ্য এবং পদ্যগদ্য মিশ্রিত রচনা আরম্ভ হইবার বহু পরে বিশ্বনাথ কবিরাজ মহাশয় তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যদর্পণ গ্রন্থেই বোধ হয় এই ব্যাপক অর্থাত্মক সাহিত্য-সংজ্ঞাটি প্রথম ব্যবহার করেন। সাহিত্য-দর্পণের পূর্ব্বেকার যতগুলি অলঙ্কারগ্রন্থ অদ্যাপি বর্ত্তমান, তাহাদের সবগুলিই কাব্য-সম্বন্ধীয়: যেমন কাব্যচন্দ্রিকা, কাব্যপ্রদীপ, মম্মট ভট্ট প্রণীত কাব্যপ্রকাশ, দণ্ডী প্রণীত কাব্যাদর্শ প্রভৃতি। প্রাচীন যুগে ছন্দোবদ্ধ রসাত্মক বাক্য অর্থাৎ কাব্যই ছিল রচনার একমাত্র বাহন, কাজেই কাব্যের বিষয় বর্ণনাতেই অলঙ্কারগ্রন্থগুলি পরিপূর্ণ।

কাব্য সংজ্ঞাটি সেকালে অনেকটা একালের সাহিত্যশব্দের মতই ছিল; কেননা, 'গদ্য-পদ্য-প্রাকৃত-ভাষাময় গ্রন্থ যে নাটক, তাহাকেও কাব্য শ্রেণীভুক্ত করিয়া লইয়া দৃশ্যকাব্য বলা হইত। ত্রিকাণ্ডশেষ অভিধানে নাটকের সংজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে—গদ্যপদ্যপ্রাকৃতভাষাময়ো গ্রন্থঃ।

ইতিহাস দর্শন বিজ্ঞান জ্যোতিষ নক্ষত্র-বিদ্যা অঙ্কশাস্ত্র চিকিৎসাশাস্ত্র প্রভৃতি যাবতীয় গ্রন্থ সমস্তই পদ্যে রচিত হইত।

ভারতীয় সাহিত্যের শৈশব আমরা দেখি বৈদিকরচনায় বেদে। বেদই আমাদের প্রথম গ্রন্থ এবং বেদের ঋকরচয়িতা ঋষিদিগের মুখেই যে ভারতীয় ভাষাসমূহের আদি ভাষা ধ্বনিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে বোধ হয় আজ আর কাহারও মতদ্বৈধ নাই। বেদের অপর নাম ছন্দস্। ছন্দস্ রচনায় যে ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছিল, সেই ভাষার নামও ক্রমশঃ ছন্দস্ নামে খ্যাত হইল। পালির জন্মকথাতেও এই ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি দেখা যায়। প্রথমতঃ বৌদ্ধশাস্ত্রকে অর্থাৎ ত্রিপিটককে পালি বলা হইত। পরে যে ভাষায় পালি অর্থাৎ বুদ্ধকথা লিখিত হইল তাহার নামও পালি হইয়া যাওয়ায় আমরা পাইলাম—পালি ভাষা।

ছন্দস্ অর্থে সমগ্র বেদ। বেদের বিভিন্ন সূক্তের বিবিধ ঋক নানা রীতিতে রচিত। ক্রমশঃ এই বিভিন্ন রচনারীতির নামও হইয়া পড়িল ছন্দস্।

এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে, রচনা রীতির অর্থাৎ ছন্দের এত বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের কি প্রয়োজন হইয়াছিল? একরকম ছন্দই আগাগোড়া অনুসৃত হয় নাই কেন? ইহার উত্তর, আমার মনে হয়, বেদের ঋকগুলি গীত হইত বলিয়া বিভিন্ন সুরের হ্রস্ব দীর্ঘ প্লুত উচ্চারণের অনুযায়ী বর্ণবিন্যাসের প্রয়োজন হওয়ায়, আপনাআপনি বিভিন্ন ছন্দেরও উৎপত্তি হইয়া পড়িয়াছিল।

বৈদিক ঋকগুলি বিভিন্ন সুরে ও লয়ে গেয়, কাজেই বিভিন্ন সুর ও লয়ের বন্ধনে কথাগুলিকে বন্দী করিবার জন্য ছন্দের বৈচিত্র্যেরও প্রয়োজন স্বাভাবিক।

ঋক্‌গুলির উচ্চারণেরও নির্দ্দেশ আছে। কোন সূক্তই এক সুরে পাঠ্য নয়। যেটি যে সুরে পাঠ্য বা গেয়, তাহার নির্দ্দেশ প্রত্যেক সূক্তেই প্রদত্ত হইয়াছে। অধিকাংশ ঋক্ ষড়জ ঋষভ গান্ধার মধ্যম ধৈবত ও নিষাদ এই ছয়টি সুরের কোনটিতে না কোনটিতে গেয়। পঞ্চমের নির্দ্দেশ অপেক্ষাকৃত কম ঋকে দেখা যায়। বৈদিক ঋক্‌গুলি গেয় ছিল বলিয়াই, সেগুলিতে ছন্দের ও সুরের বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়।

বেদে ছন্দেরও বহু বিভিন্ন রূপের সাক্ষাৎ মিলে: গায়ত্রী, অনুষ্টুপ, বৃহতী, ত্রিষ্টুপ, জগতী, ত্রিপাদবিরাড়গায়ত্রী, উষ্ণিক, ককুপ ইত্যাদি! ইহাদের মধ্যে গায়ত্রীই আদি: গায়ত্রী ছন্দসাং মাতঃ।

এইগুলিই যাবতীয় ছন্দের পিতামহ। ক্রমশঃ আদি অর্থের সঙ্কোচ ঘটিয়া কাব্য-রচনার বিভিন্ন রীতির সাধারণ সংজ্ঞারূপে, ছন্দ শব্দ বর্ত্তমানে প্রচলিত।

অলঙ্কারশাস্ত্রের মতে ছন্দোবদ্ধ বাক্যই কাব্য। রামায়ণই আদিকাব্য বলিয়া প্রসিদ্ধ।

ব্যাধ কর্ত্তৃক ক্রৌঞ্চমিথুনের একটি নিহত হইলে, শোকার্ত্ত বাল্মীকি মুনির মুখে স্বতঃ যে শোকবাণী উচ্চারিত হইয়াছিল, তাহাই শ্লোক নামে পরিচিত হইয়াছে। মহর্ষি বাল্মীকি তাঁহার রামায়ণের বালকাণ্ডে ২য় সর্গে বলিয়াছেন—

> পাদবদ্ধোঽক্ষরঃ সম
> তন্ত্রীলয় সমন্বিতঃ।
> শোকার্ত্তস্য প্রবৃত্তো মে
> শ্লোকো ভবতু নান্যথা॥

বোপদেবের কবিকল্পদ্রুমে শ্লোক ধাতু সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—শ্লোক ঋ ভ সংঘাতে। শোকে সঞ্জাত বাণীই শোক বা শ্লোক নামে খ্যাত। ক্রমশঃ অর্থবিস্তারে, শ্লোক এখন আর শোকপ্রকাশেই সীমাবদ্ধ নয়, সুখ-প্রকাশেরও বাহন হইয়াছে। বাংলায় শ্লোকের প্রাকৃতরূপ শোলোক এখন রূপ-কথার ইন্দ্রজাল রচনাতেই সম্পূর্ণরূপে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছে।

পশ্চিম রণক্ষেত্রের উপর কবে নিথর স্তব্ধতা নামিয়া আসিবে তাহার জন্য মানুষ দিন গুণিতেছে। বাঙলা দেশের অবস্থা বিচিত্র। পশ্চিমের শেষ বিস্ফোরণের লোহিত রাগ মিলাইতে না মিলাইতেই হয়তো বাঙলার পূর্ব্ব প্রান্তে সংঘর্ষের আগুন ভীষণতর হইয়া উঠিবে। ইহাতেই আমাদের বাঁচিবার সংস্থানও করিতে হইবে ইহাই বিচিত্র মনে হইতেছে। অদ্ভুত মনে হইলেও ইহার চেয়ে বড় সত্য আর নাই ইহা যেন ভুলিয়া না যাই। সৃষ্টির গোড়া হইতে আজ পর্য্যন্ত মানুষের ঘর ও সমাজ কতবার যে ভাঙিয়াছে তাহার ইতিহাস নাই অথচ প্রতিবারই ভগ্ন দেউলে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া আবার ভাল করিয়া বাঁচিবার স্বপ্ন দেখিয়াছি। বর্ষশেষে আমাদের পাঠক পাঠিকাগণকে এটুকু স্মরণ করাইয়া দিবারও প্রয়োজন আছে।

অমরকোষকার শ্লোক অর্থে বলেন পদ্যম্। অতএব শ্লোক রচয়িতা কবি। বাল্মীকিকে আদিকবি বা কবিগুরুও বলা হয়। ক্রৌঞ্চবধূর ব্যথায় বিগলিত হইয়া তিনি প্রথম শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহাকে কবি কহা হয়। কবি কু ধাতু হইতে উৎপন্ন। কু ধাতুর অর্থ শব্দ করা, বিশেষতঃ আর্ত্তস্বর উচ্চারণ করা। অতএব কবি শব্দের অর্থ শব্দকারী, অর্থাৎ যিনি আর্ত্তস্বরে শব্দ করেন অর্থাৎ যিনি শোকার্ত্ত হইয়া শ্লোক রচনা করেন।

এইরূপ, কাব্য বা কবিতা আর্ত্তিরই অভিব্যক্তি। The Sweetest songs are those that tell of saddest thoughts। Saddest thoughtsই sweetest songs. আদি কাল হইতেই আর্ত্তি গীতরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

বৈদিক ঋক যখন গীত হইত তখন ঋক-রচয়িতা ঋষিরা নিশ্চয়ই গায়ক ছিলেন। রামায়ণও গীত হইত। বাল্মীকি একাধারে কবি এবং গায়ক ছিলেন। তিনি লবকুশকে রামায়ণ গান শিখাইয়া অযোধ্যায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। লবকুশ শ্রীরামচন্দ্রকে রামায়ণ গান করিয়া শুনাইয়াছিলেন।

গ্রীক আদিকবি হোমারও একাধারে কবি ও গায়ক ছিলেন। স্যাকশন (Saxon) আদিকবি Caedmon স্বপ্নে প্রত্যাদেশ পাইয়াছিলেন—Caedmon sing me something. পরবর্ত্তী যুগে ইয়ুরোপের Bard ও Ministrelগণ ও একাধারে কবি ও গায়ক ছিলেন।

ভারতে চারণ ও ভাটগণ একাধারে কবি ও গায়ক ছিলেন। ভারতের কবিদের মধ্যে অনেকেই গায়ক ছিলেন। জয়দেবের গীত গোবিন্দ, গোবিন্দের গীত। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি কবি ও গায়ক ছিলেন। বাংলার মঙ্গলকাব্য, পাঁচালী, কথকতা প্রভৃতিতে কবিগণ স্ব স্ব রচনা গান করিতেন। অনেক গায়ক নিজে রচনা না করিতে পারায়, অন্যের রচনা গান করিতেন। আধুনিক কালেও রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি কবিগণ গায়কও ছিলেন।

রামায়ণের পর মহাভারত আর একখানি মহাকাব্য। মহাভারতের বক্তব্য বিষয়ও শোককাহিনী। সমগ্র মহাভারত খানি রামায়ণের ন্যায় গানে জনপ্রসিদ্ধি লাভ না করিলেও, মহাভারতের সার ভাগটুকু যে গীত হইত, তাহা ভগবদ্গীতা নাম হইতেই স্পষ্ট প্রমাণিত হয়। তবে এই ষষ্ঠিলক্ষ শ্লোকসমন্বিত সমগ্র মহাকাব্যখানি যে একবারও কথিত বা গীত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ মহাভারতেই বর্ত্তমান। বৈশম্পায়ন মুনি মহারাজ জন্মেজয়কে সমগ্র মহাভারত-খানি শুনাইয়াছিলেন। মুনিবর খুব সম্ভব কথাতেই শুনাইয়াছিলেন, কারণ "উবাচ" পদের দ্বারা গান করিয়াছিলেন বুঝিলে অন্যায় হইবে।

অতএব আমরা আদিকাল হইতেই দেখিতে পাই যে শ্লোক বা কাব্য গানেই আত্মপ্রকাশ করিয়া আসিতেছে।

কাব্যের অপর একটি নাম হইল পদ্য।

ছন্দোমঞ্জরীতে পদ্যের লক্ষণ কথিত হইয়াছে —

পদ্যং চতুষ্পদী তচ্চ
বৃত্তং জাতিরিতি দ্বিধা।
বৃত্তমক্ষর সংখ্যাতং
জাতির্মাত্রা কৃতাভবেৎ॥

পদ্য দুই প্রকারের, যেমন বৃত্ত ও জাতি। বৃত্ত অক্ষরসংখ্যাত অর্থাৎ আক্ষরিক ও জাতি মাত্রাপরিমিত অর্থাৎ মাত্রিক।

বাংলা পদ্যে অদ্যাপি এই দুইটি রীতিই প্রচলিত। যেমন, আক্ষরিক:

ক্ষুধিত কণ্ঠের তীব্র তিক্ত আর্ত্তনাদ
আলোকে বাতাসে করে ভয়াভ বিস্বাদ।

আর মাত্রিক:

তালীবনের মাথায় ঝলে শ্যামল আলিম্পন
কেয়ার গন্ধে দেয়ার শঙ্খে সাদর নিমন্ত্রণ।

পদ্য শব্দ চরণার্থক পদশব্দজ। এইজন্য পদ্যের পদ বা চরণ বলা হয়।

পদ্য আজন্ম সঙ্গীতেই বিকশিত ও

সঙ্গীতের সহিত নৃত্যেরও সম্বন্ধ বিশেষ ঘনিষ্ট।

সঙ্গীত অর্থে নৃত্য গীত ও বাদ্য বুঝায় বলিয়া, সঙ্গীতশাস্ত্রের অর্থ নৃত্য-গীত-বাদ্যস্ত শাস্ত্রম।

হেমচন্দ্র সঙ্গীতের অর্থ বলেন—

গীত বাদ্য নৃত্য ত্রয়ং
নাট্য তৌর্য্য ত্রিকঞ্চ তৎ।
সঙ্গীতং প্রেক্ষণার্থেঽস্মিন্
শাস্ত্রোক্তি নাট্যধর্ম্মিকা॥

নৃত্য জীবের একটা সহজ বৃত্তি। কাব্য গীত হইতে হইতে, আপনাআপনি তাহাতে নৃত্য সংযুক্ত হইয়াছে। গায়ক গানের সুরে ও লয়ে তাহার সহজ আনন্দে আপনিই এক-সময়ে নাচিয়া উঠে। গানের এ আনন্দ সংক্রামক। শ্রোতার মধ্যেও এই নৃত্যের ছন্দ প্রচালিত হয়। শ্রোতাও গানের তালে তালে গায়কের সহিত নাচে।

শ্রোতার দল মুখে না গাহিলেও গানের তালে তালে তাঁহারা যে তাল দেন, মাথা নাড়েন, বা বসিয়া বসিয়া দোলেন, এগুলিও নৃত্যের সমপর্য্যায়ভুক্ত।

সঙ্গীতদামোদরে নৃত্যের অর্থ কথিত হইয়াছে—

দেবরুচ্যা প্রতীতো য
স্তাল মান রসাশ্রয়ঃ।
সবিলাসো ঽঙ্গবিক্ষেপো
নৃত্য মিত্যুচ্যতে বুধৈঃ॥

এবং নৃতের কারণ উক্ত হইয়াছে:

গেয়াদুত্তিষ্ঠতে বাদ্যং
বাদ্যাদুত্তিষ্ঠতে লয়ঃ।
লয়তানসমারব্ধং
ততোনৃত্যং প্রবর্ত্ততে॥

অতএব আমরা দেখিতে পাই, গান হইতে বাদ্য, বাদ্য হইতে লয় এবং লয় তাল সংযুক্ত হইয়া যে নৃত্য প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা তালমানরসাশ্রিত হইয়া সবিলাস অঙ্গবিক্ষেপকেই বলা হইয়াছে। এই অঙ্গ-বিক্ষেপের প্রকার ও রীতি ভেদে নৃত্যেরও প্রকার ভেদ ঘটিয়াছে। অতএব গান শুনিয়া

নৃত্যের মধ্যে গণ্য করিলে, অন্যায় হইবে বলিয়া মনে করি না।

বিনা সুরে তালে ও লয়ে নৃত্য জন্মেওনা, জমেও না। মানবেতর প্রাণিগণের মধ্যেও নৃত্যবৃত্তি আছে। তাহাদের মধ্যে সাধারণতঃ নৃত্যের প্রেরণা জোগায় শব্দ ও বর্ণময় প্রাকৃতিক লীলা। মানুষের সঙ্গীতেও মানবেতর জীবের প্রাণে নৃত্যোল্লাস জাগে। এ দৃশ্যও বিরল নহে। সাপ সঙ্গীতের তালে তালে দক্ষিণে বামে দোলে, মৃগ পুচ্ছতাড়না করে, অনেক পাখী পক্ষবিস্তার করিয়া ধীরে ধীরে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া দোলে।

মানুষকে নাচায় কথা সুর ও তাল। গীতের উচ্ছ্বসিত, উচ্ছলিত ও উদ্বেল আনন্দরস নৃত্যের মধ্যে মুক্তি চায়। নৃত্যও তাই পদ্যের মধ্যে শতদলে বিকশিত হইয়া সম্পূর্ণরূপে আত্মদান করিয়া ধন্য হয়, পূর্ণ হয় ও সার্থক হয়।

নৃত্যের সঙ্গে পদ্যের এই একাত্মতার দরুণ গীতের সহিত পদের সম্বন্ধও অবিচ্ছেদ্য। নৃত্যের পদবিক্ষেপে গীত আত্মপ্রকাশ করে বলিয়া গীতের নাম পদ্য।

নৃত্যের অনুবর্তী গীত বা কাব্য এই ভাবে পদ্য নামে প্রথম প্রচারিত হইল। পদ্যে চরণার্থক পদই প্রধান বলিয়া পদজাত বা পদপ্রধান রচনার নাম পদ্য হওয়াই স্বাভাবিক। এখন অর্থব্যাপ্তিতে শ্লোক কবিতা কাব্য ও পদ্য সবগুলিই সমার্থক হইয়া পড়িয়াছে।

নৃত্যের চঞ্চল পদ-লীলায় যে পদ্যের সম্ভব, তাহার আরও প্রমাণ আছে: অমরকোষকার পদ্যের সমনাম বলেন বৃত্ত। ছন্দোমঞ্জরীতে পদ্য অর্থে বৃত্ত উক্ত হইয়াছে। বৃত্ত শব্দ বৃৎ ধাতু হইতে উৎপন্ন—বৃত্ত বর্তনে (কবিকল্পদ্রুম)। ছন্দোমঞ্জরীকার এই বৃত্তকে বলেন তিন প্রকার।

সমমর্দ্ধসমং বৃত্তং
বিষমঞ্চেতি তত্ত্রিধা।

অর্থাৎ সম, অর্দ্ধসম ও বিষম বৃত্ত। নৃত্য সরল রেখায় হয় না, নৃত্যের গতি সর্ব্বদাই বক্র, কাজেই বৃত্তাকার। এ বৃত্ত কখনও সম কখনও অর্দ্ধসম কখনও বা বিষম। এই বৃত্তাকার বা মণ্ডলাকার নৃত্য হইতেই পদ্যের নাম যে বৃত্ত হইয়াছে, তাহা সহজেই অনুমেয়।

নৃত্য যে প্রাচীনকালেও মণ্ডলাকার হইত, তাহার প্রমাণ পাই উৎকলকলিকায়:

কুলালচক্রপ্রতিমং
মণ্ডলং পঙ্কজাঙ্কিতং।

রাসের অপর নাম হল্লীষ। হল্লীষ অর্থে জটাধর বলেন—

স্ত্রীণাং মণ্ডলিকানৃত্যং।

হেমচন্দ্রও একমত। তিনি বলেন—

মণ্ডলেন তু যন্নৃত্যং
স্ত্রীণাং হল্লীষকন্তু তৎ।

এবং গোপীনাং মণ্ডলী নৃত্যবন্ধে হল্লীষকং বিদুঃ।

অতএব আমরা পাইতেছি স্ত্রী ও পুরুষের সম্মিলিত মণ্ডলাকার নৃত্য।

পদ্যের বিভিন্ন ছন্দের নামেও সেই জন্য আমরা নৃত্যের অর্থাৎ অঙ্গবিক্ষেপেরই পরিচয় পাই। সংস্কৃত ছন্দের নামগুলির আলোচনা করিলে দুইটি বিষয় আমাদের নিকট অত্যন্ত পরিস্ফুট হয়। প্রথমতঃ, নারীর বিভিন্ন রূপ ক্রিয়া বা মনোভাব: জঘনচপলা, ত্বরিত গতি, বেগবতী, দ্রুতবিলম্বিত, লীলাখেল, মন্দাক্রান্তা, রথোদ্ধতা, স্বাগতা, কন্যা, সতী, শশিবদনা, কুমারললিতা, মত্তা, মনোরমা, সুমুখী, প্রহর্ষিণী, রুচিরা, চণ্ডী, মঞ্জুভাষিণী, বসন্ততিলক, অপরাজিতা, দোলা, চকিতা, মদনললিতা, বাণিনী, হারিণী, ভারাক্রান্তা, উদ্দাম প্রভৃতি বহু।

দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন মানবেতর প্রাণিদিগের গতি ক্রিয়া বা ক্রীড়ার অনুকরণদ্যোতক নাম: হরিণপ্লুতা, মত্তমাতঙ্গলীলাকর, শার্দ্দূল বিক্রীড়িত, অশ্বললিত, ভুজঙ্গপ্রয়াত, ভুজঙ্গ সঙ্গতা মৃগী, মত্তময়ূর, শ্যেনী, ভ্রমরবিলসিতা, কলহংস, মৃগেন্দ্রমুখ, বৃষভগজবিলসিত, গরুড়রুত, হরিণী, বনকোকিল, হংসী, ক্রৌঞ্চপদা, ব্যাল, শঙ্খ, হরিণপ্লুতা ইঃ।

এ দুইটি ছাড়া নদ নদী জল পুষ্প তরুলতার নামেও বহু ছন্দ আছে: মালিনী প্রভৃতি।

স্রগ্ধরা, স্রগ্বিণী, বাতোর্ম্মি, জলোদ্ধতগতি, মদিরা, সোমরাজী, পুষ্পিতাগ্রা, শিখরিণী, বংশপত্রপতিত প্রভৃতি।

এইসব নাম হইতে ইহা অনুমান করা অন্যায় হইবে না যে, উক্ত পদার্থগুলির রূপ ক্রিয়া বা বিশেষ ভাবের অনুকরণে ও অনুসরণেই এই সব নৃত্যের রচনা ও নামকরণ হইয়াছিল। বিভিন্ন নৃত্যের পদসঞ্চালনে যে সব বিভিন্ন ছন্দ জাগিয়াছিল, সেই সব ছন্দকে সেই যুগের কবিরা পদ্যের ছন্দেও বাঁধিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। বেশ মনে হয়, ছন্দের নামকরণ হইবার আগে, নৃত্যের নামেই ইহারা সবিশেষ পরিচিত ছিল। এখনও আমরা শুনি এবং দেখি, আরতিনৃত্য, পূজানৃত্য, ব্যাধনৃত্য, সাপুড়ে নৃত্য, ইন্দ্র নৃত্য প্রভৃতি। অর্থাৎ বিশেষ পরিচিত কোনও জীব ক্রিয়া বা ভাবের অবলম্বনে নৃত্যগুলি গঠিত হয় এবং তাহার স্বরূপটি জনসাধারণের বোধগম্য করিবার উদ্দেশ্যে মূলের নামেই সেই নৃত্যের নামকরণ হয়। দেহের বিভিন্ন অঙ্গহারে অর্থাৎ অঙ্গসঞ্চালনে ও বিক্ষেপে যেমন বিভিন্ন নৃত্যের জন্ম, তেমনি অক্ষর বা মাত্রার বিভিন্ন যতিতে বিভিন্ন ছন্দেরও সম্ভব হইয়াছে।

পদ্যের ছন্দ নৃত্যের ছন্দ হইতে উৎপন্ন বলিয়াই পদ্যের ছন্দের নামও বিবিধ পশুপক্ষী ও নারীশ্রীর নামে অনুনামিত। পদ্য পদজাত অর্থাৎ নৃত্যজাত না হইলে, ওভাবে তাহাদের নামকরণ হইত কিনা বলা যায় না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি কবিতার নাম পদ্য ও বৃত্ত। ইংরাজীতেও কবিতার নাম Verse. Verse এর উৎপত্তি ল্যাটিন Verto হইতে। Verto-র অর্থ আবর্ত্তন। ল্যাটিন Verto ও সংস্কৃত বৃত্ত, সমার্থক, অর্থাৎ বর্ত্তনে। Verto ও বৃত্তের সৌসাদৃশ্য শুধু রূপেই নয়, প্রকৃতিতেও। Vert ও বৃৎ এই ধাতু দুইটি একই, স্থানীয় উচ্চারণ বৈষম্যে এইরূপ পৃথ মনে হইতেছে মাত্র।

বৃত্তের অর্থ মণ্ডলাকারে আবর্ত্তন Verto-র অর্থও মূলতঃ তাই। প্রাচীন গ্রীকদিগের মধ্যে দেবতার উদ্দেশ্যে Choral

আমরা তাহার অনুরূপ নৃত্য পাই হল্লীষে অর্থাৎ রাসনৃত্যে। ফলতঃ Choral dance ও রাস বা হল্লীষ একই জাতীয়। "মণ্ডলেন তু যন্নৃত্যং স্ত্রীণং হল্লীষকন্তু তৎ"—হেমচন্দ্র। এই মাণ্ডলিক নৃত্যই প্রাচীন গ্রীকের Choral dance.

সংস্কৃত পদ শব্দের অনুরূপ ইংরাজীতেও কবিতার চরণের নাম Foot. সুতরাং এখানেও নৃত্যের ছন্দকে কথায় বন্দী করিবার কালেই যে কবিতার চরণের নামে Foot শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহাতেও সন্দেহ করিবার বিশেষ কিছু আছে বলিয়া মনে হয় না।

দুই চরণ বিশিষ্ট একটি শ্লোকের নাম ইংরাজীতে Couplet. Couplet-এর অর্থ Oxford Dictionaryতে পাওয়া যায় A pair of successive lines of verse আর Couplet উৎপন্ন হইয়াছে Couple শব্দ হইতে। Coupleএর অর্থ ইংরাজ শাব্দিক বলেন—A Pair of Partners in Dance. এখানেও Couplet নৃত্যের নেপথ্যভূমির কথাই সূচিত করিতেছে, et তদ্ধিতে বিশেষ কিছুই পার্থক্য ঘটায় নাই।

ইংরাজীতে Stanzaর বর্ত্তমান অর্থ দুই, চারি বা ততোধিক মিল-শেষ চরণের একত্রীকরণ অর্থাৎ স্তবক। ল্যাটিন Stantia ধাতু হইতে Stanza শব্দ উৎপন্ন। Stantiaর অর্থ Stand অর্থাৎ দাঁড়ান, থামা। নৃত্যকালে মাঝে মাঝে নর্ত্তকদের কিয়ৎক্ষণ করিয়া বিরাম করার রীতি অদ্যাপি বর্ত্তমান। নৃত্যের এই বিরাম বা যতিই, ছন্দেরও যতিরূপে ব্যবহৃত হইতে লাগায় কবিতাও stanza বা স্তবকে বিভক্ত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। গানের সুর ও লয়ের স্বাতন্ত্র্যে, সব নৃত্যের যতি যেমন একস্থানীয় বা এককালীন নয়, তেমনি সব পদ্যের stanza বিভাগও এক রকম হয় নাই: দুই চারি ছয় আট এমনকি দশ চরণে পর্য্যন্ত এক একটি stanza নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পদ্যে এ বিভাগ প্রথমে হইয়া- ক্রমশঃ সব পদ্য গীত না হইলেও, পদ্যের নানাবিধ স্তবকবিভাগের অনুকরণে, পরবর্ত্তী কবিগণ নিজ নিজ খেয়াল ও খুশীতে নিজ নিজ পদ্যে stanza বিভাগ করিতে লাগিলেন এবং এখনও সেই প্রথাই প্রচলিত। ইচ্ছামত চরণসমবায়ে স্তবকবিভাগ সাধারণ কবিতাতেই সম্ভব, কারণ সেগুলি গেয় নয়, কিন্তু গানে তাহা চলে না, গানের স্তবকবিভাগ সুরানুগামী।

রামায়ণ-মহাভারত হইতেই পুরাণগুলি অনুপ্রাণিত। ক্রমশঃ উক্ত দুই মহাকাব্য এবং পুরাণগুলি হইতে পরবর্ত্তী কালে যে বিবিধ কাব্য ও খণ্ডকাব্যের উৎপত্তি, তাহা সহজেই অনুমেয়। আরও পরে, পূর্ব্বোক্ত মহাকাব্য কাব্য খণ্ডকাব্যাদির বিশেষ বিশেষ অংশের প্রকাশনায় নাটকের উৎপত্তি।

বিষ্ণুপুরাণের রাসোৎসব বর্ণনা হইতে প্রতীত হয় যে কাব্যপুরাণাদি অবলম্বনেই নাট্যের উৎপত্তি (বিষ্ণুপুরাণ, ৫ম অংশ, ১৩শ অধ্যায় ২৪—৩০ শ্লোক)।

নাটক শব্দটিই নটধাতু হইতে উৎপন্ন। নট নর্ত্তনে! নটশব্দের অর্থ নর্ত্তক। কাজেই নাটকের শৈশবাবস্থায় তাহাতে যে কেবল নৃত্য-গীতেরই প্রাধান্য ছিল, এ অনুমান ভুল নয়। পরে, নাটকান্তর্গত পাত্র-পাত্রীদের মুখে কথা দেওয়ার রীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এই কথাগুলি বিনা নৃত্যগীতে কথিত হইত বলিয়া, এই রচনারীতির নামকরণ হইল গদ্য। গদ ধাতুর অর্থ ভাষণ।

ত্রিকাণ্ডশেষ অভিধানে নাটকের অর্থ—গদ্য পদ্য প্রাকৃত ভাষাময় গ্রন্থ বিশেষ। সঙ্গীতদামোদর গ্রন্থে নাটকের লক্ষণ কথিত হইয়াছে। সম্পূর্ণ লক্ষণযুক্ত নাটকের উদাহরণস্বরূপ শেষোক্ত গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে—

মুরারিকবেরনর্ঘরাঘবং ভবভূতেরুত্তররামচরিতং কালিদাসস্যাভিজ্ঞানশকুন্তলকেত্যাদি।

অতএব নাটকের উৎপত্তি হইতেই গদ্য পদ্য দুইটি বিশিষ্ট রচনারীতির প্রচলন যেমন

চিরন্তনী রূপকথা

—শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু

পৃথিবীর সকল দেশেই অতি প্রাচীন কাল হইতেই রূপকথার প্রচলন রহিয়াছে। রূপকথার আদি জন্মভূমি, বিভিন্ন দেশে রূপকথার প্রসার, রূপকথার শ্রেণীবিভাগ প্রভৃতি বিষয় লইয়া ইতিপূর্ব্বে "শিশুভারতীর" সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় রবি-বাসরে অতি সুন্দর ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। সে সকলের পুনরুক্তি নিস্প্রয়োজন।

অত্যাশ্চর্য্য, অসম্ভাব্য, অবাস্তব বিষয় লইয়াই রূপকথার কারবার। পশুপক্ষী, দৈত্যদানব, সরীসৃপ-জলচর, বৃক্ষ-লতা ও মানুষকে একসঙ্গে মিলাইয়া সে সকল গল্পের

সাহিত্যের পংক্তিতে স্থানমর্য্যাদা লাভ করিল।

কাব্যের বিষয়বস্তুকে সর্ব্বজনবোধ্য করিয়া প্রকাশ করার ইচ্ছা হইতেই নাটকের জন্ম। এজন্য কবি ও নাট্যকাররূপে আমরা সেকালের শ্রেষ্ঠ কবিগণকেই পাই যেমন ভবভূতি কালিদাস প্রভৃতি। আধুনিক কালেও শ্রেষ্ঠ কবি ও নাট্যকাররূপে আমরা পাই দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মনীষীগণকে।

নাটকেই গদ্য রচনা প্রথম সাহিত্যে স্থান পাইল, তৎপূর্ব্বে পদ্যই ছিল সাহিত্যের একমাত্র বাহন। নাটকের পরেই কেবল গদ্যরচনায় সাহিত্যের সৃষ্টিও চলিতে লাগিল যেমন হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্র, কাদম্বরী প্রভৃতি।

এইস্থলে আর একটি লক্ষণীয় বিষয় এই যে সাহিত্যে গদ্যরচনা প্রবর্ত্তনের পর হইতেই, কাব্যপুরাণ বহির্ভূত বিষয় লইয়াও প্রকৃত কথাসাহিত্যেরও শুভসূচনা হইল।

এইভাবে পদ্য গদ্য, পদ্য-গদ্য মিশ্রিত ও প্রাকৃত ভাষার সমন্বয়ে রচনাবলীর ব্যাপক সংজ্ঞারূপে 'সাহিত্যে'র উৎপত্তি হইল। *

* ২৬শে নভেম্বর ১৯৪৪ তারিখে বর্দ্ধমানে রবিবাসরীয় সভায় পঠিত।

সৃষ্টি হইয়াছে। রূপকথার কাঠের ঘোড়ায় জল খায়, গাছ ও পাথরে কথা বলে, পক্ষীরাজ ঘোড়া বা পাখীর পিঠে চড়িয়া মানুষে আকাশপথে যাতায়াত করে। সমুদ্রের তলায় যাইতে বা সেখানকার রাজপ্রাসাদে বাস করিয়া আসিতে মানুষের বাধে না। কৌটায় ভরা একটী মাত্র ভ্রমরকে মারিতে পারিলেই এক নিমেষে শত সহস্র রাক্ষস-রাক্ষসীকে একসঙ্গে মারিয়া ফেলা যায়। লাঠির, খড়মের বা এক টুকরা পাথরের গুণে যাহা ইচ্ছা করা যাইতে পারে। ইচ্ছা করিলেই সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া ঘুরিয়া আসা চলে। কোন কিছুরই বাধা রূপকথার রাজপুত্রকে আটকাইতে পারে না। কিন্তু এতকাল ধরিয়া রূপকথার যে একছত্র আধিপত্য ছিল, বর্ত্তমান যুগে তাহা যেন ক্রমশঃই হ্রাস পাইয়া আসিতেছে এখন ছোটরাও পূর্ব্বের মত আর একান্ত অসম্ভাব্য ও অবাস্তব সম্পূর্ণ কাল্পনিক গল্পে সন্তুষ্ট হইতে চাহে না।

এখনকার ছোটদের গল্পে, অজয় কুমার সাবমেরিনে করিয়াই সমুদ্রের তলা দেখিয়া আসে, মাছের বা কচ্ছপের পিঠে চড়িয়া সেখানে যাইতে হয় না। রাজপুত্রের আর পক্ষীরাজ ঘোড়ায় সওয়ার হইবার আবশ্যক নাই। আকাশ পথে এরোপ্লেনে চড়িয়া শুইয়া বসিয়া অতি আরামে দেশ-দেশান্তরের রাজকন্যার কাছে যখনই ইচ্ছা যাওয়া আসা চলে। অত্যাশ্চর্য্য বৈজ্ঞানিক কৌশলে তৈয়ারী অভিনব রকমের রকেট-বেলুনে চড়িয়া বিজয় কুমার চন্দ্রলোক হইতে ঘুরিয়া আসে। আবার বেতার যন্ত্রের সাহায্যে সেখানকার অধিবাসীদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা চালায়। দূর হইতে একটি বৈদ্যুতিক সুইচ টিপিয়াই সমরেন্দ্র শুধু লক্ষ লক্ষ প্রাণ নয়, সমগ্র রাজ্যই এক মুহূর্ত্তে ধ্বংস করিয়া দিতে পারে। এখন কৌটার ভ্রমরের ছোটদের কোন আকর্ষণ নাই। এই বৈজ্ঞানিক যুগে কেহ যেন আর নিছক কল্পনার উপরে নির্ভর করিয়া তৃপ্ত হইতে পারে না।

কিন্তু, সত্যই কি রূপকথা আমাদের অন্তরে আর পূর্ব্বের মত আনন্দ দান করিতে পারিবে না? আমরা কি এমনই বাস্তববাদী হইয়া পড়িয়াছি যে আমাদের অন্তরে নিছক কল্পনার আর কোন স্থান নাই?

একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই উভয় প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ হইয়া পড়িবে। আমরা বিনা দ্বিধায় বলিতে পারিব যে, রূপকথা চিরকালই আমাদের অন্তরে আনন্দ দান করিবে। আর নিছক কল্পনাকেও আমরা কখনও নিজেদের অন্তর হইতে দূর করিতে পারিব না। আমরা বাস্তবের যতই পক্ষপাতী হই না কেন, একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, কল্পনাই বাস্তবের মূল।

নিছক কল্পনায় সৃষ্ট রূপকথা শুধু ছোটদের নয়, বয়স্কদেরও সমান আনন্দ দান করিতে পারে। রূপকথার মধ্যে মধ্যে যে একটী বিশেষ মাধুর্য্য ও কমনীয়তা দৃষ্ট হয় তাহা বাস্তব গল্পের ভিতর দুর্লভ। লেখকদের মধ্যে রূপকথা রচনায় কাহারও আগ্রহ নাই, তাঁহাদের সকলের বাস্তব লইয়াই কারবার। কিন্তু আমার মনে হয়, যাঁহারা আধুনিক ছোট গল্প লিখিয়া যশ অর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহারা একটু যত্ন লইলেই ভাল রূপকথাও রচনা করিতে পারিবেন। তাহাতে, পাঠক পাঠিকাগণের মধ্যে রূপকথার আদরও বৃদ্ধি পাইবে।*

* রবি বাসরে পঠিত।

প্রত্যাখ্যান

(উপন্যাস)

শ্রীসুধাংশু কুমার হালদার, আই, সি, এস্

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(১৪)

আগুন শুধু নমিতার অন্তরে নয়, এবার বুঝি সমস্ত বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ল। দরিদ্রের পর্ণকুটীর থেকে রাজার প্রাসাদ, শ্রমিকের বস্তি থেকে বণিকের পণ্যশালা, সর্বত্র আজ সর্বগ্রাসী হুতাশন অযুতজিহ্বা বিস্তার ক'রে ধ্বংসলীলায় মাতলেন। পশ্চিমদিগন্ত আগুনে রাঙ্গা হ'য়ে উঠল, ছিন্নভিন্ন রক্তাক্ত শিশুদেহের ওপর দিয়ে দস্যুরা তাদের মৃত্যুর রথ লুণ্ঠনের রথ টেনে নিয়ে গেল। রোরুদ্যমানা জননীদের মুখে মারল চাবুক ; গৃহহারা অসহায়দের, রুগ্নদের, বৃদ্ধদের মাথার ওপর আকাশ থেকে ফেলল বোমা। পোল্যাণ্ড থেকে ফ্রান্স, নরওয়ে থেকে আফ্রিকা থরথরিয়ে উঠল কেঁপে। সেই কাঁপন ছড়িয়ে গেল পৃথিবীময়। মানুষের দুর্জয় লোভ আর প্রমত্ত হিংসা সভ্যতার মুখোষ খুলে নির্লজ্জ তাণ্ডবে নাচতে লাগল ইউরোপে, এশিয়ায়, আট্‌লাণ্টিকে, প্রশান্ত মহাসাগরে। বুদ্ধের ত্যাগ, খৃষ্টের মৃত্যুকে ঘৃণায় উপেক্ষা ক'রে রাক্ষসেরা চীৎকার ছাড়ল। বেলজিয়াম, ফ্রান্স, ডেন্‌মার্ক, নরওয়ে, চেকোশ্লোভাকিয়া, যুগোশ্লাভিয়ায়,—সুমাত্রায়, জাভায়, বোর্ণিও, সিঙাপুরে, মালয়ে, বর্মায়,—বড় কান্নার রোল পড়ে গেল। রাক্ষসরা গিয়ে বললে, মুক্তি দিতে এসেছি। এই ব'লে টুঁটি কামড়ে ধরলে। তারপর একদিন এল বাংলা দেশে কান্নার পালা। এমন কান্না বাংলা আর কোনোদিন কাঁদে নি, এমন মরা কোনোদিন আর মরে নি, ছিয়াত্তরের মন্বন্তরেও নয়। বঙ্গ জননীর দ্বারে দ্বারে "একমুঠো ভাত দে মা"—এই নিষ্ফল প্রার্থনা জানাতে জানাতে পথ হেঁটে হেঁটে চলে গেল বাংলার নরনারী ক্ষুধা নিবারণের দেশে। কলহ করল না, দাঙ্গা করল না, অভিশাপ দিল না। শুধু মরে গেল।

সেই দারুণ দুর্দিনে আমরা নিজেদের কি আত্মপরিচয় দিয়েছি ? দেশের ইতিহাসে কলঙ্কের কালিতে লেখা থাকবে সেই লজ্জাকর কাহিনী। আমরা নিজেদের দায়িত্ব পরের ঘাড়ে চাপিয়েছি, পরকে ভুল বুঝেছি, নিজেকে ভুল বুঝিয়েছি। কিন্তু শাস্তি আমাদের পেতেই হবে। অত্যুগ্র বিষের মতো আমাদের লোভ, আমাদের শঠতা সমাজের স্তরে স্তরে ছড়িয়ে পড়বে। হিংসা রণক্ষেত্র ছেড়ে বাড়ীতে বাড়ীতে, মানুষে মানুষে, স্বামীতে স্ত্রীতে, পিতায় পুত্রে দেখা দেবে। যে-অন্যায়ের পাঁচীল তুলেছি, ঈশ্বর আমাদের বুক দিয়ে ঠুকে ঠুকে সে পাঁচীল গুঁড়িয়ে দেবেন তবে ছাড়বেন। তাঁর বিচারে অপরাধের ক্ষমা নেই, মার্জনা আছে। তিনি চোখের জল দিয়ে, বুকের রক্ত দিয়ে আমাদের পাপ মার্জনা করাবেন তবে ছাড়বেন। এখনো যাঁরা মানুষকে ভুখা মেরে রাতারাতি লক্ষপতি হবার স্বপ্ন দেখছেন তাঁরা জানেন না ঈশ্বর তাঁদেরই সন্তান-সন্ততিদের জন্যে কোন্ দুর্ভিক্ষের সাহারা মরুভূমির ব্যবস্থা ক'রে রেখেছেন।......

অনেকদিন ঘুরলেন নমিতা অনেক তীর্থে, মনস্থির হ'ল না। অসীমের মূর্ত্তি তাঁর সমস্ত হৃদয় জুড়ে বসে আছে, কেমন ক'রে ভোলা যায় তাকে! আর এত কাঁদতেও সে পারে! চোখে যে এত জল ছিল, কে জানত এর আগে! নমিতার কতবার মনে হয়েছে, নিষ্ঠুর, নিষ্ঠুর, চাইলে না তুমি আমায়, এমনি ক'রে করলে প্রত্যাখ্যান,—মানব না তোমায়! তুমি আমার কেউ নও, কোনো কালে কেউ ছিলে না, চিনিনে তোমায়! তুমি তো শত্রু, শত্রুর জন্যে কে আবার কোথায় চোখের জল ফেলেছে!—কিন্তু মনকে চোখ রাঙিয়ে শাসন করলেই কি সে শাসন মানে ? ক্লান্তচরণে সারাদিন পথে পথে ঘুরে রাত্রির অন্ধকারের অঙ্কে যখনি নিজেকে সমর্পণ ক'রে দিয়েছেন বিস্মৃতির আশায়, তখনি ভেসে উঠেছে মনে সেই রূপ, সেই হাসি। ঘুমের ওষুধ খেয়ে দেখেছেন, এমন কি চেতনা হারাবার ওষুধও খেয়ে দেখেছেন,—কিন্তু কোনো ফল হয় নি তাতে। এ রকম ক'রে আর কতদিন চলা যায়, এ আগুন যে বেড়েই চলেছে। একি আর কোনোদিন কমবে না! শম্ভু বলেছিলেন, "মা, সময় লাগবে। এখন যেন দগ্‌দগে ঘা। যতই সময় যাবে, ঘা সেরে আসবে, শেষে শুধু দাগটা থেকে যাবে।"—কিন্তু কই, এই তো এক বছর গেল, দুবছর গেল, জ্বালা যে কমে না, ঘা যে সারে না। এমনি করে মন শুধু ছলনা করে কেন ? গদাধরের শ্রীপাদপদ্মে প্রণাম নিবেদন ক'রে যেমন নমিতা উঠে দাঁড়িয়েছেন, অমনি মনে হল,—ওই যে ওরা সবাই রয়েছে দাঁড়িয়ে, ওই যে হাসিমুখে অসীম, আর তারই হাত ধরাধরি ক'রে তাঁর ছায়া—শিশুপুত্রকন্যাগুলি! হাহাকার ক'রে ওঠে মন, যখন এ ভুল ভেঙ্গে যায়।......পুরী সমুদ্রের বেলাভূমিতে যখন সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এসেছে, সহসা মনে হয়েছে, যাই ঘরে ফিরে যাই, ওরা যে সেখানে অভুক্ত বসে আছে তাঁরই প্রত্যাগমনের আশায়!—সঙ্গে সঙ্গেই চুরমার হ'য়ে ভেঙ্গে গেছে স্বপ্ন! হায়রে, কে আবার পথ চেয়ে বসে থাকবে! নিকষকালো সমুদ্রের সাপের ফণার মতো ঢেউগুলি হিস্ হিস্ ক'রে বিদ্রূপ করছে!···আবার কোনোদিন হয়তো কোনো ভাঙা টুকরো, ছেঁড়া কথার সূত্র ধরে ফিরে আসত এক ঝলকে অতীতের স্মৃতি, তার কণ্ঠের ডাকা নাম 'নমিতা দেবী' 'নমিতা'—'নমিতার খঞ্জহংস'—'ঝোঁকের মাথায় যে চলা সেই তো আসল চলা—এমনি কত কি ? টন্‌টন্ ক'রে উঠত বুক, চোখের জল আর বাধা মানত না! এক এক দিন মধ্য রাতে শয্যা ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেন, পথে ছুটে বেরিয়ে যেতেন, নিজের বুকে বারংবার আঘাত করতেন আর বলতেন, "মারো, মারো ঠাকুর, আরো মারো আমায়! তোমার যত আঘাত

আছে সব দিকে আমার মায়ো। বুক যে ভেঙে যায়, তবু তোমার কঠোর ব্রত কি গলে না!"—কেউ শুনত না তার এই কান্না, শুধু শম্ভু চাটুয্যে ছাড়া। অন্ধকারে ভূতের মতন জড়সড় হয়ে বিষণ্ণ শম্ভু, দরদী শম্ভু হু হু ক'রে চোখের জল ফেলত!—আর হয়তো শুনতেন তিনি, যিনি পাঠিয়েছিলেন নমিতার বুকে তাঁর এই বজ্র।

একদিন প্রয়াগের গঙ্গাতীরে শম্ভুকে কে একজন সংবাদ দিলে হরিদ্বারে এক বাঙালী সাধু এসেছেন, নাম তাঁর হরিদাস। তিনি নাকি মানুষের শোক ভোলাবার মন্ত্র জানেন। যাও তাঁর কাছে। শম্ভু নমিতাকে ধরে বললেন, "মা, এত তীর্থ তো ঘোরা হ'ল, এবার চলো।" নমিতা আপত্তি করলেন না। তাঁর কাছে এখানেও যা সেখানেও তাই।

নমিতার দিকে আজকাল আর তাকানো যায় না, এমনি হয়ে গেছে তাঁর চেহারা। কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনে শরীর শীর্ণ, বিবর্ণ,—দেহের সে সুখলালিত লালিত্য আর নেই। কেশ বেশ রুক্ষ মলিন, গায়ের রঙ্ তামাটে, দেখলে হঠাৎ ভিখারিণী ব'লে ভুল হয়। মুখখানি যেন দুঃখের আগুনে পোড় খেয়ে খেয়ে শক্ত পাথর হয়ে গেছে। দাঁতে দাঁত চাপা, মনের কোনো ভাবই আর মুখে প্রকাশ পাবার উপায় নেই। চোখ দুটিতে শুধু অজানা কোন্ জ্যোতির শিখা। মনের কথা তিনি কাউকে বলেন না, শম্ভুকেও না। কারো সঙ্গে কথা ক'ন না। তিনি জানেন, মানুষ হা হুতাশ করে কেবল সহানুভূতির কামনায়। কি হবে তাঁর সহানুভূতি দিয়ে। দুঃখ কি কিছুমাত্র কমবে তাতে! পাবেন কি ফিরে তাকে; যাকে হারিয়েছেন! তাই যত কথা তাঁর মনের সঙ্গে। যখনই আসে চোখে জল, তখনি বিদ্রূপ করেন নিজের মনকে, বলেন, এইরে, আবার ক্রন্দন পর্ব শুরু হ'ল বুঝি! ওরে ভ্রান্ত, ওরে মূঢ়, দেখছিস্ না পৃথিবীটা যেমন যাচ্ছিল ঠিক তেমনি চলেছে,—কী যায় আসে পৃথিবীতে তোর শোকে, কার ধৈর্য্য আছে তোর কথা শোনবার, কে গ্রাহ্য করে, কে গ্রাহ্য করে!······

হরিদ্বারের সেই হরিদাস বাবাজীটি সাধু বটে, কিন্তু গেরুয়াও পরেন না, ছাইও মাখেন না। দু'একটি লোক যারা তাঁকে অন্তরঙ্গ ভাবে জানে তারা নাকি এমন আশ্চর্য্য কথাও বলেছে যে বাবাজী গাঁজাও খান না। অনেকে বিরক্ত হয়ে চলে গেছে, বলে এ বেটা সাধু না হাতী। কিন্তু অন্তরঙ্গেরা বলেন, সাধুজী নাকি মহা পণ্ডিত এবং একদা ছিলেন মহা সম্ভ্রান্ত, মহা ধনবান। সংসার ছেড়ে এসেছেন বৃদ্ধ হয়েছেন বলে, ভোগ আর ভাল লাগল না বলে। কিন্তু বেশীর ভাগ লোক সাধুজী চেয়ে তাঁর চেলাটিকেই ভক্তি করে বেশী. কেননা সে স্বপ্নাদ্য মাদুলী দিতে পারে জলপড়া দিয়ে পুরাণো অসুখ সারাতে এবং হাত গুণতে জানে।

শম্ভু চাটুয্যে ধর্মশালার কাছে একটা কুটুরি ভাড়া করলেন, তারপর খোঁজ করতে করতে হরিদাস বাবাজীর আস্তানা আবিষ্কার ক'রে ফেললেন। ঠিক করে এলেন পরের দিন নমিতাকে নিয়ে আসবেন সকালে, সাধু দর্শনের জন্যে।···

বাবাজী বলেছিলেন কম্বলের আসনে। পরিধানে মোটা খদ্দরের ধুতি, খদ্দরের গলাবন্ধ কোট। গোঁফদাড়ি কামানো মুখ, ভাসা ভাসা বড় বড় চোখ। কি একখানা সংস্কৃত বই খোলা পড়েছিল সামনে, কিন্তু দৃষ্টি ছিল দিগন্ত প্রসারিত। হিমাচলের শিখরে শিখরে তখন মেঘের সমারোহ চলেছে। প্রভাতের আলো এসে মেঘের ওপর পড়েছে, যেন কোন্ বিরাট সিংহাসন পাতা হয়েছে অভ্রভেদী গিরিশৃঙ্গের চূড়ায়, কে যেন এখনি এসে আসন গ্রহণ করবেন সেখানে, জগৎ সংসার রয়েছে তাঁরি প্রতীক্ষায়!

শম্ভু ও নমিতা এসে যখন বাবাজীকে প্রণাম করলেন, তাঁর বাহ্যজ্ঞান ছিল না। কিছুক্ষণ পরে তিনি চমকে জেগে উঠলেন, ওদের অলক্ষ্যে চোখের দুফোঁটা জল মুছে ফেললেন। তারপর নমিতাকে আশীর্বাদ করবার জন্যে মামুলীধরণে হাত বাড়ালেন। এমন তো কত মেয়েই আসে। হঠাৎ চোখ পড়ল নমিতার মুখের দিকে। কি দেখলেন সে মুখে তা সাধুই জানেন। খানিকক্ষণ তিনি কোনো কথাই বলতে পারলেন না। নমিতা একটু তফাতে চুপ করে বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সাধু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, এস, এস, আমার মা এস, ওখানে কেন দাঁড়িয়ে!

সাধুজী কম্বলটা ছড়িয়ে দিলেন, তারই একটি পাশে নমিতাকে বসতে হ'ল। শম্ভু চাটুয্যে আখড়াটি দেখবার জন্যে বাইরে চলে গেলেন। জায়গাটা ভাল, ইচ্ছা ছিল এখানে একটু সুবিধামতন স্থান পেলে ধর্ম-শালার কাছের সেই কুঠারীটা ছেড়ে এখানেই ওঠবার।

সাধু বাবাজীর জন্যে গড়গড়ায় তামাক এল। তামাক টানতে টানতে তিনি বললেন, "সংসার ত্যাগ করলে কি হয়, তামাকটি ত্যাগ করতে পারি নি। লোকে আমায় হরিদাস বাবাজী বলে, কিন্তু আমার আসল নাম তামাকু বাবাজী।—যে তামাক খাই! তোমার নাম কি মা?"

"নমিতা—"

"নমিতা? সার্থক নাম তোমার মা। নমিতাই বটে। তোমাকে দেখেই আমার মনে হয়েছে আমাদের সকলের মধ্যে যে নীরব প্রণাম আছে যেন তোমারি মতন।" তারপর সাধু ডাক দিলেন, "ওহে ভোলানাথ চন্দর, একবার এদিকে দর্শন দিয়ে যাও তো বাপধন।"

ভোলানাথ এল। মাথায় কদম ফুলের মত সোজা সোজা চুল, সবই পাকা। ইচ্ছা আছে চুল দিয়ে জটা তৈরি করবার, কিন্তু এখন বেয়াড়া চুল যে বাড়তেই চায় না! আর সোজা সোজা হয়েই আছে, ঠিক যেন সজারুর কাঁটা। তবে পরিধানে গেরুয়া কাপড়, গেরুয়া রঙের চাদর। চেলাটিকে আর ভুল করবার সম্ভাবনা নেই।

"ভোলানাথ, আজ হাতসাফাই ক'রে কি জোগাড় করলে?" সাধু জিগ্যেস করলেন।

"আজ্ঞে বিশেষ কিছু নয়।"

"তবু শুনি।"

"এই ওর নাম কি সের পাঁচেক আটা। আজ্ঞেই এক রকম ক'রে হবে'খন।"

"ভোলানাথ, এতেও তোমার মনস্তুষ্টি হ'ল না! তোমার লোভটা কিএকটু দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে না বাবা! মনে রেখ, সংসার ত্যাগ ক'রে এসেছ।"

"বাঃ, পাঁচ সেরের কমে চলবে কেমন ক'রে বাবাজী?"

"কেন ভোলানাথ, আমি কি আজকাল দিনে চার পাঁচ সের করে আটা খাচ্ছি! আমার খাওয়ার বহর কি এতই বেড়েছে?"

"আজ্ঞে তুমি কি যে বল বাবাঠাকুর, তার কোনো মানেই হয় না। তোমার আবার খাওয়া! হায় রে আমার পোড়া কপাল!"

"তবে?"

"ঐ যে তিন বাঁক পেরিয়ে সেই ছোট্ট বস্তিটার ধারে সেই ভুনোউলী, খবর পেয়েছি ছেলে পুলে নিয়ে তারা আজ তিন দিন উপোষ ক'রে আছে। আটাটা সেখানেই চালান করেছি।"

"সাবাস্ বাবা ভোলানাথ, আমি তোমার মার্জনা ভিক্ষা করি। স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ, এ অভ্যাসটি ছেড় না। তুমি তোমার এই হাতটান মার্গেই সটান স্বর্গে যাবে। তবে সে কার্য্যটি আমি আছি যতদিন ততদিন তোমায় স্থগিত রাখতে হবে, নইলে আমায় দেখবে শুনবে কে? এখন যাও দিকিনি, তোমার ভাঁড়ারে কি আছে ক্ষুদ কুঁড়ো, চট্ ক'রে এনে দাও, আমার এই মা'টি বড় ক্লান্ত। ওঁকে কিছু খাওয়াতে হবে।"

"তা আনছি বাবাঠাকুর, কিন্তু সেই সঙ্গে তোমাকেও কিছু খেতে হবে।"

"আমি তো এই তামাক খাচ্ছি বাবা। যাও, যা বললুম তাই করো।"

"ঐ তোমার বড্ড দোষ বাবাঠাকুর, কিছু খেতে চাও না।"

ব'লে ভোলানাথ চলে গেল। সাধুবাবাজী আধপাগলা মানুষ, তাঁর কথার ধরণ ঐরকম।

নমিতা বললেন, "আমি কিছু খাবনা বাবা, আমার ক্ষিদে নেই।"

"বাবা বলে ডেকেছ যখন তখন তো কিছু খেতেই হবে মা। ততক্ষণ শোনো, তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। ঐযে দেখলে ঐ লোকটি, ও আমার ভোলানাথ চন্দর। ও আগে ছিল আমার খাস খানসামা। মাইনে পেত কত তা ভুলে যাচ্ছি, কিন্তু মাইনে যাই পাক, উপরি ছিল অনেক বেশী। দুধের সর ফুটো ক'রে পাঁকাটির সাহায্যে ও এমন দুধ চুরী ক'রে খেত যে তা দেখে আমি ওর ভূয়সী প্রশংসা করেছি। অতি যত্নে শিক্ষা করেছিল হাতটান। কিন্তু সে সব হ'ল অতীত ইতিবৃত্ত। এখন ও খানসামাগিরি ছেড়ে একেবারে চেলাগিরিতে প্রোমোশান্ পেয়েছে। ওর আগেকার দিনের প্রভুভক্তি এখন গুরুভক্তিতে দাঁড়িয়েছে। আমার হয়েছে মস্ত সুবিধে! ওকে আর মাইনে দিতে হয় না, তার ওপর ওই এখন আমায় প্রতিপালন করছে! কলাটা মূলোটা, দুধটা আটাটা কেমন ক'রে আদায় ক'রে নিতে হয় দর্শনপ্রার্থী ভক্তদের কাছ থেকে, তার সূক্ষ্ম কৌশল সমস্ত ওর জানা আছে। তার ওপর ওর দয়ামায়াও আছে। শুনলে না মা, ওর ভুনোউলীর কাহিনী?"

নমিতা মনে মনে আশ্চর্য্য হয়ে ভাবতে লাগলেন, এ আবার কেমন-ধারা সাধু!

সাধু বললেন, "আচ্ছা মা, বল দিকিন ফকিরি নিয়েছি কেন?"

"তা তো জানি নে বাবা।"

"এমন সোজা কথাটা জান না। যুদ্ধের হিড়িকে।"

"যুদ্ধের হিড়িকে!" আশ্চর্য্য হ'য়ে নমিতা বললেন। সাধু কি নমিতার অন্তরের সন্দেহ টের পেয়েছেন? তাই কি শ্লেষ করছেন?

"হ্যাঁ মা, যুদ্ধের হিড়িকে। নানা ঝঞ্ঝাট হয়েছে এই যুদ্ধে। চাল পাওয়া যায় না, নুন পাওয়া যায় না, তেল পাওয়া যায় না। কাঁচা জিনিষ ভিটামিনে ভরতি তা জানি, তবু রেঁধে খাবার অভ্যাস তো গেল না। কিন্তু কয়লা পাওয়া যায় না। কয়লা আর হীরে যে একই বস্তু এতদিনে তা বুঝলুম। কিন্তু কোথায় চাল, কোথায় তেল, কোথায় কয়লা ক'রে এই বুড়ো বয়সে আর কাঁহাতক ছুটাছুটি করি! তাই একদিন বুদ্ধি ক'রে সংসার ত্যাগ করলুম। বাস্, আর যায় কোথা! ভক্তবৃন্দ দলে দলে এসে খাবার জোগাতে লেগে গেল। কথায় বলে একের বোঝা, দশের লাঠি। ব্রেড্ প্রবলেম্ সল্ভ্ড্। কিন্তু দেখো মা, কথাটা যেন বাজারে রাষ্ট্র করে দিও না, তাহলে অনেক অংশীদার জুটবে।"

নমিতা হাসতে লাগলেন। আজ কত বছর পরে তাঁর এই হাসি!

ভোলানাথ ছুটি শালপাতায় করে কিছু মিষ্টান্ন এবং ছুটি মাটির ভাঁড়ে ক'রে দুধ নিয়ে এল। বাবাজী বললেন, "মায়ের জন্যে একটু আড়ালে জায়গা ক'রে দাও ভোলানাথ, আমার সামনে খেতে বোধ হয় ওঁর লজ্জা করবে!"

নমিতা উঠে গেলেন।

শম্ভুনাথকে সামনে বসিয়ে খাওয়াতে খাওয়াতে সাধুজী নমিতার সমস্ত পরিচয় জেনে নিলেন। শম্ভু কিছুই বাদ দিলেন না। তাঁর মায়ের কষ্ট যে কোনখানে সে কথা সাধুকে স্পষ্ট করে না জানালে সাধু উপায় নির্দ্দেশ করবেন কেমন করে।

সমস্তটা শুনে সাধু অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে গেলেন। এতক্ষণ ধরে যে লঘুস্বরে আলাপ করছিলেন তার মুখোষ ফেলে দিলেন। শম্ভুকে বললেন, "অসংখ্য জন্মমৃত্যুর মধ্য দিয়ে চলতে চলতেও মানুষের যে চিত্তশুদ্ধি হয় না, মাত্র কয়েকটি বছরেই নমিতার সেই চিত্তশুদ্ধি হয়ে গেছে।" খানিক চুপ ক'রে থেকে জিগেস করলেন, "তোমরা আমার এখানেই থাকতে পারবে না কিছু দিন? তাহলে আমার সুবিধা হয় একটু।"

শম্ভু ঘাড় নেড়ে জানালেন পারবেন। বাবার দয়া হয়েছে বোধ হয়, এবার নমিতার মনে শান্তি ফিরে আসবে হয়ত। তবু একটু ইতস্ততঃ করে শম্ভু জিগেস করলেন, "কিন্তু তাতে আপনার সাধন ভজনের বিঘ্ন হবে না তো বাবাঠাকুর?"

সাধু হেসে জবাব দিলেন, "না হবে না। মানুষের মধ্যে প্রসুপ্ত ভগবানকে জাগিয়ে তোলাই তো সব থেকে বড় সাধন।"

নমিতা এলে সাধু তাঁকে বললেন, "মা, তোমাকে আমার অত্যন্ত প্রয়োজন। তাই কিছুদিন যদি আমার এখানে থাকতে......বল, থাকবে কি মা?"

নমিতা অবাক হয়ে গেলেন। তারপর বললেন, "থাকব বাবা।"

নমিতাকে আবার কারো কোনো প্রয়োজন থাকতে পারে নাকি? যে-জীবন ব্যর্থ হয়ে গেছে, সেই রিক্ত তিক্ত জীবনে কিই বা সার্থকতা! দূরে তুষারমৌলি গিরিশৃঙ্গে সূর্য্যকিরণ সহস্র ধারায় প্রতিফলিত হচ্ছিল, আকাশ গঙ্গা ভৈরব নাদ করতে করতে শিলাপ্রস্তর আলোড়ন ক'রে চলেছে, দেবদারু বনের শাখায় প্রশাখায় এ কি অস্ফুট মর্ম্মরধ্বনি জেগেছে। এসব তো ঠিক তেমনি আছে, সেই রামায়ণের যুগেও যেমন ছিল। কিছুই তো হারায় নি! শুধু নমিতাই কি হারিয়ে যাবে! এই প্রকাণ্ড বিশ্বসংসারে তার জন্যে একটুও কি স্থান হবে না!

(ক্রমশঃ)

স্মৃতি

(গল্প)

—শ্রীদিলীপ সরকার

সেদিন কিসের জন্য যেন স্কুল বন্ধ ছিল। দুপুর বেলায় চুপ চাপ বোসে গত জীবনের পাতাগুলি উলটিয়ে যাচ্ছিলাম। শীতের মিষ্টি রোদের সাথে অতীতের মধুর স্মৃতির মালা যেন মনে অপূর্ব্ব আনন্দের দোলা লাগাচ্ছিল। এমন সময় দরজার কড়া নাড়ার শব্দে সচকিত হোয়ে উঠলাম। আমার কাছে কে আসতে পারে তাই চিন্তা করতে করতে যেয়ে দেখি, একটী ছেলে একখানা চিঠি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে চিঠিখানা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলো, ওখানা আমার নাকি? আমি হ্যাঁ বলায় বললো, সে কলিকাতা থেকে আসছে—অনিলের মা এই চিঠিখানা দিয়ে পাঠিয়েছেন। কাল বিকালে অনিল মোটর একসিডেন্টে আঘাত পেয়ে হাসপাতালে আছে। আঘাত গুরুতর, আমি যেন শীঘ্র ওকে দেখতে যাই। জানলাম কাল বিকালে মোহনবাগানের খেলা দেখতে যাচ্ছিল অনিল, খুব জোরে মোটর চালিয়ে, এমন সময় আর একখানা মোটরের সাথে ধাক্কা লাগে। চিঠিখানাতে মাত্র দুই লাইন লেখা। মা রেণু, অনিলের অবস্থা শুনেছ নিশ্চয়। অজ্ঞানের মধ্যে কয়েকবার তোমার কথা বলেছে। শীঘ্র চোলে এসো। —মাসীমা

তাড়াতাড়ি ষ্টেসনে এসে ট্রেন ধরলাম। গাড়ীতে সমস্ত রাস্তা কেবল অনিলের কথাই চিন্তা হোতে লাগলো। এই তো সেদিনের কথা, আমি অনিলের বোনকে পড়াতে যাই। প্রথমদিন অনিলের সাথে আর সবার মতনই আলাপ হয়। তার পরের দিন ও এসেই ভিমা গম্ভীরভাবে বললো, সে ওর বোনকে পড়ান আমার দ্বারা হবে না। আমি নাকি নিজেই নেহাৎ ছেলেমানুষ এবং ওর বোনের মত তখন দুই মেয়েকে পড়ান আমার কাজ নয়। ছাত্রী নাকি আমার হাতে ছেড়ে [illegible] ইত্যাদি। এতে কেমন নতুন ও বাড়ীতে কাজে লেগেছি তার উপর ছাত্রী ঢেঙানো বিস্তাটিতে তখনও হাত পাকে নি—কাজেই কথাগুলো শুনে একটু নার্ভাস্ হোয়ে পড়লাম এবং লজ্জাও পেলাম। এই রকম সামনা সামনি মন্তব্য আমি আশা করি নি, মনে মনে তাই বিরক্তও হোলাম খুব খানিকটা। ওর মা আমার অবস্থা বুঝতে পেরে ওকে ধমক দিয়ে বললেন "যা যা তোর আর ফাজলামী করতে হবে না"। আমাকে বললেন "তুমি কিছু মনে কোর না মা, ও হতভাগা চিরকালই ঐ রকম। আজ বাদে কাল কলেজ থেকে বের হবে, কিন্তু এখনও ছেলেমানুষী গেল না। কাকে কি বলতে হয় না হয়, কিছুই জানে না, জানতে চেষ্টা করে না। কেবল হৈ, চৈ, হৈ-চৈ কোরেই দিন কাটায়। উনিও যেমন হয়েছেন কিছু বলবেনও না, বলতে দেবেন না। বাড়ীতে যতক্ষণ থাকে তাই বোনে যে আমাকে কি উৎপাতই করে, সে মা তুমি কয়েকদিন আসলেই বুঝতে পারবে।" "মা, এটা কি তোমার ন্যায় হোল আমার নামে একজন নতুন ভদ্রমহিলার কাছে খুব খানিকটা কুৎসা কাটলে, কিন্তু আমার গুণের কথাটিতো বললে না? আমার মত এমন ছেলে কয়-জনের হয় একবার খোঁজ নিও তো?" ওর মা হাসতে হাসতে বললেন "তুই যা বাবা এদের পড়াশুনা করতে দে"। বোন বোলে উঠল "তারী তো পড়াশুনায় একটু ভাল তা আবার অত জাহির করা হচ্ছে।" "তুই চুপ কর মা"—মা ও অনিল বেরিয়ে গেলেন। অনিল এবার বি, এ; দেবে। বয়স মাত্র আঠার কি উনিশ—সত্যি একদম ছেলে মানুষই বটে। আমি নিয়মিত পড়াতে যাই। অনিল প্রায়ই এসে কিছুক্ষণ কোরে গল্প কোরে যায়, বাধিক বোনকে জ্বালায়। একদিন গল্প করতে করতে বললো "আচ্ছা আপনাকে কি বোলে ডাকা যায় বলুন তো?" [illegible]

বলতো "কেন আমি যা বোলে ডাকি—দিদিমনি" "যেৎ তুই না হয় ওনার ছাত্রী তাই দিদিমনি বলিস, আমি কেন তা বলতে যাবো। আপনার বয়স কত বলুনতো তার পর ঠিক করা যাবে। আপনি যদি আমার বড় হন তবে না হয় আপনার নামের পিছনে একটা "দি" যোগ করবো, আর যদি সমান কিংবা ছোট হন তবে "দেবী"—কি বলেন? বয়স বোলে ফেলুন। ও সরি—সরি—আপনাদের বয়স জিজ্ঞাসা করাতো আবার অভদ্রতা—মনেই ছিল না—আচ্ছা আপনি ম্যাট্রীক পাস করেন কোন ইয়ারে—১৯৩৬? ও আপনি আজ আমার চেয়ে দুই বৎসরের বড়—সমানই বলতে পারেন। যাক আমার কথার নড়চড় হবে না, কাল থেকে আপনাকে "রেণুদি" বোলেই ডাকবো—আপত্তি নেই তো? যাক, আপনি লক্ষী-ছাড়িকে ভাল কোরে পড়ান—আর বেশী কোরে টাস্ক দিয়ে যাবেন যাতে সারাদিন, শয়তানী না করতে পারে। আমি যাই, এখুনি খেলা দেখতে যেতে হবে—খুব ইম্পর্টেন্ট খেলা আছে আজ। আপনি বুঝি কোনদিনও খেলা দেখতে যান নি? আচ্ছা আমি একদিন আমার কার্ডখানা স্পেয়ার করবো, তবে খুব ভাল খেলায় দিন কিন্তু দিতে পারবো না। একদিন দেখলে রোজ দেখতে ইচ্ছা করবে। ঐ আপনার ছাত্রী হতভাগীকে একদিন নিয়ে গিয়েছিলাম কিন্তু ও একদম বোগলেগ। কিছু বোঝে না—কেবল এদিক ওদিক তাকিয়ে তাকিয়ে লোক দেখলো, তারপর দাদা জল খাবো—দাদা বাড়ী চল। মোহনবাগান—মহামেডান একটা সিরিয়াস খেলা—আমাকে একদম ভাল ভাবে দেখতে দেয়নি। আর যদি ওকে কোনদিন নিয়ে যাই।" "যাও যাও তোমার ও খেলাধুলা আমি দেখতে চাই না, কয়েকজন লোকে মাঠে একটা বল নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করে আর তাই দেখে লোক-গুলোর কি বিশ্রি গলাফাটানো চিৎকার।" বোন বোলে উঠে। "আপনার একদম ভাল [illegible] না [illegible] দিদি—[illegible] বলবেন না?"

"আর সবাই গেঁয়ো ভূত নয়" জবাব দেয় অনিল। "ওরা ভাই-বোন দু'জনই যেন সমান। অনিলের ছেলেমানুষী আমাকে খুবই মুগ্ধ করেছিল। আমাকে একেবারে ও নিজের দিদিই কোরে নিয়েছিল। ওদের মাও ছিলেন খুব ভাল মানুষ, ওদের বাড়ীতে আমি যে একজন মাইনে করা শিক্ষয়িত্রী তা কোন দিনই বুঝতে দেন নি কাউকেও। ওদের ব্যবহারের কথা আমার মনে থাকবে চিরদিন। অনিল প্রায়ই আমার বাসাতে আসতো। ওর কলেজের কাছেই আমার বাসা। কোনদিন হয়তো হঠাৎ এসে বলতো—"রেণুদি চট্ কোরে এক কাপ চা দাও তো তৈয়ার কোরে—বাড়ী যাবার আর সময় নেই—এইখান থেকেই মাঠে যাবো—আজ আবার চ্যারিটি—লাইন কোরে টিকিট করতে হবে।" কোনদিন হয়তো সন্ধ্যাবেলায় ভাই-বোন এক সাথে হুড়মুড় কোরে আমার ছোট ঘরখানিতে এসে আমার হাত ধোরে টানতে টানতে বলতো, "শিগ্‌গির চল, সিনেমায় যেতে হবে—মা গাড়ীতে বোসে আছেন। আমাকে সব সময় ওদের আবদারের জন্য প্রস্তুত হোয়ে থাকতে হোত—না করবার উপায় থাকতো না।

আমার বাসায় আমার এক মাসীমা ছিলেন, তিনি অনিলের সাথে আমার অত মেলা-মেশা পছন্দ করতেন না এবং এটাকে সন্দেহের চোখেই দেখতেন—ভাবে বেশ বুঝতে পারতাম। অনেকদিন তিনি চেপেই ছিলেন। একদিন আর না পেরে সেটা প্রকাশই কোরে ফেললেন। তাই বললেন—কি যে ঐ ছোঁড়াটার সাথে সব সময় করিস্? লজ্জাও করেও না—তোর থেকে না ওর বয়স কত কম?" "ছি! ছি! মাসীমা, ওকে যে আমি আমার ছোট ভাইএর মত স্নেহ করি—ও যে আমাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করে। ওকে দেখেও কি তোমার সন্দেহ হয়?" "রেখে দে তোর ভক্তি শ্রদ্ধা, ও সব আমার জানা আছে—কোথাকার কে না কে—না আছে আত্মীয়তা, না আছে কিছু তার সাথে অত কেন? দিন নেই রাত নেই, যখন তখন ঘুরে ঘুরে আসা—লোকই বা কি বলে?" মাসীমা বকেই চললেন। বাধা দেবার বা কিছু বলার প্রবৃত্তি আর ছিল না—আর বাধা দিলেও যে তিনি থামবেন না—সেটা আমার ভালভাবেই জানা আছে। তাই ও ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বাহিরের ঘরে ঢুকলাম - দেখি অনিল চুপ-চাপ বেরিয়ে যাচ্ছে। ও তবে সব শুনেছে—ইচ্ছা হোল চিৎকার কোরে কাঁদি—অনেক কষ্টে কান্না চেপে ওকে ডাকতে গেলাম—অনিল অনিল—ভাই শোন্ লক্ষীটি, আমার কথা শুনে যা—কিন্তু গলায় আওয়াজ বের হোল না। ও চোলে গেছে রাস্তা পেরিয়ে। ওকি প্রথম থেকেই শুনেছে না মাঝ পথে কেবল মাসীমার কথাগুলোই শুনেছে—ওরে আমি যে তোকে ভুল বুঝিনি তা কি তুই জানিস্? এই প্রশ্নই সব সময় আমার মনে উদয় হোত। লজ্জায় দুঃখে কয়েকদিন ওদের বাড়ীতে পড়াতে যেতে পারলাম না। সব সময়ই অনিলের মুখখানি ভাসতো আমার চোখের সামনে—বিশেষতঃ সেই দিনের ওর সেই বিষন্ন মুখখানি। কতখানি আঘাতই না লেগেছে ওর বুকে। কয়েকদিন পর ওদের বাড়ীতে পড়াতে যেয়ে অনিলকে দেখতে পেলাম না। তার পরও দুই দিন দেখতে না পাওয়ায় ওর বোনকে জিজ্ঞাসা কোরে জানতে পারলাম যে আজকাল অনিল রোজ সন্ধ্যাবেলায় ওর এক বন্ধুর বাড়ীতে পড়তে যায়। ও নাকি আজকাল পড়াশুনায় খুব মন দিয়েছে। যতক্ষণ বাড়ী থাকে পড়াশুনা নিয়েই ব্যস্ত থাকে। কারো সাথে আর আগের মত দুষ্টুমি করে না। সে যে খুবই আঘাত পেয়েছে এবং আমার সাথে আর দেখা করতে চায় না তা বেশ বুঝতে পারলাম। ইচ্ছা হোল নিজেই একবার দেখা করবো—কিন্তু এত লজ্জা হোল যে আর পারলাম না। ছি! ছি! যা শুনেছে তার পর আর কোন মুখে তার সামনে যেয়ে দাঁড়াই। কয়েকদিন পরই নতুন চাকরী পাই। হয়তো আগে হোলে এটা গ্রহণ করতাম না। কিন্তু ওদের বাড়ীতে আর আমার যেতে ভাল লাগতো না। আজ বেশ বুঝলাম ওদের বাড়ীর প্রধান আকর্ষণই ছিল আমার নতুন পাওয়া ছোট ভাইটি—আজ সে আমার কাছ থেকে অনেক দূরে—তাই ওখানে গেলেই মনটা বিশ্রী লাগে। ওদের বাড়ী থেকে বিদায় নিয়ে এলাম নতুন চাকরীতে যোগদান করতে। অনিল ভাই এই হতভাগ্যকে দিদি বোলে গ্রহণ কোরে তুই যে আঘাত পেয়েছিস্ সেটা হয়তো তোর জীবনে খুবই বেশী—। তুই ভাল থাক—তোর মঙ্গল হোক। আর আমার কথা যেন তোর মনে কোন দিন না উদয় হয়।

গাড়ী কখন ষ্টেশনে এসে গ্যাছে বুঝতেই পারি নি। খেয়াল যখন হোল তখন দেখি সবাই নেমে গ্যাছে। হাসপাতালে এসে কেবিন খুঁজে বের কোরে দেখি কেবিনে বেশ ভিড়—তখন ভিজিটিং আওয়ার—তবুও মনটা ছাঁৎ কোরে উঠলো। অনিলের মাথার কাছে ওর বাবা ও মা বোসে নীরবে অশ্রুপাত করছেন। আমাকে দেখে ওর মা ইসারায় ওর মাথার কাছে ডাকলেন। ও তখন অজ্ঞান—অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছে বুঝলাম—ঠিক সময়েই এসেছি। মাথার কাছে বসে ডাকলাম "অনিল। অনিলের কোন সাড়া নেই। অনেক রাতে ও একবার চোখ খুললো—মুখের উপর ঝুঁকে বললাম—অনিল ভাই, আমি তোর রেণুদি। কোনো কথাই সে বললো না—চোখ বন্ধ করল আবার। যতক্ষণ বেঁচে ছিল আর চোখ খোলে নি। "অনিল ভাই চোলে গেলি—কিন্তু আমার কথাতো আর বলা হোল না—তুই কি ভেবে গেলি তা তো আমি জানলাম না। আমি যে তোকে সত্য ভাইএর মতনই ভালোবেসেছি।"

তোজোর সৈন্যেরা ধীরে ধীরে ও চুপি চুপি চিন্দুইন অতিক্রম করেছিল, তারা জাপভো ও নাগা পাহাড়ের উপত্যকায় এসে পৌঁছেছিল। কোহিমার আশেপাশে কয়েকটি পাহাড় ও খাদ তারা দখল করেছিল। নাগাদের তাদের গ্রাম ত্যাগ করে যেতে হয়েছিল। তাদের ঘর বাড়ী জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তাদের কুটির মাটিতে ভেঙ্গে ফেলা হয়েছিল এবং তাদের শূকর, হাঁস, মুরগী, শস্য লুটপাট করে নিয়েছিল। জাপানীরা একেই বলে "ভারত অভিযান"

তারপর দ্রুতবেগে ঘটনা ঘটতে লাগল। এই নামগুলি আপনাদের স্মরণ আছে: জেল পাহাড়, ডি. পি. টী. রীজ, এফ. এস্. ডি. রীজ, পিম্পল এবং সর্বশেষে ডি. সি.র বাংলো। এ লড়াই অত্যন্ত তীব্র হয়েছিল।

কিন্তু আমাদের সৈন্যেরা শত্রুর চেয়ে সংখ্যায় অত্যন্ত কম হলেও শুধু যে শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করেছিল তা নয়। শেষ পর্যন্ত তাদের ধ্বংস করে এই বিপুল জয় অর্জন করেছিল।

ন্যাশনাল ওয়ার ফ্রন্ট কর্তৃক প্রচারিত। AAA 1306

কামিজ ও কলার

কথামত রাজুখুড়ো আর একদিন আসিয়া উপস্থিত। তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইয়া বলিলাম, "খুড়ো, তুমি যে ছাতা না নেওয়া ফ্যাসানের কথাটা সেদিন বোলে গেলে, আমি অনেক ভেবেচিন্তে দেখলুম, তোমার কথাগুলো খুবই ঠিক। ওটা নির্ব্বোধেরই ফ্যাসান।"

খুড়ো ভাল করিয়া একটিপ নস্য লইয়া বলিলেন, "রসরাজ, নির্ব্বোধের ফ্যাসান কেবল ঐ একটাই নয়, আরও বহুৎ আছে। তোমরাও পথেঘাটে চোখ তুলে চলোনা, চললে দেখতে পেতে ওরকম ফ্যাসানের অন্ত নেই। এই একটার কথাই তোমাকে বলছি।

"তুমি লক্ষ্য করেছ কিনা জানিনা, আজকাল আর প্রায় কারোরই কামিজের কলার ঠিকভাবে থাকেনা। সেটাকে উল্টে পেছনদিকে খানিক উঁচু করে দেওয়াই ফ্যাসান হয়ে দাঁড়িয়েছে ছোকরাদের কাছে। যারা কামিজের ওপর কোট পরছে, তাদেরও ঐ একধারা। কোটের ভেতর থেকে কামিজের ওল্টান কলারটা উঁচু হয়ে বেরিয়ে রয়েছে, দেখতে পাবে। এখন নকোড়ে ছকোড়ে থেকে প্রশান্ত সুশান্ত পর্য্যন্ত সকলেই এটাকে একটা মস্ত ফ্যাসান বোলে মেনে নিয়েছে। ছোকরাদের এইরকম কোরে পথে চলতে দেখলে আমার কি মনে হয় জান! মনে হয়, কানটি মেড়ে কলারটা ঠিক করে দি। আর বলি,— বাপু এইটেতেই তোমায় ভাল দেখাচ্ছে।

স্কুল-কলেজের ছেলেদের ত কথাই নেই, কেরাণীবাবুরাও ওটা নকল করেছেন। মেথর, বিড়িওয়ালা, ফেরিওয়ালা, কারিগর ছোকরারাও কামিজ পরলেই কলারটা উল্টে উঁচু করে দেয়। মনে করে, বাবুরা যখন এরকম করেন, তখন এটা নিশ্চয়ই একটা মস্ত ফ্যাসান।

যারা হাফপ্যান্ট পোরে বাইরের কাজে ঘোরাফেরা করে, তাদের ত কথাই নেই, সকলেরই কামিজের কলার উল্টে উঁচু কোরে দেওয়া। যেন কত কাজের লোক, কলারটা সোজা কোরে নেবার পর্য্যন্ত তার সময়ের অভাব। দেখলে হাসিও পায় আবার রাগও হয়।

সেদিন হয়েছে কি জান। আমাদের বিজয়দা অতি ভালমানুষ, ট্রামে চড়ে কোথায় যাচ্ছিলেন। ঠিক আগের সিটে একটি ছোকরা বসেছিল, তার কামিজের কলারটা উল্টান। দাদা আমার মনে করলেন, কলারটা যে উল্টে গেছে তা ছোকরা টের পায়নি। তাই পেছন থেকে বললেন, 'ওমশাই আপনার জামার কলারটা উল্টে গেছে, সোজা কোরে নিন। কোন সাড়া নেই। মনে করলেন, ছোকরা বোধ হয় শুনতে পায়নি! আর একবার যেই বলা ছোকরাত' পেছন ফিরে চোখ পাকিয়ে বোলে উঠল, 'কেন ফ্যাচ ফ্যাচ কোরচেন, ও আমার জানা আছে।' বিজয়দাত' একবারে অবাক। তারপর, গাড়ির ভেতর চারদিকে ভাল করে চেয়ে দেখেন, কেবল ঐ ছোকরারাই নয় আরও ছজন যাত্রীরও কামিজের কলার এরকম ভাবেই ওল্টান। তখন তিনি বুঝে নিলেন যে, ওটা আজকালকার একটা ফ্যাসান।"

খুড়ো একটানা বলিয়াই চলিতেছিলেন, বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "আচ্ছা খুড়ো, এ বদ্ ফ্যাসানটা প্রথমে আমদানী হো'ল কোত্থেকে?" খুড়ো বলিলেন, "হয়তো, কোন খুব কর্ম্মী সাহেব কলারটা যে উল্টে গেছে সেটা লক্ষ্য না কোরে তাড়াতাড়ি কাজে হাজির হয়েছিলেন, সেখানে তাঁর এদেশী নির্ব্বোধ সহকারী মনে করলে এই বুঝি একটা মস্ত ফ্যাসান। সেও তখন নকল কোরে নিজের কামিজের কলারটা উল্টে নিলে। তার দেখাদেখি ক্রমে অন্য নির্ব্বোধেরাও ঐরকম আরম্ভ করলে।

দেশী সাহেব আর ফিরিঙ্গীদের কথা ছেড়ে দিলে, খাঁটি সাহেবদের মধ্যে কিন্তু ওরকম বদ ফ্যাসান তুমি প্রায় দেখতেই পাবে না। আসল কথাটা কি জান, আমাদের জাতটারই হচ্ছে অবনতি। আমরা সাহেবদের দোষত্রুটীগুলোকেই নকল কোরে বাহাদুর হোতে চাই। তাদের যেসব সদ্‌গুণ রয়েছে সেগুলো নকল করবার কোন চেষ্টাই আমাদের নেই। সাহেবদের মত সময়ের জ্ঞান দেশের শতকরা নিরানব্বই জনের কাছেই তুমি আশা করতে পারনা, বিলাত ফেরতা সাহেবী পোষাকধারীর কাছেও নয়।

আমি ত সেকেলে লোক, সাহেবানির কোন ধারই ধরিনা। কিন্তু এই বুড়ো বয়সেও যথাসাধ্য সব কাজ সময়েই করতে চেষ্টা করি। আজ উঠলুম, ঠিক একঘণ্টার মধ্যে কালিঘাটে পৌঁছে একজনের সঙ্গে দেখা করতে হবে।"

রাজুখুড়ো বাহির হইয়া গেলেন।

ভারত উদ্ধার কোম্পানী লিমিটেড

—শ্রীসুবোধ রায়

ভারত উদ্ধার হয় যদি হোক—মোদের হাতে,
নইলে সে-দেশ যাক্‌না চ'লে জাহান্নমে!
দলের যে নয়, ছাই দিও তা'র বাড়াভাতে,
বন্ধু যে নয়, শত্রু সে-জন—রেখো মনে।

রাতকে করো উজ্জ্বল দিন, দিনকে নিশি,
উচ্চরবে উচ্চকিত করো পাড়া।
দল-মাদলের ভীষণ শব্দে ভরাও দিশি,
বিজ্ঞাপনে দেশ-বিদেশে জাগাও সাড়া।

তোমার কথা বুঝবে না যে, মূর্খ অতি,
হেসে তা'রে তুড়ি মেরে দাও উড়িয়ে,
নিজে তুমি বিদ্যা-দিগ্‌গজ গজপতি?
যে বলে তা' মেরে ধ'রে দাও গুড়িয়ে।

শাঁসালো আর বোকা দেখে শীকার ধরো,
ফাঁকা কথার ইন্দ্রজালে ভোলাও তা'রে;
কার্য্যশেষে জাল গুটিয়ে স'রে পড়ো,
সেরা বিদ্যে—যে বিদ্যে কেউ ধ'রতে নারে।

ভিখ্ মেলে না খালি হাতে, খালি পেটে,
খেটে খেটে ম'রে গেলেও হ'বে না নাম,
পরের মেরে গুছিয়ে ব'সো এঁটে সেঁটে,
তার পরেতে তোমার খাটার লাখ টাকা দাম।

দেশহিতৈষী হ'বেই তুমি রাতারাতি,
মনীষীও ক'রবে তোমায় সবাই মিলে;
তোমায় নিয়ে সভায় সভায় মাতামাতি,
ধন্য হ'বে খাতায় অটোগ্রাফটী দিলে!

ভারত-উদ্ধার কোম্পানী এই খুলেছি ভাই,
ভর্ত্তি হ'বে এসো যদি ভালটী চাও,
মোদের দলে এলে তুমি মোদেরি ভা'ই,
নইলে তুমি পাজী-ছুঁচো গোল্লায় যাও!

শক্তিমান পুরুষ—চন্দ্রনারায়ণ রায়

—শ্রীউমেশ মল্লিক

দিগন্ত-বিস্তৃত গঙ্গা। ধরণীকে ধন্য ক'রে পুণ্যসলিলা ভাগীরথী প্রবাহিত হচ্ছে মহাদেবের জটা থেকে। বন্ধন অবস্থা থেকে মুক্তিলাভের জন্য তটরেখার উপর এর আঘাতের শেষ নেই। ভাঁটার টানে নদী যখন মন্দীভূত হয়ে শীর্ণকায় তটভূমিতে তখন এর মৃদু করাঘাত, আবার জোয়ারের জলে যখন পরিপূর্ণ শক্তি—মুক্তিলাভের জন্য তখন নদীর কি সাবলীল তরঙ্গাঘাত! এ যেন নদীর স্বভাবজাত। এই গঙ্গাতীরে একটি নিভৃত পল্লী—সোমড়া। বসবাস অতি অল্প-লোকের। এ দুর্দ্দিন এদের ছিল না। একদিন ছিল যখন গ্রামবাসীরা ব্যবসা-বাণিজ্যে ধনধান্যে পরিপূর্ণ করে তুলেছিল গ্রামখানিকে। কিন্তু দুরন্ত ম্যালেরিয়ার প্রকোপে ও রাক্ষসী নদীর তাণ্ডব নৃত্যে আজ সে শ্রীও নেই সমৃদ্ধিও নেই। বর্ত্তমান শীলেদের বিরাট অট্টালিকা নদীগর্ভজাত। পড়ে আছে কেবল মাত্র কয়েকখানা দালান অভিশাপগ্রস্তের ন্যায় অবনত মস্তকে। বাজারের বুড়োশিবের মন্দির যেখানে সন্ধ্যা-আরতির শঙ্খ-ঘণ্টার মুখরিত শব্দে গ্রাম-বাসীরা চির অভ্যস্তভাবে হাত তুলে বলতো "বাবা বাঁচিয়ে রেখো"—সে মন্দিরও আজ গঙ্গাগর্ভে। হাজারী শীলের বিরাট প্রাঙ্গন যেখানে সারারাত্রি অতিবাহিত হ'ত আমোদ-প্রমোদে সেখানে আজ মৃত্তিকা নির্ম্মিত প্রদীপের ক্ষীণশিখা বাতাসে থরথর করে কেঁপে উঠে। আশেপাশের বিরাট অট্টালিকা-গুলি দাঁড়িয়ে আছে প্রেতপুরীর মত অবহেলায় ও সারমেয়দের প্রবেশ অধিকার ছাড়া সেখানে বিরাজ কচ্ছে এক ভয়াবহ নিস্তব্ধতা।

শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের অভাবে গ্রামের ছেলেদের বিদ্যাশিক্ষা করতে যেতে হয় পাশের গ্রামে—বলাগড়ে। সোমড়া গ্রামেরই এক-জন যুবক বলাগড় স্কুলের শিক্ষকতা করেন। [illegible] পড়েনি। অবিরাম বর্ষণে পিচ্ছিল হয়ে উঠেছে পথ। পথ চলা কঠিন সমস্যা। তরঙ্গায়িত মেঠোপথের কাদা ঠেলে শিক্ষক মহাশয় যখন কোনক্রমে স্কুলে পৌঁছালেন তখন মুষলধারে বর্ষা নেমেছে। চারিধারে নদীর পাড় ভাঙ্গার অবিশ্রান্ত ঝুপঝাপ শব্দ। আজ যেখানে বিরাট মহীরুহ সগর্ব্বে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে আকাশের নীলাভ শূন্যতাকে উপেক্ষা করে, কাল তার চিহ্নটি পর্য্যন্ত নেই। সেখানে থৈ থৈ করছে এক বুক জল।

স্কুলের ছুটীর পর আকাশের গায়ে কোথাও একখণ্ড মেঘের চিহ্নটি পর্য্যন্ত না দেখে আসার পথশ্রান্তির কথা স্মরণ করে মাষ্টার মশাই ঘাটের পথে এগিয়ে চললেন। কিন্তু গঙ্গার রুদ্রমূর্ত্তি দেখে তিনি হলেন হতাশ্বাস। উন্মাদিনী গঙ্গার সে কি কলরব! কোনরূপে একমাত্র মাঝিকে শতপ্রলোভনে সম্মত করে গঙ্গার বুকে যখন নৌকাটি ভাসতে লাগলো তখন ধীরে ধীরে মিলিয়ে-যাওয়া তটরেখার সঙ্গে রোদও মিলিয়ে এসেছে। আরোহী মাত্র দু'জন—যুবক ও মাঝি। অবিশ্রান্ত নদীর আর্ত্তনাদের মধ্যে নৌকাটি মোচার খোলার মত অসহায়ভাবে ভাসতে লাগলো। আকস্মিক মৃদু শীতল বাতাসের শিহরণে যুবকটি চমকিত হয়ে উঠলেন! স্বচ্ছ আকাশের এক প্রান্তে তখন মসীরেখার মত একখণ্ড মেঘের আবির্ভাব হয়েছে। যুবকটি চিন্তান্বিত হয়ে উঠলেন অনাগত ভবিষ্যতের উগ্রমূর্ত্তি ভেবে। বাতাসের প্রবলতার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে ক্ষুদ্র মসীচিহ্নটি ধারা আকাশটাকে ভরিয়ে ফেললো। সুরু হল নদীর মাতামাতি। আচম্কা দম্কা বাতাসে নৌকাটি দুলে উঠলো। বাতাসের প্রবলতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সুরু হলো নৌকার দোলন। অকস্মাৎ নৌকার দোলানীতে একবার মাঝির হালটা হল হস্তচ্যুত। চোখের নিমেষে কুমোরের চাকার মত অপ্রত্যাশিত ভাবে নৌকাটা পাক্ খেতে লাগলো। আরোহীদের বিরাট পরিহাস করে মুহূর্ত্তের মধ্যে অতল তলে তলিয়ে গেল।

* * *

অত্যধিক পরিশ্রমের পর যখন আরোহী যুগল কোনপ্রকারে ভেসে উঠলো তখন গঙ্গাবক্ষে বইছে বিষাদভরা সান্ধ্য বাতাস। স্রোতের গায়ে গা ভাসিয়ে তারা ভেসে চলেছে। মাথার উপর সুরু হল আবার অজস্র বর্ষণ। পৃথিবীর বক্ষে আঁধারের ঘন আচ্ছাদন পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছেদের সৃষ্টি করেছে। ঘন ঘন মেঘ গর্জ্জনও ক্ষিপ্ত নদীর মত্ততায় এমন এক শব্দের সৃষ্টি হয়েছে যাতে পরস্পরের কথা শুনা যায় না। এভাবে কয়েক মাইল ভাসার পর বর্ষণ যখন শান্তভাব ধারণ করলো তখন প্রবল স্রোতের মধ্যেও তারা পরস্পরের সান্নিধ্যে এসে পড়েছে। স্রোতের প্রখরতায় উভয়ের জীবন-মরণ যুদ্ধে যথেষ্ট প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করলো। অল্পক্ষণের মধ্যেই স্রোতের বিরুদ্ধে সন্তরণে বৃদ্ধ মাঝির অবস্থা হয়ে উঠলো শঙ্কাকুল। কষ্ট হতে লাগল তার শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে। ক্রমে দেহের সমস্ত মাংসপেশীগুলো হয়ে এল অবসন্ন। অচৈতন্যের মত সে একবার জলে ডুবছে আবার বহু চেষ্টায় কোনরূপে নিজেকে ভাসিয়ে তুলছে। মাঝির আসন্ন বিপদ বুঝে যুবকটি নদীর প্রবল টানের মধ্যেও এগিয়ে এল। মাংসপেশীবহুল এক হাতে মাঝির দেহসংলগ্ন করে তিনি এগিয়ে চললেন। এভাবে ক্রমাগত ৪ মাইল বিপরীত স্রোতে সন্তরণে যুবকের অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠলো। স্নায়বিক অবসাদে সর্ব্বশরীর বাঁশপাতার মত কাঁপছে। এগিয়ে যাওয়ার দুঃসাধ্য প্রচেষ্টায় শরীরের স্নায়ুগুলি হয়ে এল অবশ। হতাশায় মন ভোরে উঠলো। মুক্তিলাভের আকুল আগ্রহে অমানুষিক শক্তির ফলে এক হাতে মাঝিকে নিয়ে যুবক সাঁতরে চলেছেন। এভাবে জীবনযুদ্ধে তারা যখন ঘাটের উপর স্রোতের ঘায়ে আছাড় খেয়ে পড়ল তখন মাঝি সম্পূর্ণ অচেতন, যুবকের অবস্থাও অনুরূপ। বহু চেষ্টায় দুজনে কিন্তু বেঁচে উঠে।

যুবক বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতীছাত্র তদানীন্তন চন্দ্রনারায়ণ রায়, এম-এ বি-এল। গোল্ড মেডেল প্রাপ্ত. এম-এতে প্রথম স্থান সংগ্রহকারী। পরিশেষে ওকালতিতে ইনি যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করেন।

ছুটির ঘন্টা

পরিচালক শ্রীবিজনকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

বিজনদার চিঠি

আমার আদুরে ভাই-বোনেরা,

যারা এখনও নতুন বছরের চাঁদা পাঠাওনি, তারা তা পাঠাতে দেরী করো না।

বহুদিন থেকে আমার কাছ হ'তে তোমরা গল্প শুনতে চাইছো, কিন্তু তা' না শোনাতে পারার জন্যে অনেক অভিমানপূর্ণ পত্রও তোমাদের কাছ থেকে আমি পেয়েছি।...... একটা কথা তোমাদের বলে রাখি যে, আমার সম্পূর্ণ ইচ্ছে এই যে, তোমাদের আসর তোমাদেরই লেখাতে বোঝাই থাক, আর সেই চেষ্টাই আমি সর্ব্বদা করি, তাই নিজে তোমাদের জন্যে গল্প লেখার অবসরও পাই না।...সেদিন একটু অবসর পেতেই তোমাদের আব্দার যে রেখেছি তার প্রমাণ এবারের আসরে তোমাদের জন্যে আমার লেখা গল্পটা দেখলেই বুঝতে পারবে।...এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো যে, বহু ভাই-বোন পৃথকভাবে আমায় জিজ্ঞাসা করে থাকো যে, আমি কাদের বেশী ভালোবাসি? ভায়েদের না বোনেদের?... ফলে তোমাদের প্রশ্নের চাপে আমি বেশ একটা কঠিন সমস্যায় পড়ে গিয়েছি। সেই সমস্যার সমাধান করেছি আজকের ঐ গল্পের মধ্য দিয়ে।... অতএব আজ আশা করি তোমরা সকলেই বুঝবে যে, ভাই-বোন সকলকেই আমি সমান ভাবে খুব বেশী ভালোবাসি।...আজ আসি, স্নেহ নিও।

তোমাদের 'বিজনদা'

সমস্যার সমাধান

—শ্রীবিজনকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

ছুটির দিন চাকুরির চিন্তা আজ আর নেই, তাই মন দিয়ে কবিগুরুরলেখা খ্যাতনামা একখানা উপন্যাস পড়ছিলাম, এমন সময় জড়িয়ে ধরে বল্লে: বড়মামা, তুমি আমাকে বেশী ভালোবাস, না দাদাকে বেশী...ভাগ্নী ঝরণাকে বাধা দিয়ে তা'র দাদা অর্থাৎ আমার ভাগ্নে রতন বল্লে: তুমি আমাকেই সবচেয়ে বেশী ভালোবাসো, না বড়মামা? ......উপায় নেই! আজকে এদের দুজনের হাত থেকে বাঁচার মত উপায় তো কিছুই আমি খুঁজে পাচ্ছি না। তাই দু'জনকে সস্নেহে আমার দু' বাহুর সাহায্যে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে হেসে বল্লাম: দু'জনকেই খু-উ-ব ভালোবাসি!...আমার উত্তর শুনে যে ওরা দুজনের একজন খুসী হ'লো না তা' ওদের মুখ দেখেই বেশ বুঝতে পেরেছি।...তখন নিজেই হাসিমুখ করে জিজ্ঞেস করলাম: বিশ্বাস হলো না আমার কথা?

না!...মুখ ভার করে রতন আর ঝরণা আমার কথার উত্তর দেয়। মনে মনে বেশ বুঝতে পারলাম যে, আমার দুই ভাগ্নে-ভাগ্নীর ভালোবাসা থেকে এখুনিই আমি বঞ্চিত হবো। তাই সত্যি কথাটা বোঝাবার জন্যে বল্লাম: বেশ সত্যি কিনা আমার কথাটা শোন: এই গল্পটা শুনলেই বুঝতে পারবে আমার কথাটা ঠিক কি না!......গল্পের নাম শুনলে ওরা আনন্দেতে ভাত খাওয়া পর্য্যন্ত ভুলে যায়। তাই খুসী হয়ে বল্লে: বেশ প্রমাণ করে দাও গল্প বলে!...আমি গল্প বলতে আরম্ভ করলাম...বেশ শোন তবে,... একদিন হঠাৎ "জামা"র সঙ্গে "জুতো"র ঠিক তোদেরই মত ঝগড়া বেঁধে গেল এই নিয়ে যে, তা'দের দু'জনের মধ্যে লোকে কা'কে বেশী ভালবাসে। জুতো বলে— "আমায় বেশী।" জামা বলে—"আরে, থাম্, তোর চেয়ে আমায় মানুষেরা অনেক বেশী

: "কেমন করে তা বুঝবো, তার প্রমাণ তুই দে?" জুতো জামাকে ঐ বলে প্রশ্ন করে।...জামা ওর উত্তর হাসিমুখেই দেয়: "তোর থেকে মানুষেরা যে আমায় বেশী ভালোবাসে তার হাজার হাজার প্রমাণ আছে। তা' ছাড়া জগতের সবাই তাই-ই বলবে।"

: "ওসব বাজে চালাকিতে আমি ভুলছি নে। আমি তো'র কাছ থেকে তা'র প্রমাণ চাই।" জুতো বলে।

জামা অবজ্ঞার হাসি হেসে ওর কথার উত্তর দেয়—"আরে এতো সোজা কথা; দেখ না, মানুষেরা তোর চেয়ে আমায় বেশী ভালোবাসে বলেই তো তারা আমাদের তাদের গায়েতে স্থান দেয়, আর তোকে তারা স্থান দেয় তাদের পায়েতে।"...কথা ক'টা বলে জামা একবার দুষ্টুমীর হাসি হেসে সগর্ব্বে একটা দৃষ্টি হানলো জুতোর দিকে।...ওদিকে জুতো বেচারা আর ওর বিরুদ্ধে কোন যুক্তি দেখাতে পারে না, তাই অপমানে লাল হয়ে উঠে মুখটা নীচু করে চুপটী করে দাঁড়িয়ে রইলো। জামা তো জুতোর ঐ অবস্থা দেখে গলা কাঁপিয়ে হো-হো-করে হেসে উঠে ওর অপমানের ভারটা আরো বাড়িয়ে দিতে লাগলো।...

ভগবান বুঝি মুখ তুলে জুতোর দিকে চাইলেন, তাই ঠিক সেই সময় এই রাস্তা দিয়ে "ছড়ি-মশাই" সান্ধ্য-ভ্রমণে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ জামার এমন হাসি, আর জুতোকে ওমনি মুখ বুঁজে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ব্যাপারটা যে শুধু হাস্যকর নয় তা' বুঝতে তাঁর বেশী দেরী হলো না। তাই তিনি বিজ্ঞের মতই ওদের দু'জনকে জিজ্ঞেস করলেন—"ব্যাপার কি ভায়ারা? হঠাৎ

জামা ঠাট্টা করে তেমনি হেসেই উত্তর দেয়—"আর বলো কেন! ব্যাপারটা আমি আর কি বলবো, জুতোই বলুক তোমাকে।"

ছড়িমশাই বল্লেন—"বেশ তো জুতো-ভায়া, তুমিই বলো তো হে ব্যাপার কি?... কিন্তু তোমায় তো ভায়া দেখে যেরকম চিন্তিত মনে হচ্ছে তাতে মনে হয় তোমার যেন অন্ন-সমস্যা এসে হাজির হয়েছে।"

"না দাদা, আজ আমার মনে হয় অন্ন সমস্যার থেকেও যদি বড় কিছু সমস্যা থাকে তা' আমার মাথার মধ্যে এসে ঢুকেছে। তাই আমি এতো চিন্তিত।" জুতো ছড়ি মশাইকে ঐ কথা বলে তারপর সমস্ত ঘটনাটা জানালো। ছড়ি-মশাইও সব কথা শুনে বিজ্ঞের মত বল্লেন—"তাই তো ভায়া, তোমার সমস্যাটা যে ভীষণ!...আচ্ছা দেখি এর সমাধান চেষ্টা করে আমি কিছু করে দিতে পারি কি না।"

কৃতজ্ঞতার স্বরে জুতো সবিনয়ে বল্লে—"দাদা, দেখুন একবার আমার মানটা যাতে থাকে।" জুতোর কথা ক'টা শুনে আবার জামা হো-হো করে হেসে উঠে বল্লে—"আজ ওর বিপদ থেকে ওকে রক্ষে করো ছড়ি-ভায়া।..."

ছড়ি-মশাই বল্লেন—"চলো তিনজনে মিলে সান্ধ্য-ভ্রমণটা সেরে আসি, আর পথ চল্‌তে চল্‌তে ও সম্বন্ধে কথা বলা যাবে 'খন। দেখি জুতো-ভায়াকে আজ কিছু সাহায্য করতে পারি কি না।'...তিন জনে এক সঙ্গে সান্ধ্য-ভ্রমণে বার হ'লো। পথ চল্‌তে চল্‌তে ছড়ি-মশাই বল্লেন—"দেখ ভায়া, মানুষেরা তোমাদের দুজনকে সমানভাবে ভালোবাসে। তোমরা নিজেরাই কেবল তাদের ওপর সন্দেহ করে বেড়াও।"

"তা কেমন করে হয়?" জামা রেগে উঠে ছড়ি-মশাইকে প্রশ্ন করলো।

—"প্রমাণ চাও?" হাসি মুখে ছড়ি মশাই জিজ্ঞেস করলেন। আরো রেগে উঠে জামা জানালো—"নিশ্চয়ই!"

...ছড়ি মশাই বিজ্ঞের হাসি হেসে বল্লেন—"রেগো না ভায়া; এই দেখো না, মানুষের কাছে আমার স্থান তা'দের হাতের মুঠোর মধ্যে। তাই বলে আমি কি বল্‌বো যে, তোমাদের চেয়েও আমি কি তাদের কাছে বেশী প্রিয়?...তা' বল্‌বো না, কারণ আমার স্থান মানুষের কাছে ঐ খানেই, ওখানে ছাড়া তাদের দেহের অপর কোথাও স্থান হ'লে আমি তা'দের কোন রকম সাহায্যই করতে পারবো না। ঠিক তেমনই মানুষের কাছে জুতো ভায়ার স্থান তাদের পায়ে, আর ভায়া তোমার স্থান হচ্ছে তাদের গায়ে।..."

—"ব্যাস, আর বল্‌তে হবে না। জুতোর স্থান মানুষের পায়ের উপযুক্ত, অতএব তা'রা ওখানেই ওর স্থান দিয়েছে। এই তো মানুষেরা ওকে ভালোবাসে?" বলে জামা আবার অবজ্ঞার হাসি হেসে কৌতুক-দৃষ্টিতে জুতোর দিকে চেয়ে দেখলো।...এবারে কিন্তু ছড়ি-মশাই বেশ ধমকানির স্বরেই জামাকে বল্লে—"ওহে ভায়া থামো, আগে আমার কথাটা শেষ করতে দাও, তারপর যত পারো উত্তর দিও আর হেসো।"

"বেশ, বলো।" হাসি থামিয়ে জামা বল্লে।

"কিন্তু যে প্রমাণ তুমি দেখাচ্ছো, তাতে

গায়ের জোরেই কেবল বলা চলে যে, মানুষেরা জামাকে জুতোর থেকে বেশী ভালোবাসে। আমি কিন্তু তা' স্বীকার করি না। কেন জানো?......আজ যদি তোমাকে মানুষেরা বলে যে, জামা, আমি তোমায় জুতোর থেকে বেশী ভালোবাসি, অতএব খালি পায়ে এ কাঁটাবোনের পথ দিয়ে কেমন করে যাই বলো, এখন তুমি আমার পা' দুটোকে কাঁটার হাত থেকে বাঁচাও দেখি; কিম্বা জুতোকে যদি বলো যে তোমাকে আমি বেশী ভালোবাসি, অতএব আমাকে খালি গায়ের জন্যে শীতের হাত থেকে বাঁচাও দেখি! পারবে তোমরা কেউ মানুষের ভালোবাসার সে প্রতিদান দিতে?" বলে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ছড়ি-মশাই জামার মুখের দিকে চাইলেন।...জামা নিরুত্তর দেখে জুতো উত্তর দিলো—"তা' ঠিক। ওর কাজ আমিও করতে পারবো না, আর আমারও কাজ ও করতে পারবে না।"

"এখন বুঝতে পারছো তো যে, মানুষেরা আমাদের সকলকে যথোপযুক্তভাবে সমান ভালোবাসে। তবে তাদের দেহকে যেমনভাবে আমরা সাহায্য করতে পারি, আমাদের ক্ষমতানুসারে তেমন আসনেই তারা আমাদের বসিয়েছে বলে ছড়ি-মশাই বিজ্ঞের হাসি হাসলেন।

"ভাগ্যিস ছড়িদা' তুমি এসে পড়েছিলে তাই না রক্ষে। চলো রাত হয়ে আসছে ফেরা যাক্।...আরে, জামা ভায়া একটু তাড়াতাড়ি পা চালাও।" বলে সানন্দে জুতো তার দু'হাতে জামা আর ছড়ি মশাইয়ের হাত ধরে তাড়াতাড়ি ফেরার পথে পা বাড়ালো।...

* * *

জুতোর সমস্যার সমাধান হ'লো বটে, কিন্তু আমার সমস্যার সমাধান এখনও হয়নি। আমার গল্প যেই শেষ হ'লো তখন ঝরণা জিজ্ঞেস করলো: ওসব গল্প আর শুনতে চাইনা, এখন বলো আমায় তুমি বেশী ভালোবাসো কিনা?

আমি হেসে আমার ভাগ্নী ঝরণার গালে এক স্নেহ-চুম্বন বসিয়ে দিয়ে বল্লাম: নিশ্চয়ই, খু-উ-ব বেশী ভালোবাসি আমার এই ছোট্ট মাকে। তোমায় না ভালবাসলে আমি সেদিন বাঁচবো কেমন করে, যেদিন তোমার দিদিমা রাগ করে আমায় ভাত বেঁধে খেতে দেবে না। সেদিন তোমার এই ছেলেকে তুমিই ভাত বেঁধে খাইয়ে তো বাঁচাবে। কেমন, সে কথা কি আমি ভুলতে পারি? এমন লক্ষ্মী-মা এ জগতে কার আছে?

...ঝরণা তার মামার ওপর মহাখুশী হয়ে উঠলো। এদিকে আর একজন কিন্তু অভিমানে তার অন্তরের মধ্যে গুমরে মরছে। সে যে আমার ভাগ্নে রতন একথা আশা করি তোমাদের আর বলে দিতে হবে না। এবারে আমায় সে চুপ করতে দেখে গুরুগম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলে: কি মামা, আমার কথার যে উত্তর দিলে না? তা হলে কি আমাকে তুমি বেশী ভালোবাস না?...এবারে রতনের গালে এক স্নেহচুম্বন বসিয়ে দিয়ে বল্লাম: ওরে বাবা, তোমাকেও যে খু-উ-ব ভালোবাসি। তোমার দাদামশাই যদি কোনদিন তোমার এই ছেলেকে তাড়িয়ে দেন, বা তোমার এই ছেলে যখন বুড়ো হয়ে যাবে তখন তুমি রোজগার করে নিয়ে আসবে ছেলের জন্যে কত টাকা, কত জিনিসপত্র!

আর আমার ছোট্ট মা রেবে আমায় বেঁধে। তোমাদের দুজনকেই যে আমি ভাই খু-উ-ব বেশী ভালোবাসি।...

আমারও সমস্যার সমাধান যে এবারে হ'লো তা' বেশ বুঝতে পারলাম, কারণ ঝরণা আর রতন দুজনেই সানন্দে আমার গলা জড়িয়ে ধরে আমারই বুকের মধ্যে মাথা রাখলো। আমি দুজনের মাথায় সস্নেহে হাত বুলাইতে লাগলাম।

পূজায় আমার অভিজ্ঞতা

জ্যোতির্ম্ময় গঙ্গোপাধ্যায় (১০৪৩)

পূজায় নতুন জুতো কিনতে হ'বে, সবাই কিনছে; কিনতেই হইবে বইকি একজোড়া! দাম বেশী হ'লে আর কি করা যাবে। পুজোয় নতুন কাপড় আমার সঙ্গে একজোড়া নতুন জুতো না হ'লে আর কি সবার সামনে বের হওয়া চলে?

এ দোকান সে দোকানের পর কলেজ ষ্ট্রীটের কোন একটা নাম-করা দোকানে এসে শেষ পর্য্যন্ত ঢুকলাম, পছন্দ মত এক জোড়া জুতো কেনবার আশায়।

বসুন, বসুন—যথেষ্ট আদর আপ্যায়নের সঙ্গে খরিদ্দারকে বসান হচ্ছে। নিজের পছন্দমত একটার পর একটা জুতোর নমুনা দেখাতে বলছি। হঠাৎ এক সময় কানে এলো প্রচণ্ড এক ঝলক হাসির আওয়াজ, আর সে'টা মিলিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই এই কথাগুলো কানে এলো: যান্ মশাই ফিরিওলাদের কাছ থেকে কিনুন গে যান্—বেশ সস্তায় পাবেন...কি ব্যাপার দেখবার জন্যে পিছনে চেয়ে দেখি এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক আর তার সঙ্গে চার-পাঁচটি ছোট ছোট ছেলে মেয়ে। ভদ্রলোককে দেখে বুঝলাম জুতোর দাম সম্বন্ধে নিজের অনভিজ্ঞতার জন্যেই তিনি যেন এতগুলো খরিদ্দারের সামনে বেশ অপদস্থ হয়েছেন। আর ছেলেগুলোর সবার নগ্ন পা দেখলেই বোঝা যায় জুতো তাঁদের একান্তই প্রয়োজন। ছেলে মানুষ হলেও সব যে তাঁদের [illegible] তা' তাঁদের মাথার চুল থেকে পায়ের আঙুলের নখ পর্য্যন্ত সব কিছুই প্রমাণ করছিল!

আশ্চর্য্য! এমনি সময় আবার এক-জনকে উপলক্ষ্য করে দোকানদারকে বলতে শুনলাম, আসুন, আসুন—কি ভাগ্যি! কত দিন পরে—এই ছোঁড়া, দু'খানা চেয়ার এনে দেনা বাবু সাহেবকে...আমার দৃষ্টি গিয়ে পড়ল এবার সুট পরা একটি ভদ্রলোক ও মিলিটারী সাজে সুসজ্জিত ছোট একটি ছেলের ওপর, ভদ্রলোক হেসে দোকানদারকে বলেন: এই—দেখুন না বায়না ধরেছে... কিনতেই হবে। এই—সেদিন কিনলে এক জোড়া আজ বোধ হয় এক সপ্তাহও—। ওকে বাধা দিয়ে দোকানদার হেসে বলে উঠলো: তা ছেলে মানুষ ওরা, বাবু সাহেবের মত পুজোয় কিনবে বই কি এক-জোড়া!

আমার পছন্দমত জুতো না পাওয়ায় দোকান পরিত্যাগ করতে আমি বাধ্য হলাম।

রাস্তায় চলতে চলতে দোকানীর সমস্ত কথাগুলো আর তার ব্যবহারের কথা ভাবতে লাগলাম। নিজের চোখকেও অবিশ্বাস করতে পারি না।

এই সময়টুকুর মধ্যে পূজায় যে অভিজ্ঞতা লাভ করলাম—তা জীবনে কখনও ভুলতে পারব না।

—একজন প্রয়োজনেরও অতিরিক্ত পাচ্ছে, আর একজন সামান্য 'একান্ত প্রয়োজন টুকু' থেকেও বঞ্চিত! অথচ দুজনেই মানুষ—দুজনেই ছোট ছেলে—দুজনেই একই হাতে গড়া!

নারীলোক

পরিচালিকা: হিরন্ময়ী দেবী

প্রশ্ন

মানব সকল জীব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মানুষের মৃত্যু হইলে পর কত বৎসর পরলোকে অশরীরি দেহে অবস্থান করে ফিরে আসে? কোন আত্মার যদি ইহলোকে পুনরায় জন্ম হয়, ইহা কি তাহার গত জন্মের সংস্কার অনুযায়ী? আত্মা যখন অমর এবং পরমাত্মা র অংশবিশেষ, তবে লোকে দেহান্তর হইলে শোক প্রকাশ করে কেন? স্বপ্ন কি? স্বপ্ন কোন শক্তির সাহায্যে দৃশ্যমান হয়।

কুমারী ভারতী সাধু বি, এ,
c/o শ্রীফণিভূষণ সাধু এম, এ, বি, এল
রামচন্দ্র চ্যাটার্জ্জী লেন, চোরবাগান,
কলিকাতা।

শোভনা সমর্থ
ও পৃথ্বীরাজ
নল দময়ন্তী
ভূমিকায়—
নায়ামপলি
ত্রিলোক
ডেভিড
নিম্বলকর
গুঞ্জাল
সংগীত
রামচন্দ্র পাল
• JANAK PICTURES • 136 GIRGAUM ROAD • BOMBAY 4 •

খেলার মাঠে

পরিচালক:
শ্রীউমেশ মল্লিক, বি-এ

ইষ্ট ইণ্ডিয়া লন টেনিস চ্যাম্পিয়ানশিপ প্রতিযোগিতাকে ভারতের ওয়েম্বলডন প্রতিযোগিতা বলে গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ফলে যে ভারতব্যাপী উত্তেজনার সৃষ্টি হয় একথা বলাই বাহুল্য। বাঙ্গালী যে ক'জন খেলোয়াড় এতে যোগদান করেছেন তাঁদের মধ্যে যারা উল্লেখযোগ্য তাঁরা স্ব স্ব প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধে কৃতিত্বপূর্ণভাবে জয়লাভ করেছেন। দিলীপ বসু টেনিসক্ষেত্রে বাঙ্গলা দেশের একমাত্র খেলোয়াড় যার সুনাম ভারতব্যাপী। গতবৎসর এ খেলোয়াড়টি ইষ্ট ইণ্ডিয়া লন্ টেনিস অনুষ্ঠানে প্রসিদ্ধ মার্কিণ খেলোয়াড় হল সারফেসের কাছে ফাইনালে পরাজয় বরণ করেন। এবৎসর আশা করি দিলীপ বসু তার সুনাম অক্ষুণ্ন রাখতে পারবেন। ইণ্ডিয়ার ১নং খেলোয়াড় ঘউস মহম্মদ এ প্রতিযোগিতায় যোগদান না করায় অনেকে হয়তো আশাও করে আছেন দিলীপ বসুর ভাগ্যে এবার গৌরবটিকা লাভ হওয়াও অসম্ভব নয়। কয়েকটি বাঙ্গালী খেলোয়াড় আর, ব্যানার্জ্জী ও জে, এন, ব্যানার্জ্জীর কাছে আমরা আরো কিছু আশা করেছিলাম। ডাঃ পি, কে, সেন এবং তাঁর ভ্রাতা মিঃ পি, কে, সেনও উল্লেখযোগ্য প্রতিযোগী হিসাবে যোগদান করেন। ডাঃ পি, কে, সেন বিলাতে এবং জার্ম্মানীতে যথেষ্ট উৎকর্ষের পরিচয় দিয়েছিলেন। কিন্তু এখানে ডাবলসে তারা পরাজিত হয়েছেন প্রতিপক্ষ কর্পোরাল ওয়েন এবং ডিক্ রিচার্ডস-এর কাছে। টেনিস ক্ষেত্রে প্রতিভাবান খেলোয়াড় মুর্ত্তি এবং সাবুর যথাক্রমে দিলীপ বসুর এবং ইসরাদী হোসেনের কাছে সিঙ্গলস্ খেলায় পরাজিত হয়ে প্রতিযোগিতাক্ষেত্র থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন। সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য খেলা হয় ম্যাডানের। ১০—৮, ৬—৪, ৬—২ গেমে রিচার্ডকে পরাজিত করেন। আমেদ, যুধিষ্ঠির সিং, সুমন্ত মিশ্র, বসু সেন, নসু সেন প্রত্যেকে তাদের সুনাম অনুযায়ী খেলা দেখান এবং পরবর্ত্তী বিভাগে উন্নীত হয়েছেন।

১লা জানুয়ারী রেডক্রশ ফাণ্ডের সাহায্য কল্পে একটি প্রদর্শনী টেনিস প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হয়েছে। দিলীপ বসু, সুমন্ত মিশ্র, ইফতিকার আমেদ, ম্যানমোহন, মেটা প্রভৃতি যোগদান করবেন।

* * *

পূর্ব্বাংশের রঞ্জী ট্রফী প্রতিযোগিতার ফাইনালে বাঙ্গালা দল হোলকারের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করবে। এ অনুষ্ঠান উপলক্ষে হোলকার দল আগামী ১৯শে, ২০শে, ২১শে তারিখে বাঙ্গালা দলকে ইন্দোরে প্রতিযোগিতা করবার জন্য আহ্বান করেছেন। গত বৎসর হোলকার দল কলকাতায় প্রতিপক্ষতা করেছিল। এবার বাঙ্গলা দলের পালা।

* * *

রেড ক্রশের সাহায্যকল্পে আগামী ৬ই, ৭ই, ৮ই জানুয়ারী ল্যাগডেনের স্মৃতির উদ্দেশ্যে যে প্রদর্শনী ক্রিকেট খেলার ব্যবস্থা হয়েছে তাতে ভারতের প্রায় অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়দের যোগদান করতে দেখা যাবে।

কর্ণেল সি, কে, নাইডু, সারওয়াতে, মুস্তাক আলী, অমর নাথ, হিন্দেলকার, মানকড়, প্রভৃতির যোগদানের নিশ্চয়তা পাওয়া গেছে। কলকাতার ক্রীড়ামোদীদের আবার একটা উন্নত ধরণের প্রদর্শনী ক্রিকেট খেলা দেখার সুযোগ ঘটেগেল।

ক: সি, কে, নাইডুর জয়ন্তী-উৎসব ১লা জানুয়ারী থেকে অনুষ্ঠিত হবে। এ অনুষ্ঠান উপলক্ষে নৃত্যগীত, প্রভৃতির ব্যবস্থা হয়েছে। মোহন বাগান ক্লাব এ উৎসবের উদ্যোক্তা।

* * *

রঞ্জী ট্রফী প্রতিযোগিতায় মাদ্রাজ এবং হায়দ্রাবাদের খেলাটির চূড়ান্ত মীমাংসা হয়ে গেছে। ১ম ইঃ মাদ্রাজ দল ১৮৮ রাণ করে, সেই অনুপাতে হায়দ্রাবাদ ১ম ইঃ-এ ১৯২ রাণ সংগ্রহ করেছে। মাদ্রাজ দলের ২য় ইনিংসে জনষ্টনের ৮৬ রাণের সাহায্যে ২৩৩ রাণ লাভ হয়। এ প্রতিযোগিতার এই অনুষ্ঠানে গুল মহম্মদের বোলিং বিশেষ কৃতিত্বের হয়ে উঠে। প্রথম ইঃ-এ ৬৪ রাণে ৭ উঃ গ্রহণ এবং ৮১ রাণে ৫ উঃ লাভ তার সাফল্যের পরিচয় দেয়। ২য় ইনিংসে হায়দ্রাবাদ মাত্র ১৭৬ রাণ সংগ্রহ করে ৫৩ রাণে পরাজিত হয়। মাদ্রাজের এই জয় লাভের মূলে রাম সিং ও রঙ্গচারীর মারাত্মক বোলিং।

সম্প্রতি কলকাতার ক্রীড়ামোদীরা এক উচ্চাঙ্গের টেবল টেনিস প্রতিযোগিতা দেখবার সুযোগ পান। এ উপলক্ষে আমেরিকার কয়েকজন প্রখ্যাতনামা খেলোয়াড়দের দেখা যায়। মিঃ বিলেক, এরনসন প্রভৃতির খেলা দেখে অনেকেই প্রচুর আনন্দ পান। কলকাতায় নিখিল ভারত টেবল টেনিস প্রতিদ্বন্দ্বীতার ব্যবস্থা হয়েছিল।

* * *

ক্যাপ্টেন জিতেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জীর এক লক্ষ টাকা দানে শরীর-চর্চ্চার প্রধান পীঠস্থান হিসাবে কৃষ্ণবিহারী ষ্ট্রীটে নিখিল বঙ্গ ব্যায়াম-সঙ্ঘ নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। ঐ প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্ত্তন করে জিতেন্দ্র ব্যায়াম মন্দির নাম রাখা হয়। এ প্রতিষ্ঠানের বাৎসরিক ব্যায়াম প্রদর্শনী সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়েছে। যে প্রকার অর্থ এবং জনগণের সহানুভূতি এ প্রতিষ্ঠানের আছে তাতে এঁদের ব্যায়াম চেষ্টার প্রচার কল্পে অনেক কিছুই করা উচিত।

আর, এ, এফ ক্যাম্পে মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতা

গত ২০শে ডিসেম্বর এক আর, এ, এফ "ক্যাম্পে" স্কুল অফ ফিজিক্যাল কালচার বনাম আর, এ, এফদের একটী বিশেষ আকর্ষণীয় মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতা হইয়া গিয়াছে। প্রত্যেকটী লড়াই প্রতিযোগীতা মূলক হয়।

গান

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

তোমারে লাগিল ভালো
সেইত আমার ভালো,
নয়নে তোমার হেরিনু উজল
নয়ন-ভুলানো আলো।
সেইত আমার ভালো।

কত জনমের যেন পরিচয় কত জীবনের কথা
কত না-পাওয়ার করুণ কাহিনী
কত বিরহের ব্যথা।

তারা হয়ে ফোটে আকাশের গায়
মনে হয় তারা চিনেছে তোমায়
এই মিলনের মধুর মায়ায়

সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বলো—
সেইত আমার ভালো
তোমারে লাগিল ভালো।

তন্মধ্যে বাঙ্গালী তরুণ মুষ্টিবীর শৈলেন সরকার আর, এ, একের কর্পোরাল ডাউলকে পরাজিত করিয়া বিশেষ প্রশংসা অর্জ্জন করেন। লেফটেন্যাণ্ট মোকমোহন, মিঃ জে, কে, শীল, ও সার্জ্জেণ্ট ষ্টিফেনসান বিচারকের কার্য্য করিয়াছিলেন, নিম্নে প্রতিযোগীতার ফলাফল প্রদত্ত হইল :—

ওয়েল্টার ওয়েটে :—আশু রায় (এস, ও, পি, সি) এস, প্যালমার (আর, এ, এফ) কে পরাজিত করেন।

মিডল ওয়েটে :—প্রভাস চ্যাটার্জ্জী (এস, ও, পি, সি) কর্পোরাল প্রিস (আর, এ, এফ) কে পরাজিত করে।

ফেদারওয়েট—সলিল ঘোষ (এস, ও, পি, সি) সার্জ্জেণ্ট হেন্সলিপ (আর, এ, এফ) কে পরাজিত করে। ব্যাণ্টাম ওয়েট—বিশ্বনাথ মিত্র (এস, ও পি সি) সার্জ্জেণ্ট গিল (আর, এ, এফ) কে পরাজিত করে। ফ্লাইওয়েটে :—শৈলেন সরকার (এস, ও পি, সি) কর্পোরাল ডাউলকে (আর, এ, এফ) প্রহারে জর্জ্জরিত করিয়া পরাজিত করেন।

"বিন্দুর ছেলে"

—শূলপাণি—

আমরা গত ২৩শে ডিসেম্বর, শ্রীরঙ্গম মঞ্চে "বিন্দুর ছেলে"র অভিনয় দেখতে আমন্ত্রিত হয়েছিলাম। শরৎচন্দ্রের এই বিখ্যাত গল্পের নাট্যরূপ দান করেছেন শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত। প্রয়োগ-কর্ত্তা শ্রীশিশির কুমার ভাদুড়ী।

শরৎচন্দ্রের "বিন্দুর ছেলে"র সঙ্গে পরিচয় নেই বাঙলা দেশে অন্ততঃ এ যুগে এই শ্রেণীর পাঠক খুব কমই মিলবে। কাজেই এর বিষয় বস্তুর পুনরাবৃত্তি বাহুল্য বলে আমরা মনে করি। একটি খাঁটি মধ্যবিত্ত পরিবারের সুখ দুঃখের সহজ অনলঙ্কৃত কাহিনীকে নিয়েই শরৎচন্দ্রের "বিন্দুর ছেলে"র সৃষ্টি। যে দুঃখ দ্বন্দ্ব প্রতি নিয়ত বাঙ্গালী সংসারে ঘটচে দেখছি, যে ভুল বোঝার ফলে সংসারে অশান্তি ও দুর্গতি ঘনিয়ে আসে শরৎচন্দ্র ছিলেন তার ওস্তাদ লিপিকার। দীর্ঘদিন পরে শরৎচন্দ্রের 'বিন্দুর ছেলে'র নাট্যরূপ দেখে মনে হল নাটকীয় ঘটনাগুলির আবেদন এত সহজ বলেই এতখানি রস জমে উঠেছে ও সার্থকতা লাভ করেছে। এই দিক দিয়ে নাট্যরূপদাতা ও প্রয়োগ-কর্ত্তা উভয়েরই কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে। শরৎচন্দ্রের এই কাহিনী যে একটি মাত্র রংকে কেন্দ্র করেই এতখানি সার্থক হতে পারে, আমরা জানি, তার ধারণা খুব বেশী প্রয়োগ-শিল্পীর নেই। অন্য কারও হাতে পড়লে দেখতাম, এই সাদা কালোর ছবিটিকে অনাবশ্যক রঙে রেখায় দুর্ব্বোধ্য করে তোলা হত। এটা নাটকীয় রসের ক্ষেত্রে মাত্রাজ্ঞানের কথা। এ দিক দিয়ে কর্ত্তৃপক্ষ দর্শক সাধারণের ধন্যবাদ ভাজন হয়েছেন।

বলা হয় শরৎচন্দ্র ছিলেন Realist, কিন্তু realism বা বস্তুতান্ত্রিকতা তাঁর রসের একমাত্র চাবিকাঠি নয়। যাদব ও মাধবের চরিত্র শরৎচন্দ্রের কল্পনায় যে রূপ পেয়েছে—সে রূপ বাঙালী দেখতে চায় প্রতি সংসারে। তাই দর্শকেরও অত্যন্ত ভাল লাগবে এই চরিত্র দুটিকে। বাঙালী মনের চিরন্তন আদর্শ বাদকে এঁরা নাড়া দেবে। দুটি ভূমিকার মধ্যে মনোরঞ্জন বাবুর অভিনয় এককথায় চমৎকার। তাঁর অভিব্যক্তি, সাহিত্যিক মন ও শিল্পবোধের পরিচায়ক। মাধবের ভূমিকাও যথাযথ অভিনীত হয়েছে। অন্নপূর্ণার ভূমিকায় শ্রীমতী প্রভার অভিনয় সুন্দর ও সংযত। এই চরিত্রের যে মূল Symmetry তা আগাগোড়া বজায় রয়েছে শ্রীমতী প্রভার অভিনয়ে। যে দরদ শিল্পীকে অভিনীত চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম করে তোলে তার পরিচয় পাওয়া গেল অন্নপূর্ণার ভূমিকায়।

বিন্দুর ভূমিকায় অভিনয় করেন শ্রীমতী সাবিত্রী। অভিনয়ে ও চেহারায় এঁকে মানিয়েছেও বেশ। যে ভাবপ্রবণতা ও অন্তর্দ্বন্দ্ব বিন্দুর জীবনে দুর্দ্দিন ঘনিয়ে তোলে তার ধারাবাহিকতা নাটকের মধ্যে সুন্দরভাবে গড়ে উঠেছে। একটি ছোট ছেলেকে কেন্দ্র করে এই সন্তানহীনা নারীর জীবনে দুঃখ ও সংঘাতের একটা অকারণ জটিলতা দেখা দিয়েছিল। বাহিরের মুখর উত্তাপ অন্তরের কতখানি মহত্ত্ব ও সৌকুমার্য্যকে আড়াল করে রেখেছিল তা বুঝতে দর্শকদের কোথাও কষ্ট হবে না। বরং স্থানে স্থানে দর্শকের চক্ষু হয়তো অশ্রুপীড়িত হয়েই উঠবে। তথাপি আমাদের মনে হয়েছে এর অভিনয়ে কোথায় যেন একটা ফাঁক আছে। খানিকটা দরদ ও ব্যক্তিত্বের অভাব হয়তো এর জন্য দায়ী। কিশোর অমূল্য-এর ভূমিকায় কুমারী কেতকী সুন্দর অভিনয় করেছেন।

'বিন্দুর ছেলে'র অভিনয় প্রসঙ্গে আর একটা কথা বলা দরকার। বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে যে রসের পরিবেশন এ যাবৎ দেখেছি তা বালক ও কিশোরবয়স্ক দর্শকদের উপযুক্ত ছিল না। বিন্দুর ছেলে সে অভাব পূর্ণ করে দিল। পরিচ্ছন্ন অভিনয় ও সত্যকারের নাট্য-রসসৃষ্টি "বিন্দুর ছেলে"র সব চেয়ে বড় আকর্ষণ। সেই দিক দিয়ে আগামী দীর্ঘ দিনগুলিতে "শ্রীরঙ্গম" প্রেক্ষাগৃহ জনমুখরিত হয়ে উঠবে এটা কল্পনা করে নিতে পারি।

সমালোচনা

হজরত কেরমানী—এম, আবদুর রহমান প্রণীত। মুশলিম অনুসন্ধান সমিতি, কাটোয়া (বর্দ্ধমান) কর্ত্তৃক প্রকাশিত। দাম চৌদ্দ আনা মাত্র।

হজরত শাহ সৈয়দ আবদুল্লাহ কেরমাণী ছিলেন প্রাচীন মুস্লিম বঙ্গের একজন খ্যাতনামা দরবেশ। তাঁহার আবির্ভাব ও তিরোভাব কাল সম্বন্ধে ইতিহাসে কোন স্পষ্ট নির্দ্দেশ নাই। গ্রন্থকার অধিকাংশ স্থলে সমসাময়িক গ্রন্থের সাহায্য লইয়া এবং কিম্বদন্তীর উপর ভিত্তি করিয়া এই সাধক দরবেশের জীবন-কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহার জন্য তাঁহাকে যে পরিশ্রম ও অনুসন্ধান করিতে হইয়াছে তাহা পুস্তকটি পাঠ করিলেই বোঝা যায়। কেরমাণী সাহেবের বাল্যজীবন, ভারত আগমন প্রভৃতি বিভিন্ন অধ্যায়ে ধারাবাহিক ভাবে জীবন-কাহিনীটিতে বিবৃত করা হইয়াছে। বাংলা দেশের প্রাচীন ইতিহাসের গহ্বর হইতে যাঁহারা তথ্য সঙ্কলন করিতেছেন তাঁহাদের নিকট পুস্তকটির যথেষ্ট মূল্য আছে। গ্রন্থকার ও কাটোয়া মুশলিম অনুসন্ধান সমিতি এজন্য বাঙালী জনসাধারণের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। প্রায় দেড় শত পৃষ্ঠার পুস্তকের মূল্য মাত্র চৌদ্দ আনা ধার্য্য হইয়াছে। কাগজের এই দুর্ম্মূল্যের বাজারে ইহা যথেষ্ট সুলভ বলিতে হইবে।

দাতা মহবুব শাহ জীবনী—এম, আবদুর রহমান প্রণীত—দাম চার আনা।

বীরভূম শুধু হিন্দু-সাধনার কেন্দ্র নয়, বহু মুসলমান ফকির দরবেশেরও পুণ্য লীলাভূমি। হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতি পাশাপাশি দাঁড়াইয়া সে যুগে যে ইতিহাস রচনা করিয়াছিল এ যুগের হিন্দু-মুসলমান তাহা ভুলিয়া গিয়াছে। মহাত্মা মহবুব শাহের কাহিনী এক সময় বীরভূম, বর্দ্ধমান মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া, সাঁওতাল পরগণার নরনারীর মধ্যে সুপ্রচলিত ছিল। গ্রন্থকার চলিত প্রবাদ ও কিম্বদন্তীর উপর ভিত্তি করিয়া এই পুণ্য চরিত দরবেশের জীবনী রচনা করিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগে নানা কারণে বাঙলার এই দুইটি প্রধান সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সন্দেহ ও ভুল বোঝার সৃষ্টি হইয়াছে আলোচ্য-শ্রেণীর গ্রন্থের দ্বারা তাহা বিদূরিত হইবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। পুস্তকটির বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

প্রদীপ—একখানি হস্তলিখিত পত্রিকা। কিশোরদের কল্পনার রঙে প্রতিটি পৃষ্ঠা উজ্জল হইয়াছে। ইহাদের অধ্যবসায় ও রুচিবোধ বিশেষ ভাবে প্রশংসার যোগ্য। যে সমস্ত রচনা এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহা একমাত্র ছোটদের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিলেই স্বসঙ্গতি বজায় থাকিত। এ আসরে বড়দের বিশেষ করিয়া খ্যাতনামা লেখকের রচনার কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া আমরা মনে করি না।

নাটমণ্ডপ

দেখিতে দেখিতে ঘটনাবহুল ১৯৪৪ সাল অতিক্রান্ত হইল। অনন্ত কালস্রোতে ১৯৪৪ সাল একটি বুদ্বুদের মতই মিলাইয়া গেল। আমাদের রঙ্গজগতের উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলিও বিস্মৃতির গর্ভে লীন হইয়া যাইবার পূর্ব্বে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা প্রয়োজন। প্রথমে দেখা যাক্ এ বৎসরে বাংলাদেশে নির্ম্মিত কয়খানি ছবি মুক্তিলাভ করিয়াছে।

ছবির নাম	নির্ম্মাতা	সপ্তাহ
ওয়াপস (হিন্দী)	এন্-টি	* ৪৬
ছদ্মবেশী	ডি-লুক্স	* ৩৯
চাঁদের কলঙ্ক	বড়ুয়া	* ৩৩
পোষ্যপুত্র	ভ্যারাইটি	* ৩৩
বিদেশিনী	এম-পি	* ৩০
নন্দিতা	রূপশ্রী	* ২৮
সমাজ	নিউ টকীজ	* ২৩
মাটির ঘর	ভারতলক্ষ্মী	২১
হাসপাতাল (হিন্দী)	এম-পি	* ৮
সন্ধ্যা	অরোরা	৭
ইরাদা (হিন্দী)	ইন্দ্রপুরী	৪
অল-ষ্টার ট্রাজেডী	গ্রীণ	৩
বিরিঞ্চি বাবা	এ্যালায়েড	
গোঁজামিল	রূপকথা	

নিম্নলিখিত ছবিগুলি এখনও চলিতেছে :

উদয়ের পথে	এন-টি	* ৩৬
সন্ধি	চিত্ররূপা	* ৩০
প্রতিকার	নিউ সেঞ্চুরী	* ২২
শেষরক্ষা	চিত্রভারতী	৩

মোট ১৮ খানি ছবি এবৎসর মুক্তিলাভ করিয়াছে। তারকা-চিহ্নিত ছবিগুলি একাধিক চিত্রগৃহে একসঙ্গে মুক্তিলাভ করিয়া সম্মিলিতভাবে উপরোক্ত সপ্তাহে চলিয়াছে।

* * *

এবৎসরে ইষ্টার্ণ টকীজের "শহর থেকে দূরে" একাদিক্রমে রূপবাণীতে ৫১ সপ্তাহ চলিয়া এক রেকর্ড সৃষ্টি করিয়াছে। রক্সি সিনেমায় বম্বে টকীজের "কিসমৎ" ৬৮ সপ্তাহ চলিয়া হিন্দী ছবির রেকর্ড করিয়াছে। বাংলা ছবির মধ্যে "উদয়ের পথে" ও হিন্দীর মধ্যে "রামশাস্ত্রী" যে এবৎসরের শ্রেষ্ঠ ছবি তাহা নূতন করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই।

* * *

বাংলা দেশের ১৮খানি, বোম্বায়ের ৭৬ খানি, পাঞ্জাবের ৬ এবং আমেরিকা ও লণ্ডনের তৈরী ছবি ২৪০ খানি ছবি কলিকাতায় এই বৎসরে মুক্তিলাভ করিয়াছে।

* * *

নিম্নলিখিত ছবিগুলি মুক্তি-প্রতীক্ষায়—

অভিনয় নয়	কালী ফিল্ম	বাংলা
বন্দিতা	নিউ টকীজ	ঐ
দোটানা	ইউরেকা	ঐ
দুই পুরুষ	এন্-টি	ঐ
গৃহলক্ষ্মী	ভারতলক্ষ্মী	ঐ
কলঙ্কিনী	ইন্দ্রপুরী	ঐ
কত দূর	এস-ডি	ঐ
মাই সিষ্টার	এন-টি	হিন্দি
সুবে-শ্যাম	বড়ুয়া	ঐ
* সুলে	চিত্ররূপা	ঐ
স্বরগসে সুন্দর		
দেশ হামারা	ইন্দ্রপুরী	ঐ

* বঙ্গের বাহিরে মুক্তিলাভ করিয়াছে।

* * *

নিম্নলিখিত ছবিগুলি বিভিন্ন ষ্টুডিওতে এখন নির্ম্মাণাধীন :

বিরাজ বৌ	এন্-টি	বাংলা
চম্পা	পি, আর, প্রো:	হিন্দী
কুরুক্ষেত্র	ইউনিটি	ঐ
মানে-না-মানা	নিউ সেঞ্চুরী	বাঙ্গলা
মিনতি	কে. বি,	ঐ
নার্স সিসি	এন্-টি	ঐ
পথের সাথী	অরোরা	ঐ
রাজপথ	ভারতলক্ষ্মী	ঐ
শ্রীদুর্গা	মতিমহল	ঐ
সংগ্রাম	ডি-লুক্স	

মেট্রোর "কিসমৎ" ছবিতে নায়িকার ভূমিকায় মার্লেনা ডিয়েট্রিচ। ছবিখানি বর্ত্তমানে মেট্রোয় চলিতেছে।

টু সিষ্টারস্	এম, পি	হিন্দী
তক্‌রার	আর্ট	ঐ
উদয়ের পথে	এন্-টি	ঐ
ওয়সিয়তনামা	ঐ	ঐ
বন্ধু	ইউরেকা	বাংলা

নিম্নলিখিত হিন্দী ছবি তিনখানি ১৯৪৩ সালে গৃহীত হইলেও কলিকাতায় আজ পর্য্যন্ত মুক্তিলাভ করে নাই। আর্জু (আই-বি পিকচার্স), কাশীনাথ (এন্-টি) এবং

মনোমদ নৃত্যগীতানুষ্ঠান :—

জানুয়ারী মাসের প্রথমেই মধ্য কলিকাতার বিশ্ববিশ্রুত সঙ্গীতবিদ্ তিমির বরণের প্রযোজনায় একটি মনোমদ নৃত্যানুষ্ঠানের আয়োজন করা হইয়াছে। ইহাতে সুপ্রসিদ্ধ কথাকলি-নর্ত্তক কেলু নায়ার অনেকটি খণ্ড-নৃত্য ছাড়া "জটায়ু-বধ" নামক নৃত্য-নাট্যে প্রধান ভূমিকায় মঞ্চাবতরণ করিবেন। আর একজন খ্যাতনামা কথাকলি-নর্ত্তক াব, মেনন এই প্রথম কলিকাতায় তাঁহার নৃত্যকলা প্রদর্শন করিবেন। প্রসিদ্ধা চিত্র-তারকা চিত্রা দেবী এই অনুষ্ঠানে নায়িকার অংশ গ্রহণ করিবেন। ইহা ছাড়া শ্যামসুন্দরকেও তাহার ২।১টি জনপ্রিয় নৃত্যে দেখা যাইবে। ইঁহারা ছাড়া অমিতা বসু, বেলা বসু, ডলি ভট্টাচার্য্য, দিলীপ কুমার, শঙ্কর প্রসাদও আছেন। প্রথিতযশা সঙ্গীত পরিচালক অমিয় কান্তি সঙ্গীত পরিচালনা করিবেন। কণ্ঠ-সঙ্গীতে সহায়তা করিবেন বিমান ঘোষ। প্রকাশ যে, পরে ইহারা কলিকাতায় ৮।১০টি "শো" দিবেন।

বিশ্বভারতীর সাহায্যার্থে 'তপতী' অভিনয়—আগামী ১১ই জানুয়ারী সন্ধ্যা ৬॥০ ঘটিকায় ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউট্ হলে স্কটিশ চার্চ কলেজের বি, টি বিভাগের ছাত্রীগণ কর্ত্তৃক রবীন্দ্রনাথের 'তপতী' নাটক অভিনীত হইবে। ইহার দ্বারা লব্ধ অর্থ রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি-রক্ষার্থে শান্তি-নিকেতনে প্রেরিত হইবে।

গোল্ড মোহর ফিল্ম ডিষ্ট্রীবিউটর্স—এই চিত্র পরিবেশন-প্রতিষ্ঠানটি সম্প্রতি কয়েকখানি মনোমদ চিত্র সংগ্রহ করিয়াছেন এবং দিন দিন ক্রমোন্নতির পথে চলিয়াছেন। 'সন অব্ আপ্পো,' 'আলাদীন-কা-বেটা' আর্থিক সাফল্য লাভ করিয়াছে। আমরা এই নববর্ষে তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গীন শুভ কামনা করি।

গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন

গত ১৯৪৪ সালে সরকারী আদেশের ফলে আগষ্ট হইতে নভেম্বর এই চারি মাস দীপালীর আকার ক্ষুদ্রতর হওয়ায়, তাহার মূল্যও সেই অনুপাতে কম করা হয়। ইহার দরুণ অনেকে ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া এইচারি মাসের দরুণ অনেক পাঠক কিছু মূল্য ফেরৎ চাহিয়াছেন। যদিও এপ্রকার পরিস্থিতির জন্য আমাদের নিজেদের ইচ্ছাকৃত কোনও ত্রুটি বা ঔদাসিন্য নাই। দেশের এই দুর্দ্দিনে অনেকের অনেক বিষয় যেমন সুবিধা হইতেছে তেমনি অনেক বিষয়ে বিশৃঙ্খলাও যে না ঘটিতেছে তাহাও নয়। কাজেই আমাদের পরিকল্পিত কার্য্যপদ্ধতি আম। পরিবর্ত্তিত করিতে বাধ্য হই। যাহা হউক, অনেকে যখন দীপালীর বাৎসরিক চাঁদা বাবদ প্রদত্ত টাকার মধ্যে কিছু ফেরৎ চান তখন আমরা তাহা দিতেও প্রস্তুত। আমরা ঠিক করিয়াছি যেসব গ্রাহক ১৯২৪ সালে বার্ষিক বা শেষ যান্মাসিক চাঁদা যথাক্রমে ১২।০ ও ৬॥০ দিয়াছেন তাঁহারা ১৯৪৫ সালে বার্ষিক বা ষাণ্মাসিক গ্রাহক থাকিতে ইচ্ছুক হইলে ১৯৪৫ সালে জন্য ১০৷০ ও ৫॥০ পাঠাইলেই চলিবে। এখানে বলা প্রয়োজন যে ১৯৪৪ সালে আমাদের নির্দ্দিষ্ট ৪৮ সংখ্যার স্থানে ৫২ সংখ্যা কাগজও দিয়াছি এবং এই দুই টাকা তাহারও উপরে। সুতরাং আর বোধহয় কাহারও ক্ষোভের কোনও কারণ থাকিবে না।

ম্যানেজার
দীপালী

আলোক-তীর্থ—আলোক-তীর্থের সভ্য সভ্যাগণ কর্ত্তৃক দিলীপ দাশগুপ্ত রচিত নাটক 'নরনারী' আগামী ২০শে জানুয়ারী রঙমহল রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইবে। পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়াছেন নাট্যকার স্বয়ং। বিভিন্নাংশে মমতা ব্যানার্জ্জি, পারুল কর, শেফালি দে, মলিকা দাসগুপ্তা, পাপা ব্যানার্জ্জি, সুললিত গোস্বামী, মৃণাল ব্রহ্ম প্রভৃতি অভিনয় করিবেন।

"মা-বাপে"র সাফল্য

বাসন্তী ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্সের পরিবেশনাধীনে "মা বাপ" ছবিখানি যে স্থানীয় দর্শকদের নিকট বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছে তাহা বুকিং অফিসের নিকট ক্রমবর্দ্ধমান জনতা হইতেই প্রতীয়মান হয়। সিটি ও প্যারামাউণ্টে দশম সপ্তাহে চলিতেছে এই ছবিখানি।

[illegible] [illegible]
[illegible] চিত্রতারকা
সম্মেলনে
নববর্ষের হর্ষোজ্জ্বল
আকর্ষণ !

এম, আই, ষ্টুডিওর

পনছী

শ্রেষ্ঠাংশে :
মনোরমা, সাজমা, আজমল

একই সঙ্গে প্রদর্শিত হইতেছে

গণেশ
ও
পার্ক শো হাউস

আমাদের ১৯৪৪ সালের অভাবনীয় আকর্ষণ—

কাদম্বরীর পরিচালকের পরিচালনায় আর একখানি
ঐতিহাসিক চিত্র—

মুরলী মুভিটোনের

অম্রাপলী

ভূমিকায় : :সবিতাদেবী, প্রেম আদীব
পরিচালক : নন্দলাল যশোবন্তলাল
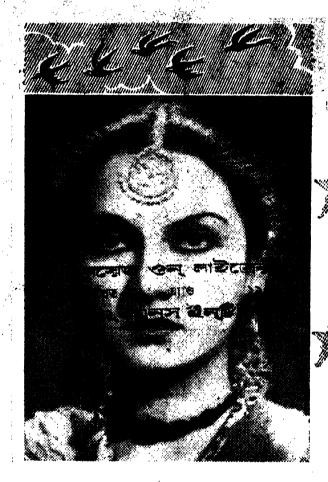
বিশিষ্ট চিত্রতারকার সম্মেলনে নির্মিত অপরূপ
সামাজিক চিত্র—

সমঝোতা

ভূমিকায় : মারগীশ, পাহাড়ী, শোভনা
সমর্থ, জাগীরদার, মুবারক

দরিয়ানির

প্রীত-কি-রীত

ভূমিকায় : স্নেহপ্রভা, চন্দ্রমোহন,
স্বর্ণলতা, পাহাড়ী, আজীম

পরিবেশক : বোম্বে পিকচার্স কর্পোরেশান, ১১এ, এসপ্ল্যানেড ইষ্ট, কলিকাতা।

দীপালীর স্বত্বাধিকারী শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত, ১২৩।১